ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের
উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের
জাতীয় নেতৃত্বের অর্থনৈতিক নীতি

বিপান চন্দ্র

প্রাইমা পাবলিকেশনস্
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬১

প্রকাশক :
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
মদনমোহন কুমার
মদন প্রেস
১/১ সি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

১

ভারতের দারিদ্র

১৮৫৭-র বিদ্রোহের অব্যবহিত পরের দশক গুলিতে শিক্ষিত ভারতীয়ের অনেকেই—যেমন, বিকাশমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নেতারা—মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন এদেশের জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়েছে। কিছুদিন বাদেই অবশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি ও চেতনার প্রসারের ফলে ঐ কল্যাণের বৈষয়িক আধেয় ও প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। তবে তখনও জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ ব্রিটিশ শাসনের আইনগত, সাংবিধানিক ও অন্যান্য অনর্থনৈতিক ফলাফলকে ইতিবাচক বলে স্বাগত জানিয়েছেন; এবং সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধও করেছেন। এটা দেখা গেছে এই সমীক্ষা যে কালপর্ব নিয়ে তার প্রায় শেষ অবধি।[১]

ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ফলাফল যে হতাশাব্যঞ্জক, এমনকি ক্ষতিকর, এরকম একটা ধারণাও অবশ্য এই সময় গ'ড়ে উঠছিল। ১৮৬৭ সালে দাদাভাই নৌরজী লিখেছিলেন, "সাধারণ মানুষ এখন পর্যন্ত (ব্রিটিশ শাসনের ফলে) কোনো উন্নতিই অনুভব করতে পারে নি।" মাত্র কয়েক বছর পরেই, ১৮৭১ সালে তিনি "দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র এবং নিঃশেষিত অবস্থার"[২] উল্লেখও করেছেন। বস্তুত ১৮৬৫-৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে পরপর কয়েকটি দুর্ভিক্ষ উনবিংশ শতাব্দীর গোটা শেষার্ধ জুড়ে সমগ্র ভারবর্ষকে গ্রাস করছিল।[৩] যার ভয়াবহ পরিণাম সদাশয় বিদেশী শাসকদের অধীনে শান্তিপূর্ণ ভারতবর্ষের সুশৃংখল অগ্রগতির ছবিটিকে বার বার নাড়িয়ে দিচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পরিস্থিতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

প্রথমদিকে ভারতের জাতীয় নেতাদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটেনের জনসাধারণ, এমনকি শাসক সম্প্রদায়ও, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কি তা জানতেন না। তাঁরা ঐ দেশের সাধারণ মানুষ, সাংসদ ও প্রশাসকদের সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, শাসকদের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট পথ বের করতে হলে, সাধারণ

মানুষের আর্থিক অবস্থা সঠিক ভাবে জানতে ও পরিমাপ করতে হবে, কেননা তাহলেই "বাস্তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত প্রয়োজন কী, তা স্পষ্ট স্বীকৃতি পাবে।" তাছাড়া ভারতীয়রা তখন জাতিত্ব ও জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন হয়ে উঠছিল; সেজন্যও নেতারা চাইছিলেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের তদানীন্তন অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে নিজেদের মনোভাবকে সুনির্দিষ্ট করতে। অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কী হবে, তা নির্ভর করছিল ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত নীতি ও তার ফলাফলের মূল্যায়নের উপর।

১৮৭০ এর দশকে ভারতীয় নেতারা দেশের অর্থনৈতিক রুগ্নতা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করলেন। ঐ বছর ২৭ শে জুলাই লন্ডনে 'সোসাইটি অব আর্টস'-এর একটি সভায় দাদাভাই নৌরজী তাঁর সুবিখ্যাত নিবন্ধ "ভারতের অভাব ও তার প্রতিকারের উপায়" পাঠ করেছিলেন। "ভারত কি বর্তমানে তার চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট পরিমানে উৎপাদনে সমর্থ?"—এই স্পষ্ট প্রশ্নটি তিনি উত্থাপন করলেন। তাঁর নিজের উত্তর ছিল নেতিবাচক। এরপর ১৮৭৩ সালে স্বল্পায়ু বাংলা ত্রৈমাসিক 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এর পাতায় ভোলানাথ চন্দ্রের লেখায় ভারতের ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হল। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হল দাদাভাই নৌরজীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা: 'ভারতবর্ষের দারিদ্র' (দ্য পভার্টি অব ইন্ডিয়া)।[৪] ঐ দশকের শেষদিকে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে জি. ভি. যোশীর[৫] সহযোগিতায় 'পুনা সার্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র' বের করা শুরু করলেন। এই পত্রিকার বহু লেখায় প্রায় দুদশক ধরে রাণাডে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ সময় প্রায় সব ভারতীয় লেখকই ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বই বা নিবন্ধ লিখছিলেন, অথবা জনসভায় কিংবা কাউন্সিল চেম্বারে ঐ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করছিলেন, ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ক রচনার প্রায় সবটাই কার্যত অর্থনৈতিক আলোচনায় নিয়োজিত হয়েছিল। এটা চূড়ান্ত রূপ পেল ১৯০১—০৩ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত-র দুখণ্ডে লিখিত 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' নামে অমূল্য গ্রন্থটিতে। রমেশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট: "ভারতের সাধারণ মানুষের—তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি এবং ব্রিটিশ রাজত্বে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার—ইতিহাস রচনা।" তিনি এটা কর্তব্য মনে করেছেন, "কেননা এই মুহূর্তে ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক কাহিনী' শোনানো এবং ভারতবাসীর দারিদ্রের মূল কারণ ব্যাখ্যা একান্ত প্রয়োজন।"

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান যত এগোতে লাগল অভিযোগের তালিকাও তত দীর্ঘ হতে লাগল। অর্থনৈতিক অবস্থার যে ছবি বেরিয়ে এল,

তা অন্ধকারের ছবি। এতকাল এদেশের যে "অতুলনীয় সম্পদের কথা ভারতীয় ক্যাবিনেটে সর্বদা উল্লিখিত হয়েছে, এবং বাণিজ্য দপ্তরের আদর্শ হিসাবেও গণ্য হয়েছে, এখন দ্রুতে এই উপলব্ধি ছড়িয়ে পড়ল যে ঐ অতুলনীয় সম্পদ শুধু নামেই, কার্যত নয়।" অল্পদিনের মধ্যেই অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে সব আলোচনায় দারিদ্রের বিষয়টিই প্রধান স্থান নিল। ভারতীয় নেতারা দারিদ্রের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে লাগলেন। দাদাভাই নৌরজী লিখলেন: "এটি এমন একটি মৌলিক সমস্যা যার সমাধান কীভাবে করা হবে তার উপরই নির্ভর করছে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আশির্বাদ হিসেবে পরিগণিত হবে কিনা; নয়তো—ঈশ্বর জানেন—কী দুর্দশাই না অপেক্ষা করছে।" অনেকেই এই দারিদ্রকে "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা" বলে বর্ণনা করতে লাগলেন। ১৯০১ সালে রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখলেন: "আমার মনে হয় না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথাও পরিস্থিতি ভারতের থেকে গুরুতর।" চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ঐ বছরই সংগ্রামী সাপ্তাহিক 'নতুন ভারত' (New India)-র প্রথম সংখ্যায় লিখলেন: "নতুন ভারত যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন, আমাদের ধারণা অর্থনৈতিক সমস্যাই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সব চেয়ে জরুরী।"[৬] 'ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' নামে একটি প্রবন্ধে ১৮৯২ সালেই বিচারপতি রানাডে রাজনৈতিক প্রশ্নের তুলনায় অর্থনৈতিক প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য, জন্ম থেকেই রাজনীতিতে "চরমপন্থী" অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৮৫ সালের ২রা জুলাই লিখেছিল: "প্রকৃত সত্য এটাই যে, ভারতবর্ষের মানুষ দুমুঠো খেতে পেলে আর ন্যায়-বিচার পেলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করতে আগ্রহী।"[৭] প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসকদের সব কাজকে সে-সময় একটি কষ্টিপাথরেই যাচাই[৮] করতে চেয়েছিলেন, তা হ'ল লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জীবনে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল কী? অর্থাৎ দেশের প্রগতি বলতে শেষ অবধি ঐ সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বোঝায় কিনা।

ভারতীয়রা যে দারিদ্রের সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন, সে সম্পর্কে ব্রিটিশ-ভারতীয় কর্তৃপক্ষও অবহিত ছিল। এই সমস্যাটিকে প্রশাসনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণেও তারা গররাজী ছিলেন না। সেজন্যই ভারতসচিব স্যার হেনরী ফাউলারকে ১৮৯৪ সালের ১৫ই আগস্ট কমন্স সভায় বলতে দেখা গেছে, "যে প্রশ্নটি আজ আলোচ্য সেটি হ'ল: ভারতে নিযুক্ত বর্তমান প্রশাসন যন্ত্র ভারতীয়দের জীবনে সার্বিক মঙ্গল বিধান করতে পেরেছে কিনা?—অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশে রূপান্তরিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে? না অবনতি ঘটেছে?"

এসব থেকে এটা স্পষ্ট যে, "দারিদ্রের সমস্যা" ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণের পর্যায়ে মঞ্চে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের মুখপাত্র ও উদীয়মান ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে এনিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে। সমসাময়িক অন্য কোনো বিষয় নিয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এত প্রবল বিতর্ক দেখা যায় নি, অন্য কোনো বিষয় এত উত্তাপ সঞ্চার করতে পারে নি, কিংবা এমনভাবে নিন্দিতও হয় নি।[৯]

১. ভারতবর্ষ কি সত্যিই দরিদ্র ছিল?

বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল এটি। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজীই প্রথম ভারতের চরম দারিদ্রের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে লেখা 'ভারতের দারিদ্র' নামে রচনায় তিনি জানিয়েছিলেন: "ভারতবর্ষ নানা দিক থেকে গুরুতরভাবে পীড়িত; দারিদ্রে নিমজ্জমান" এবং "জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করার মতো ক্ষমতাও ভারতের সাধারণ মানুষের নেই।" বস্তুত ভারতের দারিদ্র সমস্যা দাদাভাই-এর অখণ্ড মনোযোগের বিষয় হয়েছিল; বছরের পর বছর তিনি ইংলণ্ড চষে বেড়িয়েছেন সেদেশের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার "জীবনব্যাপী ব্রত" সাধনে। বয়স বাড়ার পরও এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়নি। বরং ক্রমাগত তিনি আরও কঠিন, আক্রমণাত্মক ও ধিক্কারসূচক ভাষা ব্যবহার করেছেন। ১৮৮১ সালে দাদাভাই "ভারতের চরম দুর্দশাগ্রস্থ, হৃদয় বিদারক ও রক্ত-গরম-করা অবস্থার" তীব্র নিন্দা করে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, "প্রাচ্যের—অন্তত ব্রিটিশ ভারতের—ঐশ্বর্যের কথা এখন শুধু বাক্যাড়ম্বরে পর্যবসিত, স্বপ্নমাত্র।" ১৮৯৫ সালে তিনি জানালেন, "দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসী খাদ্যাভাবে আজ মুমূর্ষু, স্পর্শ করলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে"। ১৯০০ সালে ঘোষণা করলেন: "সত্য ঘটনা হল—ভারতবাসী আজ ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে; আমেরিকার ক্রীতদাসদের থেকেও এদের অবস্থা খারাপ, কেননা আমেরিকার দাসরা যাদের সম্পত্তি সেই দাস-মালিক অন্তত তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে।"

১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের চরম দারিদ্রের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির একটি মূল আলোচ্য হয়ে ওঠে।[১০] ১৮৯১ সালে সপ্তম অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যাতে বলা হয়েছিল—"পুরো পাঁচকোটি মানুষ প্রায় অনাহারে অসহনীয় জীবন-যাপন করছে; বছর-বছর এই সংখ্যা বাড়ছে; বর্তমানে প্রতি দশকে শুধু অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যাই দাঁড়িয়েছে কয়েক লক্ষ।" এরপর প্রতি বছরই কংগ্রেস অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে; একের পর এক কংগ্রেস

সম্পাদিত দারিদ্র্যের সমস্যাকে বাৎসরিক ভাষণের অপরিহার্য অংশ করে তুলেছেন।[১১] বস্তুত এইসময় জাতীয়তাবাদী লেখক ও বক্তারা দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন একটি প্রধান বিষয় হিসেবে।[১২]—সেই ১৮৮১ সালে একজন অপ্রকাশিত-নামা লেখক পুণার সার্বজনিক সভার মুখপত্রে ঘোষণা করেছিলেন, "চরম দারিদ্র্যের লক্ষণ এত ভয়ানক আকার নিয়েছে যে অন্য কোন দেশ হলে সরকার সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করিতে বাধ্য হত, অন্যথায় বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হ'ত।" এইসময় অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রও প্রতিদিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিরত অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও দুর্দশার বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে "দুর্দশাগ্রস্থ", "চরম সংকটাপন্ন", "শোচনীয়", "সমবেদনা উদ্রেককর", "পশুর তুল্য" ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হচ্ছিল। ভারতবাসী "অনাহার-ক্লিস্ট" এবং "গোলামের মতো হীন", "নিদারুণ" দারিদ্র্যের "কর্দমে" নিমজ্জিত—ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এইগুলিই ছিল প্রচলিত বক্তব্য। কোনো কোনো সংবাদপত্র ছবির মতো বিবরণ উপস্থিত করছিল। যেমন, বাংলা কাগজ, "সুলভ দৈনিক"। এই কাগজে ভারতীয় নাগরিকের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখা হয়েছিল:

"(ভারতবাসী) জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দেহে আর তার বল নেই। রক্ত শোষিত হয়ে এখন সে ছিবড়েয় পরিণত। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে, তাকে এক বস্তা শুকনো হাড়ের বেশি কিছু বলা যায় না। অর্ধভুক্ত; অর্ধনগ্ন। দৈনিক খাদ্য—দুমুঠো ভাত আর একগাদা লতাপাতা শিকড়-বাকর, জীবনে কখনো সুখাদ্যের স্বাদ পায়নি। তার জামাকাপড় অতি দীর্ণ, ন্যাকড়ায় পর্যবসিত। তার বাসগৃহ জঘন্য, গোয়ালঘরের মতো, রোদবৃষ্টির নিষ্করুণ প্রচণ্ডতা থেকে সেখানে নিস্তার নেই।"

লোকমান্য তিলক সম্পাদিত মারাঠি সাপ্তাহিক "কেশরী"তে ১৮৯৬ সালে "শিবাজীর উক্তি" নামে একটি পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে শিবাজী বিলাপ করে বলছেন—"হায়! হায়! আমি আজ স্বচক্ষে স্বদেশের একি ধ্বংসস্তূপ দেখছি। ···সমগ্র দেশটা এখন পতিত জমি। ·····সব খুইয়েছে, শেষ অবধি স্বাস্থ্যও। দুর্বৃত্ত 'আকবার' (মূর্তিমান দুর্ভাগ্য) দুর্ভিক্ষকে সাথে নিয়ে দেশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।" পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত "ভিক্টোরিয়া পেপার"-এর ১৮৯৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংখ্যায় আরও একধাপ এগিয়ে, যেসব ভারতীয় দেশের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করছিল তাদের "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি মূলত নিবদ্ধ ছিল সাধারণ মানুষের অবস্থার উপর, উচ্চ শ্রেণীর উপর নয়। তাঁদের প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল—"অধিকাংশ দেশবাসীর" দারিদ্র্য, যা "এখন বিতর্কের বিষয়।"[১৩] সমাজের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীগুলির,

কৃষি শ্রেণীগুলির "দুমুঠো ভাতের জন্য উদয়াস্ত শ্রমে রত নিরন্ন, সঙ্কুচিত, শুষ্ক ভারতীয় রায়তের" "সেইসব লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসী যারা অন্য সময় অর্দ্ধভুক্ত থাকে, আর দুর্ভিক্ষের সময় মাছির মতো মৃতুবরণ করে" তাদের, এবং "সমাজের নিম্নস্তরের সমস্ত মানুষের" অবস্থাকেই তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন দেশের দারিদ্র অথবা স্বাচ্ছল্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে।[১৪] কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা বিশেষ করে তীব্র ধিক্কারের কারণ হয়েছিল। কারণ এদের প্রায় সবাই "বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে" ভুগত।

দারিদ্রের সমস্যার মুখ্য প্রচারকরা সমস্যাটিকে ত্রুটিপূর্ণ বণ্টনের সমস্যা অপেক্ষা স্বল্প উৎপাদনের সমস্যা হিসেবে দেখাই সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। "কাদের দ্বারা, এবং কোন পদ্ধতিতে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে আয় বণ্টন হচ্ছে", প্রশ্ন হিসেবে তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সামগ্রিক উৎপাদন ভারতবাসীর চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট কিনা, এইটাই ছিল এঁদের কাছে প্রথম বিবেচ্য, মৌলিক প্রশ্ন। সমস্যাটিকে এইভাবে দেখলে পর্যাপ্ত উৎপাদনের অভাব এবং যা উৎপাদিত হচ্ছে তা দেশে ধরে রাখার অক্ষমতাই বিশেষ গুরুত্ব পায়।[১৫] সেজন্যই ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছিলেন। ভারতে রাজনীতির বিকাশে দারিদ্র-সমস্যার এই বিশেষ ব্যাখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এর ফলে, দারিদ্র ব্যাপক জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য হ'ল যা সমাজের বিভিন্ন অংশকে দারিদ্র দূরীকরণের সার্বিক দাবীর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।[১৬] এবং অনেকটা এরই ফলে "বিশিষ্টতাবাদ" দেখা দিয়েছিল যে মতবাদের মূল কথা, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ হবে অন্যান্য দেশে অনুসৃত পথ থেকে ভিন্ন। বহু ভারতীয় আবার দারিদ্র সমস্যাটিকে দেখেছেন—"উৎপাদন ক্ষমতা শক্তি" হ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নতির অভাবের লক্ষন, এবং একই সঙ্গে, উন্নয়নের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে।[১৭]

বেশ কিছুকাল এই 'নগ্ন' ও 'শোচনীয়' দারিদ্রের অস্তিত্বকেই অধিকাংশ ব্রিটিশ প্রশাসক এবং তদানীন্তন ও প্রাক্তন কর্মচারীরা স্বীকার করেন নি। এরা সুখী সন্তুষ্ট কৃষকের জীবনের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীর চরম দুরবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ক্রমাগত অভিযোগে অতীষ্ঠ হয়ে ১৮৮৫ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত ভারতে নিযুক্ত বড়লাট লর্ড ডাফরীন ১৮৮৭ সালে "নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের অবস্থা" সম্পর্কে একটি গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে ১৮৮৮ সালে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে ভারত সরকার যে 'প্রস্তাব' প্রকাশ করেন, তার শেষে পরিশিষ্ট ক-এ এই রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশ করা হয়।

আঞ্চলিক প্রতিবেদনগুলিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছিল, যে সাধারণভাবে দেশে খাদ্যাভাব নেই, এমনকি "কৃষক সমাজের অন্তর্ভুক্ত নিচু তলার মানুষের অবস্থাও এমন কিছু খারাপ নয়, যাতে এই মুহূর্তে আশঙ্কার কারণ হতে পারে", বরং "স্বাভাবিক বছরগুলিতে জনসাধারণ রীতিমতো প্রাচুর্যের মধ্যেই বাস করে।"[১৮] ১৮৯৩ সালে ভারত সরকারকে আরও আশাবাদী হতে দেখা গেল। ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন: "এদেশ এখন রীতিমত সমৃদ্ধ"। শুধু তাই নয়, "তৃতীয় দশকের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি সংক্রান্ত রিপোর্ট"-এ (১৮৯১-৯২) জোর দিয়ে বলা হ'ল: "বৈষয়িক দিক থেকে কৃষকদের সাধারণ অবস্থা নিয়ত উন্নয়নশীল মানানুসারেই এখন বেশ স্বচ্ছল।" বেসরকারি ইংরেজ লেখকরাও এই সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে একমত ছিলেন। তাঁদের কোনো দায়-দায়িত্ব ছিল না বলে তাঁরা আরো অনেক বেশি খোলাখুলিই এই মত ব্যক্ত করেছেন।[১৯]

২. দারিদ্র্যের প্রমাণ

দারিদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ভারতের জাতীয় নেতারা অনেক সময় ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ, "এতে শয়তান নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে"। এই ধরনের যে দুটি উদ্ধৃতি নেতাদের প্রায়ই ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে তার একটি স্যার ডবলিউ হানটার-এর লেখা 'ইংল্যান্ড'স ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া' বই থেকে নেওয়া: "ভারতের চার কোটি লোক খাদ্যাভাবে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়।" অপরটি, স্যার চার্লস ইলিয়টের একটি মন্তব্য: "আমার বলতে দ্বিধা নেই, এদেশে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের অর্ধেকই জানে না আগামী বছর তাদের কী খাবার জুটবে।"

মাথা-পিছু গড় আয়ের অঙ্কও প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হ'ত। মোট বার্ষিক জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় হিসেব পাওয়া যায়। এই রকম একটি সূচককে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য কিংবা তার অভাব প্রমাণের জন্য ব্যবহারের একটা বড় সুবিধা এই যে, এর দ্বারা সমস্যাটিকে নাটকীয়ভাবে দৃষ্টিগোচর করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের ও সময়ের জীবনযাত্রার সঙ্গেও তুলনা করা যায়। উপরন্তু, সরল ও সহজবোধ্য পরিসংখ্যান ব্যবহার করার ফলে যুক্তি "পরিমাণগত ভিত্তি পেয়ে সুদৃঢ়" হয়। পরিসংখ্যানের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, "তা এমনকি নিরক্ষর ভারতীয়ের বোধ-বুদ্ধির কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।"

মাথা-পিছু গড় আয় প্রথম হিসেব করার কৃতিত্ব দাদাভাই নৌরজীর। ১৮৭৩

সালে দাদাভাই একটি সহজ অথচ কার্যকর পদ্ধতির সাহায্যে হিসেবে করে বের করেছিলেন, ১৮৬৭-৬৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি আর মোট জাতীয় আয় হয়েছিল ৩৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ তখন মাথা-পিছু আয়ের পরিমান ছিল ২০ টাকা।[২০] এই হিসেব যে গড়পড়তা, আনুমানিক, এবং নির্ভুল নয়, সে সম্পর্কে দাদাভাই সচেতন ছিলেন। কিন্তু সে সময় প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে এর থেকে বেশি নির্ভুল হিসেব করা সম্ভব ছিল না।[২১] ২০ টাকা মাথা-পিছু আয়ের অংকটি পরবর্তী বছরগুলির জাতীয় আন্দোলনে একটি প্রধান প্রচারের বিষয় হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে, প্রচার-পুস্তিকায়, বক্তৃতায়, সর্বত্র এটি উদ্ধৃত হয়েছে। ফলও হয়েছে মারাত্মক। কিন্তু দাদাভাই-এর পরিসংখ্যান যে চিত্রটি তুলে ধরেছিল, তা ভয়াবহ, কাজেই বিনা তর্কে মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী কর্তারা একই রকম সহজবোধ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক উত্তর খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। ১৮৮২ সালে ভারত সরকার অর্থ কমিটির সদস্য মেজর এভ্‌লিন্ ব্যারিং এবং ডেভিড বারবার-এর তৈরি একটি হিসেব প্রকাশ করল। এতে জাতীয় আয় ও মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল, যথাক্রমে ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ২৭ টাকা। এরপর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন: ১৮৯৭-৯৮ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমান ছিল ৩০ টাকা। উইলিয়ম ডিগবি প্রচুর তথ্যের সাহায্যে এই দাবীর যাথার্থ সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে, কার্জনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন ফ্রেড জে. এ্যাটকিন্সন নামে ভারত সরকারের হিসাব-রক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯০২ সালে, রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত একটি নিবন্ধে তিনি ব্রিটিশ ভারতের গড় মাথা-পিছু আয়ের একটি হিসেবে উপস্থিত করলেন। এই হিসেব অনুসারে ১৮৭৫ সালে ভারতে মাথা-পিছু আয় ছিল ৩০ টাকা ৮ আনা, এবং ১৮৯৫ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৩৯ টাকা ৮ আনা।

ভারতীয় নেতারা প্রধানত অসহনীয় দারিদ্রের অস্তিত্ব প্রমান করতেই আগ্রহী ছিলেন। আইন অথবা সংখ্যাতত্ত্বের কুটকচালে তাঁদের ঔৎসুক্য ছিল না। সেজন্য দাদাভাই নৌরজীর হিসেবকে মোটামুটি নির্ভুল মনে করলেও, ব্যারিং-কার্জন-এর সরকারি হিসেবের ভিত্তিতে আলোচনা করতেও তাঁরা গড়রাজি ছিলেন না। সরকারি কর্তাদের তৈরি হিসেব পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার এবং তাতে মাথা-পিছু আয় অনেক বেশি দেখানোর সম্ভাবনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনকি ঐ হিসেব থেকেও প্রায় একইভাবে দারিদ্রের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

বাস্তবিকই, মাথা-পিছু আয়ের সব হিসেবই দারিদ্রের অবস্থাকে বেশ জোরালো-ভাবেই তুলে ধরেছিল। তবে "দারিদ্র' পরিভাষাটি সর্বদাই আপেক্ষিক ও তুলনাবাচক। সেজন্য জাতীয় আন্দোলনের মুখপাত্ররা ভেবেছিলেন যে দারিদ্রের

আরও নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে হলে ভারতীয়ের মাথা-পিছু আয়কে অন্যান্য দেশের আয়ের সঙ্গে তুলনা করে অথবা ন্যূনতম মানবিক চাহিদার পাশাপাশি রেখে দেখা দরকার, এবং তখনই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থা সত্যিই কতটা খারাপ তা প্রমাণ করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথমে আয়ের হিসেব করলেন। পরের ধাপেই প্রশ্ন উঠল—অন্যান্য দেশের মাথা-পিছু আয়ের তুলনায় ভারতের মাথা-পিছু আয়ের অবস্থা সত্যিই কী রকম? উত্তর যা পাওয়া যেত তা সব সময়ই প্রতিকূল। তুলনাটাকে সুবোধ্য পরিসংখ্যানের সাহায্যে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সারণীর মাধ্যমে—প্রকাশ করা হতে লাগল। আর তুলনা-মূলক সারণীর ব্যবহারের ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেল—যেমন, "তুরস্কের মতো কুশাসিত দেশেও মাথা-পিছু উৎপাদন ছিল ভারতের দ্বিগুন" কিংবা "ভারতের অবস্থা ছিল ইংলণ্ডের থেকে উনিশগুণ খারাপ" অথবা ভারতের দারিদ্রের সঙ্গে তুলনায় "চূড়ান্ত নিপীড়িত ও কু-শাসিত রাশিয়াও ছিল রীতিমতো সৌভাগ্যবান" ইত্যাদি। মোট কথা, ভারতবর্ষ যে "সভ্য দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশ", এই ধারণাটি এর ফলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বর্তমান পর্যালোচনার সময়কাল কিংবা পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয়দের মধ্যে দারিদ্র বিষয়ে যে মানসিকতা দেখা গেছে তার অসাধারণ শক্তি ও গভীরতার উৎস ঐটিই।[২২]

ভারতীয় নেতারা জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, দারিদ্রের সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে হলে গড় আয়কে বিচার করে দেখতে হবে গড় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে, কারণ তাতে যদি দেখা যায় যে, সাধারণ একজন ভারতবাসী যা আয় করে তা মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে ভারতের দারিদ্র সম্পর্কে বক্তব্য অকাট্য হয়ে উঠবে। এজন্যই জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান একসময় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তখন জীবনযাত্রার ব্যয় বা পুষ্টির মান সম্পর্কে তথ্য প্রায় ছিলই না। সেজন্য তাঁদের দেশান্তরী কুলী, সাধারণ কৃষি-শ্রমিক, দেশী সিপাই, চাষী, জেলখানায় বন্দী ইত্যাদিদের জীবন-ধারণের ন্যূনতম চাহিদা সম্পর্কে প্রাপ্ত হিসেবের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য যা প্রয়োজন, ভারতবাসীর মাথা-পিছু আয় ছিল তার থেকেও কম। অবস্থাটা সবচেয়ে ভালো বোঝা গেল একজন বন্দীর খাদ্য বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে ভারতবাসীর মাথা-পিছু আয় তুলনা করে। দাদাভাই নৌরজী ১৮৬৭-৬৮ সালের প্রাদেশিক প্রতিবেদন থেকে হিসেব করে বের করলেন, তখন একজন বন্দীর ভরণ-পোষণের জন্য সরকারী ব্যয় হ'ত মধ্য প্রদেশে (সেণ্ট্রাল প্রভিন্স) ৩১ টাকা, পাঞ্জাবে ২৭ টাকা ৩ আনা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২১ টাকা ১৩ আনা, বাংলায় ৩১ টাকা ১১ আনা, মাদ্রাজে

৫৩ টাকা ২ আনা, আর বোম্বাই-এ ৪৭ টাকা ৭ আনা। আরও কয়েকজন লেখক একই রকম হিসেব করেছিলেন। জেলখানার মাথা-পিছু ব্যয়ের পাশাপাশি সমগ্র দেশের মাথা পিছু আয়ের হিসেব থেকে একটি সত্য উৎঘাটিত হ'ল : "অনুকূল আবহাওয়াতেও, এদেশে মাথা-পিছু উৎপাদন অপরাধী বন্দীর শুধু খাদ্য ও পরিধেয়র জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা মেটানোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়, ছোটো-খাটো শখ-শৌখিনতা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন, আনন্দ বা বিষাদের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যয়, খারাপ আবহাওয়ার জন্য সঞ্চয় ইত্যাদির কথা তো ওঠেই না"২৩। এর থেকে জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বিপুল-সংখ্যক ভারতবাসী জীবন-ধারণের জন্য ন্যূনতম যা আবশ্যক তাও পায় না, তারা দিনের পর দিন অভুক্ত কাটাতে বাধ্য হয়।

দাদাভাই নৌরজী, জি. ভি. যোশী, জি সুব্রহ্মনীয় আয়ার কিংবা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো নেতারা ভালো করেই জানতেন যে 'গড়' শব্দটি একটি অর্থনৈতিক কল্পনা, এর আড়ালে অনেক পাপই গোপন করা যায়। জনসংখ্যার দরিদ্র অংশের বা নিম্ন শ্রেণীর মাথা-পিছু আয় কখনই গড় মাথা-পিছু আয়ের সমান হয় না। বিদেশী পুঁজিপতি, উচ্চ বেতনভুক বিদেশী সরকারী কর্মচারী, বড় বড় জমিদার, শহুরে বণিক, গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইত্যাদি সবার আয় নিয়েই গড় আয়ের হিসেব, যার ফলে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত আয় গড়ের থেকে সর্বদাই কম হতে বাধ্য। কাজেই এইসব মানুষকে নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যই গড় আয়ের হিসেব থেকে যতটা প্রতীয়মান তার থেকেও বেশি কঠিন সংগ্রাম করতে হয়।

জাতীয়তাবাদীদের মতে, নিয়মিত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ঘটনা জনসাধারণের চূড়ান্ত দারিদ্র ও খাদ্যাভাবের অস্তিত্ব তুলে ধরেছে এবং তার নিশ্চিত প্রমাণ। এঁরা লিখলেন—"দুর্ভিক্ষের ঘটনাও স্থায়ী দারিদ্রের অস্তিত্বের লক্ষণ"; দুর্ভিক্ষ "দেশের পুরোপুরি নিঃশেষিত অবস্থার" প্রমাণ; "এই দেশের অধিকাংশ মানুষের চরম নিঃস্ব অসহায়তার একটি বাড়তি প্রমাণ"; "অন্য সব তথ্য পরিসংখ্যান ইত্যাদির থেকে দুর্ভিক্ষ আরও বেশি চূড়ান্তভাবে এদেশে দারিদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে", "দারিদ্রের মূর্ত প্রকাশ ঘটে দুর্ভিক্ষে" ইত্যাদি।

নেতারা শুধু চরম দারিদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থিত করেই থামেননি, ইংরেজ শাসক ও লেখককুল এদেশের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছলতার যে দাবি উপস্থিত করত, যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করতেও চেষ্টা করেছেন। ভারতবাসীর অবস্থা রীতিমতো স্বচ্ছল, এটা প্রমাণ করার মতো কোনো একটি স্বীকৃত মানদণ্ড খুঁজে না পেয়ে ব্রিটিশ মুখপাত্ররা ইচ্ছেমতো মাপকাঠি ব্যবহার করতেন; তাঁরা বোঝাতে চাইলেন যে, ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট উন্নত। আয়ের স্বল্পতা প্রকৃতপক্ষে চাহিদার স্বল্পতার ফল, দারিদ্রের লক্ষণ

নয়।[২৫] অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে দারিদ্র বলে মনে হচ্ছিল, ভারতবাসীর চাহিদার স্বল্পতার প্রেক্ষিতে এঁরা তাকে বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। এঁদের যুক্তি ঃ যদি দেখা যায় কৃষকেরা পরিতুষ্ট, তাহলে মানতে হবে তারা স্বচ্ছল। ১৮৮০-৯১-এর বছরগুলির বৈষয়িক অবস্থা সংক্রান্ত বাংলার প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হল, "(কৃষকের)চাহিদা সামান্য, তারা অল্পেই তুষ্ট হয়—কাজেই এদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বাংলার কৃষক সমাজ সত্যিই সুখী ও উন্নত জীবন যাপন করে।" "একদল হিন্দু কৃষক কত কম খেয়ে অনেক অবস্থাপন্ন লোকের থেকেও বেশি প্রাণোচ্ছল, স্বাস্থ্যবান এবং সম্ভবত স্থূলকায়" তা আবিষ্কার করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার প্রতিবেদনের লেখক রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।[২৫] এর থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা ও দীর্ঘকাল স্থায়ী সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাবে ভারতীয় কৃষকেরা বৈষয়িক চাহিদার পরিতৃপ্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সন্তোষ লাভে অনেক বেশি আগ্রহী।[২৬] এই বিষয়ীগত ও অপেক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তদানীন্তন ও প্রাক্তন ইংরেজ কর্মচারীরা ইউরোপীয় দেশগুলির মাথা-পিছু আয়ের সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের মাথা-পিছু আয়ের তুলনার বিরোধিতা করতে লাগলেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত অনুগ্র, তাঁরা বললেন, চাহিদা ও মূল্যবোধ যেহেতু আলাদা এদেশের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে ইউরোপীয় জীবন-যাত্রার মানের তুলনার চেষ্টা অযৌক্তিক, ভারতের অবস্থা বিচার করতে হবে তার নিজস্ব প্রয়োজনের নিরিখে। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে কম সতর্ক যারা তারা এক ধাপ এগিয়ে দাবী করলেন, ইউরোপীয় কৃষকদের তুলনায় ভারতীয় কৃষকেরা নাকি রীতিমতো সৌভাগ্যবান। ১৮৯৪ সালে জন স্ট্র্যাচির বক্তব্য উদাহরণ। তাঁর মতে ঃ ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলের একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির তুলনায় একজন সাধারণ ভারতীয় কৃষকের কায়িক আরাম ও সুখ লক্ষ করলে "সন্দেহ থাকে না যে পাল্লাটা ভারতীয়দের পক্ষেই বেশি ভারী।"[২৭] একই কথা বলেছিলেন ১৮৮৭ সালে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মাদ্রাজ-এর প্রাক্তন গভর্নর গ্রান্ট ডাফ। অপেক্ষাকৃত নিম্নপদের কর্মচারীদের সংযম ছিল স্বভাবতই আরও কম। ১৮৮৮ সালে ঢাকার কমিশনারতো রীতিমতো চমকপ্রদ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে বিচার করলে পূর্ব বাংলার কৃষক নাকি বিশ্বে সবচেয়ে সমৃদ্ধ কৃষক। হুগলী জেলার কালেক্টার টেনাও কম যাননি ; তিনি লিখেছিলেন—"এই জেলার দরিদ্রতম শ্রেণীর অবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের ঐ শ্রেণীর অবস্থা তুলনা করলে নিঃসংকোচে বলতে হয় সব দিক থেকেই এদের অবস্থা উন্নততর। আমি নিঃসন্দেহ যে, জায়গা বদল করতে বললে, হাজার হাজার দরিদ্র ইংরেজ খুশীমনে তা করতে চাইবে।"

ভারতীয় নেতারা এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর বলে বর্ণনা

করেছেন। ভারতবাসীর চাহিদা খুব সামান্য, কিংবা চাওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের নেই, তারা বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত জীবন ও আরামের অযোগ্য—এই ধরণের সব বক্তব্যই তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা' জীবনযাত্রার বর্তমান নিম্নমানকে দেখিয়ে উন্নত জীবনলাভের অধিকারকে বাতিল করা যায় না। আসল কথা—

'ইংরেজরা ভারতবাসীর উপকরণ কেড়ে নিয়েছে, ভারতবাসীকে উৎপাদনে আরও অক্ষম করে তুলেছে, বাধ্য করেছে তাদের চাহিদাকে সংক্ষিপ্ত করে যা পাওয়া যায় তাতেই সীমিত রাখতে, এবং তারপর মুখ ফিরিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে বলছে ঃ "দেখ! তোমাদের অভাববোধ খুবই কম। একে কম রাখতেই হবে। তেমোদের দরিদ্র হয়ে থাকতে হবে। এই নাও তোমাদের খাদ্য দুমুঠো চাল (আমরা দয়া করে আরও দুমুঠো বেশি দিতে পারি) আর এই নাও তোমাদের সামান্য জামাকাপড় আর আচ্ছাদন। বিপুল মানবিক চাহিদা আমাদের জন্যে; যা কিছু আনন্দদায়ক, তা আমরা উপভোগ করব। তোমরা দাসত্ব করবে, উঞ্ছ-বৃত্তি করে খাবে, জন্তু-জানোয়ারের মতো, আমাদের পোষা ভারবাহী পশুর মতো।" (দাদাভাই নৌরজী ঃ বক্তৃতামালা)

ভারতীয় নেতারা যোগীসুলভ মানসিকতা কিংবা আধ্যাত্মিকতার নামে দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করার নিন্দা করেছেন। বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দকে তাঁরা উচ্চ-স্থান দিয়েছেন। তাঁরা চেয়েছেন ভারতের বৈষয়িক সম্পদ যতটা সম্ভব বাড়ুক। সেজন্য উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন মানুষের অভাবের নিবৃত্তি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাপ্তির পরিমানের সমানুপাতিক। তাই অর্থনৈতিক বিক্ষোভ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন; গুরুত্ব দিয়েছেন 'অ-সুখ' বা দুঃখ নয়, দারিদ্রের অপসারণের উপর। তাঁদের আশু লক্ষ্য ছিল সীমিত—ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের জন্য দুবেলা অন্নের সংস্থান। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান অভিযোগই ছিল ঃ ভারতবাসীর চাহিদা যৎসামান্য, তবুও তা মেটানোর কোনো চেষ্টা হয়নি।

৩. দারিদ্র কি বাড়ছিল?

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীন তদন্ত এবং বারবার বিশাল অঞ্চলব্যাপী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবের ফলে সমৃদ্ধির মিথ্যা কল্পনাকে টিকিয়ে রাখা যায়নি। অচিরে, দেশজোড়া দারিদ্র সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগ কম-বেশি সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু স্বদেশবাসীই নয়, বিদেশী শাসকেরাও দারিদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ১৮৮৮ সালের 'অর্থনৈতিক অনুসন্ধান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে (দ্য রেজোলিউশন অন দ্য ইকনমিক এনকোয়্যারী অব ১৮৪৪), কৃষির সঙ্গে যুক্ত নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের অবস্থা "বর্তমানে বিশেষ উদ্বেগজনক

নয়" দাবি করেও শেষে স্বীকার করা হয়েছিল, "তথ্য প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষ দিন আনে দিন খায়" এবং "এটা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে খুব সামান্য সংখ্যক কৃষক ও শ্রমিকেরই এতটা দীন দশা"।[১৮] ১৮৯৮ সালে 'লায়াল দুর্ভিক্ষ কমিশন' লক্ষ করেছিল, কৃষির সঙ্গে যুক্ত নিচুতলার মানুষেরা এতটাই বিভৎস দারিদ্রে বাস করে যে স্বাভাবিক বছরেও তাদের যথেষ্ট খাদ্য জোটে না। ভাইসরয় হিসেবে কার্যকালের শেষ দিকে লর্ড কার্জনও অকপটে স্বীকার করেছেন : ভারতবর্ষে "চরম কিংবা তার চেয়েও বেশি" দারিদ্র বর্তমান। মেজর ব্যারিং ও লর্ড কার্জনের প্রকাশিত মাথা-পিছু আয়ের সরকারি হিসাবও (অন্য বহু দিক থেকে সমালোচ্য হলেও) এই নিদারুণ দারিদ্রকে উল্লেখযোগ্যভাবেই তুলে ধরেছিল। এসবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের দারিদ্রের বিষয়টি শুধু যে সার্বিক স্বীকৃতিই পেল তা নয়, প্রায় প্রবচনে পরিণত হ'ল।

আর তার ফলে, ব্রিটিশ শাসক ও ভারতের উদীয়মান জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুটি পাল্টে গেল। আরও বেশি জরুরী একটি প্রশ্ন দেখা গেল। ভারতবর্ষের দারিদ্র কি দিনদিন বাড়ছে? নাকি কমছে? প্রশ্নটি (উভয় পক্ষই এইভাবেই প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছে) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কারণ এর উত্তরের উপর নির্ভর করছিল আর একটি জরুরী প্রশ্নের মীমাংসা—ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হওয়ার পর বৈষয়িক ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি ঘটেছে, না অবনতি ঘটেছে? দারিদ্রের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের থেকে এই প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকেরা একটু বেশি স্পর্শকাতর ছিল, কারণ ভারতবর্ষ ক্রমাগত দরিদ্রতর হচ্ছে, এই সত্যের স্বীকৃতির অর্থ ব্রিটিশ শাসনকে ধিক্কার দেওয়া। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটা মেনে নিলে গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও ছিল। সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিরা তা ভালো করেই বুঝেছিলেন, এবং সেজন্যই স্বরাষ্ট্রসচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন চ্যালেঞ্জটিকে গ্রহণ করে কমন্সসভায় (১৯০১ সালের ১৬ই আগস্ট) ঘোষণা করলেন—"যদি প্রমাণ করা যায় যে আমাদের শাসনাধীনে ভারতের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ মেনে নেব, আমরাই এর জন্য দায়ী, এবং এদেশের শাসনভার আর আমাদের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত নয়।" প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠার আর একটি কারণ অসুখ স্বীকার না করলে তার হেতু অনুসন্ধান বা নিরসনের উপায় অন্বেষণ, সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বছরের পর বছর ভারতীয় নেতারা এই বক্তব্যই রেখেছেন যে, ভারত যে শুধু দরিদ্র তাই নয়, প্রতিদিন দরিদ্রতর হচ্ছিল, অর্থাৎ সাধারণ ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্রকে তারা তুলে ধরতে চেয়েছেন। জি, কে, গোখেল-এর ১৯০২ সালের বিখ্যাত বাজেট বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তুই ছিল এটি। বিভিন্ন দিক থেকে দারিদ্রের

প্রশ্নটিকে বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন : ভারতের সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অবস্থার "নিয়ত অবনতি" ঘটছে, যা "বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাসের করুণতম" ঘটনা। ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে "অধিকাংশ ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র" সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই এই ধরণের একটি করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। "স্পষ্ট" ও "স্বীকৃত, সত্য", "প্রতিদিন বর্ধমান" এই দারিদ্র সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থিত করতে জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাও সরব হয়ে উঠেছিল।

ভারতে কর্মরত ইংরেজ রাজ কর্মচারী এবং ইংরেজ লেখকদের বেশির ভাগই মনে করেছেন, "ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বৈষয়িক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে। অতএব ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অলীক : বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষ উন্নয়নের রাজপথ ধরে অগ্রসরমান, সেজন্য ভবিষ্যৎ যথেষ্ট 'আশাব্যঞ্জক' ও 'প্রতিশ্রুতিপূর্ণ'।" এই মতের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন লর্ড কার্জন—প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯০১ সালে কার্জন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে ভারতে মাথাপিছু আয় ১৮৮২ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে বেড়ে ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা হয়েছিল। প্রগতির এই হারকে তিনিও খুব সন্তোষজনক মনে করতে পারেন নি। তথাপি, দাবি করেছেন, "পরিবর্তনের গতিমুখ স্পষ্টতই সামনের দিকে, পিছন দিকে নয়।" ১৯০৪ সালের মধ্যে কার্জনের এই প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়েছিল ; সেজন্য গোখেলের মত সমালোচকদের ব্যঙ্গ করতে সেই পাগলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন যে গন-গনে সূর্যালোকেও বৃষ্টি পড়ছে মনে করে ছাতা খোলে। কার্জন ঘোষণা করেছিলেন : "ভারতবর্ষে দারুন জীবনীশক্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।" ১৯০৫ সালে তিনি জানালেন, ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে যে বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে "তার তুলনীয় নজির এদেশের অতীত ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না, এমনকি অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও বিরল।"

এই বিতর্কে উভয়পক্ষ একই অর্থনৈতিক তথ্য ব্যবহার করেছেন, তবে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোন থেকে। বৈষয়িক উন্নতির সহায়ক কোনো কোনো উপাদানের বিষয়ে যখন ঐকমত্য দেখা গেছে, তখনও ভারতীয় নেতারা মনে করেছেন যে, জাতীয় উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক অন্যান্য উপাদানের অভাবের ফলে সম্ভাব্য সুফললাভ সম্ভব হয়নি।

ভারতীয় নেতারা দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুনিকতাকে দারিদ্রের সবচেয়ে বড় প্রমান বলে মনে করেছিলেন ; ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি কিংবা বিস্তৃতি ও মারনশীলতাকে তাঁরা ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের নিশ্চিত লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, ইংরেজদের কাছে এইসব দুর্ভিক্ষ ছিল প্রকৃতির খেয়াল, মানুষ চেষ্টা

করলেও যা প্রতিহত করতে পারে না। ভারতীয় নেতারা কৃষি-ঋণ বৃদ্ধি ও তার ফলস্বরূপ কৃষিজীবী শ্রেণীর হাত থেকে অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর হাতে জমি হস্তান্তরকেও ক্রমবর্ধমান অভাবের লক্ষণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু ইংরেজ লেখকরা কৃষিঋণের পরিমানকেকৃষকদের দারিদ্রের সূচক বলে মানতে রাজী হননি, বরং তারা এই মত প্রকাশ করেছেন যে ঋণ-গ্রস্থতা কারণ হিসেবে গ্রাহ্য হলেও, কখনই দারিদ্রের ফলশ্রুতি নয়।[২৯] জি.ভি. যোশী এবং গোখেল দুর্ভিক্ষ বা প্লেগ-জনিত নয় এমন মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কেননা তার থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কত বেশি সংখ্যায় মানুষ অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তবে, ভারতীয় নেতারা এইভাবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের নিশ্চিত প্রমান উপস্থিত করলেও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে ইংরেজরা যে দাবি করেছিলেন তা খণ্ডন করার উপর। এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট : দাবি যে করছে দাবির যাথার্থ্য প্রমান করার দায় তার।

ইংরেজ মুখপাত্ররা তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে শুরুতেই "মহান বিচারক' ইতিহাসের শরন নিত। তাদের প্রধান যুক্তিই ছিল এই যে—আপেক্ষিক হিসেবে বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থা তুলনা করে দেখতে হবে ; আর তাহলেই বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ শাসন একটি উজ্জ্বল পর্ব, কেননা ইংরেজরা আসার আগে ভারতবর্ষ ছিল চরমতম দারিদ্রে নিমজ্জিত।[৩০] সমস্যাটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখতে ভারতীয় নেতারা কখনই গররাজি ছিলেন না! বস্তুত, তাঁদের কেউ-কেউ স্বীকারও করেছেন যে এদেশে দারিদ্রের শিকড় ইতিহাসের গর্ভে নিহিত, তা "অতি প্রাচীন একটি উত্তরাধিকার", কিংবা "অতীতের ভারতবর্ষ কখনই সমৃদ্ধ ছিল না"[৩১]! তবে তাঁদের বেশির ভাগেরই মত ছিল এই যে, বর্তমান দুঃখ-দারিদ্রের তুলনা "অতীত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না," ইংরেজ শাসন "ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিশাপ" হয়ে দেখা দিয়েছে। এঁদের অনেকে আবার এও প্রমান করতে চেয়েছেন যে, আকবরের রাজত্বকালে কিংবা অন্য কয়েকজন ভারতীয় শাসকের শাসনকালে সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অনেক ভালো ছিল। জাতীয়বাদের মুখপাত্র কেউ-কেউ এমনকি অতীতকে মহিমান্বিতও করতে চেয়েছেন, এবং হৃত-গৌরবের জন্য সরবে বিলাপ করেছেন। তবে সরকারের দাবির সবচেয়ে ভালো জবাব দিয়েছিলেন আলফ্রেড নন্দী। তাঁর প্রশ্ন ছিল—"ইংরেজ বণিকেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, তখন এদেশের দারিদ্রের মোচনই কি তাদের লক্ষ্য ছিল, নাকি, তাদের নিজেদের ঐতিহাসিকদেরই স্বীকৃতি অনুসারে, তারা এসেছিলেন এদেশের সম্পদে লুব্ধ হয়ে ?"

ভারতবর্ষে 'বিপুল' পরিমাণে মূল্যবান ধাতু আমদানি এবং এদেশের মানুষের

হাতে তার অনিবার্য পুঞ্জীভবনকে ইংরেজ রাজকর্মচারী ও লেখকরা সম্পদ বৃদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের একজন ফ্রেড জে এ্যাটকিন্সন ১৯০২ সালে হিসেব করে দেখিয়েছিলেন ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে আমদানীকৃত সোনার মোট মূল্য ছিল ১৪,১৭,০৫,০০০ পাঃ এবং রূপার ৪৭৯,২৪০৩,০০০ পাঃ ; এর থেকে মুদ্রা তৈরির জন্য আবশ্যক পরিমাণ বাদ দিলে ভারতীয়দের হাতে সঞ্চিত সোনার মাথাপিছু গড় মূল্য দাঁড়াচ্ছিল ২৬ টাকা। এই যুক্তি ভারতীয় নেতাদের খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। গোটা উনবিংশ শতাব্দী মূল্যবান ধাতু আমদানি হয়েছে, তা স্বীকার করেও, তার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে অথবা সম্পদ বেড়েছে, এই দাবি তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন। এই যুক্তিতে যে, আমদানিকৃত রূপার বেশির ভাগটাই ব্যয় হ'ত মুদ্রার জন্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দাবি মেটাতে, সঞ্চয় কিংবা অলঙ্কার তৈরির জন্য নয়। জমির খাজনা নগদে দিতে হচ্ছিল, তার উপর ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্যের চাহিদা ছিল, সব মিলিয়ে প্রতিবছরই মুদ্রার প্রয়োজন বাড়ছিল, নীট আমদানি রূপার প্রায় সবটাই চলে যাচ্ছিল মুদ্রা তৈরি করে এই চাহিদা মেটাতে। ফলে, মুদ্রার এই দাবি মিটিয়ে, ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করে, মূল্যবান ধাতুর যেটুকু অবশিষ্ট থাকত, তা জনসাধারণ সমৃদ্ধশালী হয়েছে দাবি করার মত যথেষ্ট নয়। তার উপর আবার ঐ সামান্য পরিমাণও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভোগেই লেগেছে, দরিদ্র মানুষের হাতে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছোয়নি। দাদাভাই নৌরজী আমদানিকৃত সোনা ও রূপাকে জাতীয় সম্পদে নীট সংযোজন বলে মানেননি। কারণ, ঐ সোনা ও রূপা বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমদানি হয়নি। ঐসব মূল্যবান ধাতু আমদানির পরও বাণিজ্যে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত থেকেছে, যার অর্থ রপ্তানির মাধ্যমে আমদানির মূল্য পূর্বেই পরিশোধিত হয়েছে। ফলে, বাস্তবিকপক্ষে সোনা-রূপার মত মূল্যবান ধাতু আমদানির ফলে সম্পদ বৃদ্ধি দূরের কথা বরং মূল্যস্বরূপ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানি করতে বাধ্য হওয়ায় অভাব বৃদ্ধিই ঘটেছে।[৩২]

বেশ কয়েকবছর ধরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও মোট মূল্য উভয়ত বাড়ছিল। একে অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চিত লক্ষণ বলে মনে করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পুলকিত হয়েছে। দেশের সম্পদ বাড়লে তবেই তো বেশি দামের বিদেশী পণ্যের আমদানি বাড়ে। তাছাড়া, রপ্তানি বাড়ার আর এক অর্থ তো কৃষকের আয় বাড়া। কিন্তু ভারতীয় নেতাদের বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় নেতারা বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকে লাভজনক বলে মনে করেননি, বরং ক্ষতির উৎস হিসেবেই দেখেছিলেন। কারণ—প্রথমত, "বিদেশী শিল্পজাত পণ্যের আমদানির ফলে

দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ লাভ যা হয়েছে ক্ষতি হয়েছে তার থেকে বেশি। দ্বিতীয়ত, এর ফলে দেশীয় সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছে, যা কল্যাণের সূচক নয়। এবং তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভের অংশ ভোগ করেছে বিদেশীরা, আর কুফলটা জুটেছে ভারতীয়দের ভাগ্যে।

ইংরেজ প্রশাসকরা সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রসঙ্গও তুলেছিলেন। বাড়তি কর না চাপিয়েই এই আয় বেড়েছিল। তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন এই ভেবে যে, "সরকারি আয়ের মুখ্য উৎসগুলির স্থিতিস্থাপকতার জন্যই" এটা সম্ভব হয়েছে,—অর্থাৎ "ঐসব উৎস থেকে ক্রমাগত বেশি আদায় হয়েছে, যেটা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধির লক্ষণ।" বাণিজ্য শুল্ক, ডাক-তার, লবণ-কর, আয়-কর, স্ট্যাম্প কর, আবকারি শুল্ক ইত্যাদি এইরকম কয়েকটি উৎস। দাবি করা হ'ল, "সুখ ও সম্পদ বাড়লে" তবেই এই ধরণের উৎস থেকে আদায় বাড়ে। এ-বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি খুব ভালোভাবে উপস্থিত করেছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁর ১৯০২ ও ১৯০৩ সালের বাজেট বক্তৃতায়; সেজন্য সব জাতীয়তাবাদী নেতা তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। আয় বৃদ্ধি মানেই বৈষয়িক উন্নতি, ভারতীয় নেতারা তা মানতে রাজী হননি। অন্যদিকে, অত্যধিক হারের করের বোঝাকে তাঁরা দারিদ্রের একটি কারণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন। কোনো-কোনো উৎস থেকে সরকারি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে —ইংরেজ প্রশাসকদের এই বক্তব্যকেও তাঁরা সঠিক বলে মনে করেননি। উদাহরণ হিসেবে আবকারি শুল্কের উল্লেখ করা যায়ঃ জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করেছেন, আবকারি শুল্ক থেকে আয় বৃদ্ধির অর্থ মদ্যপান বৃদ্ধি—তা জাতীয় সৌভাগ্য তো নয়ই, বরং দুর্দশার পরিচায়ক এবং যে-কোনো সভ্য সরকারের কর্তব্য এর জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ না করে, নিন্দা করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় নেতারা বাণিজ্য-শুল্ক থেকে আয়-বৃদ্ধিকেও বাণিজ্য বিস্তারের লক্ষণ বলে মনে করেননি। শুধু দুটি করের উৎস থেকে আয়-বৃদ্ধিকে তাঁরা বৈষয়িক উন্নতির লক্ষণ বলে মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন—এর একটি আয়কর, অপরটি লবণ কর। কিন্তু এই দুটি উৎস থেকেই আয় বেড়েছিল যৎসামান্য। আয়কর থেকে আদায় বছরের পর বছর একই থেকে গিয়েছে; আর লবণকর থেকে যেটুকু বেড়েছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। জাতীয় নেতারা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাতে চাইলেন, এটি দুর্দশা বৃদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কেননা লবণ কর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে আয় না-বাড়ার অর্থ, আসলে এই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যটির জন্য মাথাপিছু ভোগব্যয় কমে গিয়েছিল।

ইংরেজ কর্তারা ভারতের আর্থিক উন্নতির আরেকটি প্রমাণ হিসেবে কর্ষিত জমির পরিমাণ ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন ; কেননা, এর ফলে একদিকে জমি থেকে আয় বেড়েছে, অন্যদিকে খাদ্যের যোগান বেড়েছে![৩৩] ভারতীয় নেতাদের এই যুক্তিও অগ্রাহ্য মনে হয়েছে। তাঁরা দেখালেন—জনসংখ্যা যে-হারে বেড়েছিল কর্ষিত জমির পরিমাণ কিংবা খাদ্যের যোগান সে-হারে বাড়েনি, বিশেষত পুরনো প্রদেশ-গুলিতে।[৩৪] তাছাড়া, বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমানের তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ছিল যৎসামান্য। এবং চাষের যেটুকু প্রসার ঘটেছিল তাও কৃষিপণ্য, রপ্তানি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তার উপর, এই প্রসারও ঘটেছিল প্রধানত জঙ্গল সাফ করে কিংবা গোচারণের জন্য রাখা জমি বা পতিত জমি উদ্ধার করে। কাজেই, উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, এই দাবি সমর্থন করা যায় না। বরং জাতীয় নেতারা অভিযোগ করলেন, দেশীয় শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে জমির উপর চাপ বেড়েছে বলে সমস্ত অর্থনৈতিক নিয়ম উপেক্ষা করে উৎপাদন বাড়াতে নিম্নমানের জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে, যারে ফলে, জমি অবক্ষয় ঘটেছে। আর সেইজন্যই দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ কৃষিমন্দা, এবং বারবার দুর্ভিক্ষ।

বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে প্রমাণ করতে সরকার একটি মজার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। সরকার যুক্তি দিল, এই দাম বাড়ার কারণ কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে বেশি পরিমাণে টাকাকড়ি এসেছে। অর্থাৎ বহু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে এবং তার ফলে খাদ্য পণ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়েছে। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদেরা এই তত্ত্বেরও সমালোচনা করেছেন। প্রথম দিকে, তাঁরা দেশজুড়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এটাই অস্বীকার করতেন; তাঁদের বক্তব্য ছিল—মূল্যবৃদ্ধি যা ঘটেছে সবই আংশিক, স্থানীয় ও অস্থায়ী। পরে সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে স্বীকার করলেও তা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন অন্যভাবে। এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সূচক নয়, বরং জাতীয় উৎপাদনহ্রাস ও কৃষির অবনতির ভয়ঙ্কর লক্ষণ। কেননা, মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, কিংবা ইউরোপীয় বাজারের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে। যে কারণেই হ'ক-না-কেন, এর ফলে প্রকৃত উৎপাদক একেবারেই লাভবান হয়নি, লাভের অংশ পুরোটাই হস্তগত করেছে মহাজন, ফ'রে, আর রপ্তানি বাণিজ্যে রত বণিক সম্প্রদায়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশ কৃষি-শ্রমিক বা অন্যান্য শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি, বরং কোথাও-কোথাও কমেছে ; ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ায় তাদের দুঃখ কষ্ট আরো বেড়েছে। একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে ছোট চাষীদেরও ; তারা বিক্রি করার মত অতিরিক্ত উৎপাদন করতে পারেনি, অথচ তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে কিনতে হচ্ছিল বেশি দাম দিয়ে।

অর্থনৈতিক উন্নতি সংক্রান্ত এই বিতর্কের সময় একটি ঘটনাকে উভয়পক্ষই স্বাগত জানিয়েছিল—সেটি, আধুনিক শিল্প ও পরিবহণের প্রবর্তন ও প্রসার। সাধারণভাবে উভয়পক্ষই একে উন্নতির লক্ষণ বলে স্বীকার করেছেন। তবে ভারতীয় নেতারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি। কেননা, দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আধুনিক যন্ত্র শিল্পের প্রসারের ফলে তা পূরণ হয়নি। দ্বিতীয়ত, এইসব শিল্পও আবার গড়ে উঠেছিল মূলত বিদেশী মূলধনের সাহায্যে, কাজেই এর সুফল থেকে ভারতবাসী অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছে। যে কারণে রেলপথ নির্মাণের মত ঘটনাও অবিমিশ্র আশির্বাদ হয়নি।

এই বিতর্কে ভারতীয় নেতারা একদিক থেকে টেক্কা দিয়েছেন। চরম দারিদ্র এবং আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি সম্পর্কে তাঁরা দৃঢ়-নিশ্চয় ছিলেন। ফলে, যে-কোনো-রকম প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করতে দ্বিধা করেননি। বস্তুত, এটা তাদের বিক্ষোভ অন্দোলনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। দাদাভাই নৌরজী তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি অবিচলভাবে এই দাবি জানিয়ে এসেছেন—প্রবন্ধে, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বক্তৃতায়, পূর্ব-ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সিলেকট কমিটিতে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে, ব্যয়নির্বাহী প্রশাসন সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনে (ওয়েলবি কমিশন) প্রদত্ত সাক্ষ্যে, এককথায় সর্বত্র। ১৯০০ সালে জাতীয় কংগ্রেস "জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ, স্বাধীন তদন্ত" দাবি করেছিল। পরের বছর (১৯০১ সালে), ইংলন্ডের "ইন্ডিয়ান ফ্যামিন ইউনিয়ন" কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয় গ্রামের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা করার প্রস্তাব দিলে, কংগ্রেস সমর্থন জানিয়েছিল। ভারতীয় নেতারা ১৮৮২ সালের "বাব্যার তদন্ত" ও "ডাফরিন তদন্তের" রিপোর্ট প্রকাশের জন্যও চাপ দিয়েছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা এই মর্মে অভিযোগ আনলেন যে এই সব রিপোর্ট প্রকাশ না-করে সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

৪. দারিদ্রের কারণ

ভারতের দারিদ্র বাড়ছিল, নাকি অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছিল--এবিষয়ে তর্ক-যুদ্ধটিকে উভয়পক্ষই চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েক বছর এই বিতর্ক ভারতীয় রাজনীতিকে সজীব করে রেখেছিল। শেষ-পর্যন্ত মাত্র দুটি অভিযোগ সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল—(১) ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান এত নিম্ন ছিল যে যার থেকে নিম্নতর হওয়া অসম্ভব; এবং (২) এদেশে বৈষয়িক উন্নতি বা অবনতি যাই ঘটে থাকুক-না-কেন, তা ঘটেছে খুবই শ্লথগতিতে, এবং এত সঙ্কীর্ণ সীমায় যে বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য নির্ণয় অসম্ভব।[২৫] অন্যভাবে

বললে, এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে তখন ভারতের বৈষয়িক অবস্থা ছিল অতি নিম্নমানের দারিদ্র্যের নিশ্চলতার লক্ষনাক্রান্ত।

ভারতীয় নেতাদের কাছে অর্থনীতিতে পরিবর্তনের গতিমুখ নির্ণয়ের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল, প্রধানত এই কারণে যে, তাতে দারিদ্র্যের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ। পরবর্তীকালে, দায়িত্ব-নিরূপনেও তা সহায়ক হয়েছে। এই সমীক্ষা যে সময়কালের তার বেশির ভাগ জুড়েই ভারতীয় নেতারা জোর দিয়েছেন এই চরম দারিদ্র নিরসনের উপায় উদ্ভাবনে, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে 'বিলাপে' ব্যস্ত থাকেননি। বিদেশী শাসককুল এবং ভারতীয় নেতারা, উভয়-পক্ষই এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলি কী তা জানতে পারলে তবেই প্রতিকারের উপায় প্রস্তাব করা যায়, বা তা গ্রহণ-করা যায়। সেজন্য উভয় পক্ষই চরম দারিদ্র্যের কারণগুলিকে খুঁজে বের করে সে-বিষয়ে আলোচনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ইংরেজ লেখক ও প্রশা-সকেরা বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, প্রায় অনিবার্যভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তার প্রত্যেকটিকে ভাসা-ভাসা, অযোগ্য এবং অ-সন্তোষ-জনক বলে বাতিল করে দিয়েছেন।

প্রায়ই দেখা গেছে, ইংরেজ প্রশাসকেরা দারিদ্র্যের দায়ভার চাপিয়েছেন "জন-সংখ্যার আয়তন ও তা বৃদ্ধির হারের" উপর। তার ফলেই নাকি ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ঘাটতি এবং, ফলত, দারিদ্র অনিবার্য হয়েছে। লর্ড ডাফরিন ১৮৮৮ সালে প্রদত্ত "সেন্ট এ্যান্ড্রুজ ডিনার" বক্তৃতায় এই বক্তব্যই রেখেছিলেন—"সর্বোপরি, কোন দেশ তার বিশাল-বিশাল জেলা ও অঞ্চলে সম্ভাব্য খাদ্য উৎ-পাদনকে ছাড়িয়ে গেছে এমন বিপুল সংখ্যক ও গুণিতক হারে বর্ধমান, উপছে-পড়া জনসংখ্যার জন্য বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ?"—মজার ব্যাপার হল, ১৮৯১ সালে ভাইসরয় পদে তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ল্যান্সডাউনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, তবে তা বৈষয়িক উন্নতির প্রমাণ হিসেবে।[৩৬] সে যাই হোক, ভারতীয় নেতারা পুরো বক্তব্যটাকেই অগ্রাহ্য করেছেন; ভারতের জনসংখ্যা খুব দ্রুতহারে বাড়ছিল, ভারতবর্ষে জনাধিক্য ঘটেছে, কিংবা জনসংখ্যা বা জনবৃদ্ধির হারই দারিদ্র্যের কারণ—এর কোনোটাই তাঁরা মানেননি। বরং তাঁরা মনে করে-ছিলেন, বাস্তবে ভারতে জনবৃদ্ধির হার এত কম যে "ম্যালথাস-পন্থী অর্থনীতি-বিদরা যেসব বাধা-নিষেধের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ভারতবাসী তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলিকে কার্যকর করেছে বলে আমরা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি।" তাছাড়া, দুঃস্থ জীবনযাত্রা সবসময়েই জনঘনত্বের ফল নয়। পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ দেশেই জনঘনত্ব ভারতের চেয়ে বেশি ছিল, তা সত্ত্বেও তারা ভারতের থেকে বেশি সম্পদশালী ছিল কী করে? আবার জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গতি নেই, এমন কথাও বলা যায় না। ইংল্যান্ডসহ পশ্চিম

ইউরোপের বেশির ভাগ দেশেই জনবৃদ্ধির হার ছিল ভারতের তুলনায় অনেক বেশি, তাসত্ত্বেও ঐসব দেশের বৈষয়িক সম্পদ কমেনি, বেড়েছে। ১৮৯০ সালে "ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি" সম্বন্ধে একটি অসামান্য প্রবন্ধে জি, ডি, যোশি ভারতের "জনাধিক্যের" স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন; প্রবন্ধটি সমকালীন অর্থনীতির বিশ্লেষণের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে এখনও গণ্য হওয়ার যোগ্য। যোশি শুরু করেছেন এই অঙ্গীকার থেকে যে "ম্যালথাস-পন্থী লেখকদের দাবিমত জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্বদাই অথবা অনিবার্যভাবে ক্ষতিকর নয়।" তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে, "কোনো দেশের উৎপাদনের বৈষয়িক উপাদান নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং বিজ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা বা শ্রমের সাহায্যে তা আর বাড়ানো অসম্ভব হলে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি খুবই ক্ষতিকারক, তখন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হয়।" তবে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে সে প্রশ্ন ওঠে না, কারণ "(ভারতের) বৈষয়িক সম্পদ এখনও মানুষের হাতের, কারিগরি দক্ষতার এবং বিজ্ঞানের স্পর্শ পাওয়ার জন্য অপেক্ষারত।" বস্তুত ভারতবর্ষের মত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি "ম্যালথাস-পন্থী অর্থনীতিবিদদের দাবিমত অভিশাপ" না হয়ে বরং সম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়ারই সম্ভাবনা। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মত দুই প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করে। ১৮০৬ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ হয়েছিল, তাসত্ত্বেও ঐ সময়ে জাতীয় আয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাঃ থেকে বেড়ে ১২ কোটি ৪৭ লক্ষ পাঃ-এর আকাশচুম্বী অঙ্কে পৌঁছেছে। ফ্রান্সেও ১৭৮০ থেকে ১৮৮২ সালের জনসংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু জাতীয় আয়ও বেড়েছিল ১৬ কোটি পাঃ থেকে ৯৬ কোটি পাঃ এ। এর থেকে স্পষ্ট যে, জনসংখ্যার ক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গাণিতিক হারে বৃদ্ধির ম্যালথাসীয় সূত্রটি কার্যকর হয়নি। তার কারণ—"জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ উৎপাদনক্ষম শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি, এরসঙ্গে শ্রম ও মূলধনকে আরো উৎপাদনশীল করার মত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরিত হলে, মোট উৎপাদনবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।" ভারতবর্ষেও অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া উচিত ছিল। এর থেকে যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে হয় সেটা স্পষ্ট: ভারতবর্ষের সমস্যার জন্য দায়ী "তথাকথিত জনাধিক্য ততটা নয়, যতটা দায়ী প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদন, যা স্বীকৃত।" নিচের উদ্ধৃতাংশে যোশি বিষয়টিকে আরও সহজবোধ্য ও বিশদ করে উপস্থিত করেছিলেন:

"উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে একটা স্বাভাবিক আনুপাতিক সম্পর্ক থাকে, যা প্রত্যেক জনসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার গড় মান নির্ধারণ করে দেয়। জনসংখ্যা

ও উৎপাদন দুইই স্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকলে আনুপাতিক সম্পর্কটি ঠিক থাকে, জীবনযাত্রার জাতীয় মান-এও কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। যখন জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে অথচ উৎপাদন বাড়ে স্বাভাবিক হারে, তখনই প্রকৃত জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বাড়ছে এই অবস্থায় যদি উৎপাদন কমতে থাকে, তখন যে সঙ্কট দেখা দেয় সেটি প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদনের সঙ্কট। পশ্চিমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে এই সম্পর্কের একটি মাত্র দিককে তুলে ধরে, সম্পর্কটিকে গুলিয়ে ফেলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সম্পর্ককে একত্রে 'জনাধিক্যের সমস্যা' বলে উপস্থিত করা হয়। আমরা আগেই দেখেছি, ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিকের থেকে বেশি নয়! বৈষয়িক সম্পদেরও অভাব নেই। তাসত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে এদেশে উৎপাদন প্রয়োজনানুপাতিক নয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে প্রকৃত সমস্যা সুনিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদরা যাকে 'জনাধিক্য' বলেন, তা নয়। সমস্যা কম উৎপাদনের ; তাঁরা এটা স্বীকার করতে চান না।"

যদি ধরে নেওয়া যায় যে জনসংখ্যা বাড়ছিল, তাহলেও তার ফলেই অনিবার্য-ভাবে দারিদ্র বেড়েছে এমন কথা বলা যায় না। কেননা, দ্রুত শিল্পায়ন ঘটিয়ে ঐ সমস্যার মোকাবিলা করা যেত ; এবং সেটাই উচিত ছিল। "এদেশের বর্তমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যসংস্থান নিঃসন্দেহে জরুরী ; তবে আমাদের মতে, আরও বেশি জরুরী ক্রমাগত বেশিসংখ্যক শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থান।"—প্রায় সমগ্র ভারতীয় নেতৃত্বই পরোক্ষে এই মত ব্যক্ত করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে সত্যিই জনাধিক্য ঘটেছিল, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাকে সামগ্রিক জনাধিক্যের ফল বলে মানতে রাজী হননি ; ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর অপরিকল্পিতভাবে এবং জোর করে দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফলেই এটা ঘটেছে। "এখন জনাধিক্যের কথা বলার অর্থ একজনের দুটো হাত কেটে দিয়ে তারপর সে 'হাত নাড়াতে পারছেনা', 'নিজের কাজ করতে পারছে না' ইত্যাদি বলে তাকে ব্যঙ্গ করার মত।" কাজেই এটা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয়েছে, জনাধিক্যের তত্ত্ব প্রচার প্রকৃত সমস্যা থেকে জনসাধারনের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া'র চেষ্টা, এবং তা "যন্ত্রণাদায়ক কাটা ঘায়ে নুন ছিটোনোর মত ।"

দারিদ্রের আর একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা ছিল ঃ ভারতবাসী অমিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ে অমনোযোগী। বিবাহ কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বেপরোয়া খরচ করার প্রবণতা তার প্রমান। ১৮৮৮ সালে 'অর্থনৈতিক অনুসন্ধান' সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই কথাই বলা হয়েছিল—"মিতব্যয়িতার অভাব এদেশের মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ·· সব প্রতিবেদনেই বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে অপব্যয়ের প্রচলিত রীতির প্রসঙ্গ দেখা যায়।" রায়তদের কথায়-কথায় আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতাকেও এরই আর এক লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও-কখনও

এ-মন্তব্যও করা হয়েছে যে, ভারতের কৃষক ও শ্রমিক দরিদ্র হতে বাধ্য, কারণ এরা উদ্যমহীন, মূর্খ ও অকর্মন্য।

ভারতীয় রায়ত অদূরদর্শী অথবা ভারতের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হ'ল অমিতব্যয়িতা, ভারতীয় নেতারা এই ধরনের অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, "বরং বিশ্বে কোথাও ভারতীয় কৃষকের থেকে বেশি মিতাচারী, সংযমী ও কৃপন কৃষক সমাজ" খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা যা খরচ করে তা সামান্য, তাও কদাচিৎ, তা কখনই দারিদ্রের কারণ হতে পারে না। তবে, ভারতের মানুষের কি কখনো-সখনো একটু আনন্দ বা দু-একটা উজ্জ্বল মুহূর্ত উপভোগ করার অধিকার একেবারেই নেই? তাদের কি দৈহিক, নৈতিক, মানসিক বা সামাজিক দিক থেকে জীবনকে ভোগ করার, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, অধিকার অথবা দায় কোনোটাই নেই? জন্তুর জীবনই কি তাদের জন্য একমাত্র বরাদ্দ? কোনো সামাজিক ব্যয় চলবে না? আর করলেই, তা হবে অমিতব্যয়িতা, মূর্খামি, বুদ্ধির অভাব ইত্যাদি কত কী?" (দাদাভাই নৌরজী, 'বক্তৃতামালা')।

সমস্যাটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে—স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে—দেখেছিলেন জি, ভি, যোশি। তাঁর মতে, ক্ষমতার বাইরে খরচের প্রবণতার ধারণাও জনাধিক্যের ধারণার মতই আপেক্ষিক। একদিক থেকে দেখলে তা যেমন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি বোঝায়, অন্যদিক থেকে দেখলে তেমনি বোঝায় প্রয়োজনের অনুপাতে আয় কম: "আমাদের আয় যদি এত কম হয় যে ব্যয়-সংকুলান অসম্ভব হচ্ছে, তাহলে সেজন্য দায়ী অমিতব্যয়িতার প্রবণতা নয়, দায়ী দেশীয় শিল্পের সেই অবস্থা যার জন্য আয় কম।" ভারতীয় নেতারা এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারতীয় কৃষকরা অন্যান্য দেশের কৃষকদের থেকে বেশি আমোদপ্রিয় কিংবা পরিশ্রমবিমুখ নয়, বাস্তবে ভারতীয় কৃষক সমাজ বিশ্বের সবচেয়ে কুশলী ও পরিশ্রমী শ্রেণীগুলিরই অন্যতম। তার মধ্যে যে অ-বিচক্ষণতা, অজ্ঞতা বা উদ্যমহীনতা দেখা যায় তা অসুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণ নয়, বরং ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলে ফরাসী কৃষকেরা স্বভাবে ও অভ্যাসে রূপান্তর ঘটানোর যে সুযোগ পেয়েছিল বলে জানা গেছে, ভারতীয় কৃষকশ্রেণী জীবনের উন্নতি ঘটানোর সেরকম সুযোগ বা উৎসাহ কখনই পায়নি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় নেতারা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের নিন্দা করতে কখনই কুণ্ঠিত হননি, এবং সংযম অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথাও বারবারই বলেছেন। তবে তাঁরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন, দারিদ্রের অজুহাত হিসেবে নয়, ভারতবর্ষের উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা-স্বরূপ মনে করে। রায়তের দারিদ্র বৃদ্ধিতে আদালতের অবদান প্রসঙ্গে তাঁরা ইংরেজ-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন, এবং এই ব্যবস্থার

পরিবর্তে হয় সালিশি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছেন নয়তো পুরনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

মহাজনরা মারাত্মক চড়া হারে সুদ নিয়ে গ্রামাঞ্চলের সর্বনাশ ঘটিয়েছে এবং সেটি দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ—ভারতীয় নেতারা এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁদের মতামত দশম পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হবে। সংক্ষেপে বললে, তাঁরা রায়তের দারিদ্রের জন্য মহাজনকে গৌণভাবে দায়ী করেছেন প্রধান কারণ বলে মনে করেননি। রায়তরা দরিদ্র বলেই তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। কাজেই মহাজন দারিদ্রের ফলশ্রুতি, কারণ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ বারবার বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ায় বিশ্ববিবেক নাড়া খেয়েছিল। এই সময়েই দারিদ্রের সমস্যা ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। ফলত, দারিদ্রের কারণ ও দুর্ভিক্ষের উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দুর্ভিক্ষকেই দুঃখ-দারিদ্র ও বৈষয়িক ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী করতে লাগলেন; জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবি করলেন, আসলে দারিদ্রই বারবার দুর্ভিক্ষের ঘটনা কিংবা তার তীব্রতা ও বিধ্বংসী চরিত্রের জন্য দায়ী। স্বভাবতই কী কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে?—এই প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠল। লর্ড কার্জন ১৯০০ সালে এর একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ভঙ্গীতে।' তাঁর মতে, কম বৃষ্টিপাত আর তার ফলে শস্যহানিই ছিল বারবার দুর্ভিক্ষের কারণ। কার্জনের ভাষায় "ভারতের ভয়ানক খরা পরিস্থিতি" ও তার ফলস্বরূপ কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতির কথা মনে রাখলে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, কোনো সরকারের পক্ষেই আকাশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কিংবা "এই পরিমাণে বিপুল ও বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণতি কী হতে পারে তা অনুমান করে" প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব। ভারতের দুর্ভিক্ষ যে একান্তই ঈশ্বরের অভিলাষ, যাকে প্রতিরোধ করা বা ভিন্নপথে পরিচালিত করার ক্ষমতা মানুষের নেই, সে-বিষয়ে ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল ১৯০২ সালের মধ্যেই নিঃসংশয় হয়ে গিয়েছিলেন। কার্জন মন্তব্য করেছিলেন:

"যে দেশের আবহাওয়া এখানকার মতন, যে দেশের জনসংখ্যা এই হারে বাড়ছে, সেখানে সরকারকে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে বলা মানে জগৎ-সংসার নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটি ঈশ্বরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে বলা।……গত শরতে নিতান্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহে মনসুন আবার দেখা দিল…আর সেজন্যই বর্তমান শীতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে একে মুহূর্তের জন্যও ত্বরান্বিত করা কিংবা অতি নিকৃষ্ট ব্যবস্থার পক্ষেও একে রোধ করা অসম্ভব।"

অর্থাৎ, ভারতবর্ষ চিরকালই দুর্ভিক্ষ অধ্যুষিত ছিল, সুদূর ভবিষ্যতেও তাই থাকবে, এই দেশে একটি মানবদরদী সরকারের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা হ'ল, দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ও ব্যাপকতা কিছুটা কমানো।

অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদীরা এই অভিমত পোষণ করতেন যে, দুর্ভিক্ষের কারণ প্রকৃতির খেয়ালখুশি নয়, কারণ মানুষের ব্যর্থতা, তাই তা প্রতিরোধ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ভিক্ষের আশু কারণ যে বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা, এটা জাতীয়তাবাদী নেতারা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁদের মতে, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কেননা সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তাছাড়া, দেশের কোনো একটি অঞ্চলে ফসল না-হলে, দ্রুত যানবাহনের যুগে, দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ হবে কেন? সর্বত্র একই সঙ্গে ফসল না-হওয়ার পরিস্থিতি প্রায় কখনই হয়নি। মোট জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় মোট খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে, এরকমও কোনো বছরেই ঘটতে দেখা যায় নি। বহু ইউরোপীয় দেশও খরার কবলে পড়েছে. কিন্তু “প্রত্যেকবারই তারা (দুর্ভিক্ষের) করালগ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।” স্বাভাবিক সময়েও ইংলণ্ডে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন হয় শতকরা ৫০ ভাগ, তা সত্ত্বেও ইংলণ্ডকে কখনই অনাহারে থাকতে হয়নি। ভারতবর্ষেও, সবকিছু যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে খাদ্যদ্রব্য বাইরে থেকে আমদানি করা যেত, কিংবা অন্তত দেশের মধ্যেই উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু এর কোনোটাই করা যায়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কারণ, খাদ্যদ্রব্যের যোগান সত্ত্বেও, ক্রয়ের ক্ষমতার অভাব, ফসলের ব্যর্থতা নয়। অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষ টাকার, খাদ্য-পণ্যের না। যদি দেখা যায় এক বছর ঠিকমত বর্ষা না হলে তার পরিণাম সহ্য করার মত ক্ষমতা ভারতের মানুষের নেই, তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই ভারতবাসীর দারিদ্রের প্রমাণ।

জাতীয়তাবাদীদের মতে, ভারতে দুর্ভিক্ষের মূল ও স্পষ্ট কারণ নিহিত ছিল এই দারিদ্রের মধ্যেই, যে দারিদ্র সমগ্র দেশটিকে গ্রাস করেছিল। “ক্রমহ্রাসমান প্রতিরোধ ক্ষমতা” এবং (প্রতিকূল অবস্থায়) টিকে থাকার অক্ষমতা দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতার সীমা—অর্থাৎ এক বছর ফসল ব্যর্থ হলে কী পরিমাণে পাইকারিভাবে অনাহার দেখা যাবে, তা—নির্ধারণ করেছে। ফসলের ব্যর্থতা দারিদ্র ঘটায় নি, দারিদ্রই পণ্যের অভাবকে দুর্ভিক্ষের রূপ দিয়েছে। অন্যভাবে বললে, ফসলের ব্যর্থতা শুধুমাত্র ভারতের দারিদ্রকে স্পষ্টই করে তুলে ধরেছে।

জাতীয়তাবাদী নেতারা এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, এদেশের দারিদ্রের জন্য কোনোভাবেই প্রকৃতিকে দায়ী করা যায় না। ভারতবর্ষ প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ: “এখানে প্রভূত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যা অনন্য যদি নাও

হয়, অন্তত অফুরাণ ও অতুলনীয়"। এবং দেশটি "ঈশ্বরের আশির্বাদে, বৈষয়িক অগ্রগতির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল সুযোগ-সম্পন্ন।" তাঁদের মতে, সেই কারণেই সমস্যাটি আরও মর্মস্পর্শী—ভারতবর্ষ "যদি সত্যিই সমৃদ্ধ দেশ, তবে সে দেশের মানুষ আজ দারিদ্রে নিমজ্জিত কেন?"

জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ শাসকদের দেওয়া ব্যাখ্যাকে একদেশদর্শী এবং ভাসা-ভাসা বলে বাতিল করে দিয়ে ভারতের দারিদ্রের প্রকৃত কারণ কী তা খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, এই দারিদ্র সহজাত বা অবশ্যম্ভাবী নয়, তা মানুষের তৈরি, কাজেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়, এবং তা অবসানযোগ্য। তাঁদের মতে, কয়েকটি অর্থ-নৈতিক কারণের ফলেই ভারববর্ষ দরিদ্র হয়ে পড়েছিল, এবং সেই কারণগুলিকে আবিস্কার ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে, নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব।[৩৭]

সমস্যাটিকে দেখবার ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন দারিদ্রের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয় অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক খেয়ালকে দায়ী করেছেন—যার হাত থেকে, অন্তত স্বল্পসময়ে, পরিত্রাণ নেই; কিংবা দায়ী করেছেন ভারতের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে, যার থেকে মুক্তি (যদি বা সম্ভব হয়) ভারতবাসীর নিজ উদ্যোগেই কেবল সম্ভব।—দুটোর কোনোটার ক্ষেত্রেই দারিদ্রের অবস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করা যায় না বা দারিদ্র দূর করার দায়িত্বও সরকারের উপর ন্যস্ত হয় না। অন্যদিকে, ভারতীয় নেতারা দারিদ্রের উৎস হিসেবে এমন সব কারণ ও শক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন যেগুলি, তাঁদের মতে, ইংরেজ শাসনকালে শাসকদের ভুল-ত্রুটি কিংবা কাজকর্মের ফলে দানা বেঁধেছে বা বাধামুক্ত হয়েছে অথবা যেগুলিকে সচেতন ভাবে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। এঁরা দাবি করেছেন, মুখ্যত প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েই এগুলিকে রোধ করা সম্ভব ছিল।[৩৮] লক্ষণীয় যে, এই বিতর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ইতিহাসের একটি পরিহাস: বৈজ্ঞানিক দিক থেকে উন্নত প্রতীচ্য প্রকৃতির রাজত্বের অনিবার্যতার নিয়তিবাদী ধ্যান ধারণার আশ্রয় নিয়েছিল, আর পশ্চাদপদ প্রাচ্য জোর দিয়েছিল মানুষের প্রকৃতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করার ক্ষমতার উপর।

ভারতের সাধারণ মানুষের দারিদ্রের কারণ এবং পরে সমাধান খুঁজতে গিয়ে ভারতীয় নেতারা নানা ধরনের অর্থনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেইগুলিকেই তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আন্দোলন করেছেন। এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁদের অর্থনৈতিক মতামত ও কর্মসূচী। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতিকেও তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। দারিদ্র দূর করা এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়নের জন্য যে সংগ্রাম পরি-

চালিত হয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে রূপ নিয়েছিল তাঁদের রাজনৈতিক বোধ। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এই বিবর্তন প্রক্রিয়াটিকে আমরা বিচার করে দেখব। সব সময়েই যেটা মনে রাখতে হবে তা হ'ল, দারিদ্র্যের সমস্যাই পরবর্তীকালের সব অর্থনৈতিক অনুসন্ধান, বিতর্ক ও প্রচারের পটভূমি রচনা করেছিল।

টীকা

১। প্রায়শই যে সব সুফলের উল্লেখ করা হত সেগুলি হ'ল: শান্ত, আইন-শৃঙ্খলা, পশ্চিমী শিক্ষা, কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ঐক্য ও তার ফলস্বরূপ জাতীয়ভাবের প্রসার, রেল, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল প্রভৃতি। দাদাভাই নৌরজীর প্রবন্ধাবলী, বক্তৃতা এবং অন্যান্য লেখায়, বিভিন্ন কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতায়, জি ভি. যোশি, মুধোলকর, আলফ্রেড নন্দী, সি ওয়াই. চিন্তামনি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখের লেখায় ইংরেজ শাসনের সুফলের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

২। ১৮৭৩-৭৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মুখার্জী'স্ ম্যাগাজিন'-এ "ভারতের শিল্পবাণিজ্যের সমর্থনে একটি বক্তব্য" নামে লেখকের পরিচয়হীন অপেক্ষাকৃত অপঠিত একটি প্রবন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র বিষয়টিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন—"এতদিন শাসকেরা যা বলেছে ভারতবাসী তাই মেনে নিয়েছে, বিচার না করে, খুঁটিয়ে না দেখেই। তার কারণ—প্রথমত, তারা বিদেশী প্রভুদের চাকচিক্যে মোহিত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃতই কোনপথে হতে পারে, সে বিষয়ে তারা কিছু জানত না। তারা শাসকদের সব কথা যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছে তা দেখে মনে হয় যেন ঐসব বাণী ছিল বাণিজ্যিক বেদমন্ত্র। কিন্তু এখন প্রতিদিনই মানসিক কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। ···যত খতিয়ে দেখছে তত বেশি করে চরম নিঃস্ব অবস্থার দিকে অগ্রগতি সম্পর্কে সেনিশ্চয় হচ্ছে।"

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই পরিবর্তনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত বালগঙ্গাধর তিলকের একটি লেখায়। তিলক লিখেছেন: "প্রথম প্রথম ব্রিটিশদের নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে সাধারণ মানুষ চমকিত হয়েছিল। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি তাদের মুগ্ধ করেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শান্তিতে বসবাস সম্ভব হচ্ছিল···কথায় কথায় লোকে বলত—এখন বেনারস থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত লাঠির ডগায় সোনা ঝুলিয়ে যে কোন অন্ধ লোকও নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু মদের প্রভাব যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এই মোহও সেরকম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অন্ধ লোক লাঠির মাথায় সোনা ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে কিনা সে প্রশ্ন এখন নিরর্থক, কেননা সোনা কোথায়? এখন প্রতিদিনই মানুষ বুঝতে পারছে যে আসলে সোনাই ক্রমাগত দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে।" (জি. পি. প্রধান ও এ কে ভাগবত-এর "লোকমান্য তিলক" বই-এ উদ্ধৃত—বোম্বাই, ১৯৫৮, পৃঃ ৪১)

৩। উইলিয়ম ডিগবি ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্রস্পরাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' বই-এ এরকম ১৮টি দুর্ভিক্ষের কথা বলেছেন, যার মধ্যে ১৮৭৬ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের "সবচেয়ে ভয়ানক চারটি দুর্ভিক্ষ" উল্লেখযোগ্য। প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই ডিগবির বইটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছিল।

৪। ১৮৭৬ সালে লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার অধিবেশনে পঠিত নৌরোজীর 'দারিদ্র্য' সম্পর্কে প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই মন্তব্য: "মর্গ নোটস্-

গুলি ১৮৭৩ সালে ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটিতে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু কমিটির প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রকাশিত হয় নি। তার কারণ, আমার ধারণা এগুলিতে প্রকাশিত মতামত কমিটির চেয়ারম্যানের (মিঃ আর্টন) এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত দপ্তরের সহ-সচিব স্যর গ্রাণ্ট ডাফের পছন্দ ছিল না।"

৫। জি. ভি. যোশী নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান অর্থনীতিবিদদের অন্যতম। দুর্ভাগ্যবশত, সরকারী চাকুরে হওয়ার ফলে (সরকারী বিদ্যালয়ের প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক) কখনও পাদপ্রদীপের সামনে আসতে প্যারেন নি। গোপালকৃষ্ণ গোখেল যোশীকে অন্যতম গুরু বলে মান্য করতেন। তাঁর দ্বিতীয় গুরু ছিলেন বিচারপতি রানাডে। যোশী, গোখেল-এর বক্তৃতা প্রস্তুত করতে সাহায্য করতেন। গোখেল সে ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। ১৯০২ সালের ১০ই এপ্রিল যোশীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর প্রথম বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোখেল জানিয়েছিলেন—"বক্তৃতাটি আমার যতটা তার থেকে বেশি আপনার—আমার মনে হচ্ছে, এর সব কৃতিত্ব অপহরণ করে একে আমার বলে চালিয়ে দিলে তা শঠতা হবে।"

৬। এই সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়েছিল—"আমরা নতুন ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় কোন প্রশ্নকেই উপেক্ষা করতে চাই না। তথাপি আমাদের আন্দোলনের বিষয় হিসেবে বর্তমানে অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সমস্যাকে বেছে নিয়েছি।" স্পষ্টতই সব চরমপন্থী নেতাই যে বিমূর্ত জাতীয়তাবাদের পূজারী ছিলেন, তা নয়।

৭। এই দৃষ্টিভঙ্গীর র‍্যাডিক্যাল দিকটি ১৮৯৪ সালের ৭ই নভেম্বরের লেখাতে স্পষ্ট—"বেঁচে থাক্যর জন্য প্রয়োজনীয় রসদ থেকে বঞ্চিত একটি জাতি কখনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—বিশ্বস্তও হয় না।"

৮। ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে দাদাভাই নৌরজী বলেছিলেন, "দেশ যদি এইভাবে ক্রমাগত নিঃস্ব হতে থাকে তাহলে ব্রিটিশ শাসনের সব সুফল, ব্রিটিশ শাসনের সব ভালো কাজই, মূল্যহীন হয়ে পড়বে।" সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৯০২ সালের ৯ই মার্চ লেখা হয়েছিল—"একটি নিঃস্ব অনাহারক্লিষ্ট দেশের কাছে ভালো প্রশাসন ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রতিদিন দুমুঠো ভাত বেশী মূল্যবান নয় কি? আইন শৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে ভালো, তবে রুটি আরো ভালো।"

৯। এই ক্রোধ ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। মতপার্থক্যটি আজও ঐতিহাসিকদের বিভক্ত করে রেখেছে।

১০। ১৮৮৬-র কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিবেদনের ভূমিকাতে আছেঃ "সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত দারিদ্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রতিনিধিই সংশয় প্রকাশ করেননি, প্রশ্ন উত্থাপন করেননি, বরং প্রতিটি প্রদেশের প্রতিনিধি একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের নিচু তলার মানুষের দুঃস্থ জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন।"

১১। উদাহরণঃ দ্বাদশ কংগ্রেসে সভাপতি আর, এম, সয়ানি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন—"ভারতবাসী দরিদ্র জাতি, দিন আনে দিন খায়, বহু লোক না খেয়ে থাকে, অনেকের একবেলার বেশী জোটে না।" ১৮৯৭ সালে সভাপতি সি, শঙ্করণ নায়ার দুঃখ করে বলেছিলেনঃ "দেশের দারিদ্র নানা রূপে ও আকৃতিতে প্রকট।" ১৯০১ সালে সভাপতি ডি. ই. ওয়াচা দারিদ্রের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "দারিদ্রই আজ ভারতবর্ষের স্বাভাবিক অবস্থা।"

১২। উদাহরণঃ বাংলার কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী "তার দুর্দশার কাহিনী—অনশন-ক্লিষ্ট সন্তান, শীর্ণ গরু-মোষ আর রিক্ত ক্ষেতের" উল্লেখ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, "এদের দারিদ্র আর দুর্দশার কথা প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই।" ১৮৯০ সালে তিনি "ভারতবর্ষের অসংখ্য সাধারণ মানুষের দারিদ্র ও দুর্দশা-

পীড়িত অবস্থার" প্রতি ইংরেজ শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঐ বছরই বিচারপতি রানাডে লিখেছিলেন—"এখানে দারিদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা" এবং "এই দারিদ্র অবিশ্বাস্য।...রাস্তা দিয়ে শুধু হেঁটে গেলে, কিংবা আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে পর্যালোচনা করলেও, আমাদের জাতীয় সম্পদ যে নিঃশেষিত তা স্বীকার না করে উপায় নেই।"

১৩। গোখেল বক্তৃতাবলী, পৃঃ ১৬। ১৮৭৩ সালেই ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছিলেন: "বেশির ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান-এর উন্নতি যেখানে হয়নি, সেখানে দেশ বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত হয়েছে এমন দাবি নিছক অতিকথা (মিথ্যা), হাস্যকর অলীক কল্পনা।" ১৮৮১ সালে বালগঙ্গাধর তিলকও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "কোনো দেশকেই অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হয়েছে বলা যায় না যতক্ষণ না সেই দেশের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।"

১৪। এই বক্তব্য স্পষ্ট করে উপস্থিত করেছিলেন "যুক্তপ্রদেশ" কংগ্রেসের নেতা এ. নন্দী, ১৮৯৮ সালে, "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স" এ প্রকাশিত তার 'ভারতের দারিদ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে: "বর্তমান ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে কৃষিজীবীদের দেশ কৃষকদের অবস্থাই যদি শোচনীয় থেকে গেল, তাহলে অন্য কোথাও উন্নতি হল কি না-হল তাতে কী যায় আসে।" এ্যাডাম স্মিথ-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছিলেন, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্থ রয়ে গেলে কোনো সমাজকেই উন্নত বা সুখী বলা যায় না।"

১৫। যেমন—যোশী মানতে রাজী হননি যে, "পশ্চিমের কিছু দেশের মতো ভারতবর্ষেও দারিদ্রের কারণ সম্পদের অসম বণ্টন।" তাঁর মতে—"আমাদের সমস্যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বা কোন কোন সমাজতান্ত্রিক প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের সমস্যা নয়। এদেশে দারিদ্র যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ, তা নয়...এখানে সম্পদ বণ্টনে এমন কোন বৈষম্য নেই যা সংশোধন করা দরকার; শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সম্পর্কের মধ্যে এমন কোন ফাটল নেই যা ভরাট করতে হবে। আমাদের 'শ্রমিকের দাবি' তুলে ধরার প্রশ্ন নেই, 'মূলধনের কর্তব্য' আদায় করার দায় নেই, কিংবা 'সম্পত্তির অধিকার' সমর্থন করার স্বার্থ নেই।" (যোশী পৃঃ ৮১৯)।

১৬। যোশী লিখেছেন (পৃঃ ৮১৯): "আমাদের অবস্থা একটু বিশেষ ধরনের। এখানে পুরো একটি জাতি অপর একটি জাতির সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত। এখানে এলিজাবেথ-এর 'দারিদ্র আইনের' প্রয়োজন নেই, কিংবা প্রয়োজন নেই ফরাসী দেশের অস্থায়ী সরকার প্রবর্তিত Ateliers nationaux-এর...এখানে প্রয়োজন যৌথভাবে প্রয়োগযোগ্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী..।

১৭। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। যোশী লিখেছিলেন, "হাতের সংখ্যা যত বাড়ছে, কাজ তত কমছে, পেটের সংখ্যা যত বাড়ছে, খাদ্য তত কমছে—সংক্ষেপে এই হল আমাদের শিল্পের অবস্থা।" (পৃঃ ৮০৪)

১৮। ১৮৮৮র "রেজোলিউশন অব গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার" সংযোজনী 'A'তে আছে—হিসাব করে দেখা গিয়েছে মাদ্রাজে "মাসে ৬ টাকা মজুরি হলে একটি পুরো পরিবারের দিনে তিনবার ভাত ও রুটি (জোয়ার বা ভুট্টার), তাড়ি এবং মদ (উপকূলবর্তী অঞ্চলে) এবং সপ্তাহে এক দিন বা দুদিন মাংস খেয়ে দিব্যি চলে যায়।" এই রেজোলিউশনে বোম্বাই-এ খাদ্যাভাবের অভিযোগও অস্বীকার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে খাদ্যাভাবের যে অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছিল তার উল্লেখ করে প্রাদেশিক সরকার মন্তব্য করেছিলেন "দাক্ষিণাত্যের কোথাও ব্যাপক দারিদ্রের লক্ষণ নেই।" অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার লিখেছিলেন—"ব্যাপক দারিদ্র নিঃসন্দেহে আছে, তবে অবস্থা ততটা খারাপ নয়,—সাধারণ মানুষ মোটামুটি ভালোই খেতে পায়।"

১৯। উদাহরণ : ভারতসরকারের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার জন স্ট্র্যাচি তার 'ইণ্ডিয়া' নামে বই-এ (লণ্ডন, ১৮৯৪) লিখেছিলেন—"সব প্রজাই এখন ব্রাহ্মণের মতো কিংবা পুরনো কালের জমিদারদের মতো পোশাক-আশাক পড়ে। ..এদের স্ত্রীদেরও অনেকেরই ছুটির দিনের জন্য আলাদা পোশাক, রুপোর অলঙ্কার ইত্যাদি আছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের সংস্থান করেও এদের হাতে কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকছে যা দিয়ে বিলাস-দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি কেনা যায়।" (পৃঃ ৩০৩)

২০। যাঁরা দাদাভাই ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাঁরা 'পভার্টি এণ্ড আন—ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' বই-এর ৪—২৫ এবং ১৪৭—৭৩ পৃঃ দেখবেন। সংক্ষেপে পদ্ধতিটি এই রকম : প্রথমে বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্য হিসেব করে তার সঙ্গে ঐ বছর খনি, শিল্প, মৎস চাষ, বৈদেশিক বাণিজ্যের যৎসামান্য আয় ইত্যাদি থেকে সম্ভাব্য আনুমানিক আয় যোগ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দাদাভাই সেবা কার্যাদির মূল্য ধরেন নি, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, সেবাকার্যাদি থেকে যে আয় হয় তা আসলে প্রকৃত আয় নয়, হস্তান্তরিত আয়।

জাতীয় আয়ের হিসেব করতে গিয়ে দাদাভাই যে দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন তার তাত্ত্বিক মূল্য বিচার না করেও বলা যায় যে, পশ্চাদপদ দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব করতে হলে জাতীয় আয়কে মোট বস্তুগত জাতীয় উৎপাদনের সমান করে দেখাই সুবিধাজনক, কারণ, এই সব দেশে ছদ্ম-বেকারী ব্যাপক। দ্বিতীয়ত, 'সেবাকর্মের' সঙ্গে যুক্ত শ্রেণীর প্রধান অংশেরই চরিত্র সামাজিক পরগাছার। তাছাড়া, পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগের প্রায় শুরু থেকেই এই সব দেশে কতকগুলি কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল—যেমন, অর্থের ব্যবহার বৃদ্ধি অথবা পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি। কাজেই প্রকৃত বস্তুগত উৎপাদনের হিসেবকে ভিত্তি করলে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের লক্ষ্য-পূরণ সহজ হয়।

২১। দাদাভাই-এর এই হিসেবের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ২০ টাকা মাথাপিছু আয়ের যে হিসেব করেছিলেন পরবর্তীকালের সব গবেষণাতেই সেটি সমর্থিত হয়েছে ;—এটা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

২২। অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদের অভিমত, জাতীয় আয়ের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা খুব একটা মূল্যবান হয় না,—কেননা বিভিন্ন দেশের পণ্যমূল্যস্তরে পার্থক্য থাকে ; তাছাড়া, পরিসংখ্যানগত সমস্যাও আছে (ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট পৃঃ ৫২৩)। তাসত্ত্বেও পদ্ধতিটি বহুল-প্রচলিত, এটিকে কাজে লাগানোর মত সূত্র উদ্ভাবন সহজেই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে কলিন ক্লার্ক এর কণ্ডিশনস 'অব ইকনমিক প্রগ্রেস' পৃঃ ৫২৮ দ্রঃ।

২৩। ১৮৮৮ সালের "ডাফরিন ইনকোয়ারি এণ্ড রেজোলিউশন"—এ এই সমস্যার একটি বিশেষ দিক আলোকিত হয়েছিল। মাদ্রাজ-প্রদেশের নেলোর জেলার সিভিল সার্জেন তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন : "কিছুদিন জেলে থাকার পর বন্দীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, ওজন বেড়ে যাচ্ছে।" মাদ্রাজের 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর মতে, এর কারণ জেলে ভালো খাদ্য পাওয়া যায়, অথচ কাজ কম। তাছাড়া, জেলে যাবার পর বন্দীদের মামলা নিয়ে আর উদ্বেগে কাটাতে হয় না। সরকার প্রকাশিত প্রাদেশিক প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসারে এবিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়েছিল, : "বন্দীদশায় ওজন বাড়ার সংবাদ উল্লেখযোগ্য"। অন্য প্রদেশ থেকেও একই সংবাদ এসেছে।

২৪। "দারিদ্র ও সম্পদের ধারণা আপেক্ষিক"—এই মত প্রকাশ করে ১৮৯৯ সালে লর্ড এলগিন জানিয়েছিলেন : "আমি বিশ্বাস করিনা যে ভারতের অধিকাংশ মানুষ মনে করে তারা ক্রমাগত দরিদ্র হচ্ছে। হয়তো তাদের আয় কম। কিন্তু কম হলেও তা তাদের সাধাসিধে অভাব মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট।" (বক্তৃতাবলী পৃঃ ৪৯১)

২৫। 'সমৃদ্ধি' সম্পর্কে এই অদ্ভুত 'নিয়তিবাদী' ধারণার উল্লেখ ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। স্ট্র্যাচি লিখেছেন—"ভারতের জলবায়ুতে জীবন ধারনের জন্য আবশ্যিক প্রয়োজন সহজেই মেটানো যায়। ভারতবাসীর মাটির ঘর ঝকঝকে, চকচকে, সে যা চায় সেইরকমই আরামদায়ক নীড়···স্বাভাবিক অবস্থাতে, একজন ভারতবাসী যা খেতে চায় তা যথেষ্ট পরিমাণেই পায় ..অবশ্য বসন-আসন খুব বেশি থাকে না, তবে ভারতবাসীর চাহিদাও খুব বেশি নয়, এমনকি শীতকালেও সে ঠাণ্ডায় কষ্ট ভোগ প্রায় করেই না।" (ইণ্ডিয়া, ১৮৯৪, পৃঃ ৩৩১-৩)

২৬। "ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভারতবাসীর কাছে সম্পদ অথবা মজুরি বৃদ্ধির থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শান্তি ও সুখ।"—গভর্নর জেনারেলের কৌন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য জে. ডি. রিজ 'রিয়াল ইণ্ডিয়া", লণ্ডন, ১৯০৮; পৃঃ ৩১৯-২০। এ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজ-এর সমর্থনে যত লেখা বের হয়েছে বইটি তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

২৭। স্ট্র্যাচি (ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩০১)"ফ্যামিন কমিশনারের" প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত মন্তব্যটির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই বাক্যাংশটি—"যদিও তার আয় স্বল্প এবং জীবনে ঝুঁকির সম্ভাবনা অনেক বেশি।" অজান্তেই এটি শ্লেষাত্মক হয়ে গিয়েছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব ফাউলার ১৮৯৪ সালে প্রায় একই মন্তব্য করেছিলেন: "গ্রামীণ ভারতের জলবায়ু এমনই যে দরিদ্র মানুষের চাহিদা খুবই কম, ইংলণ্ডের দরিদ্র মানুষের চেয়ে সে অনেক সহজে তার চাহিদা মেটাতে পারে।"

২৮। রেজোলিউশন-এর শেষে সংযোজিত জেলার ও প্রদেশের প্রতিবেদনগুলিতে নিদারুণ দারিদ্র ও অভাবের বর্ণনাই ছিল মুখ্য। রেজোলিউশন শুধু এইটুকুই প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, ভারতে স্থায়ী দুর্ভিক্ষাবস্থা ছিল না। সেটাও কি কম সান্ত্বনার কথা!

২৯। "ঋণগ্রস্থতা সর্বদাই দারিদ্রের ইঙ্গিত নয়, চরম বিপদের তো নয়ই; বস্তুত একজন সাধারণ অধমর্নের অবস্থা বাস্তবে সেই ব্যক্তির মত ব্যাঙ্কে যার আমানত আছে, এবং মাঝে মাঝে ওভারড্রাফট নিতে হয় "(দ্য থার্ড ডেসিনিয়াল মর‍্যাল এণ্ড মেটিরিয়াল প্রোগ্রেস রিপোর্ট, পৃঃ ৪০৫)।

আরেকটি সরকারি নথিতে আর এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছিল—"ঋণ-এর অর্থ একরকম জমা, কাজেই ঋণগ্রস্থতা অভাবের নয় বরং সম্পদের লক্ষণ" প্রভিনসয়াল রিপোর্টস অন মেটিরিয়াল কণ্ডিশন অব দ্য পিপল ১৮৮১-৯১, (বেঙ্গল রিপোর্ট; পৃঃ ৮)।

৩০। জেনারেল জর্জ চের্সনি ১৮৯৪ সালে লিখেছিলেন, "ভারতের বর্তমান যা কিছু সম্পদ সবই আমাদের শাসনের ফলে সম্ভব হয়েছে। কারণ, আমরা যখন এসেছি ভারত তখন দারিদ্র-জর্জর, আমরা না এলে ঐ অবস্থাতেই থেকে যেতে হত।" ১৯০৪ সালে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন কার্জন—"বর্তমান ভারতের অবস্থাকে আলেকজাণ্ডার, অশোক, আকবর বা ঔরঙ্গজীবের সময়কার ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে...দেখা যাবে বৈষয়িক অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, প্রায় অতুলনীয়ভাবেই।"

৩১। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী একজন বাঙ্গালী লেখক স্বীকার করেছিলেন, "ভারতের ইতিহাসের সব পর্বেই ভারতীয় কৃষক ছিল করভার-জর্জরিত, ধর্ষিত শ্রেণী, অদৃষ্টের পরিহাস আর লোভ-লালসার শিকার।" কিন্তু তারপরেই তিনি যোগ করেছিলেন —"ইংরেজ শাসনে তার দুর্দশা আরও বেড়েছে।" (রায়—'দারিদ্র' পৃঃ ১৯৯)।

৩২। একটি অসামান্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দাদাভাই: "ধরা যাক আমি কাউকে ২০ টাকা মূল্যের পণ্য দিয়ে পরিবর্তে ৫ টাকার অন্য পণ্য আর ৫ টাকার রৌপমুদ্রা পেয়েছি। এখন কেউ যদি বলেন এই বিনিময়ে আমিই লাভবান হয়েছি, কারণ আমি রৌপ-মুদ্রায় পাঁচ টাকা পেয়েছি—তাহলে নিঃসন্দেহে ঐ লাভ ঈর্ষারও অযোগ্য।" ('ভারতের দারিদ্র')

৩৩। ১৯০১ সালে কার্জন হিসেব করেছিলেন, ১৮৮০ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ যেখানে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর ছিল ১৮৯৮ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ২১ কোটি ৭০ লক্ষ একর—অর্থাৎ "জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাতে কর্ষিত জমির পরিমান বেড়েছে।" একর প্রতি উৎপাদনশীলতাও ১৮৮০ সালের ৭৩০ পাঃ থেকে বেড়ে ১৮৯৮ সালে হয়েছিল ৮৪০ পাঃ। আর এই হিসেবের ভিত্তিতেই কার্জন দাবি করেছিলেন, খাদ্যদ্রব্যের যোগান বেড়েছে। (বক্তৃতাবলী)

৩৪। যোশী হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতিতে কৃষি জমির পরিমাণ বেড়েছিল ৪৬ লক্ষ একর. কিন্তু জন সংখ্যা বেড়েছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ।

৩৫ বহু সরকারি ও আধাসরকারি নথিপত্রে এটি স্বীকৃত। যেমন, ১৮৯৮ সালে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কমিশন মন্তব্য করেছিল ঃ "সমাজের নিচুতলার একটা অংশ চিরকালই দিন এনে দিন খেয়ে বেঁচে থেকেছে, এখনও তাই আছে। এদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটলে বা খারাপ ফসল হলে তার ধাক্কা অস্বাভাবিকভাবে এদের জীবনে এসে পড়ে। জনসংখ্যার এই অংশটি আয়তনে বিপুল। সব দিনমজুর আর স্বল্পদক্ষ হস্তশিল্পী এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পরিসংখ্যান ইত্যাদির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিগত বিশ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম যে-হারে বেড়েছে, এদের মজুরি সে-হারে বাড়েনি। সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে না সমাজের এই অংশের সম্পদ বেড়েছে কিংবা বেঁচে থাকার ক্ষমতা বেড়েছে। দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাস সঙ্কুচিত হওয়া তো দূরের কথা, তা আরও ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে বেশি ঘন জনবসতিপূর্ণ জেলাগুলিতে। ফলে ঐ অসংখ্য মানুষের মৃত্যু কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে নি, তা বেড়েছে।"

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিভাগের জর্জ ব্লিন নামে একজন গবেষকের সাম্প্রতিক অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র "১৮৯৩-৯৪ থেকে ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতেব কৃষিপণ্য—উৎপাদন ও প্রবণতার পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সমীক্ষা"-র পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ঐ সময় প্রতি বছরই মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত কমছিল—১৮৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৮৯৫-৯৬ সালে যেখানে ছিল ৫৮৭ পাঃ, ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৪৫-৪৬ সালে তা কমে হয়েছিল ৩৯৯ পাঃ (থর্নার উদ্ধৃত করেছেন)।

৩৬। ভারতীয়রা এই বিরোধ উপভোগ করেছেন। এঁদেরই একজন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখনো-কখনো বৈষয়িক উন্নতির প্রমাণ, আবার কখনো দারিদ্রের অভিব্যক্তি।"

৩৭। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় নেতারা দেশীয় শিল্পের ধ্বংস-সাধন ও তার ফলস্বরূপ গ্রামীন অর্থনীতিতে ফিরে-যাওয়া, রায়তের উপর ভূমি-করের বোঝা, ব্যয়বহুল প্রশাসন ও উচ্চ করহার, এবং ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ-নিষ্কাষন, ইত্যাদিকে ভারতের দারিদ্রের অর্থনৈতিক কারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

৩৮। ১৯০২ সালের ২রা মার্চ "দ্য বেঙ্গলী" মন্তব্য করেছিল ঃ "জাতীয়তাবাদীরা দুর্ভিক্ষের যে সব কারণের কথা বলেন, সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সে-ক্ষেত্রে পুরো প্রশাসনটাকেই বদলাতে হবে, এবং ইংরেজ শাসন প্রথমত ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পরে ভারতীয়দের, এই নীতিটিকেই পরিত্যাগ করতে হবে।"

২

শিল্প ঃ ১

১. দেশীয় শিল্পের বিলুপ্তি

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর যে সব সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটেছিল তার মধ্যে একটি শহুরে হস্তশিল্প ও গ্রাম্য কারিগরি শিল্পের ক্রমাবনতি ও বিলোপ। এর ফলে, আমাদের সমাজে বহু শতাব্দী ধরে "কৃষি ও হস্ত-চালিত শিল্পের মধ্যে যে নিবিড় ঐক্যের" ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়তে শুরু করল। "আঠারো শতক পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মোটের উপর সমৃদ্ধ ঃ ভারতীয় উৎপাদন-পদ্ধতি এবং শিল্প-বাণিজ্যের সংগঠন ছিল পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সঙ্গে তুলনীয়"। উনিশ শতকের শেষদিকে এই দেশীয় শিল্প ভেঙে পড়তে শুরু করল, এবং পুনর্নির্মাণের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। অন্যদিকে, যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক শিল্প গড়ে-ওঠার পথও সুগম হয়নি।

গোড়ার দিকে ভারতের জাতীয় নেতাদের কাছে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল শিল্প গঠনের সমস্যা। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে তারা সাধারণ দেশীয় শিল্পের ধ্বংস এবং সেই ধ্বংসজনিত অভাব পূরণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্প গড়ে না-ওঠাকেই দায়ী করেছেন। দিনের পর দিন ভারতীয় লেখকেরা এই বক্তব্যই বারবার তুলে ধরেছেন, আর আজ এই দেশীয় শিল্প কাল ঐ দেশীয় শিল্পের পতন দেখে বিলাপ করেছেন। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিলুপ্তির অব্যাহত ধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁরা বলেছেন, ভারতবর্ষ একদা এক বিরাট উৎপাদনক্ষম জাতি ছিল, যার শিল্পজাত দ্রব্য এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশের বিশাল বিশাল বাজারের চাহিদা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিটিয়েছে। চরকা, তাঁত ও অন্যান্য হস্তশিল্প বহু লক্ষ নরনারীর পূর্ণ সময়ের বা আংশিক সময়ের কাজ যুগিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনের পর এ সব কিছু ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে বসেছে। ভারতবর্ষ শুধু তার বৈদেশিক বাজার হারিয়েছে তাই নয়, হারিয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারও, ফলে বিপুল পরিমাণে বিদেশী শিল্পজাত পণ্য আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে। "যে ভারত পঞ্চাশ বছর আগেও নিজের শিল্পজাত

পোশাক পরিধান করত, সেই ভারত এখন দূরবর্তী প্রভুর প্রেরিত পোশাকে আচ্ছাদিত। পশম দ্রব্য, সিল্ক কিংবা অন্য বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই তেল ও পশুচর্মের ক্ষেত্রেও, একই ঘটনা। এই হল আমাদের অবস্থা। সমগ্র পরিস্থিতি এক নজরে দেখলে মনে হয় আমরা যেন এক গিরিচূড়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি, সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই পড়ে যাব এক অবিমিশ্র, চরম হতাশার গহ্বরে।"[১] রমেশ চন্দ্র দত্ত দেশীয় শিল্পের এই পরাভবকে "ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের বিষাদতম ঘটনা" বলে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে, "ভারতের সম্পদের উৎস গিয়েছে শুকিয়ে", এবং সাধারণ ভারতবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জাতীয় নেতাদের মতে, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল তার ভাঙন এবং তার ফলে শিল্পে মন্দা শুধু যে জাতীয় আয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসকে ধ্বংস করেছে তাই নয়, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমজীবীর সাবেকি বৃত্তিকে ধ্বংস করেছে, শিল্প-বৃত্তিগত আয়ের পথ রুদ্ধ করেছে, এবং তাদের বাধ্য করেছে আরও বেশি কৃষি-নির্ভর হতে, কেননা, জীবনধারণের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। এই ভাবে হস্তচালিত শিল্পের অবক্ষয়ের ফলে কৃষিজমির উপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ পড়েছে। এর পরিণতি হিসেবে, সমাজজীবনে গ্রামীন সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছে, এবং ভারতের মানুষ "অসহনীয় ও বিকল্পহীন কৃষির" উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।[২] কৃষি নির্ভরতার ক্রমোচ্চ হার লক্ষ করলে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিস্তৃতি কতখানি হয়েছিল তা বোঝা যায়। ভারতবর্ষের কৃষি চিরকাল অনিশ্চিত ও খামখেয়ালিপূর্ণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিল্প হিসেবে এমনিতেই নিরাপদ ছিল না, তার উপর আবার এই সামগ্রিক নির্ভরতা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া, আমাদের দেশে কর্ষনোপযোগী জমির পরিমাণ ছিল অতি সীমিত, এবং কৃষি নতুন কর্মসংস্থানে অসমর্থ। সেজন্যও গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির এই বিস্তৃতি আরও ক্ষতিকর হয়েছিল। বস্তুত "যে জাতিকে পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভর করে থাকতে হয় সে জাতি গরীব হতে বাধ্য"। বহু জাতীয় নেতাই ১৮৮০-র দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে কমিশনারদের এই বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন যে, "ভারতীয়দের দারিদ্রের এবং অভাবের দিনগুলিতে ঝুঁকির কারণ ছিল একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি: কৃষিই ভারতীয় নরনারীর প্রায় একমাত্র বৃত্তি।" কৃষিতে এই অতিরিক্ত ভিড় কৃষিজীবীর দক্ষতাও নষ্ট করেছিল। এর ফলে, ভূসম্পত্তি ছোট-ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে, অতিচাষের প্রবণতা বেড়েছে, তাছাড়া অনুর্বর নিম্নমানের জমিতে চাষের সম্ভাবনাও বেড়েছে। এই ভিড় গ্রামের চারণক্ষেত্র, বনাঞ্চল ইত্যাদিকেও গ্রাস করছিল। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে ছদ্মবেশী বেকারি দেখা দিয়েছিল। জি. ভি যোশি দেখিয়েছেন: এক বিরাট সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় শ্রমিকের বোঝা বহন করতে হয়েছে জমিকে, তার ফলে সঞ্চয়ের

হার কমে গিয়েছে এবং জমির উন্নতির জন্য আবশ্যক মূলধনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, জমির উপর চাপ বাড়ার ফলে অলাভজনক চড়াদামে প্রজাস্বত্ব কেনার জন্য কৃষিজীবীদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তাছাড়া মজুরির হারও কমে গিয়েছিল। রানাডে মন্তব্য করেছেন, আধুনিক ভারতবর্ষে এই গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্তারের ফলে একধরনের "গ্রাম্যতা—অর্থাৎ শক্তি, বুদ্ধি ও আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব দেখা দিয়েছিল।" সার্বিক শিল্পের দুর্দশার ফলে এবং অন্যদিকে ভেঙে পড়া শিল্পের স্থান পূরণ করতে পারে এমন নতুন শিল্প গড়ে না ওঠার জন্য এদেশের অর্থনীতি বিদেশী অর্থ ব্যবস্থার দাসত্বে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছিল। বিদেশী শ্রমিকের চোখে ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ''একটি শষ্য উৎপাদনের অর্থাৎ কাঁচামালের কেন্দ্র—এই মাল বিলাতি জাহাজে বোঝাই করে ব্রিটিশ দালালেরা তাদের দেশে নিয়ে যায়, আর দক্ষতা ও মূলধনের সাহায্যে শিল্পজাত পণ্যে রূপান্তরিত করে ফেরৎ পাঠায় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে, বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমে।"

কীভাবে এবং কেন গ্রামীন ও শহুরে হস্তচালিত শিল্পের এই দ্রুত অবনতি ঘটেছিল? সময় আর নানান ঘটনার অনিবার্য ফলস্বরূপ? তা যদি হত, তাহলে একে শুধু দুঃখজনক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু ভারতীয় নেতারা মনে করেছিলেন যে, আমাদের সাধ্যাতীত কিছু ঘটনা অংশত দায়ী হলেও, মূলত এটা "এক ভয়ানক স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুর শোষনের অবশ্যম্ভাবী ফল।" তাঁরা এর জন্য প্রধানত এদেশের ইংরেজ শাসকদের এবং ব্রিটেনের সেইসব কর্তাদের দায়ী করেছেন যারা "ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করার জন্যে" অবিচল নিষ্ঠা আর অসাধারণ নৈপুন্য দেখিয়েছে।

ভারতীয় নেতারা এ-বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতি-দের প্ররোচনায় সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ শিল্প উৎপাদকদের উৎসাহ দিতেই এটা করেছে: এতে ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ হলো কিনা বা ভারতীয়রা দুর্দশায় পড়ল কিনা, তা নিয়ে তারা মোটেই চিন্তিত ছিলা ন।[৩] তাঁদের মতে, ব্রিটিশ নীতির দুটো স্পষ্ট দিক ছিল ঃ (১) বিবিধ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় হস্ত-শিল্পের ধ্বংসসাধন করে এদেশে ব্রিটিশ পন্যের বাজার গড়ে তোলা; এবং (২) ব্রিটেনের দ্রুত উন্নয়নশীল শিল্পের জন্য কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভারতবর্ষকে পুরোপুরি কৃষি-উৎপাদক দেশে পরিণত করা। এবং এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যেই দেশীয় ও কারিগরি শিল্পের-মূলোচ্ছেদ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ শিল্পের উপর নির্ভরশীল করে তোলা আবশ্যক হয়েছিল।[৪]

ভারতীয় নেতারা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পের এই অতিদ্রুত ও স্বচ্ছন্দ ধ্বংস-সাধন সম্ভব হয়েছিল কারণ ইংরেজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা

চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। তাঁরা-এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসনের সঙ্গে একমত হয়েছেন ঃ "বিদেশী শিল্প-পতিরা রাষ্ট্রীয় অবিচারের সুযোগ নিয়ে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে দেশীয় শিল্পোৎপাদকদের দমিত করেছে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে।" শোনা যায় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠী দেশীয় হস্তশিল্পের বিরুদ্ধে নানা রকম নিয়ম-বিধি জারি করতে আরম্ভ করেছিল। কীভাবে ভারতীয় বাজারে দেশীয় পণ্যের পরিবর্তে ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা খতিয়ে দেখার জন্য ১৮১৩ ও ১৮৩৩ সালে পার্লামেন্টারি অনুসন্ধানের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ভারতীয় নেতাদের মতে, বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এর ফলে একদিকে উঁচুহারে শুল্ক-মাসুল এবং অন্যান্য বাধানিষেধের মাধ্যমে ব্রিটেনের বাজারে ভারতীয় শিল্পের স্থান সংকুচিত হল, অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতীয় বাজার ব্রিটিশ উৎপাদকদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল।[৫] ১৮৪৮ সালে অবশ্য ব্রিটেনের বাজারে রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, "কিন্তু তার আগেই চূড়ান্ত ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।" নানা ধরনের অন্তঃশুল্ক ও মাসুল ধার্য করার ফলে ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যও সীমিত ও শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছিল। স্বদেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের বিক্রির ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাছাড়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁতি ও কারিগরদের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে তাদের বাধ্য করেছিল অল্প বা অলাভজনক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে। ফলে তারা তাদের পৈত্রিক বৃত্তি বা ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

দেশীয় শিল্পকে হত্যা করার এই সচেতন প্রচেষ্টার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই স্বীকার করেছেন যে, বাষ্পচালিত উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি আর উন্নতমানের যন্ত্রশিল্পের জন্যেই ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পক্ষে স্বল্প মূল্যে পন্য যুগিয়ে স্বদেশীয় বাজার থেকে দেশীয় কারিগরদের পুরোপুরি বিতারণ সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রানাডের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় ঃ "বিদেশ বলেই এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ নয়—এই প্রতি-যোগিতা প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানুষের শ্রমের প্রতিযোগিতা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও দক্ষতার সঙ্গে অজ্ঞতা ও আলস্যের প্রতিযোগিতা। এরফলে শুধু সম্পদের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হচ্ছে তাই নয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিভা আর অপরের জন্য শ্রমের উপর কর্তৃত্বও চলে যাচ্ছে।" বহু জাতীয়তা-বাদী নেতা অবশ্য এই মতও পোষন করেছেন যে, শুধুমাত্র উন্নত ও দক্ষ পদ্ধতির জোরেই বিদেশীরা আমাদের দেশীয় শিল্প ধ্বংশ করতে পেরেছে, একথা

ঠিক নয়। দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার পতনের জন্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, রেলপথ তৈরি এবং অবাধ বাণিজ্যনীতিকেও সমভাবে দায়ী করা যায়। শেষোক্ত দুটি রাজনৈতিক প্রভূত্ব স্থাপনের সূত্রেই ঘটেছিল—কীকারণে ইংল্যাণ্ডের যান্ত্রিক সভ্যতা এত দ্রুত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল? জাতীয় নেতারা সে প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন। এঁদের মতেঃ "ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশকে লুণ্ঠন করে ইংরেজরা যে প্রভূত সম্পদ আহরণ করেছিল", তার দ্বারাই তাদের "যন্ত্র সভ্যতার এই উৎকর্ষ ও দ্রুত বিকাশ" সম্ভব হয়েছে।[৬] অর্থাৎ, ভারতীয় নেতারা এই কথাটাই বলতে চাইলেন যে, "শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে একদা ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য ছিল, তা ইংরেজের হাতে চলে গিয়েছিল প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগের ফলেই, অর্থনৈতিক নিয়ম পরে তাতে সহায়ক হয়েছে।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঐ সময় ভারতীয় লেখকরা মূলত শহুরে হস্তশিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনার উপরই জোর দিয়েছিলেন, তুলনায় গ্রামীণ শিল্পের অবক্ষয় তাদের মনোযোগ কম আকর্ষন করেছে। তাছাড়া, শহরাঞ্চলে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের রুচিতে যে পরিবর্তন ঘটছিল তাকেও তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেননি এবং কাঁচামাল রপ্তানী ও দেশীয় সংগঠনগুলির ক্রমাবলুপ্তির ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন।

দেশীয় শিল্পব্যবস্থার অবক্ষয় ভারতবর্ষের দারিদ্রের মূলে—এই যুক্তিদিয়ে জাতীয়তাবাদীরা স্বদেশী কারিগরি শিল্পের পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, যথোপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষন এবং আধুনিকীকরনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং ঐগুলিকে দেশীয় শিল্পব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ও মানুষের দুর্দশামোচনের উপায় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করেছিলে, "বারবার যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে তার হাত থেকে পরিত্রান পেতে হলে মুমূর্ষু স্বদেশী-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন জরুরি", "অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে এই পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।" ভারতীয় নেতারা এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে "আধুনিক বৃহদায়তন যন্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হস্তচালিত শিল্পের পক্ষে টিকে থাকা দুরূহ, এবং সে দুরাশা করা যায় না"। তথাপি তাঁদের অনেকেই মনে করেছেন হস্তশিল্পগুলির সংরক্ষন প্রয়োজন এবং হস্তশিল্প থেকে বৃহদায়তন শিল্পবিকাশের পথে যে স্বাভাবিক বিবর্তনের পদ্ধতি আছে, তার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটতে দেওয়া উচিত,[৭] কেননা স্বাভাবিক বিকাশের পদ্ধতি অনুসৃত হলে হস্তশিল্পের দুর্দশা ও ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন যথাসম্ভব কম হয়। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল এই যে, তারা যান্ত্রিক শক্তিগুলিকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেনি। এ বিষয়ে জি ডি যোশির অর্থনৈতিক চিন্তাসমৃদ্ধ মতের বিশদ উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঃ "কোনো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণ সরকার, যার দায়িত্ববোধ

বিষয়ে সচেতনতা আছে, কখনই কোনোরকম বাধা না দিয়ে দেশের শিল্প সংগঠনে এরকম বিধ্বংসী মূলগত পরিবর্তন হতে দিত না। হস্তচালিত শিল্প থেকে বাষ্পচালিত শিল্পের বিকাশ নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী, তাকে রোধও করা যাবে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো একটি পশ্চাদপদ, অনুন্নত দেশে যন্ত্রশিল্পায়নের এই ধারাতে দেশের মঙ্গলের জন্যই সময়মত ও সামগ্রিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আইনগতভাবে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে এবং তা সরকারের এক্তিয়ার ভুক্তও।"

২. আধুনিক শিল্পের উন্নতি ঃ

প্রথমদিকের জাতীয়তাবাদী নেতারা কখনই মনে করেননি যে বৃহৎ শিল্পের বিরোধিতা বা তার বিকল্প হিসেবে ক্ষুদ্র কারিগরি শিল্পের সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, বরং তারা প্রায় সকলেই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রবর্তন চেয়েছেন। আধুনিক শিল্প প্রবর্তনের এই দাবি এবং তার সমর্থনে বক্তব্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় আধুনিক ভারতে শিল্পায়নের আবশ্যকতার মুখ্য প্রচারক জাষ্টিস রানাডের লেখায়—

"উৎকৃষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই যন্ত্রের ব্যবহার শিখতে হবে। ··· আমাদের কাঁচামালের উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, অথবা উৎকৃষ্ট কাঁচামাল আমদানি করতে হবে, যদি তা দেশে উৎপন্ন না হয়। আমাদের শ্রম ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার শিখতে হবে, এবং যতদিন না তা ঠিকভাবে শিখে উঠতে পারছি, ততদিন বিদেশ থেকে কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে। দীর্ঘকালের গ্রাম্যতা আমাদের জবুথবু করে ফেলেছে ; এখন হাত দিতে হবে নতুন কাজে, আরো বেশি কঠোর, আরো আন্তরিক. শ্রমের জন্য পেশীকে প্রস্তুত করতে হবে। এটি একটি সামাজিক গুণ, যা আমাদের শিক্ষণীয়, তা কতটা পারছি বা পারছি না তার উপর নির্ভর করছে এই প্রতিযোগিতায় হারব না জিতব।·· আমি নিশ্চিত যে খুব শিগগিরই এটা সমগ্র জাতির মূলমন্ত্র হয়ে উঠবে, এবং এই সুপ্রাচীন দেশে আধুনিক জীবনধারা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

ঐ-সময়ে বস্তুত, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রতিটি উদ্যোগকেই ভারতীয় নেতারা স্বাগত জানিয়েছেন, উদ্যমের অভাবে সুযোগের অপচয় ঘটতে দেখলে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, এবং, শুধু তাই নয়, শিল্প বাণিজ্যে অংশ নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। "আমাদের পুঁজিপতি আর শিল্পোদ্যোক্তা ···ব্যবসায়ী, যন্ত্র নির্মাতা আর দোকানদারের জাতিতে পরিণত হতে হবে"[৮] —এই ছিল এঁদের স্লোগান। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে শিল্পায়নই

জাতীয় উন্নতির একমাত্র না-হলেও অন্তত সবচেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ' লক্ষণ এবং উন্নয়নের একমাত্র উপায়।

শিল্পায়ন ঘটলে বহুবিধ সুবিধে পাওয়া যাবে—এইটিই ছিল শিল্পায়নের পক্ষে প্রধান যুক্তি। এবং সেজন্যই ভারতীয় নেতারা শিল্পায়নকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মনে হয়েছিল ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ও কম উৎপাদন। কাজেই আধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারলে তবেই আরো দারিদ্র আর অবক্ষয় রোধ করা যাবে, জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব হবে, এবং লক্ষ-লক্ষ ভারতবাসী সমৃদ্ধির পথে এগুতে পারবে। এছাড়া, আর একটি যুক্তি ছিল। চাষযোগ্য প্রায় সব জমিই ইতিমধ্যেই চাষের আওতায় এসে গিয়েছিল, ফলে কৃষির সম্প্রসারণ আর সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় একমাত্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমেই জমির উপর চাপ কমানো, গ্রামীণ বেকারী ও অর্ধ বেকারী হ্রাস বা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনধারণের বিকল্প উপায় সৃষ্টি সম্ভবপর। সর্বোপরি, শিল্পায়ন অত্যাবশ্যাক মনে হয়েছিল এই কারণে যে, এর ফলে গ্রাম্যতার আরও সম্প্রসারণ রোধ করা যাবে, কৃষির মত অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত একটি পেশার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা কমানো যাবে, এবং দেশ থেকে সম্পদ নিষ্কাসন ও শিল্পজাত পণ্য আমদানি আর কাঁচামাল রপ্তানির ফলে "মজুরি ও মূলধনের" লোকসান কমানো যাবে।

কোনো-কোনো জাতীয় নেতা আবার দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রগতির জন্যও বৃহদায়তন উৎপাদনের আবশ্যকতার কথা বলেছেন। তাঁদের মতে—আধুনিক কলকারখানা হলে শুধু সম্পদই বাড়বে না, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, উৎপাদন শক্তিসমূহের পূর্ণ ও বহুমুখী বিকাশ ঘটবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, "সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত" কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার নিম্নতম ধাপ এবং 'মুক্ত ও সম্প্রসারণশীল' শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা একটি উচ্চতর পর্যায়—এমন কি মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমান হলেও। কাজেই শিল্পায়ন উৎকর্ষ ও অগ্রগতির নিদর্শন; শিল্পায়ন ঘটলে সংস্কৃতি, চরিত্র ও মেধার উন্নতি হয়, তা আরো ছড়িয়ে পড়ে। রানাডে ১৮৯০ সালে লিখেছিলেন ঃ "জাতিকে নব নব কর্মধারায় প্রবর্তিত করতে স্কুল কলেজের তুলনায়" অনেক বেশি ফলপ্রসূ কলকারখানা মিল ইত্যাদি স্থাপন। এই আধুনিক শিল্পের শক্তিই ভারতের বিভিন্ন ধরনের মানুষকে অখণ্ড জাতিয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম ভারতের বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীকে সাময়িক ভাবে বেঁধে রাখতে পারে, কিন্তু অধিকার পেয়ে গেলে ওই ঐক্যবন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাণিজ্যগত বন্ধন একবার তৈরি হলে কখনও নষ্ট হবে না। বাণিজ্যিক আর শিল্পগত

উৎপাদনের বন্ধন খুব নিবিড় ঐক্যের বন্ধন, ভারতীয় জাতিগঠনে যার ভূমিকা অবিসংবাদিত।"[৯]

এই ভাবেই উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই দ্রুত শিল্পায়নের জন্য জাতীয়-দাবি উঠতে শুরু করল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখনকার কোনও সংবাদপত্র বা সমাজকর্মী কখনও পশ্চিমী কায়দায় শিল্প কারখানা স্থাপন করলে সুযোগ সুবিধার যে অপরিসীম বৃদ্ধির সম্ভাবনা তা অস্বীকার করেনি, বা সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেনি। কেবল একজন ব্যক্তির কণ্ঠেই পুঁজিবাদী বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে কথা শোনা গিয়েছিল—তিনি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ডন পত্রিকার সম্পাদক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালের আগে সতীশচন্দ্র তেমন বিখ্যাত ছিলেন না। ১৯০৫ সালের পরে সুপরিচিত শিষ্যদের দৌলতে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। এখানে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত যে প্রশ্নে সতীশচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠেছে, তা গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে এই বিষয়ে তার মতামতের সঙ্গে একদিকে মিল আছে মহাত্মা গান্ধির মতামতের অন্যদিকে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থাগত চিন্তার। তাঁর মতে, আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার মূল গলদ দুটি: একদিকে এর ফলে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু সুসংগঠিত সংখ্যালঘু পুঁজিপতিগোষ্ঠী তৈরী হয়, যারা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষকে যন্ত্রে ও মজুরির দাসে পরিণত করে; অন্যদিকে এই উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ করে তোলে অতিকায় সব শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে যা ভারতবর্ষের মতন বিশাল দেশে স্থায়ী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপদের কারণ হতে পারে। এর প্রতিকার হ'ল পারিবারিক হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে দেশীয় শিল্পের পুণর্বিন্যাস। শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প থাকতে পারে—যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, খনি রেলওয়ে ইত্যাদি; বিপুল-সংখ্যক পারিবারিক বা ব্যক্তিগত হস্তশিল্পের টিঁকে থাকার স্বার্থে যেগুলি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, একটি "যৌথ নৈতিক জীবন" গড়ে তোলা—যাতে "বিভিন্ন উন্নয়নশীল গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার ও সামগ্রিকভাবে নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিটি শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট ও স্বাধীন ভূমিকা থাকবে, আবার সমগ্রের স্বার্থে তারা পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সংহতি গড়ে তুলবে।"

পশ্চিমী শিল্পসমাজের প্রতিযোগিতা ও সম্পদ-লিপ্সার প্রকৃতি, যা সামাজিক সম্পর্কের আঁটোসাঁটো বন্ধনকে আলগা করে দিয়েছে এবং ""ব্যক্তিকে একান্তই নিজের জন্য ও নিজেকে নিয়ে বাঁচার" ধরন শিখিয়েছে, তা সমসাময়িক অন্য কিছু ভারতীয় লেখকের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। ১৮৯৩-এর এপ্রিলে "পুণা-সার্বজনিক সভার" জার্নালে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক তদানীন্তন পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কঠিন অভিযোগ জানিয়েছিলেন 'The

Exigencies of Progress in India' (ভারতে প্রগতির জন্য জরুরি কিছু ব্যবস্থা) নামে প্রবন্ধে, তার তুলনা মেলে না :

"অতীতের স্বৈরাচারতন্ত্র যেসব অত্যাচার চালিয়েছে তার সব কিছুকেই ম্লান করে দিয়েছে বর্তমানের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যবস্থার কদর্য অসমতা, সম্পদ ও সম্পত্তির কেন্দ্রিকতা, পুঁজির কাজে শ্রমের আইনগতভাবে দাসত্ব স্বীকার, পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাবে অসংখ্য মৃত্যু, এবং হতাশা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈরাশ্যের কারণে নথিভুক্ত হয়নি এমন অগণিত আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত।"

তবে পশ্চিমী শিল্পায়নের এসব দুর্বলতা কিন্তু আলোচ্য লেখকদের শিল্পবিমুখ করেনি। সুবিধা অসুবিধা বিচার করে এঁরা রায় দিয়েছেন পশ্চিমী জীবন পদ্ধতির পক্ষেই, প্রাচ্যের নয়। অবশ্য, এই পছন্দ-অপছন্দের গুরুত্ব খুব একটা ছিল না, কেননা এটাই বিশ্বজোড়া পুঁজিতন্ত্রের নিয়ম হয়ে উঠেছিল, এবং ভারতবর্ষকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব ছিল না, "যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, অবশ্যম্ভাবিতাকে মেনে নিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিতে সামিল হওয়াই ছিল শ্রেয়।" সময়ের বিচারে, নীল, চা ও কফির বাগিচা ভারতে প্রথম শিল্পোদ্যোগ। কিন্তু এগুলির মালিকানা ছিল পুরোপুরি ইউরোপীয়, তাছাড়া এগুলি আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর ছিল না, সেজন্য ভারতীয়দের নজর কাড়তে পারেনি। কল-কারখানার শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতীয়-নেতাদের মনোযোগ সে দিকে আকৃষ্ট হল ; তখন থেকে শিল্পের বিস্তারই তাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। রেলপথ নির্মানের মধ্যে দিয়েই ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের সূচনা। এর পর ১৮৫০-এর দশকে সুতাকল, পাট-শিল্প ও কয়লাখনি শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করল। শেষোক্ত দুটি শিল্প ছিল ইউরোপীয় পুঁজির দখলে। ফলে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের আশা-ভরসার একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠল বস্ত্র-শিল্প যা শুরু থেকেই এদেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ১৮৭৯ সালে ভারতে ৫৬ টি কাপড়ের কল ছিল, কর্মী সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০। প্রায় ৭৫ ভাগ কাপড় কলই ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে। অন্য দিকে ১৮৮২ তে বাংলাদেশে মাত্র ২০টি চটকল ছিল, যাতে কাজ করত ২০,০০০ শ্রমিক। স্পষ্টতই ১৮৮০-তে ভারতে আধুনিক শিল্পের বিস্তার হয়েছিল অত্যন্ত সীমিতভাবে, তবে সে-সময়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় অগ্রগণ্যদের মধ্যে আধুনিক শিল্প গড়ার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলাই ছিল যথেষ্ট। ১৮৮০ সালের পর থেকে খুব ধীরগতিতে কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ধারায় শিল্পের অগ্রগতি ঘটতে থাকে, যার ফলে ১৯০১-২ সালে ৩৬টি চটকল (শ্রমিক সংখ্যা ১১৪,৭৯৫ জন) এবং ১৯০৪-৫ সালে ২০৬ টি কাপড় কল (কর্মী সংখ্যা ১১৬, ৩৬৯) গড়ে উঠেছিল। ১৯০৬-এ কয়লা-খনি শিল্পে কাজ করত ৯১,০০০ জন শ্রমিক।

খুব সীমিত পরিমাণে হলেও অন্যান্য কিছু-কিছু শিল্পও এ-সময়ে গড়ে উঠেছিল। যেমন—তুলো ছাড়াবার যন্ত্র ও সুতাকল, চাল-ময়দা পেষাই কল, কাঠচেরাই কল, চামড়ার কারখানা, পশম শিল্প, কাগজ ও চিনির কল এবং কিছু খনিজ শিল্প, যথা লবণ, অভ্র, শোরা, পেট্রোলিয়ম ও লোহা ও পেতলের ঢালাইয়ের কারখানা। তবে এই শিল্পোন্নয়ন ঘটেছিল খুব ধীর লয়ে এবং মূলত তা পাট ও সুতোর শিল্পেই সীমিত ছিল। দেশীয় হস্তশিল্পের স্থানচ্যুতির কোনরকম ক্ষতিপূরণ এতে হয়নি।

স্বভাবতই ভারতীয় নেতারা ভারতে শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলি কী কী, এবং কীভাবে প্রতিকার সম্ভব তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডেও এদেশের সরকারি মহলে একটি ধারণা সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল, তা হল, ভারতের পক্ষে কখনই খুব বড় মাপের শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, গরম প্রধান এই ট্রপিকাল দেশটিকে কেবল কাঁচামালের উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবেই তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং সেইসব কাঁচামাল দিয়ে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ইউরোপীয় দেশগুলিকেই শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে।[১০] ভারতীয় নেতারা প্রথমেই এই ধারণাটি যে ভুল তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষও যে অত্যন্ত গুরুত্বময় শিল্পোৎপাদক দেশ ছিল, তার বহু "নিদর্শন উপস্থিত করে, তারা দাবি করলেন যে এদেশে আধুনিক শিল্পোৎপাদনের সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।" প্রথমত, আধুনিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এখানে উৎপন্ন হয় বলে উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী হবে দামে সস্তা, অর্থাৎ কম দামে শিল্প উৎপাদকের দেশ হবে ভারতবর্ষ। তাছাড়া, ভারতীয়দের মধ্যে সেই সব গুণাবলী—জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, আত্মনির্ভরতা, কঠোর শ্রমক্ষমতা ইত্যাদি—প্রভূত পরিমাণে দেখা যায় যেগুলি দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক। স্বভাবতই ভারতীয় নেতারা ভবিষ্যত শিল্পসমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাবান ও আশাবাদী ছিলেন। এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক উদ্যম সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য-সৃষ্ট, প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারিত করতে পারলে ঐ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে, এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল।

৩. মূলধনের স্বল্পতা :

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে ভারতবর্ষে অপর্যাপ্ত জমি ও শ্রম থাকলেও মূলধনের অভাব ছিল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানতম বাধা। রানাডে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের জমি যেমন জলের তৃষ্ণায় কাতর, শিল্প তেমনই মূলধনের অভাবে শুষ্কতাপ্রাপ্ত"। মূলধন সমস্যার দুটো দিক ছিল। (ক) পুঞ্জিভূত মূলধন ও বর্তমান সঞ্চয়ের স্বল্পতা।

যার কারণ—অনতি-অতীতে শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব; জনগণের অশেষ দারিদ্র্য—যার ফলে সাধারণভাবে সঞ্চয় অসম্ভব কিংবা অন্তত দুরূহ হয়েছে; হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুশাসন যা সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বহুবিভক্ত করেছে; রাষ্ট্রের বিপুল করভার, যা মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে; এবং অর্থনৈতিক সম্পদ নিষ্কাষণ, যার ফলে সম্ভাব্য সঞ্চয়ের বিপুল অংশই চলে গেছে বিদেশে। (খ) দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মূলধনী সম্পদকে আকৃষ্ট ও একত্রিত করে কাজে লাগাতে আধুনিক শিল্পের ব্যর্থতা। এই দ্বিতীয় দিকটি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব ও একত্রে কাজ করার অনীহার অনিবার্য ফলশ্রুতি—"যৌথভাবে কাজ করার অভ্যাস ও সহযোগিতার মনোভাবের একান্ত অভাব, যা ব্যতিরেকে বৃহদায়তন শিল্পের শুরু ও সাফল্য কখনই হয় না"। তাছাড়া আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবের ফলেও অসংখ্য আমানতকারীর ছোট ছোট সঞ্চয় একত্রিত হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিযুক্ত হতে পারেনি। বৃহদায়তন শিল্প যে এখানে মূলধন আকর্ষণ করতে পারেনি তার আরেকটি কারণ, ভারতীয় পুঁজি ছিল কম উদ্যমী এবং ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক।

ভারতীয় নেতৃবর্গ কখনই অস্বীকার করেননি যে, পুঞ্জিভূত মূলধনের পরিমাণ রাতারাতি বাড়ানো সম্ভব নয়। তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন তা হল, ব্রিটেনে সম্পদ চালান রোধ করতে পারলে এবং "দেশের মানুষ সঞ্চয়প্রবণ হয়ে কঠোরভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ" করতে শিখলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। নেতৃবর্গ বর্তমান মূলধনী সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের প্রস্তাবও করেছেন। তাঁরা ধনী জমিদার ও রাজন্যবর্গকে আহ্বান জানিয়েছেন বৃহদায়তন শিল্পগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এবং সাধারণ মানুষকে আহ্বান করেছেন তাদের সঞ্চয়কে কাজে লাগাতে। আধুনিক ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি শিল্পের সাহায্যে মূলধন-গঠনের উপর তাঁরা জোর দিয়েছেন, যাতে ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত ও অসাড় ছোট ছোট সম্পদকে সজীব ও অসীম সম্প্রসারণশীল মূলধনে পরিণত করা যায়। তবে তাঁরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন পারস্পরিক বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার ও সহযোগ গড়ে তোলার উপর যাতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যৌথ-মূলধনী কারবারের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-উদযোগে সমষ্টিকরণ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি পশ্চিমের দেশগুলিতে খুব সাফল্য লাভ করেছিল। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় ভারতীয় নেতারা বারবার উত্থাপন করেছেন, তা হল, রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তা। পরের অধ্যায়ে তা বিশদ আলোচিত হবে।

৪. কারিগরি শিক্ষা :

ভারতে শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব বাধা ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীর অভাব। সেজন্য জাতীয় দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ও বহুচ্চারিত দাবি হয়েছিল কারিগরি বিদ্যার স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলার দাবি, যাতে কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে বেশিরভাগ সময়েই নির্ভর করতে হত বিদেশ থেকে নিয়ে আসা উচ্চ-বেতনভুক শিল্পবিশারদদের উপর ; ফলে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, ভারতের মাটিতে বৃহৎশিল্পের শেকড় তৈরি হবে না "যতদিন না আমরা এমন এক সম্প্রদায় মানুষ পাব যারা শিল্পোৎপাদনের প্রতিটি বিভাগে পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও পরিচালনা এবং দক্ষতা ও জন্মগত পারদর্শিতার সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্যতা-সম্পন্ন ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।" ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৭ সালে তৃতীয় অধিবেশনে কারিগরি শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দাবি জানিয়েছিল, "ভারতের দারিদ্র-মোচনের জন্য অন্যান্য কাজের সঙ্গেই সরকারকে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তৃত পরিসরও গড়ে তুলতে হবে"। ১৮৮৮-তে পরের অধিবেশনেই কংগ্রেস সাধারণ কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে এদেশের শিল্পব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখতে একটি মিশ্র কমিশন গঠনের দাবি তুলেছিল। ১৮৯১, ১৮৯২, ১৮৯৩-তে এই দাবি পুনঃপুনঃ ঘোষিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালেও কংগ্রেস খুব জোরের সঙ্গেই কারিগরি বিদ্যার স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এরপর প্রত্যেক বছরেই এই দাবি উচ্চারিত হতে লাগল। ১৯০৪-এ কংগ্রেস প্রস্তাব করল সমগ্র দেশের জন্যে অন্তত একটি কেন্দ্রীয় পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক স্তরে ছোট ছোট স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউরোপীয় মহাদেশে, (বিশেষত জার্মানিতে) এবং জাপান ও মার্কিনদেশে কারিগরিবিদ্যার স্কুল-কলেজ শিল্পবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সেই সাফল্য দেখেই ভারতীয় নেতারা কারিগরিশিক্ষা বিস্তারের দাবি উত্থাপনে অন্তত আংশিকভাব উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ভারতীয় নেতারা স্পষ্টই বুঝে নিয়েছিলেন যে সরকার কারিগরিশিক্ষা বিস্তারের উদ্‌যোগ গ্রহণ না করলে বা ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব না নিলে আধুনিক শিল্পের জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন কিছুতেই মেটানো যাবে না। কেউ কেউ আঞ্চলিক বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেও বরাদ্দ অর্থের অন্তত কিছুটা কারিগরি শিক্ষার স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্য ব্যয় করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মোটকথা, সবাই এ-বিষয়ে একমত হয়েছেন যে. আর্থিক অভাবের কথা বলে কিছুতেই কারিগরি শিক্ষায় ঢিল দেওয়া চলবে না। ভারতীয় নেতারা সাধারণ-ভাবে হিসেব করে চলারই পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি তাঁরা দাবি জানিয়েছেন

যে অন্তত এক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতেই হবে, তা যত বেশিই হোক না কেন। ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল শিল্পে পশ্চাৎপদতা যার ফলে চাকরি-বাকরির সুযোগ ছিল না। সেজন্য জাতীয় নেতারা এও দাবি করেছিলেন যে সরকারকে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে উৎসাহ যোগাতে হবে, পূর্তদপ্তরে, বনবিভাগ. টেলিগ্রাফ বিভাগ ও রেলওয়েতে ভারতীয়রা যাতে উচ্চপদে নিযুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয়দের প্রত্যাশা ছিল অনেক, সেজনা কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অপ্রতুল কার্যকলাপ রীতিমত সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।[১১]

সরকারের দায়িত্বের উপরে সবিশেষ গুরুত্ব দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেতারা স্বনির্ভরতার উপরেও খুব জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে এবং বিত্তবান্-লাখোপতি ও জমিদারদের কাছে আবেদন করেছিলেন কারিগরি শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ খোলার ব্যাপারে উদার হাতে দান করার জন্য এবং বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের পাঠাবার জন্য নানা ধরনের বৃত্তির জন্য। ১৮৭৬ সালে কলকাতার ইণ্ডিয়া লীগ নিজেদের চেষ্টায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তারের আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ১৮৯৯-তে জে. টাটা উচ্চমানের বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পের জন্য তিরিশ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস টাটার এই স্বদেশ-হিতৈষণার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ একটি প্রস্তাব পাস করে।[১২] তবে স্বনির্ভরতার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সম্ভবত ১৯০৪ সালে কলকাতায় 'দি অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়ান্টিফিক অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন' এর প্রতিষ্ঠা, যার নেতৃত্বে ছিলেন কে. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. এম. বোস প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা। এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের খরচ-খরচা, বিদেশ প্রত্যাগত ভারতীয় শিল্প-বিশেষজ্ঞদের নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে সুসজ্জিত করে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ করে টাকা তোলা হত। অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক চাঁদা ছিল মাত্র চার আনা।

কারিগরিবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা কী ধরনের হওয়া উচিত, তা নিয়েও ভারতীয় নেতারা ভেবেছেন। উনিশশতকের শেষদিকে ভারতে মাত্র চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল; এসব কলেজ থেকে পাস করা ছাত্ররা প্রায় সকলেই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি পেয়ে যেত। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোরের সরকারি আর্ট স্কুলগুলিতে শিল্পশিক্ষার বিভাগ ছিল—তাঁত বোনা, মৃৎ-শিল্প, খোদাই ও কলাই-এর কাজ, কাঠশিল্প, সোনারূপার কাজ ও বিভিন্ন ধাতু

অলঙ্করণের কাজ ইত্যাদি শেখান হত। ১৯০২ সালে শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২৩-এ। এদের শিক্ষন বিষয় ছিল মূলত ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ, জুতো তৈরি ও দর্জির কাজ। ছুতোর, কামার ও অন্যান্য হস্ত-শিল্পের মধ্যেই শিল্পশিক্ষাকে আবদ্ধ রাখার এই সরকারি নীতিকে দেশের নেতারা যারপরনাই সমালোচনার বিষয় করেছিলেন।[১৩] ভারতবর্ষে হস্তশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগর যথেষ্ট ছিল, প্রয়োজন ছিল আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারের। কারিগরি শিক্ষার মূল লক্ষ্য, পুরনো লুপ্তপ্রায় ও মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়, নতুন বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং সেইসব পণ্য উৎপাদন যেসব পণ্য আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। কাজেই নতুন শিল্পবিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে পারবে এবং ভারতীয় যন্ত্রশিল্পীদের আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিষয়ে অবহিত করবে এমন শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক ছিল। এই কারণেই ভারতীয়রা বিদেশে শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর উপর এত জোর দিয়েছিলেন। এবং উন্নতমানের কারিগরি শিক্ষাদানের যোগ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য বিশেষ চাপ দিয়েছিলেন।

৫. শিল্পোদ্যম :

কোন কোন ভারতীয় নেতা মনে করেছেন যে, ভারতবর্ষ শিল্পে পশ্চাদপদ হওয়ার একটা বড় কারণ, ভারতীয় জনগণের শিল্পসংগঠনে উদ্‌যোগ ও উদ্যমের বিশেষ অভাব। ১৮৮৫ সালে জি. ভি. যোশি বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত, স্বাধীন ও স্বনির্ভর উদ্‌যোগের মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ তার অভাব ভারতীয়দের মধ্যে দুঃখ-জনকভাবে প্রকট"। অন্য কিছু নেতা এই মত পোষণ করতেন যে, অন্যান্য গুণের অভাবও ভারতীয়দের মধ্যে লক্ষণীয়, যেমন—পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের অভাব, অনুসন্ধিৎসার অভাব, স্বাধীন চিন্তা ও কার্যের অভাব, সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার অভাব, "ঝুঁকি নিয়ে কাজ কবার সাহস" এবং "বিরোধী শক্তিকে জয় করার সপ্রতিভতা"র অভাব। তবে এই সদগুণগুলির অভাবের জন্য তাঁরা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দায়ী করেননি। বরং জাতীয় নেতারা ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা এবং বিশেষ করে ভারতীয়দের উদ্যমের অভাবের জন্য দায়ী করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অনুশাসনকে এবং প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যকে। জাত-পাতের ব্যবস্থা শ্রম ও মূলধনের সচলতা নষ্ট করে দিয়েছিল। উঁচু জাতের শিক্ষিত বুদ্ধিমান তরুণেরা জাত-পাত প্রথার জন্য শিল্পে বা প্রযুক্তিতে অংশ নিতে অনুৎসাহিত হয়েছে, যার ফলে "সমাজের সবচাইতে চিন্তাশীল গোষ্ঠী সর্বোচ্চ দক্ষতা থেকে বিমুক্ত থেকেছে"। তাছাড়া বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ বাণিজ্যের সম্প্রসারণকে রুদ্ধ করেছে। ধর্মীয় ভাবধারাও একদিকে পরিতৃপ্তির বোধে উৎসাহ যুগিয়েছে, অন্যদিকে সম্পদ-লিপ্সার বিরুদ্ধে ঘৃণা

সঞ্চার করে বৈষয়িক উন্নতির পথ কন্টকিত করেছে। এর ফলে সামাজিক সম্পদ বর্ধনের উৎসাহ অবসিত হয়েছিল। ভারতে দুঃখবাদ ছিল সর্বব্যাপ্ত। মনুষ্য জীবনকে পূর্বনির্দিষ্ট ও যন্ত্রণাময় বলে ধরে নেওয়া হত, এবং মনে করা হত দেশের উন্নতির প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রথা বাণপ্রস্থের অবকাশ, কর্মোদ্যমহীনতা এবং সহজ নিস্তরঙ্গ ও অলস জীবনযাপনকেই সর্বাপেক্ষা সুখকর বলে মনে করেছে। স্বপ্ন ও কাল্পনিকতায় মগ্ন ভারতীয় সমাজ অনধিগম্যতার সন্ধানেই চিরকাল ব্যাপৃত থেকেছে। কিন্তু আধুনিক শিল্পসভ্যতা হল। অতিমাত্রায় বাস্তববাদী। ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির ভারতীয় আদর্শ ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এর সঙ্গে জাতপাতের ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য যুক্ত হয়ে ভারতবাসীকে সামাজিক সচেতনতাহীন করে তুলেছিল ঐ সময় সেটাই ছিল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য।

জাস্টিস রানাডের নেতৃত্বে সংস্কারবাদী বলে পরিচিত জাতীয়তাবাদীদের একাংশ এই মত প্রচার করেন যে এখানে আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তুলতে হলে সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক পরিবর্তন দরকার। রানাডে বলতেন, "যদি তোমার সামাজিক ব্যবস্থা গোলমেলে হয়, তুমি কিছুতেই উন্নত অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবে না।" সেজন্যই সংস্কারবাদীরা দেশের মানুষকে পুরনো রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রগাঢ় প্রভাব কাটিয়ে উঠে পশ্চিমের নতুন জীবনদর্শন অর্থাৎ ধনতন্ত্রের মন্ত্র গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন ; এবং আধুনিক সব ধারনাকে—প্রগতি ও বিজ্ঞান চেতনা, চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা, পরিবর্তন এবং দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি অনুরাগ, আশাবাদ ও বাস্তববোধ, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে—প্রশংসা করে অনুকরণীয় গুণ বলে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ভারতীয় নেতারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন মেনে নিলেও হিন্দু রীতিনীতি বা সামাজিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেননি, সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পায়নের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক বলেই মনে করেছেন। এঁরা আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার উপযোগী অভ্যাস ও কর্মোদ্যোগের বিকাশ আবশ্যক বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এঁদের বিশ্বাস ছিল এই যে, ঐ সব গুণাবলী সুদূর প্রাচীন কালে হিন্দুদের মধ্যে দেখা যেত, পরে তা সমাজ ও ধর্মের অবক্ষয়ের জন্য বিলুপ্ত হয়েছিল, কাজেই পশ্চিমের দারস্থ হওয়ার দরকার নেই, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা থেকেই তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর সবচেয়ে ভাল পরিচয় পাওয়া গেছে জাত-পাতের প্রতি তাঁদের মানসিকতায়। এঁরা বৈদিক বলে 'মূল' চতুর্বর্ণের ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন, চতুর্বর্ণের প্রশংসা করেছেন, চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, কিন্তু আধুনিক যুগের শত শত ভাগে বিভক্ত জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতাকে নিন্দা করেছেন।

সে যাই হোক, ভারতীয় সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন কিংবা আধুনিক বিকাশমান শিল্পযুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রশ্ন কিন্তু আলোচ্য এই পর্বের জাতীয় অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম ও তার জন্য যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে নতুন এক জাতীয়তাবাদী প্রেরণার সঞ্চার হয়েছিল যা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জগৎকেও তোলপাড় করে দিয়েছে। শাসকদের উন্নাসিকতার প্রতিক্রিয়ায় এই নতুন জাতীয়তাবাদ বহু ভারতীয় নেতাকে স্বদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির জয়গানে অনুপ্রেরিত করেছিল। পশ্চিমী দুনিয়ায় মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা পূরণে ধনতন্ত্রের ব্যর্থতা তাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। তবে সমাজ সংস্কার আন্দোলন কখনই তেমন প্রখর হতে পারে নি। উপরন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ধনতান্ত্রিক উদ্‌যোগের সাথে অগ্রনী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন জৈবিক বা অন্তর্নিহিত সম্পর্ক ছিলনা, এদেশের উদীয়মান বণিক ও শিল্পপতির বেশির ভাগ এসেছেন খুব গোঁড়া সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শ্রেণী—যেমন মারওয়াড়ি, জৈন, ভাটিয়া, চেটিয়ার, খোজা, বোরা ইত্যাদি—থেকে, বাংলাদেশের প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা বা বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণের সামাজিক উদারনীতিবাদীরা এ-ব্যাপারে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, এদেশে শিল্পপুঁজিবাদ না দেখা দেওয়ার জন্যেই পুঁজিবাদী উদ্যোগের মানসিকতার অভাব দেখা গেছে, মানসিকতার অভাব বা অনঅগ্রসরতা তার কারণ নয়।

প্রথম দিককার বহু জাতীয় নেতা শিল্পোদ্যোগের অভাব দূর করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ; কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ; ১৮৫৫-তে দাদাভাই নৌরজী লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কামাদের কারবারে ছিলেন, পরে ১৮৬৯-তে নিজেই 'দাদাভাই নৌরজী অ্যাণ্ড কোম্পানী' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পুনেতে অবস্থিত 'কটন অ্যাণ্ড সিল্ক স্পাইনিং অ্যাণ্ড উইভিং ফ্যাক্টরি', 'মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি,' 'পুনে মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক', 'পুনে ডাইং কোম্পানি', 'রী পেপার মিল' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ও গড়ে-ওঠার ক্ষেত্রে রানাডে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। গোখেল উল্লেখ করেছেন, "বিগত বিশ বছরের মধ্যে পুনের বেশির ভাগ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই রানাডের উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্যে গড়ে উঠেছিল।" ভারতে শিল্প ও কল-কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর যাঁরা উৎসাহ দেখিয়েছেন' তাঁদের

মধ্যে কে. টি. তেলাঙ্গ, ফিরোজ-শা-মেহতা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ঃ ১৮৭০-এর দশকে পূর্বোক্ত দুইজন বোম্বাই-এ একটি সাবানের কারখানা তৈরি করেন। বস্তুত ভারতীয় শিল্পর সঙ্গে ফিরোজ-শা-মেহতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিলকও, অল্প সময়ের জন্য হলেও, শিল্পস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ঃ ১৮৯১-তে তিনি তাঁর দুই বন্ধুর সহায়তায় যৌথ উদ্‌যোগে নিজাম শাসিত অঞ্চল লাটুরে কটন-গিনিং (সুতোর জাল তৈরির) কারখানা স্থাপন করেন। ডি. জি. ওয়াচা ছিলেন মোরারজি গোলক দাস অ্যাণ্ড সোলাপুর মিলস-এর বিশাল কারবারের ম্যানেজিং এজেণ্ট ; বহু বছর তিনি বম্বে মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্যও ছিলেন। উনিশ শতকের কংগ্রেসের আরেকজন প্রভাব-শালী নেতা আর. এন. মুধলকর বেরারে আধুনিক শিল্প বাণিজ্যের পথিকৃৎ ছিলেন। ১৮৮১-৮২ সালে জনকয়েক বন্ধুর সহায়তায় তিনি বেরারের প্রথম যৌথ মূলধনী কারবার বেরার ট্রেডিং কোম্পানি খোলেন, এবং সম্পাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। পরে ১৮৮৬-তে আরও কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে মুধলকর বেরারে প্রথম কাপড় কল স্থাপন করেছিলেন ; অন্য বেশ কয়েকটি সুতাকল ও তেলকলও তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। আরেকজন প্রবীন কংগ্রেস নেতা মদনমোহন মালব্য ১৮৮১-তে এলাহাবাদে খুলেছিলেন দেশী তেজারতিকোম্পানি ; পরে প্রয়াগ সুগার কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতেওতাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লালা লাজপত রাইয়ের মত প্রসিদ্ধ জননেতাও যুক্ত ছিলেন বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। এই ব্যাংকটি ভারতের আদি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি। তাছাড়া লাজপত রাই পাঞ্জাবে সুতাকল ও কাপড়কল প্রতিষ্ঠাতেও প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, অনেক কয়টির বোর্ড অব ডিরেক্টার্স-এর সভ্যও ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা অবশ্য শিল্প ও কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে ততটা উদ্যমী হননি, তাসত্ত্বেও দেখা গেছে, ১৮৮০-তে এ. এম. বোস, দুর্গামোহন দাস ও ভুবনমোহন দাসকে অন্য আরও দুজনের সহায়তায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. এম. বোস, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সম্মানিত সদস্য হয়েছিলেন এবং অন্তত প্রতীকীভাবে হলেও বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী নেতারা শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন পন্থায় মূলধন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। পয়সা ফণ্ড-এর প্রতিষ্ঠা, একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত, এর মূল লক্ষ্য ছিল, কলকারখানা গড়তে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়কে কাজে লাগানো। ১৮৫৬ সালে বাংলাদেশের রানীগঞ্জের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রথম এই ফাণ্ড খোলার প্রস্তাব করলে কয়েকজন নেতা তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৭৩-এ বোম্বাইতে জি. ভি. যোশিও 'পয়সা

ফন্ড' তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে-মাত্র দেড়শ টাকা জমা পড়েছিল। ১৮৯৯-এ তরুণ স্কুল শিক্ষক এ ডি. কালে-র দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়; তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তহবিল তৈরির কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বাৎসরিক এক পয়সা করে চাঁদা নেওয়া হত, লক্ষ্য ছিল দেশে আধুনিক শিল্প গড়ে তোলা। এই প্রচেষ্টায় তিলক ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য নেতারা সমর্থন যুগিয়েছিলেন। কালে-র উৎসাহ ও পরিশ্রম অল্পদিনের মধ্যেই ফলপ্রসূ হয়। ১৯০৮ সালে এই পয়সা ফন্ডের সহায়তায় মহারাষ্ট্রের তেলেগাঁও অঞ্চলে একটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র সমেত কাঁচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতীয় নেতারা বিভিন্ন শিল্প-সমিতিও গড়ে তুলেছিলেন, আলোচনা-সভা, শিল্পমেলা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করতেন: তাঁদের লক্ষ্য ছিল দেশে শিল্প ও যন্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনচেতনা তৈরি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে উৎসাহ জাগিয়ে তোলা, শিল্প-প্রযুক্তির বিস্তারে ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ ও উৎসাহ সৃষ্টি, উন্নততর প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চার, এবং বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের সম্ভাবনা ও সুযোগ বিষয়ে সচেতন করে তোলা। রাণাডেকেই বলা যেতে পারে এই বিষয়ে প্রথম উদ্‌যোগী পুরুষ। তিনি ছিলেন ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম ভারতের শিল্পসমিতির অন্যতম সংগঠক। ঐ ১৮৯০ সালেই পুনায় অনুষ্ঠিত শিল্প-বিষয়ক সম্মেলনেরও অন্যতম সংগঠক ছিলেন রাণাডে। তার আগে একটি শিল্প-মেলাও সংগঠিত করেছিলেন। আর এই সব ব্যাপারেই রাণাডে সাহায্য পেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের জি. ভি. যোশি, এম. বি নামযোশি প্রমুখের কাছ থেকে। শিল্প-বিষয়ক সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয় ১৮৯০ সাল থেকে; তারপর বহু বছর এই অধিবেশন বসেছে। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও শিল্প-বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এই সম্মেলনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। রাণাডে এবং যোশির প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর অনেক কয়টিই এই সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণ। পুনার শিল্প সম্মেলনের অনুকরণে কলকাতাতেও ১৮৯৯-এর অক্টোবরে একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সভা বিশেষ কোন সাড়া তুলতে পারেনি। তুলনায় শিল্পমেলাগুলি অনেক বেশি সফল হয়েছিল। প্রথম মেলা বসে ১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে শ্রী জে. এন. চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজনের উৎসাহে। বহরে ছোট-খাটো এই মেলা ছিল প্রায় একক প্রচেষ্টার ফল। পরবর্তী কয়েক বছর কংগ্রেস অধিবেশনে এই ধরনের মেলা আর হয়নি। ১৯০০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ষোড়শ অধিবেশনে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে স্থির করে যে অধিবেশন চলাকালীন অন্তত একটি দিনের অর্ধেক সময় ব্যয় করা হবে শিল্প-প্রযুক্তিগত সমস্যা ও আন্দোলন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য, এবং সেজন্য একটি শিল্প-বিষয়ক কমিটিও তৈরি হল। এই কমিটির চিন্তাভাবনা অনুযায়ী ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের

অংশ হিসেবেই অনুষ্ঠিত হল একটি শিল্পমেলা। এরপর থেকেই শিল্পমেলা কংগ্রেস অধিবেশনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় নেতাদের মতে, ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কঠিন বাধা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অবাধ বাণিজ্য-নীতি, কেননা এই নীতির জন্য দেশীয় ক্ষুদ্র ও অনুন্নত কলকারখানাকে পশ্চিমের উন্নত ও সংগঠিত শিল্পের সঙ্গে এক অসম ও অন্যায় প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। তাঁদের এই অভিমতের এবং সরকারী অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিশদ বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে করা হবে।

টীকা

১। ১৯০১-এর কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেসের অভিমত ছিল, ভারতীয় জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার অন্যতম কারণ দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমাবনতি (প্রস্তাব III)। ১৮৮৫ সালে যোশি লিখেছিলেন, আমাদের জনগণের দুর্বিষহ অবস্থার মূল কারণ দেশীয় শিল্পোৎপাদনের দ্রুত অবক্ষয় বা ধ্বংসসাধন। আর. এন. মুধলকার ১৮১৬ সালে কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলেন, আমাদের দেশের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের জন্য দায়ী আমাদের প্রাচীন শিল্প ও বাণিজ্যের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ বা ধ্বংস-সাধন। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৬-এ লিখেছেন, নতুন ধরনের শিল্প ও যন্ত্রের বিকাশ যতটুকু উন্নতি ঘটাতে পেরেছে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতি সাধন করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা দেশের যদি হাজার ভাগ উপকার করে থাকে, ক্ষতি করেছে লক্ষ লক্ষ গুণ।

২। রমেশচন্দ্র দত্ত বা অন্যান্য অনেকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে রাণাডে লিখেছেন, "ভারতবর্ষও অন্য অনেক প্রাচীন জাতির মত প্রায় সম্পূর্ণতই কৃষি নির্ভর ছিল, ব্রিটিশ শাসনে এই নির্ভরতা আরও অনেক বেড়েছে।"

৩। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "প্রায় দেড়শ বছরের ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যনীতি ভারতীয় উৎপাদকদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয় নি, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ইংরেজ উৎপাদকের মুখ চেয়ে"।

৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের স্থির ও অবিচল নীতি হয়ে দাঁড়াল এই দেশটাকে কাঁচামাল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, যার সাহায্যে শিল্পোৎপাদনে ইংল্যান্ডের আধিপত্য বজায় রাখা যায়।

৫। ১৮৩১ সালে "১১৭ জন সম্মানীয় দেশীয় ব্যক্তি" প্রিভি কৌন্সিলের কাছে একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে " 'বিনা শুল্কে' অথবা বাংলায় যে দরে ইংরেজদের শিল্পজাত বস্ত্রাদি বিক্রি হচ্ছিল সেই দরে, বাংলার সুতি বস্ত্র এবং রেশম বস্ত্র ইংলন্ডের বাজারে বিক্রির" অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন।

৬। ডি, এস. আয়ার এই কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে : ভারতের সম্পদ "নিয়ে যাওয়ার ফলে ইংলন্ডে একটি পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাদের হাতে ভারতীয় অর্থ পুঞ্জিভূত হয়েছে। এই অর্থের দৌলতেই ঐ শ্রেণীটির বাণিজ্যিক ক্ষমতা

বেড়েছে, তাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ নতুন সচলতা পেয়েছে। ...উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ভারতবর্ষ ও আয়ার্ল্যান্ডকে শোষণ করে এইভাবেই ইংলন্ডের বৈভব গড়ে উঠেছিল।"

৭। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্র দত্তের মন্তব্যঃ "মূলধন যে বিপুল পরিমাণে সুফলদায়ী তা অনস্বীকার্য। তদসত্ত্বেও এটা সত্য যে, একজন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল হয় যখন সে নিজের জমিতে চাষ করে কিংবা নিজের তাঁতে কাপড় বোনে, কারণ তখনই তার মর্যাদা, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায়।··· প্রত্যেকটি ভারতবাসী এই আশা পোষণ করে যে···ধনতন্ত্রের অভিঘাত সত্ত্বেও তার কুটির শিল্প অন্তত আংশিকভাবে বেঁচে থাকবে।"

৮। "একটি দেশ সভ্যতায় কতটা উন্নত তা পরিমাপ করা যায় সেই দেশের মানুষের বাস্তব উদ্যোগ, পেশার সংখ্যা ও পরিমাণ, শিল্প, অন্যান্য কর্মকাণ্ড, দক্ষতা, উচ্চাশা এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা কতটা উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারছে তার দ্বারা। শিল্প ও উৎপাদনশীলতায় একটি দেশ অপর দেশ থেকে কতটা উন্নত তার দ্বারা প্রগতির পরিমাপ করা যায়।" (দা এক্সিজেন্সিজ অব প্রোগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া", JPSS, এপ্রিল ১৮৯৬ পৃঃ ৬)

৯। 'বেঙ্গলী' পত্রিকা এ-ব্যাপারে আরও এগিয়ে গিয়ে ১৯০০ সালে একটি সংখ্যায় এই মত ব্যক্ত করেছিল যে "দেশপ্রেমের একটি প্রধান গুণই হ'ল তা বাণিজ্যিক মেজাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে।"

১০। 'ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্টে' (১৯১৬-১৮; পৃঃ ২) এই মত দেখা যায়। যিনি নিজেকে ভারতে শিল্পায়নের প্রধানতম সমর্থক বলে দাবি করতেন সেই লর্ড কার্জনও ১৯০৩ সালে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন—"এদের (ভারতবাসীর) বিপুলতম অংশই কৃষি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং দৈহিক দিক থেকে কৃষিকাজেরই যোগ্য, এরা কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কিছু কখনই করবে না" (বক্তৃতাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩)। ভোলানাথ চন্দ্র (MM ২য় খণ্ড, পৃ ৫৫৭), কে, টি তেলাঙ্গ (ফ্রি ট্রেড এন্ড প্রোটেকশন, পৃঃ ৩৪-৩৫), যোশি (পৃঃ ৪৬), রাণাডে (প্রবন্ধাবলী) প্রমুখ এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন।

১১। "বর্তমানে প্রচলিত কারিগরি শিক্ষা অসন্তোষজনক ও যথেষ্ট নয়", এই সুদৃঢ় ধারণাটি ১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনে নথিভুক্ত হয়েছিল; ১৮৯৯, ১৯০০ ও ১৯০১ সালের যথাক্রমে ষোলো, আঠারো ও উনিশ নম্বর প্রস্তাবে এই ধারণারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

১২। প্রস্তাব XVI। ১৯০০ সালে একই ধরনের আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তার আগে, ১৮৯৮ সালে, এ, এম, বোস টাটাকে "স্বদেশের প্রকৃত বন্ধু" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

১৩। ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে "ক্যালকাটা রিভিউ"-এ প্রকাশিত "টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া" নামে একটি প্রবন্ধে হ্যাভেল কারিগরি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষার দাবির বিরোধিতা করেছিলেন।

৩

শিল্প : ২

১. বিদেশী পুঁজির ভূমিকা :

পুঁজির স্বল্পতা এবং উৎপাদনের নতুন আঙ্গিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধা ও ও অনুৎসাহ ভারতের শিল্পবিকাশের সম্ভাবনাকে সীমিত করেছিল। অন্যদিকে, একই সময় ব্রিটিশ মূলধন স্বদেশে ব্যবহৃত হওয়ার পরও প্রচুর উদ্‌বৃত্ত হয়ে পড়েছিল, এবং সেজন্য অন্য দেশে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজ শাসকরা প্রচার করতে লাগল যে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার ও এদেশে শিল্পের বিকাশের জন্য, উদ্‌বৃত্ত ব্রিটিশ পুঁজি এদেশে লগ্নি করা প্রয়োজন। উভয় দেশের শাসককুলই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, ব্রিটিশ মূলধন আমদানি ও বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকগুলিকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই ভারতীয় অর্থনীতির দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠা যাবে, এবং ব্রিটেনের উদ্‌বৃত্ত মূলধনও সবচেয়ে লাভজনক অথচ নিরাপদ ব্যবহারের সুযোগ পাবে।[১]

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিদেশী মূলধনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিল বলেই অব্যাহত গতিতে ঐ মূলধন এদেশে লগ্নি করা সম্ভব হয়েছিল। এবং এইভাবে, দেশীয় পুঁজি ও উদ্যোগের অভাবের সুযোগ নিয়ে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এদেশের শিল্পবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবেই এদেশে প্রকৃত ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগের প্রাথমিক হার ছিল তুলনায় খুবই কম। ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর প্রধানত এদেশের অর্থ ও এদেশ থেকে সংগৃহীত ঋণের সাহায্যেই শিল্প গড়ে তুলতে উদযোগী হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নতুন ধরণের বাণিজ্য, ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও খেত-খামার সবই গড়ে উঠেছিল ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারিদের সঞ্চিত অর্থ লগ্নি করে—"লগ্নিকৃত মূলধন ছিল মূলত এদেশেরই রাজস্ব ও লুটের অংশ, তার পুনর্বিনিয়োগ হয়েছিল, এর মধ্যে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ মূলধন ছিল না" (লেল্যান্ড হ্যামিলটন জেঙ্কস : দ্য মাইগ্রেসন অব ব্রিটিশ ক্যাপিটাল টু এইটিন সেভেনটি ফাইভ)। ১৮৫৭ সালের পর থেকে প্রকৃত ব্রিটিশ মূলধন আসতে শুরু করে, এবং বেশ ভালো পরিমাণেই। ১৮৫৪

থেকে ১৮৫৯-এর মধ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক—প্রায় দেড়শ পাউন্ড। দুর্ভাগ্যবশত, উনিশ শতকে ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ পুঁজির মোট পরিমাণের নির্ভরযোগ্য হিসেব পাওয়া যায় না। এদেশে লগ্নিকৃত বিদেশী পুঁজির একটা বড় অংশ এসেছিল অন্যদেশে নিবন্ধিত কিছু যৌথ-মূলধনী কারবারের মাধ্যমে; ঐসব কারবার এদেশে পুরোপুরি অথবা অংশত ব্যবসায় লিপ্ত থাকত, সেজন্য এদের পুঁজির সঠিক পরিমাণ হিসেব করা সম্ভব ছিল না। তবে, ১৯০৯ থেকে ১৯১১-এর মধ্যে প্রকাশিত তিনটি হিসেব থেকে ঐ সময়ে বিদেশী পুঁজির মোট পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ১৯০৯ সালে "ইকনমিস্ট" পত্রিকায় একজন লেখক হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, তখন এদেশে বিনিযুক্ত ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। ১৯১০ সালে স্যর জন পেইশ-কৃত অন্য একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯০৯ সালের মধ্যে ভারতে ও সিংহলে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউন্ড। ১৯১১ সালে এম, এফ, হাওয়ার্ডস হিসেব করেছিলেন, ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড। এসব হিসেব কতটা সঠিক সে বিচার বাদ দিলেও, এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে, এই সময়ে এদেশে বিদেশী পুঁজি লগ্নির পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খুঁটিয়ে বিচার করলে, ভারতে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে ভারতীয় জননেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল, সেটা বুঝতে হ'লে এই বৈশিষ্টগুলির কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, ১৮৭০-এর পরে এই পুঁজির জন্য বিদেশে যে-পরিমাণ বাৎসরিক সুদ প্রেরিত হয়েছে তা বাৎসরিক নতুন মূলধনের আমদানিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এর অর্থ: উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছর গ্রেট ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ থেকেই নীট মূলধন সংগ্রহ করেছিল। অন্যভাবে বললে, ব্রিটেন ভারতে লগ্নিকৃত পুঁজির লভ্যাংশ থেকেই নতুন পুঁজি সরবরাহ করেছে, এমনকি ঐ লাভের খানিকটা অংশ অন্যান্য দেশেও বিনিয়োগ করেছে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ পুঁজির মালিকেরা যেমন ভারতবর্ষে তাদের উদবৃত্ত মূলধন লগ্নি করতে চেয়েছে তেমনি ব্রিটিশ শিল্পপতিরা চেয়েছে এদেশের বাজারকে তাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রির এক-চেটিয়া বাজারে পরিণত করতে। ব্রিটেনে শিল্পপতিরা বেশি ক্ষমতাবান হওয়ায় ভারত সরকার বাধ্য হয়েছে এদেশের শিল্পায়ণের ব্যাপারে অনুৎসাহের—কখনও বিরুদ্ধতার—নীতি অবলম্বন করতে। এর ফলে বিদেশী পুঁজি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মুখ্যত সরকারী ঋণ, রেলব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, খনি কিংবা শিল্পগুলিতে, যাতে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়নি, উপরন্তু তারা ভারতের বাজারকে পুরোপুরি গ্রাস করার সুযোগ পেয়েছে। স্যার জর্জ পেইশের মতে, ১৯০৯ সালে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ পাউন্ড ব্রিটিশ

পুঁজির মধ্যে ২৫ লক্ষ পাউন্ড লগ্নি করা হয়েছিল বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে. এর মধ্যে শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল তুলনায় কম। তৃতীয়ত, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ খুবই নগন্য হলেও ভারতের শিল্প বিকাশের এই পর্যায়ে এই পুঁজির কর্তৃত্বই ছিল সর্বব্যাপী। বেশিরভাগ দেশীয় পুঁজি এর কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পাটকল, পশম ও রেশম শিল্প, কাগজের কল, চিনি কল, চামড়ার কারখানা এবং লোহা ও পিতলের ঢালাই কারখানা ছিল বিদেশী মালিকানাধীন। কেবলমাত্র সুতিবস্ত্র শিল্পের এক বড় অংশে শুরু থেকেই ভারতীয়দের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু, এমনকি এই শিল্পেরও মূলধনের একাংশ ছিল বিদেশী, তদুপরি সংগঠনিক ব্যবস্থাপনাও অধিকাংশই ছিল বিদেশীদের হাতে, এবং কারিগররা আসত বিদেশ থেকে।

বহুকাল ধরেই বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্থ ও বহুধাবিভক্ত। প্রথম দিকে বিদেশী পুঁজি নিয়োগ করে রেল, খনি, খাল, বাগিচা ও আধুনিক যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠছিল। তখন কেউ বিদেশী পুঁজি আমদানির বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু ভারতীয়দের মালিকানাতে কিছু শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করার পর বিদেশী আধিপত্যের ফলাফল সম্পর্কে ভারতীয়রা সচেতন হতে থাকে। তখন থেকে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে সমালোচনা দেখা দিতে লাগল। উনিশ শতকের শেষ দিকে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী গোষ্ঠী বিদেশী পুঁজি ব্যবহারের পক্ষপাতী হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল চরম বিরোধী।[২] জাতীয় মনোভাবের এই পরিবর্তন খুব চমৎকার ধরা পড়ে দাদাভাই নওরোজির চিন্তা ভাবনা বিশ্লেষণ করলে। গোড়ার দিকে নওরোজি ছিলেন বিদেশী পুঁজির গোঁড়া সমর্থক, কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনিই হয়ে উঠলেন একজন চরম সমালোচক![৩] এই প্রসঙ্গে, লক্ষণীয় যে, যে সব ভারতীয় নেতা সাধারণভাবে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন, অন্যদিকে যারা বিদেশী পুঁজির বিরোধী ছিলেন তারাও এর কিছু কিছু সুফলের উল্লেখ করেছেন। এই জটিল, এবং কখনও কখনও দুমুখো, দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য জাতীয় নেতাদের চিন্তাভাবনাকে অনেক সময় অসঙ্গতিপূর্ণ, এমনকি অযৌক্তিকও মনে হয়। তবে, ১৯০৫ সালের মধ্যেই ভারতে বিদেশী পুঁজির তদানিন্তন ও ভবিষ্যত ভূমিকা সম্পর্কে এঁদের ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

যে সব ভারতীয় নেতা বিদেশী পুঁজির ব্যবহার সমর্থন করেছেন তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে—ভারত একটি গরীব দেশ, এখানে নতুন শিল্প ও কল-কারখানা নির্মাণের জন্য পুঁজি সংস্থান দুরূহ, সেজন্য প্রয়োজন বিদেশী মূলধনের, যার দ্বারা এদেশের শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এবং ফলত ভারতীয়

জনগণের বৈষয়িক সমৃদ্ধি গড়ে তোলা যাবে।[8] ১৯০৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ঃ "ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা করা একান্তই মূর্খতা, তা আত্মহত্যার সামিল হবে"। ঐ নিবন্ধে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্য সংস্থা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে অনুপ্রেরিত করবে। এরা শিক্ষকের ভূমিকা নেবে, এটাই ছিল প্রত্যাশা। স্বভাবতই জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের ভারতে মূলধন লগ্নি করতে উৎসাহিত করাই উচিত হবে। সুদ বা লভ্যাংশ তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রকাশ করা অকর্তব্য নয়, কারণ এই অর্থ প্রদান সম্ভব হচ্ছে তাদের দৌলতে সম্পদ তৈরি হয়েছে বলেই।

অবশ্য ভারতীয় নেতাদের অধিকাংশই বিদেশী মূলধন ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন; এর কুফলের থেকে সুফল অনেক বেশি—এই বক্তব্য তারা মানতে রাজি হননি। এঁদের যুক্তির প্রাথমিক বিন্যাসটা ছিল এরকম ঃ শিল্পায়ন বা দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য যে রেলব্যবস্থা, খালখনন, খনি, কলকারখানা বা চাষবাসের আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না, কোন পরিস্থিতিতে এসব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে এবং কারা তাতে উপকৃত হচ্ছে তা দেখতে হবে। যেহেতু ভারতের সম্পদ-বৃদ্ধি ঘটেছিল বিদেশীদের উদ্যোগে, সেজন্য এর ফলে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেছে তা তারাই ভোগ করেছে, বাড়তি সম্পদও তারাই আত্মসাৎ করেছে।[৫] অতএব একথা বলা যায় না যে বিদেশী পুঁজি এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে অথবা এদেশের মানুষের অবস্থার উন্নতি করেছে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে শুধু কিছু কিছু আপাতিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেছে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, বৈদেশিক পুঁজি গোটা ভারতের মানুষকে "ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাঠ কাটার জন্য কাঠুরে, আর জল বয়ে আনার জন্য ভারীতে" পরিণত করেছে; "শ্বেত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় জনগণ হয়ে পড়েছে নিতান্তই এক কুলির জাত"। বিদেশী পুঁজির আশ্রয়ে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কোন উন্নতি তো হয়ই নি, বরং ভারতবর্ষ 'লুণ্ঠিত ও শোষিত' হয়েছে। সম্পদ বৃদ্ধি তো দূরের কথা, ভারতবাসীর দুঃখ-দৈন্যের ব্যাপকতার জন্য দায়ী এই পুঁজির ব্যবহার : তা আরও সম্প্রসারিত হলে দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এবং "আমাদের দেশকে চিরকালের জন্য ব্রিটিশ পুঁজির উপর নির্ভরশীল করে তুলবে"। অর্থাৎ এই নেতৃবর্গের মতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ শুধু তদানীন্তন ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতির পক্ষেই বিপদজনক ছিল না, তা পরবর্তী প্রজন্মকেও বিপদের মুখে ঠেলে দেবে[৬] এবং সে কারণেই একে প্রতিরোধ করা সমূহ কর্তব্য। এই বক্তব্য বিপিন চন্দ্র পাল খুব সুন্দর ভাবে উপস্থিত করেছিলেন—

"বিদেশী, মুখ্যত ব্রিটিশ, পুঁজির সাহায্যে দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর এই প্রচেষ্টা আমাদের উপকার তো করছেই না বরং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত উন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে বৈদেশিক পুঁজির শোষণ একই সঙ্গে দেশের সরকার ও জনগণকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ……বিপদ যতটা অর্থনৈতিক ততটাই রাজনৈতিক। 'নবভারতের' ভবিষ্যত সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এই দ্বিমুখী সমস্যার দ্রুত ও চূড়ান্ত সমাধানের উপর'' ।[৭]

প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশী পুঁজির বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে একমাত্র ভারতীয় শিল্পপতিরা শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে তবেই দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারবে ; বিদেশী শিল্পমালিকদের পক্ষে কখনই তা করা সম্ভব নয়। ১৯০১ সালে জি.এস আয়ার বলেছিলেন, ''আমি আধুনিক বা প্রাচীনকালের এমন কোনও দেশের দৃষ্টান্ত জানিনা, যেখানে শাসক-জাতিভুক্ত বলে সব ধরণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এমন একদল বিদেশী শিল্পপতি তাদের শাসিত অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করেছে।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, আমাদের জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশীয় কাঁচামালকে শিল্পোৎপাদনের কাজে-লাগানোর যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলতে পারলে, তবেই দেশে অকৃষিজাত সম্পদ গড়ে তোলা যাবে।''[৮]

বিদেশী পুঁজির বিরোধীদের মতে, মূলত বিজাতীয় বৈদেশিক পুঁজি ভারতীয় মূলধন গঠনে সাহায্য করেনি, বরং বাধা দিয়েছে, এবং দেশীয় পুঁজিকে সরিয়ে ব্রিটিশ পুঁজির জন্য জায়গা করে দিয়েছে। এমনকি ব্যাঙ্কব্যবস্থার মতন ক্ষেত্রে, যেখানে বিদেশী প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল না এবং ভারতীয়দের "স্বাভাবিক সফলতা অর্জনের" সুযোগ ছিল, সেখান থেকেও বিদেশী উদ্যোক্তারা ভারতীয় উদ্যোক্তাদের বিতাড়ন করেছে। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা সর্বক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজির বাধার সম্মুখীন হয়েছে। একসময় বিদেশ থেকে অবাধে আমদানি-কৃত পণ্য যেমন ভারতের শহুরে শিল্পকে ধ্বংস করেছিল, তেমনই বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পসংগঠন ধ্বংস করেছে ভারতের গ্রামীণ হস্তশিল্পকে। বিদেশী উৎপাদকরা এদেশের সুলভ শ্রমকে কাজে লাগাতে পেরেছিল বলে এটা আরও মারাত্মক হয়েছে। কারও কারও হয়তো মনে হয়ছে—এতে ক্ষতি কী?—বিদেশী পুঁজিপতিরা তো অব্যবহৃত দেশীয় সম্পদকেই কাজে লাগাচ্ছেন।—এর উত্তরে, সমালোচকরা বললেন, ক্ষতি কী তা বুঝতে পারবে পরবর্তী প্রজন্ম। বহু বছর পর যখন ভারতীয়রা মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করতে সমর্থ হবে তখন তারা দেখবে যে বেশির ভাগ শিল্পের ক্ষেত্রেই দ্বার অবরুদ্ধ, বহু আগে থেকেই বিদেশী শিল্পপতিরা অন্যায়

ভাবে সে সব জায়গা দখল করে বসে আছে, নতুন কোন সুযোগ নেই। সেজন্য, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সমর্থন করলে তা বর্তমানে সামান্য সুবিধা পাওয়ার জন্য ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেওয়া হবে, যেটা কখনই হতে দেওয়া উচিত নয়। শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিকে বিকিয়ে দেওয়ার এবং জাতির ভবিষ্যত ও সর্বকালীন স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার অধিকার কোনোও ভারতীয়ের, এমনকি বর্তমান প্রজন্মেরও, নেই। লর্ড কার্জন মন্তব্য করেছিলেন, "গোটা শিল্প ও বাণিজ্য জগতের নিয়মই এই যে, যে চাষ করবে জমি তার; কেউ যদি জমিতে উপস্থিত থেকেও নিজের কোদাল দিয়ে চাষ না করে, তাহলে বাইরে থেকে কেউ লাঙ্গল নিয়ে এসে চাষ করতে চাইলে তার বাধা দেওয়ার কোন অধিকার থাকে না।" সমালোচকরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে জানালেন, ভারতের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্র অধিকৃত থাক আর না থাক. তা একান্ত ভারতীয়দেরই, অন্য কারোর সম্পত্তি নয়। উল্টে তাঁরা কার্জনকে প্রশ্ন করলেন—

"ভাইসরয়ের যুক্তি ঠিক বলে মেনে নিলে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, আমেরিকায় চীনাদের বিরুদ্ধে, ইংল্যান্ডে মার্কিনী পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, কিংবা যে সব পণ্যে ব্রিটিশদের একচেটিয়া অধিকার ছিল সে সব পণ্য সস্তাদরে আমদানির বিরুদ্ধে সোরগোলের কারণ কী? বর্মার তেলের খনিগুলিতে মার্কিনী তেল কোম্পানীকে ঢুকতে দিতে তো লর্ড কার্জনই আপত্তি জানিয়েছেন। কেন?—সেই একই কারনে কি আমরাও বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি না?"

বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধবাদীরা কখনই এটা মেনে নেননি যে মূলধনের সাহায্য ছাড়া শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁরা এটাও মানতে রাজি হননি যে, হয় বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করতে হবে নইলে কোনও মূলধনই তৈরি হবে না—ভারত এমন কোনো উভয়-সংকটের সম্মুখীন। আসলে সমস্যাটা বিদেশী কিংবা দেশীয় পুঁজি বেছে নেওয়ার সমস্যা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিলম্বের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। তাসত্ত্বেও বিদেশী পুঁজির ব্যবহার সমর্থনীয় মনে হয় নি, কেননা তার ফলে ভারতীয়দের নিজস্ব মূলধন গড়ে তোলার সম্ভাবনা নষ্ট হবে, কিংবা অন্তত আরও বিলম্বিত হবে।

বিরুদ্ধবাদীদের আরেকটি যুক্তি ছিল। বিদেশী শিল্পপতিরা শুধু মূলধনের সুদই নয়, পুরো মুনাফাই ভারতের বাহিরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ফলে এদেশের সম্পদ নিষ্কাষিত হচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড বা অন্য সব স্বাধীন রাষ্ট্রে বিদেশী মূলধন অর্থনৈতিক দিক থেকে জনসাধারণ বা জাতির পক্ষে লাভজনক হতে পেরেছিল, কারণ তাদের শুধু মূলধনের সুদ দিতে হয়েছে[৯]; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় বিদেশী মূলধন ব্যবহারের কোনো সুবিধাই ভারতবাসী পায়নি, বরং অসুবিধাগুলিকেই ভোগ

করতে হয়েছে। এঁদের মতে ভারতের পরিস্থিতির কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন—

প্রথমত, ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় বিদেশী পুঁজি আমদানি করেনি, বিদেশী শাসকেরা তা চাপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিপুল করের বোঝা আর সম্পদ-নিষ্কাসন দেশীয় মূলধন গঠনকে ব্যাহত করেছে, কেননা জনসাধারণের হাতে সঞ্চয় করার মত অর্থ অবশিষ্ট থাকে নি। মূলধনের স্বল্পতার জন্য ভারতীয়রা নতুন শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে পারেনি, আর সেই সুযোগে বিদেশী শিল্পপতিরা জাঁকিয়ে বসেছিল। গোটা প্রক্রিয়াটায় প্রথমে ভারতীয় শিল্পসংগঠকদের দুর্বল করে দেওয়া হয়, তারপর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা বলে বিদেশী পুঁজি চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই বিদেশী পুঁজি এদেশে দেশীয় পুঁজিকে সাহায্য করতে আসেনি, বরং বাধা দিতে এসেছে। এদেশের উন্নতি তার লক্ষ্য ছিল না, তার অভীষ্ট ছিল প্রভুত্ব-স্থাপন ; তা ভারতের সম্পদের বিকাশ চায়নি, চেয়েছে ঐ সম্পদ লুঠ করতে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী মূলধন ভারতীয় মূলধনকে সরিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তার কারণ এই নয় যে, ঐ বিদেশী মূলধন অর্থনৈতিক ভাবে বেশি দক্ষ ছিল কিংবা ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ-বিমুখ ছিল। আসল কারণ, এদেশের ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতে বিদেশী মূলধনকে সাদরে নিয়ে এসেছে এবং নানা ভাবে উৎসাহিত করেছে। যেমন, তারা বিদেশী মূলধনের মুনাফা সুনিশ্চিত করেছে, সস্তায় অথবা বিনামূল্যে জমি দিয়েছে, এবং প্রশাসনিক ও আইনগত বিধিব্যবস্থার দ্বারা ঐ মূলধনের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। অন্যদিকে, দেশীয় পুঁজিপতিদের সর্বস্তরেই নিরুৎসাহ করা হয়েছে, কোনরকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি, নিজের পথ নিজেকে দেখে নিতে বলা হয়েছে। কাজেই দেশীয় ও বিদেশী পুঁজির মধ্যে ন্যায়-সংগত বা সমপ্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল না, বিদেশী পুঁজিপতিরা অন্যায় ভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল।

তৃতীয়ত, অন্যান্য দেশে বিদেশী মূলধনের দোষত্রুটি কিছুটা ঢাকা পড়েছে এই কারণে যে, বিদেশী মূলধনের আমদানি এ সব দেশে দেশীয় মূলধনের স্বল্পতা-জনিত অসুবিধে দূর করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী পুঁজি মানে বিদেশ থেকে অর্থ বা মূলধন আসেনি, এখানে বিদেশী মূলধন প্রকৃত অর্থে বিদেশী মূলধন ছিল না, এটা ছিল কৃত্রিম মূলধন প্রবাহ। ভারতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের নিজেদের দেশের সম্পদকে এদেশে এনে বিনিয়োগ করেনি ; বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং প্রশাসনের ব্যয়ের নামে নিষ্কাশিত ভারতের সম্পদেরই একটা অংশ এদেশে মূলধন আকারে ফিরে এসেছে। জাতীয় আয়ের দিক থেকে দেখলে

সমস্ত দেওয়া-নেওয়াটাই শুধু কাগজপত্রের হিসেব।[১০] ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে যে মূলধন প্রকৃতই আসেনি তা স্পষ্ট বোঝা যায় বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের হিসেব দেখলে। ১৮৮৭ সালেই দাদাভাই নৌরজী দেখিয়েছিলেন, সমস্ত বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করতে ভারতে যে পরিমাণ নীট আমদানী হয়েছে তার চাইতে নীট রপ্তানির পরিমাণ ছিল বেশি। কাজেই ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ছিল অসাধারণ—নিজের সম্পদের দ্বারা সে নিজেই শোষিত হচ্ছিল। এজন্যই লর্ড কার্জনের বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জি. এস. আয়ার বলেছিলেন, "অতীতে ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ মদত ও সহযোগিতা যদি ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপনে সহায়ক হয়ে থাকে, বর্তমানেও তেমনি ভারতবাসী তার নিজের অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘটাতে নিজেরাই সহযোগিতা করছে।"

মজার ব্যাপার হ'ল, আমাদের দেশের সম্পদকে নিষ্কাশন করে সেই সম্পদকেই বিদেশী মূলধনরূপে এদেশে পুনর্বিনিয়োগ করার এই ঘটনা ভারতীয় নেতাদের অনেককেই বিমূঢ় করেছিল, ফলে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য অনেক সময় অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। একদিকে তাঁরা বিদেশী বিনিয়োগ থেকে পাওয়া মুনাফা রপ্তানির বিরুদ্ধে বলেছেন, অন্যদিকে এই লভ্যাংশ পুনর্বিনিয়োগেরও বিরোধিতা করেছেন, কারণ তার ফলে আরও বেশি মুনাফার আকারে তা ভবিষ্যতে এদেশের সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। এই অসঙ্গতি চিন্তাগত ভ্রান্তির ফল নয়; ভারতের অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত ছিল এর কারণ। ভারতীয় নেতারা সঠিকভাবেই এই অসঙ্গতিপূর্ণ জটিল অবস্থাটিকে ধরতে পেরেছিলেন, সেজন্য বিদেশী পুঁজি-সৃষ্ট মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের ফলে "ক্রমবর্ধমান সম্পদ নিষ্কাশনের" অন্তহীন প্রবাহ গড়ে ওঠার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৮৮৭ সালে নৌরজী লিখেছিলেন: "প্রথমে ব্রিটিশ ভারতের নিজস্ব সম্পদ বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার পর সে-সম্পদ আবার দেশে ফিরে আসছে ঋণের আকারে, সেই ঋণের সুদ দিতে আরও বেশি সম্পদ চালান করতে হবে—সমস্ত ব্যাপারটা এক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করেছে।'[১১] সমস্যার এই দ্বান্দ্বিকতার জন্য তাঁদের মতামতও দ্বান্দ্বিক চরিত্র নিয়েছিল। তাঁরা দেখলেন, এটা আসলে দুটো সমস্যার অর্থাৎ পুঁজিসৃষ্ট মুনাফা রপ্তানি বা সেই মুনাফার পুনর্বিনিয়োগের মধ্যে যেকোন একটিকে বেছে নেওয়ার সমস্যা নয়। সমস্যা হল: দুষ্টচক্রটিকে অব্যাহত থাকতে দেওয়া হবে, নাকি সম্পদ নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ করে শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলত দেশীয় পুঁজির উপর নির্ভর করা হবে? দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করলে উভয় দুষ্টের হাত থেকেই পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতীয় নেতারা এও দেখিয়েছিলেন যে বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করে এদেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে যেটুকু সুবিধে পাওয়া যাচ্ছিল, তাও ছিল অত্যন্ত

সীমাবদ্ধ। এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বিদেশী পুঁজি ব্যবহার অতি অল্পসংখ্যক বাড়তি কর্মনিয়োগের সংস্থান করতে পেরেছে। জাতীয় মজুরি তহবিলের বৃদ্ধিও ঘটেছে খুব সামান্যই। তাও আবার সিংহভাগ চলে গেছে বিদেশীদের খর্পরে, কেননা সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই তৈরির সময় এবং চালু হবার পরেও উচ্চবেতনসম্পন্ন প্রশাসনিক পদ সবই বিদেশীদের দখলে ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই চিত্র দেখা গেছে। এর ফলে, ভারতীয়রা চাকরি পাবার এবং ভোগব্যয় বাড়ানোর ন্যায্য অধিকার থেকেই শুধু বঞ্চিত হচ্ছিল না, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও দূরপ্রসারী কুফল দেখা যাচ্ছিল। এদেশে কর্মরত বেশিরভাগ বিদেশীই তাদের বেতনের বৃহদাংশ পাঠিয়ে দিত নিজ দেশে, যার ফলে ভারতবর্ষ মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হারাচ্ছিল। উপরন্তু, ভারতীয়রা শিল্পগত কলাকৌশল, বাণিজ্য সংগঠনের প্রশাসনিক বিদ্যা ও উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ হারাচ্ছিল, অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির একটি বহু কথিত সুফল থেকে ভারতীয়রা বাস্তবে বঞ্চিত হচ্ছিল। 'হিন্দু' পত্রিকায় তাই আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল—"শিল্পে কর্মনিয়োগের সুযোগ বাড়লে যে জ্ঞান ও শিক্ষালাভের সুযোগ আসে তাও আমরা হারিয়েছি।" কিছু কিছু নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হল, কিন্তু ভারতে নয় ইংল্যাণ্ডে, ইংরেজ পুঁজিপতিদের বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করার সুবাদে। সমালোচকরা অভিযোগ করলেন, বিদেশী-অধ্যুষিত বাগিচা, খনি, কারখানা বা রেলওয়ে শিল্পে যেসব ভারতীয় কুলি-মজুর বা অন্যান্য অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করত, তাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম, দিনে মাত্র এক আনা বা বড় জোর দু-আনা, তা দিয়ে অতি নিম্নমানের প্রাত্যহিক জীবন-নির্বাহও ছিল অসম্ভব। এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের ফলে ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ মানুষ যোশি কথিত "মৃতপ্রায় শ্রমজীবী জনতায়" পরিণত হয়েছিল; ভারতবর্ষ পর্যবসিত হয়েছিল "কাঠুরিয়া ও ভারীর দেশে", এমনকি "দাস-জাতিতে"। ভারতীয় শ্রমজীবীকে তার স্বদেশে "ক্রীতদাসের ভূমিকায়" সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল। দাদাভাই নৌরজী লিখেছিলেন, "আসলে ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষ দাসের মত জীবন যাপন করছে, নিজের জমিতে নিজস্ব সম্পদে দাসের মত শ্রম করে যা উৎপাদন করে, তা ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।" তদসত্ত্বেও কিছু ভারতীয় লেখক বিদেশী মূলধনের ফলে যেটুকু কর্মসংস্থান হয়েছে তাকেই স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন, শুধু একটি শর্তে; এই স্বাগত জানানোর অর্থ এদেশে প্রকৃত আর্থিক উন্নতি হয়েছে বলে মেনে নেওয়া নয়। সেটা সে যাই হোক, তারা অন্তত এটা স্পষ্ট করে উপস্থিত করেছিলেন যে বিদেশী সংস্থায় কর্মরত দেশীয় শ্রমিক যে মজুরি পেত তাতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না। ভারতবাসী ছোটলোক, শ্রমিক বা কুলির জাত এবং সেটাই তার

ভবিতব্য, এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনো-না কোন এক সময় তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়বেই।

বিদেশী পুঁজির সমালোচকদের আরেকটি বক্তব্য ছিল এই যে, কুলির কাজ করে ভারতীয়রা যে মজুরি পাচ্ছিল, তা যে-কোন মানদণ্ডেই ভারতীয় সম্পদ শোষণের ও এদেশের নিজস্ব শিল্পের ধ্বংসসাধনের ক্ষতি সামান্যই পূরণ করেছে। খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে সেটাই ছিল ঘটনা ; বাগিচা শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। একদিক থেকে দেখলে, খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এই বিদেশী শোষনের পরিণাম ছিল সাংঘাতিক, কেননা তার ফলে সেই জাতীয় সম্পদের স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে যা নিঃশেষিত হলে আর পূরণ করা যাবে না। বিদেশীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার চাইতে বরং এদেশের খনিজ সম্পদ অব্যাবহৃত থাকাও ভালো ছিল, তাহলে অন্তত পরে ভারতীয়রা তা কাজে লাগাতে পারত ; 'বেঙ্গলী পত্রিকা' লিখেছিল, "একটি প্রকৃত ভারতীয় সরকার অন্তত এটুকু সুনিশ্চিত করত।" একই ভাবে বাগিচা শিল্পের ফলেও জমি নিঃশেষ হয়েছে। জি.ভি যোশি দেখিয়েছেন, বাগিচা শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি আর একটি বাড়তি অন্যায় করা হয়েছে। বেশিরভাগ বাগিচাই প্রথমে সরকারি খরচায় গড়ে তুলে, তারপর তুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশীদের হাতে, কোনরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই। জমির মূল্য স্বরূপ তাদের যা দিতে হয়েছে তাও নামমাত্র। বস্তুত বাগিচায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ একেবারেই হয়নি বললেই চলে। অনায়াসেই এই শিল্পটি ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া যেত।

ভারতীয় নেতাদের মতে, বিদেশী পুঁজি ব্যবহারের এইসব অর্থনৈতিক দিক আবার রাজনৈতিক বিপদ ডেকে এনেছে। বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটলে অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক পরবশ্যতা দেখা দেয়—এই বিশ্বাস থেকেই রাজনৈতিক বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রাণাডের ভাষায় : "বাণিজ্য ও শিল্পে আধিপত্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেখা দেয়"। এর পিছনে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। কালক্রমে বিদেশী পুঁজি একটি কায়েমী স্বার্থ—'বিজাতীয় অভিজাতদের আধিপত্য'—প্রতিষ্ঠা করে যে অভিজাত শ্রেণী অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেশের প্রশাসনিক নীতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে।[১২] ১৮৮৯ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দু' পত্রিকা একই অভিমত প্রকাশ করেছিল—"যে দেশে একবার বিদেশী পুঁজি ঢুকে পড়েছে সে দেশের প্রশাসন যন্ত্র অচিরেই তাদের কব্জায় চলে যায়।"

ভারতীয় নেতাদের মতে, ভারতবর্ষের মত যেসব দেশে বিদেশীদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত সেখানে এই রাজনৈতিক বিপদ বহুগুণ বেশী হয়ে দেখা দেয়। কেননা এই পরিস্থিতিতে বিদেশী কায়েমী স্বার্থ দেশীয় জনগণের যুক্তিসম্মত রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের বৈরিতা প্রদর্শন করে এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। ১৮৮৯ এর ২৩শে

সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় 'দি হিন্দু' পত্রিকা বিরল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে লিখেছিল, "রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের এই যুগে যদি বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রভাব বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্যের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে, কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাবে সাম্রাজ্যের বিপদ নিয়ে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রচণ্ড সোরগোলে"। পরবর্তী-কালে কার্জনের সময় এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এত বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে কোনো জননেতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা খুব সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিল যে ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রতিপত্তির ফলেই এই প্রতিক্রিয়া।[১৩] বাস্তবিকপক্ষে, ভারতীয় জননেতাদের অনেকে বিশ শতকের গোড়াতেই ব্রিটিশ পুঁজিপতি স্বার্থের সঙ্গে ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি ধরতে পেরেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন যে ভারত সরকার মূলত ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত এবং সচ্চিদানন্দ সিনহা সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান পিপল'-এর ১৯০৩ সালের একটি সংখ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—

"লর্ড কার্জনের সাক্ষ্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রশাসনিক যন্ত্র আসলে শোষণ প্রক্রিয়ার বাহন। দক্ষ প্রশাসন ছাড়া বাণিজ্যের বিস্তার সম্ভব নয় ; আবার বাণিজ্য লাভজনক না হলে উন্নত প্রশাসনব্যবস্থা নিরর্থক। অতএব চেম্বার অব কমার্সের নির্দেশ ও সম্মতি ছাড়া ভারত সরকারের চলার উপায় নেই। এটাই, আসল 'সাদা মানুষের বোঝা'।[১৪]

রানাডেও লক্ষ করেছিলেন যে বিদেশী অর্থনৈতিক আধিপত্য রাজনৈতিক প্রভুত্বকে "আরও অসন্তোষজনক" করে তুলেছিল।

জাতীয় নেতাদের অনেকেই অবশ্য পরিস্থিতির অন্য দিকটি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বিদেশী রাজনৈতিক শাসন থাকার জন্যই ভারতে বিদেশী পুঁজি অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষ যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হত, যদি সে সম্পদ-নিষ্কাষন থেকে মুক্ত হত, নিজের প্রয়োজন মত স্বদেশের সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন হত, সমান শর্তে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার অধিকার ভোগ করত, এবং স্বার্থ-সাধনের পর বিদেশী পুঁজি অপসারণ করতে পারত যদি তার দেশীয় উদযোগগুলিকে উৎসাহিত ও সাহায্য করতে সমর্থ এমন স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকত, তাহলে বিদেশী পুঁজি দেশীয় শিল্পের সহায়ক হতে পারত এবং কল্যাণকর হয়ে দেখা দিত, যেমন হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রে।

বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তার স্বরূপ বোঝার ফলে বেশির ভাগ জাতীয় নেতাই একটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছিলেন, তা হল, ভারতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির

প্রয়োজন যদিও বা ছিল, বিদেশী পুঁজিপতিদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ধার করা পুঁজির সঙ্গে উদযোগী সংগঠনী পুঁজির পার্থক্য তাঁরা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন। শেষোক্ত পুঁজির মালিকেরা "সমগ্র শিল্পক্ষেত্রটিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রনাধীন" করে ফেলে এবং সবটুকু মুনাফা তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। অন্য দিকে ধার করা পুঁজি নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত অঙ্কে সুদ পায় মাত্র, লভ্যাংশের বাকীটা— ঋণ শোধ হয়ে গেলে পুরোটাই—দেশে থেকে যায়। কাজেইদেশীয় শিল্পে উন্নতির জন্য কখনও কখনও বিদেশীমূলধন ঋণ করা যেতে পারে, কিংবা বিদেশী প্রযুক্তিবিদদের কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু বিদেশী পুঁজিপতিদের দ্বারা তাদের মালিকানাধীন শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিদেশী পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কখনই সমর্থনীয় নয়। দাদাভাই-এর ভাষায়, "ভারতে ইংল্যাণ্ডের মূলধন প্রয়োজন খুবই, কিন্তু ব্রিটিশ মূলধনই শুধু প্রয়োজন. তাই বলে ইংরেজরা এসে ভারতীয় মূলধন ও উৎপন্ন সম্পদ সবই গ্রাস করবে. সেটা কখনই কাম্য নয়।"

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটো ত্রুটি ছিল। এদেশে বৃহদায়তন শিল্প, খনি বা পরিবহন ব্যাবস্থা গড়ে তোলার মত যথেষ্ট পরিমান মূলধন ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল না। আবার বিদেশের বাজার থেকে মূলধন ধার করতে হলে যে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হয়, তাও তাদের ছিল না। এমতাবস্থায়, বিদেশী পুঁজিপতিদের রোখা এবং এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার থেকে তাদের বিরত করা, সম্ভব ছিল কি? উনিশ শতকের দুজন মুখ্য ভারতীয় অর্থনীতিবিদ— দাদাভাই নৌরজি এবং জি. ভি. যোশি—এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চল্লিশ বছরেরও বেশি পরে স্বাধীন ভারতীয় সরকারকে যে নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা অসামান্যভাবে তাঁরা প্রথম উপস্থিত করেছিলেন। তা হল—কোনরকম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি ছাড়া বিদেশী মূলধন ব্যবহারের সুফল পেতে হলে জাতীয়করণ করতে হবে, সেই সব শিল্পকে, যেগুলি বৃহদায়তন বলে দেশীয় শিল্পপতিদের পক্ষে গড়ে তোলা অসম্ভব, এবং যেগুলির জন্য প্রভূত পরিমানে বিদেশী মূলধন লগ্নি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সরকার তার রেভিনিউ আদায়কে জামিন রেখে বিদেশ থেকে অল্প সুদে ঋণ করে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তা ব্যয় করতে পারে। এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা জাতীয়করণের কথা ভেবে ছিলেন শুধু বিদেশী পুঁজিপতিদের অবাধ প্রবেশকে রুদ্ধ করার জন্যই, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা ঐ ধরণের অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা একটি স্বল্পমেয়াদী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কথাই ভেবেছিলেন। এইভাবে দেশীয় শিল্পকে পুনরুদ্ধার করে, কিছুটা উন্নতি ঘটিয়ে, পরে দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।[২৫]

পরিশেষে, এসবের থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, বিদেশী পুঁজির সমর্থক অথবা বিরোধী, সব জাতীয় নেতারই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। দ্বিতীয়ত, সমগ্র জাতীয় নেতৃত্বই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রগতি দেশীয় মূলধন ও দেশীয় উদযোগের ভিত্তিতে শিল্পায়নের উপর নির্ভর করে। এমনকি যাঁরা বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ সমর্থন করেছেন, তাঁরাও এই কথা ভেবেই সমর্থন করেছেন যে কোনরকম শিল্পায়ন না-হওয়ার চাইতে বিদেশী পুঁজিকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্পবিস্তার বরং মন্দের ভালো। তবে, বেশিরভাগ ভারতীয় নেতারই মত ছিল অন্যরকম—তাঁরা বিদেশী পুঁজির সাহায্যে শিল্পায়ন অপেক্ষা শিল্পায়ন স্থগিত রাখার পক্ষে ছিলেন। তাছাড়া, এটাও লক্ষণীয় যে, জাতীয়তাবাদীরা মোটের উপর শিল্পপুঁজিরই বিস্তার চেয়েছিলেন, বাণিজ্য পুঁজির নয়। সেজন্যই জাতীয় আন্দোলনের ওই অধ্যায়ে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রায় অনুপস্থিত দেখা যায়। তৃতীয়ত, বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প, রেলওয়ে ইত্যাদির প্রাথমিক বিকাশ পরোক্ষভাবে ভারতে শিল্পায়নের ঝোঁক গড়ে তুলেছিল বলে, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে দেশীয় পুঁজির বিরোধ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেজন্য জাতীয় অর্থনৈতিক আন্দোলনের এই পর্বে (উনিশ শতকের শেষাবধি) এই বিরোধের তেমন কোনও প্রকাশও দেখা যায় নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। ১৮৮৬ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসে এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত বা গৃহীত হতে দেখা যায় নি ; কোনও সভাপতির অভিভাষণেও বিষয়টি উল্লেখিত হয় নি, ১৮৯৮-সালে সভাপতি জি.এস আয়ার তাঁর অভিভাষণে প্রথম এই সমস্যার উল্লেখ করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় শিল্পের শৈশব অতিক্রান্ত হতে থাকলে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-পতিদের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। বিদেশী পুঁজিপতিরা এই সময়ে লর্ড কার্জনকে পেয়েছিল জোরালো সমর্থক ও উৎসাহদাতা হিসাবে। ১৯০০ সালের পর থেকে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায় ও কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন দেখা গেল।

২. রাষ্ট্রের ভূমিকা

ভারতীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের জ্ঞান, ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তদুপরি শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপই কেবল এই অভাব পূরণ করে এদেশে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অসুবিধে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারত। সে কারণেই ভারতীয়[১৬] নেতৃত্ব একমত হয়ে দেশের শিল্পবিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য দাবী করেছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল

যে, প্রতিটি শিল্পের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের নীতি ছাড়া এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রত্যক্ষ, সুসংবদ্ধ ও স্পষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি ছাড়া, ভারতীয় অর্থনীতির কোনরকম উন্নতি সম্ভব না। সাবেকি দেশীয় শিল্প কিংবা আধুনিক যন্ত্রশিল্প, সর্বত্রই প্রয়োজন ছিল নানাভাবে ও নানা পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা বিষয়টিকে বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেন, কিন্তু তার বহু আগেই, ১৮৫৩ সালে, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর পুনর্নবীকরণের সময়, ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সের কাছে কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে দাবিপত্র পেশ করা হয়েছিল তাতেই "শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের" দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ১৮৯১ সালে পুনায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শিল্প বিষয়ক সম্মেলনেও বেসরকারি শিল্পসংগঠনে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সরকারি সাহায্যের দাবিটি আলোচিত হয়। এরপর ১৯০২ সালে কংগ্রেস পুনরায় দাবিটিকে উত্থাপন করে। ঐ অধিবেশনে প্রস্তাবাকারে সুপারিশ করা হয়— "দেশীয় শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারকে উৎসাহদানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।" ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে জি. ভি. যোশি ও রাণাডেই বোধ হয় এই দাবির সমর্থনে সবচেয়ে বেশি সরব এবং অটল ছিলেন।[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় নেতারা মেজি ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জাপান সরকার আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে যেভাবে সাহায্য করেছিল তাকে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। জি. সুব্রাহ্মনিয়া আয়ারের ভাষায়, জাপানের "ঐ ঘটনা ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের চিন্তার উপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য" প্রভাব ফেলেছিল।

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দেশীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারের তাত্ত্বিকওব্যবহারিক অনিহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তখন 'লেসে-ফেয়ারের' (বা অবাধ নীতির) সমর্থক। সেজন্য ব্রিটিশ শাসকরা বলতেন "প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সরকার অনধিকারী, এসব ব্যাপার ব্যক্তিগত উদযোগের হাতে ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।"[১৮] আর এই কারণেই শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য থেকে গেছে। দুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা প্রতিয়মান হয়েছিল প্রথমত কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল; দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেটুকু যা করা হ'ত তা রীতিমত দায়সারা গোছের। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারি সাহায্য ও উৎসাহের দাবি, শিল্পোন্নয়নের তথাকথিত সমর্থক লর্ড কার্জনের তিরস্কারের বিষয় হয়েছিল। কার্জনের মতে, এই দাবি যাঁরা উত্থাপন করেছেন তাঁরা কল্পনা করে নিয়েছেন যে "বর্তমান ভারত সরকার বা অন্য যে কোনো সরকার যেন যাদুদণ্ডের এক আঘাতে এই

বিশাল উপমহাদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে।" ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটি সার্বিক ধারণা থেকে এই সরকারি নীতি অংশত উদ্ভূত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা তাই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত অবাধ বাণিজ্যের তত্ত্বটির বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ চালালেন। বিশেষ করে ভারতের মত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশে ঐ নীতির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁরা প্রবল তাত্ত্বিক আপত্তি তুলেছিলেন। এ-সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা পরের এক অধ্যায়ে থাকবে।

এই সময়কার অন্যতম জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ, জাস্টিস রাণাডে. ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে, অতীতের ও তখনকার ঘটনা-বলীর সঙ্গে এই তাত্ত্বিক অবস্থানের কোনও সঙ্গতি ছিল না। অতীতে সরকার ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বহু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। যেমন, গোড়ার দিকে, রেল কোম্পানির যাতে লোকসান না হয় তার জন্য রাষ্ট্র জামিনদার থেকেছে, পরে একসময় নিজেই রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছে। সিঙ্কোনা, চা ও কফি চাষের জন্যও রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়েছে, এমনকি প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছে। লৌহ শিল্পের উন্নতির জন্যও বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়া ছাড়াও রাষ্ট্র প্রচুর অর্থব্যয় করেছে: ভূতাত্ত্বিক জরিপের ব্যবস্থা করেছে, নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্র নিজের উদ্যোগে কয়লার খনি পরিচালনা করেছে। রাষ্ট্রীয় সাহায্যের এই নীতি একদা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাহলে একইভাবে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ ও অনুদান দেওয়া যাবে না কেন? এর জন্য নতুন কোন নীতি গ্রহণের প্রশ্ন নেই। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুদান দেওয়া যেতে পারে, শুধু সে সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। অতীতের মত পরিবহণ ও বাগিচা শিল্পে রাষ্ট্রীয় মূলধন ব্যয় না করে আধুনিক পণ্য শিল্পকে সাহায্য করলে সেটা অনেক লাভজনক হতে পারে।

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুদান ও উৎসাহ নানাভাবেই দেওয়া যেতে পারত, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটিকে আলাদা করে বা অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রয়োগের দাবি জাতীয়তাবাদী নেতারা করেছিলেন। সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতীয়দের মতে এদেশে শিল্পোন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে মূলধনের অপ্রতুলতা। সে কারণে তাঁরা বাণিজ্যিক কুসীদজীবী মূলধনকে শিল্প-মূলধনে বা পুঁজিতে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারি সাহায্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এর জন্য, প্রথমেই সমগ্র ঋণ

ব্যবস্থাকে আধুনিক কায়দায় সংগঠিত করার আবশ্যকতার কথা তাঁরা বলেছিলেন। কেননা তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদকে একত্রীভূত করা সম্ভব হত। শুধু ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ঋণ ব্যবস্থায় নিজস্ব নিয়মে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া গতিহীন ও মন্থর হতে বাধ্য। তাই ভারতীয় নেতারা দাবি করলেন, "যেহেতু রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ অর্থের একমাত্র ভাণ্ডার এবং সব ঋণের উৎস রাষ্ট্রই উদ্যোগ নিয়ে, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমগুলির সাহায্যে, রাষ্ট্রীয় ঋণকে ব্যবহার করে, অনুদান দিয়ে এবং ব্যাঙ্কের আমানতের জামিনদার থেকে সঞ্চয়কারী ও ঋণগ্রহীতা শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলুক।" অর্থাৎ জাতীয় নেতারা চেয়েছিলেন, "রাষ্ট্র-পরিচালিত ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন একটি যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা", যার জন্য সরকারের একটি পাই-পয়সাও খরচ করার প্রয়োজন ছিল না, শুধু "ঋণ আদায়ের জন্য সুযোগ সুবিধা দান, জেলান্তরে সরকারি উদ্বৃত্ত অর্থ যাতে ব্যাঙ্কগুলি ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাই ছিল যথেষ্ট।" সরকার যদি শিল্পপতিদের অল্প সুদে, সরকারি তত্ত্বাবধানে, ঋণ দিতে পারত, তাহলে আরও ভালো হত। এবং তার জন্য প্রয়োজনে সরকারের পক্ষে ঋণগ্রহণ অথবা সঞ্চয়ীকৃত আমানতের উপর নির্ভর করা কঠিন ছিল না। এই প্রসঙ্গে, রাণাডে একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি দাবি করলেন সরকার বা স্থানীয় সংস্থাগুলির উদ্যোগে কয়েকটি অর্থবিষয়ক কর্পোরেশন স্থাপন করা হোক, যারা সরকারের কাছ থেকে কম সুদে টাকা ধার করে সম্ভাব্য শিল্পপতিদের আগাম ঋণ দেবে। তাছাড়া, যেভাবে রেলওয়েকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে অন্যান্যদেরও সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রাণাডে করেছিলেন। তাছাড়া নতুন নতুন শিল্পকারখানায় বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া নিশ্চিত করে ভারতীয় সঞ্চয়কারীদের উৎসাহিত করার কথাও তিনি বলেছিলেন। সরকার-প্রদত্ত গ্যারাণ্টির ভিত্তিতে রেলশিল্প যেভাবে বিদেশ থেকে মূলধন ঋণ করেছিল, অনুরূপভাবে ভারতীয় শিল্পপতিরা যাতে বিদেশ থেকে ঋণ করতে পারে, তার জন্য সরকারী গ্যারাণ্টির দাবিও করা হল।[১৯] শস্তা ঋণের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সরকার ওইসব শিল্পসংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারত, এবং তার জন্য লভ্যাংশও পেতে পারত। এই প্রসঙ্গে সদ্যগঠিত কারখানাগুলিকে সরাসরি ভর্তুকি দেওয়ার দাবিও আনা হ'ল। রাজস্বের অর্থ থেকে এই ভর্তুকি দেওয়া অসম্ভব ছিল না। তাছাড়া, শিল্পের শৈশবাবস্থায় প্রাথমিক বাধাবিঘ্নগুলিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য নানারকম দান-অনুদান দেওয়ার কথাও তাঁরা বললেন। এই সুযোগ পেলে, ঐসব শিল্পের পক্ষে নিজের পায়ে দাঁড়ানো সহজসাধ্য হতো।

আরেকটি ব্যাপারেও ভারতীয় নেতারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন। তাঁরা সরকারের এবং রেলওয়ে স্টোরের ক্রয়নীতির পরিবর্তন দাবি করলেন। সরকারি ক্রয়ের প্রায় সবটাই ছিল বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার। এর মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাজ-সরঞ্জাম, পৌর ব্যবস্থার জন্য নানা দ্রব্য—যেমন, জল, গ্যাস, পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র, ডক, সেতু, অট্টালিকা, বা রাস্তা তৈরির জন্য স্টীল সিমেন্ট ও অন্যান্য পণ্য—সবই ছিল। টেলিগ্রাফ টেলিফোনের জন্য সরঞ্জাম, প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রেল ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতে রেল লাইন, ব্রীজ, রেলিং স্টক এবং বাড়িঘর নির্মাণের মালমশলা প্রায় সবই আসত ইংল্যান্ড থেকে। ভারতীয় নেতারা অভিযোগ করলেন, এই ক্রয়নীতির দ্বারা একদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে, অন্যদিকে দেশীয় শিল্পকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এইসব পণ্য বিদেশী শিল্পপতিদের কাছ থেকে না কিনে দেশীয় শিল্পমালিকদের কাছ থেকে কেনা হলে লাভজনক মূল্যে ভারতীয় শিল্পোজাত পণ্যের বিক্রির বাজার সুনিশ্চিত হত, এবং তার ফলে, ভারতীয় শিল্পপতিরাও উৎসাহ পেত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে ব্যবসায়-রত কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ পুঁজিপতিও এই দাবি সমর্থন করেছিল। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন, লর্ড রিপনের প্রশাসন, এবং ১৯১৬-১৮র ভারতীয় শিল্পকমিশনও সমর্থন জানিয়েছিল। যার ফলে, শেষ অবধি কিছু ভারতীয় শিল্প সংস্থা পণ্য সরবরাহের ফরমাশ পায়। ১৮৯৮ সালেই লক্ষ্ণৌ-এর "হিন্দুস্থান" পত্রিকা ভারতীয় শিল্পোজাত দ্রব্যাদি না-কিনে ইউরোপের বাজার থেকে সরকারী ক্রয়ের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

সরকারের প্রধান যুক্তি ছিল, বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না বা উৎপাদিত হয় না। এর উত্তরে কয়েকজন ভারতীয় নেতা সরকারি উদ্যোগে ঐসব দ্রব্য উৎপাদনের প্রস্তাব করলেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের এই প্রস্তাব "লেসা ফেয়ার" বা অবাধ নীতির বিরোধী। অন্য একটি কারণেও বহু ভারতীয় নেতা এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন: শিল্প বা কলকারখানা তৈরি করার ক্ষেত্রে একেবারে শুরুতেই নানারকম বাধা বিপত্তি দেখা যায়, সেজন্য প্রাথমিক পর্বে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত, তাহলে "ঐসব শিল্পোদ্যোগ কতটা লাভজনক বা ব্যবহারিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ" তা বোঝা যাবে, এবং প্রাথমিক বাধাগুলিও কাটিয়ে ওঠা যাবে, তাছাড়া সাধারণভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে উন্নয়নের রাস্তা পাওয়া যাবে এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা যাবে। ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য নেতারা আর যেসব প্রস্তাব

এনেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল – "স্বতন্ত্র শিল্প-বাণিজ্য দপ্তর" খোলার প্রস্তাব, 'যার মাধ্যমে" সম্পদের সুব্যবস্থা করা যাবে এবং সরকারকে ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে "কারিগরি ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সাহায্য দেওয়া যাবে" : সমীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের প্রস্তাব ; শুল্কের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবি ; যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক রদের দাবি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসারের দাবি। শিল্পোন্নয়নের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের এই দাবি তুঙ্গে পৌঁছল ১৯০৩ সালে যখন জি কে. গোখেল রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ঐ বছর বাজেট ভাষণে তিনি বললেন, "পরিস্থিতির দাবি হল এই যে, এখন একটা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে যত্নসহকারে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এদেশের নৈতিক ও বস্তুগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যায়। পরিকল্পনা দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, বছরে বছরে কতটা উন্নয়ন ঘটল তাও খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।"

শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহায়তার এই উল্লেখযোগ্য দাবি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন মূলত জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা, জাতীয় সংবাদপত্রে কিংবা কংগ্রেসের সভা-সম্মেলনে ততোটা সোচ্চারে এই দাবি তুলে ধরা হয় নি। সম্ভবত এই অনুৎসাহের একটি প্রধান কারণ, প্রথম থেকেই নেতৃবর্গের সন্দেহ ছিল বিদেশী ব্রিটিশ সরকার, তা সে যত সদাশয়ই হ'ক, কখনই এমন কোনো নীতি গ্রহণ করবে না যা তাদের নিজেদের দেশের শিল্পপতিদের স্বার্থবিরোধী। এই কারণেই ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে পুণা সার্বজনিক সভার মুখপত্রে জি, ভি. যোশির লেখা 'ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি" সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ১৮৯০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু' পত্রিকা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে সমর্থন করেও মন্তব্য করেছিল ঃ

"ইংরেজ জাতির স্বার্থই হল ভারতের দেশীয় শিল্পকে অবদমিত করে রাখা। অন্তত তাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করা। ভারতের ইংরেজ শাসককুল এদেশের অধীনতা থেকে সবচেয়ে বড় যে সুবিধে আদায় করতে চায়, কার্যত আদায় করেও, তা হল, ব্রিটিশ শিল্পোজাত পণ্যের একটি বিরাট বাজারের সুবিধে।...... এই পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সাহায্যে এদেশের শিল্পোন্নয়নের যে প্রত্যাশা পুনার লেখক করেছেন তা অলীক হতে বাধ্য।"

১৮৯০ সালের ৩১শে মের 'বঙ্গবাসী' আরও স্পষ্ট করে বলেছিল ঃ

"এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের জন্য সরকারের সাহায্য খুবই প্রয়োজন। · কিন্তু সেই সাহায্য এমন একটি সরকারের

কাছে প্রত্যাশা করা যায় কি, যে সরকার শুধু বিদেশী বা বিধর্মীই নয়, উপরন্তু এমন একটি জাতির যারা নিজেরাই শিল্পোদ্যোক্তা ও বনিক। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, ভারতীয়রা তাদের নিজেদের উৎপাদিত দেশীয় পণ্য ব্যবহার করছে এই দৃশ্য ইংরেজ শিল্পপতিদের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে ভারতীয় বাজার থেকে দেশীয় পণ্য ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে। এই ইংরেজ শিল্পপতিরাই ইংরেজ জাতি। অন্য সব কিছুর আগে তাদের স্বার্থ রক্ষাই ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর লক্ষ্য।"

ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় আরও অনেকে এইরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[২০] ভারতে ইংরেজ সরকার অনুসৃত নীতি ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অভিজ্ঞতা তাঁদের এইভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছিল। তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে, ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যকে যে সাহায্য করেনি শুধু তাই নয়, বিদেশী প্রতিযোগীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ করেছে। তাঁদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না এই ঘটনাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

৩. স্বদেশী

দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র মোচন এবং দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য ভারতীয় নেতারা বহু বছর ধরেই একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন, এবং কালক্রমে তা জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। পদ্ধতিটি, স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দেশীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দান, এবং তার জন্য বিদেশী পণ্য ক্রয় না করা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, এমনকি বয়কট করা। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী সর্বভারতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ আন্দোলনের নাটকীয় সাফল্য কিংবা ব্যাপক বিস্তৃতি হঠাৎই হয়নি, বেশ কয়েক দশক ধরেই তার পূর্বপ্রস্তুতি চলছিল। বাস্তবিকভাবে স্বদেশীর চিন্তা ভাবনা ও আন্দোলন ভারতীয় চেতনার উন্মেষের প্রাথমিক পর্ব থেকেই দেখা গিয়েছে। কিছুটা অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে-ওঠা স্বদেশী আন্দোলন শুরু থেকেই ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল। সেইসময়ের অনুমোদিত গণসংগঠনগুলি এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়নি, সমর্থন যুগিয়েছিল দেশীয় পত্র-পত্রিকা এবং অগণিত অচেনা-অজানা মানুষ। এ-বিষয়ে লেখাপত্র খুব কম। সেজন্য স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এখানে অপ্রয়োজনীয় মনে না-ও হতে পারে।

১৮৪৯ সালে পুনার গোপালরাও দেশমুখ প্রথম 'প্রভাকর-এ বিলেত থেকে আমদানি করা পণ্যের বদলে দেশীয় পণ্য ব্যবহার সুপারিশ করেছিলেন। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতও সম্ভবত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে

নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু বা জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা থেকে। প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে এই মেলা প্রতি বছরেই সংগঠিত হয়েছে। জাতি-গঠনের জন্য বিবিধ কর্মসূচী ছাড়াও এই মেলার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল দেশীয় উৎপাদকদের উৎসাহ দেওয়া ও তাদের তৈরী চারুকলা ও কারুশিল্প ইত্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। নবগোপাল মিত্রকে এই কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু, যিনি প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ঋষি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং "বিলেতি পণ্য বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের অন্যতম উদ্যোক্তা" ছিলেন।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে স্বদেশী চিন্তা বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৭০ সালে বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিকের সম্পাদনায় 'নেটিভ ওপিনিয়ন' দেশবাসীর কাছে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনকি প্রয়োজনে বেশি দাম দিয়েও স্বদেশী পণ্য কেনার আবেদন রেখেছিল। ১৮৭২ সালে রানাডে পুণায় অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতায় 'স্বদেশী'র ধারণাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে, "স্বদেশীর অর্থই হল, এমনকি অপেক্ষাকৃত খারাপ মানের বা বেশি দামের হলেও, স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার"। তাঁর বক্তৃতা বহু শ্রোতাকে উদ্দীপিত করেছিল। এঁদের মধ্যে একজন, 'সার্বজনিক কাকা' নামে পরিচিত, পুণা সার্বজনিক সভার অন্যতম নেতা গনেশ বাসুদেও যোশি। পরবর্তীকালে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম নেতা বাসুদেব কাড়কের নামও উল্লেখযোগ্য। এঁরা উদ্দীপিত হয়ে "শুধুমাত্র স্বদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি" ব্যবহার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। জি ভি যোশি তাঁর ধুতি, জামা ও পাগড়ির জন্য প্রতিদিন সুতো কাটতেন। স্বদেশী জিনিসকে সাধারণ্যে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে দোকানও খুলেছিলেন। ১৮৭৭ সালের আগস্ট মাসে দিল্লীর দরবারের বর্ণাঢ্য জাঁকজমকের মধ্যেও তিনি নিজের-হাতে-কাটা খাদির জামা—কাপড় পড়ে সার্বজনিক সভার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। 'স্বদেশী' প্রচারক ফাড়কেও ছিলেন একই রকম আবেগে উদ্দীপ্ত। "দেশের যুবসমাজকে স্বদেশী ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে" তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালের ১৩ই জুলাই 'রাস্ত গফতার'-এ মারাঠি মুখপত্র 'নিশ্চয় পত্রিকা' থেকে রচনা অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। শোনা যায় মফস্বল অঞ্চলে ঐ 'নিশ্চয় পত্রিকার' প্রচার সংখ্যা ছিল বিপুল। ঐ পত্রিকাতে দেশের মানুষকে দেশীয় শিল্পের অবনতি রোধকল্পে নিম্নমানের ও বেশি দামের হলেও স্বদেশি পণ্য কিনতে ও বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়ে যেসব প্রস্তাব প্রকাশ করা হত, তা মফস্বলে ব্যাপকভাবে সমর্থিত হত। এই একই মানসিকতার প্রকাশ দেখা গেছে ১৮৭৫ এর ২৫শে আগস্টের 'হিন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে। বিপিনকৃষ্ণ বোসের মতে, ১৯৮৪ এই স্বদেশী

দ্রব্যের প্রচার-কল্পে নাগপুরে একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো[২১] এবং ওই বছরেই বাঙ্গালোরে একটি কোম্পানি তৈরি হয়েছিল ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য। এই কোম্পানি ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপাদিত পণ্যের কারবার করবে না বলে অঙ্গীকার করেছিল। ১৮৭৬এর ৬ জানুয়ারির অমৃতবাজার পত্রিকায় একজন পাঠক লিখেছিলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, কোনো প্রকার বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করব না, স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য এবং বিলেতী পন্য বর্জনের জন্য চেষ্টা করব।"

বাংলাদেশে ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে Mookherjee's Magazine-এ প্রকাশিত তাঁর সুবিশাল প্রবন্ধ 'A Voice for the Commerce and Manufacture of India'-তে স্বদেশীর প্রতি জোড়ালো সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। বিলেতি দ্রব্য বর্জন করে "খানিকটা স্বাদেশিকতা দেখানোর জন্য" তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন এবং "ইউরোপে প্রস্তুত জিনিস-পত্রের প্রতি ভারতীয়দের অনুরক্তিকে অ-ভারতীয়তার নজির" বলে বর্ণনা করে তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে -

'এদেশের রাজন্যবর্গ, জমিদার, বাবুশ্রেণীর লোক এবং বড় বড় শহর নগরের উচ্চবিত্ত মানুষেরাই জাতির প্রতি সত্যনিষ্ঠ নয় এবং স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাসে সাহায্য করছেন। এর কারণ এই নয় যে, বিলাতি জিনিস শস্তা ও উচ্চমানের, এরা মোসাহেব প্রকৃতির ও বুদ্ধিভ্রষ্ট বলেই এধরনের আচরণ করেন ·· উন্নত রুচিবোধের কথা বলে এদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ঢাকা যাবে না, বিশেষ করে যখন এদের প্রশ্রয়ে দেশের সর্বোত্তম স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।"

তিনি খেদের সঙ্গে বলেছিলেন যে, "আমাদের জাতির দাসত্ব ও নীচতার জুরি নেই'। এক অসাধারণ তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, যুক্তি ও বোধ থেকে তিনি, দেশবাসীকে দেশকে পুনরুদ্ধার করার জন্য নৈতিক অস্ত্র ধারণ করতে, অর্থাৎ বিদেশি দ্রব্য বর্জনের, আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"যে মূর্খতার ফলে অতীতে ক্ষতি হয়েছে, এখন তা অবশ্যই আমরা রোধ করতে পারি, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে, আনুগত্যহীনতা প্রদর্শন না করে, আইনানুগভাবে ত্রাণের জন্য প্রার্থনা না করে, আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের নিজেদের শক্তির উপরেই নির্ভর করতে হবে। আমাদের প্রত্যক্ষ সহায়তাতেই ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। স্বভাবতই আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করলে তার প্রতিক্রিয়াও হবে বিপরীত। যদি আমরা আমাদের সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও একমাত্র অস্ত্র নৈতিক অবরোধ ব্যবহার করি, তা কোন মতেই অন্যায় হবে না। আসুন আমরা ইংলন্ডের

পণ্য বয়কটের শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করি, তার ফলে আগে যে ক্ষতি হয়েছে এখন তা পূরণ করতে পারব।"

১৮৮৫ সালে ঢাকার জনসাধারণও "নৈতিক অবরোধের" দ্বারা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্রও বিদেশী পণ্য বয়কট এবং ভারতীয় কলকারখানার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আবেদন জানিয়ে ছিল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৫—এই পনের বছরে সমগ্র দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার দেখা গেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের খুশি করার জন্য ভারত সরকার সুতিবস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক রহিত করার নীতি ঘোষণা করলে এই আন্দোলন আরও জোড়দার হয়ে ওঠে। এই সময় দেশীয় শিল্পকে ধ্বংসের ও বিদেশী পণ্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে রচিত নতুন নতুন স্বদেশী সংগীত সমগ্র পশ্চিম ভারতের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনমনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব-সম্পন্ন 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৮১ সালে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার এবং আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তুলে ম্যাঞ্চেস্টারের চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য গনসংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। 'অমৃত বাজার' প্রস্তাব করেছিল, "ভারতের সব বড় শহরে প্রতিনিধি পাঠানো হোক,·· এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রচারপত্র ছাপানো হোক।" "বিদেশী দ্রব্যসম্ভার নিয়ে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের সকলকেই একঘরে করে দিতে হবে"—এই দাবি তুলে বাস্তবিক ভাবেই এই পত্রিকা তখন পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বাড়াবার জন্য ১৮৮১ সালে এলাহাবাদে একটি দেশী তেজারতি কোম্পানি খোলা হয়েছিল; পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ছিলেন এই কোম্পানির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৮৩ সালের ১৮ই এপ্রিল 'কোহিনুর' পত্রিকায় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির উদ্যোগে লাহোরে "ভারতীয় জাতীয়সভা" প্রতিষ্ঠার খবব বেরিয়েছিল। এই সভার সদস্যদের যতদূর সম্ভব স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের অঙ্গীকার করতে হত। আজমীরেও অনুরূপ একটি সমিতি তৈরি হয়েছিল। ১৮৯০-এ ডেকান কলেজের ছাত্রেরা একটি স্বদেশী ভাণ্ডার খুলেছিলেন। বিলাতী জিনিসের পরিবর্তে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের দাবিতে বোম্বাই-এর বিভিন্ন জায়গায় তখন অজস্র জনসভা সংগঠিত হচ্ছিল। এই সব সভা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বম্বে মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র—যেমন, উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলি ও অযোধ্যা থেকে "আলমোড়া আখবর" (১মে ১৮৮২), 'নাসিম-ই-আগ্রা' (৭ই জুন ১৮৮৯), 'রহ্বার' (১৬ই জুলাই ১৮৮৯) ও 'হিন্দুস্তানি' (১১ই এপ্রিল ১৮৯৪);

পাঞ্জাব থেকে 'ইম্পিরিয়াল পেপার' (৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯), 'পাঞ্জাব পঞ্চ' (৩০ জুলাই,১৮৯১, 'পয়সা-আকবর' (১০ আগষ্ট, ১৮৯১) এবং 'আকবর-ই-আম' (১৮ জুলাই, ১৮৯৫); মাদ্রাজ থেকে 'আর্য জনপারুপালানি' (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯)—বিদেশী দ্রব্য বয়কট, দেশী জিনিস ব্যবহার, স্বদেশী ভাণ্ডার খোলা ও সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য সভা সমিতি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল। বেরার থেকে 'বারহার সমাচার' (২২ জুন, ১৮৯১); বোম্বাই থেকে 'মারাঠা' (১৩ই মার্চ, ১৮৮১ ও ৮ই জুলাই, ১৮৯৪), 'নেটিভ ওপিনিয়ন' (২৬ মার্চ, ১৮৯১), 'পুণাবৈভব' ১০মে, ১৮৯১), 'হিন্দু পঞ্চ' (২৯শে মার্চ, ১৮৯৪), 'অরুণোদয়' (১৮ই মার্চ, ১৮৯৪) এবং 'মোড়া বৃত্ত' (২ আগষ্ট, ১৮৯৪); বাংলাদেশ থেকে 'সোমপ্রকাশ' (২৩ জানুয়ারি, ১৮৮২), 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' (২৭শে মার্চ, ১৮৮২), 'ভারত-মিহির' (১৬মে, ১৮৮২), 'সঞ্জীবনী' (১৪ই জুন, ১৮৮৪), 'সময়' (২২ জুন, ১৮৮৫), 'বঙ্গবাসী' (১৬ এপ্রিল ও ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৯, ২রা মে ১৮৯১) 'সময় ও সাহিত্য' ৫ই এপ্রিল ১৮৯১), 'এডুকেশন গেজেট (৭ জুন ১৮৯১) ও প্রভাতীতে স্বদেশী কার্যসূচী জোড়ালভাবে সমর্থিত হয়েছিল। আধুনিক হওয়ার জন্য, কিংবা এক শ্রেণীর কাছে সম্মানের আশায় যারা বিলেতি বস্ত্র ও অন্যান্য বিলেতি জিনিসপত্র ব্যবহার করত তারা প্রবলভাবে সমালোচিত হল। অমৃতবাজার (১৯ জুলাই, ১৮৯১) লিখেছিল, 'নিছক বাবুগিরি করার জন্যই কিছুলোক হরেকরকম ইউরোপীয় কাপড় জামা ব্যবহার করে। হাজার হাজার বছরের হিন্দু সভ্যতার কথা মনে রেখে আমরা অবশ্যই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা ঐ বাবুদের ঘৃণ্য রুচিকে ছাপিয়ে উঠতে পারব। এদের ব্যবহারে ও চরিত্রে কোনও উৎকর্ষের ছাপ নেই, কেবল অর্থ আছে বলেই এরা নিজেদের উন্নত শ্রেণীভুক্ত বলে জাহির করে।"

এই সময়ে স্বদেশীর চিন্তা স্বীকৃত সভা সমিতিগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিম ভারতের 'শিল্পসভা'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শিল্প সম্মেলনে পুণার বিখ্যাত লেখক, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি ও জননেতা এম. বি. নামযোশী সভায় উপস্থিত সদস্যদের সবাইকে আহ্বান জানান আমদানিকৃত বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে এবং এই কর্মসূচী কতটা সফল হল বাৎসরিক সভায় তা জানাতে। এর আগে, বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে—বিশেষত ১৮৯৪-এর বর্ধমান সম্মেলনে স্বদেশীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। ১৮৯১ সালে কংগ্রেসের মঞ্চে পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা লালা মুরলীধর আমদানি-করা বিদেশী জিনিস কেনার জন্য সদস্যদের তিরস্কার করে "ভায়েদের হৃদয়ে আলোড়ন তোলার" কথা বলেছিলেন। তখন থেকেই কংগ্রেস স্বদেশীর আওয়াজ তোলা শুরু করে। ১৮৯৪ সালে মুরলীধর আবার ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কংগ্রেসের সদস্যদের বিলেতি সৌখিন দ্রব্য ও বস্ত্রাদি

বর্জন করে দেশের অগণিত গরীবদের সহমর্মী হতে আহবান জানালেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত একজন প্রতিবেদক লিখেছেন, মুরলীধরের এই বক্তব্যে সভা "বহুক্ষণ সোচ্চার সমর্থন" জানিয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল ১৮৯৬ সালে। ঐ বছর ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যধিক শুল্ককর চাপিয়ে দেওয়ায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন সমগ্র ভারতবর্ষ রোষে ফেটে পড়ল। অনেকেই একে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং "জাতীয় স্বার্থে" ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পকে বয়কট করার সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলেন। অনেকে এটাও অনুভব করলেন যে, শুধুমাত্র আবেদন নিবেদন, মৌখিক প্রতিবাদ বা প্রস্তাব গ্রহণ করে কিছু হবে না, আরও প্রত্যক্ষ ও জোরদার আন্দোলনের পথে যেতে হবে। সেই মুহূর্তে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সংগঠিতভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করার প্রশ্ন। বোম্বাই ছিল আধুনিক সুতি বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। স্বভাবতই আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভূমিকা ছিল অগ্রণীর। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় বয়কট করার জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সঙ্ঘ সমিতি গড়ে উঠল। বোম্বাই প্রদেশের প্রায় সব ভারতীয় পত্র-পত্রিকা এই বয়কট আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন যুগিয়েছে। পুনে, আহমেদনগর, সাতারা, বরশি, জলগাঁও, রাজপুর ইত্যাদি জায়গায় অসংখ্য জনসভায় আন্দোলনকে সংগঠিত করার এবং স্বদেশী ছাড়া অন্য কোনো পণ্য কেনা-বেচা বা ব্যবহার না করার শপথ নেওয়া হয়। এই প্রদেশে বয়কট আন্দোলন কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে পারা যাবে ১৮৯৬এর ১৭ই মার্চের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র এক প্রতিবেদন পড়লে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বোম্বাই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ল্যাঙ্কাশায়ারে নির্মিত পণ্য বর্জন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সভা-সমিতি করা হয়েছিল এবং জেলার সর্বত্র প্রচারের জন্য প্রচারপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। বিলেতি দ্রব্য বর্জনের মানসিকতা কত জোরদার তা দেখানোর জন্য বিশাল সব জনসমাবেশে বিলেতি কাপড়ের গাঁটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুনের নিউ ইংলিশ স্কুলের ছাত্ররাও বিলাতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করেছিল। টাইমস পত্রিকার একজন প্রতিবেদক লিখেছেন, "বিলাতি জামা কাপড়ে সজ্জিত কোনও ভদ্রলোকের পক্ষেই অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে রাস্তাঘাটে হাঁটার উপায়ছিল না।" বি জি তিলক প্রথম থেকেই এই বয়কট আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও এই সময়ে আন্দোলনের জোয়ার প্রধানত বোম্বাই প্রদেশেই দেখা গিয়েছে, দেশের অন্যত্রও বহু সংবাদপত্র এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

গণ-আন্দোলনের চাপে সুতিবস্ত্রের উপর শুল্ক হ্রাস করা হলে স্বদেশী আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রগুলি স্বদেশীর

সমর্থনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন ১৮৯৯ সালে বেনারসের 'ভারতজীবন' "স্বাদেশীকতায় উব্দুদ্ধ শিক্ষিত মানুষের" প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদের "বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে" আহ্বান জানায়। ১৯০১ সালে সঞ্জীবনী পত্রিকা (কয়েক বছর পর, ১৯০৫ সালে, এই পত্রিকা বাংলাদেশে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল) স্বদেশীর আবশ্যকতা তুলে ধরে এই কর্মসূচীকে সফল করার পথ ও পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে। 'সঞ্জীবনীর' এই লেখায় দেশে যে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদিত হয় সে সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা এবং দেশীয় পণ্য বিক্রির উপযুক্ত বিপনন ব্যবস্থার অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এবং এইসব অসুবিধে দূর করার জন্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়। সঞ্জীবনী আরও লিখেছিল যে বড় পাইকারী ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার বাস্তবে সাধারণ মানুষকে দেশীয় জিনিস কিনতে বাধ্য করতে পারে। ১৯০২এর ১৫ই মার্চ 'পয়সা আকবর' পত্রিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যেসব দেশপ্রেমিক ভারতীয় বিদেশী বস্ত্র বর্জনের শপথ নেবেন তারা তাঁদের নাম ছেপে প্রচার করবে। কংগ্রেসের চতুর্দশ সম্মেলনে বক্সি জয়সিরাম স্বদেশী জিনিস ব্যবহার এবং স্বদেশী প্রচারের জন্য সমিতি গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের আহ্বান জানান। ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক প্রকাশ্য এক বিবৃতিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস সম্মেলনের সদস্য ও আমন্ত্রিতদের যতটা সম্ভব স্বদেশে উৎপাদিত পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরের বছরই কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বদেশী উদযাপনের আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের বিষয় কমিটিতে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বদেশীর কর্মসূচী বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। অবশ্য তখন এই প্রস্তাব সকলের কাছে গ্রাহ্য হয়নি, সে কারণে বিষয় কমিটি তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে অনেকেই স্বদেশীর ধারণা বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাঞ্জাবে ১৮৯৮ সালে 'স্বদেশী পণ্য প্রচারণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দেশীয় পণ্যের উৎকর্ষ সাধন এবং ব্যবহার বৃদ্ধি ছিল এই সভার ঘোষিত লক্ষ্য। ১৯০২ সালে পুনেতে এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে একটি স্বদেশী দোকান খোলা হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তা সাফল্যলাভও করেছিল। ওই একই বছরে বাংলাদেশের অন্যতম স্বদেশী নেতা জে. চৌধুরির নেতৃত্বে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান স্টোরস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হল। পরের বছর "আমেদাবাদে স্বদেশী দ্রব্য সংরক্ষণ সমিতি" তৈরি হল; উদ্বোধন করলেন দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাবেকলাল।

এইভাবে আমাদের আলোচ্য সময়কালে ভারতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনের

উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল। বিলেতি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতে হবে তা যতই মহার্ঘ অথবা নিম্নমানের হ'ক না কেন, এইরকম চিন্তা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল।[২২] ব্যক্তিভেদে ও সময়ভেদে স্বদেশীর ধারণা ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই সময়ে স্বদেশীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যই প্রধান হয়ে উঠেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দুর্বল ও পিছিয়ে-পড়া দেশ, এই উপলব্ধিই তার কারণ। স্বদেশীর মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করে উৎসাহিত করতে পারলে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব—এটাই ছিল প্রধান যুক্তি। স্বদেশী আন্দোলনের বেশির ভাগ প্রবক্তাই সুস্পষ্টভাবে এই বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। যেমন লোকমান্য তিলকের ইংরেজি মুখপত্র 'মারাঠা' ১৮৯৬ সালের ১২ এপ্রিলের সংখ্যায় লিখেছিল:

"এই আন্দোলনের লক্ষ্য—স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটানো। তার ফলে ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্প প্রেরণা পাবে। এদেশে তৈরি কাপড়ের চাহিদা বিপুল এবং প্রতিনিয়ত তা বাড়ছে, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রের ব্যবহারের উন্নতি ঘটবেই, এবং বস্ত্রশিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রবণতাও বাড়বে।"

মাত্র একমাস পরেই এই পত্রিকা সুখবর দিয়ে জানিয়েছিল যে তাদের এই প্রত্যাশা অংশত পূরিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৩টা নতুন কাপড় কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—৭টি বোম্বাইতে, ৬টি আমেদাবাদে। তাছাড়া, আরও উন্নতমানের সুতো তৈরির চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশে স্বদেশীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচল প্রবক্তা কৃষ্ণকুমার মিত্রর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাও বারবার উল্লেখ করেছে যে এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য, শিল্পের অগ্রগতি। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথও একই কথা বলেছিলেন।

অনেকে স্বদেশী সমর্থন করেছেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন বিদেশীদের প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদের বাঁচাবার জন্য। লক্ষণীয় যে, দেশীয় যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে হস্তশিল্পকে বাঁচাবার তাগিদ কিন্তু কেউই বোধ করেন নি।

স্বদেশীকে সমর্থন করে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যেসব যুক্তি বিস্তার করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল এই রকম: ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা চালিত ভারত সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করার ফলে এদেশের শিশু শিল্প টিঁকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক সংরক্ষণের সুযোগ পায়নি, তাই ভারতের মানুষকেই এগিয়ে এসে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলে এদেশের শিল্পকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ "বাস্তবোচিত ও সম্ভব"। বিদেশী সরকারের খেয়াল-

খুশি বা মর্জির উপর এর সাফল্য নির্ভর করবে না, আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিই সাফল্যের শর্ত। পরাধিন জাতির সামনে এই একটি পথই খোলা। ১৯০২ সালে কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বক্তব্য সবচেয়ে স্পষ্ট করে উপস্থিত করেছিলেন: "সরকারের পক্ষে আইন রচনা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যদি অসম্ভব হয়, আমরা কি আমাদের জাতীয় ইচ্ছার ভিত্তিতে, নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে, সেই সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারিনা?"

ল্যাংকাশায়ারের বিদেশী শিল্পপতিরা ভারতে নির্মিয়মান সুতিবস্ত্র শিল্পকে কোনঠাসা করার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছিল বলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করেছেন। সেজন্যেই তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনকে, বিশেষ করে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলনকে ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পপতিদের 'স্বার্থান্ধতার' বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধের উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল যে যদি এক প্রবল বয়কট অভিযান গড়ে তোলা যায় তাহলে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে এবং বিদেশী শিল্পপতিরা তখন বাধ্য হবে ঐ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে। অন্তত তাদের বিশেষ সুবিধা আদায় ঠেকানো যাবে। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'মারাঠা' পত্রিকা লিখেছিল, "ল্যাংকাশায়ার অপরিসীম লোভের বশে যদি ভারতকে শাসন করতে উদ্যত হয়, তবে ভারতের বীরত্বপূর্ণ সংকল্প ল্যাংকাশায়ারকে ধ্বংস করুক। ভারতে কয়েক বছর ল্যাংকাশায়ারের কাপড় বয়কট করা হ'ক, তাহলেই ম্যাঞ্চেস্টারের অর্থগৃধ্নু বণিকদের সম্বিত ফিরবে।"

বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের পরিবর্তে ভারতে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার এই আন্দোলনের আর একটি লক্ষ্য ছিল। বিদেশী শিল্পজাত পণ্য আমদানির জন্য ভারত থেকে যে সম্পদ নিষ্কাশিত হচ্ছিল, তা কমানোই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এই সময়কার জাতীয়তাবাদী মতামত খুঁটিয়ে দেখলে নজরে পড়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তখনও স্বদেশী আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রাম বলে মনে করতেন না। একথা বলার মানে অবশ্য এই নয় যে, কোনো নেতাই স্বদেশীকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলেননি, কিংবা জনসাধারনের আন্দোলনে তা কখনই অভিব্যক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯১ সালের প্রথমদিকেই 'পুনা বৈভব' "এজ অব কনসেণ্ট এ্যাক্ট" রদ করার জন্য বিলেতি কাপড় বর্জনের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিল। ১৮৭৪-এ মারাঠি পত্রিকা 'মোরা বৃত্ত' জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপায় হিসেবে বয়কট অভিযানের পক্ষে প্রচার করেছিল। ১৮৯৭ সালে এই পত্রিকার সম্পাদক কে. বি. কেল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ন-মাস কারারুদ্ধ হন। এরপর ১৯০১ সালে লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত

সাপ্তাহিক "অ্যাডভোকেট" লিখেছিল যে, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়দের উপর থেকে অন্যায় বিধিনিষেধ সরিয়ে নেবার জন্য এবং অস্ট্রেলিয়ার সরকারকে "আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত আচরণ করতে" বাধ্য করার জন্য "আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র হিসেবে স্বদেশীকে" ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই, চীনাদের মার্কিনী পণ্য-বর্জনের অভিজ্ঞতা ভারতীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, অনেক নেতাই তখন মনে করেছেন যে স্বদেশীকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সময় আসেনি। অদূর ভবিষ্যতেও যে সে প্রয়োজন দেখা দেবে একমাত্র দাদাভাই নওরোজি ১৮৮০ সালেই অসামান্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বিদেশের শিল্পসামগ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে রচিত স্বদেশী সঙ্গীতের অসম্ভব জনপ্রিয়তার নজির দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

"ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত অপেক্ষাকৃত সুলভ পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় হস্তশিল্পে উৎপাদিত মহার্ঘ পণ্য ব্যবহারের সংকল্প অনেকের কাছেই হাস্যকর ঠেকতে পারে। কিন্তু কালক্রমে এই আন্দোলনের যে কী বিপুল আকার নেওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিংবা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কীভাবে তার বিস্তার ঘটবে, সে বিষয়ে আমরা একেবারেই সচেতন নই। স্বদেশী গানের লক্ষ্য এখন শুধু বিলেতি বস্ত্র, কিন্তু সেটা ভবিষ্যতে অন্যান্য বিদেশী পণ্য-বর্জন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি। ইংরেজরা যদি দেওয়ালের লিখন এখন না-দেখতে পায়, তবে অনতিদূর ভবিষ্যতেই তা দেখতে হবে। ভারতবর্ষের অবস্থার ক্রমাবনতি যদি অব্যাহত থাকে, যদি ভারতের মানুষ তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটছে না দেখে হতাশ হয়ে পড়ে, এবং যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এদেশের শিক্ষিত যুবসমাজ জাতিকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে, তাহলে আনুগত্য থেকে বিদ্রোহের পথে যেতে খুব দেরি হবে না, তখন বিলেতী জিনিসের প্রতি বীতরাগ বিলাতি শাসনের বিরুদ্ধতায় পর্যবসিত হবে। এসব স্বদেশী গান তখনও একই ভাবে গাওয়া হবে; শাসকের বিরুদ্ধে অভিসম্পাতের এক একটি শব্দ স্ফুলিঙ্গের কাজ করবে।"

তথাপি, এমনকি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবেও স্বদেশী কিন্তু আলোচ্য এই পর্বে ব্যাপক সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। এর কারণ, জাতীয় নেতৃত্বের এবং উদীয়মান ভারতীয় শিল্পপতিদের একাংশ স্বদেশীর বিরোধিতা করেছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বিরুদ্ধতা প্রকাশ্যেই ঘটেছে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা বোঝা গেছে আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের অভাব দেখে। এরা স্বদেশী আন্দোলনকে স্বাদেশিক চেতনার প্রকাশ বলে অভিনন্দিত করলেও, ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে একে অবাস্তব এবং এমনকি জনশক্তির অকারণ অপচয় বলে মনে করেছেন। এদের সবচাইতে বড় যুক্তি ছিল এই যে

আন্দোলন এক "ভুল অর্থনৈতিক চিন্তার" উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কারণ জনসাধারণ ভালো বা মাঝারি ধরনের বিলেতি কাপড়ও যে বর্জন করবে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না, সে সব-সময়েই চাইবে কম দামে ভাল জিনিস কিনতে। নিছক স্বদেশ-প্রেমের তাড়নায় এই স্বাভাবিক প্রবনতা উল্টে যাবে, এরকম ভাবা ঠিক নয়। কাজেই স্বদেশীর প্রচেষ্টা "বিফল হতে বাধ্য"। স্বাদেশিকতার বন্যা বইলেও, "জনগণকে ব্যাবসার সাধারণ নিয়ম থেকে এক ইঞ্চিও সরিয়ে আনা সম্ভব নয়।" সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, এমনকি শিক্ষিত যুক্তিশীল মানুষের কাছ থেকেও অন্য রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না। ওয়াচা প্রশ্ন করেছিলেন, ভদ্রলোকেরা কি তাঁদের স্ত্রী-ভগিনী ও সন্তানদের ভালো শাড়ি, জামা, ছিটকাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করতে নিষেধ করতে পারবেন? "খুব অস্বস্তিকর হলেও বাস্তব ঘটনা হল এই যে, সাধারণ ক্রেতা, তার বিদ্যাবুদ্ধি যাই হোক না কেন, স্বাভাবিক নিয়মেই দেশপ্রেমের ভাবালুতায় আপ্লুত হয়ে নিজের পছন্দ-অপছন্দকে বাতিল করে শস্তাদরে উৎকৃষ্ট জিনিস কেনা থেকে বিরত হবে না"। ভারতবর্ষে সে-সময় যে কাপড় ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হত, তা ভারতীয় কলকারখানায় উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কেননা ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল না; যন্ত্রপাতি কেনবার মত মূলধনও ছিল না। "বয়কট আন্দোলন তো আর গ্রীক দেবী মিনার্ভা নয় যে রাতারাতি কল-কারখানা তৈরি করতে পারবে"। "এক বছরের মধ্যে, এমনকি পাঁচ বছরের মধ্যেও, এত কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব নয় যাতে সমগ্র ভারতের চাহিদা মেটাতে ইংল্যান্ড থেকে কাপড় আমদানি না করলেও চলবে!" এই প্রসঙ্গেই ওয়াচা প্রায় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতই বলেছিলেন যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদন করতে আরও অন্তত বিশ বছর লাগবে।

এই বক্তব্যের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, তা হল এই যে, স্বদেশী আন্দোলন শুরু করার প্রকৃষ্ট সময়ের জন্য আরও তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, স্বদেশী শুরু করার আগেই কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে, স্বদেশীকে অনুসরণ করে কলকারখানা গড়ে উঠবে না। তবে ভারতীয় কাপড়-কলের উৎপাদনের স্বল্পতা তাঁতের সাহায্যে পূরণ করা অসম্ভব ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তাদের অনেকেই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু ওয়াচা ও তাঁর অনুগামীরা যে কোনো ধরনের কাপড়ের কথা বলেন নি, শুধু মিলের কাপড়ের কথাই বলেছেন; স্বদেশী আন্দোলন তাঁদের কাছে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের পরিবর্তে ভারতীয় মিলের কাপড়ের পক্ষে প্রচার আন্দোলন হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল। বিদেশী মিলের কাপড়ের পরিবর্তে ভারতীয় তাঁতের

কাপড়ের কথা তাঁরা ভাবেন নি। তাঁদের মতে, লক্ষ্য হ'ল "দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এবং পুনরুজ্জীবনের অর্থ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রগতি, ভুষিমাল চালানো নয়।" তাঁরা তাঁতের কাপড়কে মিলের কাপড়ের ক্ষতিকর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছেন। মিল মালিকদের হাত থেকে তাঁতীদের বাঁচানোর এবং তাঁত-শিল্পের সংরক্ষণের জন্য সুতোর উপর যে এক্সাইজ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াচা ১৯০১ সালে লিখেছিলেন—"মিলের কাপড়ের প্রধান প্রতিযোগী তাঁতীর তৈরি কাপড়। তাঁতীরা ভারতে তৈরী সুতো ব্যবহার করে, তাদের তৈরি কাপড়ের উপর কোন কর ধার্য করা হয় না। তাঁতীর দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এই ব্যবস্থা অবশ্যই ভালো, কেননা তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়, এবং এর ফলে তাদের ব্যবসায় উন্নতর সম্ভাবনা। কিন্তু মিলমালিকদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব।—এ-তো একধরনের সংরক্ষণের মধ্যেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা।"[২৩]

এর থেকে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বোম্বাইয়ের কাপড়-কলের মালিকরা এবং তাঁদের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিরা দেশীয় উৎপাদনের দ্বারা চাহিদা মেটাতে সক্ষম না-হওয়া পর্যন্ত -অর্থাৎ তাদের নিজেদের হিসেব অনুযায়ী অন্তত কুড়ি বছরের মধ্যে—বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন শুরু করা উচিত হবে বলে মনে করেন নি। তাঁরা অবশ্য 'খাদি' আন্দোলনকে সমর্থন করতে গররাজি ছিলেন না, কেননা ভালোভাবেই জানতেন 'খাদি' সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যাঁরা সন্দিহান ছিলেন, হয়তো একটা ভয়ও তাঁদের মনে উঁকি দিয়েছে, তা হল এই যে, স্বদেশী আন্দোলন করলে ইংরেজ শিল্পপতিরা ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নতুন কাপড়-কলগুলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিতে অস্বীকার করতে পারে। তাঁদের কাছে শাসকশ্রেণী ছিল দুর্জয় ক্ষমতাসম্পন্ন, তুলনায় ভারতীয়রা নিতান্তই দুর্বল। মোটকথা, কাপড়-কল মালিকদের মধ্যে স্বদেশীর প্রতি সমর্থনের অভাব এবং এমনকি বিরোধিতার মানসিকতার পিছনে দুটি কারণ কাজ করেছে : (১) এই বিশ্বাস যে, ভারতের কাপড়কলগুলির সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ ভারতের অন্তর্দেশীয় বাজারে এমনিতেই যথেষ্ট, সেজন্য কৃত্রিমভাবে বা জোর করে তা সম্প্রসারনের চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। মোটা কাপড়ের ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রায় একচেটিয়ার মত ছিল, ফলে এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁতশিল্পকেও সাহায্য করা যেতে পারত। এবং (২) নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তির, এবং মানুষের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষমতা ও শক্তির উপর বিশ্বাসহীনতা বা আস্থার অভাব। যার ফলে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

এইভাবে, জাতীয়তাবাদী নেতাদের একটি প্রভাবশালী অংশের এবং ভারতীয় মিলমালিকদের বিরোধিতার জন্য স্বদেশী আন্দোলন শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী

মানুষের ব্যাপক অংশের সমর্থন পেয়েও শক্তিশালী আন্দোলন হয়ে উঠতে পারেনি, এবং কখনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সরকারী অনুমোদন লাভ করেনি।

টীকা

১। "ভারতের বাইরে বিনিয়োগের অন্যান্য সব ক্ষেত্রই ধীরে ধীরে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ঐসব দেশে শুধু যে ব্রিটিশ মূলধনই বিনিযুক্ত হচ্ছে, তা নয়, বিশ্বের অন্যান্য সম্পদশালী দেশের মূলধনও আছে। এটা চলতে থাকলে শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন দীর্ঘকাল ব্যাংক ব্যবস্থার গোলকধাঁধায় আবদ্ধ ব্রিটিশ মূলধনকেও জোর করে বের করে এনে নতুন নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্রে চালিত করতে হবে। অর্থনৈতিক মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেই তা ভারতবর্ষে পথ খুঁজে নেবে, কারণ এখানে ব্রিটিশ আইন ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হবার বাড়তি সুবিধে আছে।" (কার্জন, 'বক্তৃতাবলী', খণ্ড-III, পৃঃ ১৩৪)।

এর আগে, কার্জন মন্তব্য করেছিলেন, "ব্রিটিশ মূলধন এদেশের (অর্থাৎ, ভারতের) জাতীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য" ('বক্তৃতাবলী', খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪)।

২। এই ঘটনাটি বহু ভারতীয় অর্থনীতিবিদের নজর এড়িয়ে গেছে। এমনকি "আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা" (বোম্বাই, ১৯৪৬)-র খুবই তথ্যাভিজ্ঞ লেখকদ্বয়, অধ্যাপক পি, এ, ওয়াদিয়া এবং অধ্যাপক কে, টি, মার্চেন্ট, এই ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন ; তাঁদেরও ধারণা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির আগে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব বিদেশী মূলধন সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থিত করেননি। ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট লিখেছেন ঃ "১৯২২ সালের আগে পর্যন্ত ভারতে বিদেশী মূলধন লগ্নির মূল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত জনমত গ'ড়ে ওঠেনি। করনীতি সংক্রান্ত কমিশনই প্রথম উল্লেখ করে যে ভারতীয়রা সুনির্দিষ্ট শর্ত ছাড়া বিদেশী মূলধন লগ্নির বিরুদ্ধে।" (আওয়ার ইকনমিক প্রবলেম, পৃঃ ৪৭৯-৮০)।

৩। দাদাভাই প্রথম জীবনে বিদেশী মূলধন আমদানিকে ভারত থেকে ইংলণ্ডে অনিবার্য সম্পদ-নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আংশিক বাধা, এবং ক্ষতিপূরণ, বলে মনে করেছিলেন।

৪। "বিদেশী শোষকরা পঙ্গপালের মত সমগ্র দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে অস্থি-মজ্জা সব খেয়ে নিঃশেষ করবে। তাতে এদেশের মানুষ কীভাবে উপকৃত হতে পারে? লাভের টাকা অন্যত্র চলে যাচ্ছে ; সময় হ'লে মূলধনও তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।" Rep. INC ১৮৯৯, পৃঃ ৫৯)।

৫। "নিউ ইণ্ডিয়ার" পরের সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন ঃ "বর্তমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতিতে আমরা বিদেশী শিল্পপতিদের উদ্যোগে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত প্রতিটি শিল্পকেই নতুন বিপদের আশংকা হিসেবে দেখতে বাধ্য হচ্ছি" (১৯শে আগস্ট, ১৯০১)। 'কেশরী' পত্রিকায় ১৮৯০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রীতিমত ঘোষণা করা হয়েছিল—"মহাদেব (অর্থাৎ রাণাডে) বিদেশী মূলধনের প্রশস্তি গাইছেন ; তিনি দেশের শত্রু।"

৬। ১৮৯৯ সালে ওয়াচা মন্তব্য করেছিলেন ঃ "একমাত্র দেশীয় সম্পদই কাজের। দেশীয় মূলধন আরো নতুন মূলধন সৃষ্টি করবে। প্রক্রিয়াটি ধীরগতি হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই তা ঘটবে।"

৭। নিষ্কাসন তত্ত্বের জনক দাদাভাই নৌরজি এই মতটি খুব জোরের সঙ্গে ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় নেতারা সমর্থন জানিয়েছেন।

৮। ১৯০৩ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তিরস্কার করে কার্জন মন্তব্য করেছিলেনঃ "ভারতে বিদেশী মূলধন এলে তা এদেশের সম্পদ নিষ্কাসন করে আরো দারিদ্রের কারণ হয়ে দেখা দেবে—এই তত্ত্ব আমার অনেক সময়েই অজ্ঞতাপ্রসূত ও মারাত্মক রকমের বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়েছে।···গ্রেট ব্রিটেন যখন আমেরিকা বা চীনদেশে মূলধন বিনিয়োগ করেছে, তখন তো কেউ অভিযোগ করে বলেননি যে তার ফলে ঐ দেশগুলির সর্বনাশ হয়ে গেছে। একটি বিদেশী রাষ্ট্র মিশরের নীল নদে বাঁধ নির্মাণ করলে বা অন্যান্য শিল্প গ'ড়ে তুললে, তার জন্য কেউই মিশরকে কৃপাপ্রার্থী মনে করেনি। রাশিয়াতেও প্রথমে বিদেশী মূলধন ও প্রযুক্তির সাহায্যে শিল্প গ'ড়ে উঠেছিল, এখন তা দেশের পক্ষে লাভজনক হয়ে উঠেছে। আমেরিকা যখন তার সঞ্চিত মূলধন, বিস্ময়কর উদ্ভাবন-ক্ষমতা, এবং বাণিজ্যিক প্রতিভা দিয়ে ইংলণ্ডকে প্লাবিত করে, আমরা তখন বাড়িতে ব'সে আমাদের সম্পদ নিষ্কাশিত হয়ে গেল বলে হায়, হায় করিনে।" (বক্তৃতাবলী, খণ্ড-।।, পৃঃ ১৪০)।

৯। "ওয়েলবি কমিশন" এ প্রদত্ত প্রতিবেদনে দাদাভাই লিখেছিলেনঃ "ব্রিটিশ ভারতের ন্যায়-পরায়নতাহীন, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রথমেই এদেশকে তার উৎপন্ন দ্রব্য অথবা নিজস্ব সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেশটিকে মূলধনহীন অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে, তারপরে বিদেশী পুঁজিপতিরা এসে এই ধ্বংসযজ্ঞকে সম্পূর্ণ করছে।" এবং "আমাদের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই, সবটাই বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৩৮২ এবং ৩১৯)।

১০। দাদাভাই লিখেছিলেন, বিদেশী প্রভুরা "প্রথমে ভারতকে লুট-করে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হতভাগ্যে পরিণত করেছে, তারপরে ঐ লুঠ-করা সম্পদকে এখন নিজের বলে চালিয়ে এ-দেশের ভূমি ও শ্রম-সম্পদকে শোষণ করার কাজে লাগাচ্ছে।' (দারিদ্র, পৃঃ ৫৬৮)।

১১। ১৯০১ সালে বিপিন চন্দ্র পালের লেখাতেও একই মনোভাব দেখা গেছে—"বিদেশী পুঁজিপতিরা আমাদের সম্পদ শোষণ করে বছরে শতকরা ১০ থেকে ১৫ টাকা হারে মুনাফা লুঠছে এবং তার ফলে, মাত্র ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে তাদের মূলধন দ্বিগুণ হয়ে আরও বেশী শোষণের কাজে লাগছে। এই ভাবে আমাদের বোঝা বাড়তেই থাকবে, আমাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ যুগ-যুগ ধরে বাইরে চলে যাবে, আর ভারতবর্ষের নিরন্ন সাধারন মানুষ চিরন্তন দারিদ্রে নিমজ্জিত হতে থাকবে।" (নিউ ইণ্ডিয়া, ১৮ই নভেম্বর, ১৯০১)।

১২। ১৮৮৫ সালে যোশি লিখেছিলেনঃ "রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে—আমরা যদি ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা না করে থাকি—ক্ষমতা সম্পত্তি ও সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য। ফলে একটি শক্তিশালী বিদেশী বাণিজ্যিক স্বার্থ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরক্তিকর সক্রিয় প্রভাব না-হয়ে যায় না ; সর্বদাই সে চেষ্টা করবে ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজ-স্বার্থের অনুকুলে সিদ্ধান্তকে আনতে এবং সরকারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে।" (রাইটিংস এ্যাণ্ড স্পিচেস, পুনা, ১৯১২, পৃঃ ৭৪০)।

১৩। ১৯০১ সালের ১০ই জুন 'বেঙ্গলি' পত্রিকা লিখেছিলঃ "ব্রিটিশ মূলধনের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও তজ্জাত জটিল স্বার্থের জন্যই প্রকৃতপক্ষে ভারতের সরকার পরিচালনায় ব্রিটিশ প্রবৃত্তি ও ঐতিহ্যের স্বাধীন প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছে। যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বিগত বছরগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের সরকারের বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে, তার কারনও এই ঘটনা।···এইটাই আসল কারন, যার জন্য আমাদের প্রতিনিধিদের বাজেট তৈরিতে অংশ নিতে দেওয়া হয়না, কেননা আশঙ্কা আছে এই সুযোগ দিলে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে যা বিদেশী শোষকদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।"

১৪। ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে বিপিন চন্দ্র পাল "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতীয় প্রতিনিধিদের বাজেট সম্পর্কে মতদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য একটাই—ব্রিটিশ মূলধনের স্বার্থ সংরক্ষণ। ১৯০৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গলি' লিখেছিল—ভারতে ব্রিটিশ সরকার 'চেম্বারের' ক্রীড়নক, "কুমোড় যেমন মাটির দলাকে ইচ্ছেমত কাজে লাগায়, 'চেম্বারও' তেমনি সরকারকে ইচ্ছেমত কাজে লাগাচ্ছে।"

১৫। যোশিও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং ভারতের অর্থ বিনিয়োগ করে বাগিচা-শিল্প গ'ড়ে-তুলে পরে তা ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন।

১৬। 'একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ' ব্যতিক্রম দেখা যায় ১৮৮৩ সালের ২৮শে জুলাই 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মন্তব্যে। বেঙ্গলি লিখেছিল—"আমরা বুঝতে পারছি না একমাত্র কিছু-কিছু বাধাসৃষ্টিকারী আইন প্রত্যাহার করার পরোক্ষ উপায় ছাড়া অন্য কীভাবে সরকারের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সাহায্য করা সম্ভব।"

১৭। এ-বিষয়ে জি ভি. যোশির মতামত তাঁর "বক্তৃতাবলী ও অন্যান্য লেখায়" পাওয়া যায়। ১৮৮৫ সালে যোশি লিখেছিলেন—"প্রথমেই আমাদের সরকারকে পুরোপুরি সহযোগী হিসেবে পেতে হবে। আমাদের বর্তমান অনুন্নত অবস্থায় সরকারের সাহায্য ছাড়া জাতীয় অগ্রগতির জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমরা যখন তীব্র প্রতি-যোগিতার সম্মুখীন।—সরকারকে আমাদের প্রকৃত অভাব কী তা বুঝতে হবে, এবং জাতীয় শিল্পের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।"

১৮। ১৮৮০ সালের ফিন্যান্স কমিশন স্বর্থহীন ভাষায় এই নীতি ঘোষণা করেছিল। শিল্পায়নের গুরুত্ব স্বীকার করলেও, কমিশন মনে করেছিল প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপে শিল্পায়ণ সম্ভব নয়, কারণ তার ফলে "সুস্থ বাণিজ্য-নীতি লঙ্ঘন করা হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাধা পাবে।" সেজন্য, কমিশন প্রস্তাব করে যে সরকারের উচিত পরোক্ষ উপায়ে রেলপথের বিস্তৃতি ঘটিয়ে কিংবা স্থানীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়ে" শিল্পায়ণে সাহায্য করতে হবে।

১৯। বিশেষ করে লৌহ বা ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই গ্যারাণ্টি অতীব প্রয়োজন বলে রাণাডে মনে করেছিলেন। কেননা—"এই শিল্পে প্রথম কয়েকটি পরীক্ষামূলক বছরে লাভের প্রত্যাশা করা যায় না" এবং সেজন্য "রেলওয়ে শিল্পকে যেভাবে উদার হস্তে সাহায্য করা হয়েছে সেরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না-থাকলে কোনো পুঁজিপতিই তার মূলধন বিনিয়োগ করার ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না।" (রাণাডে, বক্তৃতাবলী পৃঃ ১৬৮-৯)।

২০। ১৯০১ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন—"এটা বিশ্বাস্য যে, সরকার জাতীয় শিল্পের উন্নতি চাইলে পরিশ্রমী, দক্ষ ভারতবাসীকে উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে পারে। যেভাবে আমাদের এই প্রজন্মেই জাপানে করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মুনাফা-শিকারী বিদেশী বণিক-শিল্পপতি এই কাজ করবে, সেটা অকল্পনীয়। কাজেই, স্বাভাবিক ভাবেই, সে চেষ্টা হয় নি।" (ইকনমিক হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৮৯)।

২১। বোস আরও উল্লেখ করেছেন যে নাগপুরের কামারদের "ছুরি-কাঁচি তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, এবং তারপর বিশেষভাবে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে সেগুলো কিনে দেশের সর্বত্র বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এইভাবে আমাদের তাঁতিদের কাজে লাগে যেসব যন্ত্রপাতি সেগুলোও তৈরি-করে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য।"

২২। লক্ষনীয় যে, সে-সময় কারোরই মনে হয়নি, এদেশের শিল্পজাত পণ্যের দাম কমানোও স্বদেশীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা সুতি শিল্পের ক্ষেত্রে অন্তত, এদেশের শিল্পপতিরা দাম চড়া রেখে বিপুল পরিমানে মুনাফা লুঠছিল।

২৩। বোম্বাই-এর "মিল ওনারস্ এ্যাসোসিয়েশনের" সভাপতি জাতীয় নেতা না-হওয়া সত্ত্বেও ১৮৯৯ সালে "এ্যাসোসিয়েশনের' বার্ষিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় অনেক বেশি স্পষ্ট করে বক্তব্যটি রেখেছিলেন ঃ "আমরা মিল মালিকেরা কখনই এই অভিযোগ করি না যে সুতি বস্ত্রের উপর আরোপিত এক্সাইজ শুল্ক ইংলণ্ড থেকে আমদানি-করা বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আমাদের এ্যাসোসিয়েশন সর্বদাই একথা বলে এসেছে যে ল্যাংকাশায়ারে তৈরি ভালো কাপড়ের সঙ্গে আমাদের মোটা কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই ওঠে না। এক্সাইজ শুল্ক বাস্তবে তাঁত শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে, এটা নিঃসন্দেহে সত্য ; এবং সেজন্য দেখা যাচ্ছে তাঁতশিল্পে সুতোর ব্যবহার প্রতিবছরই বাড়ছে। কিন্তু, ১৮৯৬ সালের পর বোম্বাই-এর কাপড়-কলের মেশিন-তাঁতের সংখ্যা একটিও বাড়েনি।"

২৪। এই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা-করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে ভারতীয় সুতি-শিল্প সাধারণ মোটা কাপড়ের বাজারে ল্যাংকাশায়ারের কাপড় বিক্রি বন্ধ করে দিতে পেরেছিল, কিন্তু মাঝারি বা উৎকৃষ্ট কাপড় উৎপাদন ততটা বাড়াতে পারেনি। অথচ দেখা গেছে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে, দেশীয় হস্তচালিত তাঁতশিল্পে উৎপন্ন কাপড় শুধু ভারতীয় কাপড় কলগুলিতে তৈরি মোটা কাপড়েরই নয়, এমনকি ল্যাংকাশায়ারের মাঝারি ও মিহি কাপড়েরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল স্বদেশীর ফলে ; এই সময় স্বদেশী আন্দোলন প্রাথমিক ভাবে তাঁতশিল্পের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবশ্য অবস্থা একেবারেই পাল্টে গিয়েছিল। কারণ, এর মধ্যেই ভারতের কাপড় কলগুলি মাঝারি, এমনকি মিহি কাপড়ও প্রচুর পরিমানে উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে।

৪

বৈদেশিক বাণিজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে—বিশেষ করে ১৮৫০ সালের পরে—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছিল। কার্যত একটি বাণিজ্যিক বিপ্লবই ঘটে গিয়েছিল। আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য, মূল্যে এবং পরিমাণে, উভয়তই অনেকটা বেড়েছিল। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং লক্ষ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনের চেহারা নীচের সারনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ[১]

(লক্ষ টাকার হিসেবে)

					আমদানী	রপ্তানী
বার্ষিক গড়	··১৮৩৪-৩৫	থেকে	১৮৩৮-৩৯	পর্যন্ত	৭.৩২	১১,৩২
”	” ···১৮৪৯-৫০	”	১৮৫৩-৫৪	”	১৫,৮৫	২০.০১
”	” ···১৮৫৯-৬০	”	১৮৬৩-৬৪	”	· ৪১.০৬	৪৩,১৭
”	” ··১৮৬৯-৭০	”	১৮৭৩-৭৪	”	· ৪১.৩০	৫৭,৮৪
”	” ···১৮৭৯-৮০	”	১৮৮৩-৮৪	”	·· ৬১,৮১	৮০,৪১
”	” ···১৮৮৯-৯০	”	১৮৯৩-৯৪	”	· ৮৮,৭০	১০৮,৬৭
”	” ··১৮৯৯-১৯০০	”	১৯০৩-০৪	”	··· ১১০,৬৯	১৩৬,৫৯
বছর	” ···১৯০৪-০৫	”			··· ১৪৩.৯২	১৭৪,১৪

[বিঃ দ্রঃ সরকারী ভাণ্ডার ও সঞ্চয় তহবিলের হিসেব এর অন্তর্ভুক্ত]

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের গঠনে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। ১৮১৩ সালের আগে অতি প্রাচীন কাল থেকেই—ভারতবর্ষ প্রধানত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করত, বিনিময়ে আমদানি করত মূল্যবান ধাতু এবং বিলাস-পণ্য। কিন্তু ১৮১৩ সালের পর, বিশেষ করে ১৮৫৮ সাল থেকে, ভারত ধীরে-ধীরে কৃষিজাত কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি-কারকে পরিণত হল, আমদানি করতে লাগল ইউরোপের শিল্পজাত পণ্য। আবহমান কাল ধরে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের মুখ্য পণ্য ছিল সুতী এবং

পশমের কাপড়, ধীরে-ধীরে তার জায়গা নিল নানা ধরনের কৃষিজাত পণ্য। যার মধ্যে প্রধান হল তুলো ও পাট, চা ও কফি, আফিং, তৈল-বীজ এবং ধান ও গম। ১৮৮১-৮২ সালে এবং ১৯০৪ থেকে ৫ সালে শেষের দুটি পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে মোট রপ্তানির শতকরা ১৭ এবং ২৬ ভাগ। এই সময় আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান স্থান নিয়েছিল সুতী-বস্ত্র ও সুতো, ধাতু, যন্ত্রপাতি, চিনি, তেল প্রভৃতি। এর মধ্যে শুধু সুতো-জাত পণ্যের পরিমাণ ছিল ১৮৮১-৮২ ও ১৯০৪-৫ সালে যথাক্রমে মোট আমদানির শতকরা ২৪ ও ৩৯ ভাগ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন উৎসাহ-ব্যঞ্জক প্রবণতা দেখা গেল। এই সময় একদিকে লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের আমদানির পরিমাণ বাড়ছিল ; অন্যদিকে, আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপন্ন সুতো এবং পাটজাত বস্ত্রাদি রপ্তানি আবার নতুন করে দেখা গেল, এবং তার গুরুত্বও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল।

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে একটি স্বাভাবিক অথচ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের হারের ক্রমাগত বৃদ্ধি। ১৮৫৬ সালের পরে মাত্র সাত বছর এটি দেখা যায় নি। ভারতীয়দের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১. জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টি জাতীয় নেতাদের বিশেষ করে উত্তেজিত করেনি বা তাদের চিন্তা ভাবনাকে তেমন ভাবে আকর্ষণ করেনি। অংশত এই কারনে যে একে আন্দোলনের বিষয়ে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় নেতারা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার নানাদিক সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু কখনই এই সমস্যাকে জাতীয় আন্দোলনের যোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখেন নি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিকে জাতীয় নেতারা কখনই খুব কল্যাণকর মনে করেননি, এবং সেজন্য, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করেন নি। তাঁদের কাছে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুধু এই কারণেই যে, তা ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যাকে—যেমন, দারিদ্র, শিল্পায়ন, বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণ, ইত্যাদি—প্রভাবিত করেছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণকে তাঁরা অন্যান্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তার ফলাফলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, প্রশংসা বা নিন্দা কোনটাই করতে চাননি।

ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি এবং তাদের মুখপাত্ররা বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত

প্রসারকে এদেশের পক্ষে বিশেষ সুফলদায়ী মনে করেছিলেন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের স্পষ্ট অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে বার বার দেখাতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য সবাই এ-বিষয়ে একমত ছিলেন না। এঁদের কেউ-কেউ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে, এই দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুললেন—দেশের আকৃতি এবং জনসংখ্যার তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য কি সত্যিই খুব একটা বেড়েছে? ১৮৮৭ সালে দাদাভাই নৌরজী দেখালেন ইউরোপের দেশগুলি এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের তুলনায় "ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কত নগণ্য"। রমেশ চন্দ্র দত্ত, ডি. ই. ওয়াচা এবং জি. এস আয়ারও একই কথা বলেছেন। তাঁদের আরেকটি বক্তব্য এই ছিল যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটলেই তাকে সমৃদ্ধির লক্ষণ বলা যায়না, এবং সেজন্য উল্লসিত হওয়ারও কারন নেই। তাঁরা আন্তর্জাতিক পণ্য বিনিময় বৃদ্ধির সাধারণ সুফলকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু যেটা মানতে রাজী হননি তা হল, বাণিজ্যের মোট-মূল্য ও পরিমাণ বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক অগ্রগতির অথবা অবিমিশ্র কল্যানের সুনিশ্চিত সূচক। তাঁরা মনে করেছেন, ইউরোপের বাণিজ্যিক জাতিগুলির ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার জাতীয় আয়ের পরিস্থিতিকে অনেকটা সঠিক ভাবে প্রকাশ করলেও ভারতবর্ষের মতো দেশে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা না-থাকায় ঐ ছক ব্যবহার-যোগ্য নয়। কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি মানেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই-ধরনের বক্তব্য অতি সরল, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা। তার উপর, প্রকৃত ঘটনা যা তার বিবরণ এমনকি অর্ধ-সত্য-হলেও, মারাত্মক। ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল— "বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক কাজকর্ম অথবা বাণিজ্যের প্রসার সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, তা হবে অনেকটা বয়স, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে এই তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো বাতুলতা।" জি. ভি. যোশি বিষয়টিকে বিচার করেছিলেন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। ১৮৮৯ সালে তিনি লিখলেন: "বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে মানেই দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধি হয়েছে, একথা বলা যায় না। বাণিজ্য পণ্য বন্টন করে। তা নতুন যোগান সৃষ্টি করবেই, এমন দাবী করা যায় না।—"[২] রমেশ চন্দ্র দত্তও সাম্প্রতিক অতীতের প্রেক্ষাপটে বিচার করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন—

"১৮৮১-৮২ সনে লর্ড রিপনের শাসনকালে শান্তি এবং তুলনামূলক সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। সে-সময় ভারতের আমদানি ও রপ্তানির মোট-মূল্যের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড। কিন্তু, ১৯০০ থেকে ১৯০১ সালটি

ছিল দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশার বছর। তা সত্ত্বেও ঐ বছর মোট আমদানি-রপ্তানির পরিমান দাঁড়িয়েছিল ১২ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড। ভারতবর্ষকে জানেন অথবা এদেশ সম্পর্কে শুনেছেন এমন কোন ব্যক্তি কি বলবেন যে, ১৮৮১-৮২ সালের তুলনায় ১৯০০-০১ সালে আয় বেড়েছিল, ভারতবাসী বেশী পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পেয়েছিল, কিংবা তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল ?”

প্রশ্ন হ'ল বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং জাতীয় সমৃদ্ধির মধ্যে সহজ কার্য-কারণ সম্পর্কটিকে জাতীয় নেতারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছিলেন কেন ? তাঁদের মতে, এর একটি কারন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধি স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে ঘটেনি, এবং তা অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি ছিল না। এই বৃদ্ধি ঘটেছিল অস্বাভাবিক পথে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে, এবং সেজন্য একে জোর-করে-করা কৃত্রিম, অস্বাস্থ্যকর এবং 'অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুস্থ' বলা যায়। এই পরিচ্ছেদেই পরে এই মত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এখানে প্রসঙ্গত শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে ছিল এই বিশ্বাস —প্রায় অন্ধ বিশ্বাসের মতোই—যে কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদক হওয়াই ভারতবর্ষের 'স্বাভাবিক' নিয়তি ছিল না ; এবং দেশটিকে জোর করে কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদকে পরিণত করলে সেটা অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক হতে বাধ্য। জমির পরিমাণ সর্বদাই সীমিত ও অপর্যাপ্ত হয় ; কিন্তু এদেশে শ্রম অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারা মনে করেছেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের তাৎপর্য শুধুমাত্র বাণিজ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই অনুধাবন করা যায় না, বাণিজ্যের মোট পরিমাণ অপেক্ষা কী-ধরনের পণ্য বিনিময় হচ্ছে এবং জাতীয় কৃষি ও শিল্পের উপর তার প্রভাব কী, তা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। বাস্তবিক পক্ষে এগুলিই “মূল প্রশ্ন”। জাতীয়তাবাদী নেতাদের চিন্তা-ভাবনা এগুলির দ্বারাই সব থেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁরা বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করে কাঁচামাল রপ্তানি এবং শিল্পজাত-পণ্য আমদানির প্রবণতার ক্ষতিকর দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরা দেখাতে চাইলেন, এর ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের কৃষি উৎপাদনশীল উপাঙ্গে পরিণত হচ্ছিল। জাতীয় নেতাদের বেশির ভাগই এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন যে, এই ঘটনা স্বাভাবিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল নয়, বরং “ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলন্ডের সুনির্দিষ্ট নীতির” ফল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অগ্রণী জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদেরা আধুনিক শিল্পজাত পণ্যাদি রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদির আমদানি প্রক্রিয়াটিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ করেছিলেন, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দেখা গিয়েছিল।

এবং একে স্রোতের 'গতিমুখ পরিবর্তনের' লক্ষণ বলে স্বাগতও জানিয়েছিলেন : কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই বিষয়েও, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে, এই প্রবণতা ছিল দুর্বল ও অপ্রতুল, এবং ক্রমহ্রাসমান। পরে এই পরিচ্ছেদেই এবং "শুল্ক" ও "মুদ্রা ব্যবস্থা" ও "বিনিময়" সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে দেখানো হবে যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই একটিমাত্র প্রবণতাকেই জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতে—কী পরিস্থিতিতে এবং কী কী শর্তে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, তাও খতিয়ে দেখার মত। ভারতবর্ষ কি বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ভোগ করছিল? ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য কাদের হাতে ছিল, কারা একে নিয়ন্ত্রণ করত? এবং, এর থেকে পাওয়া মুনাফাই বা কাদের পকেটে যেত? যেসব পণ্য বিনিময় হচ্ছিল সেগুলি কি জাতীয় উদ্বৃত্ত, বিলাস-সামগ্রী, নাকি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি? আমদানি রপ্তানি স্থিতির (অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যের) পরিমাণটাই বা কী ছিল? এবং কী তার কারণ?—এই ধরনের কিছু প্রশ্ন জাতীয় নেতারা তুলে ধরেছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাঁরা এগুলিকে বিবেচ্য বলে মনে করেছিলেন।

মোট কথা, সমগ্র বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার কখনই অর্থনৈতিক কর্মসূচীর লক্ষ্য হতে পারে না। প্রথমেই দেখা দরকার, এর ফলে দেশ কী পরিমাণ লাভবান হয়েছে, অথবা ক্ষতি হয়েছে কতটা। সাবধানী পর্যবেক্ষকদের তার পরেও লক্ষ করতে হবে, এই বাণিজ্যের উৎস ও প্রকৃতি কী, জাতীয় কল্যাণের উপর তার প্রভাব কতটা। শুধু বাণিজ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত হিসেব দেখলেই হবে না—।

২. বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল

ভারতীয় নেতারা সাধারণভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুফল সম্পর্কে যে প্রচার চলছিল, তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ভারতবাসী সাধারণকে সে-বিষয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। সামগ্রিক ফলাফলের হিসেবে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি যে ক্ষতিকর হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন। তাঁরা প্রথমেই বর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের প্রভাব ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, তা কখনই জাতীয় উন্নতি কিংবা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ নয়। কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করা হয়েছে অংশত বিদেশী শিল্পজাত পণ্য আমদানির বাড়তি মূল্য মেটাতে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে যা নিতান্তই ক্ষতিকর, এবং অংশত বিদেশী শাসন-পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য, অর্থাৎ

"শ্বেত শাসকদের ভয়ানক মহার্ঘ সেবাকার্যাদির মূল্য দিতে"। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই জাতীয় নেতারা উদ্বৃত্ত রপ্তানির পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি বৃদ্ধির দুর্নীতির কারণটিকে বিশেষ করে খতিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ১৮৩৪—৩৬ থেকে ১৮৩৮-৩৯ পর্যন্ত এই পাঁচ বছর রপ্তানী উদ্বৃত্ত ছিল গড়ে চার কোটি টাকা, ১৮৬৯—৭০ থেকে ১৮৭৩-৭৭ এই পাঁচ বছরে তা হয়েছিল ১৬ কোটি টাকা, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩-৪ এই পাঁচ বছরে ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ১৯০৪ থেকে ১৯০৫এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আমদানি থেকে রপ্তানি বেশি হওয়ার ফলে এই উদ্বৃত্তের অবিচল বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে সব দিক থেকে বিচার করে এটিকে তাঁরা "অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত"[৪] মনে করে উল্লসিত হতে রাজী হন নি; বরং এর জন্য গভীর উদ্বেগ বোধ করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদী নেতারা সমস্যাটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হওয়ায় যে উদ্বৃত্ত ঘটছিল সেটি প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত নয় অর্থাৎ, এটি সেই অনুকূল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য স্থিতির লক্ষণ নয়, যার ফলে স্বর্ণ অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি বাড়ানো যায় তাঁদের মতে, এটি সত্যিই একটি অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের ফলে উদ্বৃত্ত অর্থাগম হয় নি, কিংবা দেশ কোনোভাবেই লাভবান হয় নি। ১৮৭১ সালেই দাদা ভাই নৌরজী এই উদ্বৃত্ত রপ্তানির ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, এর ফলে "রৌপ্য-মুদ্রা অথবা অন্যান্য পণ্যের মাধ্যমে আমদানি বাড়ে নি"। 'ভারতের দারিদ্র' শীর্ষক লেখায় তিনি বিষয়টিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থিত করেছিলেন। যেসব লেখক খুব সহজেই ধরে নিয়েছিলেন যে, "ভারতের পক্ষে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের ফলে কোনো-না-কোনো সময় ভারতবর্ষ লাভবান হবে" তাদের ভর্ৎসনা করে দাদাভাই লিখেছিলেন: "তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, রপ্তানির তুলনায় আমদানির এই যে ঘাটতি তার একটি পয়সাও নগদে বা পণ্যে ভারত কখনই পাবে না।" ১৮৯৮ সালে মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত কমিটির (ইণ্ডিয়ান কারেন্সী কমিটি) কাছে প্রতিবেদনে দাদাভাই রীতিমতো 'ক্রোধ' প্রকাশ করেছিলেন; তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল: "এই বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তকে ভারতের পক্ষে অনুকূল উদ্বৃত্ত-বাণিজ্য বলার অর্থ ভাষার অপব্যবহার, এটি 'বাণিজ্য ও নয় 'বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত'ও নয়···এই বিশাল পরিমান অর্থ—প্রতি বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা—ভারত কি কখনও স্বোপার্জিত বলে ফিরে পাবে?" বস্তুত একমাত্র রানাডে ছাড়া ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে অর্থনীতিবিদ আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই দাদাভাই-এর সঙ্গে একমত হয়ে এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের ফলে "কোনো

বাণিজ্যিক প্রতিদান" পাওয়া যাবে না, এই মত প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

প্রশ্ন হল ঃ রপ্তানি বাণিজ্যের এই উদ্বৃত্ত প্রকৃত পক্ষে কী ছিল?' "উদ্বেগ জনক এই ব্যতিক্রম"-এর প্রকৃত তাৎপর্যই বা কী ছিল? ভারতীয়দের মতে, রপ্তানিতে এই উদ্বৃত্ত প্রয়োজন হয়েছিল তিনটি কারণে—(ক) ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের সুদের দায় মেটাতে; (খ) দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ব্যয়ভার বহনের জন্য; এবং (গ) ভারতবর্ষে অবস্থানরত ব্রিটিশ প্রশাসক, বণিক, বাগিচা-মালিক এবং মূলধনের মালিকদের সঞ্চয় এবং মুনাফা বাবদ প্রাপ্ত আয় দেশে পাঠানোর সুবিধের জন্য, অর্থাৎ ক্রমাগত বর্ধমান অর্থনৈতিক শোষনের ফল আদায়ের জন্য। সংক্ষেপে বললে, "আমদানির তুলনায় রপ্তানির এই আধিক্য ছিল বিদেশী শাসকদের প্রতি ভারতবাসীর বশ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ কর প্রদান।" এই উদ্বৃত্ত ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি তো করেই নি, আসলে এটি ছিল 'সম্পদ নিষ্কাশনের' একটি রূপ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সম্পদ ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত করার একটি পদ্ধতি মাত্র। স্বর্ণপিণ্ড (বুলিয়ন) অপ্রাপ্য হওয়ায় এই সম্পদ স্থানান্তর করতে হয়েছে পণ্যের মাধ্যমে। তার জন্য অনুকূল বাণিজ্য বজায় রাখা ছিল অপরিহার্য। এবং সেজন্যই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি উদ্বৃত্ত শুধু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই নয়, প্রায় নিয়ম হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য, রপ্তানী বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও সম্পদ নিষ্কাশনের মধ্যে এই গভীর সংযোগটি প্রথম তুলে ধরেন দাদাভাই নৌরজী, ১৮৭১ সালে। ১৮৯৫ সালে তিনি এটিকে স্পষ্ট সূত্রাকারে উপস্থিত করেন ঃ 'এই ভাবেই ব্রিটিশ ভারতের দরিদ্র মানুষ বিদেশীর চাহিদা মেটাচ্ছে, বাণিজ্যের মুনাফা যোগাচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে নিষ্পেষিত হয়ে বশ্যতা কর প্রদান করছে।" অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা দাদাভাইকে সমর্থন করেছিলেন। যোশি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার সাহায্যে দেখালেন -মোট যে পরিমান সম্পদ এদেশে থেকে নিষ্কাশিত হচ্ছিল "উদ্বৃত্ত রপ্তানি" ছিল তার একাংশ ঃ "রপ্তানি উদ্বৃত্ত রূপে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে পাঠানোর আবশ্যকতা থেকেই রপ্তানি বাণিজ্যের এই উদ্বৃত্ত বাধ্যতামূলক হয়েছে।" রমেশ চন্দ্র দত্তও দ্বিতীয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ঃ "ভারতের শাসন ব্যয়-ভার (Home Charges) নির্বাহের জন্য সম্পদ নিষ্কাশন আবশ্যক হয়েছে এবং সেজন্যই আমদানির থেকে রপ্তানি বেশী করতে এ দেশকে বাধ্য করা হয়েছে।" দত্ত মন্তব্য করেছিলেন—"১৮৯৬ থেকে ১৯০০-র দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতেও ভারতকে যে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত বজায় রাখতে হয়েছিল, তার থেকেই এই বাধ্যতার চরিত্রটি ধরা পড়ে।" তিনি দেখালেন যে, রপ্তানি উদ্বৃত্ত আসলে 'বশ্যতাকর'। এই সম্পর্কটি সে সময়ে পরোক্ষ ও গোপন হলেও, অতীতে তা ছিল না। ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করত তখন সব বিনিয়োগই হত সাম্রাজ্যের আয় থেকে অর্থাৎ তখন সম্পর্কটা ছিল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর, এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সরকারীভাবে স্বীকৃত।

অমৃতবাজার পত্রিকা রপ্তানি উদ্বৃত্ত ও সম্পদ নিষ্কাশনের সম্পর্কটিকে প্রায় নাটকীয় কায়দায় উপস্থিত করেছিল। সম্পাদক মতিলাল ঘোষ-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় অনুধাবন করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ১৮৯৬ সালের ১১ই জানুয়ারি এই পত্রিকায় সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হল—বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া ভারতবর্ষকে শোষণ করা সম্ভব নয়, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকলে 'স্বরাষ্ট্র সচিব ও অনান্য সামরিক ও বেসামরিক আমলারা ভারত থেকে সরাসরি অর্থ নিয়ে যেতে হয়তো পারত এবং তার ফলে এ দেশের অর্থের ভাণ্ডার সংকুচিত হত ঠিকই, কিন্তু আসল সম্পদ, উৎপন্ন পণ্য, দেশেই থেকে যেত, তাতে ভারতবাসীর সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের অভাব হ'ত না।'

এই কারনেই বেশির ভাগ ভারতীয় নেতা উদ্বৃত্ত বাণিজ্যকে ভালো লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে উল্লাসিত হননি। অস্বাভাবিক উদ্বৃত্ত বাণিজ্য আসলে ক্রমবর্ধমান শোষণ ও সম্পদ-নিষ্কাশনের উপায়। নেতারা সঠিক ভাবেই মনে করেছেন, কৃষিজাত কাঁচামালের রপ্তানি-বৃদ্ধি কৃষির উন্নতির লক্ষণ নয়, বরং তা প্রমাণ করে "কৃষির সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ মানুষের দাসত্ব আরও বেড়েছে" এবং "বৈষয়িক দিক থেকে নিঃশেষিত" মানুষের উপর ঐ "'অতিরিক্ত বোঝা" আরও বেশি দারিদ্রের কারন হয়েছে। সদাশয় ইংরাজ সরকার ভারতের উন্নতি এবংএদেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কত কিছু করছেন, এটা তারই মূল্য, এই যুক্তিতেই কি তা সমর্থনীয়? এই প্রশ্নের মূলে যে প্রতিজ্ঞাটি আছে জাতীয়তাবাদী নেতারা সেটিকে গ্রাহ্য বলে মনে করেন নি—'সম্পদ নিষ্কাশন" সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তাছাড়া তাঁরা দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছিলেন। যেমন, জি. ভি. যোশি লিখেছিলেন—''বাণিজ্যিক দিক থেকে এটা অবশ্যই ক্ষতি, অন্যদিক থেকে দেখলে যাই মনে হোক না কেন। কাজেই দেশের মোট বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতির জমা খরচে সে হিসেব করতেই হবে।"

ভারতীয় নেতারা ক্রমবর্ধমান আমদানির ঘটনাকেও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। আমদানির প্রায় পুরোটাই ছিল শিল্পজাত পণ্য। ইংরেজ শাসকরা দাবি করতেন, আমদানি বৃদ্ধি আসলে ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির সূচক। কিন্তু ভারতীয় নেতারা তা মানেন নি। তাঁদের মতে, ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে এই আমদানি বৃদ্ধি আসলে ভয়ানক, বিষাদময় পরিণতির কারণ হয়েছে, এটি শুধু জাতীয় ক্ষতির সূচনাই করেনি, "অর্থনীতি ও শিল্পের মৃত্যু" পরোয়ানাও জারী করেছে। বস্তুত তাঁরা সমস্যাটির মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। যে সবপণ্য আমদানি হত সেগুলি ছিল সস্তা। ফলে দেশীয়

শিল্পের বিকাশ, নতুন চাহিদা সৃষ্টি বা নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার—অর্থাৎ, অর্থনীতির পরিভাষায় "নতুন কার্যকর চাহিদা" সৃষ্টির—পরিবর্তে অবাধ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সুযোগে দেশীয় হস্তশিল্পজাত পণ্যকে অপসৃত করে এদেশের বাজার দখল করে নিচ্ছিল। আমদানি বৃদ্ধির এই ফলাফল তাঁরা ১৮৩১ সালেই লক্ষ করেছিলেন। ঐ বছর ১০০ জন সম্মানিত ভারতীয় নাগরিক ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করে এই মর্মে অভিযোগ করেছিলেন: "বিগত কয়েক বছর যাবৎ গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদিত কাপড় এদেশে আমদানির ফলে দরখাস্তকারীদের ব্যবসায় বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে; আমদানির পরিমান প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাইতেছে; দেশীয় শিল্পের পক্ষে ইহা সমূহ ক্ষতিকারক।" ১৮৭৩ সালে ভোলানাথ চন্দ্র দেশবাসীর কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা যেন বিদেশী শিল্পজাত পণ্য আমদানিকে "আশির্বাদ বলে মনে না করেন, কেননা আসলে এটি একটি অভিশাপ—বর্তমানে এটা দেশীয় শিল্প ও দেশজ শিল্পজাত পণ্যের পক্ষে সর্বনাশ হয়ে উঠেছে।" ১৮৯৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন—"মোট মূল্যের হিসেবে আমদানির পরিমাণ বাড়ার প্রকৃত অর্থ, ইংলণ্ডের বাষ্পচালিত যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের শ্রম-চালিত শিল্পের অবলুপ্তি ঘটছে।" ১৯০৩ সালে গোখেল ঘোষণা করেছিলেন: "বিদেশী দ্রব্যের প্রতিটি আমদানি সেই পরিমাণ দেশীয় শিল্পের অপসারণ বোঝায়, তা কোনোমতেই ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষণ নয়।" জি, এস, আয়ার আরও স্পষ্ট করে সমস্যাটির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: "ভারতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিনিময় আভ্যন্তর বিনিময়ের প্রসার বা উন্নতিতে সহায়ক হয়নি, বরং তা আভ্যন্তর বাণিজ্যকে স্থানচ্যুত এবং অপসারিত করেছে।"

জি ভি যোশি আমদানি বৃদ্ধির পরোক্ষ আর একটি ফল লক্ষ করেছিলেন। আমদানি বৃদ্ধি একদিকে শহুরে হস্ত-শিল্পকে ধ্বংস করে পণ্য-বিচলন এবং আভ্যন্তর বাজারের সীমা বিস্তৃত করেছে, অপরদিকে একটি শ্রেণীর সবাইকে বেকার করে সস্তা শ্রমের যোগান বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে এদেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হল, শিল্পোদ্যোগও দেখা দিল, কিন্তু 'এদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও যেসব শিল্প ছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল।"

দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল সুতী বস্ত্রের আমদানি এবং সুতো রপ্তানির ঘটনা। এটি ভারতীয় নেতাদের অত্যন্ত প্রিয় একটি উদাহরণ হয়েছিল। প্রসঙ্গত তাঁরা অন্যান্য পণ্য আমদানির ঘটনারও উল্লেখ করেছেন—"মাদুর কিংবা দেশলাই থেকে শুরু করে কলে তৈরী পণ্যাদি ও যন্ত্রপাতি"—যেমন, ছাতা, মোমবাতী, বই, বুট, খেলনা

ইত্যাদি—এ সবই ছিল "ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস-সাধন কতটা সম্পূর্ণ হয়েছিল, তার প্রমাণ।"

ভারতীয় নেতারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ক্রমাগত বেশি পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির ফল হয়েছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের পক্ষে সর্বনাশা। এর ফলে, "বৈচিত্র্য-সম্পন্ন অথচ সুষম জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ হস্ত-শিল্পী এবং কারিগরকে বংশ পরম্পরায় অনুসৃত পেশা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তারা যে শুধু অন্নের সংস্থানই হারিয়েছে তাই নয়, তারা এবং তাদের বংশধররা বাধ্য হয়েছে সেই "একমাত্র অনিশ্চিত আয়ের উৎস" কৃষির উপর ক্রম-নির্ভরশীল হয়ে পড়তে। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধির একটি প্রত্যক্ষ ফল ঃ আরো বেশি-সংখ্যক মানুষ কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। যে-কারণে ভারতের অর্থনীতি ক্রমাগত গ্রামীন চরিত্র নিচ্ছিল, কৃষি হয়ে উঠছিল ভিড়াক্রান্ত, এবং পরিণতিতে, জাতীয় আয়ের উৎস সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল,[৭] এবং ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিদিন দরিদ্রতর হচ্ছিল।

কিছু জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক বর্গের সাহায্যে এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। বিদেশী শিল্পজাত পণ্য আমদানি এবং এদেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানির ঘটনাটিকে পাশাপাশি রেখে তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, একত্রে এই দুইটি প্রক্রিয়ার ফল হয়েছে আরো মারাত্মক। শিল্পোৎপাদক দেশ থেকে কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদকে পরিণত হওয়ায় ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অবনতি ঘটেছিল। একদা শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল যে দেশ সেই দেশে "কম উৎপাদনশীল কৃষি' প্রধান হয়ে উঠল, "শিল্পে নিযুক্ত দক্ষ শ্রমিককে বাধ্য হয়েই অদক্ষ কৃষি শ্রমিকে পরিণত" হতে হল, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত কমে গেল। এর ফলে ভারতকে "মজুরি ও মুনাফার হিসেবে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির" সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এ কথা ঠিক যে, ভোক্তা হিসেবে ভারতবাসী কিছুটা লাভবান হয়েছিল, কারন সস্তায় অনেক ভালো পণ্য পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার জন্য "উৎপাদক এবং শ্রমিক" হিসেবে যে মূল্য দিতে হয়েছে, তা ছিল তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে, যেসব কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছিল তা রপ্তানি না করে দেশে ধরে রাখতে পারলে দেশীয় মূলধন ও শ্রমের নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের মতামত মুধোলকর খুব সুন্দর ভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন—

"যদি এদেশ থেকে কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি এবং তার পরিবর্তে ও দেশের শিল্পজাত পণ্য এদেশে আমদানি না করতে হত, এবং ঐ কাঁচামালকে কাজে লাগিয়ে এখানে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হত, তাহলে উপরোক্ত বিনিময়ের ফলে যে বিপুল পরিমান অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে তা এই দেশেই থাকত, এদেশের মজুরি-ভান্ডার বাড়ত এবং মূলধনের মালিকদের মুনাফা বাড়ত।"

এর আগেই ১৮৮৮ সালে জি. ভি. যোশি তাঁর "ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্য" নামে প্রবন্ধে "ভারতের বিশেষ বাণিজ্যিক পরিস্থিতির" জন্য যে ক্ষতি হচ্ছিল তার একটা খসড়া হিসেব উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে খুব কম করে ধরলেও এর ফলে মজুরি এবং মুনাফার যে ক্ষতি হয়েছে তা বছরে প্রায় ৬৮ কোটি টাকা, এবং শতকরা তিন ভাগ সুদে এটা মূলধনে রূপান্তরিত করা হলে মূলধনের পরিমান দাঁড়াত ১৬০০ কোটি টাকা—। যোশি এই প্রক্রিয়ার আরো একটি শোচনীয় ফলাফলের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—"এদেশের দক্ষ শিল্পোদ্যোগীরা শিল্পক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, এবং যে কোনো প্রগতিশীল মানবগোষ্ঠীর মেরুদণ্ড-স্বরূপ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী" তা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতীয় লেখকরা গ্রামীন এবং শহুরে হস্তশিল্পের ধ্বংসের নিন্দা করেছেন, অথচ কেউই কৃষির বাণিজ্যিকরণ এবং গোটা অর্থনীতির গ্রামায়নের ফলে শিল্প ও কৃষির মধ্যে সম্পর্কে যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে মন্তব্য করেননি। এর ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। তা হল: ভারতীয় নেতারা কখনই পণ্য বিনিময়ের সম্প্রসারণ এবং আভ্যন্তর বাজারের বিস্তারের বিরোধিতা করেন নি। সবাই আধুনিক শিল্পের জোরালো সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিল্প বিকাশের পরিণাম-স্বরূপ গ্রামীন স্বয়ম্ভরতার বিনষ্টি যে অনিবার্য, সে-বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। বস্তুত আভ্যন্তর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে তারা কখনই খারাপ বলে মনে করেন নি। মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরণটির বিরোধিতা করেছেন। আসলে তাঁরা বিদেশী পণ্যের দ্বারা ভারতের গ্রামীন বাজারকে গ্রাস করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কেননা এর ফলে এদেশের দেশীয় শিল্প নিজস্ব বাজার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, এদেশের শিল্পপতিরা মুনাফা হারাচ্ছিলেন, এবং বিধ্বস্ত কারিগর শ্রেণী নতুন শিল্পে নিযুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় নেতারা কখনই ভারতের গ্রামীন স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অটুট রাখার কথা ভাবেননি, তারা চেয়েছিলেন ঐ প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে আধুনিক শিল্পায়নের নতুন জোয়ার আসুক।

কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি এবং তার ফলে মূল্যের বৃদ্ধি হওয়ায় অন্তত কৃষির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা বিশেষ লাভবান হয়েছেন—এই তত্ত্ব জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মেনে নিতে রাজি হননি। যেমন, ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৩ সালে লিখেছিলেন: "ভারতীয় কৃষিজীবীকে ঘিরে বিরাট বাণিজ্য-সম্পদ গড়ে উঠলেও সে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে—অভাব, দারিদ্র এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিমজ্জিত ও মহাজনের বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় এখনও সে একইভাবে ঘানি টেনে চলেছে।" বেশ কিছুদিন

ধরেই জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে হচ্ছিল যে বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তর বাজারে কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়েনি, বরং কমেছে, কিংবা বড় জোর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। অবশ্য অন্য একটি মতও প্রচলিত ছিল। কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে লাভের সম্ভাবনা তা প্রকৃত চাষীর হাতে পৌঁছোত না। বিপুল পরিমাণ খাজনা ও কৃষিকর, মহাজনের ঋণ ও তার সুদ, এবং বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে, চাষীকে ফসল ঘরে তোলার আগেই তা অনেক কম দামে বিক্রি করে দিতে হত। ফলত, লাভের অঙ্কের একটা বড় অংশ যেত "র‍্যালি বাদার্স"-এর মতো বিদেশী বণিক কিংবা তাদের ভারতীয় দালালের পকেটে, যারা কৃষকদের উৎপন্ন পণ্য কম দামে কিনে নিত; আরেকটা বড় অংশ যেত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের পকেটে, যাদের কাছে "রায়তেরা ফসল তোলার আগেই বাঁধা পড়ত"। এর উপর আবার লাভের একটা অংশ তুলে নিত রাষ্ট্র ও জমিদার কর ও খাজনাবাড়িয়ে।— একমাত্র বড় জমির মালিকেরাই শুধু ইচ্ছেমত ফসল বিক্রি করে মুনাফা করতে পারত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল বাস্তবে গোপন 'সাউকার'। অন্যদিকে গ্রামীণ জনসাধারনের অধিকাংশই ছিল কৃষি-শ্রমিক এবং ছোট কৃষক, যাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে স্বোৎপাদিত খাদ্য ছাড়াও বাড়তি খাদ্য বাজার থেকে কিনতে হত, ফলে দাম বাড়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিল। জি. ভি. যোশি হিসাব করে দেখিয়েছেন, যদি ধরে নেওয়া যায় বাণিজ্যের ফলে কৃষকরা লাভবান হয়েছিল তাহলে সেই লাভের পরিমাণ বছরে মাথাপিছু চার আনার বেশি কখনই হয়নি। শিল্পে বা কর্মনিযুক্তিতে যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে সম্ভাব্য লাভ ছিল এটুকুই, পরিমাণে যৎসামান্য।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রপ্তানিযোগ্য প্রধান পণ্যগুলি—যেমন চা, কফি, নীল এবং পাটজাত দ্রব্যাদি—প্রায় সবটাই উৎপাদিত হচ্ছিল বিদেশী মূলধনের সাহায্যে, বিদেশীদের উদ্যোগে। ফলে, এই সব শিল্প ও রপ্তানি থেকে যা লাভ হয়েছে তার সবটাই বিদেশী মূলধনের মালিকদের পকেটে গেছে, ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটেছে অতি নিম্নহারে মজুরি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় সব সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদের এই বক্তব্যের সঙ্গে রানাডে এক মত হতে পারেননি, এবং সেজন্য তিনি একটি গুরুতর ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। রানাডে ইংল্যান্ডের শাসনাধীন পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জীবনধারাকে আদর্শ গণ্য করে এটা দেখাতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদকে পরিণত করার সম্ভাব্য বিকল্প ত্রুটি।[৮] তিনি যেটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা হল, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাগিচা শিল্পের উপর সম্পূর্ণ বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার ফলে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের

কাছে শিল্প হিসেবে তার মূল্য ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, এর ফলে ওখানে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি, যে কারণে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল ভারতবাসীর থেকেও খারাপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কিছু ভারতীয় লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমদানি বাণিজ্যকেও বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছিলেন। এরা লক্ষ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে যেসব পণ্য আমদানি হত, তার একটি বিরাট অংশ যেত এদেশে বসবাসকারী বিদেশীয়দের ও অল্পসংখক ইংরেজীয়ানায়-আপ্লুত ভারতবাসীর প্রয়োজন মেটাতে এবং বিদেশী কারবার, রেলওয়ে ও সরকারের চাহিদা পূরণ করতে। এইসব আমদানিকৃত পণ্যাদির খুব সামান্য অংশই বিপুল-সংখ্যক সাধারণ মানুষের ভোগে লাগত। মাথা-পিছু মূল্য হিসাব করলে কয়েক পয়সা মাত্র।

কোনো-কোনো জাতীয়তাবাদী লেখক এও দেখাতে চেয়েছেন যে, ভারত থেকে যা রপ্তানি হত তা উৎপাদন-উদ্বৃত্ত নয়—অর্থাৎ ঐসব পণ্য এদেশেই ভোগে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, এমন নয়। কেননা, এদের বেশির ভাগই ছিল জীবনধারণের জন্য এবং শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন—রঙ চাল, সুতীবস্ত্র, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি। নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার চাপে এইসব পণ্য রপ্তানি হত। আর তার ফলেই এদেশে "মারাত্মক পরিমাণে" খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিত। পক্ষান্তরে, এইসব পণ্য রপ্তানির বিনিময়ে যা আমদানি হ'ত সে-সবই স্বচ্ছল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অথবা বিলাস দ্রব্য, যা না-পেলেও খুব একটা ক্ষতি ছিল না। ১৮৮৯ সালের ৬ই জুলাই "বঙ্গবাসী"তে এই মতটাই জোরালোভাবে উপস্থিত করা হয়ঃ

"আমরা আমাদের মুখমণ্ডলের দ্যুতি অথবা কুঞ্চিত কেশের শোভা বাড়াইতে তোমাদের তৈয়ারি পাউডার কিংবা পমেটম চাহি না; আমরা ঘড়ি পড়িয়া লাঠি হাতে আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনীয় হইয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিতে চাহি না …আমরা চাহি না তোমাদের রেশম ও পশম বস্ত্রাদি আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতে; আমরা চাহি না শেরী ও শ্যাম্পেনের দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে; চাহি না তোমাদের তৈয়ারি বস্ত্রে লজ্জা ঢাকিতে,—যদি আমাদের দেশীয় তন্তু-শিল্পীরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা বল্কল পরিধান করিয়া থাকিব, তাহাও না জোটে নগ্ন গাত্রে বিচরণ করিব। আমরা তোমাদের কাছে আমাদের জীবন প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের তাহাই দাও"।

জাতীয়তাবাদী লেখকেরা বিদেশী বণিকের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্য এবং এদেশীয় বণিকদের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যের মধ্যেও পার্থক্য করেছিলেন।

তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই ইংরেজ এবং অন্য বিদেশী বণিকদের হস্তগত ছিল, যার ফলে লাভের সিংহ-ভাগটাই (জি ভি. যোশির মতনুসারে শতকরা নব্বই ভাগের বেশী) এদেশ থেকে চলে যাচ্ছিল। উপরন্তু, এর ফলে আমাদের বাণিজ্যের প্রায় পুরো ব্যবস্থাটাই –"সমস্ত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য"—বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল ; রেলপথ, জলপথ, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বীমা ব্যবসা, এমনকি গ্রাম থেকে সমুদ্রপোত পর্যন্ত পণ্য নিয়ে যাওয়ার আভ্যন্তর যোগাযোগ পথ, সবই ছিল বিদেশীদের হাতে। জি ভি. যোশি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, বাণিজ্যের উপর এই বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের ফলে যে মোট ক্ষতি হচ্ছিল তার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় ২৬ কোটি টাকা—অর্থাৎ "আমরা যে হোম-চার্জের জন্য এত অভিযোগ করি তার দ্বিগুণেরও বেশি"। কোনো-কোনো ভারতীয় নেতা অবশ্য এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ইচ্ছে করলে ভারতীয়রা এই ক্ষতির অন্তত কিছুটা এড়িয়ে যেতে পারতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নগণ্য ভূমিকা গ্রহণের জন্যে তাঁরা এদেশীয় বণিকদের ভর্ৎসনা করেছেন, এবং "বৈদেশিক বাণিজ্যের বোঝার এবং সঙ্গে সঙ্গে লাভেরও যোগ্য অংশীদার হতে" পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন—যোশি মন্তব্য করেছেন যে, যাই হোক না কেন "এটা তো আমাদের নিজেদেরই কাজ", আর এর জন্যে নিশ্চয়ই "বিশেষ কারিগরি শিক্ষা এবং বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় না"। বোম্বাইয়ের খোজা এবং পার্শীরা ইতিমধ্যেই চীন ও পূর্ব আফ্রিকার বাজার আবিষ্কার করে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। তাদেরকে অনুসরণ করে এদেশে এবং বিদেশে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এজেন্সী-হাউস করা যেতে পারত। একইভাবে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতায় তিনটি জাহাজী কোম্পানী স্থাপন করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এবং অযোধ্যার অগ্রণী ভারতীয় সংবাদপত্র 'এ্যাডভোকেট'-এ বক্তব্যটি এইভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল—

"আমাদের অবশ্যই সভ্যতার অগ্রগতির জন্য দেশীয় মূলধনে, দেশীয় দক্ষ ব্যক্তিদের পরিচালনায় এবং সম্ভব হলে ব্রিটিশ পতাকাধারী কিন্তু ভারতীয় মালিকানাধীন জাহাজে বাণিজ্য করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে, একে স্বপ্ন, এমনকি দিবা-স্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইদিক থেকে অগ্রগতি না হলে ভারতীয়রা একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না"।

সবশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের কয়েকজন এও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, প্রতিদানহীন ভাবে উদ্বৃত্ত রপ্তানি করতে বাধ্য হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভারতবর্ষের

ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়েছে। নিঃসন্দেহে তাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নৌরজী মিলের লেখা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন: "যে দেশ অন্য কোনো দেশকে নিয়মিত অর্থ প্রদানে বাধ্য হয়, সে দেশ শুধুমাত্র ঐটুকু ক্ষতিরই সম্মুখীন হয় না, তার ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি, কারণ তাকে বাধ্য হয়েই নিজ দেশে উৎপন্ন পণ্যাদির বিনিময়ে অসুবিধেজনক শর্তে অন্য দেশের পণ্য কিনতে হয়।" অন্যান্য ভারতীয় লেখকেরাও হয় মিলের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন কিংবা অনুরূপ কথা বলেছেন। যেমন, ১৮৮৮ সালে যোশি মন্তব্য করেছিলেন: "এই যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতিবছর ইংলন্ডকে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত হিসেবে দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে, এতে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের বিরাট অংশের বাধ্যতামূলক চরিত্রটিই স্পষ্ট। এটা দাম-ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে।" ডি, ভাচাও লক্ষ করেছিলেন যে, একটি ঋণী দেশকে তার উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী অনেক কম দামে দিতে বাধ্য হতে হয়, এবং এই অবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধির অর্থ "আরও বেশি পরিমাণে জাতীয় সম্পদ জলাঞ্জলী"। ১৮৯২ সালের ১৭ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকাতেও একই বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছিল।

৩. খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি

সাধারণের কাছে সহজলভ্য ছোট-ছোট সংবাদপত্রে ভারতীয় নেতারা বৈদেশিক বাণিজ্যের যে দিকটি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা ও মন্তব্য করতেন, সেটি খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি। বাংলাদেশ ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত। বাংলাদেশ ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবে নেতারা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সরব হয়েছিলেন। এই তিনটি প্রদেশে নেতাদের এই সরবতার একটি বিশেষ কারণও ছিল: ঐ সব প্রদেশ দ্রুত গম রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য সব বছরে এক রকম হতো না; চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিমাণ ও মূল্যেও পরিবর্তন দেখা যেত। তাসত্ত্বেও নীচের হিসেবগুলি থেকে এই রপ্তানি বাণিজ্যের তদানিন্তন চরিত্রটি সহজেই ধরা পড়ে—

গড়ে ১৮৮২-৩ থেকে	১৮৯১-৯২)	৪৮,২৬৭,১১৭ টন (১০০মন)	১৭,৮২ লক্ষ টাকা	
,, ১৮৯২-৩ ,,	১৯০১-২	৪২,২৬৮,৩৪৫ ,,	,, ১৭,৮৯ ,,	,,
,, ১৯০৪-৫ সালে		১০২,০২১,৩৪১ ,,	,, ৪১,১১ ,,	,,

চাল রপ্তানি হ'ত প্রধানত ব্রহ্মদেশ থেকে, আর গম এবং ডাল ইত্যাদি যেত ভারতবর্ষ থেকে। হিসেব থেকে দেখা যায় ১৮৬৯ সালে যেখানে ভারত থেকে গম রপ্তানি হয়েছিল ২৭৫, ৪৮১ টন (১০০ মণ), ১৮৭৩-৭৪ সালে সেখানে

রপ্তানি হয়েছে ১, ৭৫৫, ৯৫৪ টন ১৮৮২-৮৩ সালে ১৪, ১৯৩, ৭৬৩ টন এবং ১৮৯১-৯২ সালে মোট ৩২, ৭৪০,০০০ টন।

জাতীয়তাবাদী মতামত নানা-কারণেই এই খাদ্য রপ্তানির বিরোধী ছিল। তবে প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, এই ভাবে খাদ্য-রপ্তানির ফলেই ভারতবর্ষে খাদ্য ঘাটতি এবং দুর্ভিক্ষ চিরন্তন হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর ফলেই দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব হয়নি। ১৮৯১ সাল ছিল একটি দুর্ভিক্ষহীন বছর। তথাপি ঐ বছরে প্রকাশিত "আউধ পাঞ্চ"-এর একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্যে এই মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে ঃ

"বর্তমানে এ দেশ থেকে খাদ্য-রপ্তানির পরিমাণ এত বেশি যে তা প্রকৃত পক্ষে এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। বস্তাভর্তি খাদ্যশস্য আসলে বস্তাভর্তি এদেশের মানুষ, ইংলন্ডের সভ্য নরখাদকেরা অবাধ-বাণিজ্যের তরোয়াল দিয়ে তাদের হত্যা করে খাবে বলে নিয়ে যাচ্ছে।"

উত্তর-ভারতের প্রধান হিন্দী সাপ্তাহিক "ভারত জীবন" ১৯০০ সালের ১৯ শে জানুয়ারী মন্তব্য করেছিল—"যদি এই রপ্তানি রোধ করা না যায়, তাহলে অচিরে ভারতবর্ষ জঙ্গলে পরিণত হবে।"

জাতীয়তাবাদীরা এ-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় ছিলেন যে খাদ্য-রপ্তানিই দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কারণ, কেননা, ভারতবর্ষ থেকে যে খাদ্য-শস্য রপ্তানি হচ্ছিল তা উদ্বৃত্ত উৎপাদন নয়, এদেশের মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সরবরাহ, তারই অংশ। এবং এর ফলেই ভারতবাসীর অর্দ্ধভুক্ত অবস্থা। ১৮৯১ সালের ২৫ শে জুলাই 'হিতবাদী' লিখেছিল ঃ "বিদেশী বণিকেরা ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে', ভারতীয় রায়ত "বিদেশীদের পেট ভরাতে গিয়ে নিজের পরিবারকে অভুক্ত রাখতে বাধ্য হচ্ছে।" রমেশ চন্দ্র দত্ত একই কথা বলেছিলেন—"গমগমে আপাত-আনন্দদায়ক এই শস্য-বাণিজ্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে একটি ঘটনা, তা হল—কৃষি উৎপাদনশীল এই দেশের গ্রামাঞ্চলে উৎপাদক পরিবারগুলি এমনভাবে অভুক্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছে, যার পরিণতি মারাত্মক ..।" তিনি তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, "এমনকি সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের আগেও খাদ্যশস্য বাণিজ্যে টান পড়েনি, তা আগের মতোই অব্যাহত থেকেছে।" ভারতীয় নেতারা অবশ্য এটা স্বীকার করেছেন যে, ঠিক দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে খাদ্য রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু, তাতে কিছু যায় আসেনি, কেননা স্বাভাবিক বছরগুলিতে উদ্বৃত্ত শস্য-ভান্ডার নিঃশেষিত হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষের বছর ঐ সঞ্চয় থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। সেজন্য তাঁদের একটি বক্তব্যই ছিল এই যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রকৃতির খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীলতা বেশী বলে, খাদ্য শস্যের উদ্বৃত্তের হিসেব করার সময় অনটনের বছরগুলির ঘাটতিকেও হিসেবে আনা প্রয়োজন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতবর্ষের মানুষের অভাব মেটানোর পর উদ্বৃত্ত না-থাকলে কীভাবে খাদ্যশস্য বিক্রি বা রপ্তানি হত? কেনই বা উৎপাদকেরা উৎপন্নের একটি অংশকে বিপদের বছরের জন্য সরিয়ে রাখতে পারেনি? এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই ছিল বাধ্যতামূলক এবং অস্বাভাবিক। জমিদারকে অথবা রাষ্ট্রকে বাড়তি হারে জমির খাজনা দিতে গিয়ে—তাও টাকাকড়িতে—কৃষককে তার ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হতে হতো। তদুপরি, একদিকে বাজারের অভাব, অন্যদিকে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত রাখার তাগিদ মিলিতভাবে তাকে বাধ্য করত তার জমিতে উৎপন্ন ফসল বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে।

খাদ্যশস্য রপ্তানি আরেক দিক থেকে ক্ষতিকর হয়েছিল: এর ফলে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছিল, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়েছিল "অনাহার ও মৃত্যু"। ১৮৯১ সালে কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে লালা মুরলী-ধর এজন্যই মন্তব্য করেছিলেন: "মাত্র তিরিশ বছর আগে এক টাকায় দেড় মন গম এবং দু'মণ অন্যান্য শস্য পাওয়া যেত, কেননা তখন বিদেশে শস্য রপ্তানি হতো না। এখন সেই জায়গায় দাম হয়েছে ছয়গুণ বেশী, যার অর্থ, দরিদ্র মানুষের উদর পূরণ ছয়গুণ বেশী কষ্টসাধ্য হয়েছে।"

এজন্যই জাতীয় নেতৃত্বের একটি বড় অংশ অবাধ বাণিজ্য এবং খাদ্য-শস্য রপ্তানির উপর বাধা-নিষেধ আরোপের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এদের কেউ-কেউ প্রস্তাব করলেন যে, খাদ্য শস্যের উপর বাণিজ্য-শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া হোক; আবার কেউ-কেউ এমন দাবিও করলেন যে, খাদ্যশস্য রপ্তানি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। ১৮৯৬-৯৮ সালের দুর্ভিক্ষের বছর-গুলিতে দ্বিতীয় মতটাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই সময় কোনো-কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা বিশেষ করে লক্ষ করেছিলেন, সরকার দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্যশস্য রপ্তানি কমিয়ে দিতে অথবা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেননি। এর থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সরকারের মূল নীতিই ছিল ব্রিটেনের জনসাধারণকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার জন্য যেমন করে হোক এদেশ থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি বৃদ্ধি। এই কারণেই, ভারতবর্ষের জনমত প্রায় পুরোপুরি খাদ্য রপ্তানির বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। এমনকি স্বাভাবিক বছরেও খুবই সামান্য-সংখ্যক ভারতীয় সংবাদপত্র খাদ্য-শস্য রপ্তানির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, খাদ্যশস্য রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বণিকেরা কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের এই মতের বিরোধীতা করেছেন। তা অপ্রত্যাশিতও নয়। কেন? স্বাভাবিকভাবেই, ঐ বণিক সম্প্রদায় রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি চেয়েছে। সেজন্য তারা চালের উপর রপ্তানি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেছিল। যেমন, ১৮৮২ সালে কলকাতার খ্যাতিমান ব্যবসায়ী এবং "ইম্পিরিয়াল

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের" সদস্য দুর্গাচরণ লাহা চাল রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্কের বিরোধিতা করে সেটিকে "আমাদের বাণিজ্য শুল্কের একটি আপত্তিকর বিষয়" বলে উল্লেখ করেছিলেন, এবং দাবি করেছিলেন যে, এই শুল্ক অপসৃত হলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে, কেননা "ভালো বাজারে ভালো দামে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার সুযোগ তারা পাবে।" স্বভাবতই কলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এই বক্তব্য সমর্থন করেছিল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক মশাইও ১৮৮৯ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে চেম্বারের বার্ষিক সভায় একইভাবে "এই দেশ থেকে রপ্তানিকৃত চালের উপর অত্যধিক হারে শুল্ক আদায়ের" বিরোধিতা করেছিলেন।

উপসংহার

উপসংহারে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দেশের অর্থনীতির উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাবের মূল্যায়ন ভারতীয় নেতারা যেভাবে করেছিলেন, তার থেকে এটা স্পষ্ট, তাঁরা সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে সময় আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের তত্ত্বের প্রভাবে বিশ্বাস করা হতো যে বৈদেশিক বাণিজ্য উপায় নয়, লক্ষ্য ; এবং বাণিজ্য-বৃদ্ধি সর্বদাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই তত্ত্ব মানতে রাজী হননি। এটা ঠিক যে, তারা ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যতটা বিশদ আলোচনা করেছেন, এই বিষয়টিতে তা করেন নি।[৯] তথাপি এটাও অনস্বীকার্য যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল চরিত্রটি তুলে ধরতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন, এবং বাণিজ্যের সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করেছিলেন সাধারণ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রেক্ষাপটে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় লেখকেরা জাতীয় আয়, জাতীয় শিল্প এবং কর্মনিয়োগের নিরিখে বৈদেশিক বাণিজ্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বলেই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি তাঁরা সাধারণভাবে বিরূপ ছিলেন না বা কখনই মনে করেননি বৈদেশিক বাণিজ্য মাত্রই খারাপ। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় নেতারা কখনই "স্বাভাবিক বাণিজ্যের" বিরোধী ছিলেন না—অর্থাৎ, শিল্পের জন্য এবং দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক বাণিজ্যকে কখনই আপত্তিকর বলে মনে করেননি। তাঁদের মধ্যে আপত্তির বিষয় ছিল, তদানিন্তন বৈদেশিক বাণিজ্যের অবাঞ্ছিত উপনিবেশিক এবং বাধ্যতা-মূলক চরিত্র। তাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, প্রকৃতি ও গতিমুখকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন শিল্পের প্রয়োজনের ভিত্তিতে। ১৯০১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত জি এস. আয়ারের বক্তৃতাতে এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল :

"ভারতের বাণিজ্যকে স্বাভাবিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। এর

অর্থ—ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষের চাহিদা মেটাতে হবে স্বদেশীয় শিল্পের উৎপাদন দিয়ে, উদ্বৃত্ত অংশই শুধু রপ্তানি করা যেতে পারে এদেশে উৎপন্ন হয় না এমন পণ্যের বিনিময়ে। এটা করতে পারলে তবেই অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সর্বনাশকে প্রতিহত করা যাবে এবং সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে।”

এর আগে, রাণাডেও একই কথা বলেছিলেন—

“প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সংগঠিত সমবায়ের ভিত্তিতে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে শিখতে হবে। আমাদের প্রয়োজনমত বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে, কাজে লাগিয়ে, সেই সব শিল্পজাত পণ্যকে কাঁচামালের পরিবর্তে রপ্তানি করতে (একই পরিমাণে; কিন্তু শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে আয়তনে কম এবং সহজে স্থানান্তর যোগ্য) শিখতে হবে। এর ফলে আমাদের শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরাও কর্মে নিয়োগের সুযোগ পাবে।”

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতীয় নেতাদের কাছে শিল্পের স্থান ছিল মুখ্য। জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যকে তাঁরা তুলনায় গৌণ বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে তাঁরা সগর্বে ভারতের অতীত ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়েছেন, এবং তা অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন! তাঁরা যন্ত্রপাতি আমদানির কথা বলেছেন এবং তার পরিবর্তে কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি চেয়েছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হবে, অর্থনীতির আরও অবনতি ঘটবে না, এবং শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে, এই শর্তে এমনকি শিল্পজাত পণ্য আমদানিতেও তাঁদের আপত্তি ছিল না। বস্তুত তাঁরা এইগুলিকেই ইংরেজ রাজনীতিবিদ, পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীদের সামনে টোপ হিসেবে রেখেছিলেন, ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সংস্কারে তাদের উদ্যোগী করে তোলার জন্য।

১৮৮৭ সালে ইংলণ্ডের পত্রিকা “কনটেম্পোরারি রিভিউ”-এ একটি প্রবন্ধে দাদাভাই নৌরজী “ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শিল্পোজাত পণ্যের সবচেয়ে খারাপ ক্রেতা” এই মর্মে বিলাপ করে কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটি সুন্দর প্রস্তাব করেছিলেন—

“ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্যক্তি যদি মাত্র এক পাউন্ড মূল্যের সামগ্রীও কিনতে পারত, তাহলে শুধু ভারতবর্ষেই ইংল্যাণ্ডের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াত সমগ্র বিশ্ব-জুড়ে তার বর্তমান রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণের সমান (২১৩,০০০,৩৮০০ পাঃ)। এর ফলে ব্রিটিশ শিল্পের ও উৎপাদনের কী অসাধারণ উন্নতিই না হতে পারত!·· ভারতবর্ষের যদি উন্নতি ঘটে, এবং সে যদি বিপুল পরিমাণে ইংল্যাণ্ডের পণ্য ভোগে সমর্থ হয়, তাহলে তা ইংল্যান্ড এবং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে কী দারুণ লাভজনকই না হবে!”

দাদাভাই উপসংহারে লিখেছিলেন: "ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষকে যদি স্বাভাবিক অর্থনীতির শর্ত পালন করে অবাধে বিকাশ লাভ করতে দেওয়া হ'ত, তাহলে সেটা সম্ভব ছিল।" এবং এর ঠিক চৌদ্দ বছর পরে রমেশচন্দ্র দত্ত গ্লাসগোর ফিলজফিক্যাল ইনস্টিটিউশনের সভায় শ্রোতাদের একই কথা শুনিয়েছিলেন:

"আপনাদের এবং আমাদের স্বার্থ বিপরীত নয়; বরং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যদি আমাদের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হতো এবং ভারতবর্ষের শিল্প-সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে তিরিশ কোটি ভারতবাসী আপনাদের শিল্পজাত পণ্যের ক্রেতা হতে পারত····· একমাত্র ভারতবর্ষের জনসাধারণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের বাণিজ্যে সৌভাগ্য দেখা দিতে পারে।"

এর থেকে সুস্পষ্ট যে, ভারতীয় নেতারা পারস্পরিক সুবিধার জন্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে সবসময়েই সমর্থন করেছেন। তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিই বাণিজ্যোন্নতির চাবিকাঠি, বাণিজ্য বাড়লেই সম্পদ বাড়ে না।

পরিশেষে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনোভাব লক্ষ করলে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও নজরে পড়ে: শিল্পোন্নতিকেই আমাদের নেতারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং সেজন্য বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গিয়েও নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রসঙ্গ না তুলে শিল্পোন্নতির বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ঐ সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি অনুঘটকের কাজ করে ভারতীয় বাজারের—এবং ফলত আভ্যন্তর ব্যবসায় বাণিজ্যেরেও—প্রসারের কারন হয়েছিল। আবার কারিগরি শিল্প ও কৃষির মধ্যে পূর্বতন সংযোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলও হয়েছিল একই। আর এই সবের প্রভাবে একটি দেশীয় বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায়, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসস্তুপের উপর এই শ্রেণীটি বিকাশলাভ ক'রে ক্রমে-ক্রমে একটি বিশাল সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছিল। লক্ষণীয় হ'ল, প্রথম যুগের জাতীয় নেতারা কখনই এই মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি দেখাননি। ভারতীয় বাজারের উদ্ভব এবং পণ্য-বিচলন বৃদ্ধির (বিদেশী শিল্প-পণ্য আর এদেশের কৃষিজাত কাঁচামালের বিচলন) ফলেই যে এই শ্রেণীটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল, তাও তাঁরা কখনও উল্লেখ করেননি—এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেও। বাস্তবিকপক্ষেই, সেই সময় জাতীয় নেতারা ছিলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থের সত্যিকারের প্রবক্তা। তাঁদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিল্প-সমৃদ্ধি। উদীয়মান বণিক বুর্জোয়ার সঙ্গে চিন্তার দিক থেকে অন্য কোনোভাবে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তা স্পষ্ট। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও, শুধু খাদ্য-পণ্য-বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবই তার প্রমাণ। তখন

পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা ছিল খাদ্যশস্য রপ্তানির বাণিজ্যে প্রধান সরবরাহকারী। এইসব অঞ্চলে আধুনিক শিল্প বলে কিছুই ছিল না, পুঁজিপতি শ্রেণী বলতে কেবল একটি শ্রেণীই ছিল, সেটি বণিক শ্রেণী, অনেকটা পরিমানে খাদ্যশস্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তথাপি, ঐ প্রদেশগুলিতেও খাদ্যশস্য রপ্তানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, এমনকি শিল্পে অনগ্রসর অঞ্চলেও জাতীয় নেতৃত্ব তখনও বণিক বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেনি।

টীকা

১। ১৯১৩ সালের হিসেব অনুসারে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ পাঃ। প্রায় সবটাই সমুদ্রপথে পরিচালিত হোত। স্থলপথে বাণিজ্যের তুলনায় সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রাধান্য এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, এটাকেই তদানিন্তন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২। এর আগেই যোশি এই সাবধানবানী উচ্চারণ করেছিলেন—"বিশাল পরিমাণ এমন ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে যে প্রকৃত চরিত্রের দিকে নজর পড়ে না।"

৩। রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর "ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" ২য় খণ্ডে এই প্রক্রিয়া ও তার ফলাফলের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

৪। ঠিক কী পরিমাণ অর্থ জড়িত ছিল সে-বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

ভারতীয় লেখকরা এটা লক্ষ করেছিলেন যে, মূলধন আমদানী ও সরকারী ঋণের ফলে আমদানির মূল্যে বেড়ে যাওয়ায় এবং বাড়তি রপ্তানি কমে যাওয়ায় বৈষম্যটা কম বলে মনে হয়। সবসময়েই ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য। ১৮৫৭ সালের পর কয়েক বছর তুলনায় আমদানি বেশি হয়েছে, কারণ ঐ সময় সরকারী ঋণ বেড়েছিল আর রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজন মেটাতে বিদেশী মূলধন আমদানিও বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

৫। বাস্তবে, মোট সম্পদ-নিস্কাশনের পরিমাণ উদ্বৃত্ত রপ্তানির পরিমাণের থেকে বেশি ছিল। কারণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত যতটা ছিল আসল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল তার থেকে বেশি।

৬। জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য কীনস্ প্রস্তাব করেছিলেন, হয় জার্মান পণ্য বেশি করে কিনতে হবে, নয়তো ইংলণ্ডের নাগরিকদের জার্মানিতে গিয়ে সেদেশের বিয়ার পান করার অনুমতি দিতে হবে। এমন কিছু নতুন কথা নয়।

৭। জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য ভালো করেই জানতেন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত) যে ভারতের দুঃখজনক পরিস্থিতির একমাত্র কারণ আমদানি বাণিজ্য নয়; এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পিছনে আছে অন্য নানা ঘটনা, বৈদেশিক প্রভুত্ব সেগুলির উৎস।

৮। রাণাডের মতে, জীবনধারার কাঠামো "নেদারল্যাণ্ডের অধীন, পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জকে বৈষয়িক উন্নতি অর্জনে সাহায্য করেছে।" তিনি উল্লেখ করেছেন, "ব্রিটিশ ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে কাঁচামালের পরিমাণ ছিল অন্যান্য পণ্যের চারগুন, কিন্তু নেদারল্যাণ্ডের অধীন পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তা ছিল মোট রপ্তানির চার ভাগের

এক ভাগ।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাণাডেও বিদেশী মূলধনের তুলনায় দেশীয় মূলধনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং দেশীয় মূলধনের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন।

৯। একটা কারণ এই যে, অর্থনীতিবিদরা ছাড়া অন্য ভারতীয় নেতারা শুধু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের মতন একটি অতি ব্যাপক বিষয়কে আন্দোলনের বিষয়বস্তু করা সহজ ছিল না। বছরের পর বছর কংগ্রেসের অধিবেশনে যে অসংখ্য প্রস্তাব পাশ হয়েছে তার মধ্যে এমন একটি প্রস্তাবও নেই যা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে। এটা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে জাতীয়তা-বাদীদের অনুৎসাহের প্রমাণ।

৫

রেলপথ

রেলপথ নির্মাণ ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত রেলপথ তৈরির আগে ব্রিটিশ শাসন কখনই ভারতীয় জীবনের অন্তস্তল স্পর্শ করতে পারেনি, কিংবা বিকাশমান বিশ্ব বাজারের সংগে যুক্ত করে দিয়ে এদেশে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারেনি। তাই একটা সময়ে বিদেশী শাসকরা রেলপথ স্থাপনকেই এদেশের সব অর্থনৈতিক দুরবস্থার একমাত্র মুস্কিল-আসান হিসেবে দেখতে লাগলেন। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে রেলপথের বিস্তারের দাবিও প্রবলভাবে উত্থাপিত হ'ল।

সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের ইতিহাস এক "বহুকথিত কাহিনী।" তথাপি আমরা এখানে সে কাহিনী সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব। রেলপথ নির্মাণের ফলে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যার ক্ষেত্রে সেই সময়ের জাতীয় নেতৃত্ব কী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তা ভালো করে বোঝার জন্য।

একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ ঃ[১]

এদেশে রেলপথ বসানোর প্রস্তাব সম্ভবত সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজে, ১৮৩১-৩২ সালে; গাড়ি টানার জন্য পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। বঙ্গীয় রেলের পরিকল্পনা প্রথম নেওয়া হয় ১৮৪৩ সালে, ইংলণ্ডে। গোড়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকরা এই প্রস্তাবে খুব একটা উৎসাহ দেখাননি ঃ তাঁদের আশঙ্কা ছিল এদেশে রেলশিল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু স্বদেশে রেল মালিক, মূলধন লগ্নীকারী, ভারতের সংগে বাণিজ্যরত বণিক সংস্থা এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দীর্ঘকাল ধরে প্রতিহত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কোম্পানির কর্মচারি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন, "হিন্দুস্থানের' সমতলভূমিতে রেলপথ স্থাপনের অসামান্য সুযোগ আছে, এবং তা স্থাপিত হলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার পরিচালনা এবং দেশটির সামরিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান হবে।"

রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর-পরই লগ্নিকৃত বিদেশী পুঁজির জন্য প্রাপ্য ন্যূনতম সুদ অথবা ডিভিডেন্ড সুনিশ্চিত করতে সরকারি গ্যারান্টির প্রশ্নে কোম্পানির পরিচালক ও রেল শিল্পের মালিকদের মধ্যে একটি স্বল্পস্থায়ী মতভেদ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তারও পরিসমাপ্তি ঘটে শিল্পপতিদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। ১৮৪৯ সালে ভারতসচিব "ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি" এবং "দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানি"র সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তির শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ—(১) ভারতে রেলপথের নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে বেসরকারি সংস্থার হাতে: (২) এইসব সংস্থায় সংগৃহীত মূলধনের উপর নিরানব্বই বছরের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদের গ্যারান্টি দেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি; (৩) এছাড়া উক্ত কোম্পানি প্রয়োজনীয় সব জমি বিনামূল্যে নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ-এর ব্যবস্থা করে দেবে; (৪) এইসব সুযোগ সুবিধে প্রদানের বিনিময়ে রেলওয়ে ব্যয় ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকার কোম্পানির থাকবে; (৫) রেলপথগুলিকে বিনা মাশুলে ডাক এবং অপেক্ষাকৃত কম মাশুলে সৈন্যদের ও সৈন্যবাহিনীর রসদ পরিবহন করতে হবে; (৬) গ্যারান্টিপ্রদত্ত সুদের ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ থাকলে সেই লাভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও রেল কোম্পানিগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে, চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত অগ্রিম পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত, এবং তারপর থেকে পুরো লভ্যাংশ কোম্পানিগুলি পাবে; (৭) নিরানব্বই বছর পূর্ণ হলে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রেল কেম্পোনিগুলি ভারত সরকারের দ্বারা অধিগৃহীত হবে, সরকারকে শুধু যন্ত্রপাতি, কলকারখানা আর শকট সম্ভারের মূল্য প্রদান করতে হবে; (৮) প্রয়োজন বোধ করলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই, পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে, মূলধনী সম্পদ ও শেয়ারের পূর্ণমূল্য প্রদান করে রেলপথগুলিকে সরকার কিনে নিতে পারবে; (৯) যে-কোনো সময়ে ছয় মাসের নোটিশ দিয়ে রেল কোম্পানিগুলিও রেলপথ সরকারকে সমর্পণ করতে এবং প্রকৃত বিনিযুক্ত অর্থ সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়ার দাবি জানাতে পারবে।

পরবর্তী দু'দশকের সব চুক্তিই ছিল এই আদি চুক্তির আদলে তৈরি। অবশ্য তখনও পদ্ধতি বা নীতি কী হবে কিংবা কতটা দ্রুত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে মতপার্থক্যের অবসান হয়নি। আরও কয়েক বছর এসব নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলেছিল। শেষ অবধি সাময়িকভাবে স্থির হয়েছিল যে, ব্রিটিশ মূলধনের সাহায্যে এবং ইংলন্ডে সমিতিভুক্ত কোম্পানির মাধ্যমে দ্রুত রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা হবে। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি তাঁর বিখ্যাত "বিশদ কার্যবিবরণী"তে এই কর্মসূচী স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটলে ইংলন্ডের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে এবং নিজের উৎপাদিত কৃষিজ কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসাবে

ভারতবর্ষের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ব্রিটিশ মূলধনের লগ্নীক্ষেত্র হিসাবে দেশটা কত সম্ভাবনাপূর্ণ, আর দ্রুত সৈন্য সমাবেশ ও সঞ্চালনের ক্ষেত্রে রেলপথ কত উপযোগী, সে বিষয়েরও উল্লেখ ডালহৌসি করেছিলেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তিনি চারটে মেন ট্রাঙ্ক লাইনের এবং সবকটি প্রেসিডেন্সির মধ্যে এবং প্রতিটি প্রেসিডেন্সির আভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক বন্দরগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। ট্রাঙ্কলাইন ব্যবস্থার এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির সুবিধার জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করা।

১৮৬৯ সালের শেষদিকে এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। গ্যারাণ্টি-প্রাপ্ত কোম্পানিগুলি ততদিনে ৪, ২৫৫ মাইল রেলপথ নির্মাণ করে ফেলেছে। এই সময়-কালের মধ্যে সুদের গ্যারাণ্টি ছিল শতকরা চার থেকে সাড়ে চারের মধ্যে।

১৮৬৯ সালের পূর্বে নির্মিত রেলপথের জন্য খরচ হয়েছিল খুবই বেশি। যা ছিল অমিত-ব্যয়িতার নিদর্শন। ফলত প্রথম থেকেই সরকারকে কোম্পানিগুলিকে প্রদত্ত গ্যারাণ্টিখাতে প্রচুর ব্যয় করতে হয়েছিল। যেখানে লর্ড ডালহৌসির হিসাব মত গড়ে মাইল প্রতি ৮,০০০ পাউন্ড খরচ হবার কথা, সেখানে দেখা গেল খরচ হয়েছে মাইল পিছু প্রায় ১৮,০০০ পাউন্ড, তাও জমির দাম বাদ দিয়ে, কেননা জমি বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল।"[২] এই বাড়তি ব্যয়ের কারণ ছিল বহুবিধ। কাজটা ছিল একেবারে নূতন ধরণের। তার উপর, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, স্থানীয় পরিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদিও ছিল। ব্রডগজের মনোনয়ন, অনাবশ্যক উচ্চমান, অপ্রয়োজনীয় ডবল লাইন ইত্যাদিও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু ব্যয়-বৃদ্ধির আসল কারণটা ছিল অন্যত্র। তা হল, ঢালাও গ্যারাণ্টীর ব্যবস্থা। যার জন্য নির্মান কার্যে অথবা রেল চলাচলে মিতব্যয়িতার কোনো প্রেরনাই রেল কোম্পানিগুলি পায়নি, বরং অযথা ব্যয়কেই প্রশয় দেওয়া হয়েছে, কেননা সুদের গ্যারাণ্টির ফলে মূলধন লগ্নির পরিমাণ বাড়লে বেশি সুদ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

১৮৭২ সালে ভারতের এক প্রাক্তন অর্থসচিব ডবলিউ, এন, ম্যাসে এই কথাটাই বলেছিলেন: "পুরো অর্থই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে এসেছে; যতদিন পর্যন্ত ভারতের তহবিল থেকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদের নিশ্চয়তা আছে, ততদিন তাদের টাকাটা হুগলির জলে ফেলা হল, না চুন সুরকিতে লাগানো হ'ল, তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথার কারণ নেই।" সুতরাং ব্যয়ভার সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখতে পারলে যে পরিমাণ অর্থ সুদ দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত হলেও হতে পারত, দেখা গেল বিনিয়োগের উপর গ্যারেণ্টির সুদ দিতে গিয়ে তাতে কুলোচ্ছে না, এবং সরকারকে বাধ্য হয়ে ঘাটতি মেটাতে হচ্ছে। এই

নিয়মিত এবং ক্রমবর্ধমান ঘাটতি[৩] ভারতের সরকারি কোষাগারের উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করল, এবং তার ফলে অনিবার্য ভাবে রেলের নির্মাণকার্য শ্লথ হয়ে এল। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লাট স্যার জন লরেন্স একটি দীর্ঘ ও প্রাঞ্জল কার্যবিবরণীতে প্রস্তাব করেছিলেন. "যে ব্যবস্থার ফলে লাভের সবটাই কোম্পানির ঘরে যাচ্ছে আর লোকসানের বোঝা চাপছে সরকারের উপর" সেই ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করা হ'ক। গ্যারাণ্টি তুলে নেবার ফলে ভবিষ্যতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে সরকারের কর্তব্য হবে গ্যারাণ্টির হারের চাইতে কম সুদের হারে মূলধন ঋণ করে অথবা সরাসরি কোষাগার থেকে অর্থ লগ্নি করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনা। প্রস্তাবটা ভারতসচিব গ্রহণ করেছিলেন। এর পর ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত সরকার নিজের উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪৯৩ মাইল রেলপথ সরকারি এজেন্সিগুলির মারফৎ নির্মিত হ'ল, অর্থাৎ মোট রেলপথের পরিমাণ দাঁড়াল, ৮,৪৯৪ মাইল।

পূর্বতন গ্যারাণ্টি-ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম খরচে সরকারি উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও নির্মাণ-কার্যের গতি ত্বরান্বিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় অচিরেই সরকারকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল। দেখা গেল, সরকারি সামর্থ্য প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।[৪] ভারতের এবং ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ দ্রুত রেলপথ নির্মাণ করতে চাইছিলেন[৫]; তাছাড়া ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দেশে প্রায় ২০,০০০ মাইল রেলপথের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল। সেজন্য পথ নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য লর্ড রিপনের নেতৃত্বে ভারত সরকার জবরদস্ত ওকালতি শুরু করল। বিষয়টিকে খতিয়ে দেখবার জন্য ১৮৮৪ সালে একটা পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হ'ল। এই কমিটি সুপারিশ করল, আরো দ্রুতগতিতে রেলপথের সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার এজেন্সিরই সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একাজে উৎসাহ দেখায় নি, যার জন্য সরকারকে আবার গ্যারাণ্টি প্রথায় ফিরে যেতে হ'ল, যদিও আগের তুলনায় হালকা শর্তে। অবশ্য একই সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের কাজও চালু রইল। এরপর থেকেই রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুতবেগে এগিয়েছিল—কারো-কারো ভাষায় 'পড়ি কি মরি' করে। ১৯০৫ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ৩৫৯ কোটি টাকা (অথবা ২৪ কোটি পাউণ্ড) ব্যয়ে নির্মিত প্রায় ২৮,০৫৪ মাইল রেললাইন যাতায়াতের জন্যে খুলে দেওয়া হ'ল।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেলপথের বিকাশের এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক

নিরীক্ষা থেকে লক্ষণীয় চারটি প্রধান বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করব—

(ক) ভারতীয় রেলপথ মূলতঃ ব্রিটিশ মূলধনে নির্মিত হয়েছিল, এবং এতে ভারতীয় মূলধনের কার্যত কোনো ভূমিকাই ছিল না। এর জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যে মূলধন এসেছিল "তা সামগ্রিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম একক লগ্নি'-র উদাহরণ।

(খ) যে অর্থে "উদ্যোক্তারা লোকসানের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে" সেই অর্থে প্রকৃত বেসরকারি উদ্যোগ ভারতীয় রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। কারণ, উদ্যোক্তারা এবং বিনিয়োগকারীরা স্বাভাবিকভাবেই যে ঝুঁকি থাকে তাও নিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা সরকারি গ্যারাণ্টির ছত্রছায়ায় কাজ করাকে অথবা রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রচারিত সরকারি বণ্ডে বিনিয়োগ করাকেই শ্রেয় মনে করেছে।

(গ) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধিও 'ভারতীয় রেলপথ বিনিযুক্ত মূলধনের সুদ দিতে সক্ষম হয়নি। ১৯০০ সালেই প্রথম রেলওয়ে নীট মুনাফা করে। ততদিনে সরকারকে গ্যারাণ্টির প্রদত্ত সুদ হিসাবে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা দিতে হয়েছিল।

(ঘ) আলোচ্য সময়কালের শেষ কয়েক বছরে রেলপথ তৈরির কাজ বেশ দ্রুতগতিতে চলেছিল, যদিও এটা ছিল সরকারের আর্থিক অনটন এবং মহামারী আর দুর্ভিক্ষের সংকটকাল। ১৮৫০ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে যেখানে ১৭,৩০৮ মাইল রেললাইন বসানো হয়েছিল, সেখানে প্রায় ১০,৭৪৬ মাইল বসানো হয় ১৮৯২ থেকে ১৯০৫ এই সময়টুকুর মধ্যে। জেংক্স্-এর বক্তব্য অনুযায়ী, "এমনকি গ্রেট ব্রিটেনেও রেলপথ নির্মাণের কাজ এত দ্রুতগতিতে করা যায়নি; ফ্রান্সের রেলপথ নির্মিত হয়েছিল আরো ধীর গতিতে।"[৬]

২. দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাদের বক্তব্য :

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ নির্মাণের কাজ ক্রমশঃ দ্রুত হয়ে উঠতে থাকায় ভারতীয় নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন রেলের সম্প্রসারণ এবং সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং প্রচার করা প্রয়োজন। এমনিতে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত ছিল না, যে প্রশ্নটিকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তা হ'ল নির্মাণের কাজ অত দ্রুত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা। এ-বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনায় নেতারা উৎসাহী ছিলেন না; দোষগুণ নিয়েও সেজন্য তারা আলোচনা করেন নি। ভারতবাসীর শুভাশুভ এবং তার আর্থিক জীবনের উপর রেলওয়ের প্রভাব সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার দ্বারা

তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। জি. ভি. যোশি পুণা সার্বজনিক সভা'র পত্রিকায় ১৮৮৪ সালের অক্টোবর মাসে 'দি ইকনমিক রেজাল্টস অব ফ্রী ট্রেড অ্যান্ড রেলওয়েজ এক্সটেনশন' প্রবন্ধে জাতীয় নেতাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করেছিলেন। ভারতবাসীর মনোভাবকেই তিনি প্রকাশ করেছেন, এই দাবি উপস্থিত করে যোশি রেলপথের যথেষ্ট সম্প্রসারণের প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"ইতিমধ্যেই দেশের যে-সব ক্ষতি ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরো বড় রকমের যে ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে তার অন্তত কিছুটাও যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম, তাঁদের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই একপেশে উন্নয়ন কার্যের পক্ষে ওকালতি চালানো হচ্ছে, সুস্থিরভাবে সেসবের বিচার-বিবেচনা করা, এবং ব্যাপারটা যখন আরো দূর অবধি গড়াবে, তার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ফলাফলের হিসাব-নিকাশ করা… । অতীতের সরকারি কাজকর্মের আর্থ-সামাজিক ফল কী দাঁড়িয়েছিল সেটা স্মরণে না রাখলে এ প্রশ্নের সঠিক মীমাংশা করা সম্ভব নয়।"

৩. অর্থনীতির উপর রেলপথের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ শাসকদের মতে রেলপথের প্রভাব ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণটাই মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। শুরু থেকেই দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে লোকহিতৈষিণার প্রশ্ন তাঁরা তুলেছিলেন ; দাবি করেছিলেন, রেলপথ দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে সাহায্য করবে। ভারতে রেলপথ নির্মাণের অন্যতম পথিকৃৎ লর্ড চ্যাপম্যান ১৮৪৮ সালে এই বক্তব্যই উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের ফলেই এই দারিদ্র ; রেলপথ নির্মাণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে চায়, এমন দেশে দারিদ্র থাকতে পারে না।" ১৮৮৪ সালের পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটিও একই যুক্তিতে রেলপথের দ্রুত সম্প্রসারণ সুপারিশ করেছিল। এর ফলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য বাড়বে, আরো বেশি উর্বর কৃষিভূমি অথবা কয়লাখনিকে কাজে লাগানো যাবে, এবং সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।[৭] ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলগিন ১৮৯৬ সালে জোর দিয়ে বলেছিলেন, "রেলপথ নির্মিত হলে তার সাহায্যে আমরা সুনিশ্চিতভাবে কৃষিনির্ভর এই সুবিশাল জনসমাজের বৈষয়িক অবস্থার প্রকৃত উন্নতিসাধন করতে পারব।" তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের "এই রেলব্যবস্থাকে আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধান এবং রাজনৈতিক স্থিরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রচন্ড শক্তিশালী এক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।"

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রেলপথের প্রকৃতি

ও সম্ভাব্য উপকারিতা—যথা সুলভ এবং দ্রুত পরিবহণের সুযোগ, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের উন্নতি, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা, নতুন কর্মসংস্থান, অন্তর্দেশীয় এবং বহির্বাণিজ্যের উন্নতি, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, কৃষিকর্মে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সুফল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও কলকারখানার স্থাপনে প্রত্যক্ষ উৎসাহদান, সামগ্রিকভাবে উদ্যোগের প্রসার, ইত্যাদি— সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ নেতাদের মতন তাঁরা প্রকৃত উন্নতি ও উন্নতির সম্ভাবনার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা ভুলে যাননি। এটা ঠিক যে, রেলপথ নির্মাণের যুগে, এমনকি পরেও, রেলপথের সুফলের সম্ভাবনা তাদের কারো কারো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, ফলে দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণের দাবিতে তাঁরাও অন্যদের সঙ্গে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন।[৮] কিন্তু যখন প্রকৃতই কী হয়েছে সেদিকে নজর দিলেন, দেখা গেল কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির অনেকটাই অদৃশ্য, যেটুকু বা পাওয়া গিয়েছিল তাও রেলপথ নির্মানের ফলে উদ্ভূত কুফলের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

এই কারণেই ১৮৮৩ সালে দাদাভাই নৌরজি অভিযোগ করেছিলেন, "ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য রেলপথ নির্মাণের যেসব সুফল দেখা গেছে, তা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে"। ১৮৮৮ সালে জি ভি. যোশি মন্তব্য করেছিলেন: "রেল ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ফলাফল এ দেশে শিল্পোদ্যমের বহুমুখী বিকাশের পথে ভীষণ ক্ষতিকারক হয়েছে"। "ভারতের মতন একটা দেশে সুষ্ঠু, বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেবার যে প্রবণতা রেলব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে" যোশি তার সমলোচনা করেছিলেন। ডি. ই. ভচা ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আর্থিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে, এর ফলে (অর্থাৎ, রেলপথ নির্মাণের জন্য) জনসাধারণকে কিছু কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।" ১৮৯৮ সালে, জি. এস. আয়ার স্পষ্টই বললেন যে তদানীন্তন রেলনীতি বাস্তবে, "বহুমুখী অমঙ্গলে" পরিগণিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তও মনে করেছেন, ভারতবর্ষে রেলপথের অর্থনৈতিক প্রভাব "সামগ্রিক ভাবে মঙ্গলজনক হয়নি।" তিলকের বক্তব্য: ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের ঐ স্তরে টেলিগ্রাফ, রাজপথ প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে সুফলের সম্ভাবনা ছিল না কেননা সবই ছিল "পরের বউকে সাজানোর" মত। বিচারপতি রানাডে পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "রেলপথ নির্মাণের ফলে আর যে সুবিধাই হ'ক না কেন যে বিশেষ দুর্বলতা ভারতবর্ষকে পঙ্গু করে রেখেছিল এবং জাতির অগ্রগতিতে বাধা হয়েছে, রেলপথ তার সুরাহা করতে পারেনি।" অনুরূপভাবে, আরো শাণিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে। যেমন ১৮৮৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল 'সহচর' লিখেছিল,—"লৌহপথের প্রসারের অর্থ আরও বেশি লৌহ শৃঙ্খল"; 'দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা'ও ১৮৯২ সালের

৩১শে মে লিখেছিল—"রেল ব্যবস্থা দেশকে আরও দরিদ্র করে ফেলেছে"; 'মোড়া-বৃত্ত ১৯০৩ সালের ৩০ শে জুন মন্তব্য করেছিল: "রেলপথ আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাড়িয়েছে"; এবং 'ইন্দু প্রকাশ' ১৯০৪ সালের ৩০শে নভেম্বর অভিযোগ করেছিল যে, "রেলপথ ভারতের উন্নতির মূলেই কুঠারাঘাত করেছে।"

রেলপথ থেকে উদ্ভূত কুফলের মধ্যে যেটিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন তা হ'ল, রেলপথ ভারতে শিল্পোদ্যগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা শিল্পবিপ্লব না হওয়ায়, অর্থাৎ পাশাপাশি বৃহদায়তন ভারতীয় শিল্পের অভাবে, পরিবহনের এই বিপ্লব প্রচলিত বাণিজ্য-প্রথাকে ধ্বংস করেছে, এবং ইংল্যাণ্ডের মেশিনে তৈরী শস্তা পণ্য সম্ভার কম দামে বিক্রির সুযোগ করে দিয়ে এদেশের হস্ত-শিল্পের সব নাশ ঘটিয়েছে। যার ফলে রেলপথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে বরং আরও অবনতির কারণ হয়েছে। ভারতবর্ষও ক্রমশঃই আরো বেশি করে গ্রামীণ হতে-হতে অবশেষে ব্রিটেনের কৃষি-উপনিবেশে পরিণত হচ্ছিল। এজন্য ১৮৮৪ সালে জি. ভি যোশি খেদোক্তি করেছিলেন যে, লর্ড ড্যালহৌসি আর তাঁর উত্তরসূরীদের রেলনীতি "বিস্ময়করভাবে কম সময়ের মধ্যে" দেশজ শিল্পকে "পিষে মেরে ফেলে" "দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছে এবং ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।" বিচারপতি রাণাডেও এই রেলনীতির নিন্দা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, তাঁর মতে, এই নীতির জন্যেই "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আশা সুদূর-পরাহত হয়ে পড়েছিল এবং বিদেশী পণ্যের আমদানি সহজ হয়ে পড়েছিল, যা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব হ'ত না।" তাছাড়া "গুটিকয়েক প্রেসিডেন্সি শহর বাদ দিলে এই নীতি সর্বত্রই স্থানীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল এবং জনসাধারণকে আরো বেশি পরিমানে কৃষিনির্ভর ক'রে ও কৃষিকে একমাত্র জীবিকায় পরিণত ক'রে তাদের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিল'। জি. এস. আয়ার একই কথা আরও সংক্ষেপে এবং জোর দিয়ে বলেছিলেন—"এদেশে এক এক মাইল রেলপথ বসেছে আর কোনো না কোনো শিল্পের শবাধারে এক একটি পেরেক মারা হয়েছে।" "সুতরাং" —তিনি লিখলেন—"এই অপরিসীম দারিদ্র যা গরীবদের পিষে মারছে, তার অনেকাংশ কারণ বলে রেল ব্যবস্থাকেই জবাবদিহি করতে হবে"। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনুরূপ সমালোচনা করেছিলেন।

জি. ভি. যোশি সমস্যাটিকে আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে রেলপথ নির্মাণের জন্য সুদের গ্যারাণ্টি আসলে বিদেশী বণিকদের ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে তিনি এই ব'লে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যে, "দেশীয় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিদেশী বণিক যাতে বেশি সুবিধা পায় সেজন্যে তাকে বা তার স্বদেশিয়দের

উদার হস্তে সাহায্য করতে হচ্ছে ভারতকে, আর এর ফলে দেশীয় উৎপাদকরা যে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ইতিমধ্যেই হয়েছিল, তা আরও বেড়েছে"।

কিন্তু দেশীয় শিল্পের এই অবলুপ্তি প্রক্রিয়া কি অনিবার্য ছিল না? যে সব দেশে শিল্প এবং পরিবহন বিপ্লব হয়েছে তাদেরও কি একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি? প্রতিটি দেশেই রেলপথ নির্মাণ কি নতুন নতুন শিল্পস্থাপনে সহায়ক হয়নি? এর উত্তরে কিছু ভারতীয় নেতা একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তা হ'ল—"এদেশে রেলপথ শিল্পোৎপাদনে প্রেরণা দেয়নি" কারণ রেলপথ নির্মাণের ফলে ইংল্যাণ্ডে কয়লা, ইস্পাত এবং যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের প্রাথমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হলেও, ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এবং ভারতের অন্তর্দেশীয় বাজারের যে প্রসার হয়েছিল তার থেকে আহৃত মুনাফার বেশির ভাগটাই গিয়েছিল ভারতের নয় ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের পকেটে। সর্বোপরি, রেলপথ এদেশের অর্থনীতির জঠরেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠেনি, তা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার পরিণতি হয়েছে নিদারুণ। জি. এস আয়ার সেজন্যই প্রশ্ন করেছিলেন— "এই বিধ্বংসী প্রক্রিয়াটিকে কি একটু ধীরগতি ও পর্যায়ক্রমিক করা যায় না, যাতে সাধারণ মানুষ একটু বাঁচার সুযোগ পায়?"

এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ কোন কোন আধুনিক শিল্প বিশেষ করে [চা] বাগিচা ইত্যাদি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এগুলি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার প্রায় সবটাই যেত বিদেশীদের ঘরে। এই ধরণের অর্থনৈতিক বিকাশ প্রকৃতপক্ষে বিদেশী মূলধনের দ্বারা শোষণেরই নামান্তর।

রেলপথের আরেকটি কুফল দেখা গিয়েছিল। রেলপথ স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ নিষ্কাশন আরও বেড়েছিল। এ-দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল বিদেশী মূলধনের সাহায্যে, রেলব্যবস্থা পরিচালিতও হচ্ছিল বিদেশী কর্মীবাহিনীর দ্বারা। ফলে সুদ ও মুনাফা হিসেবে, আমদানি করা সরঞ্জামের দাম ও ইউরোপীয় কর্মচারিদের পারিশ্রমিক হিসাবে এবং ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত অফিসের খরচ মেটাতে প্রচুর টাকা বাইরে চলে যাচ্ছিল। সুদের জন্য ব্যয় রেলের সামগ্রিক ব্যয়ের সামান্য অংশ, যেসব দেশকে বিদেশী মূলধনের সাহায্যে রেলপথ নির্মাণ করতে হয়েছে তাদের সবাইকেই এই ব্যয় বহন করতে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যয়গুলি একান্তভাবেই ভারতের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এগুলির জন্যই এদেশের অর্থনীতিতে রেলপথ স্থাপনের ফলাফল অন্যান্য রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সম্পদ নিষ্কাষণের জন্য রেলপথের উপকারিতা কমতে কমতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখেই দাদাভাই নৌরজি ১৮৭৬ সালে বলেছিলেন: "এদেশে রেলপথ নির্মাণ বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক সরকারি পূর্তে

কর্মাদি করা হ'ক, কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যাতে স্বাভাবিক সুফলটা আমরাই পেতে পারি, অন্যথায় নিরন্নের কাছে ভূরিভোজের বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই।" জি. এস. আয়ার লিখেছিলেন যে, রেলপথ নির্মাণের ফলে প্রাপ্য বিভিন্ন সুবিধার বিনিময়ে সম্পদ নিষ্কাষণ একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হলেও ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়; ভারতকে ইতিমধ্যেই নানা খাতে প্রতি বছরে ৩০০ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি বিদেশে পাঠাতে হচ্ছিল, ফলে রেলপথ খাতে আরও অর্থ বিদেশে পাঠাবার সামর্থ্য তার ছিল না।[৯]

জাতীয়তাবাদী নেতারা রেলব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ করেছেন : রেলপথ নির্মাণের ফলে বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানি সহজতর হয়েছে। যার ফলে এমনকি স্বাভাবিক সময়েও খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়ে দেশ সহজেই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়ছে।[১০] এই সমালোচনা এত ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল যে লর্ড কার্জন ১৯০১-২ সালের আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তৃতায় সবিস্তারে এর জবাব দিতে বাধ্য হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অভিযোগকে ভিত্তিহীন এবং "প্রথম শ্রেণীর হেত্বাভাস" আখ্যা দিয়ে তিনি খাদ্যশস্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ঘটনা এবং "এটা প্রধানতঃ রেলপথ নির্মাণের ফলে হয়েছে", এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে, ভারতে উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ রপ্তানি হচ্ছিল বলে অভিযোগ করা হয় সেটা সঠিক নয়, বরং রেলওয়ের কল্যাণে দেশের উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশষ্য নিয়ে-যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং বিদেশের বাজার থেকে আমদানি করা যাচ্ছে, আর তার ফলে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে। কিন্তু রেলের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে দাবি রেলের অতি-উৎসাহী প্রবক্তারাও যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিল, তা ধরে ফেলতে নেতাদের একাংশের খুব বেশি দেরি হয়নি। তাঁরা দেখালেন যে, খাদ্যশষ্য আমদানি কিংবা আভ্যন্তর বাজারে পুণর্বণ্টনের ফলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব কমেছে বলে যে দাবি করা হচ্ছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের দু'দুটো দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জি এস আয়ার লিখলেন : "একমাত্র বর্মা ছাড়া অন্য কোনো দেশ থেকেই খাদ্য আমদানি করা হয়নি ; এবং শুধু যে আমদানি করা হয়নি তাই নয়; দুর্ভিক্ষের সময়েও বাইরে প্রভূত পরিমাণে খাদ্য রপ্তানি ক'রে দেশের সামান্য সঞ্চয়কেও নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে।" ১৯০১ সালের ২৮ শে এপ্রিল "বেঙ্গলী" পত্রিকা অন্য আর একটি দিক থেকে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে অভিযোগ করেছিল : রেলব্যবস্থা বাণিজ্যিক পণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে পরোক্ষে খাদ্যের যোগান কমিয়ে দিয়েছে, কারণ বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করে লাভের সম্ভাবনা বেশি বলে বহু জমিতে খাদ্য-শষ্যের বদলে বাণিজ্যিক-শস্যের চাষ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী নেতারা আর একটি বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন, তা হ'ল, ভারতে রেলব্যবস্থা বাণিজ্যিক দিক থেকে সফল হয়নি, যে কারণে, বহুকাল পরেও, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি, রেলওয়েজ স্বনির্ভর হতে পারেনি। এবং লোকসানের বোঝা বহন করেছে, বিদেশী লগ্নীকারীরা নয়, ভারত সরকার—অর্থাৎ, এদেশের জনসাধারণ। নেতারা বারংবার এটা জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন যে ভারতবাসীর দারিদ্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই লোকসানের বোঝা বড়ই দুঃসহ হয়েছিল। রেলপথ থেকে পাওয়া উপকারের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। ১৯০১ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ভাষণে ডি. ই ভাচা মন্তব্য করেন: "রেলের উপকারিতা স্বীকার করলেও, প্রশ্ন থেকে যায়, কোনো দেশের পক্ষে, এমনকি ভারতের তুলনায় অনেক কম দরিদ্র দেশের পক্ষেও, কি এই বার্ষিক ক্ষতির বিলাসিতা সহ্য করা সম্ভব?"

ভারতীয় নেতাদের একাংশ এটাও লক্ষ করেছিলেন যে, তৎকালীন রেলনীতি আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়কে সযত্নে সাহায্য করলেও, দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং শিল্পোন্নয়নের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছে, এমন কি বাধা দিয়েছে। জি এস আয়ার ১৮৯৮ সালে "রেলব্যবস্থা বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক" কিনা, তা পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিচার করে দেখেছিলেন। যে তথ্য বেরিয়ে এল তা হল এই যে—১৮৯১-৯২ থেকে ১৮৯৬-৯৭ সালের মধ্যে যেখানে রেলপথ এবং নদীপথে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত পণ্যের (বিভিন্ন বন্দরে পাঠানো মাল বাদ দিলে) মোট পরিমাণ ছিল ১৩০,৪৫১,০০০ থেকে ১৬৭, ০৬৫,৬৪০ মণ, সেখানে একই সময়ে বহি বাণিজ্য পোতগুলিতে প্রেরিত বাণিজ্য-পণ্যের পরিমাণ ছিল ১৬৫,১০৫,০০০ মণ থেকে ১৮৫,১৯৯,০০০ মণ। আয়ার মন্তব্য করেছেন: অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধিই যদি প্রশাসনের উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে গ্রামাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর আরো বেশি নজর দেওয়া হ'ত। এরও আগে, ১৮৮৮ সালে, শাণিত বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে জি. ভি. যোশি দেখিয়েছিলেন যে, রেলের মাসুল নীতির মধ্যেই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার প্রবণতা ছিল। তাঁর ভাষায়: "রেলের মাসুল খুবই কম, এমনকি ইংল্যাণ্ড এবং বহু ইউরোপীয় দেশের তুলনাতেও কম রাখা হয়েছে", অথচ রেল কোম্পানিগুলি ব্যয় নির্বাহ করতে এবং সুদের টাকা দিতে অপারগ, গ্যারাণ্টির শর্ত অনুযায়ী ঘাটতি সরকারকে মেটাতে হচ্ছে। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, তা হ'ল—"বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্যে রেল মাসুলের হার কম রেখে সরকার যে ভর্তুকি দিচ্ছে তা প্রকৃত অর্থে বহির্বাণিজ্যের কল্যাণ-তহবিলে সরকারি দান।"

অবশ্য সে সময় এই সামান্য কয়েকজন নিপুণ পর্যবেক্ষককে বাদ দিলে জাতীয় নেতারা এই সমস্যাকে মোটের উপর উপেক্ষাই করেছিলেন।[১১] তার প্রধান কারণ, রেলের মাসুল-নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায় এমন সামর্থ্য ভারতীয়

শিল্পোদ্যোগের তখনো ছিল না। তাছাড়া ভারতীয় শিল্প যা গড়ে উঠেছিল তা প্রধানতঃ বন্দর শহরগুলিকে ঘিরে। বন্দরমুখী বাণিজ্যে কম মাসুলের সুফল তারাও সমানভাবে ভোগ করত। কিন্তু তাসত্ত্বেও যেটা লক্ষণীয় তা হ'ল, জাতীয় নেতৃত্বের কোনো অংশই কখনো বিকাশমান বাণিজ্যিক বুর্জোয়ার দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাধারণভাবে পরিবহণের মাসুল কিংবা বিশেষ ক'রে রপ্তানি-যোগ্য কাঁচামালের পরিবহণ-ব্যয় কমানোর দাবি জানান নি।

এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যেও হয়তো কিছুটা আশার আলো দেখা দিত যদি রেলপথ নির্মাণের ফলে উদ্ভূত আর্থিক বোঝা আর অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই দেশের মানুষকে "কারিগরি প্রশিক্ষণ দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, যাতে কারিগরি জ্ঞান অর্জন ক'রে এবং পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তারা রেলব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট নব শিল্পপরিমণ্ডলের দায়িত্বভার যথাসময়ে নিজের হাতে তুলে নেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।"[১২] কিন্তু রেলপথ নির্মাণের সময় বিদেশী শাসকবর্গের মাথায় এধরণের কোনো চিন্তাই স্থান পায়নি। বরং দেখা গেল যে সরকার এবং রেল কোম্পানি উভয়েই উচ্চ পদগুলি থেকে ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলটা দাঁড়াল, লর্ড ডালহৌসি রেললাইন দিয়ে ভারতবর্ষকে ঢেকে দেবার প্রস্তাব পাশ করানোর পর পঁচিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও নেটিভ ভারতবাসী রেলপথের নির্মাণ কিংবা পরিচালনার কাজে আগের মতই অযোগ্য রয়ে গেল।

এছাড়া রেলপথ নির্মাণের একটা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল। জি ভি যোশি এবং জি.এস আয়ার সেটি চরম বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যোশির মতে, রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে "বিদেশী শেয়া হোল্ডারদের একটা শক্তিশালী অভিজাত-মণ্ডলী" গড়ে উঠছিল, যাদের স্বার্থ ছিল এদেশের স্বার্থের পরিপন্থী। আয়ারও উল্লেখ করেছেন যে বিদেশী রেল কোম্পানিগুলি "ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এদেশের স্বার্থ-বিরোধী কার্যেরত বিদেশী কায়েমি স্বার্থকে আরও শক্তিশালী" করে তুলছিল [১৩]

কিন্তু একটা লক্ষ করার বিষয় হ'ল এই যে, রেলপথ নির্মাণের অন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ঐ সময়ের বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী সমলোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথমত কৃষিতে বাণিজ্যিক বিপ্লব - অর্থাৎ বাণিজ্যশস্য চাষের প্রসার এবং কোনো কোনো শস্যের স্থানিক বিশিষ্টতা অর্জন, যা পুরো-পুরি না হলেও অন্তত অংশত রেলপথের অবদান-সম্পর্কে তাঁরা কোনো মন্তব্য করেন নি। দ্বিতীয়ত, সারা দেশে দ্রব্য-মূল্য সমীকরণের যে লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সেটার গুরুত্বও তাঁদের চোখে পড়েনি, যদিও তাঁরা কখনো-কখনো এ রকম সমীকরণ যে ঘটেছে তার উল্লেখ করেছেন। সবশেষে, রেলপথ ভারতীয় বাণিজ্যিক মূলধনকে গ্রামাঞ্চলেও অনুপ্রবেশের যে সুযোগ ক'রে দিয়েছিল তা তারা লক্ষ

করেন নি, এবং সেজন্যই তাকে রেল ব্যবস্থার সুফল বলে মনে করেন নি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, রেলপথ সম্পর্কে ভারতীয় সমালোচকদের বিরুদ্ধে অনেক সময় যে রক্ষণশীলতার অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা ঠিক। এটা মনে রাখা দরকার যে, জাতীয়তাবাদী সমালোচকরা কখনই "সামাজিক রক্ষণশীলতার ফলে অনড়, অচল অথনৈতিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখার আদর্শের"[১৪] দ্বারা পরিচালিত হন নি। বরং এঁরা সবাই আধুনিক শিল্পের অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশই অগ্রসর সামাজিক চিন্তারও অংশীদার ছিলেন (সে বিষয়ে এর আগে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)। এটা ঠিক যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির উপর সংরক্ষণশীলতার প্রভাব ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব কম কাগজই প্রচলিত সমাজজীবনে পরিবর্তন আনার দায়ে রেল পথকে অভিযুক্ত করেছে।[১৫]

প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় নেতারা কখনই রেলের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তাঁরা আপত্তি জানিয়েছিলেন সেই সময়ে রেল সংক্রান্ত কাজ যে ভাবে চলছিল তার বিরুদ্ধে।[১৬] ভারতীয় অথনীতির উপর রেলপথের প্রভাব ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করার পর তাঁরা বুঝতে পারেন যে আগে তাঁরা যা ভেবেছিলেন এবং কতৃপক্ষ যে আশার চিত্র এঁকেছিল, বাস্তবে তার বিপরীতটাই ঘটেছে। তাঁরা দেখালেন, রেলপথ মোটেই অবিমিশ্র আশীর্বাদ হয়নি, এর সার্বিক প্রভাবের প্রায় সবটাই নেতিবাচক, যা দেশের অনগ্রসরতাকে জীইয়ে রাখতে এবং আরো সম্প্রসারিত করতে সহায়ক হয়েছে; অন্যদিকে, উপকার যেটুকু হয়েছে, তার প্রায় সবটাই বিদেশী ব্যবসায়ীরা শুষে নিয়েছে। সুতরাং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সাধারণভাবে রেলপথ অবশ্যই সম্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু সেই মুহূর্তে ভারতে রেল একটা অশুভ প্রভাব হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতের কোষাগারের উপর রেলপথ যে চাপ সৃষ্টি করেছিল সেটা আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল না। এবং অথনীতিকে চাঙ্গা করাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে এই অর্থ অন্যত্র আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোও অসম্ভব ছিল না। পরে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা হবে।

৪. ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য

ভারতের জাতীয় নেতারা একটি অতি সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন: ব্রিটিশ কতৃপক্ষ এবং বিদেশী লেখকরা রেলপথ-নির্মাণের জন্যে এমনভাবে চাপ দিচ্ছিলেন কেন? এবং কী কারণেই বা ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা ১৮৪৪ সালের পর থেকে—বিশেষ করে লর্ড এলগিন এবং লর্ড কার্জনের শাসনকালে—এ ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন? প্রশ্নটাকে অন্যভাবে রাখলে দাঁড়ায়, রেলপথ কাদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে বলে মনে করা হয়েছিল? এসবই পরার্থবাদী

লক্ষ্য থেকে করা হয়েছে. এরকম কোনো চট্‌জলদি ব্যাখ্যা তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা এটা বিশ্বাস করতে রাজি হন নি যে, ভারতীয়দের উপকার করা ও এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনই ছিল লক্ষ্য, এবং বিদেশী সরকার শুধু সেই সদিচ্ছার দ্বারাই প্রাণিত হয়েছে। অবশ্যই তারা এটা মানতে রাজি ছিলেন যে. কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণের জন্যে এই বাড়াবাড়ির মূলে হয়ত বা অজ্ঞতা এবং ইউরোপীয় দেশের অবস্থার সঙ্গে এদেশের অবস্থাকে তুলনীয় মনে করার ভ্রান্তি কাজ করেছে। কিন্তু মোটের উপর ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যে অনেক বেশি পার্থিব এবং সংকীর্ণ ও স্বার্থপরায়ন ছিল, সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, যাদের বিরামহীন চাপে প'ড়ে ভারতীয় কোষাগার থেকে খরচ করে এবং লোকসানের ঝুঁকি নিয়েও রেলপথ তৈরি করা হয়েছে, সেই ব্রিটিশ বণিক, উৎপাদক এবং লগ্নীকারকদের শ্রীবৃদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য। দেশব্যাপী রেলপথ স্থাপন করা হয়েছিল ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে বিট্রিশ শিল্পপতিদের মুনাফা তৈরিতে সাহায্য করার জন্য।[১৭]

ভারতীয়দের মতে, এই বিশাল দেশের অভ্যান্তরীণ বাজারটাকে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের জন্যে উন্মুক্ত করা এবং ব্রিটেনের ক্ষুধার্ত মানুষ ও কল কারখানার জন্য ভারতীয় খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যই রেলপথ নির্মাণের প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শাসকেরা ভারতকে বৃটেনের কৃষি উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

সরকারিরেলনীতির রূপায়ণের পিছনে বিদেশী বাণিজ্যের এই মূল ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার সঙ্গে সঙেগ অনেক ভারতীয় সমালোচক অন্য আরও কিছু চাপ ও উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন। মিলিতভাবে এইগুলিই ছিল রেলপথ নির্মাণের কারণ। এর মধ্যে একটি, ব্রিটেনে তৈরি রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য – যথা ওয়াগান, ইস্পাতের লাইন, ইঞ্জিন, অন্যান্য মেশিনপত্র, এবং কল-কারখানা ইত্যাদির – রপ্তানির সুযোগ করে দিয়ে ইংল্যান্ডের ইস্পাত শিল্পকে সহায়তা করা। তাছাড়া, ভারতে রেলপথ নির্মাণ করে বহুসংখ্যক ইংরেজকে ডাইরেক্টর থেকে টিকিট কালেক্টর পর্যন্ত নানাবিধ পদে কর্মনিয়োগের সুযোগ-সৃষ্টিও ছিল আর একটি লক্ষ্য। এইসব সমালোচকদের কেউ কেউ তাঁদের সমকালীন অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে, সরকার এবং কোম্পানি পরিচালিত রেলপথ দুটোই এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে উদ্বৃত্ত বৃটিশ মূলধন নিরাপদ এবং লাভজনক লগ্নীর সুযোগ পায়। আবার কারো-কারো লেখা থেকে এই উপলব্ধিরও আভাস পাওয়া যায় যে, ভারতের উপর বিদেশী রাজনৈতিক প্রভুত্ব দৃঢ়তর করাই ছিল রেলের আর একটা উদ্দেশ্য।

জি এস. আয়ার ১৮৯৮ সালে সরকারি নীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্যের সারাংশ সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন—"পুঁজিপতি, শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী, লৌহ শিল্পের ও কয়লা খনির মালিক, রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও ডাইরেক্টর, সর্বোপরি পেনসনের সঙ্গে অতিরিক্ত আয় যোগ করতে উৎসুক এমন অবসরপ্রাপ্ত ইঙ্গ-ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারি—এরা সবাই ভারতে রেলপথ নির্মাণে আগ্রহী। ভারতের পুরো বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে যে ইউরোপীয় বণিকেরা, যাদের ব্যবসায় আর উপকূলবর্তী শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে—তারাও এই ভূ-খণ্ডের সর্বত্র রেলপথের জাল ছড়িয়ে দিতে সমান আগ্রহী।"

বহু ভারতীয়ের মনে হয়েছিল যে রেলপথ নির্মাণ আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে এই কারণে যে, এই রেলপথ নির্মিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের ব্যবসার সুবিধে করে দিতে, অথচ এর পুরো বোঝাটাই বইতে হয়েছে ভারতীয়দের।[১৮] এর ফলেই সেই বিচিত্র ঘটনা দেখা গিয়াছে ঃ ব্রিটিশরাজ তার "পিতৃসুলভ দায়িত্ব" পালন করার নামে 'অধীনস্থ এই বিশাল দুর্ভাগা দেশটাকে পঙ্গু ক'রে তার সম্পদ নিষ্কাশন করে সাহায্য করছে এমন একটা দেশকে, যার এ ধরনের সাহায্যের কোনোই প্রয়োজন নেই।"

৫. ভারতীয় মানদণ্ড

ভারত সরকারের রেলনীতি যে ব্রিটেনের প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এটা লক্ষ করে ভারতীয় নেতাদের একাংশ উপলব্ধি করলেন যে, কতটা অগ্রাধিকার দিয়ে এবং কত দ্রুত রেলপথ নির্মাণ প্রয়োজন সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ একান্তই জরুরি। এ বিষয়ে তাঁরা যে আলোচনা করেছেন তা শুধু পরিবহণ নীতি বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহণের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবই নয়, সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যান-ধারণার উপরও আলোকপাত করে।

সর্বপ্রথমেই তাঁরা যে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তা হ'ল, ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রেলপথের অবদানকে বিচার করে দেখতে হবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে।[১৯]

দ্বিতীয়ত, তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে, পরিবহণ এবং শিল্পের মধ্যে শেষোক্তটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং তুলনায় পরিবহণের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম, কারণ প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক বিকাশ বলতে শিল্পোন্নয়নকেই বোঝায়। জি. ভি. যোশি ১৮৮৪ সালে লিখেছিলেন—'শিল্পের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে

ও মূলত নির্ভর করে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর।" প্রকৃতপক্ষে "সুসম্বনিত শিল্পব্যবস্থাই……… একটি জাতির উন্নতির পিছনে মূল প্রাণশক্তি।"[২০] এই অভিমত প্রবল সমর্থন পেয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২৫শে-মের বোম্বাইয়ের 'নেটিভ ওপিনিয়ন' পত্রিকায়। রেলপথের জন্যে গঠিত সিলেক্ট কমিটির কার্য-বিবরণীর উপর মন্তব্য ক'রে পত্রিকাটি লিখেছিল: "আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বিভিন্ন শিল্প-স্থাপনের উদ্দেশ্যে যদি একটা কমিশন গঠন করা হ'ত, তাহলে সেটার উপকারিতা রেলপথ সম্প্রসারণের জন্যে গঠিত বর্তমান সিলেক্ট কমিটির তুলনায় অনেক বেশি হ'ত।…এই ধরণের উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের সম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলার সূচক নয়।"

জি. এস আয়ারও একই বক্তব্য জোর দিয়ে উপস্থিত করেছিলেন: "দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগানোর বদলে সরকারের রাজস্ব ব্যয়িত হচ্ছে নিছক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল সরবরাহের কাজে। এটা তো সবারই জানা যে যেটুকু সামান্য সম্পদ আমাদের আছে তা একস্থান থেকে অপরস্থানে নিয়ে যাওয়ার চাইতে নূতন সম্পদ উৎপাদনের চেষ্টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"[২১]

বস্তুত, রেলপথের উপকারিতা 'দেশের উৎপাদিকা শক্তির উপর", অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতি ও শিল্প-ব্যবস্থা রেলপথকে কতটা কাজে লাগাতে পারে, তার উপর নির্ভরশীল. 'কেননা জাতীয় শিল্পের সংগঠনের পক্ষে উপযোগী অন্য আরো বেশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যদি না থাকে, তাহলে শুধু রেলপথ প্রগাঢ় শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, যে শক্তি দ্বারাই দেশের ব্যাপক অগ্রগতির মূল ভিত্তি রচিত হয়'। শিল্পায়ন ঘটতে থাকলে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রেলপথকে বিস্তৃত করা যেতে পারত, কিন্তু দেশ যখন মূলতঃ কৃষিভিত্তিক রয়ে গেছে, তখন বিদ্যুৎগতিতে রেলপথ বানানো নিরর্থক। অন্য ভাবে বললে, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প যদি রেলপথের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাড়তে পারত, তাহলে রেলের সম্প্রসারণ স্বাস্থ্যকর হ'ত. তা লাভজনক হতে পারত. এবং জনসাধারণেরও সমর্থন পেত।[২২] ১৮৮৪ সালের ৩০শে এপ্রিল 'সহচর' লিখেছিল:

"যে রেললাইন ইতিমধ্যেই বসানো হয়ে গেছে তার যথেষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন, কিন্তু যতক্ষণ না ভারতের দেশীয় শিল্প বিকাশলাভ করছে ততক্ষণ এটা সম্ভব হবে না, … কাপড়ের কল, লোহার কারখানা ইত্যাদির মতন আরো শিল্প এদেশে গড়ে তোলা হ'ক, তাহলেই কাঁচামাল এবং শিল্পপণ্য পরিবহণের কাজে লেগে ভারতীয় রেল লাভের মুখ দেখবে।"

কিন্তু বাস্তবে এটা ঘটেনি যদিও তা আশা করা হয়েছিল।[২৩] ভারতীয়রা এটা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, শুধু রেলপথ নির্মাণ শিল্পোদ্যোগের জন্ম দিতে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে পারে না,[২৪] সেজন্যে প্রয়োজন অন্য ব্যবস্থার। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রেলপথ শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল[২৫], কিন্তু ভারতের

অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, ভারতে রেলপথ প্রকৃতপক্ষে দেশীয় শিল্পের পঙ্গুত্ব লাভে, বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যের কল্যানে এবং এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণে সাহায্য করেছে—'শক্তিচালিত বাণিজ্য-ইঞ্জিন' এদেশে শিল্প বিপ্লব নয়, বাণিজ্য বিপ্লব নিয়ে এসেছে। আর তার ফলে, দেশের সুস্থ স্বাভাবিক বৈষয়িক অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে, জাতির কর্মক্ষমতার কেন্দ্রকে পঙ্গু করে রেখে, রেলপথ আধুনিক শিল্প গ'ড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করেছে।

কাজেই ভারতীয় নেতাদের মূল বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট: যেখানে দ্রুত শিল্পায়নই হচ্ছে না সেখানে "রেলের জন্যে বাড়াবাড়ি করা নিছক পাগলামি।" অথবা জি ভি. যোশি যেমন বলেছিলেন—

"আমেরিকাতে যেভাবে দ্রুত রেলপথের বিস্তার ঘটেছিল ভারতেও যদি সেইভাবে রেলপথ বিস্তারের নীতি গৃহীত হয়, ভারতীয় কোষাগারের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে, তবে অবশ্যই সেই সঙ্গে অন্যান্য আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ন প্রয়োজন, না-হলে দেশকে ফতুর হয়ে যেতে হবে।"

সবশেষে, নেতারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের সম্পদ ভীষণভাবে সীমিত, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়, সুতরাং সেই সামান্য সম্পদের আশায় ব'সে-থাকা বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে বাছাই করতেই হবে। তাঁদের মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না যে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতের পশ্চাদপদতা যেহেতু অভিশাপস্বরূপ, সেজন্য শিল্পোন্নয়নকে অবশ্যই পরিবহণের আগে স্থান দিতে হবে। সেজন্যই তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন, সরকার রেলপথের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ করছেন, তা রেলের বদলে শিল্প ও সেচের মত অধিকতর উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হ'ক।[২৬]

শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে রেলপথের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন তুলে ধরা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতিও তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যেগুলি রেলপথ নির্মাণের দ্রুততা ও কর্ম পরিধি স্থির করার সময় বিচার্য বলে তাঁরা মনে করেছেন। রেলপথ বিস্তারের সীমা-নির্ধারক এইরকম একটি বিষয় হ'ল কোষাগারের শোচনীয় অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের উপর বিরাট করের বোঝা। মোটামুটিভাবে তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে—ভারত ধনী দেশ নয়, তার সম্পদ বিশাল নয়, কিংবা তার কোষাগার এমন অফুরন্ত নয়, যাতে রেলপথ নির্মাণের এই গতিবেগকে সমর্থন করা যায়।[২৭] দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটি দেশীয় মূলধনের প্রাপ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের মতে, রেলপথ নির্মাণ দেশীয় মূলধনের উপর নির্ভরশীল হওয়াই কাম্য, এর জন্যে

স্টার্লিং ঋণকে আর বাড়তে দেওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়, কেননা তাহলে ভারতের সম্পদ আরো বেশি পরিমাণে দেশের বাইরে চ'লে যাবে।

এছাড়া, আর একটি বাধার দিকে, ভারতীয় নেতারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সে বিষয়ে সাবধানতার নীতি অবলম্বন প্রয়োজন বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। রেলপথের জন্য বিনিযুক্ত অর্থের জন্য টাকার হিসাবে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে (প্রথম দিকে টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিঃ ১০ পেঃ হিসাবে) এবং লণ্ডনের অর্থ বাজার থেকে সংগৃহীত মূলধনের জন্য পাউণ্ডের হিসাবে সুদ দিতে ইংলাণ্ডে যে টাকা পাঠাতে হচ্ছিল, তা ভারতীয় মুদ্রা থেকে পাউণ্ডে রূপান্তরিত করতে গিয়ে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। বিশেষ করে পাউণ্ডের সঙ্গে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রমাগত টাকার অবমূল্যায়ন ঘটায় এই ক্ষতির পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছিল।

বহু ভারতীয় নেতা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে নূতন রেলপথ নির্মাণ অনুমোদনের আগে আর্থিক মুনাফার সম্ভাবনা আছে কিনা, সেটা খুব ভালোভাবে খতিয়ে দেখে, সে, বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত। তাঁরা আশঙ্কা করেছেন, অধিকাংশ রেলপথেরই আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তা নাহলে, সুদের গ্যারাণ্টি ছাড়া নির্মাণের কাজে এগুতে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা গররাজি হবেন কেন?

ভারতীয় নেতাদের একাংশের অভিমত ছিল এই যে, রেলপথ স্থাপনের গুণাগুণের কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, তাহলেও, যেহেতু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক কিংবা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্যে যে পরিমাণ রেলপথ বসানো প্রয়োজন তার সবটাই বসানো হয়ে গিয়েছিল, তখন সরকারের কর্তব্য ছিল দেশের পুনর্গঠনের জন্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃষ্টি ফেরানো। এবং ঐসব ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি ঘটলে, তখনই কেবল নতুন রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারত।

ভারতের কোষাগারের অবস্থা, দেশীয় মূলধনের অপ্রাপ্যতা, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পিত রেলপথের মুনাফাহীনতা, ভারতীয় শিল্পের চাহিদা ও শিল্পের সঙ্গে রেলের সমন্বয়ের প্রয়োজন, ইত্যাদির কথা মনে রেখে, এবং একই সঙ্গে বিবিধ অর্থনৈতিক কার্য ও কারণের পরিবর্তনশীল পারম্পর্যের পরিপ্রেক্ষিতে রেলপথের কিছু সম্প্রসারণ যে অপরিহার্য, এই বাস্তবোচিত উপলব্ধি থেকে জাতীয় নেতারা ১৮৮৪ সালের পর[২৮] অনুভব করেছিলেন যে খুব দ্রুত নির্মাণ কার্য চালানো অথবা 'যথেচ্ছ রেলপথ' বসানো অনুচিত হলেও প্রয়োজনমত অবশ্যই নতুন রেলপথ নির্মাণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা করতে হবে আরো অনেক পরিমিতি সহকারে, সরকার যেভাবে করতে চাইছিল অথবা ক'রে ফেলছিল, সেভাবে নয়।[২৯] এঁদের কেউ কেউ এর সঙ্গে আর একটি শর্ত যোগ করেছিলেন ঃ

"এরপর থেকে সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর নূতন রেলপথ নির্মাণের দায় জনগণের উপর চাপাতে পারবেন না', ভবিষ্যতে সমস্ত রেলপথ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নির্মাণ করতে হবে, অর্থাৎ বেসরকারি উদ্যোগকে ঝুঁকি নিতে হবে, এবং কোনোরকম সরকারি অংশগ্রহণ অথবা গ্যারাণ্টি থাকবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৮৯৯ সালে ফাউলার কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় রমেশচন্দ্র দত্ত একটি আকর্ষনীয় প্রস্তাব রেখেছিলেন, তাহল—"কোনো নূতন রেলপথ অনুমোদন করার আগে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।" অন্যত্রও তিনি মন্তব্য করেছেন, সরকার রেলনীতির ক্ষেত্রে "জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারছেন", "শক্তিশালী শ্রেণীসমূহের অভিমতের বিরুদ্ধে জনগণকে তাদের মতামত সংবিধানসম্মতভাবে জ্ঞাপনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না"[৩৩] বলে।

৬. সংগঠন পদ্ধতি

অতি দ্রুত রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজন আছে কিনা, সে-বিষয়ে বিশদ আলোচনা ছাড়াও ভারতের জাতীয় নেতারা রেলের সংগঠন নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছিলেন। তবে এ-বিষয়ে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা সীমিত ছিল শুধু রেলপথ নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত ধরণের এজেন্সি কী হওয়া উচিত তার আলোচনায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় নেতারা বিশেষ ক'রে ১৮৮৪ সালের পর থেকে রেলপথের দ্রুত সম্প্রসারণের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই তাঁদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ঐটিই। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রায় অলভ্য, যাও বা পাওয়া যায় তা খুবই বিক্ষিপ্তভাবে। আর নতুন রেলপথ দরকার নেই, এই কথা বলে সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রবণতা ছিল স্পষ্ট।

রেলপথ নির্মাণের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি এজেন্সি আর বেসরকারি কোম্পানির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক, এই প্রশ্নটি লর্ড রিপণ ভাইসরয় থাকাকালীন ভারতীয়দের মধ্যে অন্তত প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য হয়ে উঠেছিল। রিপনের অর্থসচিব ইভলিন বেরিং ১৮৮৯ সালে প্রস্তাব করলেন যে, সরকারের একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ ক'রে বেসরকারি নির্মাতাদের হাতে আংশিকভাবে কাজের ভার দিয়ে দেওয়া হ'ক—সরকারি সাহায্য ব্যতীত, অথবা, যথাসম্ভব কম সাহায্যে তাদের এটা করতে হবে। এর পরেই ১৮৮৩ সালে ভারত সরকার লাভজনক রেলপথগুলিকে লীজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থির হয় যে, সাধারণভাবে সরকার সেইসব রেলপথ তৈরির ভার নেবে যেগুলি বাণিজ্যিক দিক থেকে বা অন্য কারণে লাভজনক হবার সম্ভাবনা কম ব'লে বেসরকারি এজেন্সিগুলির পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়।' পরবর্তী কয়েক বছরে এই নীতি অনেকটাই

কার্যে রূপায়িত হয়েছিল। একের পর এক ভারতসচিব, গভর্নর জেনারেল এবং রবার্টসন প্রমুখ রেলের বড় কর্তারা এই নীতির প্রশংসা করেছেন, একে সমর্থন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির মধ্যে একটির ক্ষেত্রেই সব ভারতীয় নেতা একমত ছিলেন। গ্যারান্টি প্রথার ফলে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, করদাতাদের মাথার উপর কী বিরাট বোঝা চেপেছে, এবং কত তাড়াতাড়ি এই কু-ব্যবস্থা রদ করা সম্ভব, সে বিষয়ে তাঁরা সবাই ভেবেছেন। তাঁদের মতে, এই প্রথার সব চাইতে আপত্তিকর দিক, সরকার সর্বদা গ্যারান্টি দেওয়া সুদ দিতে প্রস্তুত থাকায় এবং তার থেকে বেশি লাভের বিশেষ সম্ভাবনা না-থাকায় কোম্পানিগুলি মিতব্যয়ী হতে প্রণোদিত হয়নি, বরং যথেচ্ছ, বাহুল্যপূর্ণ এবং বাজে খরচ করতে উৎসাহ পেয়েছে।[৩১] গ্যারান্টী দিয়ে রেলপথ নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের এই আপত্তি সবচেয়ে প্রাঞ্জলভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছিল বিচারপতি রাণাডের লেখা "পার্লামেন্টারি কমিটি অন ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওয়ার্কস" নামক প্রবন্ধে, যেটা লেখকের ছদ্মনামে পুনা সার্বজনিক সভার মুখপত্র "কোয়ার্টারলি জর্নাল"-এর জুলাই সংখ্যায় ছাপা হয়। রানাডে লিখেছিলেন,

"গ্যারান্টির প্রথায় নির্দিষ্ট সুদের হার চড়া (ইংল্যাণ্ডে মূলধনের উপর গড়ে যে মুনাফা আয় হয় তার চাইতে অনেক বেশি), হওয়ার ফলে কোম্পানিগুলি নির্মাণকার্যে অথবা নির্মাণ শেষ হয়ে যাবার পর পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্ত পরিমাণে মিতব্যয়ী হচ্ছে না; তাদের স্বার্থ, খরচ যথাসম্ভব বেশি করা, যাতে করে বেশি পরিমাণে লগ্নির উপর গ্যারান্টির সুদটা আদায় করা যায়'[৩২]।

কিছু নতুন রেলপথ নির্মাণ অপরিহার্য ছিল। এমতাবস্থায় গ্যারান্টি প্রথা তুলে দিলে, বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারত? এ প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। তাঁদের একাংশ মনে করতেন করদাতাদের বোঝা যাতে আর না বাড়ে সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সেজন্য সরকারের কর্তব্য জনসাধারণের টাকা আর রেল খাতে ব্যয় না ক'রে নূতন নির্মাণকার্যের পুরো ব্যাপারটাই গ্যারান্টি-বিহীন 'খাঁটি' বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেওয়া।[৩৩] সম্ভবত আরো বেশি সরব, অন্য একটি অংশ—যাঁদের মধ্যে জি. ভি. যোশি এবং অন্যরা ছিলেন, এবং যাঁদের অন্য দলের সঙ্গেও বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল—বেসরকারি মালিকানার বিপক্ষে এবং সরকারি উদ্যোগের পক্ষে মত দেন। কেন তাঁরা সরকারি মালিকানা চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নেতারাও প্রায় একই ধরনের যুক্তি দেখিয়ে দাবি করেছিলেন যে কোম্পানিগুলির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে যখনই সুযোগ আসবে সরকারকে গ্যারান্টি প্রদত্ত রেল কোম্পানিগুলিকে কিনে নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ

করতে হবে। তাছাড়া, তাঁরা সরকার কর্তৃক নির্মিত অথবা অধিগৃহীত রেলপথ বেসরকারি কোম্পানিকে লীজ দিয়ে দেবার নীতিরও বিরোধীতা করেছিলেন।

নেতাদের যে অংশ সরাসরি সরকারি উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের পক্ষে ছিলেন তাঁরা এটা বুঝেছিলেন যে, এখানে খাঁটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর সরকারী সংস্থার মধ্যে কোন্‌টা ভালো, প্রশ্ন তা নয়, আসলে বেছে নিতে হবে এক-দিকে সরকারি উদ্যোগ অপরদিকে গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত কোম্পানি ব্যবস্থার মধ্য থেকে একটিকে। সেক্ষেত্রে প্রথমটিই অপেক্ষাকৃত ভালো। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকও। বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে আশা করা যায় না যে তারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে এবং এতটা দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে যাতে (এই) "দেশের সাধারণ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, এমনকি কখনও কখনও তার জন্য নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হলেও"। আর্থিক দিক থেকেও—তারা মনে করেছেন—গ্যারাণ্টি প্রথার তুলনায় সরকার পরিচালিত রেলওয়েজ-এর সুবিধা অনেক। বাজারে সরকারি ঋণের ব্যাপারে আস্থা থাকার ফলে সরকার যে কোনো সময় অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ জোগাড় করতে পারে সেজন্য কখনই সরকারকে গ্যারাণ্টি হিসাবে যে হারে সুদ গুণতে হচ্ছে সেই শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ দিতে হবেনা। তদুপরি, রেলব্যবস্থা সরকারি পরিচালনাধীন হলে যে লাভ হবে মূলধন পরিশোধ ও সুদ মেটাবার পর তা দেশেই থেকে যাবে—বিদেশী কোম্পানির মুনাফা হিসাবে দেশের বাইরে চলে যাবে না।[২৭] ১৯৮৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি "মাহ্‌রাট্টা" লিখেছিল, সরকারি ঋণের সুদ আর গ্যারান্টির হারের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যে টাকা বাঁচবে তা দিয়ে মূল ঋণ পরিশোধিত হতে পারে, এবং শুধু তাই নয়, সুদ এবং মুনাফা উভয় খাতের টাকাই দেশে থেকে যাবে।[২৮]

জি.ভি. যোশি সরকারি উদ্যোগে রেল ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ভাবেও সুবিধা-জনক ব'লে মনে করেছিলেন। যদিও নৈতিবাচক দিক থেকে। তিনি জানিয়ে-ছিলেন, এই ব্যবস্থা "জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী · শক্তিশালী বিদেশী স্বার্থের ক্রমাগত সম্প্রসারণ ব্যাহত" করবে। একই বক্তব্য ১৮৮৪ সালের ৩০শে এপ্রিল বাংলা সাপ্তাহিক 'সহচর' ভারতীয় রেলপথ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ এবং সুলিখিত প্রবন্ধের শেষাংশে খুব জোরালোভাবে তুলে ধরেছিল: "এসব সত্ত্বেও, আরো কয়েকটি নতুন রেলপথ বানিয়ে মানুষকে বিদেশী কোম্পানির বাঁধা গোলামে পরিণত করা ঠিক হবে কি? সরকার কি ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ঈজিপ্ট বানাতে উদ্‌গ্রীব? এখন থেকে একমাত্র সরকারের উদ্যোগেই রেলপথ তৈরি করা উচিত।"[২৯]

তবে বেসরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে এই নেতাদের আপত্তির প্রধানতম কারণ ছিল, প্রতিষ্ঠানের বিদেশী চরিত্র এবং তজ্জনিত মুনাফা-রপ্তানি। এঁদের অনেকেই বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে যদি পুরোপুরি ভারতীয়

কোম্পানি গঠন করা যায় তাহলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অবশ্যই বরণীয়, এবং বাঞ্ছনীয়ও। বাস্তবিকপক্ষে এ'রা এবং প্রথম মতাবলম্বী গোষ্ঠীরও অনেকেই রেলপথ নির্মাণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় মূলধন এবং উদ্যোগকে কাজে লাগানোর কথা বলেছিলেন।[৩০] ১৮৮৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি "মাহ্‌রাট্টা"তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দাবি জানানো হয়েছিল যে, "এখন দেশীয় পরিচালনায়, দেশজ মূলধন, দ্রব্যসম্ভার ও শ্রম সহযোগে রেলপথ নির্মানই সরকারের নীতি হওয়া উচিত।" ১৯০২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঐ কাগজে আবার লেখা হয়েছিল—"যদি রেলপথ বানাতেই হয়, তাহলে অবশ্যই যতদূর সম্ভব ভারতীয় মূলধনের সাহায্যে তা করতে হবে"। "রেলওয়েতে দেশীয় লগ্নী যে প্রায় শূন্যের কোঠায়" সেজন্যে খেদ প্রকাশ ক'রে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র এই সময় ভারতীয়দের বিশেষ ক'রে ভারতীয় পুঁজি-পতিদের মূলধন সংগ্রহ করে রেলপথ তৈরির উদ্দেশ্যে বেসরকারী কোম্পানি খোলার আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতীয় মূলধন আকৃষ্ট করার কোনো চেষ্টা না করার জন্যে তারা সরকারের উপর দোষারোপ করে, এবং জাতীয় মূলধন ব্যবহার করছে এমন ভারতীয় কোম্পানির প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, ১৮৮৭ সালের ১০ই আগস্ট 'হিন্দু' পত্রিকা গ্যারাণ্টি প্রথাকে নিছক অপব্যয় বলে ধিক্কার জানিয়েছিল। এবং ১৮৮৭ সালের ৩রা আগস্ট পত্রিকাটি ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্যেও গ্যারাণ্টির দাবি জানাতে দ্বিধা করেনি। কিছু লেখক এমন প্রস্তাবও করেছিলেন যে, রেলপথ তৈরীর গতি এমনভাবে কমিয়ে আনা হোক যাতে সম্পূর্ণ দেশীয় মূলধনের সাহায্যেই তা করা যায়।

কিন্তু, সদিচ্ছা থাকলেও, রেলপথ নির্মাণের জন্যে যে বিশাল মূলধন প্রয়োজন, তা যোগান দেওয়ার মত সম্পন্ন দেশীয় বেসরকারি কোম্পানি গঠন করা তখনো সম্ভব ছিল না। আর এটা বুঝতে পেরেই ভারতীয় নেতাদের অনেকেই সরকারি একচেটিয়া ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালের ৫ই মার্চ 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' লিখেছিল, "ভারতের মত দেশে যেখানে জনসাধারণ অতীব দরিদ্র এবং সেজন্য নিজেদের সংগৃহীত মূলধনের সাহায্যে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনায় অনুৎসাহী, সেখানে বিদেশী বণিকদের হাতে দেশকে ফতুর হতে দেবার চাইতে সরকারের ব্যবসায়ীর ভূমিকায় নামা এবং মুনাফা করা অনেক ভাল'। কিন্তু সরকারের দ্বারা রেলপথ নির্মাণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা গুরুতর আপত্তি হতে পারে যে এর ফলে অতি কেন্দ্রীকরণ এবং অতি আমলাতন্ত্রীকরণ প্রশ্রয় পায়। সেজন্য জি. ভি. যোশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে "প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসকদের" হাতে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৮৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি "মারহাট্টা" পরামর্শ দিয়েছিল

রেলপথ পরিচালনার জন্যে পাবলিক বোর্ড ও ট্রাস্ট গঠন করার। ১৯০৩ সালের মে মাসে "হিন্দুস্থান রিভিউ অ্যান্ড কায়স্থ সমাচার" লিখেছিল, সরকারি এবং বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি রেলওয়ে ট্রাস্টের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ক

৭. রেলপথ বনাম সেচব্যবস্থা

এবারে সেচব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। রেলের সঙ্গে সেচের সম্পর্ক এখন ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। তার কারণ, সরকারি বড়কর্তা আর জাতীয় নেতাদের কাছে রেলপথ আর সেচ দুটো প্রতিযোগী বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। একদল রেলপথ স্থাপনকে আর অপর দল সেচ-ব্যবস্থাকে নিয়মিত দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক বলে মনে করেছিলেন। কাজেই সরকারের সীমিত আর্থিক সম্পদের উপর প্রতিদ্বন্দী দাবীদার ছিল রেল ও সেচ-ব্যবস্থা। ১৯০২-৩ সালের শেষ অবধি বড় বড় ও ছোট সেচ প্রকল্পের জন্য মূলধন খাতে সরকারের মোট ব্যয় হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা ; অন্যদিকে ১৯০৫ সালের ৩০ শে জুনের আগে সরকারি এবং গ্যারান্টী প্রদত্ত রেলের জন্য মোট লগ্নি হয়েছিল ৩৫৯ কোটি টাকা। তখনই ভারতীয় নেতারা এই পার্থক্য লক্ষ করে এর সমালোচনা করেন। তবে এ নিয়ে জাতীয় স্তরে বিক্ষোভ দানা বাঁধে আরও পরে ; ১৮৯৭ সালের বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে এই বিক্ষোভ গুরুতর আকার নেয়। ভারতীয় নেতারা সেচব্যবস্থাকে অবহেলা করে অন্যায়-ভাবে রেলপথের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন—সেচ-ব্যবস্থা যেন সরকারের সিন্ডারেলা। ১৮৯৮ সালে ভাইসরয়ের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিষয়টির উল্লেখ করে আর. এম. সায়নি নালিশ জানালেন ঃ "রেলওয়েজ সরকারের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পাচ্ছে, অথচ দুর্ভিক্ষ রোধে অনেক বেশি সহায়ক সেচের খালের জন্য বছরে এক কোটি টাকার এক তৃতীয়াংশ অথবা রেলের জন্যে বার্ষিক ব্যায়ের তেরো ভাগের এক ভাগ মাত্র বরাদ্দ করা হচ্ছে।" এ বিষয়ে সরকারের কঠোরতম সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৯০৩ সালে তিনি লিখলেন ঃ "যখন আমরা রেল থেকে সেচের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তখন মূঢ় অপব্যয়ের জায়গায় দেখতে পাই সমান মূঢ় কৃপণতা।" সমসাময়িক অন্য অনেক জননেতা ও সাংবাদিকও একইভাবে সমালোচনা করেছেন।

সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতারা যে যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন, তা হ'ল, "জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য সেচ প্রকল্প নির্মাণ রেল-লাইন বসানোর চাইতে অনেক বেশি জরুরি।" ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী

"মারহাট্টা" লিখেছিলঃ "বণিক সভাগুলি রেলের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যুদ্ধ চালাতে চায়, কিন্তু আমাদের স্বার্থ হ'ল সেচ প্রকল্পের জন্যে সংগ্রাম করা।" তবে ভারতীয়দের বক্তব্য সবচেয়ে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছিল, "কাইজার ই-হিন্দ"। ১৯০৩ সালের ২৩ শে আগস্ট সেচ খাতে তৎকালীন ১ থেকে ২½ কোটি টাকার জায়গায় বার্ষিক ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ের আবেদন জানিয়ে কাগজটি লিখেছিলঃ "সন্দেহ নেই যে বলা হবে বিপুল ব্যয় সঙ্কুলান করার সামর্থ্য সরকারের নেই, কেননা নূতন রেলপথ তৈরির জন্য বছরে খুব কম করেও ৫ থেকে ৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। এর জবাবে আমাদের বক্তব্যঃ এখন সময় এসেছে রেল পথ নির্মাণের গতি শ্লথ করার। ... সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের (দুর্ভিক্ষের) অভিজ্ঞতার পরও, লক্ষ লক্ষ মানুষ ও লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর মৃত্যুর পরও কি সরকার চক্ষুষ্মান হবার বদলে স্বার্থান্বেষী বণিক সভাগুলিকে তুষ্ট রাখার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে রেলপথ বানিয়ে যাবার নীতিতে অনড় থেকে যাবেন? দেশের কোটি কোটি মানুষ, যারা এখনও বছরের পর বছর আধপেটা খেয়ে থাকে, তাদের স্বার্থের কথা সরকার ভাববেন না? যে সেচ পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে সমস্ত দেশের দুর্বল এলাকাগুলির আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে তাকে একেবারে কোনঠাসা করে রাখা হবে?"

নেতাদের কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের কৃষির প্রয়োজন এবং সম্ভাবনার দিক থেকে দেখলে সেচের ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণই অপ্রতুল! এঁদের মতে, প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের শাসকেরা এবং রাজন্যবর্গ যেসব বহুমুখী সেচ প্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন সেগুলি ছিল উচ্চ প্রশংসার যোগ্য ও অনুকরণীয়। নেতারা সেচ-ব্যবস্থার দ্রুত ও ব্যপক বিকাশের জন্য দাবি জানালেন। কেননা তাঁদের মতে এটা করতে পারলে তবেই ভারতবর্ষকে সত্যি সত্যি বাঁচানো সম্ভব ছিল।

ভারতীয় নেতারা কেন রেলপথের তুলনায় সেচ প্রকল্প নির্মানকে শ্রেয় মনে করেছিলেন? তাঁদের প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সেচব্যবস্থা রেলপথের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য। রেলপথ বড়জোর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুটা লাঘব করতে পারে, কিন্তু সেচ ব্যবস্থা রোগের মূলে প্রবেশ করতে এবং সেজন্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রেলের মাধ্যমে বড়জোর বর্তমান মজুত খাদ্যভাণ্ডারকে দেশের বিভিন্ন অংশে পোঁছে দিয়ে আরো সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু সেচ ব্যবস্থা খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।[৩১] আসলে, আগেই যেকথা বলা হয়েছে, ভারতীয় নেতারা মনে করতেন স্বাভাবিক সময়ে খাদ্যশস্য রপ্তানির সুবিধা করে দিয়ে রেলপথ বাস্তবিক ভাবে অনটনকে দুর্ভিক্ষে পরিণত করতেই সাহায্য করেছিল।

সেচের পক্ষে দ্বিতীয় আর একটা যুক্তি ছিল, এটা লাভজনক। বাস্তবিকভাবেই সেচ প্রণালীগুলি আর্থিকভাবে লাভজনক ছিল, কেননা সেচ থেকে শতকরা ৬

থেকে ৯ ভাগ পর্যন্ত মুনাফা পাওয়া যেত। অন্যদিকে রেলে শুধু ঘাটতিই দেখা গেছে।[৩২] কিছু নেতা এটাও উল্লেখ করেছেন যে, সেচ খালের একটা বড় সুবিধা হ'ল, এগুলিকে কম খরচায় মাল' পরিবহনের কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন এটাও লক্ষ করেছিলেন যে, সেচের খাল নির্মানে ব্যয় করলে তা এই দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে, কেননা ব্যয়ের প্রায় সবটাই হবে খনন কার্য, দেওয়াল নির্মান ইত্যাদির জন্য। অন্যদিকে, রেলের জন্য ব্যয়ের বেশীর ভাগটাই চলে যায় যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী বাইরের দেশগুলিতে। আবার এঁদের মধ্যে একজন এমনকি তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে সমস্যার আরো গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, এবং সেই সময়ের ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে রেল ও সেচের তুলনামূলক উপযোগিতা বিচার করে দেখেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর "নেটিভ ওপিনিয়ন" লিখেছিল: "আমাদের বিশ্বাস, আমাদের রাজস্ব ও আয় ব্যয়ের এবং সম্পদ উন্নয়নের শৈশবাবস্থার সঙ্গে খালপথ অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ; তুলনায় রেলপথ গুরুভার গহনার ন্যায়। খালগুলি জমির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাড়তি মূলধন জোগান দিতে পারবে।"

প্রশ্ন হ'ল, সেচের গুরুত্ব যখন এত, ভারত সরকার সেচের উন্নতির বিষয়টিকে অবহেলা করেছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ আর একবার দেশের শাসকদের মনোবৃত্তির বেদনাদায়ক পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সেচ ব্যবস্থার অবহেলার মূলে ছিল ব্রিটিশ জাতির স্বার্থপরতা এবং ভারতের জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ব্রিটিশ বণিক, উৎপাদক ও লগ্নি-কারীদের সন্তুষ্ট রাখার ও তাদের সেবা করার সরকারি প্রবণতা। এই অভিমত কখনো কখনো খুবই স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন ১৯০১ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: "প্রত্যাশিতভাবেই ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য প্রসারে সহায়তাকারী রেলপথকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারতের কৃষির উপকারে লাগতে পারত যে সেচ-ব্যবস্থা সেটি অগ্রাধিকার পায়নি।" ১৯০৩ সালে ২৩ শে আগস্ট "কাইজার-ই হিন্দ" আরো স্পষ্ট করে ও সরাসরি এই অভিযোগ এনে লিখেছিল:

"এখানেই ভারত সরকারের পায়ের চেরা ক্ষুর চোখে পড়ে। আমরা একথা স্পষ্ট বলতে চাই যে, সরকার মুখে যতই এদেশের দেনার দায়ে বিকিয়ে যাওয়া কৃষককুলের দুঃখ-লাঘবের কথা বলুক না কেন, (ইংলণ্ডের) বনিকসভা ও বিদেশী বণিকদের প্রতি তার প্রীতি অনেক অনেক বেশি। যতই কপট আচরণ করুক

না কেন আসলে প্রশাসনের দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সরকার বিশাল জনসমষ্টির স্বার্থকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থপর বিদেশী বণিকের স্বার্থের জন্য বলি দিতে প্রস্তুত।" এমনকি মধ্যমপন্থী ব'লে পরিচিত 'ইন্দুপ্রকাশ'ও ১৯০৪ সালের ৩০ শে নভেম্বর লিখেছিল ঃ

"ভারতের মতন সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে সেচ খালের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা অসম্ভব। আসল কথা, দেশটা মোটেই জনগণের মঙ্গলের জন্য শাসিত হচ্ছে না। বাজারের প্রসারের জন্যে ইংরেজ বণিকদের আরো রেললাইন প্রয়োজন, এবং সরকারও সেই প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের উপকার করছেন।"

গোড়ার দিকে ভারতীয়দের এই বিক্ষোভ প্রশাসনের উপর সামান্যই প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। সাধারণত এই অভিযোগকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলে উপেক্ষা করা হত।[৩৩] উদাহরণ হিসেবে ১৯০০-২ সালে লর্ড কার্জনের বাজেট বক্তৃতার উল্লেখ করা যেতে পারে। কার্জন বিষয়টিকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সেচব্যবস্থার দ্বারা "দুর্ভিক্ষ-প্রবন জেলাগুলিকে খরার প্রকোপ থেকে মুক্ত রাখা অথবা ঐ সব জেলার দুঃস্থ অধিবাসীদের সাহায্য করা অসম্ভব।"—সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন সেচের সুযোগ বাড়লে সমস্যাটা আরো সঙ্গিন হয়ে উঠবে ; কেননা একটা মরুভূমি অঞ্চল কৃষির আওতায় এলে জনসংখ্যা আরও দ্রুত বাড়বে আর তার ফলে আরো বেশি মুখে অন্ন জোগাতে হবে। তবে সে যাই হোক, কার্জন ঐ বক্তৃতায় স্পষ্টতই এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে সেচের প্রসারের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত, কারণ ৪,০০০,০০০ একরের বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব ছিল না। তিনি দাবি করেছিলেন, "সম্ভাব্য সব সেচ প্রকল্প অথবা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক হিসাবে খুবই আবশ্যক প্রকল্পগুলির প্রায় সবই ইতিমধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে, এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসমত সেচ ব্যবস্থার সীমাহীন সম্প্রসারণের কোনো সম্ভাবনা নেই।"—তবে এই আপাত শেষ কথার মধ্যেই বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটেনি—ভারতীয় অভিমতের প্রভাব শেষ পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। পরের বছরের বাজেট বক্তৃতাতেই লর্ড কার্জন বলেছিলেন, "বাধ্য ঘোড়াকে চাবুক মারার কোনো অর্থ হয় না ঃ ভারতবর্ষে অন্য কোনো সরকার কখনই বর্তমান সরকারের মত সেচের ব্যাপারে উৎসাহদানের গরুত্ব এত গভীরভাবে উপলব্ধি করেনি।" সমালোচকদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন সরকারের অভিপ্রায়ের "গভীরতা ও আন্তরিকতায় বিশ্বাস রাখেন"। এবং এই আন্তরিকতার প্রমান হিসাবে, সেচ-ব্যবস্থা ও তার সুপ্ত সম্ভাবনার বিষয়টা খুব ভাল ক'রে খাতিয়ে দেখার জন্যে তিনি একটি কমিটিও নিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য ডি, ই, ওয়াচা দেরিতে সত্যোপলব্ধি হওয়ায় সরকারকে ভৎসর্না করার সুযোগ ছাড়েন নি। ১৯০১ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে তিনি মন্তব্য করেন ঃ "দেখা যাচ্ছে যে এই

বিষয়ে আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় অভিমতের তুলনায় সরকার অনেক পিছিয়ে রয়েছে"।[৩৪]

সেচ কমিশন ১৯০৩ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০ বছরে আরো ৬০½ লক্ষ একর জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্যে অতিরিক্ত ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ করেছিল। লর্ড কার্জন কমিশনের এই সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন: "মানুষের সংগঠন ক্ষমতা এবং সীমিত শক্তির বিচারে ঐটি হচ্ছে এযাবৎ গৃহীত বিশালতম কর্মসূচী যা ব্যক্তিগত উদ্যম অথবা সংগঠিত সরকারি দক্ষতা উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে"। কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ভালোই ছিল। শুধু একটি সমালোচনাই করা হয়েছিল, তা হ'ল, যে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তার পরিমান ছিল নগন্য; আরো কম সময়সীমায় মধ্যে আরো অনেক বেশি ব্যয়ের সুপারিশ করা উচিত ছিল।

৮. উপসংহার

রেলপথ সম্পর্কিত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরোক্ত বিশ্লেষণ আর একবার প্রমাণ করে যে আলোচ্য সময়কালে ভারতের জাতীয় নেতাদের অর্থ-নৈতিক চিন্তাধারা কত গভীর ছিল। তাঁরা রেলপথের উপকারিতার মূল্যায়ন করেছেন, বিমূর্তভাবে নয়, পুরোপুরি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের বৃহত্তর পটভূমিকায়। তৎকালীন রেলনীতির পর্যালোচনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সরকারের রেলনীতি মূলতঃ ভারতীয়দের কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হয় নি—এই নীতি ভারতীয়দের চাহিদা, বিশেষতঃ শিল্পের চাহিদাকে উপেক্ষা করেছে, এবং এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ আর্থিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা। তাঁরা এটা লক্ষ করেছিলেন যে ভারতের অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক চরিত্র দেবার ক্ষেত্রে রেলপথ গুরুপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটা অনগ্রসর দেশে রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রাগ্রসর দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক শক্তির সম্পর্ক এবং তার ফলাফলস্বরূপ রাজনৈতিক জটিলতাকেও তাঁরা কিছু কিছু ধরতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় নেতারা চেয়েছিলেন, রেলপথ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উজ্জীবিত ক'রে (যা শিল্প এবং কৃষির উন্নতির ফলেই সম্ভব হতে পারত) জাতীয় অর্থনীতির সেবা করুক। তাঁদের আদর্শ ছিল এমন এক রেলনীতি যা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করবে, এবং সেইসব সরকারি জনহিতকর কর্মসূচী যাতে অগ্রাধিকার পাবে সেচ এবং কৃষি।[৩৫] রেলপথ সম্পর্কিত কর্মসূচী ভারতের আর্থিক সামর্থ্য এবং তার অর্থনীতিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিক, এটা তাঁরা চেয়েছিলেন।

পরিশেষে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় নেতারা যে রেলনীতির কথা

বলেছিলেন তাতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পের প্রয়োজনের পরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই নীতির লক্ষ্য ছিল, ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহদান, ব্যপক আমদানি বৃদ্ধি নয়; এবং খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য না করে আরো বেশি পরিমানে খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ জোগানো। কাজেই তাঁদের প্রস্তাবিত রেল-নীতি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যপুঁজির স্বার্থানুকূল ছিল না।

রেলপথ বাণিজ্য-পুঁজিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার এবং গ্রামাঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। সেজন্য স্বভাবতই, বাণিজ্য পুঁজি রেলপথের দ্রুত বিস্তৃতির ঘোরতর সমর্থক ছিল। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউনকে লেখা এক আবেদনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স অন্তর্দেশীয় ও সংযোগকারী রেলপথের দ্রুত বিকাশের জন্যে দরবার করেছে। এর আগে কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে চেম্বার রেল মাশুলের, বিশেষ করে খাদ্য শস্য, বীজ ও পাট অর্থাৎ রপ্তানি পণ্যগুলির মাশুলের, হার কমানোর জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। চেম্বার ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জনকে লেখা এক আবেদনে সখেদে মন্তব্য করেছিল, ভারতবর্ষের রেলপথের পরিমান মাত্র ২১,০০০ মাইল, যার ফলে "দেশের অভ্যন্তরে এমন বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে যার সঙ্গে কোনো বাণিজ্য কেন্দ্রেরই সরাসরি যোগাযোগ নেই"। এই আবেদনের শেষে বলা হয়েছিল, "সুতরাং আমরা যারা এই দেশের বাণিজ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের কাছে রেলপথের সম্প্রসারণের বিষয়ে মহামহিম সরকারের আশ্বাস খুবই প্রীতিদায়ক হয়েছে"।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রেলপথের দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় নেতাদের বিরোধিতা, তার সপক্ষে যুক্তি-তর্কের উপস্থাপনা এবং রেলের বিকাশকে তাঁরা যে পথে চালিত করতে চেয়েছেন—এ সব কিছুই প্রমাণ করে যে তাঁদের কাছে বাণিজ্যস্বার্থের চাইতে শিল্পোন্নয়নের স্বার্থ অনেক বড় ছিল।

টীকা

১। এই অংশ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বই-এর উপর নির্ভর করে লেখা—ড্যানিয়েল থর্নারঃ "ইনভেস্টমেন্ট ইন এম্পায়ার" (ফিলাডেলফিয়া, ১৯৫০); হোরেস বেলঃ "রেলওয়ে পলিসি ইন ইণ্ডিয়া" (লণ্ডন, ১৮৯৪); জেংক্স্ঃ গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত "দ্য ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া" ভল্যুম III; এন, সান্যাল ঃ "ডেভলপমেন্ট অব ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ" (কলকাতা, ১৯৩০); এবং আর, ডি, তিওয়ারি—"রেলওয়েজ ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া" (বোম্বাই, ১৯৪১)।

২। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু রেলপথ তৈরিব খরচ পড়েছিল জমির দামসহ মাইল প্রতি মাত্র ২ হাজার পাউণ্ড—বুকানন পৃঃ ১৮৩।

৩। জেংক্স্, পৃঃ ২২১—২ এ উদ্ধৃত। আর একজন অর্থসচিব, রাইট অনরেবল এস লেইং, ১৮৬১ সালে এক সরকারি রিপোর্টে একই প্রশ্ন তুলেছিলেন [এইচ. এম.

জগ্‌তিয়ানি, "দি রোল অব দি ষ্টেট ইন দি প্রভিসন অব রেলওয়েজ" (লণ্ডন, ১৯২৪ পৃঃ ৯৮ তে উদ্ধৃত)। ভারত সরকারও ১৮৬৯ সালের মার্চ মাসে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে রেলপথ নির্মাণের এই দিকটির কড়া সমালোচনা করেছিলেন—বেল পৃঃ ৯৮-এ উদ্ধৃত।

৪। ২৮ মার্চ, ১৮৬৯ তারিখে ভারত সরকার একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছিল যে ভারতীয় রেলপথ থেকে আয় হত মাত্র তিন শতাংশ, যার ফলে গ্যারাণ্টির সুদের বাকি টাকা সরকারকেই দিতে হয়েছে (বেল—পৃঃ ৯৭-তে উল্লিখিত)। ১৮৫৮—৫৯ থেকে ১৮৬৯-৭০ সময়কালে গ্যারাণ্টির মোট পরিমান দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২৪০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৬৮-৬৯ এই এক বছরেই প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড (তিওয়ারি, পৃঃ ৫৬)।

৫। সাধারণভাবে নিয়ম করা হয়েছিল যে রেলওয়ে খাতে মোট খরচ একটা নির্ধারিত সীমার বাইরে যাবে না, সেটা রাজস্ব থেকে সরাসরি ব্যয়ই হ'ক অথবা রেলের ঋণ পরিষেবার ব্যয়ই হ'ক। সীমাটা অবশ্য প্রায়ই সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সীমার নীতিটি সর্বদাই মেনে চলা হ'ত।

৬। ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতিরা ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বল্পতায় মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সেজন্য তারা উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে, যাতে ভারতের সুবিশাল অন্তর্দেশীয় বাজারের পুরোপুরি সদব্যবহার করা যায় আর দূরতম প্রান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ ক'রে দ্রুত গতিতে ব্রিটেনে পাঠানো যায়। বাস্তবিকপক্ষে ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ঠিকমত শোষণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল এইসব আধুনিক সহায়ক ব্যবস্থাদির। তাছাড়া লগ্নিকারীদের চাপও ছিল। গ্যারাণ্টি পাওয়া রেলে বিনিয়োগ তাদের কাছে বেশ নিরাপদ মনে হয়েছে।

৭। সান্যাল, পৃঃ ১৪৬-এ উদ্ধৃত। ১৮৯৪ সালে তাঁর "ভারতীয় সমাজপদ্ধতি" বই-এ চেসনি দাবি করেছেন যে রেলপথের উন্নতি ভারতকে "দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে নিরাপত্তা" দিয়েছে।

৮। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসন ১৮৫৩ সালে হাউস অব কমন্সের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে ভারতের "সম্পদের বিকাশ এবং শিল্প ও উৎপাদনের প্রসার ও উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সরকারি কর্মদ্যোগের কোনো ব্যবস্থা" না থাকার জন্য চার্টার আইনের সমালোচনা করা হয়েছিল (ভোলানাথ চন্দ্রের "রাজা দিগম্বর মিত্র", খণ্ড ১ পৃঃ ৭৪ এ উদ্ধৃত)। রেলপথ নির্মাণের প্রথম দিকে রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ এবং বোম্বাইয়ের বণিকরা যে প্রবল সমর্থন জানিয়েছেন সে সম্পর্কে জানবার জন্যে, দ্রঃ—থর্নার, পৃঃ ৫২ ; ৭৭, ৯৭। ১৮৭১ সালে দাদাভাই নৌরজিও সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে "ভারতের মতন দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের অন্যতম" বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ভাষায় "এটি একটি সহজ-সাধ্য পথ যার উপর ভারতের বৈষয়িক মুক্তি নির্ভর করছে।" নৌরজি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রেলপথ নির্মাণ এবং খাল খনন "বিগত পনেরো বছরের মধ্যে প্রশাসনের একমাত্র অথবা প্রধান উল্লেখযোগ্য কাজ যার জন্য সরকার ন্যায্য কারণেই প্রশংসা দাবি করতে পারে ও তা পেয়েওছে—এবং যার জন্য ভারতও ইংরেজদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ" (প্রবন্ধাবলী ; পৃঃ ১২৩, ২২৬, এবং পৃঃ ১০৩, ২০৬, ২০৮, ১২৮)। এই প্রসঙ্গে "ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর," ৪ সেপ্টেম্বর ; "জামে জামশেদ," ১০ জানু ; "বোম্বাই ক্রনিকল্‌", ৯ জানু, ২০ মার্চ, এবং ১৬ ডিসেম্বের (ঐ ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৩) ; "হিন্দুস্তানি", ৮ মার্চ; হিন্দু, ৯ জানু ১৮৮৫ ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য। ১৮৮৪ সালের ২৪

শে ফেব্রুয়ারি "দি মারহাট্টা" লিখেছিল : "রেলপথের আরো সম্প্রসারণ না ঘটলে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের অগ্রগতির আশা নেই।" এই উৎসাহ অবশ্য ১৮৮৪র মধ্যেই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ ১৮৮৪-র সিলেক্ট কমিটির কার্য-বিবরণী এবং রিপোর্ট নিয়ে আলাপ আলোচনার অথবা এই সময়ে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের অগ্রগতি এবং বণিক স্বার্থের উপর তার প্রাধান্য বিস্তারের ফলে।

৯। জি. এস. আয়ার, ওয়েলবি কমিশন, খণ্ড-৩। ১৯০৩ সালে একই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ডবলিউ, টি, থর্নটনের লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন : "রেলপথ ভাল, সেচও ভাল, কিন্তু দেশের সম্পদ বাইরে চালান দেওয়ার যে ঢল নেমেছে, তা ক্রমশই স্রোতের আকার ধারণ ক'রে ভারতের জীবনরক্ত নিঃশোষিত করতে করতে তার শিল্পোদ্যমের মূল উৎসগুলিকে শুষ্ক ক'রে তুলছে ; সেই ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা রেল বা সেচ কোনোটিরই নেই" (ডব্লু. টি. থর্নটন, ওয়েস্টমিনস্টার রিভ্যু, ১৮৮০, ইকনমিক আস্পেক্ট-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ২৮৭)।

১০। মাশুল নীতি পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন ১৯১৬-১৮ (দ্রঃ রিপোর্ট, অধ্যায় X, IX) এবং অসংখ্য সংস্থা ও লেখকবৃন্দ এর সাক্ষী। জি. এস. আয়ার ও জি. ভি. যোশি মাশুল নীতির যে ধরনের সমালোচনার সূচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে ভারতীয় রেলপথ নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কাছে সেটাই প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১১. যোশি—তদেব, পৃঃ ৬৮৯ ; এবং জি এস আয়ার—ইকনমিক আস্পেক্ট, পৃঃ ২৬৫। সহচর, ৩০ এপ্রিলও দ্রঃ। যোশি ও জি. এস. আয়ার দেখিয়েছিলেন যে বিদেশি রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারনেই ধার করা টাকায় রেললাইন বানিয়ে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে অথচ স্বাধীন দেশগুলিতে এই রেলপথ নির্মানই প্রভুত কল্যানসাধন করেছে।

১২. এই ধরনের সমালোচনার একমাত্র উদাহরণ যেটি আমার চোখে পড়েছে তা ১৮৯৪ সালের ৫ই মে "বঙ্গবাসী"র এই উক্তি—"রেলপথ বর্ণাশ্রম প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেছে, কেননা রেলগাড়িতে সমস্ত বর্ণের মানুষকে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসতে বাধ্য হতে হচ্ছে।"

১৩। উদাহরণস্বরূপ : ১৮৮৩ সালে দাদাভাই নৌরজি লিখেছিলেন—"সরকারি কর্মোদ্যোগের ব্যাপারে আসল প্রশ্নটা এই নয় যে কি ক'রে তা বন্ধ করা যায়, প্রশ্ন হ'ল কি ক'রে দেশবাসীর কাছে সেই উদ্যোগের পূর্ণ সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ভারতে যে সব করণীয় ভালো কাজ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হ'ল জনগণের উপকারার্থে সরকারি জনহিতকর প্রকল্পের বিকাশসাধন—তাদের অপকারার্থে নয় ; ভারতের মানুষ খেটে মরবে আর অন্যারা তার ফল ভোগ করবে, তারজন্য নয়" (পভার্টি, পৃঃ ১৯৬)।

১৪। এই মত যেভাবে বলিষ্ঠ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তা বিশদ করে তুলে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানাভাবর ফলে শুধু দু-একটির বেশি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে না।

জি ভি যোশি : "ভারতে শুধু ইংরেজ শাসনই নয়, ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ছিল ডালহৌসির স্বপ্ন। এই দেশের স্থায়ী স্বার্থকে তার জন্য বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডের মুক্ত বাণিজ্যের তত্ত্ব, এবং ঐ তত্ত্বের প্রবক্তাদের বিশাল সুনাম, মূলত স্বার্থান্বেষী ও আগ্রাসী ঐ নীতির দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। ব্রিটিশ জাতির কাছে ভারতের মূল্য কতটা তা নির্ধারিত হয়েছে ভারতের কৃষি কী পরিমান কাঁচামাল রপ্তানি করে ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পকে পোষণ করতে ও চালু রাখতে সাহায্য করেছে, তার দ্বারা। স্বভাবতই ভারতকে-

সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে কাঁচামাল রপ্তানিতে : যে কোনো মূল্যে খাল কাটতে হয়েছে, রেলপথ তৈরি করতে হয়েছে এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছে, যাতে কাঁচামাল রপ্তানি ও ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য আমদানি সহজতর হয়। ভারতের নিজস্ব শিল্পের চাহিদার কোনো গুরুত্ব ছিল না। ভারতবর্ষের সব সম্পদ অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ করতেই হবে, যে কোনো মূল্যে, তা যত দুর্বিষহই হ'ক না কেন।" (যোশি, তদেব, পৃঃ ৬৭৪-৭৫)।

জি.এস.আয়ার : "ইংরেজ পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রনেতাদের মুখের কথা মিথ্যে…মনে রাখা দরকার. ভারতে প্রতি মাইল রেলপথ তৈরি হলে কত-সংখ্যক ইংরেজ লাভবান হচ্ছে। এইসব প্রভাবশালী লোকেরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর নতুন রেলপথ নির্মাণে প্রবর্তিত করতে কখনই পিছপা হবে না।" (EA. পৃঃ ২৭২-৭৩)।

জি কে গোখেল : "ভারতের মানুষ মনে করে যে রেলপথ তৈরি করা হচ্ছে মূলত ইংরেজ বাণিজ্যিক ও বণিক শ্রেণীর স্বার্থে, এর ফলে আমাদের সম্পদ আরও বেশি করে শোষণ করতে সুবিধে হবে।" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ১১৯৪)

পি. এ. চারলু : "রেলপথ নির্মাণ আসলে শিল্পোদ্যোগ, বাণিজ্য, কলকারখানা, রেলের শেয়ার আর উচ্চাশাপূর্ণ কৃৎ-কৌশলের স্বার্থে ; এদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি সবাই তাই এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার. তারা তাদের সুসংস্কৃত ও উদ্যমী বুদ্ধিমত্তাকে এতে নিয়োজিত করছে।"

"নববিভাকর", ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৪ : "ইংরেজ বণিকদের সুবিধের জন্য রেল প্রয়োজন।…ইংরেজ বণিকরাই ইংলণ্ডের শাসক শ্রেণী। সংসদ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীরা তাদের ভৃত্য। যে নীতিতে তারা খুশি, সেইটাই সবচেয়ে ভালো নীতি। (LCP, 1900, খণ্ড,XXXIX, পৃঃ ১৪৪)।

১৫। ১৯০৩ সালে জি, এস, আয়ার লিখেছিলেন : "মিঃ রবার্টসন তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনের কোথাও ভারতের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির পরিচয় দেননি।…বিদেশী ব্রিটিশ শাসনে এদেশে এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যার জন্য এদেশের কল্যাণ বিষয়ক প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান অন্যান্য দেশে অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়, তা করতে হবে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, যদিও আরও শক্তিশালী নানা স্বার্থের সংঘাতের ফলে সে প্রয়োজন সর্বদাই অস্পষ্ট রয়ে গেছে।" (ইক, আস্প পৃঃ ২৬৬-৭ এবং পৃঃ ২৬১, ২৬৩)।

জি. এস. আয়ার-এর "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স্" পৃঃ ১৮২, ১৯২—৩ দ্রঃ। দাদাভাই নৌরজিও একই কথা বলেছিলেন, যদিও একটু ভিন্ন সুরে : "সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সেজন্য প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই নয় যে কীভাবে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া যাবে ; প্রকৃত প্রশ্ন, কী করলে দেশের জনসাধারণ তার পূর্ণ সুযোগ পেতে পারে।" (পভার্টি, পৃঃ ১৯৭)

১৬। জি এস আয়ার : "ইক. আস্প" পৃঃ২৭১এবং "ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স" পৃঃ১৮২ও১৮৮। জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে (১৯০১ সালে) ডি. ই. ওয়াচা বলেছিলেন : "এখন এটা স্বীকার করা হচ্ছে যে রেলপথ আসলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়াতাড়ি খাদ্য-শস্য পরিবহনের একটা উপায় মাত্র, দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে রেলের এক পয়সা অবদানও নেই।" এরপর তিনি অভিযোগ করেছিলেন : "কিন্তু খোদ কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরে ঐ ভ্রান্তি সংশোধিত হতে এতগুলি বছর কেটে গেল" (CPA, পৃঃ ৫৭৭)। হিন্দু ২৩ জানুঃ ১৮৮৫ ও দ্রঃ।

১৭। এমনকি মার্কসও ১৮৫৩ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "যে দেশে লোহা এবং কয়লা আছে সে দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় একবার যদি যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা যায়, তাহলে সেই যন্ত্র নির্মাণ থেকে বিরত হওয়া অসম্ভব। একটা বিশাল দেশের সর্বত্র রেল ব্যবস্থা চালু রাখতে গেলে যে সব আশু ও চলতি চাহিদা পূরণ করতে হবে তার জন্য শিল্প বিষয়ক কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন না করে উপায় নেই। এবং-এর থেকেই শিল্পের এমন সব ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়বে যার সঙ্গে রেলের আপাত কোনো সম্পর্ক নেই। সেজন্যই ভারতে রেলব্যবস্থা একদিন প্রকৃত আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎ হয়ে দেখা দেবে" ("অন কলোনিয়ালিজম," পৃঃ ৭৯)।

কিন্তু ঘটনার বিকাশ সেভাবে হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেলপথ নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে তৈরি যন্ত্রসম্ভার দিয়ে, ফলে এর জন্য ভারতে ব্যাপক শিল্পোদ্যম গড়ে ওঠেনি (জেংকস্, পৃ ২২৭)। ব্যাপারটা অন্তত একজন বিচক্ষণ ভারতীয়ের চোখে পড়েছিল। রেলপথ সম্প্রসারণের অব্যবহিত পরেই সরকার লৌহ শিল্পকে উৎসাহ দিচ্ছে না বলে সরকারের সমালোচনা করে "নেটিভ ওপিনিয়ন' ১৮৮৫-র ২০শে ডিসেম্বর লিখেছিল—"কয়লা খনির কাছোপিঠেই আকবিক লোহার বিরাট বিরাট স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই লোহা জোগাড় করে আমাদের নিজস্ব রেললাইন এবং সেতুর কাঠামো তৈরি করার বদলে আমাদের সরকার বিদেশের বাজার থেকে এসব কিনে আনছেন। বিদেশ থেকে লোহা কেনায় যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা যদি ভারতে ব্যবহার হোত তাহলে যে আরো সুলভে ভালো কাজ হতে পারত তাই নয়, একটা নতুন শিল্পেরও সূত্রপাত হোত। সরকার কি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টিকে দেখে পদক্ষেপ নেবেন, যাতে অন্যরা তাদের মূলধন এই দিকে লগ্নি করতে উৎসাহিত হন ?"

আমাদের আলোচ্য সময়কালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল রেলের দ্রব্যসম্ভার ভারতীয় সংস্থা থেকে কেনা হোক এবং প্রয়োজন হলে সরকারি উদ্যোগে ভারতেই সেগুলি তৈরির ব্যবস্থা করা হোক(তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, ততদিনে রেলপথ নির্মাণের কাজ বেশির ভাগই হয়ে গিয়েছিল। আসলে রেল পরিবহণের তাৎক্ষণিক এবং চলতি প্রয়োজনের দাবি মেটানোর তাগিদ থেকে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের জন্ম হয়নি। এর কারণ, শিল্পায়নের গতিছিল অত্যন্ত শ্লথ, এবং বিদেশি পুঁজির কঠোর নিয়ন্ত্রনাধীন।

১৮। যাঁরা দাবি করতেন, "রেলপথ যেহেতু পণ্যাদির জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি করে, সেই কারণে রেলপথ স্থাপনের ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে বাধ্য—" নৌরজি তাদের তীব্র ভৎর্সনা করেছেন। বারবার তিনি এটা দেখিয়েছেন যে, "পণ্যের চাহিদা মানেই শ্রমের চাহিদা নয়" এবং "শিল্পের প্রসার নির্ভর করে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কতটা লভ্য তার উপর।" (পভার্টি, পৃঃ ৫৬)

১৯। যোশি দেখিয়েছিলেন, "আমেরিকায় মুক্ত বাণিজ্য বলে কিছু নেই, সেখানে সংরক্ষণই সার কথা। রেলপথ সরকারি নয়, বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি। এবং আমেরিকার সমগ্র রেলব্যবস্থা তার বৈষয়িক অগ্রগতির একটি দিক মাত্র। অন্যান্য দিকগুলোর যথা, কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সমগ্র দেশ জুড়ে একই সঙ্গে ঘটানো হচ্ছে।" অন্যদিকে, "আমাদের দেশের অবস্থা আমেরিকার মতন একেবারেই নয়..এখানে রেলব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের প্রসার ঘটেনি।" (তদেব, পৃঃ ৬৭০-৭১)

২০। ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গোখেল ঘোষণা করেছিলেন: "আমরা আর নতুন রেলপথ চাই না; এখন শিক্ষার জন্য বেশি বরাদ্দ করা হ'ক, পরে রেলপথ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন। আপনারা শুধু একটা কাজই করছেন, অন্যদিকে তাকাচ্ছেন না। এইসব রেলপথ যে অনুপকারী তা নয়...আসলে প্রশ্ন হলো কোনটা বেশি উপকারী।" (ওয়েলবি কমিশন, খণ্ড III, 18409)।

২১। রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছেন: "ভারতে মাথা পিছু আয় যেখানে বছরে ২ পাঃ আর ইংলণ্ডে ৪২ পাঃ সেখানে ইংলণ্ডের যানবাহনের আরাম ভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় "(ইকনমিক হিসটরি" পৃঃ ৫৪৮)।

২২। আগেই দেখানো হয়েছে, ঐ বছর অবধি জাতীয় নেতৃত্ব এই প্রশ্নে একমত ছিলেন না। ১৮৮৪ সালে বা তারপর থেকেই বড় বড় সংবাদপত্র যেমন, হিন্দু, মারহাট্টা, ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর প্রভৃতিতে রেল সমস্যার আলোচনায় বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছে।

২৩। জি. ভি. যোশি অভিযোগ করেছিলেন, সিলেক্ট কমিটি "এই বিষয়ে আরও অবহিত হওয়ার জন্য এদেশের মানুষের মতামত জানার চেষ্টা করেনি।" (তদেব, পৃঃ ৬৬৯) ওয়েলবি কমিশনের সাক্ষ্যে গোখেল জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একবারও রেলপথ স-প্রসারণের কথা বলেনি।

২৪। নওরোজির প্রবন্ধাবলী, (পৃঃ ১০৮-১০৯ দ্রঃ । দত্ত এটা প্রমাণ করতে ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারি থর্নটন, ম্যাসি এবং লর্ড লরেন্সের লেখা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: "রেলপথ নির্মাণ করতে অপচয় করা হয়েছে, অথচ যাত্রী সাধারণের সুযোগ-সুবিধার কথা মনে রাখা হয়নি—সম্ভবত অন্য কোন দেশের রেল ব্যবস্থার ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা দেখা যাবে না।" (ইকনমিক হিস্টরি পৃঃ ৩৫৩)

২৫। পৃঃ ৬। ১৮৬৮ সালেই দাদাভাই নৌরজি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছিলেন: "গ্যারাণ্টি দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের অর্থ আমি বুঝি না—ঝুঁকি এবং দায়-দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে আর কোম্পানি শুধু মুনাফা লুটবে।" (জার্নাল অব ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৮৬৯, পৃঃ ১৩)। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'রহবার' রেলপথ নির্মাণে গ্যারাণ্টির ব্যবস্থাকে "ভারতীয় করদাতাদের অর্থে ইংরেজ পুঁজিপতিদের ধনী করার একটি উপায়" বলে বর্ণনা করেছিল।

২৬। এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর' ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১; 'বোম্বে সমাচার' ২রা এপ্রিল ১৮৮১; 'নববিভাকর' ২১শে জুলাই ১৮৮৪; এবং 'বেঙ্গলী' ৯ আগষ্ট ১৮৮৪ দ্রঃ। আমাদের সন্দেহ, এর মূলে ছিল এই আশঙ্কা যে, গ্যারাণ্টি ছাড়া এই ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি অনীহ বলে বাস্তবে নতুন রেলপথ নির্মাণ সম্ভব হবে না।

২৭। ১৮৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর 'সহচর' প্রস্তাব করেছিল, রেলপথ থেকে আয়ের ফলে বর্তমানের কিছু কিছু কর হ্রাস হয়তো সম্ভব। জি এস্ আয়ার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তৈরি রেলপথ বেসরকারি মালিকানায় তুলে দেওয়ার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে এই যুক্তিটিই ব্যবহার করেছেন।

২৮। ১৮৮৬ সালে জি. ভি.যোশি "বর্তমান গ্যারাণ্টি প্রাপ্ত শেয়ারকে" রেলের জন্য সরকারি ঋণে "রূপান্তরিত ও সংহত" করার একটি প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। তিনি মন্তব্য

করেছিলেন, এর ফলে মুনাফার যে বড় অংশ পাওয়া যাবে সেটা ছাড়াও "গ্যারান্টি-প্রাপ্ত কোম্পানির ঋণপত্র থেকে সরকারি ঋণপত্র প্রাধান্য পাওয়ায় যে লাভ হবে" তার ফলেই সঞ্চয় করা যাবে বছরে ৮১.৬০০০ পাঃ।

২৯। একই যুক্তিতে জি. এস্. আয়ার রাষ্ট্রীয় রেলপথের পরিচালনা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি লিখেছিলেন, "এদেশে বিদেশী কায়েমী স্বার্থ ইতিমধ্যেই যথেষ্ঠ পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং প্রায়শই তা এদেশের জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী", আর এর ফলে তা আরও শক্তিশালী হবে।

৩০। ১৮৮১-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর': "সব দিক থেকেই ভারতের মানুষের পক্ষে শ্রেয় হবে হিন্দু পুঁজির মালিকদের (যেমন, রথসচাইল্ড) সুযোগ করে দেওয়া অপেক্ষা নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে জনকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহণ। কেননা, ঐ বিদেশী পুঁজির মালিকদের একমাত্র লক্ষ্য হোল শেয়ার বাজারের সমস্ত মুনাফাকে একচেটিয়া ভাবে আত্মসাৎ করা।"

৩১। জি এস্. আয়ার ১৮৯৮ সালে লিখেছিলেনঃ "রেলপথ সম্পদ উৎপাদনে অক্ষম; সম্পদের বণ্টনে শুধু সাহায্য করে। অন্যদিকে সেচের উন্নতি হলে রায়ত যেখানে এক মন গম উৎপাদন করতে পারত, সেখানে দু মন গম উৎপাদনে সক্ষম হবে" (ইণ্ডিয়ান পলিটিকস্ পৃঃ ১৮২)। ১৯০১ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি সভায় ইংরেজ শ্রোতাদের জানিয়েছিলেনঃ "রেল-ব্যবস্থা দেশের খাদ্য সরবরাহে এক দানা শস্যও অতিরিক্ত যোগ করে না, কিন্তু সেচব্যবস্থা খাদ্য সরবরাহ দ্বিগুণ করতে এবং তৎসহ শস্য সঞ্চয় ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সহায়ক "(বক্তৃতাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৭)। এছাড়া ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১; ওয়াচা, বক্তৃতাবলী, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৫; সায়নি LCP ১৮৯৭, ভল্যুম XXXVI, পৃঃ ১৮৯; হিন্দু ১২ মে ১৯০২; দত্ত EH৯৯ পৃঃ ১৭৪, ৩৬০; ইন্দুপ্রকাশ ৩০ নভেম্বর RNP Bom. ৩ ডিসেম্বর ১৯০৪) প্রভৃতি দ্রঃ।

৩২। অবশ্য এটাই একমাত্র শর্ত ছিল না। সেচ প্রকল্প অলাভজনক হলেও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে তা নির্মান করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কিত পার্লামেণ্টারি কমিটিতে (জুলাই ১৮৮১, পৃঃ ২৬) রাণাডের বক্তব্য এবং দত্তর বক্তৃতাবলী দ্রঃ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কিছু ভারতীয় লেখক লাভ না হওয়ার যুক্তিতে বৃহদায়তান সেচের পরিবর্তে কম ব্যয়ে এবং পুকুর কেটে ছোট আকারে সেচের ব্যবস্থা সমর্থন করেছিলেন—যোশি, তদেব, পৃঃ ৮৬৭-৬৮ এবং ওয়াচা, বক্তৃতাবলী, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৫ দ্রঃ।

৩৩। ১৮৭৭ সালে লর্ড সলিসবেরি ঘোষণা করেন, "সেচ ব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই দুর্ভিক্ষের বিরাট রকম প্রতিষেধক হিসেবে দেখতে পারি না" (উদ্ধৃতি, জন্ মার্ডক "ফেমিন্—ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড ফ্যালাসিজ," পৃঃ—৯)। ১৮৭৮ সালে পার্লামেণ্টের একটি সিলেক্ট কমিটি ভারতে বড় আকারের সেচের সাফল্যের সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে খারিজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া কোনো কোনো সরকারি মহলে এই ভেবে বেশ আত্মতৃপ্তি দেখা গিয়েছিল, যে দ্রুত রেলপথ সম্প্রসারণের দ্বারা দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধান করে ফেলা গেছে। উদাহরণঃ চেসনি পৃঃ ৩৪৩-৪৪ দ্রঃ। অবশ্য ১৮৯৬-১৯০১ এর মধ্যে বারবার দুর্ভিক্ষের ফলে আত্মতুষ্টির এই মনোভাব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

৩৪। রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছেন যে, সেচ প্রসঙ্গে ভারতীয়দের সমালোচনা "পুরোপুরি সঠিক ছিল।" তার মতে, "এই সমালোচনা ভারত সরকারকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হলে ইতিমধ্যেই ভারত দুর্ভিক্ষের আশংকা থেকে রক্ষা পেত" (বক্তৃতাবলী)।

৩৫। এই কারণেই রেলের পুনরুজ্জীবক ভূমিকার কথা তাঁদের মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন (বুকানন যেদিকে পরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) বহুকাল ধরে রেলপথ শিল্পোৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি না করে বরং বাধা হচ্ছিল। তাছাড়া, পরিবহণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে কৃষিরও ক্ষতি হয়েছে।

৬

শুল্ক-ব্যবস্থা

১৮০০ থেকে ১৯০৫, এই সময়কালে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বকে অর্থনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য করতে হয়েছিল। বিষয়টি, শুল্ক-ব্যবস্থা। ভারতীয়রা এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ শিল্পের বিকাশ ও দারিদ্র্যের সমস্যার সঙ্গে শুল্ক ব্যাবস্থার সংযোগ ঘনিষ্ঠ। এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপরেই ভারতের দারিদ্র-সমস্যার সমাধান নির্ভর করছিল। জাতীয়তাবাদী নেতাদের শুল্ক নীতিটি গঠিত হয়েছিল একটি দ্বৈত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েঃ সুতীবস্ত্র ও চিনির ওপরে সরকারী ধার্য-শুল্কের বিরুদ্ধে এবং তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মুক্ত-বাণিজ্য-নীতির প্রশ্নে তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে। শেষোক্ত বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে; বর্তমান অধ্যায়ে কেবলমাত্র প্রথম বিষয়টির পর্যালোচনা করা হোল।

১. সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক বিলোপ, ১৮৭৮-৮২

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা সম্রাজ্ঞীর হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় ভারতে আমদানি শুল্কের ৩ ৫ শতাংশ ধার্য হ'ত তুলা ও সুতোর ওপর, এবং সুতী-বস্ত্র সহ অন্যান্য ব্রিটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক ছিল ৫ শতাংশ। অন্য দেশ থেকে আনা পণ্যের উপর শুল্কের হার ছিল এর দ্বিগুণ। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে সরকার শুল্কের হার বাড়িয়ে তুলা ও সুতোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ করতে বাধ্য হয় পরের বছর তুলা ও সুতোর ওপরে ধার্য শুল্কও ১০ শতাংশ করা হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও বস্ত্র শিল্পপতিদের চাপে শুল্কনীতির পুণমূল্যায়ন ও শুল্ক-হ্রাসের ব্যাবস্থা হলো। বিশেষত সুতোর তৈরি কাপড়ের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হলো। পাকানো সুতো ও থান কাপড়ের উপর শুল্কের হার ১৮৬১ সালে ৫ শতাংশ এবং ১৮৬২ সালে ৩ ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হলো; ১৮৬২ সালে সুতীর কাপড়ের ওপর শুল্কের হার ৫ শতাংশ করা হলো। সাধারণ আমদানী-শুল্কও ১৮৬৪ সালে ১০ থেকে ৭-৫ শতাংশ এবং ১৮৭৫ সালে ৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হ'লো। এই

সময় শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যেই আমদানি-শুল্ক আরোপ করা হোত, শিল্প সংরক্ষণের লক্ষ্য একেবারেই ছিল না।

কিন্তু এই শুল্ক হ্রাস সত্ত্বেও, ১৮৭৪ সাল নাগাদ কাপড়ের উপরে আমদানি শুল্কের (যার থেকে আমদানি খাতে মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক আসত), ব্যাপারটি ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পপতিদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হোল। ১৮৭৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব্ কমার্স স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে প্রেরিত একটি স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেছিল যে ভারতে সুতী-শিল্পজাত পণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ভারত ও গ্রেট ব্রিটেন উভয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। তারা দাবি করল, সুতী পণ্যের ওপরে আমদানি-শুল্কের অবলুপ্তি ঘটানো হোক। কিন্তু ১৮৭৪ সালের নভেম্বরে ভারত সরকার নিযুক্ত একটি কমিটি শুল্কের হার সংরক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, এই অভিযোগ বাতিল করে দেয়।

এই সময় ভারত বিষয়ক নতুন কন্‌জারভেটিভ স্বরাষ্ট্র সচিব লর্ড স্যালিস্‌বেরি মুক্ত বাণিজ্যের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন, এবং বারবার ভারত সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কেন সুতী-দ্রব্যের ওপর থেকে আমদানি-শুল্ক তুলে নেওয়া দরকার। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই কারণেই ঐ শুল্কের বিলুপ্তি যে একান্ত প্রয়োজন, সেটা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন। প্রথমত, তিনি দেখালেন যে, সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি গ্রেট ব্রিটেনে স্বীকৃত মুক্ত-বাণিজ্যের সাধারণ নীতির বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ এই শুল্ক ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানিতে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাদের স্বদেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে। তৃতীয়তঃ এই শুল্ক ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, কারণ এর ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। সবশেষে, এটা এমনকি উদীয়মান ভারতীয় বয়নশিল্পের প্রকৃত স্বার্থও রক্ষা করছে না, কারণ এর ফলে ঐ শিল্প মেকি উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দুর্বল ভিত্তিভূমির ওপরে গড়ে উঠছে। এছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন, আমদানি শুল্ক বিলুপ্তির রাজনৈতিক কারণসমূহও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়ে তিনি যেসব যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তাতে বাস্তবিকভাবেই ভবিষ্যৎবক্তার অন্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য তাঁর মূল রচনা থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছি ঃ

"ভারতের বাণিজ্য ধীরে ধীরে ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয় উৎপাদকদের হাতে চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এটা একপক্ষের কাছে অত্যন্ত তিক্ত অনুভূতির কারণ হবে; অন্যপক্ষের থাকবে অপ্রত্যাশিত সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য গভীর উদ্বেগ। ইংরেজ উৎপাদক ক্রমাগত আরও বেশি দৃঢ়তার সাথে চাপ সৃষ্টি করবে সেইসব শুল্ক তুলে নেওয়ার জন্য যা তার পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যদিকে-

ভারতীয় উৎপাদক তার নিজস্ব প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ সব শুল্কের মূল্য বুঝতে শিখবে।...**কিছুটা তিক্ততা এখনই অনুভূত হচ্ছে। যারা এই নীতির মধ্যে ইংরেজদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের আভাস দেখতে পাবেন** তারা আরও বেশি করে তা অনুভব করবেন। **তবে এ বিষয়ে পদক্ষেপ বিলম্বে ঘটলে ঐ বিরক্তিকে শুধু বাড়িয়েই দেওয়া হবে, এবং বিলম্ব আরও দীর্ঘায়ত হলে, তা একটি গুরুতর বিপত্তিতে পরিণত হতে পারে**"। (মোটা হরফ লেখকের)।[১]

লর্ড স্যালিসবেরির দিক থেকে এই বক্তব্য সুনির্দিষ্ট রূপ নেয় ১৮৭৬ সালের ১৩মে তারিখে লিখিত চিঠিতে। সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে তিনি জানান: "যে শুল্ক নীতিগতভাবে ভ্রান্ত, ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকারক এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে আত্মঘাতী, ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই শুল্ক অবশ্যই সময় থাকতে অপসারণ করা উচিত।" শুল্ক বিলোপের বিরুদ্ধে আর যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল তা হোল, সরকারি কোষাগারের ওপরে এর প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকারক হবে। সে বিষয়ে স্যালিসবেরির বক্তব্য ছিল এই যে, তাঁর এই নির্দেশকে কার্যকরী করার সময় ভারত সরকারকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ফলাফল বিবেচনা করে দেখতে হবে, কিন্তু ভারতীয় করদাতাদের অন্যান্য যে সব রাজস্ব ছাড় দেওয়া হচ্ছে সেগুলির তুলনায় এই শুল্ক বিলোপ অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

ভারত সরকার এবং ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক স্বরাষ্ট্রসচিবের এই নির্দেশ মানতে রাজি হননি। তাঁরা সুতী-পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক বিলোপ করতে অস্বীকার করেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে, ঐ শুল্ক বাস্তবে সংরক্ষণমূলক নয়। অবশ্য সমালোচকদের কিছুটা তুষ্ট করার জন্যই লম্বা-আঁশযুক্ত তুলার আমদানির ওপর ৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

১৮৭৫ সালে লর্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করেন। লর্ড লিটন ভাইসরয় পদে ও স্যার জন্ স্ট্র্যাচি 'ফিনান্স মেম্বার' নিযুক্ত হন। সুতী দ্রব্যের ওপর আমদানি-শুল্কের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়, কেননা দুজনই স্বরাস্ট্রসচিবের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।[২] এই সময়ে (১৮৭৭ সালের ১১ই জুলাই) হাউস্ অব্ কমন্সে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হয় যে, "ভারতে সুতী-দ্রব্য আমদানির ওপরে যে শুল্ক আরোপিত আছে তা সংরক্ষণমূলক বলে সুস্থ বাণিজ্য-নীতির পরিপন্থী, এবং অনতিবিলম্বে—ভারতের আর্থিক অবস্থা অনুকূল হওয়া মাত্র তা বিলুপ্ত হওয়া উচিত।"[৩] আফগানিস্তানের যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও রুপার মূল্যহ্রাসের দরুন লর্ড লিটন ও তার অর্থ-মন্ত্রীর এই উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। তৎসত্ত্বেও ১৮৭৮ সালেই কিছু কিছু মোটা সুতীবস্ত্রের ওপর শুল্ক রহিত করা হোল এবং ১৮৭৯ সালে ৩০ কাউন্টের বেশি নয় এমন সব সুতী শিল্পজাত দ্রব্যের উপর থেকে শুল্ক বিলোপ

করা হ'ল ! ১৮৮২ সালের বাজেটে ৩০ লক্ষ পাউন্ড উদ্বৃত্ত হওয়ায় আরও সুযোগ পাওয়া গেল। সুতীবস্ত্র ও সেই সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের বেশির ভাগের উপর থেকে আমদানি শুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়া হোল। কেবলমাত্র লবণ, মদ, ও লিকার এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শুল্ক রয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী ১২ বছর ধরে ভারতে বস্তুত কোন আমদানি শুল্ক ছিল না। অন্য যে কোনো দেশের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে মুক্ত বাণিজ্য নীতি অনুসৃত হচ্ছিল। এমনকি ব্রিটেনের বন্দরগুলি পর্যন্ত তুলনায় অনেক কম মুক্ত ছিল। ফলত স্বাভাবিক কারণেই শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বেড়ে গেল। ১৮৭৮-৭৯ থেকে ১৮৮১-৮২ সালের মধ্যে এই আমদানির মূল্য ২৮ শতাংশ বেড়েছিল; ১৮৭৮-৭৯ থেকে ১৮৮৪-৮৫-এর মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪৫ শতাংশ। যেহেতু এই সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাচ্ছিল, পরিমাণের দিক থেকে আমদানি আরও অনেক বেশি বেড়েছিল। অবশ্যই এই বৃদ্ধির পিছনে অন্য অনেক কারণও ছিল; তবে নিঃসংশয়ে বলা যায়, আমদানি-শুল্কের বিলোপ ছিল এরজন্য অন্তত আংশিক দায়ী।[৪]

২. সুতী বস্ত্রের উপর আমদানি-শুল্ক বিলোপের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া

সুতীবস্ত্রের উপর থেকে আমদানি-শুল্ক বিলোপের প্রশ্নে আন্দোলনের শুরু থেকেই ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের সবাই একমত হয়ে আমদানি-শুল্ক বিলোপের বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতা এতটা তীব্র হয়েছিল যে তাঁদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য স্যার জন্ স্ট্র্যাচি বহুবছর পরে নালিশ জানিয়ে বলেছেন, "রাজস্ব সংস্কারের প্রশ্নে ভারতের জনমত সর্বদাই ছিল প্রতিবন্ধক এবং অজ্ঞতাপূর্ণ।"

১৮৭৪ সালে যখন ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব্ কমার্স ভারতে সুতীবস্ত্র আমদানির ওপর শুল্ক বিলোপের দাবি জানায় এবং স্বরাষ্ট্র সচিব সেই দাবিটিকে ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন, বাংলার 'সহচর' পত্রিকা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারিতে অনুরূপ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে ইস্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখা। ঐ বছরই সুতী-দ্রব্যের ওপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করলেও লম্বা আঁশের তুলোর ওপরে ৫ শতাংশ আমদানি কর বসিয়ে ভারত সরকার সমালোচকদের তুষ্ট করার চেষ্টা করলে, সংবাদপত্রগুলো তার তীব্র সমালোচনা করেছিল। পরের বছর গোড়ার দিকে, লর্ড স্যালিসবেরি সুতীবস্ত্রর ওপর আমদানি শুল্ক ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হবে বলে ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব্ কমার্সকে আশ্বাস দিলে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তারও সমালোচনা করেছিল।

১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে কোনো কোনো মোটা কাপড়ের ওপর থেকে শুল্ক

উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে, বহু সংবাদপত্র তীব্রভাষায় নিন্দা করে। ১৮৭৯ সালে সবরকম কোরা সুতীর কাপড়ের ওপর থেকে কর উঠিয়ে নেওয়া হলে, তা দেশ জুড়ে সংবাদপত্র ও জনগণের দ্বারা ধিকৃত হয়[৫]। ক্রুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রশ্ন করেছিলেন: "এর চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে বলা, এই দেশের মানুষের স্বার্থের প্রতি-এর চেয়ে বেশি জঘন্য অবজ্ঞা প্রদর্শন, কি এর আগে কখনও ঘটেছে?" ঐ বছরেই ২৩শে মার্চের 'সাধারণী' পত্রিকাতে লর্ড লিটনকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানানো হয়েছিল। "সাধারণী" লেখে, "সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যত বেশি করে লর্ড লিটনের চরিত্র বিশ্লেষণ করছি তত বেশি তার প্রতি আমাদের বিরক্তি বাড়ছে।" আমদানি-শুল্ক তুলে নেওয়ার ঘটনাকে এই পত্রিকায় লর্ড লিটনের "দুর্বল-চিত্তের" পরিচায়ক বলে বর্ণনা করা হয় এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়, "আমাদের এই দুর্দশার সময়ে তিনি নিজ জাতির প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা আমরা কখনও ভুলতে পারব না।"

এরপর ১৮৮০-৮১ সালে সুতি শিল্পজাত পণ্যের ওপর থেকে অবশিষ্ট আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়ার প্রস্তাব যখন এলো ভারতীয় সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানগুলি তখন আর একবার বিরোধিতায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ১৮৮১ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় বাজেটের ওপর বক্তৃতা করতে উঠে লর্ড হ্যারিংটন সুতি-পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আর বিলম্ব করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। অবশেষে ১৮৮২ সালে মেজর ব্যারিং যখন এই শুল্ক সম্পূর্ণ বিলোপ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, ভারতীয়রা দলমত নির্বিশেষে এই কাজের নিন্দা করে[৬]। কিছু কিছু সমালোচকের ভাষা ছিল রীতিমত কঠোর। যেমন ১৮৮২ সালের ৬ই এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল: "আমদানি-কর বিলোপ একটি অপরাধ এবং, পুনরায় বলছি, একে সমর্থন করার প্রচেষ্টা অপরাধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে।" তবে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমালোচনার সুর ছিল তুলনামূলক-ভাবে নরম। অংশত এই কারণে যে, এই ধরণের সম্ভাবনার পূর্বাভাস বহুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল, এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা ইতিমধ্যেই অনেক হয়েছে। তাছাড়া এটি ভারতীয় বয়নশিল্পকেও প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, কারণ, আমদানি হোত মূলত উন্নতমানের সুতীবস্ত্র, ভারতীয় সুতাকলে সে ধরনের কাপড় তখনও পর্যন্ত খুব একটা তৈরি হোত না। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমালোচনার সুর নরম হওয়ার আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ সম্ভবত ছিল লর্ড রিপন ও মেজর বারিং-এর জনপ্রিয়তা, এবং সেজন্য রাজনীতিগতভাবে তাঁদের বিব্রত না-করার মানসিকতা।[৭]

আমদানি শুল্কের বিরোধীদের প্রধান যুক্তি ছিল, সুতীজাত দ্রব্যের

ওপর শুল্ক ভারতীয় বয়নশিল্পকে সংরক্ষণ করছিল। ভারতীয় নেতারা এই যুক্তিকে খণ্ডন করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই আমদানি শুল্ক ছিল পুরোপুরি-অসংরক্ষণমূলক, কেননা ভারতে খুব মিহি সুতোর কাপড় উৎপন্ন হোত না এবং আমদানিকৃত কাপড়ের বেশির ভাগই ছিল ঐ ধরণের। ভারতের কাপড় কল যে ধরণের কাপড় উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল, কতকগুলি স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করত, সেই ধরণের মোটা কাপড় আমদানি হোত খুব কম, কাজেই আমদানি শুল্ক বিলোপ করে সেই সুবিধা খর্ব করার প্রশ্নই ওঠেনা।[৮] দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারা যেটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছিলেন, তা হোল, পুরোপুরি রাজস্বের প্রয়োজনেই আমদানি শুল্ক একসময় আরোপ করতে হয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে ভারতের তদানীন্তন আর্থিক পরিস্থিতিতে এই শুল্ক থেকে আয় ছিল একান্তই আবশ্যকীয়। সুতী-বস্ত্রের ওপর চাপানো আমদানি শুল্কের মতন এমন যন্ত্রণাবিহীন ও পীড়নবিহীন রাজস্বের উৎস আর নেই। স্বভাবতই তাঁরা আশংকা করেছিলেন, যেহেতু ভারতের আর্থিক অবস্থা হতাশাব্যাঞ্জক ও বিশৃংখল, সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি কর বিলোপ করলে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করা হবে জনগণের কাছ থেকে আরো বেশি পরিমাণে ঋণ করে অথবা জঘন্য সব কর[৯] ধার্য করে; এবং তাদের এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিছু ভারতীয় নেতা এই মন্তব্যও করেছিলেন যে, সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি কর বিলোপ করা হোল, অথচ লবণ কর, লাইসেন্স কর বহাল তবিয়তে বজায় থাকল, এটা অত্যন্ত অন্যায়[১০]।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হোল, যাঁরা সুতোর তৈরি কাপড়ের উপর আমদানি শুল্ক সংরক্ষণমূলক নয় বলে দাবি করেছিলেন সেই ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ আবার একইসাথে এও ঘোষণা করেছিলেন যে ঐ শুল্ক বিলোপ করলে তা ভারতীয় বয়নশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, ঐ শুল্ক সংরক্ষণমূলক। তা না হলে ভারতীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অভিযোগের অন্য কোন ব্যাখ্যা অসম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, নেতাদের কেউ কেউ খোলাখুলিই স্বীকার করেছিলেন যে, সংরক্ষণমূলক বলেই তাঁরা এই শুল্ক সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, যে সময় সম্পর্কে এই আলোচনা তখন প্রায় সব ভারতীয় নেতাই শিল্পায়নের জন্য সংরক্ষণশীলতাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করতেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৩ রাজনৈতিক তাৎপর্য

সুতোর কাপড়ের ওপর থেকে শুল্ক বিলোপের বিষয়টি ছিল জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর অন্যতম যেটিকে প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী নেতারা আন্দোলনের বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। কয়েক বছর ধরে এই আন্দোলন

চালানো হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে। তাসত্ত্বেও শেষ পরিণাম তাদের হতাশ করেছে। একে একে তাদের সব বক্তব্য অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত সুতোর তৈরি কাপড়ের ওপর আমদানি শুল্ক পুরোপুরি বাতিল হয়েছে। এর ফলে শাসকশ্রেণী সম্পর্কে তিক্ততা ও বিরূপতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শাসকদের সদিচ্ছা সম্পর্কেই ক্রমশ সন্দেহ দেখা দিল। বহু উদীয়মান ভারতীয় নেতা এর থেকে যথাযথ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে শুরু করলেন।

যে শুল্কনীতি জাতীয়তাবাদীদের কাছে সুস্পষ্টভাবে দেশের স্বার্থ-বিরোধী বলে মনে হয়েছে, সেই নীতিকে কার্যকর করা হলে, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন : কেন এই ধরণের নীতি অনুসৃত হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন সরকারি শুল্কনীতি কখনই ভারতীয় জনগণের মঙ্গল বিধান কিংবা মুক্ত বাণিজ্য-নীতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য রচিত হয়নি : ভারতীয় বয়নশিল্পের দ্রুত বিকাশ দেখে ল্যাংকাশায়ারের শিল্পপতিদের হৃদয়ে জাগ্রত ঈর্ষাই ছিল আসল কারন। স্বভাবতই তাঁদের মনে হয়েছে, যেহেতু ইংল্যান্ডের দুটি রাজনৈতিক দলই ল্যাংকাশায়ারের রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করতে আগ্রহী ছিল, সেজন্য সুতোর কাপড়ের ওপর আমদানি শুল্ক পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিলোপ করে শক্তিশালী ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থরক্ষা ও ইংল্যান্ডের দলীয় রাজনীতির প্রয়োজন মেটানো হয়েছে, এবং তার জন্যই ভারতের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৫ সালে ১৫ই ডিসেম্বর "বোধ-সুধা" "ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থপর বণিকের দল ও তাদের আজ্ঞাবাহী সেবাদাস ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে এই অভিযোগ করে।

১৮৮১ সালের জুলাই মাসে জাস্টিস্ রাণাডে পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন, বৃটেনের রক্ষণশীল নেতারা "মুক্ত-বাণিজ্যের নামে ভারতের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে" এবং ম্যাঞ্চেস্টারকে খুশি করতে ২৫০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব ছেড়ে দিয়েছে[১১]। এর আগে, ১৮৮০ সালে, পুনার একটি জনসভায় পুণা সার্বজনিক সভার পরিচালক-মণ্ডলীর তদানীন্তন সভাপতি রক্ষণশীল মতাবলম্বী রায় বাহাদুর কে. এল নাল্‌কারও সক্রোধে একই অভিযোগ করেছিলেন :

"ইংল্যান্ডে বসে ভারতের ভাগ্য-বিধাতারা যেভাবে নিজ নিজ চাকুরির মেয়াদ-বৃদ্ধি এবং নিজেদের ধনসম্পদ রক্ষার জন্য ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার করতে তৎপর,তা দেখে আমাদের ভাবতে হচ্ছে,ম্যাঞ্চেস্টারের অনুগ্রহ লাভের জন্য কিভাবে সম্প্রতি আমাদের বস্ত্র আমদানি শুল্ক লব্ধ রাজস্ব জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।"

১৮৮২ সালের ১১ই মার্চ "দি বেঙ্গলী" পত্রিকা ঐ বছর গ্ল্যাড্‌স্টোনের লিবারেল সরকার কর্তৃক অবশিষ্ট আমদানি শুল্কের বিলোপের ঘটনাকেই শুধু নয়, যে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে এটা করা হয়েছিল তারও নিন্দা করে লেখে :

"এই শুল্ক বিলোপের ঘটনাটিকে মহান যুক্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। যখন একটা অন্যায় করা হচ্ছে, তখন ভণ্ডামির দ্বারা সেটিকে একটি মহান ব্যাপার এবং সৌভাগ্য বলে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করেছে।"

ব্রিটিশ প্রশাসকেরা ভারতীয়দের প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও তীব্রতাকে অবজ্ঞা করাই শ্রেয় মনে করেছিল[১২]। অন্যদিকে, বহু ভারতীয় নেতা এই শুল্ক বিলোপ নিয়ে যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ চলছিল তার রাজনৈতিক তাৎপর্যকে গভীর-ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন। এ পর্যন্ত তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছিলেন—এবং পরবর্তী কিছুকাল ধরে বিভিন্ন ঘটনায় তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছিল—তাতে সমস্ত অপশাসনের দায় ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ অফিসারদের ঘাড়ে চাপানো হত। ঐ অফিসারদের মনে করা হ'ত আসল শয়তান, যারা নিজ স্বার্থে সহৃদয় ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী, গণতান্ত্রিক সংসদ ও স্বাধীনতাপ্রেমী ইংরেজবাসীর উদার নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করেনি। কিন্তু অচিরেই এটা প্রকাশ হয়ে পড়ল যে সুতীবস্ত্রের আমদানির ওপর শুল্ক সংক্রান্ত বিতর্কে আমলারা মোটা-মুটিভাবে ভারতের পক্ষেই ছিল, ইংরেজ সরকার ও সংসদই প্রকৃত শয়তানের ভূমিকা নিয়েছে।[৮] আর এরই ফলে সম্ভবতঃ এত ব্যাপকভাবে এই প্রথম, ভারতীয়রা তাদের শাসকশ্রেণীর সদিচ্ছা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও এমনকি সরাসরি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। স্বভাবতই যে বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তে তাঁদের পৌঁছতে হয়েছিল তা হোল, ইংল্যাণ্ডের এবং তার বণিক সম্প্রদায় ও উৎপাদকদের স্বার্থেই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন। এদেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা তার লক্ষ্য নয়।

১৮৭৫ সালে 'বেসগাঁও সমাচার' মন্তব্য করেছিল ইংল্যাণ্ডে তৈরি সুতীবস্ত্রের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে নেওয়া হবে বলে স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব্ কর্মাসকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা "ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—যদিও দাবি করা হচ্ছে ভারতের মঙ্গলের জন্যই এটা করা হয়েছে, কিন্তু এর আসল লক্ষ্য শাসক জাতির কল্যাণ সাধন"[১৩]। তবে ভোলানাথ চন্দ্র প্রথম ভারতীয় যিনি এই সমস্যার একটি বিস্তারিত ও নির্ভীক বিশ্লেষণ করেন। ১৮৭৬ সালে একটি লেখায় শুরুতেই তিনি স্বীকার করে নেন যে এই বিতর্কের মূল বিষয়টির—অর্থাৎ সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক বিলাপের—নিজস্ব কোন গুরুত্ব ছিল না; কেননা ঐ শুল্ক বিলুপ্ত হলেও স্বাভাবিক সুবিধার জন্যই ভারতের বয়নশিল্পের বিকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী। এবং এরপরই তিনি জোর দিয়ে বলেন, আসলে, "আমরা জাতি হিসেবে যেটা জানতে চাই তা হল, ভারতবর্ষ ভারতীয়দের স্বার্থে না ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে চালিত হবে।" তাঁর কাছে এটা পরিস্কার ছিল যে, এর উত্তরে,

"শুভদিন আগত বলে যে মিথ্যা আশা আমাদের জাতির মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যাবে।" যেমন ১৮৫৮ সালের প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। শাসনভার বণিক কোম্পানীর হাত থেকে সম্রাজ্ঞীর কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে সরকারের চরিত্র ও লক্ষ্যে পরিবর্তন ঘটবে, এই বিশ্বাস এখন সম্পূর্ণ অমূলক ঃ

"সংস্কার সাধন কিংবা উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন অথবা নতুন ভূমিকার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট অবনতি হয়েছে। জাতিগত স্বার্থ একইরকম রয়ে গেছে। ভারতীয় ও ইংরেজদের স্বার্থের অভিন্নতা সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন ঘোষণা, ভারতকে নিংড়ে নেওয়ার লোভাতুর কামনা, কিংবা ভারতবর্ষকে নাবালকত্বের স্তরে আটকে রাখার সংকল্প ১৭৭৬ সালে যা ছিল ১৮৭৬ সালেও একইরকম রয়ে গেছে।"[১৪] এরপর ভোলানাথ চন্দ্র ঘোষণা করেন, "ম্যাঞ্চেস্টারের এই বিজয় ভারতীয় জনগণের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একটি অভিজ্ঞতা, কারণ এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষও ঐ শহরের তাঁতি ও জোলাদের সমকক্ষ নয়।"

এর ঠিক তিন বছর পর এস. এন ব্যানার্জি একটি বক্তৃতায় সরাসরি প্রশ্ন করেন ঃ "আমি আমার দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রাখছি, আমাদের যদি নিজেদের সরকার থাকত তাহলে সেই সরকার কি জনমতকে বেপরোয়াভাবে অবজ্ঞা করে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে এই ধরনের একটি কাজ করতে পারত!" ১৮৮১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর "মাহরাট্টা" এই সত্যটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে লিখেছিল ঃ ভারতবর্ষ একটি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, ইংলণ্ডের সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়, একটি বিজিত জাতি, ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থেরকাছে ভারতের স্বার্থকে যে বলি দেওয়া হ'ল তা এক ধরণের 'জরিমানা' যা প্রতিটি বিজিত জাতি বিজয়ী জাতিকে বিনা অনুযোগে দিতে বাধ্য।" আসলে "মাহরাট্টা" এই ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষের সমস্যার উৎস বিদেশী সরকারের কোনো একটি বিশেষ কার্য নয়, এদেশের মৌলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

১৮৮২ সালে লর্ড রিপন পুনরায় ঘোষণা করেন যে সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক বিলোপ ভারতবর্ষের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে মঙ্গলকর। একই সাথে তিনি এও ঘোষণা করেছিলেন, "ভারতবর্ষের স্বার্থেই, এবং তার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তিনি এদেশের শাসন পরিচালনা" করতে চান। ১৮৮২ সালের ১১ই মার্চ "বেঙ্গলী" পত্রিকা এর উত্তর দিয়ে লেখে ঃ "ভারতবর্ষের স্বার্থেই ভারতবর্ষকে শাসন করব একথা বলা খুবই ভাল, কিন্তু আমাদের শাসকশ্রেণী ভুলতে পারেন না ·· যে তারা ইংরেজ এবং যে ভাবেই হোক সরকার এমন নীতির দ্বারাই পরিচালিত হবে যাতে করে ইংরেজরা উপকৃত হতে পারে।" কয়েকদিন পরেই, ১৮৮২ সালের ৬ই এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতবর্ষের রাজনীতিক দাসত্বের দিকে আর একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিল ঃ "(ইংল্যাণ্ড) ইউরোপে তার

প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর এই অনুগ্রহ (মুক্ত-বাণিজ্যের) চাপিয়ে দিতে পারে না, তার নিজস্ব উপনিবেশ-গুলিতেও পারে না, কারণ তারা স্বশাসিত ····· কিন্তু ভারতবর্ষ একটি অসহায় দেশ— ভারতমায়ের সন্তানেরা দুর্বল ও অক্ষম।" এর বহু বছর পরে সুতীর কাপড়ের উপর থেকে আমদানি শুল্কর বিলোপ-প্রসঙ্গে আর. সি. দত্ত লিখেছিলেন, "ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসকেরা বোম্বাই-এর শিশু সুতীশিল্পের বিকাশ দেখে ঈর্ষান্বিত হননি বরং খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ বণিক ও ব্রিটিশ ভোটারদের সেবাদাস।" এই মন্তব্যের মধ্যে নিহিত ছিল ভারত সরকারকে ব্রিটিশ বণিকের কব্জা থেকে মুক্ত করার আকুল আকাঙ্খা, যাতে ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূলে একটি শুল্কনীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

কখনো কখনো অবশ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য স্পষ্ট দাবিও করা হয়েছিল। যেমন ১৮৮২ সালের ২২ মার্চের 'সহচর' পত্রিকায়। চার বছর পরে ঐ পত্রিকাটিতে জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছিল—যদি তারা ঐ আমদানি শুল্ক পুনঃ-প্রবর্তনে আগ্রহী হয় তাহলে অন্যান্য ইংরেজ উপনিবেশের (যেমন কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া) অনুরূপ স্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। একই কথা লেখা হয়েছিল ১৮৮৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখের "মাহরাট্টায়", চরম হতাশার সঙ্গে : "একটি বণিক বিদেশীর শাসনাধীনে থেকে আমরা কখনই আমদানি শুল্কের পুনপ্রবর্তন প্রত্যাশা করতে পারি না।"

সুতোয় তৈরি কাপড়ের উপর আমদানি শুল্ক বিলোপের ফলে ভারতীয় বয়ন শিল্প যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা প্রতিরোধ করার অপর উপায় ছিল, বিদেশী বস্ত্র না কিনে স্বেচ্ছা সংরক্ষণ গড়ে তোলা বা স্বদেশী।— ভারতীয় নেতৃত্ব এটাকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে বেছে নেয়। স্বদেশীর সবচেয়ে বড় সুবিধা, রাজনৈতিক পরাধীনতার অবস্থাতেও এটা কার্যকরী করা যায়। স্বদেশীর ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এখানে সেটা আলোচ্য নয়; এই বই-এর তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. আমদানি শুল্কের পুনঃপ্রবর্ত্তন

১৮৮২ সালে সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক বিলোপের সময়ে লর্ড রিপন একটি সাধু-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন : "এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যে প্রশ্নটি ঘিরে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বহু বছর ধরে দুঃখজনক মত-পার্থক্য দেখা গেছে তার অবসান ঘটবে।" কিন্তু যারা নিজেদের ভারতীয়

জনসাধারনের মুখপাত্র বলে দাবি করতেন তাঁরা কখনও থেমে থাকেন নি। এরপর বহু বছর, বস্তুতঃ যতদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছে ততদিনই, এই শুল্ক বিলোপের ব্যাপারটি তীব্র আক্রমণ ও সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। উপরে পর্যালোচিত যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে তাঁরা সুতীবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক অবলোপকে জাতীয় অবিচারের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। বারংবার বলেছেন, এটা একটা "সাধারণ বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা এবং ব্রিটেনের স্বার্থের কাছে ভারতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেবার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।" আর্থিক ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা দেখা দিলে কিংবা সংকট হলেই তাঁরা এই শুল্কে পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। লবণ-কর, আয়করের মতো অন্যান্য করের বদলে অথবা দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় সঙ্কোচনের - যেমন, প্রাদেশিক সরকারগুলির জন্য বরাদ্দ রাজস্ব হ্রাস—পরিবর্তে এই শুল্কের পুনপ্রবর্তনই তাঁদের কাছে কাম্য মনে হয়েছে।

এমন তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম সত্ত্বেও যে শুল্ক বিলোপ হয়েছিল তা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। অর্থের বিনিময় মূল্য হ্রাস, দ্রুত রেলপথ নির্মাণ এবং সামরিক খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক ক্ষমতার উপরে ক্রমাগত চাপ বাড়ছিল। নতুন কর প্রবর্তন করে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক ভারসাম্য আর বজায় রাখা যাচ্ছিল না। ১৮৯৪ সালে এই সংকট চরম আকার ধারণ করে। ঐ বছর ঘাটতির পরিমান ছিল সাড়ে তিন কোটি টাকা। ফলে বেপরোয়াভাবে আয়ের নতুন উৎস খোঁজা শুরু হ ল। ১৮৯৩ সালে ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, ভারতে আমদানি শুল্ক আরোপিত হলে বিরোধিতার সম্ভাবনা ন্যূনতম। সরকার ঐ পরামর্শ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং সেই কারণেই ১৮৯৪-এর মার্চে একটি নতুন শুল্ক-আইন জারী হল, যাতে সব ধরণের আমদানির উপরেই ঢালাও ৫ শতাংশ হারে কর আরোপ করা হল। শুধু সুতি-বস্ত্র, সুতলি ও সুতাকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল, ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থে এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের নির্দেশ মান্য করে।[১৫]

এই নতুন শুল্কের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা পরে একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে করা হবে। শুধু নতুন শুল্ক-তালিকা থেকে সুতিদ্রব্যকে বাদ দেওয়ার ফলে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমিত থাকবে আমাদের বর্তমান আলোচনা। এই বাদ দেওয়ার ঘটনা সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যারা শুল্ক-বিলটির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। কারণ, এই বিলের আওতা থেকে সুতী-দ্রব্যকে বাদ দেওয়া মানে একটি বিরাট অন্যায়কে সমর্থন করা। স্মারকলিপি, আবেদনপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন গণ-সংগঠনগুলি তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশে এর বিরোধিতা করে জনসভাও করা হয়।[১৬] এর সঙ্গে ছিল

সংবাদপত্র, যারা সুতোর কাপড়ের উপর আমদানি শুল্কের সমর্থনে মুগুর উঁচিয়েই ছিল।

জাতীয়তাবাদীদের অভিমত ছিল স্পষ্ট। নিছক আর্থিক কারণেই সুতী-দ্রব্যের উপরে, বিশেষতঃ সরু-সুতোর কাপড়ের উপরে আমদানি-কর আরোপ প্রয়োজন। এর সঙ্গে সংরক্ষণ-নীতির কোন সম্পর্কই নেই, কেননা ভারতীয় সুতো কলে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে বিলেতি কাপড়ের প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ছিল না। তবে, তাঁদের বেশির ভাগই বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের মত একটি অনুন্নত দেশে, সংরক্ষণমূলক কর আরোপ করে তার শিল্পকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দোষের কিছুই নেই।[১৭]

ভারতীয় নেতারা সুতী-দ্রব্যকে আমদানি-শুল্কের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নির্দ্বিধায় ম্যাঞ্চেস্টারের এবং ইংল্যাণ্ডের শাসকপার্টির স্বার্থের কাছে ভারতবর্ষের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এমনকি চরম মধ্যপন্থী পুণা সার্বজনীক সভাও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিল যে, "ভারতীয় জনগণের পক্ষে এই-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরিহার্য যে এই ছাড় একটি ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর স্বার্থপর ও অজ্ঞানতাপূর্ণ চাহিদার পুরস্কার।"

বহু ভারতীয় নেতাই এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসনের অন্তর্নিহিত রাজনীতির বিষয়টি সম্পর্কে একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৮৯৪ সালের ৩০শে মার্চের "অ্যাডভোকেট" পত্রিকা মন্তব্য করে: এই শুল্ক-আইনটি জারী করার আগের দীর্ঘ ও উত্তপ্ত বিতর্ক "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোপন স্বার্থকে ভয়ঙ্করভাবে আলোকিত করেছে। নরম করে বললেও, অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে, ইংরেজ সরকার 'ভারতীয় জনস্বার্থের চেয়ে নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষায় বেশী যত্নশীল।" ১৮৯৪ সালের ১৮ই মার্চ পুণাতে অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত আবেদনপত্রটিতে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। "আমদানি শুল্কের তালিকা থেকে সুতীবস্ত্র বাদ দেওয়ায় একটি দুর্বোধ্য নীতির সমগ্র চেহারাটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে"—এই মন্তব্য ক'রে আবেদনকারীরা লেখেন: "এখন বোঝা যাচ্ছে যে কেন সরকার ভারতবর্ষে খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের বিকাশের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। এটি ল্যাংকাশায়ারের বণিক সমিতির হুকুমনামার প্রতি আনুগত্যের ফল...। ভারতবর্ষের প্রয়োজনমত শিল্পের বিকাশের জন্য যে জাতীয়-নীতি আবশ্যক, সরকার সযত্নে তা এড়িয়ে গেছেন; পরিবর্তে এমন একটা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা কেবল বিদেশী উৎপাদকদেরই স্বার্থানুকূল"।[১৮] এই মনোভাব আরও জোরদারভাবে উপস্থিত করেছিল, "দৈনিক ও সমাচার পত্রিকা"। সম্রাজ্ঞীকে বিদ্রূপ করে বলা হয়েছিল যে, তিনি "অনায়াসে সোজাসুজি বলে দিতে পারেন, ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ

লুঠতরাজের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।" বঙ্গবাসী পত্রিকাও ১৮৯৪-র ১৭ই মার্চ "মুখোস খুলে গেছে" শিরোনামে একটি রচনায় স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটিকেই সুসংবদ্ধ ক'রে প্রকাশ করেছিল :

"যাই-হোক-না-কেন সূতীবস্ত্রের উপর শুল্কের প্রশ্নে ইংরেজ প্রশাসকদের মুখোস খুলে গেছে। দেশের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারিই শুধু নয়, ইংল্যাণ্ডের সমগ্র সরকারী প্রশাসন ও প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিকেও এই অপমানকর স্বীকারোক্তি করতে হবে, 'যে-অহংকার আমরা এতদিন পোষণ করে আসছি, ভারতের স্বার্থে এবং ভারতীয় জনগণের কল্যাণের জন্য আমরা ভারতবর্ষকে শাসন করছি বলে আমাদের যে অহঙ্কার, সেটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন'—ইংরেজ বণিকদের স্বার্থেই ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রেখে শাসন করা হচ্ছে।"[১৯]

উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী নীতিকে প্রতিরোধ করতে ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ "হিন্দু পঞ্চ" ও ১৮ই মার্চ "অরুণোদয়" ভারতের জনগণের কাছে আবেদন রাখে বিদেশী সুতে-দ্রব্য না-কেনার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে শাসকেরা যে উদ্দেশ্যে নতুন শুল্ক নীতি থেকে সুতি-দ্রব্যকে বাদ দিয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে বানচাল করতে হবে।

৫. ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ সালের শুল্কের তালিকা ও তুলাকর আইন

আমদানি শুল্ক থেকে সুতী-দ্রব্যকে বাদ দেবার ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এত প্রচণ্ড প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল যে লর্ড এলগিন সমালোচকদের শান্ত করার জন্য এই ইঙ্গিত দিতে বাধ্য হন যে এটা স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। বাস্তবেও দেখা গেল ব্যবস্থাটি ছিল সাময়িক। নিজের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্যই ভারত সরকারকে১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে বাধ্য হয়ে পুনরায় একটি নতুন আইন প্রবর্তন করতে হয়েছিল, যাতে সুতীর কাপড় ও থান কাপড়ের উপরে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। অবশ্য একই সঙ্গে, ভারতীয় পাওয়ার মিলে প্রস্তুত ২০ বা তার বেশী নম্বরের সুতোর উপরে সমতারক্ষার্থে ৫ শতাংশ আবগারি-করও বসানো হয়েছিল। "যেকোন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তুলনারহিত এই কর" রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়নি, করা হয়েছিল এই কারণে যে ভারতীয় বয়নশিল্প যাতে নতুন শুল্কনীতির ফলে ল্যাংকাশয়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সামান্যতম সংরক্ষণের সুযোগও না পায়। সত্যি বলতে কি, এই ঘটনার আগে পর্যন্ত ভারত সরকার এই পদক্ষেপের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিল না। ১৮৭৮ সালে স্যার জন স্ট্র্যাচি আবগারি শুল্কের প্রস্তাব বাতিল করেদিয়েছিলেন, তা "ব্যয়সাপেক্ষ, গোলমেলে ও অসুবিধাজনক"। এবং "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পক্ষে অনুপযোগী" বলে। এমনকি ১৮৯৪

সালে অর্থসচিব জেম্‌স ওয়েস্টল্যান্ড একটি চিঠির মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রসচিবকে জানান যে, "ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা ৯৪ ভাগই হল মোটা জাতের (২৪ নম্বর ও তার বেশি) কাজেই ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আওতার বাইরে; এবং ম্যাঞ্চেস্টারের পক্ষে ভারতের মত অত সস্তায় ঐ ধরনের কাপড় যোগান দেবার চেষ্টাও সম্ভব নয়।" জেম্‌স ওয়েস্টল্যান্ডর পরামর্শ ছিল, যদি সমতা রক্ষার জন্য আবগারি কর আরোপ করতে হয়, তবে তা কেবল ২৪-এর বেশি নম্বরের সুতোর উপরেই করা উচিত। কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব স্বয়ং ২০-এর বেশি নম্বরের সুতোর উপরে আবগারি কর বসানোর জন্য চাপাচাপি করেন। ফলত ভারতে তৈরী সুতার ২০ শতাংশই এই করের আওতায় চলে আসে। ঐ আবগারিকর সংক্রান্ত বিলের উপরে ভাষণ প্রদানকালে জেম্‌স ওয়েস্টল্যান্ড প্রকাশ্যেই একথা স্বীকার করেন। তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, ভারত সরকার নিজে থেকে এটি ভালো বলে এই ব্যবস্থার সুপারিশ করেনি, এটা সুপারিশ করা হয়েছিল স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশানুসারে।

ভারতীয় সুতী-দ্রব্যের উপরে আমদানি শুল্ক পুনরারোপের ফলে জনগণের ইচ্ছা স্বীকৃতি পেয়েছিল বলে জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রত্যাশিত-ভাবেই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন[২০]। ডি. ই. ওয়াচা সেটা ব্যক্তও করেছিলেন ঃ "এ ক্ষেত্রে ভারত সরকার সত্যিই জনগণের চাহিদাকে রূপ দিয়েছে এবং মহানুভবতার সঙ্গে তাদের প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে বলেছে"। তবে এই প্রশংসা সার্বিক ছিল না। আমদানি শুল্কের হারের স্বল্পতা সমালোচিতও হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেও ১৮৯৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর "মারহাট্টা" মন্তব্য করে যে, উপায়ান্তর না দেখেই সরকার এটা করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঐ পত্রিকার মতে, শুল্কের হার আরও বেশী ১০ কি ১৫ শতাংশ হওয়া উচিত ছিল। এরই বিপরীতে ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুতোর উপর আবগারি শুল্ক আরোপের নিন্দা করেন। তাঁরা এই শুল্ক আরোপকে কূটবুদ্ধি প্রসূত এবং ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী আখ্যা দিয়েছিলেন।[২১]

১৮৯৪ সালের ব্যবস্থায় ব্রিটিশ উৎপাদকেরাও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় নি। তারা অভিযোগ করল ২০ নম্বরের কম সুতোর ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক ছাড়ের দ্বারা ভারতীয় বয়নশিল্পকে সংরক্ষিত করা হয়েছে—কেননা, "মোটা সুতার কাপড় তৈরিতে ল্যাংকাশায়ারও প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারত, এবং করতও", কিন্তু সুতোর উপরে আবগারি শুল্কের বোঝা ছিল কার্যত সুতী বস্ত্রের উপর সমতুল্য আমদানি শুল্কের থেকে কম এবং তাছাড়া, বার্মায় ভারতীয় রপ্তানিকে অন্যায়ভাবে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছিল। ভারত সরকারকে শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে প্রেরিত এই অভিযোগের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে

হয়েছিল। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, দুটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হল। সুতোর উপর থেকে আমদানী শুল্ক ও আবগারি কর দুইই তুলে নেওয়া হল। সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানী শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩·৫ শতাংশ করা হল। এবং ভারতীয় সুতাকলে তৈরি সমস্ত কাপড়ের উপরে আবগারি শুল্ক ৩·৫ শতাংশ করা হল। এর ফলে একদিকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর থেকে শুল্ক আদায় কমে গেল ৫১·৫ লক্ষ টাকা বা ৩৭ শতাংশ, অন্যদিকে ভারতে উৎপন্ন পণ্যের উপরে করের বোঝা বাড়ল ১১ লক্ষ টাকা বা ৩০০ শতাংশ।

কল্পিত সংরক্ষণের ধুয়ো তুলে ভারতে তৈরি মোটা কাপড়ের উপরে কর চাপানোর ফলে ভারতীয় জনমতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ভারতীয় শিল্প ও জনসাধারণের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য ভারতবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ে।[২২] ১৮৯৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী "মারহাট্টা" গর্জে উঠেছিল: "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে এদেশের শাসনভার সম্রাজ্ঞীর কাছে হস্তান্তরিত হবার পর ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থে সুতী করের পুনর্বিন্যাসের মতন এমন নিদারুণ অন্যায় আর ঘটেনি।" একইভাবে ১৮৯৬ সালের ৩১ জানুয়ারির "সময়" পত্রিকাও আক্রমণ করে লিখেছিল: "ইংরেজরা কতটা স্বার্থান্ধ এটাই তার প্রমাণ। স্বদেশবাসীর স্বার্থ রক্ষার তাড়নায় নির্দ্বিধায় অন্যদেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে বা তাদের গলায় ছুরি চালাতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।"

পরবর্তী বহু বছর সুতোর উপর আবগারি-শুল্কের বিষয়টি জাতীয়তাবাদীদের উত্তেজিত করে রেখেছিল। ১৯০২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আবগারি-করের নিন্দা করে ও তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কঠিন ভাষায় লিখিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯০৪ সালে পুনরায় একই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯০২ সালের প্রস্তাবটি উত্থাপন ক'রে ডি. ই. ওয়াচা ঘোষণা করেন, যতদিন না এই কর প্রত্যাহার করা হচ্ছে, কংগ্রেস "এই অসম করটিকে তুলে নেবার দাবিতে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাবে।" আর সি দত্ত-ও তাঁর বিভিন্ন রচনায় ও অসংখ্য বক্তৃতায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন, "১৮৯৬ সালের ভারতীয় আইনটি রাজস্ব বৈষম্যের উদাহরণ হিসেবে আধুনিক যুগে তুলনারহিত।" কেননা "বেশির ভাগ সভ্য সরকারই বিদেশী পণ্যের উপর বেশি করে কর চাপিয়ে স্বদেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করে। পুরোপুরি মুক্ত-বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করছে এমন সরকারও রাজস্বের জন্য মাঝারি ধরণের আমদানি শুল্ক বসালেও দেশে উৎপন্ন পণ্যের উপর কখনই আবগারি-কর চাপায় না।" জি কে গোখলেও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তাঁর ভাষণে আবগারি-শুল্কের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ক্ষোভের কথা বার বার সোচ্চারে জানিয়েছেন।[২৩] কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে এন. জি. চন্দভারকার ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আবগারি-কর উঠিয়ে নেবার দাবি জানিয়ে-

ছিলেন। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সংবাদপত্র, যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে বিষয়টিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

১৮৯৪-৬ সালে জাতীয়তাবাদীরা রাজস্ব-নীতির পরিবর্তনের সমালোচনা করেছিলেন প্রধানত এই কারণে ঃ

তাঁরা এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, সুতোর উপর আবগারি শুল্ক বসানোর ফলে ভারতের শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে।[২৪] কেননা তাঁদের আশঙ্কা ছিল, আবগারি-শুল্ক আরোপের ফলে ভারতীয় বয়নশিল্প মিহি সুতো কাটার কাজ শুরু করতে পারবে না, অথচ এটা করতে পারলে তবেই এই শিল্পের আরও বিকাশ ঘটতে পারত। তাঁদের কেউ-কেউ আবার এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে, এই শুল্কের ফলে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে যার ফলে জাপানের মত এশিয়ার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। বাস্তবে অবশ্য এই আশঙ্কা ছিল অমূলক, কারণ ১৮৯৪ ও ১৮৯৬, এই দুই সালের আবগারি-শুল্ক আইনেই রপ্তানির জন্য পণ্যের ক্ষেত্রে কর সম্পূর্ণ রদ করা হয়েছিল। সম্ভবত নেতারা এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি ঠিক বুঝতে পারেন নি, অথবা তাঁরা এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেলে কিংবা মুনাফার কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়লে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমে যাবে।

ভারতীয় নেতারা ১৮৯৬ সালের সুতোর উপর আবগারি-শুল্ক সংক্রান্ত আইনটিকে আরও যে কারণে সমালোচনা করেছিলেন, তা হ'ল, এই আইন দরিদ্র মানুষের উপরে কঠিন আঘাত হানবে, কারণ তারাই মোটা কাপড় কেনেন এবং সেই মোটা কাপড়ের উপরেই কর আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ দেখিয়েছিলেন, আসলে বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি-শুল্ক ১.৫ শতাংশ কমিয়ে এই নতুন আবগারি শুল্ক বসানোই হয়েছে গরিবের উপর কর চাপিয়ে উন্নতমানের কাপড় যারা ব্যবহার করে সেই ধনীদের সুবিধা দেবার জন্য। ১৮৯৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল, দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের এত সহানুভূতির কথা এখন কোথায় গেল?'

আর একটি যুক্তি তাঁরা দিয়েছিলেন। শিল্পের এবং জনসাধারণের আর্থিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কুফল ছাড়াও, এই আবগারি কর আরোপের পেছনে অন্য যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল সেগুলোও ছিল অপ্রয়োজনীয়, এবং সেই কারণেই এই কর ছিল অন্যায্য। প্রথমত, তাঁরা দেখালেন, এই কর চাপানোর কারণ অবশ্যই অর্থ সংগ্রহ নয় কারণ এর থেকে যে আয় হওয়ার সম্ভাবনা কর আদায়ের খরচ প্রায় তার সমান। এবং ফলে কোন মতেই এই কর খুব একটা লাভজনক ছিলনা।[২৭] ডি. ই. ওয়াচা ১৯০২ সালে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে আবগারি শুল্ক থেকে যে ১৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল তা রাজস্ব

হিসেবে সামান্য হলেও, সেটা ছিল মিল মালিকদের লভ্যাংশের শতকরা ৫০ ভাগ, ফলে তাদের মুনাফা গুরুতর ভাবে কমে গিয়েছিল। ওয়াচা এটা মানতে রাজি হননি যে মিল মালিকেরা ক্রেতাদের কাছ থেকে ঐ টাকা তুলে নিয়েছে কিংবা তা তুলে নেওয়া সম্ভব। মজার ব্যাপার হল, ওয়াচা জাতীয়তাবাদীদের প্রথমদিকের যুক্তির একটি মূল ধারণাকেও খণ্ডন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, ঐ আবগারি করের ফলে গরিব ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কেননা করের বোঝা ক্রেতাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২৬]

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নেতারা এই অজুহাতও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে আমদানি-করের সংরক্ষণশীল প্রকৃতির প্রভাবকে খারিজ করার জন্য এবং ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের লেনদেন বজায় রাখার জন্যই, আবগারি-শুল্কের প্রয়োজন ছিল। পূর্বের মতই তাঁরা জোর দিয়ে বলেছিলেন, বাস্তবে আমদানি-শুল্ক স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করেনি, কারণ, ভারতীয় বাজারে ভারত ও ব্রিটেনে প্রস্তুত সুতি বস্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল খুবই কম। ব্রিটেন খুব কমই মোটা কাপড় ভারতে রপ্তানি করত, তাদের রপ্তানির বেশির ভাগটাই ছিল মিহি সুতোর কাপড়, ভারতে যা কখনই খুব একটা উৎপাদন হত না। এই যুক্তির সাথে তাল মিলিয়েই ১৮৯৪ সালে বহু ভারতীয় এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন যে, যদি আবগারি কর আরোপ করতেই হয়, তবে তা ২৪ ও তার বেশি নম্বরের সুতোর ওপরে করা উচিত, ২০ এবং তার বেশি নম্বরের সুতোর উপরে নয়। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ফজলভাই বিশ্রাম এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও এনেছিলেন, এবং তা উপস্থিত সাতজন ভারতীয় সদস্যের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছিল। পরে ব্রিটিশ উৎপাদকেরা আরও অধিক সুবিধা আদায়ের জন্য চিৎকার শুরু করে দেন; এই যুক্তিতে যে, ২০ নম্বরের কম ভারতীয় সুতাকে আবগারি-করের আওতার বাইরে রাখলে তা হবে মুক্ত বাণিজ্যের বিরোধী। ভারতীয় নেতারা দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ এমনও পরামর্শ দিলেন, ভারত সরকার যদি ব্রিটিশ উৎপাদকদের শান্ত করতে চায়, তবে আবগারি করের আওতা আর না বাড়িয়ে বরং ২০ নম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ সুতোকে আমদানি কর থেকে মুক্ত করে দেওয়া হোক।

ভারতীয় নেতারা আবগারি শুল্কের বিরোধিতা করেছেন এবং তা বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন মূলত এই কারণে নয় যে তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন যে এই শুল্কের প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর অথবা শুল্কটি অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের বিরোধিতার মূলে ছিল ঐ শুল্ক আরোপ করার মৌলিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং এই বিশ্বাস যে ঐ শুল্ক আরোপ ভুল, বা নিছক অজ্ঞানতা-প্রসূত ছিল না[২৭], বরং তা সচেতনভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল ভারতীয় উদীয়মান বয়ন-শিল্পের ক্ষতিসাধন করে "ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থ সচেতন অসভ্যদের" তুষ্ট করার জন্য,

কারণ তারা মনে করেছে এভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রগতিকে বন্ধ করা যাবে। ১৮৯৪ সালের অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই বক্তব্য অত্যন্ত খোলা-মেলা ভাবে রেখেছিল: "এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে এই আবকারি শুল্কের প্রস্তাব পেশ করে ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থের কাছে ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে"। ১৮৯৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গলী' পত্রিকা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ক'রে লিখেছিল—"ভারতের জনসাধারণের ক্ষমতা নেই এই সরকারকে বাধ্য করার, ম্যাঞ্চেস্টার তা পারে, কারণ তারাই এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখবে ····· আগে ক্ষমতা তার পরে শুল্ক।"

আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে কোনো-কোনো ভারতীয় নেতা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজন ও কর্তৃত্বের অধীনে আনাই ছিল এই আবকারি শুল্কের আসল উদ্দেশ্য। এই ধারণার জোরালো প্রকাশ দেখা গেছে কাউন্সিল চেম্বারে ফিরোজশা মেহতার ঘোষণায়: সরকারী "তত্ত্ব ও নীতির মূলকথা, ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার সামান্যতম আশঙ্কা থাকলে ভারতের জন্মলগ্নেই সেই শিশু-শিল্পকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে"।[২৮]

এমনকি তদানীন্তন ভারতীয় জননেতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে নরমপন্থী এন. জি চন্দভারকরও ১৯০০ সালের কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে মন্তব্য করেতে বাধ্য হয়েছিলেন: "বর্তমান নীতির লক্ষ্য, কোনো ভারতীয় শিল্পকেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে দেওয়া হবে না।" ১৮৯৪ সালের ২৪ ডিসেম্বরের কাশিম-উল-আকবর লিখল: "ইংরেজরা প্রথমদিকে ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে সাহায্য করার ভান করে আসছিল, কিন্তু এই ঘটনাই প্রমাণ যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঐ বিকাশ রোধ করা"।[২৯] ১৮৯৫ সালের ১৭ই মার্চ 'মারহাট্টা' ভারতে ব্রিটেনের মূল আর্থিক নীতি সম্পর্কে আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ক'রে লিখেছিল, এই একটি মাত্র ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে, "যে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিরা চান ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর হয়ে থাকুক, অর্থাৎ আমরা চিরকাল কাঁচামালের উৎপাদক হয়ে থাকব আর ইংল্যাণ্ড হবে শিল্পোৎপাদক।"

৬. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

আমদানি ও আবকারি শুল্ক সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ পর্যালোচনা ক'রে বহু চিন্তাশীল ভারতীয় নেতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতাকে—বস্তুতঃ, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে—চ্যালেঞ্জ করে ব্যাপক সামান্য-সূত্র নির্মান করেছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই শুল্ক-সংক্রান্ত আখ্যান যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছিল তার মূল কারণ এটাই। সুতোর উপর আব-

কারি শুল্ক আরোপ ও অন্যান্য রাজস্বের ক্ষেত্রে সংশোধন ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তারও কেন্দ্রে ছিল জনসাধারণ ও নেতাদের মনে বিদেশী শাসনের নৈতিক যাথার্থ্য অথবা, অন্যভাবে বললে, এই শাসনের ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন[৩০]।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি ও আবকারি শুল্কের এই ঘটনার থেকে বিরাট-সংখ্যক ভারতবাসী যে নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছিল, তা হ'ল, ভারতের জনগনের স্বার্থে নয়, মূলত ব্রিটিশ-জনগণের স্বার্থে — বিশেষত ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থে—ভারতকে শাসন করা হচ্ছে, এবং ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধলে দেয়ালে পিঠ ঠেকবে ভারতেরই। ১৮৯৬ সালের ২৮শে জানুয়ারি "কেশরীতে" তিলক অত্যন্ত তীক্ষ্ন ভাষায় এই অনুভূতিকে প্রকাশ করেন : "এটা নিশ্চিত যে ভারতকে দেখা হচ্ছে ইওরোপীয়দের খাদ্য হিসেবে সংরক্ষিত এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমি রূপে"।[৩১] ১৮৯৬ সালের ২৯শে জানুয়ারির অমৃত বাজার পত্রিকা সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিল, ভারতবর্ষ স্পষ্টতই "ইংরেজের সম্পত্তি।" অন্য বহু ভারতীয়ও অনুরূপ প্রাঞ্জল ভাষায়, তবে কম রোষভরে, নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পি. আনন্দ চারলু সুতোর উপর কর আরোপ সংক্রান্ত প্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন, তাতে এই প্রশ্নে সমগ্র জাতীয় ভাবনা-চিন্তা সংক্ষেপে মূর্ত হয়েছিল। তিনি বলেন : "ব্রিটিশ ক্ষমতার শক্ত হাত ভারতকে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করছে, কিন্তু ব্রিটিশ ও ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে কিংবা তামিল প্রবাদ অনুসারে) ভেড়া শস্য ভক্ষণ করলে, তখন আর ভারতের প্রতিরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।"

এইভাবে ভারতীয় নেতৃত্বের একটি বিরাট অংশ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক উদ্দেশ্য এবং সোচ্চারে ঘোষিত বদান্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে, লক্ষনীয় হ'ল, এই উপলব্ধি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মেজাজের সাথে সংগতি থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দাবিকে তীব্রতর করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি। এবং ভারতীয় নেতৃত্বের বেশির ভাগ এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা ঠিক যে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁদের প্রিয় রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেসব দাবির বেশির ভাগই যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে অতি নরমপন্থী ছিল। ১৮৯৪ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সংস্কারের প্রশ্নে তাঁর ভাষণে মদন মোহন মালব্য এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মালব্য তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, পুনর্গঠিত

লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ভারতের জনস্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে; ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সরকারী সদস্যরা ১৮৯৪ সালের ভারতীয় শুল্ক বিলটির উপরে নিজ পছন্দ মত ভোট দিতে পারেন নি: এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের হুকুম তামিল করার কাজেই কেবল কাউন্সিলকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল "জনগণের প্রকৃত ও বাস্তব স্বার্থের বিচারে" নিছক ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। এবং সেজন্য, বেসরকারি সদস্যরা যে সাধারণভাবে ভারতের পক্ষ সমর্থন করে, সে কথা মনে রেখে, মালব্য দাবি তোলেন যে কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, এবং কাউন্সিলকে "এই দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আরও বেশি প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হবে।"

১৮৯৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের 'মারহাট্টা' পত্রিকা আরও একধাপ এগিয়ে দাবি জানায় যে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্যকেই নির্বাচিত হতে হবে এবং ইম্পিরিয়াল বাজেটকে কাউন্সিলের সামনে ভোটের জন্য পেশ করতে হবে। অন্য অনেকেই ঐ সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারত সরকার আর ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ নয়।[৩২] কেউ কেউ আবার সরকারকে বলেন, স্বরাষ্ট্র সচিবকে পুরোক্ষমতা ছেড়ে দিতে কিংবা নিদেনপক্ষে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তুলে দিতে, যাতে করে যে নগ্ন ক্ষমতা স্বরাষ্ট্র সচিব গোপনে প্রয়োগ করছেন, তা খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

খুবই বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বরাজের দাবিও উত্থাপন করা হয়েছিল। ভারত ব্রিটিশ রাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেলে এবং স্বশাসিত হলে তবেই রাজস্বের ন্যায্য ভাগ পাবে এবং শিল্পায়নের কর্মসূচী অনুসরণ করতে পারবে—এই বিপ্লবী মতবাদও অভিব্যক্ত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ্যেই এই মতামত প্রকাশ করা হয়: "ইংল্যান্ড প্রধানত একটি শিল্প-প্রধান ও বাণিজ্যিক দেশ, কাজেই যতদিন ইংরেজরা ভারত-বাসীর উপরে প্রভুত্ব করবে, ততদিন ভারতবর্ষকে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের স্বৈরাচার মেনে নিতে হবে।" ১৮৯৬-এর আবকারি কর আরোপ ও শুল্ক হ্রাসের প্রসঙ্গে আর, সি, দত্ত ১৮৯৮ সালে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা এর খুব কাছাকাছি। তিনি লেখেন –

"যতদিন না ভারতের জনসাধারণকে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর এবং নিজেদের জাতীয় রাজস্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করা হচ্ছে, ততদিন বারবার এই অপমানকর দৃশ্য দেখতে হবে যে, নিজ দেশের ভোটারদের নির্দেশ-ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সরকার জেনেশুনে ও প্রকাশ্যে ভারতবাসীর স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে।"[৩৩]

আবকারি শুল্ক গোখলেকে পর্যন্ত উত্তেজিত করেছিল। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "এক দেশের জনগণের দ্বারা অপর দেশের সরকার পরিচালনা সম্বন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিল যা বলেছেন" এটা তারই উদাহরণ।[৩৪]

কিন্তু দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তখনও কালের গর্ভে। তখনকার কর্মসূচি ছিল —জাতীয় চেতনার জাগরণ, সেই চেতনার সংহতি সাধন, এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনে ভারতীয় জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথমটি বলিষ্ঠতা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাফল্যের সাথেই অনুসরন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টি সম্পন্ন হয়েছিল শুল্ক নিয়ে আসমুদ্র-হিমাচল জাতীয় চেতনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে। সেই প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও কৌশলী ছিলেন লোকমান্য তিলক। শুল্ক আন্দোলনের মূল্যকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য তার পত্রিকা 'মারহাট্টা' অচিরেই জাতীয় ঐক্যের উদ্দীপক আহ্বান জানিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল ঃ

"তরুণ ভারতের বিরোধী সন্দিগ্ধ-চিত্ত ইংরেজরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে চলেছে, ভারত কখনই একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। এমন একটি ভয়ংকর সংকটময় মুহূর্তে, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। সকল ভারতবাসী —হিন্দু, মুসলমান, পার্শী এবং ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ—সকলে এক লক্ষ্য নিয়ে এগোই। এখন সংকোচ বা দ্বিধার সময় নয়। জাতির স্বার্থে সকল ব্যক্তিগত মতপার্থক্য বিসর্জন দিতে হবে, এবং দেশবাসী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, একই শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য।"[৩৫]

অর্থনৈতিক বা অনুরূপ বিষয়ে ব্রিটিশ-নীতির বিরোধী প্রতিক্রিয়া থেকে আবকারি-শুল্ক সম্পর্কে জাতীয় প্রতিক্রিয়া যে ভিন্ন ধরণের হয়েছিল ও গুণগত-ভাবে উচ্চ স্তরের ছিল তার কারণ, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তৃতীয় কর্তব্যটি পালন করেছিলেন। নিছক বিক্ষোভের স্তর অতিক্রম করে এই প্রতিক্রিয়া সক্রিয় আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। যদিও তার ব্যাপ্তি ছিল সামান্য, এবং সম্ভবতঃ দেশের একটি মাত্র অংশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেই তা সীমিত ছিল। এই সময়েই সুতীবস্ত্রের উপর আবকারি-শুল্কের প্রশ্নকে ঘিরে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের চিন্তা লক্ষ্যণীয়ভাবে কার্যকরহয়।[৩৬] বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ শিল্পকে সাহায্য করার একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছিলেন, কেননা ব্রিটিশ শাসকদের বিচারবোধ ও উপচিকীর্ষার উপর আর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছিল না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা হতে লাগল, এবং এইসব জনসভায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হ'ল। মহারাষ্ট্রে ক্ষুদ্রাকারে স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত হ'ল। এই ক্ষুদ্রাকার বিদেশী-বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য আবকারি-শুল্ক

বিরোধী আন্দোলন থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ এটা ছিল জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি নতুন ধরণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। প্রতিকারের জন্য শাসকের কাছে আবেদন-নিবেদন করার পরিবর্তে স্বনির্ভরতার মনোভাব জাগ্রত করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।[৩৭] আত্মবিশ্বাসবোধ জাগ্রত করতে ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ব্যাপক-সংখ্যক শহুরে মানুষকে সামিল করতে সরকারের শুল্ক নীতির ফলে উদ্ভূত প্রথম পর্বের এই স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা ছিল খুবই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

৭ চিনি আমদানি-শুল্ক, ১৮৯৯

রাজস্ব সংক্রান্ত আর একটি নীতি ভারতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটি, ইউরোপ থেকে আগত ভর্তুকি প্রাপ্ত চিনির উপরে দামের সমতা রাখার জন্য আমদানি-শুল্ক চাপানোর নীতি। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। বস্তুত ভারতীয় নেতৃত্বের অর্থনীতির জ্ঞান, তাদের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, এবং তাদের রাজনৈতিক কৌশল কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বর্তমান আলোচনার সময়কালে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যে ব্যাপক বিভেদ দেখা দিয়েছিল তার অন্তত একটি দৃষ্টান্তের মূলে ছিল এ বিষয়ে মত-পার্থক্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারত ছিল চিনি-রপ্তানিকারী। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভারত পরিশুদ্ধ চিনি আমদানি করতে শুরু করে। বেশির ভাগটাই আসত ব্রিটিশ উপনিবেশ মরিসাস থেকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বীট থেকে তৈরি চিনির আমদানি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। কারণ, ঐ সব দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে-ভর্তুকির ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এবং ঐ চিনি ছিল খুবই সস্তা। আর তার ফলে, ১৮৯৮ সালের মধ্যেই মরিসাস থেকে আমদানি করা চিনি ও দেশজ চিনির বাজার বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই জোয়ার ঠেকাবার জন্য ১৮৯৯ সালের ২০শে মার্চ ভারত সরকার ১৮৯৪ সালের শুল্ক-আইন সংশোধন করে ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনির উপরে ভর্তুকির সমপরিমাণ আমদানি-শুল্ক আরোপ করার অধিকার অর্জন করে। মুক্ত বাণিজ্যের বহুল ঘোষিত নীতি থেকে এই আপাত-সাহসী বিচ্যুতির প্রধান কারণ হিসেবে সরকার যে যুক্তি খাড়া করেছিল, তা হ'ল, কৃত্রিম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ভারতের একটি মহান শিল্প ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আখচাষ যাতে আরও ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার জন্যই সরকার এটা করেছে। অভিযোগ করা হয়—ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে; ভারতীয় শোধনাগারগুলি ব্যাপক হারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এই বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া তখনও অব্যাহত; আখচাষের ক্ষেত্রে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণও কমে গিয়েছে। সরকারের মতে, ঐ ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি শুধু এদেশের আধুনিক কারখানাজাত ও পরিশোধিত চিনিই নয়, অপরি-

শোধিত ও অর্ধ-পরিশোধিত চিনিরও প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। মরিসাসের চাষী ও শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার সাম্রাজ্যবাদী বিবেচনা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে—এই অভিযোগ সরকার তীব্রভাবে অস্বীকার করে। সরকার দাবি করল যে, ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের স্বার্থরক্ষাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।[৩৮]

লর্ড কার্জন প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন যে দেশের আপামর জনসাধারণ তার এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে: শুধু বোম্বাই ও করাচীর ইউরোপিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স-এর কতিপয় আমদানিকারী বণিক ছিল এর বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যি ঘটনাটি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব কখনই, এমন কি শুরুতেও, এই আমদানি-শুল্ককে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেননি। বরং কাল-ক্রমে, এর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ শক্তিশালী ও বেগবান হয়েছে। এর পরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট জানা যাবে যে, কোনো স্তরেই ভারতীয়রা এই শুল্ক আরোপকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন জানান নি কিংবা এই ব্যবস্থা নেওয়ার সময় সরকারি মহল যে মনোভাবে আপ্লুত হয়েছে তাতে সম্মতি জানাননি।

তবে, অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে, ভারত সরকারের এই কার্যের সমর্থক ও সমালোচকের সংখ্যা সমান ছিল না। সংশোধনী আইনটি পাশ হওয়ার আগে, এবং যখন এটি পাস করা হচ্ছিল তখন, সমালোচকের চেয়ে সমর্থকের সংখ্যা ছিল বেশি। সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জাস্টিস এম জি রাণাডে, অর্থনৈতিক বিষয়ে যাঁর মুখের কথাকে তখনও বহু সংখ্যক ভারতীয় আইন বলে মনে করত। রাণাডে ১৮৯৯ সালের মে ও জুন মাসের 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশিত তিনটি রচনায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।[৩৯] এছাড়া, অন্য যাঁরা সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাঁদের একজন পি. আনন্দ চারলু, অন্যজন আর. সি দত্ত।[৪০] চারলু ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে সরকারকে সোচ্চার ও বলিষ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। অমৃত বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, হিন্দু, মারহাট্টা, ইন্দুপ্রকাশ, এ্যাডভোকেট ও ট্রাইবুনের মত প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই ছিল এর পক্ষে।[৪১] বস্তুতঃ অমৃত বাজার পত্রিকাই সর্বপ্রথম ভর্তুকি-প্রাপ্ত বীটজাত চিনির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয় এবং সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায়।[৪২]

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অথচ—সরব দল প্রথম থেকেই তীব্র ও নিরবচ্ছিন্নভাবে এই শুল্ক আরোপের বিরোধিতা করেছিল। শোনা যায়, এই দলের নেতা ছিলেন পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক। ১৮৯৫ সালেই শ্রীরায় 'দি পভার্টি প্রবলেম অব ইণ্ডিয়া' ('ভারতের দারিদ্র সমস্যা')

নামে একটি গ্রন্থ রচনা ক'রে অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে বাংলায় যথেষ্ট নাম করেছিলেন। তিনি সেই সময়ে চিনি শুল্কের উপরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আর এই দুই পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ ক'রেছিলেন একাকী কিন্তু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, ফিরোজশা মেহতা। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রীমেহতা আপত্তি জানিয়েছিলেন। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সরকারি বিলের উপর যখন বিতর্ক চলছিল তখন তিনি বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করার পূর্বে আরও তথ্য, বিস্তারিত অনুসন্ধান ও বিতর্কের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।[৪৩]

এই বিতর্কে দুই পক্ষের অবস্থান ও বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত অলোচনার পূর্বে, আরও দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। প্রথমতঃ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে তখনও ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ সালের শুল্ক আন্দোলনের স্মৃতি ছিল সজীব। এবং সে সময় তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গী করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং ঐ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে চিনি শুল্কের বিষয়টিকেও তাঁরা দেখছিলেন। চিনি শুল্কের প্রশ্নে ঐ শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে গিয়েই তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের এই মতপার্থক্য শুধু মাত্র বিষয়টির ভালমন্দ বিচারের মধ্যেই সীমিত ছিল না। চিনি শুল্ক আরোপের ফলে মুক্তবাণিজ্য নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ জুড়ে যে ব্যাপকতর বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেও এই মতপার্থক্য। বর্তমান আলোচনায় আমরা অবশ্য ঐ বিতর্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নই।

চিনি শুল্কের সমালোচকরা প্রথমত এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যেসব অনুমানের ভিত্তিতে এই শুল্কের প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছিল সেগুলো সবই ভ্রান্ত। ভারতে উৎপন্ন চিনির বেশির ভাগই ছিল সাধারণ মানের, অশোধিত, এবং সেজন্য ভারতের চিনির সঙ্গে ইউরোপের চিনির প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল না। এবং দেশজ চিনি কম দামে বিক্রি করতে না হলে, ভারতের চিনি শিল্পের বা সেই শিল্প-নির্ভর আখ চাষ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁরা এটা স্বীকার করেছেন, আখচাষে নিয়োজিত জমির পরিমান কমে গিয়েছিল। কিন্তু, তাঁদের মতে, সেটা হয়েছিল প্রধানত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ও খরার কারণে। ১৮৯৬-৭ সালের আগে, অর্থাৎ ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবার আগেও, এ ধরনের সংকোচন ঘটেছে। এই সমালোচকেরা এটাও স্বীকার করেছিলেন যে, বিদেশী চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দেশীয় পরিশোধিত চিনি-শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষতি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তখন বাংলায় ৬টি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় ২টি, পাঞ্জাবে ১টি এবং

মাদ্রাজে ৫টি বৃহৎ চিনি কারখানা ছিল, এবং মোট পরিশুদ্ধ চিনি উৎপাদন হ'ত ৮০০,০০০ টন, অর্থাৎ দেশের পরিশুদ্ধ চিনির মোট চাহিদার মাত্র এক পঞ্চমাংশের মত। এবং এই সব চিনিকল বন্ধ হয়ে গেলেও ৪ থেকে ৫ হাজারের বেশি শ্রমিক বেকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া, শুধু বীটজাত চিনিই ভারতের পরিশুদ্ধ চিনির একমাত্র শত্রু ছিল না, ভারতীয় চিনি কলগুলিকে ধ্বংস করার পেছনে মরিসাস থেকে আগত চিনির ভূমিকাও ছিল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইওরোপীয় চিনি আমদানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও, দেশজ চিনি মরিসাসের চিনির সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারত না। বাস্তবিকই ১৮৮৩ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ জার্মান ও অস্ট্রিয়ার চিনি এদেশে আসার আগেই কি কেবলমাত্র বাঙলা প্রদেশেই ৮৯ টি চিনি কল বন্ধ হয়ে যায় নি?[৪৪] 'প্রতিভাসি' এমনকি এই অভিমতও প্রকাশ করে যে, সেই সময়ে ভারতে আধুনিক চিনিশিল্প গড়ে ওঠার আদৌ কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অপর দিকে, চিনি শুল্কের সমর্থকেরা সংখ্যা ও তথ্য দিয়ে দেখাতে চাইলেন যে ভারতবর্ষের সর্বত্র একে একে কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি অপরিশুদ্ধ চিনির উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। এবং তার ফলে আখ ও খেজুর চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ মারাত্মক রকম কমে গিয়েছিল; ভবিষ্যতে আরও মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার আশংকা ছিল। এটা দুর্ভিক্ষের দরুণ হয়নি: এর কারণ "বিদেশী চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে চিনি শিল্পের ক্ষতি"। সেজন্য তাঁরা চিনি শুল্ককে দেখেছিলেন দেশীয় চিনি শিল্পের আংশিক সংরক্ষক ও সঙ্কট থেকে পরিত্রাতা হিসেবে। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন, এই শুল্ক পরিশুদ্ধ চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চলতা ও অবনতি রোধ করবে, গ্রামীন চিনি শিল্পে প্রাণের জোয়ার আনবে, আখ চাষের বিস্তার ঘটাবে, এবং হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। জাস্টিস রাণাডে অবশ্য চিনি শুল্কের সমালোচকদের সঙ্গে একটি বিষয়ে একমত ছিলেন —সেই সময়ে দেশে খুব বেশি-সংখ্যক চিনি শোধনাগার ছিল না, সে কারণে চিনি শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, শুধু এইভাবে বিষয়টিকে দেখলে তা খুবই অদূরদর্শীতার পরিচায়ক হবে। কেননা এই শিল্পের গোটা ভবিষ্যৎটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই মূল সমস্যা।

চিনি শুল্কের সমালোচক ও সমর্থকদের মধ্যে বিতর্কের আর একটি বিষয় ছিল, চিনির ক্রেতাদের উপরে এই করের প্রভাব। সমালোচকদের মতে, চিনি রপ্তানিকারী দেশগুলি ভর্তুকি দেওয়ায় তাদের চিনির দাম ছিল কম, কাজেই ভারতীয় ক্রেতারা সেই পরিমাণে লাভবান হয়েছে। এটা ঠিক যে, চিনির উপর আরোপিত শুল্ক দেশীয় শিল্পকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে না, কিন্তু যেহেতু দেশীয় শিল্প দেশের পরিশুদ্ধ চিনির চাহিদার খুব সামান্যই মেটাতে পারে,

সেই হেতুই চিনি আমদানি চলতেই থাকবে। ঐ শুল্ক আরোপের ফলে যে পরিবর্তন ঘটবে তা হল, অস্ট্রিয়া ও জার্মানী থেকে সস্তা চিনির পরিবর্তে মরিসাস থেকে বেশি দামে চিনি আমদানি হবে। সুতরাং এই শুল্ক আরোপ আসলে জনগণের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর সামিল।

এই সমালোচনার যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা কখনই অস্বীকার করেননি যে ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি সস্তা। কিন্তু তাঁরা ঘোষণা করলেন, চিনি শুল্কের বিরোধীদের যুক্তিকে সঙ্গত মনে করা যেত, যদি এর সঙ্গে ভারতীয় চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ জড়িত না থাকত। ইউরোপীয় চিনি আমদানির ফলে ভারতীয় চিনি শিল্প যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেটা দেখিয়ে তাঁরা সমালোচকদের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনির এই সস্তা দামই দূর ভবিষ্যতে একদিন ক্রেতাদের গলায় সত্যিকারের ফাঁসে পরিণত হবে। কেননা রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির প্রকৃত উদ্দেশ্য, কৃত্রিম উপায়ে বীটজাত চিনির দাম কমিয়ে প্রতিযোগীদের শেষ করে দেওয়া। একবার দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করে দিতে পারলে এবং তার পুনরুদ্ধারের আর সম্ভাবনা না থাকলে, তখন ইউরোপীয়রা বাজারে কর্তৃত্ব করবে ও একচেটিয়া দাম হাঁকাবে।

বেশির ভাগ মানুষের জন্য বেশি পরিমান কল্যাণের উপযোগিতাবাদী তত্ত্বটিকে কাজে লাগিয়ে এই শুল্কের সমর্থকেরা সুচতুরভাবে সস্তার যুক্তিকে বাতিলকরে দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখান যে, আমদানিকৃত ও পরিশুদ্ধ চিনির মূল্য বাড়ায় ভারতের দরিদ্র শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, কেননা তারা অপরিশুদ্ধ দেশীয় চিনি ব্যবহার করত, বেশি দাম দিতে হয়েছে শুধু মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে। কিন্তু সমাজের স্বার্থে এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকা উচিত ; শুল্কের ফলে চিনির দাম বৃদ্ধিকে "দরিদ্র দেশবাসীর মঙ্গলার্থে এক ধরনের পরোক্ষ কর" হিসেবে দেখা তাদের কর্তব্য।

লক্ষ্যণীয় যে, এই নেতারা 'সবার আগে শিল্প' এই অনুশাসন বাক্যটি অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা উদীয়মান পাশ্চাত্য-আলোকপ্রাপ্ত শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্য থেকে এসেছিলেন, এবং মূলতঃ তাঁদেরই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কাজেই দেশের শিল্পায়ণের স্বার্থে ক্রেতা হিসাবে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিনি-শুল্কের সমালোচকেরাও বোধহয় এই ত্যাগের প্রশ্নে বিরোধিতা করতেন না। তাঁদের একমাত্র আপত্তি ছিল এই যে এই ত্যাগের ফলে সমগ্রের উপকার না-হলে শুধু একটি অংশের ত্যাগ হবে অর্থহীন।

চিনি শুল্ক আইন প্রণয়নের পিছনে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যকে সমালোচকেরা সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। সন্দেহ করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা মনে হচ্ছিল, আসলে তেমনটি নয়। ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা থেকে সরকার এই আইন প্রণয়ন করেনি। ভারতের চিনিশিল্প বিপন্ন ব'লে

তারা যে চিৎকার করছিলেন আসলে সেটাও একটা ধাপ্পা, সরকারী মুখপাত্রেরা ভারতের কৃষক ও উৎপাদকের প্রতি যে সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন, তাও পুরোটাই ভণ্ডামি কিংবা তার চেয়েও জঘন্য কিছু। সরকারী ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মরিসাস ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কৃষক ও উৎপাদকদের সাহায্য করা, এবং যে-প্রতিযোগীদের সাথে তারা কোন মতেই লড়াই করে পেরে উঠছিল না, ভারতের বাজার থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়া। সরকার যদি সবরকম চিনির আমদানির উপরেই সংরক্ষণ-শুল্ক আরোপ করত তাহলে সেটা শাসকদের নিষ্ঠার সূচক হতে পারত; এবং সবাই স্বাগত জানাত। তাছাড়া ভারতীয় চিনি শিল্পকে বাঁচানোই সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে, যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণতই অপর্যাপ্ত, কারণ এই ব্যবস্থা মরিসাসের চিনির মত দুর্দমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে ভারতীয় চিনিশিল্পকে রক্ষা করতে অক্ষম। রায় লিখেছিলেন : মোটের উপর আমাদের চাহিদার বেশির ভাগ পরিশুদ্ধ চিনি যদি "জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বদলে মরিসাস থেকে আসে, এবং আমাদের চিনিশিল্পকে ধ্বংস করে, তাহলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা একই হবে।" তাঁর মতে, বাস্তবে সরকার যদি সত্যি-সত্যিই ভারতীয় চিনিশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ও উৎসাহিত করতে ইচ্ছুক হয়, তবে মরিসাসের চিনির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে, এবং, শুধু তাই নয়, একই সাথে দেশীয় শিল্পকে প্রত্যক্ষ সাহায্য ও উৎসাহ জোগাতে হবে, আখচাষের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হতে হবে, এবং চিনি প্রস্তুত করার পদ্ধতিকেও উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে, চিনি শুল্ক আরোপের পেছনে সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্যের মূল্যায়নের প্রশ্নে এই শুল্কের সমর্থকদের অধিকাংশেরই প্রতিক্রিয়া ছিল অনুকূল। অন্তত এই বিষয়ে ১৮৯৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত সংসদীয় দলিলে (ব্লু বুক)[৪৪] 'তিক্ত সত্য' বর্ণিত হওয়ার আগে পর্যন্ত। চিনি-শুল্ক সংক্রান্ত আইনটি যখন পাশ করাহয় তখনও বহু সংবাদপত্র এবং ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করেছেন যে 'ভারতের মঙ্গলের জন্যই' এই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।[৪৫] —এমন "উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করা হয়েছিল যে দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য লর্ড কার্জনরূপী অর্থনৈতিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে।"[৪৬] কিন্তু এই উচ্ছ্বাস দু মাসও টেঁকে নি। চিনি-শুল্ক সংক্রান্ত সংসদীয় দলিলটি সমালোচকদের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কাকে সঠিক প্রমাণ করেছিল।[৪৭] শুধু তাই নয়, এটি সমর্থকদেরও নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে পুরোপুরি—বা অন্তত নীতিগতভাবে—ভারতীয় কৃষক ও উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, এটা করা হয়েছিল মরিসাস ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চাষী ও উৎপাদকদের উপকারার্থে। এমনকি জাস্টিস রাণাডে পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে এই নীতি-পরিবর্তন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিনিশিল্পে সঙ্কটের জন্য। চিনি শুল্কের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক পি. আনন্দ চারলুও

১৯০১ সালে স্বীকার করেছিলেন, এই "বিলটি পাশ করানোর সময় যে আশঙ্কা খোলাখুলি প্রকাশ করা হয়েছিল" "কতিপয় উপনিবেশের স্বার্থেই আইনটি প্রণয়ণ করা হচ্ছে, তা বোধহয় অমূলক নয়"। ফলত, চিনি-শুল্ক আইনের বহু সমর্থক এক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হন, এই বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ "সেঁতিয়ে গেছে।" অবশ্য তাসত্ত্বেও এঁরা আইনটির নিন্দা করতে রাজি হননি। সমালোচকদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা প্রকাশ করে এই বক্তব্যে অটল ছিলেন যে, যেহেতু উক্ত ব্যবস্থার ফলে সুদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় চিনিশিল্পের মঙ্গল সুনিশ্চিত হবে, সেজন্য ভারতবাসীর পক্ষে একে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হওয়া অনুচিত: এমনকি মরিসাসের চাষীদের সঙ্গে সমস্বার্থের বন্ধনও গড়ে তোলা যেতে পারে। তাঁরা বললেন, যদি শেষ পর্যন্ত এই শুল্ক ভারতীয় চিনির দুই বিদেশী শত্রুর একটিকেও ঘায়েল করতে পারে, সেটাও হবে পরম লাভ। সর্বোপরিএর ফলে ভারতীয় চিনিশিল্প কিছুটা "নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে।"

একটি ব্যাপারে জাতীয় নেতৃত্বের অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের মতের মিল ছিল। উভয় গোষ্ঠীই মনে করেছেন যে শুধু সমতারক্ষী শুল্ক আরোপ করেই ভারতীয় চিনি শিল্পকে রক্ষা করা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন অনতিবিলম্বে অন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ। যেসব উপায়ের কথা ভাবা হয়েছিল তার একটি—মরিসাসের চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতায়ও ভারতীয় চিনি শিল্পকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় আর একটি উপায়, দেশীয় শিল্পকে বিশেষ ও সক্রিয় সরকারি সহযোগিতা প্রদান। মজার ব্যাপার এই যে, এই বিশেষ সুযোগ সুবিধার দাবি জানাতে গিয়ে জাস্টিস রাণাডে মদ্যপান বর্জনের দাবির—যেটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল—বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে, চিনি উৎপাদনের বাহ্য অর্থনৈতিক সুবিধের একটি,এর বর্জিত অংশ থেকে 'রাম' উৎপাদন করা যায়। এবং "যতদিন না শোধনাগারগুলিকে বর্জিত অংশ থেকে স্পিরিট উৎপাদন ক'রে কারখানার কাছাকাছি মজুতাগার থেকে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, ততদিন কোন চিনি-কারখানা চলতে পারে না।" রাণাডে অভিযোগ করেছিলেন আবকারি শুল্কের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া অধিকারের ফলে ভারতীয় উৎপাদকেরা এই সুবিধা পায়নি। সেজন্য তিনি দাবি করেন যে, চিনি শিল্পের প্রয়োজনের থেকে আবকারি শুল্কের স্বার্থকে বড় করে দেখা চলবে না এবং চিনি শোধনাগারগুলিকে 'রাম' তৈরি করার ও "যারা উৎকৃষ্ট পানীয় হিসেবে রাম খেতে চান" তাদের কাছে তা বিক্রি করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। রাণাডে নিজে, এবং জাতীয় নেতৃত্বর এর আগে অন্যত্র সাধারণের কাছে মদ বিক্রির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির যে জোরদার দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁর এই বক্তব্য ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সহজেই লক্ষ করা যায়, এই ক্ষেত্রে শিল্পপ্রেমী রাণাডে তাঁর সমাজ-সংস্কারক ও

নীতিবাগীশ সত্তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেজন্যই মদ্যপানের সপক্ষে বলেছিলেন।

পরবর্তীকালের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে এই যে মতবিরোধ চলেছিল তাতে প্রায় সব বিষয়েই বিরোধীদের বক্তব্য ছিল সঠিক। আমরা আগেই দেখেছি যে চিনি-শিল্প আইন সম্পর্কিত সংসদীয় দলিল প্রকাশিত হওয়ার পর কীভাবে অধিকাংশ ভারতবাসী এই আইন-প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনির আমদানি বন্ধ হয়নি। বরং আরও খারাপ ঘটনা দেখা গেল—ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি ভারতীয় বাজার থেকে অপসারিত হওয়ার পর পরিবর্তক হিসেবে দেশী চিনির বাজার বিস্তৃত হ'ল না, মরিসাস ও জাভা থেকে চিনি আমদানি বাড়ল। কয়েক বছর বাদে এমনকি সরকারি কর্তারাও সমালোচকদের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। যেমন, ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন স্বীকার করেন যে ভারতীয় অপরিশুদ্ধ চিনি ও আমদানিকৃত পরিশুদ্ধ চিনির মধ্যে "বর্তমানে বাস্তবিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই"। পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন –

"আমি যতটা জানতে পেরেছি তাতে বিগত কয়েক বছর আখচাষের অধীনে জমির পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত আছে, এমনকি হয়তো কমেই যাচ্ছে। অবশ্য এর কারণ বিদেশের সাথে প্রতিযোগিতা বা ভারতীয় শোধনাগারগুলির বাজারের ব্যর্থতা নয়; দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক অভাবের পরিস্থিতিই এর কারণ, যার জন্য প্রতিটি কৃষি-পণ্য একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।"

সুতরাং, চিনি-শুল্কের ভারতীয় সমর্থকদের যে যুক্তিগুলি আমরা উপরে আলোচনা করেছি সেগুলিই যদি একমাত্র যুক্তি হয় তবে এই সিদ্ধান্তে আসা খুবই সঙ্গত মনে হতে পারে যে, এক্ষেত্রে তাঁদের অর্থনৈতিক বিচার ও বিশ্লেষণ ছিল ভাসা ভাসা ও বাস্তব জীবনসত্য-রহিত। কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল করা হবে; এবং তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা ও সততাকে খাটো করে দেখা হবে। আমাদের অভিমত হল : এই বিষয়ে সরকারকে সমর্থন জানানোর পিছনে আরও গভীর যুক্তি ছিল যা আমরা এখনও পর্যালোচনা করে দেখিনি। তাঁরা কখনও কখনও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, আবার কখনও সুচতুর সতর্কতার সাথে—যদিও খুবই কার্যকরভাবে—ব্যক্ত করেছেন। পরাধীন জাতির নেতা হিসেবে এটা তাঁরা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের এই যুক্তির মূলে নিহিত ছিল এই বিশ্বাস যে, চিনি-শুল্ক আইনটি এ দেশের রাজস্ব-আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করেছে। এটিকে তাঁরা সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে দেখেছিলেন। এবং সেই সুযোগটিকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে তাঁরা মুক্ত বাণিজ্যের তত্ত্বকে আক্রমণ করতে

চেয়েছেন ও সংরক্ষণ নীতি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ'রা ভেবেছিলেন, যে-অবস্থাতে এবং যে কারণেই হোক না কেন অথবা শর্ত যাই হোক সরকার একবার মুক্ত-বাণিজ্যের নীতি থেকে সরে এলে আর সংরক্ষণনীতি গ্রহণের জন্য তাদের যুক্তি ও চাপকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এবং চিনির শুল্ক আইনে যে সংরক্ষণ-নীতি রূপ পেয়েছে তা অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা যাবে, এমনকি ব্রিটিশ প্রতিযোগী জড়িত থাকলেও। ডি. জি. কালেকে যদি বিশ্বাস করা যায়—এবং তাঁকে বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই—তাহলে জাস্টিস রাণাডে যখন আইনের সপক্ষে সক্রিয় সংগ্রামে রত ছিলেন, তাঁর মনে এই চিন্তাই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এই বিষয়ে রাণাডের পত্রগুচ্ছের ভূমিকায় কালে লিখেছেন, সংরক্ষণকারী আমদানি-শুল্কটি রাণাডের কাছে ছিল এমন একটি পেরেক যাতে তাঁর মুক্ত-বাণিজ্য-তত্ত্বের সমালোচনাকে ঝুলিয়ে দেওয়া সম্ভব। রাণাডে এই শুল্কে-র মধ্যে "পেরেকের সূঁচলো দিকটি দেখেছিলেন এবং এর সাহায্যে মুক্ত-বাণিজ্যের শক্ত মাটিতে যে ক্ষুদ্র ফাটল দেখা গেছে তাকে আরও বড় করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে দেশীয় শিল্পের সুপরিকল্পিত বিকাশের দিকে নজর রেখেই ভারতের আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা যায়।"

৮. চিনি-শুল্ক আইনের সংশোধনী (১৯০২)

একটু আগেই দেখেছি, ১৮৯৯ সালের চিনি-শুল্ক আইন বীটজাত চিনি আমদানি রদ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ ইউরোপীয় বীট চিনির উৎপাদকেরা সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত ব্যবসায়ী সংস্থা (কার্টেল) গঠন ক'রে তাদের রপ্তানিতে পরোক্ষ ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত সরকার ১৯০২ সালের জুন মাসে অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এই চিনি-শুল্ক সংশোধনী বিলটি জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে পূর্বের আইনটির মত ততটা সমর্থন পায় নি। পক্ষান্তরে, পূর্বেকার আইনের সমালোচকদের যুক্তিগুলি নতুন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। যদিও লর্ড কার্জন আর একবার ঘোষণা করলেন, "এই আইনটিতে জনস্বার্থ রক্ষা ছাড়া আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই", তিনি ভারতীয় নেতাদের কাছ থেকে অভিনন্দন কিংবা পুষ্পবৃষ্টি পাননি, বরং ইস্টকবৃষ্টিই হয়েছিল। নেতাদের বড় অংশ ঘোষণা করলেন যে সরকার ঔপনিবেশিক বাগিচামালিক ও উৎপাদকদের স্বার্থেই কাজ করেছেন: এই চিনি-শুল্কের ফলশ্রুতিতে তারা ভারতীয় নেতাদের কাছ থেকে আরও উচ্চ মূল্য আদায় করতে এবং সাথে সাথে ভারতীয় চিনি-শিল্পকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের কারও-কারও এটাও মনে হয়েছিল যে, ভারত সরকারের কার্যক্রমের পেছনে সম্ভবতঃ ইওরোপীয় পরিশুদ্ধ চিনির উৎপাদকদের মঙ্গল কামনাই সক্রিয় ছিল। বৃহৎ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র

'বঙ্গবাসী' বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করে। তারা নতুন চিনি-শুল্ক আইনটি সমর্থন করে। এই যুক্তি দেখিয়ে যে পূর্বেকার আইনটি কার্যকরী করার প্রথম বছরে বাস্তবিকভাবে ভারতীয় উৎপাদকরা লাভবান হয়েছিল, এবং ভারতে চিনি কারখানা খোলার ব্যাপারে ইউরোপীয়রা উৎসাহিত হলে, নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হবে ও আখ ও গুড়ের চাহিদা বাড়বে। তাছাড়া, ইউরোপীয়দের উদাহরণ দেখে পরে ভারতীয় শিল্পপতিদেরও এগিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে।

সরকারি নীতির বিকল্প হিসেবে কিছু ভারতীয় নেতা আর একবার ব্রিটিশ উপনিবেশসহ সব দেশের চিনি আমদানির উপরেই সংরক্ষণমূলক কর আরোপের প্রস্তাব করেন। তাঁদের কয়েকজন আরও এগিয়ে দাবি করেছিলেন যে, যদি তা না-করা যায়, তবে ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি আমদানির উপর থেকেও সংরক্ষণমূলক শুল্ক তুলে নিতে হবে।

৯. বিবিধ প্রশ্ন

এবারে শিল্পনীতির অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ যে দিকগুলি সম্পর্কে জাতীয় নেতারা মন্তব্য করেছিলেন এবং অন্য যে দিকটি সম্পর্কে তাঁরা গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলি বিবেচ্য।

চিনি ও সুতীবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্কের ব্যাপারে ভারতীয় নেতারা যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু যেসব পণ্যের ভারতে তৈরি কোনো পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল না, কিংবা যেগুলি আমদানি হলে এদেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতিতে সহায়ক হ'ত, সেসব পণ্যের উপরে আমদানি শুল্ক আরোপের ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। শিল্পায়ণ প্রক্রিয়া ও ক্রেতার স্বার্থের উপর আমদানির প্রতিক্রিয়াকে তাঁরা বিচার করে দেখেছিলেন। যেমন, ১৮৮৮ সালে যখন প্রথম কেরোসিন তেলের উপর আমদানি শুল্ক ধার্য হ'ল, এবং কয়েকবছর পরে ১৮৯৪ সালে সেই শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তাঁরা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। সরকার ভেবেছিল, এই শুল্কের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উঠবে না। কারণ, কোনো ব্রিটিশ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল না। কিন্তু ভারতীয় নেতারা বিরোধিতা করেন। প্রধানত এই যুক্তিতে যে, যেহেতু কোনো ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে কোরাসিনের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এক্ষেত্রে দরিদ্র ভারতবাসীর স্বার্থের প্রশ্নকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা এরাই বেশির ভাগ কেরোসিনের ভোক্তা, বাড়িতে আলো জ্বালানোর জন্য। এবং নতুন কর এইসব দরিদ্র মানুষের কাছে বোঝা-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

এরপর ১৮৯৪ সালে যখন শুল্ক আইন প্রবর্তন করে সরকার কয়লা, ধাতুদ্রব্য, রং, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন

হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করে তখন তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল আরও তীব্র। শিল্পের উপরে এইভাবে পরোক্ষ-কর চাপিয়ে শিল্পের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টার জন্য তাঁরা সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিলেন।[৫১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে রুপোর পাত ছিল অন্যতম। ব্রিটিশ সরকার রুপার পাতের আমদানির উপরে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কর ধার্য করে। এবং ঐ পাতের উপরে বিশুদ্ধতা নিরূপক হল-মার্ক দেবার মত জটিল ব্যবস্থা চালু করে। ১৮৮২ সাল থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই শুল্কের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। ১৮৮৯ সালে এই প্রতিবাদ তীব্রতম রূপ নেয়। সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অবিলম্বে রুপোর পাতের উপর থেকে শুল্ক বিলোপ করার ও হল-মার্ক ঐচ্ছিক করার দাবি জানায়।[৫২] এই প্রতিবাদ কাঙ্খিত ফললাভ করেছিল। চার্লস ব্রাডলাফ, যিনি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, লোকসভায় প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, এবং ১৮৯০ সালে ঐ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়।

ভারতীয় নেতারা এইসব সামান্য বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ মুক্ত-বাণিজ্যের নীতির প্রতি ইংরেজদের প্রীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে তাঁরা তুলে ধরতে চেয়েছেন। রুপোর পাতের উপর আরোপিত শুল্ক তুলে নেবার দাবি জানানোর সাথে সাথে তাঁরা বার বার এই প্রশ্ন করেছিলেন: মুক্ত-বাণিজ্যের নীতি রক্ষার দোহাই দিয়ে ১৮৮২ সালে যখন ভারতে সুতীবস্ত্রের উপর শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে, তখন কেন রুপোর প্যাতের উপর শুল্ক বজায় থাকবে? এবং ইংল্যাণ্ড কেন ভারত যে ভাল উদাহরণ স্থাপন করেছিল, তা অনুসরণ করবে না? তাঁরা ঘোষণা করেন, এটা করতে অস্বীকার ক'রে ইংল্যাণ্ড ভারতের শাসকদের স্বিচারীতা ও স্বার্থপরতাকেই প্রকাশ করেছে। ১৮৮৪ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী 'জ্ঞানপ্রকাশ' লিখেছিল: "ইংল্যাণ্ড মুক্ত-বাণিজ্য নীতির কথা প্রচার ক'রে। অথচ তাদের আচরণ প্রবাদের অনুরূপ: অন্যকে দর্শনকথা শুনিয়ে নিজে বোকার মত ব্যবহার। এর চেয়ে বেশি হাস্যকর আর কি হতে পারে!" ১৮৮৪ সালের ২৭শে মার্চ অমৃত বাজার পত্রিকাও ক্রুদ্ধভাবে লিখেছিল: "একেই এরা মুক্ত-বাণিজ্য বলেন। আমরা বলি মুক্ত-বাণিজ্য নয়, নোংরা আচরণ।" ১৮৮৮ সালের ৩রা জুন 'মারহাট্টা' মন্তব্য করেছিল: "ইংল্যাণ্ডের মুক্ত বাণিজ্যের নীতি একেবারেই মেকি, একটি প্রহসন···। সমস্ত স্বার্থপরতা পুরোপুরি ফাঁস হয়ে গেছে। বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার অহমিকা নিছকই প্রতারণা বলে এখন প্রমাণিত।"

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রুপোর পাতের উপর থেকে শুল্ক বিলোপের দাবির পক্ষে আরও কিছু যুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখান যে, এই শুল্ক সুতীবস্ত্রের উপর আরোপিত শুল্কের মত নয়, এটি পুরোপুরি সংরক্ষণ-মূলক, কারণ এর থেকে

সংগৃহীত মোট বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েক হাজার পাউন্ড। এবং এই শুল্ক তুলে নিলে ভারতের কৃৎ-কৌশল ও বাণিজ্য লাভবান হবে। তাছাড়া, রৌপ্য-পাতের রপ্তানি বাড়লে ভারতীয় রুপা বাইরে চলে যাবে, যার ফলে টাকার উপরে চাপ কমবে ও তার অবমূল্যায়ণ বন্ধ হবে।

১০. সিদ্ধান্ত

ভারত সরকারের বিভিন্ন শুল্ক নীতির প্রতি ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের মনোভাবের যে পর্যালোচনা করা হ'ল তার থেকে তাঁদের শুল্ক নীতির চারটি প্রধান দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ তাঁদের নীতি ছিল সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করার নীতি, যদিও তাঁরা নির্বিচার সংরক্ষণের কথা বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের নীতি থেকে এটাও স্পষ্ট যে, আধুনিক শিল্পায়ণের জন্য জাতীয় নেতৃত্বের আগ্রহ ছিল গভীর ও অবিচ্ছিন্ন ; তাঁরা সব সময়েই শিল্পের স্বার্থকে আগ্রাধিকার দিয়েছেন, বাণিজ্যের স্বার্থকে নয়। এমনকি, বিদেশী বস্ত্র ও পরিশুদ্ধ চিনির মধ্যবিত্ত-ক্রেতা হিসেবে নিজেদের স্বার্থকেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সচেতনভাবে দেশের শিল্পায়নের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য উপেক্ষা করেছেন। অন্যভাবে বললে, ক্রেতা ভারতবাসীর চেয়ে উৎপাদক ভারতবাসীর স্বার্থকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, যখনই তাঁদের মনে হয়েছে যে পেট্রল বা, কারও-কারও মতে, চিনির মতো দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ জড়িত নয়, তখনই তাঁরা নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে ক্রেতা স্বার্থকে তুলে ধরেছেন। তৃতীয়তঃ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে ভারত সরকারের শুল্কনীতি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ করেছে। সম্ভবত ব্রিটিশ উৎপাদকের স্বার্থের সেবা করার জন্যই বিদেশী সরকারের শুল্কনীতি পরিকল্পিত হয়েছে। ভারত সরকারব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের জন্য ভারতে ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ বাজার যতটা সম্ভব রক্ষা করতে বধ্যপরিকর। ভারতীয় গ্রামগুলির অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতাকে দ্রুত নষ্ট করে এবং দেশীয় হস্তশিল্পের বিনাশ ঘটিয়েই এই বাজার তৈরী করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব তাঁদের এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছেন ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। চতুর্থতঃ সরকারের শুল্কনীতি তাঁদের জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করেছে—আরও সুস্পষ্টভাবে, রাজনৈতিক বাস্তবতাকে দেখতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, এটাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করতে, তাদের মধ্যে জায়মান জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণাকে সংহত করতে, সমগ্র দেশের জনসাধারণকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে, এবং রাজনৈতিক প্রচার ও সংগ্রামে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে। বস্তুত এই পর্যালোচনার সময়কালে যে সব বিষয় সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ও সরকার-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করেছিল, সরকারি শুল্কনীতি ছিল তার অন্যতম।

টীকা :

১। ১৮৭৫-এর ১৫ই জুলাই তারিখের স্বরাষ্ট্র সচিবের 'ডেসপ্যাচ'। ঐ বছরই ১১ই নভেম্বরের 'ডেসপ্যাচে' স্বরাষ্ট্র সচিব পুনরায় বলেছিলেন. সুতীবস্ত্রের উপর শুল্ক আরোপের ঘটনা "যাঁদের উপর সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও সৌভাগ্য অনেকটাই নির্ভরশীল এমন দুটি শিল্পোৎপাদক শ্রেণীকে শুধু পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয় রাজনৈতিক শত্রুতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে··· যদি এই সমস্যার সমাধান দীর্ঘকাল স্থগিত রাখা হয় তাহলে এটি বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মধ্যেও তিক্ততাপূর্ণ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠবে।"

২। লিটন-এর মনোভাব জানবার জন্য দ্রঃ—লেডি বেটি ব্যালফুর : "দ্য হিস্টরি অব লর্ড লিটন্‌স ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৮৭৬-১৮৮০" (লণ্ডন. ১৮৯৯ পৃঃ ৪৬২, ৪৭৭)। স্ট্র্যাচির জন্য দ্রষ্টব্য তার ১৮৭৭ সালের "আর্থিক বিবৃতি"।

নীচে উদ্ধৃত অনেকটা পরিমাণে খোলাখুলি বক্তব্যটি থেকে স্ট্র্যাচির মনোভাব আরও ভালো করে জানা যায়—

"আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না এই ব্যাপারে ভারতীয় ও ইংরেজদের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে···ঘটনা অন্যরকম হলে কী করা উচিত ছিল, তা নিয়ে আমি কোনো দূরকল্পনার আশ্রয় নেব না। তবে এই সুযোগে আমি একটি কথা বলতে চাই : আমরা প্রায়ই শুনি যে ভারত সরকারের কর্তব্য শুধু ভারতীয়দের স্বার্থ দেখা এবং তাঁর জন্য যদি ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় আমাদের কিছুই করার নেই। আমি অন্তত এটা মেনে নিতে একেবারেই রাজি নই। জীবনের অধিকাংশটাই ভারতে কাটিয়েছি এবং ভারত সরকারের চাকরি করেছি বলে একজন ইংরেজ হিসেবে আমার জাতিত্ব হারাইনি। নির্বোধ লোকেরা ম্যাঞ্চেস্টার-এর স্বার্থ বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কিন্তু আসলে ম্যাঞ্চেস্টার-এর স্বার্থ বলতে তো আর শুধু সুতিবস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কিছু বুদ্ধিমান ও মহান মানুষের স্বার্থকেই বোঝায় না, বোঝায় লক্ষ লক্ষ ইংরেজের স্বার্থ। আমি এটা স্বীকার করতে লজ্জিত নই যে, ভারতবর্ষের প্রতি আমার কর্তব্য বিষয়ে আমি অন্য যে কোনো ব্যক্তির মত সমান সজাগ হলেও, আমার বিবেচনায় আমার স্বদেশের প্রতি কর্তব্যের থেকে বড় কোনো কর্তব্য নেই।"

৩। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত উপরওয়ালার কাছে পাঠানোর সময় লর্ড স্যালিসব্যারি দেখিয়েছিলেন, "আরও ৫টি সুতাকল চালু হওয়ার মুখে, এবং হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৮ সালের মার্চ নাগাদ ভারতে চালু সুতো কাটার টাকুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১,২০১,২৮৪টি" (১৮৭৮ সালের "আর্থিক বিবৃতির" পরিশিষ্টাংশ)।

৪। জে, স্ট্র্যাচি : "ভারতবর্ষ" (১৯০৩) পৃঃ ১৮১-২। হ্যামিলটন অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছিলেন : "এই শুল্ক তুলে নেওয়ার ফলে না বস্ত্র আমদানি আগের থেকে দ্রুতহারে বেড়েছে, না ভারতীয় সুতী দ্রব্যের ব্যবসার দ্রুততর প্রসার রোধ হয়েছে]" (তদেব, পৃঃ ২৪৭)

৫। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালের ৩রা মে বোম্বাইতে একটি জনসভা হয় (ইন্দুপ্রকাশ, ৫ই মে)। কলকাতাতেও ২৭শে মার্চ ১৮৭৯ অনুরূপ একটি জনসভা আহূত হয়েছিল এবং এই সভায় প্রায় ৩০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন. (বাগল, তদেব, পৃঃ ৪১)। এই প্রসঙ্গে

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, "বক্তৃতাবলী", পৃঃ ২০১-৩ ; কে, টি, তালাং, "নির্বাচিত রচনাবলী ও বক্তৃতাবলী" (বোম্বাই. ১৯১৬), পৃঃ ১৮৫-৮৬ প্রভৃতিও দ্রঃ।

৬। "অতি রাজভক্ত" মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পর্যন্ত কৌন্সিল চেম্বার এর সভায় সুতিবস্ত্রের উপর থেকে শুল্ক বিলোপের সমালোচনা করেছিলেন।

৭। এঁদের শাসনকালে "ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট" তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এছাড়া "দ্য ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড এ্যামেণ্ডমেণ্ট" বিলটি পাশ করার প্রস্তুতি চলছিল। তবে সবচেয়ে বড় কথা, তখনও উদারপন্থী ও র‍্যাডিকাল ইংরেজদের উপর ভারতীয় নেতৃত্বের আস্থা অটুট ছিল।

৮। স্যার জন স্ট্র্যাচি ভারতীয়দের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, চমকপ্রদ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায়ঃ "যেসব পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে বা আরোপ করা যেতে পারে তার প্রায় সবগুলিই হয় ভারতে প্রস্তুত হয় কিংবা প্রস্তুত করা সম্ভব। এর অর্থ, আমদানি শুল্ক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃতভাবে সংরক্ষণশীল অথবা সেই সম্ভাবনাযুক্ত হতে বাধ্য" (আর্থিক বিবৃতি, ১৮৭৮)।

৯। বহু বছর পরে রমেশচন্দ্র দত্ত দুঃখ করে লিখেছিলেনঃ "এই শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল এমন সময় যখন মাদ্রাস ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেনি ; যখন উত্তর ভারত ১৮৭৮ সালের দুর্ভিক্ষে ধুকছিল ; যখন জমির খাজনার উপর নতুন সেস্ সদ্য ধার্য হয়েছে ; যখন বিশেষ কর আরোপ করে তৈরি করা দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল অদৃশ্য হয়ে গেছে ; যখন সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেবে ঘাটতি দেখা গেছে ; এবং যখন বৈজ্ঞানিক সীমানা খোঁজার ফলস্বরূপ আফগানিস্তানে গোলমাল বেধেছে এবং তার জন্য বিপুল ব্যয়ের বোঝা মাথার উপর ঝুলছিল" (ইকনমিক হিস্টরি, পৃঃ ৪১৬)।

১০। বস্তুত ১৮৮২ সালে শুল্ক প্রত্যাহার প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রায় সব সংবাদপত্রই এই যুক্তি উপস্থিত করেছিল।

১১। রাণাডে—অগস্টাস মংগ্রেডিয়েনের "ফ্রি ট্রেড এ্যাণ্ড ইংলিশ কমার্স" বই-এর সমালোচনা, (JPSS, Vol. IV No. 1, p. 50)। জি, এ. মানকর-এর (তদেব, খণ্ড ১, পৃঃ ২১৪-১৫) বই থেকে জানা যায় যে এটি লিখেছিলেন জাস্টিস রাণাডে।

১২।। জন স্ট্র্যাচি-র পরবর্তীকালের একটি মন্তব্যে ওদের সেই সময়কার মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। স্ট্র্যাচি লিখেছেন, ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে ভারতীয়দের অভিযোগ ছিল "বোকার মত মিথ্যা কুৎসা রটনা", যাকে "গুরুত্ব দেওয়ার বা যার উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না" (ইণ্ডিয়া, ১৯০০ পৃঃ ১৭৮)। এই প্রসঙ্গে স্ট্র্যাচির "অর্থনৈতিক বিবৃতি, ১৮৮৩"-ও দ্রঃ। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, একই সময়ে সর্বোচ্চ ব্রিটিশ শাসকরা কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের আপত্তিকে বিবেচনা করেছিলেন. তবে তাদের মনে হয়েছিল ঐগুলি সেই সময়কার পরিস্থিতির অঙ্গ।

১৩। একইভাবে, লম্বা-আঁশযুক্ত সুতোর কাপড়ের উপর আমদানি শুল্কে আরোপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৭৫ সালের ২৩শে আগস্ট "সদাদর্শ" লিখেছিলঃ "এরপর কে আর অস্বীকার করবে, এদেশটাকে কী করে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা যায় তার চিন্তায় আমাদের শাসকদের চোখে ঘুম নেই ?"

১৪। ভোলানাথ চন্দ্র, MM, Vol. I, পৃঃ ৫৮-৬০। চন্দ্র আক্ষেপ করেছেন—"বৃথাই আনুগত্য আদায় করতে যুবরাজের এদেশে আগমন—বৃথা রাণীর ভারতের সাম্রাজ্ঞী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ। প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ওরমুজাল নয় অরিমান—আসলে ম্যাঞ্চেস্টারই ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা" (তদেব. পৃঃ ৩৩)।

১৫। ভারত সরকার সম্ভবত সুতিবস্ত্রকে নতুন শুল্কের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর সরকার তা বাতিল করে দেয়।

১৬। পুণা সার্বজনিক সভার ১৮৯৪ সালের ৬ই মার্চের স্মারকলিপি। ঐ বছরই ৮ই মার্চ প্রদত্ত "ভারত সভা"র স্মারকলিপি এবং ১৮৯২-৩ থেকে ১৮৯৫-৬ সালের "ভারত-সভার প্রতিবেদন "প্রভৃতিও দ্রঃ। ১৮৯৪ সালের ১৮ই মার্চ পুণাতে যে সভা হয়েছিল তাতে গৃহীত আবেদনপত্রের জন্য দ্রঃ ঐ দিনের "মারহাট্টা" পত্রিকা ; এবং ২০শে মার্চ মাদ্রাসে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের জন্য ২৫শে মার্চের "মারহাট্টা"। কলকাতা (৮ই মার্চ), বোম্বাই (১৪ই মার্চ), অমৃতসর (৭ই মার্চ) এবং লক্ষ্ণৌ (৯ই মার্চ)-এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দ্রঃ PP (House of Commons), 1876, Vol. 72, No. 202.

১৭। রাসবিহারী ঘোষ— 'বক্তৃতাবলী', পৃঃ ১০০। জাতীয়তাবাদীদের শুল্ক-নীতির এই দিকটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে পরিচ্ছেদ ১৬-তে।

১৮। বহু জাতীযতাবাদী নেতা প্রায়শই যেটা করতেন সেইভাবে নরম সুরে ও পরোক্ষ ভঙ্গীতে আবেদনকারীরা এর থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শাসকদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, এই পদক্ষেপ "রানীর ভারতীয় প্রজাদের বর্তমান পূর্ণ আনুগত্যে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে, যেটা হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না" (দ্রঃ মাহরাট্টা, ১৮ই মার্চ ১৮৯৪)।

১৯। ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ "দ্য বেঙ্গলী" একইভাবে ঘোষণা করেছিল, "ইংলণ্ডের ন্যায়-বিচার বোধ সম্পর্কে এদেশের মানুষের আস্থা টলে গেছে।"

২০। প্রধান জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মাত্র একটি, এ্যাডভোকেট, সুতিবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্কের বিরোধিতার কারণ হিসেবে বলেছিল যে, এর ফলে এই সব পণ্যের দাম বেড়ে যাবে এবং আবকারি শুল্ক আরোপের প্রয়োজন হবে। বিকল্প হিসেবে, এই পত্রিকা, ম্যাঞ্চেস্টার-এর র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে মোর্চা গড়ার প্রস্তাব করেছিল (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪)।

২১। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, এর আগেও যখন আবকারি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছিল, তখন বহু ভারতীয় সংবাদপত্রই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

২২। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বি. আর ভুসকুতে, পি আনন্দ চারলু এবং মোহিনী মোহন রায় সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেছিলেন।

২৩। ১৯০৩ সালে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় গোখেল আর সি. দত্ত-র প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন, "বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুবিধে করে দেওয়ার জন্য সরকার প্রায় ধ্বংসোন্মুখ একটি দেশীয় শিল্পের উপরে করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, এমন ঘটনা অন্য কোনো দেশে দেখা যাবে না।"

২৪। এর কয়েক বছর পরই আর. সি দত্ত জানিয়েছিলেন, আবকারি শুল্ক আরোপের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প "শতাব্দীর শেষ কয়েক বছরে রুদ্ধ হয়ে গেছে" (ইকনমিক হিস্টরি, পৃঃ ৫৪৪)। ১৯০৪ সালে গোখেলও একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

২৫। এই বিষয়টি নিয়ে তেমন হৈচৈ হয়নি, কারণ "অর্থ বিষয়ক সদস্য" নিজেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বলেছিলেন, "আয় বাড়ানোর উদ্দেশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।" তাছাড়া, ভারতীয় নেতৃত্বের কাছেও এটা স্পষ্ট ছিল। ১৯০৪ সালে "অর্থবিষয়ক সদস্য" যখন বলেন আবকারি শুল্ক থেকে সরকারের আয় হয়েছে ২০ ২৫ লক্ষ টাকা, গোখেল অবজ্ঞাভরে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, "আমার মাননীয় বন্ধু যদি সত্যিই বিশ্বাস

করেন, আবকারি শুল্ক অব্যাহত আছে এই কারণে যে এর থেকে যা আয় হচ্ছে সরকারের পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তাহলে বলতে হবে ভারতে বা ইংলণ্ডে তিনিই একমাত্র লোক যিনি এরকম ভেবেছেন।'

২৬। গোখেল ১৯০৪ সালে এই অনুমানের কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছিলেন: "এখন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই শুল্ক বস্তুত সাধারণ ক্রেতারাই দিচ্ছেন—অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীগুলো দিচ্ছে।" এর আগে ১৯০২ সালে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন "বোঝার একটা অংশ পড়ছে" দরিদ্রদের ঘাড়ে।

২৭। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা" লিখেছিল: "আমাদের কিছু সমসাময়িক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই প্রতিবাদের ফল . ভবিষ্যতে ফলবে; স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বোধোদয় হবে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর কিছু বোঝে না এমন ভাবা ভুল। উদারনৈতিক হোক আর রক্ষণশীল হোক ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার যথেষ্ট বোধবুদ্ধি আছে এবং তা তারা ব্যবহার করে। তারা ভালোভাবেই জানে যে ল্যাংকা-শায়ারকে খুশি করতে তারা ভারতবর্ষের প্রতি গুরুতর অন্যায় করছে। কিন্তু করার কী আছে?···উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল কোনো দলের পক্ষেই ল্যাংকাশায়ারের ভোট বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়।"

২৮। ১৮৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি "বঙ্গবাসী"ও একই কথা লিখেছিল: "ভারতবর্ষের মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে, যেসব শিল্পের ক্ষেত্রে ইংরেজদের স্বার্থ কোনোভাবে জড়িত আছে এবং ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গে তার সংঘাতের সম্ভাবনা আছে, সেসব শিল্পকে কিছুতেই সরকার সাফল্যের সঙ্গে চালাতে দেবে না।"

২৯। একইভাবে ১৮৯৪-এর ৩০শে ডিসেম্বর "অরুণোদয়" জানিয়েছিল যে, সুতিবস্ত্র শুল্ক আইন পাশের ঘটনা "নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে সরকার ভারতীয় সুতাকলের উন্নতি চায় না!" বোম্বাই এর "নেটিভ প্রেস"-এর সংবাদদাতা লিখেছিল—সেই সপ্তাহে ভারতীয় সব সংবাদপত্র "ভারতের শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব লক্ষ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং হতাশা-ব্যাঞ্জক ভাষায় আবকারি আইন পাশ সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা ব্যক্ত করেছে।"

৩০। যেমন, ১৮৯৬-র ২-রা ফেব্রুয়ারি "দর্শক" এই বলে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল 'যে "ভ্রান্তপথে চালিত নীতি অনুসরণে তারা অটল থাকার ফলে ব্রিটিশ শাসনের ন্যায় ও সততা সম্পর্কে ভারতীয়দের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে!" এর আগে, ১৮৯৪ সালে, রাসবিহারী ঘোষ শাসকদের সাবধান করে বলেছিলেন যে শুল্ক নিয়ে তারা যেভাবে কসরৎ দেখাচ্ছেন তাতে "ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইংরেজদের সুনাম (যা সযত্নে সংরক্ষণীয়) বিপন্ন। এতকাল ধরে তারা বেয়োনেট কিংবা তরবারির থেকেও শক্তিশালী যে সম্মোহন শক্তির সাহায্যে প্রজাদের রাজানুগত করে রাখতে পেরেছিল, তা ভেঙ্গে পড়বার মত বিপদের সম্মুখীন" (বক্তৃতাবলী ১৫২-৩)।

শুধু ভারতীয়রাই সতর্ক করেননি ১৮৯৪ সালে একইরকম জোর দিয়ে জেনারেল জি চেস্নি জানিয়েছিলেন, "সম্প্রতি যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি বাতিল না-করলে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র ও বিশ্বাসযোগ্যতা এমন আঘাত পাবে যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, হয়তো দেবেও" (পৃ: ৩৪৭)। একইভাবে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ৬ জন সদস্যের অন্যতম স্যার এ আরবুথনট, যিনি ১৮৯৪ সালে সুতিদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক রদ করার বিরোধিতা করেছিলেন, একটি সভার কার্যবিবরণীতে ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত জটিল ব্যবস্থাটিতে একটি বিষয় সুনিশ্চিত, তা

হ'ল, ভারতের ও গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থের মধ্যে মৌলিক অভিন্নতা রয়েছে, এবং কোনো পদক্ষেপ যদি মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ হয় অথবা ব্রিটিশ শাসনের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাদের আস্থা টলিয়ে দেয়, তবে তাকে সাম্রাজ্যের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক বলা যাবে না।" (উকিল পৃঃ ৪২৭-এ উদ্ধৃত)।

৩১। ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬। দু-সপ্তাহ পরে, ১৮৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি "কেশরী" আবার লিখেছিল : "গত সোমবারের আগের সোমবার ভারত সরকার অন্যায় সুতি শুল্ক আইনটি পাশ করে সমগ্র বিশ্বের কাছে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তারা ভারত শাসন করছেন এদেশের মানুষের কল্যাণের জন্য নয়, অল্প কিছু ইংরেজ ব্যবসায়ীর স্বার্থে।"

৩২। ১৮৯৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা" ঘোষণা করেছিল : "ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা ম্যাঞ্চেস্টারের দাস, আর এখানকার সরকার ঐ মন্ত্রীসভার দাস।" এর আগে ১৮৯৪-এর ৩০শে ডিসেম্বর "অরুণোদয়" লিখেছিল : "ম্যাঞ্চেস্টারের মিল মালিকরা আমাদের প্রকৃত শাসক এবং ভারত বিষয়ক স্বরাষ্ট্র সচিবের মুখের কথাই আমাদের আইন।" পরের অভিযোগটির পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে ১৮৯৬ এর ১০ই ফেব্রুয়ারির "ভারত জীবন"-এ।

৩৩। দত্ত : "ভারতীয় রাজনীতি", পৃঃ ৫৩। একইভাবে ১৮৯৬-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি "কর্ণাটক প্রকাশিকা" লিখেছিল : "যা প্রয়োজন তা হ'ল, ভারতকে স্বদেশে ভারতীয়দের দ্বারাই শাসিত হতে হবে। (সেজন্য) কাউন্সিলকে বর্ধিত করে এদেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব মূলক করে তুলতে জনসাধারণকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।"

৩৪। গোখেল, "বক্তৃতাবলী", পৃঃ ৪১। ১৯০১ সালে আর সি দত্তও মন্তব্য করেছিলেন : "মানবপ্রকৃতিই হল এই রকম যে, কোনো জাতিই অন্য কোনো জাতির জন্য স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে চায় না" (বক্তৃতাবলী, II পৃঃ ১১৩)।

৩৫। এই দিকে জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টার সাফল্যের সাক্ষ্য কয়েক বছর পরই লোভাট ফ্রেজার-এর কথায় পাওয়া যায়। তিনি যা বলেছিলেন তা অনেকটা লোকমান্য তিলকের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি—

"আমার বিশ্বাস, এটিই একটি সমস্যা যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান, রাজপ্রেমিক ও নৈরাজ্যবাদী, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, মূক কর্মচারির দল, বেসরকারি ইউরোপীয়দের অধিকাংশ—এই সব সম্প্রদায়েরই অভিমত, ভারতের শুল্ক ব্যবস্থাকে ভারতের স্বার্থে ঢেলে সাজাতে হবে। এরা সবাই বিশ্বাস ক'রে, বর্তমানে ইংলন্ডের স্বার্থই প্রথম বিবেচিত হচ্ছে।" (পৃঃ ৩৩৯-৪০)

৩৬। বয়কট আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রঃ তৃতীয় অধ্যায়।

৩৭। তিলক এটা স্পষ্ট লক্ষ করেছিলেন। এ বিষয়ে ১৮৯৬-এর ৯ই ফেব্রুয়ারির "মারহাট্টা" দ্রঃ। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় বয়কটের আহবান প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—"ব্রিটেনের ন্যায়-পরায়ণতার ঐতিহ্য আর আমাদের সাহায্য করবে না। অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর সদিচ্ছাও সাহায্য করবে না। ভারতের সামনে একটিই পথ খোলা—তাকে নিজের সাহায্য নিজেকেই করতে হবে।"

৩৮। কার্জন, "বক্তৃতাবলী", I, পৃঃ ৬২। তিনি যোগ করেছিলেন : স্বরাষ্ট্র সচিবের অনুমোদন পেয়েও ঐকমত্যের ভিত্তিতে "আমরা নিজেদের উদ্যোগেই আমাদের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা ব্যবহার করছি ভারতকে বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত করতে"।

অর্থবিষয়ক সদস্য জেমস্ ওয়েস্টল্যান্ড আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন : "পুরোপুরি ভারতের স্বার্থে ও একমাত্র ভারতের প্রসঙ্গেই আমাদের এই আইন যদি বিশালসংখ্যক অধিবাসীর ভরণপোষণ অটুট রাখতে সহায়ক হয়, তাহলে আমার মনে হয় এই বিলের সমর্থনে সেটিকে একটি অতিরিক্ত যুক্তি হিসেবে কাউন্সিলের সামনে রাখতে পারব।"

৩৯। এম জি. রাণাডে, "ভারতের চিনি শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি"। ১৮৯৯ সালের মে জুন মাসে "টাইমস অব ইণ্ডিয়া"য় রাণাডে এই নামে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ডি জি.. কালের ভূমিকা-সহ তা প্রকাশিত হয়েছে (বোম্বাই)।

৪০। পি. এ. চারলু, LCP 1899, Vol. XXXVIII, পৃঃ ১০৪, ১৭৬ ৯ ; এবং দত্ত—টাইম ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে লেখা চিঠি, ৩১শে মার্চ ১৮৯৯-তে "ইণ্ডিয়া"য় পুনঃ প্রকাশিত।

৪১। ১৮৯৮ সালের ২২শে অগস্ট এটা করা হয়েছিল। এর তিন মাস পরে ১৮ই নভেম্বর অমৃতবাজার ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনির আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে। কয়েকদিন আগেই ১৪ই নভেম্বর এই পত্রিকা জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছিল বিদেশী চিনি কেনা থেকে বিরত থাকতে। এই প্রসঙ্গে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল যে যদি বিদেশী চিনি "খারাপ" বলে প্রচার করা যায় তাহলে হয়তো জনসাধারণকে রাজি করানো সম্ভব হবে।

একই সময়, ২০শে নভেম্বর, "হিন্দুস্থান, এবং ২৮শে নভেম্বর "ভারত জীবন" ও এই শুল্কের সমর্থনে লিখেছিল।

৪২। পি. মেহতা, বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৫৭০। মেহতার দ্ব্যর্থক বক্তব্যের জন্য কার্জন ঐ বিতর্কেই তাঁর বক্তৃতায় দাবি করেনঃ "মাননীয় শ্রীমেহতা অনুপুঙ্খ সমালোচনা উপস্থিত করলেও কখনই অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি, এবং আমি নিশ্চিত যে এই ব্যবস্থার মূলে যে নীতি তাতে তাঁর সম্মতি আছে" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৬১)। অন্যদিকে, ১৯০৬ সালে ডি ই. ওয়াচা "শুল্ক আরোপের সমর্থনে উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডনে" "বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন স্যার পি এম মেহতা' যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা করেছিলেন।

৪৩। রায়-এর মতে, আরেকটি কারণ, ইউ. কে ও ইউ এস এ তে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাংলা থেকে যে চিনি রপ্তানি হত তার পরিমান হ্রাস। পি মেহতাও একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেনঃ "এটা ঠিক যে দেশের কয়েকটি চিনি শোধনাগার বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এটা যে ভর্তুকি-প্রাপ্ত চিনি আমদানির ফলেই হয়েছে এবং সেটাই একমাত্র বা মূল কারণ, এ-ব্যাপারে আমি একেবারেই সুনিশ্চিত নই" (বক্তৃতাবলী, পৃ ৫৭০)।

৪৪। সংসদীয় দলিলটি (ব্লু বুক) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৯৮ সালের মে মাসের ভারত সরকারের একটি ডেসপ্যাচে আমদানিকৃত চিনি আখচাষকে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি, একথা জোর দিয়ে বলা হলেও, এবং সেজন্য সমতারক্ষাকারী শুল্ক আরোপ করতে অস্বীকার করলেও, স্বরাষ্ট্র সচিব দুবার (১৮৯৮-এর ২৫শে আগস্টের ডেসপ্যাচে এবং তারপরে আবার ১৮৯৯ এর ২৬শে জানুয়ারির ডেসপ্যাচে) ভারতে ভর্তুকি প্রাপ্ত চিনি আমদানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে মরিসাসের আখচাষীরা যে স্মারকলিপি দিয়েছিল তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভারত সরকারকে এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য এবং চাপও দিয়েছিলেন।

৪৫। সম্ভবত এইটি ছিল অনেকেরই মত। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় প্রেস-এর সংবাদদাতারা তাঁদের সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে এই বিষয়টির উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেননি।

হয়তো তাঁরা মনে করেছিলেন, সরকারের কাজের সমর্থনের উল্লেখের ফলে এই বিষয়টিও এসে গেছে। সাধারণভাবে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধী "দ্য গুজরাতি" ১৮৯৯ সালের ১৪ই মে সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদপত্রে যে আস্থা প্রকাশ করা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছিল। ওয়াচাও ১৯০৬ সালে এই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ১৭৩)।

৪৬। ২৪শে মার্চ, ১৮৯৯-এর "সময়" থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে এই মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়ঃ "মহামান্য লর্ড (কার্জন) বিলটি পাশ করার সময় যে মহত্ত্ব, প্রজাদের সম্পর্কে সংবেদনশীলতা এবং সর্বোপরি কর্তব্যবোধের নিদর্শন উপস্থিত করেছেন, তাতে তিনি প্রতিটি ভারতবাসীর গৃহে পূজিত হবেন।"

৪৭। ১৮৯৯ সালের ১৪ই মে "গুজরাতি" লিখেছিল, ভারত সরকার ও স্বরাষ্ট্র সচিবের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় "কতৃত্বসম্পন্ন চেম্বারলেন (উপনিবেশ সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র সচিব) বিজয়লাভ করেছেন এবং যথেষ্ট পরিবর্তনশীল হ্যাতিয়ারের সাহায্যে গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে পুরোপুরি বোকা বানিয়েছেন।"

৪৮। ১৯০২-এর ২১শে এপ্রিল "নিউ ইণ্ডিয়া"-য় বিপিনচন্দ্র পাল খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন যে ১৮৯৯ সালে তিনি চিনির উপর আমদানি শুল্ক আরোপ সমর্থন করেন—যদিও জানতেন যে ভারতের উপকারার্থে এই শুল্ক আরোপ করা হয়নি, তা করা হয়েছিল মরিসাসের ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে—কারণ তিনি একে একটি নতুন নীতি, "মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্কে গোঁড়ামি থেকে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন" হিসেবে, দেখেছিলেন।

ভারত সরকারও এই ধারণার প্রসারে উৎসাহ যুগিয়েছিল। চিনির উপর শুল্ক আরোপের প্রস্তাব উত্থাপন করে জেমস ওয়েস্টল্যাণ্ড ঘোষণা করেছিলেনঃ "আমি শুল্ক ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার প্রস্তাব করছি।" প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে লর্ড কার্জন শিল্পেঅনুন্নত দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে সুন্দর যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৬৩ ৬৪)।

৪৯। "কেশরী" একই সঙ্গে পাঠকদের সাবধান করে লিখেছিলঃ "যে সরকার ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থে এদেশের সুতীশিল্পকে পঙ্গু করে দিতে দ্বিধান্বিত নয়, তা ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ যোগাবে, এই প্রত্যাশা সমুদ্রের জল থেকে চিনি পাওয়ার প্রত্যাশার মত অমূলক।"

৫০। নিউ ইণ্ডিয়া, ২১শে এপ্রিল, ১৯০২; সঞ্জীবনী, ১২ই জুন, ১৯০২।

৫১। উল্লেখযোগ্য যে, অনেক আগে, ১৮৮১ সালের ২৮শে আগস্ট, "মাহরাট্টা" ভারতীয় শিল্পের স্বার্থে যন্ত্রপাতি আমদানির উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছিল।

৫২। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে ডি. ই. ওয়াচা এই শুল্ককে "বর্বরোচিত" ও "মধ্যযুগীয় অর্থ-নীতির পুরো নিদর্শন" বলে বর্ণনা করেন। এর আগে, ১৮৮৮-র ৩-রা জুন "মাহরাট্টা" "যেভাবে বর্বরোচিত কায়দায় পণ্যের উপর চিহ্ন আরোপ করা হচ্ছে" তার তীব্র নিন্দা করে। ঐ বছরই ৩-রা জুন "ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর" একে "বর্বর শুল্ক" এবং "রাজস্বের জুলুম" আখ্যা দিয়েছিল।

৭

মুদ্রা ও বিনিময়

আমাদের আলোচ্য সময়ে ভারত সরকারের আর্থিক নীতির ব্যাপারে উত্থাপিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল ১৮৯৩ সালের মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন। ঐ বছর টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ও রৌপ্য মুদ্রার অবাধ প্রচলন হয়েছিল। আধুনিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় মুদ্রা ও বিনিময় যে অনিবার্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে তার কারণ, মুদ্রা ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আনা হয়েছিল টাকা মুদ্রা হিসেবে অযোগ্য বলে নয়, অর্থাৎ টাকার যোগানে বাহুল্য বা ঘাটতির জন্য নয়। পাউন্ড স্টারলিং এর সঙ্গে টাকার বিনিময় মূল্যের দ্রুত অবনতির ফলে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার থেকে রেহাই পাওয়াটাই ছিল সরকারি ব্যবস্থা একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করতে পারে, সেটা একবারও ভেবে দেখা হয়নি।

"মুদ্রা-ব্যবস্থা" বাস্তবিকই বিষয় হিসাবে এতো বিশাল যে এখানে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। বিনিময়ের ব্যাপারটিও খুব একটা সহজ বিষয় নয়। এই বিষয় দুটির সামগ্রিক আলোচনায় আমরা আপাতত যাচ্ছি না। মুদ্রা ও বিনিময়ের পরিবর্তন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্প, আর্থ-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপর কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে সরকার ও দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বিতর্কের এটাই ছিল কেন্দ্র-বিন্দু। এই বিতর্ককে ঘিরে দেশের মানুষের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী অনুভূতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। সে কারণে, এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত মুদ্রা ও বিনিময়ের এই বিশেষ দিকটির মধ্যেই সীমিত থাকবে।

১. সরকারি মুদ্রা-নীতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে ভারত সরকারের মুদ্রানীতির বিস্তারিত আলোচনা আছে ১৮৯৩ ও ১৮৯৮ সালের "ইন্ডিয়ান কারেন্সি কমিটি"র

রিপোর্টে এবং এই বিষয়ে একাধিক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে। সুতরাং, আলোচ্য সময়ে ভারতের মুদ্রা ও বিনিময় জগতে যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত' বিবরনই যথেষ্ট হবে।

১৮৩৫ সালের এ্যাক্ট XVII-র বলে ভারতীয় মুদ্রায় রৌপ্যমান কার্যকর হয়। এরপর ১৮৭০ সালের মুদ্রা আইনে সরকারকে রৌপ্য পিণ্ডের বিনিময়ে টাকা ছাপানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা ভারতীয় মুদ্রাকে "স্বাভাবিক" করেছিল— অর্থাৎ টাকার মূল্য তখন থেকে নির্ধারিত হয়েছে রূপার বাজার দরের ভিত্তিতে। যেসব দেশ স্বর্ণমাণ অনুসরণ করছিল তাদের সঙ্গে বিনিময়ের হার নির্ভর করত রূপার স্বর্ণমূল্যের উপর। রূপার স্বর্ণমূল্য যেহেতু ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত কম-বেশি স্থির ছিল, ঐ সময়ে টাকার বিনিময় মূল্যও ২ শিঃ-এর কাছাকাছি অপরিবর্তিত থেকেছে। কিন্তু ১৮৭৩ সালে একটা বড় পরিবর্তন দেখা গেল। রূপার স্বর্ণমূল্য পৃথিবী জুড়ে কমতে শুরু করল (কারণগুলির মধ্যে আমরা আপাতত যাব না, কেননা সেগুলো সব ভারতের বাইরের), ফলে যে টাকা এতদিন রূপার বিনিময়ে অবাধে ছাপানোর যোগ্য ছিল তার মূল্য স্বর্ণমান-ভিত্তিক মুদ্রাগুলির তুলনায় হ্রাস পেতে লাগল। অন্যভাবে বললে স্বর্ণমান অনুসরনকারী দেশগুলির মুদ্রার সঙ্গে ভারতের টাকার বিনিময় মূল্য কমতে আরম্ভ করল। সে সময় ইংলণ্ডের মুদ্রা ছিল স্বর্ণমান-ভিত্তিক। এর ফলে ১৮৭২ সালে যেখানে ভারতীয় টাকা প্রায় ২ শি.এর সমান ছিল, ১৮৯৩-৯৪এ তার মূল্য দাঁড়াল ১৪.৫৪ পে.।

ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যের এই ঐতিহাসিক অবনতি বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা ও আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম অভিযোগ, এতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষত আমদানি বাণিজ্য দারুণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা অনুভব করেছিলেন যে টাকার স্টারলিং-মূল্যের ভয়ংকর ওঠা-নামা ভারত-ইংলণ্ড বাণিজ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আরও অভিযোগ উঠল, বিনিময় মূল্যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ জুয়া এবং ফাটকাবাজি হয়ে উঠেছিল।[১] বিনিময় মূল্যের অবনমনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত সামরিক ও অসামরিক ইংরেজ কর্মচারিরা আর একটি অভিযোগ করেছিল। বেতন দেওয়া হচ্ছিল টাকায় অথচ পরিবারের ভরণ-পোষণ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বাবদ তাদের যে ব্যয় নির্বাহ করতে হত তার অধিকাংশই স্টারলিং-এ, আর তার ফলে তাদের ভীষণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল, কেননা একই পরিমান স্টারলিং মুদ্রার জন্য অনেক বেশী টাকা দিতে হচ্ছিল।[২] অবনমনের আর একটি স্পষ্ট কুফলের কথা বলা হয়েছিল। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ মূলধনের প্রবেশ নিরুৎসাহিত ও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এটা হয়েছিল মুনাফা, সুদ এবং আসল মূলধনের স্বর্ণমূল্য

অনিশ্চিত বা অবনমিত হওয়ার জন্য। এবং এতে বিশেষ করে "আশু প্রয়োজনীয়" রেল-ব্যবস্থার প্রসারণ ব্যাহত হচ্ছিল।[৩]

তবে বিনিময় মূল্যের অবনমনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আপত্তি এসেছিল ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। কেননা এর ফলে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছিল। ভারত সরকারের অবস্থাটা ছিল অদ্ভুত। সরকার রাজস্ব আদায় করত রুপায় কিন্তু তার ব্যয়ের একটা বড় অংশ বিশেষত স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যয় (home charges) করতে হোত সোনার মাধ্যমে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত রুপার স্বর্ণমূল্যের ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর তার স্টারলিং দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য আরো বেশি বেশি পরিমাণে টাকা দিতে হচ্ছিল। এর উপর প্রতি বছরই এই দায়ের পরিমাণ বাড়ছিল বলে অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। এই ভাবেই বিনিময়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অন্যভাবে বললে ঃ ''সরকারকে এখন একটি বিশেষ বছরে যে পরিমাণ টাকা দিতে হচ্ছিল আর টাকার বিনিময় মূল্য ২ শি. থাকলে যত দিতে হোত—এই দুই এর পার্থক্য বর্তমাণ বিনিময় ব্যবস্থায় ভারত সরকারের ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ। "দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৯৪-৯৫ সালে ১৫.৭৭ মিলিয়ন "হোম চার্জেস" বাবদ ভারত সরকারকে দিতে হয়েছিল ২৮.৯ কোটি টাকা। ১৮৭২-৭৩ সালের বিনিময় হার কার্যকরি থাকলে এই দেয় অর্থের পরিমাণ হোত মাত্র ১৬.৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি বিনিময় হারে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল এই তফাৎটা—১২.৩ কোটি টাকা। এটা সরকারের সংশ্লিষ্ট বৎসরে ভূমি রাজস্ব বাবদ মোট যা আয় হয়েছিল তার অর্ধেকেরও বেশী. এটা মনে রাখলে পরিস্থিতির গুরুত্ব কতটা ছিল তা সহজই অনুমেয়।

১৮৭৫ থেকে ১৮৯৮ এই কটি বছরে বিনিময় হারের অবনমনের ফলে মোট ক্ষতির অংক দাঁড়িয়েছিল ১৫৪ কোটি টাকা। ১৮৯৪ সালে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। এই বিপুল ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারকে বছরের পর বছর আরও বেশি বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে ছাঁটাই ও কর বৃদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পদ্ধতি হিসেবে প্রথমটিকে বিশেষ কার্যকর করা যায় নি। সত্যি বলতে কি এই সময়ে সরকারের ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েই গিয়েছিল। সুতরাং বাধ্য হয়ে সরকারকে এমন সব ব্যবস্থা নিতে হোল যা আদৌ জনপ্রিয় নয়—যেমন লবন কর ও আয়কর আরোপ কিংবা ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি। কিন্তু একটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশে কর চাপিয়ে আয়বৃদ্ধির সুযোগ স্পষ্টতই অত্যন্ত সীমিত। কৃষকের উপর অন্যায় করের বোঝা চাপালে অত্যন্ত 'বড় ধরণের' রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষত, যখন এই নতুন কর চাপছে "বিদেশীশাসনের ফলে এবং দেশের বাইরে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ভার মেটানোর তাগিদে।"

এ ছাড়া, বিনিময়ের হারের আকস্মিক ভয়ানক ওঠা-নামার ফলেও ভারত সরকারকে ভীষণ আর্থিক অনিশ্চয়তা ও অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সরকারের অর্থ-সংক্রান্ত যাবতীয় হিসেব-নিকেশ ও আর্থিক ব্যবস্থাদি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল, এবং কার্যত ভারতীয় বাজেট পরিণত হয়েছিল "বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ে জুয়াখেলায়"। প্রায় পঁচিশ বছর টাকার স্বর্ণমূল্যের এই অবনমন ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের একটি দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে ফিরছিল। তারা বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করতে লাগল কীভাবে একটি সুষম বাজেট তৈরি করা যায়। তাদের মনে হয়েছিল সরকারের কাছে কেবল দুটো মাত্র পথই খোলা - হয় বিনিময় হারের অবনমন রোধ করতে হবে, নয়তো অতিরিক্ত কর বৃদ্ধির মত অপ্রিয় কাজ করতে হবে, এ ছাড়া বাঁচবার আর উপায় ছিল না।

এই সময় ভারত সরকার বিনিময়ের অবনমন রোধ করার চেষ্টায় পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে। বহুদিন ধরে সরকার এই আশাকে লালন করেছিল যে সোনা ও রুপার আপেক্ষিক মূল্য স্থির করার প্রয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক দ্বিধাতব চুক্তির সম্ভাবনা হয়ত বাস্তব হয়ে উঠবে। কিন্তু ১৮৯২ সালে ব্রাসেলস সম্মেলনে যখন এরকম একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো সরকার তখন মুদ্রামান রুপা থেকে সোনার ভিত্তিতে নির্ণয় করার প্রস্তাবটিকে বিবেচনা করতে শুরু করল। এই প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য চেম্বার অব কমার্সগুলির মাধ্যমে সংগঠিত বণিক সম্প্রদায়ও সরকারকে চাপ দিচ্ছিল। এর সঙ্গে ছিল সম্প্রতি স্থাপিত ইণ্ডিয়ান কারেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের চাপ।[৪] ফলত সরকারি প্রস্তাব সমেত মুদ্রা-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি তৎকালীন লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড হার্শচেল-এর সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হলো।

এই কমিটির সুপারিশ মত ভারত সরকার ১৮৯৩ সালের ২৬ শে জুন এ্যাক্ট নং VIII, ১৮৯৩ পাশ করে, যাতে ভারতীয় টাঁকশাল থেকে ব্যক্তিগত নামে রুপার অবাধ মুদ্রায়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সরকার একটি নোটিশ জারি করে স্থির করে দেয়, টাকার বিনিময় হার হবে ১ শি ৪ পে, এই হারে জনসাধারণকে স্বর্ণমুদ্রা এবং স্বর্ণপিণ্ডের বিনিময়ে টাকা বা কাগজী মুদ্রা যোগান দেওয়া হবে, এবং জনসাধারণের কাছ থেকে পাওনা টাকা এক বা আধা স্বর্ণ গিনিতে গ্রহণ করা হবে। স্বল্পকাল পরেই দেশে যে স্বর্ণমান প্রবর্তিত হয়েছিল, এই দুই ব্যবস্থা ছিল তার প্রথমে পদক্ষেপ।

১৮৯৩ সালের এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টাকার স্বর্ণমূল্য বাড়িয়ে ১ শি. ৪ পে. করে টাকার পরিমান কমিয়ে আনা। এইভাবে টাকার মূল্যকে তার ধাতুমূল্য (একটি মুদ্রায় যে পরিমাণ রুপা থাকে তার মূল্য) থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাড়িয়ে দেওয়া হোল। যার ফলে টাকা স্বাভাবিক মূল্য বা ধাতু মূল্যের বদলে

কৃত্রিম এবং বাঁধিত মূল্য প্রাপ্ত হোল। এতে টাকার ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার অথবা, একটু ঘুরিয়ে বললে, আভ্যন্তরীণ মুদ্রা সংকোচনের ফলে, দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের বাজারে দর কমে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কিছুদিন পর, ১৮৯৪ সালে, টাকার বিনিময় হার আরও কমে ১ শি ১ পে.-এ দাঁড়ালে সরকারি মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য সফল হোল এবং টাকার মূল্য বাড়তে শুরু করল। ১৮৯৮-৯ মাস নাগাদ রূপার মূল্য কমতে থাকা সত্ত্বেও টাকার বিনিময় হার বেড়ে প্রায় ১ শি ৪ পে -এর কাছাকাছি পেঁাছেছিল। ভারত সরকার তখন অনুভব করলেন যে ১৮৯৩ সালের নীতিটিকে তার যুক্তিসম্মত পরিণতির লক্ষ্যে চালিত করার সময় এসে গেছে। বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার জন্য স্যার হেনরী ফাউলারকে চেয়ারম্যান করে আর একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। ঐ কমিটি স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন সুপারিশ করল, এবং এই লক্ষ্যে পেঁাছবার জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবমত ১৮৯৯ সালে টাকার মূল্য ১ শি ৪ পে -এ (এ্যাক্ট XXII বলে) বেঁধে দেওয়া হ'ল এবং গিনি ও অর্ধ-গিনিকে আইনগ্রাহ্য মুদ্রার স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। ফলে টাকা পরিণত হোল নিদর্শন মুদ্রায়। যদিও অসীম বৈধ মুদ্রা হিসেবে তখনও টাকার স্বীকৃতি রয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার পরবর্তীকালের ইতিহাস এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক, সেজন্য আপাতত এখানেই নিবৃত্ত হব। শুধু পরবর্তী কালের দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন হবে। এক, শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে মুদ্রা ব্যবস্থাটি প্রচলিত হয়েছিল সেটি স্বর্ণমান বা স্বর্ণমুদ্রা নির্ভর নয়, আসলে স্বর্ণ-বিনিময়-মান-ভিত্তিক ব্যবস্থা।[৫] দুই, ভারতের আর্থিক ইতিহাসে একটি নতুন স্থিতিশীল বিনিময় হার ও বাজেটীয় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির যুগের সূচনা হ'ল। অবশ্য টাকশাল বন্ধ করে দেওয়ার বা টাকার আপেক্ষিক প্রাচুর্যের অবসানের জন্য এটা হয় নি। বস্তুত অল্প কিছুদিন পর থেকেই আবার এত ব্যাপক আকারে টাকা ছাপা শুরু হয়েছিল যে জে এম. কেইনস্‌কে মন্তব্য করতে হয়েছিল, "সরকার ভয়াবহভাবে টাকা ছাপার রাস্তা নিয়েছে।"[৬] অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় নেতারাও টাকার বিপুল যোগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করেছিলেন। আসলে টাকার স্বর্ণমূল্য যে স্থির রাখা সম্ভব হয়েছিল সেটা "সম্পূর্ণই প্রশাসনিক ব্যবস্থার কৃতিত্ব", যেগুলো গ্রহণ করতে সরকার "কখনই বাধ্য ছিল না।"

২. ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

টাকার স্বর্ণমূল্যের ক্রমাবনতির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া প্রথমে খুব বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল ছিল। বহু জাতীয়তাবাদী নেতা

বিনিময় মূল্যের এই অবনমনের সমালোচনা করেছিলেন এবং একে জাতীয় জীবনে বিরাট বিপর্যয় বলে গণ্য করেছিলেন ; বিশেষ করে যখন অবনমন-জনিত ক্ষতি-পূরণের উদ্দেশ্যে নতুন কর চাপানো হয়েছিল।[৭] কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই সমস্যাটির সামগ্রিক ফলাফল সম্পর্কে দীর্ঘদিন অজ্ঞ ছিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তা বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করেননি। অবশ্য অল্প-সংখ্যক কিছু নেতা ছিলেন যারা এই ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তার অংশীদার হননি। উত্তর কালের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সংক্ষেপে তাঁদের পূর্বসূরী ঐসব সমালোচকদের মতামত আলোচনা করা হবে প্রথম বছরগুলিতে সঠিকভাবে বললে, ১৮৯২ সাল পর্যন্ত —অধিকাংশ ভারতীয় নেতাই তাদের প্রতিক্রিয়াকে কতকগুলি অস্পষ্ট মন্তব্য ও উপদেশের মধ্যে সীমিত রেখেছিলেন। যেমন—(ক) বিদেশে প্রেরিত ব্যয় সংকোচন ; (খ) স্বর্ণদায়কে রৌপ্যদায়ে রূপান্তরিত করা ;[৮] এবং (গ) আন্ত-র্জাতিক স্তরে দ্বিধাতব মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন। এঁদের কেউ কেউ এমন কি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রবর্তনের এবং বেসরকারি ফাটকাবাজদের অবাধে মুদ্রানির্মাণ বন্ধের পক্ষেও সুপারিশ করেন। বিচারপতি রাণাডে স্থিতাবস্থার নীতি সমর্থন করে ঘোষণা করেছিলেন : "মুদ্রাব্যবস্থাকে এই রকম স্বার্থ-প্রনোদিত উপায়ে ব্যবহার করার লোভকে অবশ্যই সংবরণ করতে হবে, কেননা এর ফলে বিশ্বাসভঙ্গ করা হয় এবং রৌপ্য মূল্যের অবনমন এবং বিনিময় হারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে যায়।"

৩. মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ

১৮৯২ সালে যখন বৃটিশ বণিক ও কর্মচারীদের বিক্ষোভ মুদ্রা ও বিনিময়-সংক্রান্ত সমস্যাটির গুরুত্ব অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল, কেবল তখনই এ ব্যাপারে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অমনোযোগ ও উদাসীনতার অবসান ঘটেছিল। ভারতের নেতৃবৃন্দ তখন এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম মুখপাত্র ডি. ই. ওয়াচা ১৮৯২ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে "তাঁর নিজের এই বিষয়টি" সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর মতে, মুদ্রা সমস্যার সঠিক সমাধানের উপরই "আমাদের মতো একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির দেশে অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।"

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তখন টাকার ক্রমহ্রাসমান স্বর্ণ-মূল্যের সপক্ষে লড়াই-এর দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। যার জন্য, তাঁরা ১৮৯৩ এবং ১৮৯৯ সালে কারেন্সি অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরেও বিনিময় হার কমার ঘটনার সপ্রশংসে উল্লেখ করেন, এবং তার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। ১৮৯৩ সালের কারেন্সি অ্যাক্ট-এর আগে ও পরে মুদ্রা ও বিনিময়ের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের এই বক্তব্য

আশ্চর্যজনকভাবে অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। সেজন্য এই বই-এ তার পর্যালোচনা এক সাথে করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদীরা শুরুতেই একটি বিশ্বাসকে অবলম্বন করে এগিয়েছিলেন, তা হোল, বিনিময়ের স্থিতিশীলতা মূল কথা নয়, টাকার সঙ্গে সোনার বিনিময়ের হারের প্রশ্নটিই আসল ব্যাপার। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনে হয়েছিল, যারা উচ্চ বিনিময় হারের পক্ষে বলছিলেন তারা নিজের নিজের কথাই শুধু ভেবেছেন। সরকার চেয়েছে বিনিময় হারের অবনমনের ফলে স্টার্লিং এ পাওনা মেটাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা, তা এড়িয়ে যেতে; সরকারী কর্মচারিরা চেয়েছে ইংল্যাণ্ডে আরো বেশি পরিমানে অর্থ পাঠাতে; এবং ইউরোপীয় পণ্য যারা আমদানি করত তাদের বাসনা ছিল কম মুনাফাতেই ব্যবসা করা, কেননা অন্যথায় ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। আর এসব কারণেই এরা সবাই একটি 'স্বার্থপর ও নির্লজ্জ" আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ভারতীয় নেতারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করলেন, এইসব বিদেশী বণিক, বিদেশী পুঁজি এবং বিদেশি কর্মচারীদের স্বার্থকে কিছুতেই এ দেশের স্বার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। এমনকি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের স্বার্থও অভিন্ন নয়। কাজেই এই প্রশ্নে এদেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থই একমাত্র বিবেচ্য হওয়া উচিত।[৯] এবং এই একটিমাত্র মাপকাঠির ভিত্তিতেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রৌপ্যমান বর্জন, টাঁকশাল বন্ধ করা, এবং স্বর্ণমান প্রচলনের দাবিতে ১৮৯২ সালে ইন্ডিয়ান কারেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে যে আন্দোলনে হয়েছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানান। এগুলির ফলে টাকার মূল্যের কৃত্রিম বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। ১৮৯২ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে এই বিরোধিতাই নরম সুরে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত একটি বিষয় লক্ষণীয়, মুদ্রা ও বিনিময় প্রশ্নে ভারতের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে ভারতের সরকারি কর্তৃপক্ষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবজ্ঞা ও ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯২ সালে ২১ শে জুন স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরকারি কর্তৃপক্ষ একটা রিপোর্ট পাঠায়, যাতে বলা হয়েছিলঃ "ভারতে জনমত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাগ্রণের পক্ষে যথেষ্ট তৈরি, এবং সাধারণভাবে সকলেই চায় রৌপ্যমুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল হোক।'

ভারতীয় জনমত সম্পর্কে সরকারের ধারণা যে ভুল ছিল তা আরেকবার বোঝা গেল যখন ১৮৯৩ সালে ভারতীয় টাঁকশালগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুলি সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কম-বেশি একইভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সরকারের নিন্দা করে, কারণ এই ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণ বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষি এবং শিল্পের স্বার্থের পরিপন্থী।[১১] ঐ বছরেরই শেষের দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সরকারি পদক্ষেপের নিন্দা করে একটি

প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে গিয়ে ডি. ই. ওয়াচা ১৮৯৩-এর মুদ্রা আইনকে "অন্ধকারে বেপরোয়া লাফ দেওয়া" এবং "একটি ভয়ংকর ও ক্ষমার অযোগ্য ভুল" বলে অভিহিত করেন। ১৮৯৮ সালে যখন ভারত সরকার টাকার স্বর্ণমান ১ শি. ৪ পে স্থির করে দেয় তখন আর একবার ওয়াচা "১৮৯৩ সালের জঘন্য অপরাধের" নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। দাদাভাই নৌরজিও টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটিকে "বেআইনী, অসম্মানজনক ও স্বৈরাচারী" বলে অভিহিত করেছিলেন এবং স্বর্ণমান বর্জনের দাবি জানিয়ে ছিলেন। আর সি. দত্ত টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার সরকারি চেষ্টাকে "অস্বাভাবিক, বেপরোয়া ও বিপজ্জনক" আখ্যা দেন, এবং স্বর্ণমান গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও আর-একবার "কৃত্রিমভাবে" আভ্যন্তরীণ মুদ্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা সঙ্কোচন করে বিনিময়জনিত এই ক্ষতির মোকাবিলা করার পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে। ডি. ই. ওয়াচা আগের মতনই ১৮৯৩ সালের মুদ্রা আইনকে "সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষ-ভাবে বাঙ্ক ও বণিক সম্প্রদায়ের বিরামহীন অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মূল কারণ বলে" দায়ী করেছিলেন। নৌরোজি, দত্ত এবং অন্যান্য সকলে টাঁকশালগুলি অবিলম্বে খোলা এবং টাকাকে রৌপ্যমানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য যে ফাউলার কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে ভারতের জাতীয় স্বার্থের একজনও প্রতিনিধি ছিলেন না: সেটিও ভারতীয় নেতাদের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল।[১২] এই কমিটির সুপারিশ ক্রমে এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৯৯ সালে যে মুদ্রা আইন চালু হ'ল ভারতীয় নেতারা আবার তার সমালোচনা করেছিলেন। তবে সমালোচনার ধার আগের মত ছিল না। খুব সম্ভব এই কারণে যে, মুদ্রাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি ততদিনে একটি স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তবু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখনও এবং তার পরে অনেক বছর বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। ১৯০১ সালের ১৭তম অধিবেশনে ১৮৯৩ সালের মুদ্রা আইনের—যার বলে ভারতীয় টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল—বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পুনরায় নথিভুক্ত হয়েছিল। একই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৮তম অধিবেশনেও। নেতৃস্থানীয় অনেকেই এর পরেও বহু বছর ধরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে টাকার কৃত্রিম মূল্য-বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখে এসেছেন।[১৩]

ভারত সরকারের মুদ্রানীতি জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন যে পায়নি তার কারণ মূলতঃ তিনটি: (১) টাকার মূল্যের অবনমনের সুফল; (২) মুদ্রাব্যবস্থাই যে সরকার ও জনগণের আর্থিক সংকটের মূলে—এমন চিন্তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব; (৩) সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর টাকার

মূল্যবৃদ্ধির কুফল। এই কারণগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা এবার যাব, কেননা তা আমাদের আলোচ্য সময়ে জাতীয় নেতৃত্বের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানগুলিকে বুঝতে সহায়ক হবে।

৪. নিম্ন বিনিময় হারের সুফল :

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই বিশ্বাস করতেন, ১৮৭৩ সাল থেকে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি দেখে মনে হয় যে রৌপ্যমান ও টাকার মূল্যের অবনমন ভারতীয় অর্থনীতিকে যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে উপকৃত করেছে, এবং ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মুদ্রামানগুলির মধ্যে রৌপ্যমানই উৎকৃষ্ট।[১৪] তাঁদের মনে হয়েছিল, বিনিময়ের নিম্নহারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সুফল দেখা গেছে তা হ'ল, এর ফলে ভারতীয় শিল্প, বিশেষত বস্ত্রশিল্প, উৎসাহিত বোধ করেছে। কেননা এই শিল্প পরোক্ষভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল বিনিময়ের নিম্নহারের জন্য বিদেশজাত পণ্যাদির দাম তুলনায় অনেকটা বেড়ে যাওয়ার ফলে। 'মাহরাট্টা' ১৮৯২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর লিখেছিল : "এই নয়া বিনিময় আইন অনেকটা বৃটিশ পণ্যের উপরে আমদানি করের মতো ·· ভারত সরকার যা সর্বদা প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, এই নতুন বিনিময় আইন শেষ পর্যন্ত সেটাকেই সম্ভব করে তুলল'।[১৫] ১৮৮৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 'হিন্দু' পত্রিকা এমনকি এটাও উল্লেখ করে যে নিম্ন বিনিময় হার ভারতকে চীন ও জাপানের বাজার বৃটিশ কাপড় কল মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে সাহায্য করেছে।[১৬] পি. সি. রায় এই পরিস্থিতির আর একটি সুফল লক্ষ্য করেছিলেন। "ভারতে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ আর তেমন লাভজনক না হওয়ায়" দেশীয় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের সুযোগ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।[১৭]

আশ্চর্যের বিষয়, জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু তাদের টাকাকে রৌপ্যমানভিত্তিক করার দাবির সমর্থনে একবারও বলেননি যে নিম্ন বিনিময় হারের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পণ্যের দাম কমে গিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। অথচ রৌপ্যমানের দাবির সপক্ষে এটা ছিল অন্যতম যুক্তি। বরং বাস্তবে কিছু ভারতীয় নেতা টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে যে রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটাকেই অস্বীকার করেছিলেন। এ-ব্যাপারে রমেশচন্দ্র দত্তব্য তিক্রম। তিনিই, কিঞ্চিৎ অস্পষ্টভাবে হলেও, বুঝতে পেরেছিলেন যে, "রৌপ্য-মূল্যের অবনমনের ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি না হয়ে বরঞ্চ কিছুটা উপকারই হয়েছে"। কিন্তু মোটামুটিভাবে জাতীয় নেতাদের ব্যাপক অংশেরই প্রবণতা ছিল কাঁচামাল রপ্তানিকে ভালো চোখে না দেখার। সাধারণভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তাদের বিরূপ মনোভাবের সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এর থেকে এই ধারণাটি আরো জোরদার হয় যে, টাকার অবনমনকে সমর্থন করার পেছনে বণিকশ্রেণী

বা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি তাদের সহানুভূতি মূল কারণ ছিলো না। ভারতীয় কৃষক বিক্রীত পণ্যের বিনিময়ে আরো বেশি টাকা পাচ্ছে আর তার ফলে উপকৃত হচ্ছে এই দাবিটিও মেনে নিতে তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে, ভারতে কৃষিজ পণ্যের দাম তো বাড়েই নি বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে আরো কমে গিয়েছিল।

৫. ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় বিনিময় মূল্যের ভূমিকা :

মুদ্রানীতি পরিবর্তনে জাতীয় নেতৃত্ব যে বিরোধিতা করেছিলেন তার আর একটি কারণ ছিল। ভারত সরকারের আর্থিক দুর্দশার মূলে টাকার স্বর্ণমূল্যের অবনতি —এ ধারণাকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেছেন। বিনিময়ে ক্ষতির ফলে ভারতের কোষাগার যে শূন্য হয়ে গিয়েছে, তা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, এবং তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশও করেছেন, কিন্তু তা এই কারণে যে বিনিময়ের অবনতি-জনিত ক্ষতির সম্পূর্ণ দায় শেষ পর্যন্ত বহন করতে হবে ভারতীয় করদাতাদেরই। সেজন্য তাঁরা এই প্রক্রিয়ার নিবৃত্তি চেয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে দাদাভাই নৌরজি বিনিময়-জনিত এই ক্ষতিকে "বৃটিশ-ইন্ডিয়ার পক্ষে ভয়ংকর" বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেন, এই ক্ষতি ভারতীয় জনসাধারণের উপর একটি নিদারুণ বোঝাস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "অত্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণকে 'হোম চার্জেস' বাবদ এতদিন টাকায় ২ শি হারে ১৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে পাঠাতে হচ্ছিল, এখন বিনিময় হার অবনমনের ফলে টাকা ১ শি ৪ পে. হওয়ায় আরো অতিরিক্ত প্রায় ৭ কোটি টাকার পণ্য বিদেশে পাঠাতে হবে।"[১৮] ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ও সরকারি বক্তব্যের মধ্যে মিল ছিল এইটুকুই। কিন্তু বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিবিধান সম্পর্কে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতেন। টাকার স্বর্নমূল্যের অবনতির ফলে বাণিজ্য ঘাটতি সংকটের কারণ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এটা মনে করতেন না। তাঁদের মতে, সংকটের কারণ ছিল অন্যত্র। মুদ্রানীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে অসামান্য ঐক্য ও সংহতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রোগের প্রকৃতি নির্ণয় এবং চিকিৎসার বিধানই ছিল তাঁদের বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

এই সংকটের মূল কারণ বিনিময়-হার নয়, ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডের অর্থ-নৈতিক সম্পর্কই এর জন্য দায়ী। নিম্ন বিনিময়-হারের জন্য বাণিজ্যে ঘাটতি হয়নি। তা ক্রমাগত বেড়েছে স্বরাষ্ট্র মাসুলের (হোম চার্জেস) এর জন্য। বাধ্যতামূলকভাবে ইংলন্ডে সোনা পাঠাতে না হলে টাকার স্বর্ণমাণের অবনমন সম্ভবত ভারত সরকার বা ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক ভবিষ্যৎকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারত না। এবং সেজন্যই যতদিন স্বরাষ্ট্র মাসুল (হোম

চার্জেস) দিতে হবে, ততদিন নিছক মুদ্রানীতি পরিবর্তন করে কোন সুরাহা হবে না।

অনেক ভারতীয় মুখপাত্রই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ল্যাসিকাল আর্থিক তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, "আর্থিক ব্যবস্থা এমনভাবে কাজ করে যাতে একটি দেশের বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই ভারসাম্যের অবস্থায় উপনীত হওয়ার দিকে ঝোঁকে।" সেজন্য তাঁরা বারবার জোর দিয়ে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, স্বরাষ্ট্র ব্যয়ের (হোম চার্জেস) জন্য ক্ষতি না হলে শুধু টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের জন্য ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হত না, কেননা সেক্ষেত্রে তা মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বাজারের পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিত।" কোনো কোনো ভারতীয় নেতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, বিদেশে দীর্ঘদিন যাবং ক্রমাগত অর্থ প্রেরণের প্রয়োজনে সরকার বাধ্য হয়েছে যে কোন মূল্যে সোনা কিনতে, যার ফলে রৌপ্য-মূল্যের অবনমন এবং প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ভারত যখন রৌপ্যমান বর্জন করল তখন এই যুক্তির সারবত্তা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল। ১৮৯৯ সালে ওয়াচা বোম্বাইয়ের শিল্পমালিকদের বলেছিলেন, বাণিজ্যে অস্থিরতা ও ঘাটতির কারণ, বিদেশে টাকা পাঠাতে হচ্ছে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মুদ্রা সোনা, রূপা, সুতো বা গম যাই হোক না কেন যতদিন বিদেশে অর্থ রপ্তানির পরিমান বাড়তে থাকবে ততদিন বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাও দেখা দেবে ·· সমস্যার মূলে আছে আসলে হোম চার্জেস।' জি. এস আয়ারও লক্ষ্য করেছিলেন যে, "১৮৭২ সালে—এমনকি তারপরেও বহুদিন হোম চার্জেস-এর বোঝা কারুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কেননা সেইসময়ে রেলওয়ের জন্য এবং অন্যান্য কারণে ইংলণ্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করা হচ্ছিল।"

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই জাতীয়তাবাদী নেতারা সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সরকারের বক্তব্য ছিল, বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের নেই, শুধু দুভাবে এর প্রতিকার সম্ভব জনসাধারণের উপর আরো কর চাপিয়ে কিংবা টাকার মূল্য বাড়িয়ে। জাতীয়তাবাদী নেতারা অন্য আর একটি উপায়ের কথা বললেন। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারলে তা সম্ভব। প্রথমত, তাঁরা বললেন, বাণিজ্যে ঘাটতিই যদি সরকারের ক্ষতির মূল কারণ না হয়, তাহলে সরকারের প্রস্তাবমত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, সমস্যার আসল উৎস হোম চার্জেস বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ রপ্তানি, কাজেই এই ব্যাধি নির্মূল করতে হলে যে নীতির ফলে স্টারলিং দায়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে সেই নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। হোম চার্জেস-এর ব্যয় কমানো অথবা হোম চার্জেস তুলে দেওয়া কিংবা ইংল্যাণ্ডে সম্পদ পাচার বন্ধ করা অথবা অন্তত

কিছু পরিমাণ স্টার্লিং দায়কে রৌপ্য দায়ে রূপান্তরিত করা যাতে "আগের থেকে কম টাকায় সরকার প্রয়োজন মিটিয়ে তার তহবিলকে কিঞ্চিৎ স্বস্তি দিতে পারে"—এইগুলিই এই রোগের প্রধান ও একমাত্র "স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রতিষেধক"। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতে, এই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর সুনিশ্চিত একটি উপায় —"ভারতীয় প্রশাসকের দক্ষতা যতটা সম্ভব বজায় রেখেই পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে অর্পণ, কারণ এই ব্যবস্থার সুবিধে হচ্ছে, এদের বেতন ও পেনসন সোনার মাধ্যমে দিতে হবে না"। আর একটি উপায়, সরকারি ভাণ্ডারের জন্য আরো বেশি দ্রব্য দেশের ভেতর থেকে ক্রয় করা। তৃতীয় উপায়টি, ইংল্যাণ্ডে ভারত সরকারের ব্যয়ের ন্যায়সম্মত একটা অংশ ইংল্যাণ্ডেরই বহন করা।

বেশ কিছু ভারতীয় টাকার অবনমন ও বাণিজ্যের ক্ষতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই আশায় যে এতে সম্পদ-পাচারের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ ও সরকারের চোখ খুলে যাবে এবং সরকার বাধ্য হবে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ১৮৯২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রিকা স্পষ্টভাবেই এই ভাবনাকে তুলে ধরেছিল :

"বর্তমান পরিস্থিতি আর কিছুদিন অপরিবর্তিত থাকলে এমন পরিবর্তন আসতে পারে যাতে এই দেশের মানুষেরা উপকৃত হবেন। স্বরাষ্ট্র ব্যয় (হোম চার্জেস) অবশ্যই সংকুচিত হবে এবং প্রয়োজনীয় পণ্যাদি দেশের থেকেই কিনতে হবে। সরকার যদি ভারতীয় বাজারে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে ভারতীয় বাণিজ্য কি ভীষণভাবেই না উজ্জীবিত হবে!…(এতে) ভারতীয় শিল্পও উৎসাহ পাবে।"

তাঁরা মনে করেছিলেন যে, বাণিজ্য-হ্রাস ইংরেজদের একটা বড় অংশকে দেশে থাকতে এবং ভারতের প্রশাসন পরিচালনার ভার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে।

টাকার মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য আরো বেশি করের হাত থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে রেহাই দেওয়া কিংবা আর্থিক বিপর্যয় রোধ করা—এ জাতীয় সরকারি যুক্তি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, স্বরাষ্ট্র ব্যয় যদি বিপুল পরিমাণে কমানো নাও হয় এবং বাণিজ্যে ক্ষতিও ক্রমাগত চলতেই থাকে, তাহলেও নতুন কর না চাপিয়েই সরকারের বর্তমানের আর্থিক সম্বল থেকে অনায়াসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যেতে পারে। তাঁরা বললেন—যদিও বাণিজ্যের ব্যাপারটি সত্যিই একটি বড় সমস্যা, তবুও একে ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থায় "সড়াইখানার পোষা বেড়ালের মতো কিংবা ঐশ্বরিক বিধান" হিসাবে দেখা অনুচিত। ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতার জন্য অনেকাংশে দায়ী করতে হবে সরকারের সামরিক ও অসামরিক ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে, যার

ফলে সরকারের বিপুল পরিমান স্টারলিং দেনার উদ্ভব হয়েছে। বিণিময়-জনিত লোকসান এর জন্য মূলত দায়ী নয়। সুতরাং ব্যয় সংকোচন, বিশেষতঃ সামরিক ব্যয় সংকোচনের মধ্যেই পরিস্থিতির উন্নতির উপায় নিহিত, অর্থ-ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে তা করা যাবে না। ডি. ই. ওয়াচা বিশেষ করে এই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। পরিসংখ্যানের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে ১৮৮৩-৮৫ থেকে বর্ধিত সামরিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট সময়ে নতুন কর থেকে প্রাপ্য আয়ের প্রায় পুরোটাই গ্রাস করেছে। কাজেই সামরিক ব্যয় কমাতে পারলে "ভারতকে ঋণগ্রস্থ হতে হত না এবং বাণিজ্য সংকটের মধ্যেও পড়তে হত না।"

কোনো কোনো ভারতীয় নেতা এও প্রস্তাব করেছিলেন যে, "যদি অন্য সব কারণ অপরিবর্তনীয় ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও, এদেশে তৈরি হয় না, কিংবা এদেশের সাধারণ মানুষের ব্যবহারে লাগে না, কিংবা দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নয়, এমন সব পণ্যের উপর স্বল্প পরিমাণে আমদানি কর ধার্য করলেই" এই বাণিজ্য-সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। সুতীবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক এই রকম করের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

যাইহোক, টাঁকশাল বন্ধ করে দিলে ও টাকার মূল্যবৃদ্ধি ঘটালে নতুন কর চাপানোর প্রয়োজন হবে না, এবং সেজন্য সরকার ও জনসাধারণের আর্থিক চাপ অনেকটা কমবে—ভারতীয় নেতারা এই জাতীয় সরকারি যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পুরো ব্যাপারটাকেই তাঁদের মনে হয়েছিল কিছু অর্থনৈতিক তথ্যের মার-প্যাঁচ। মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে কোনো কিছু করা সম্ভব, এটা তাঁরা মানেননি। তাঁদের মতে, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৮-এর মুদ্রা আইন বলে টাকার মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে ভারতের জনসাধারণকে "অস্পষ্ট অথচ বিপুল পরিমাণ নতুন পরোক্ষ করের বোঝা" বহন করতে বাধ্য করা হয়েছে, কেননা "পুরনো হারে কর কৃত্রিমভাবে-বর্ধিত-মূল্যের টাকার মাধ্যমেই গ্রহণ করা হচ্ছিল"।[২০] দাদাভাই নৌরোজি ১৮৯৮ সালে লিখলেন, "টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া এবং বর্তমানের সোনার মূল্যে ১১ পেঃ এর টাকাকে ১৬ পেঃ মূল্যের মেকি টাকায় উন্নীত করা আসলে গোপনে ভারতীয় করদাতাদের কাছ থেকে আরও প্রায় ৪৫ শতাংশ নতুন কর আদায় করার সামিল"।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনে হয়েছে, যে ভাবে মুদ্রাসমস্যার মোকাবিলা করা হচ্ছিল তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রত্যক্ষভাবে করের বোঝা চাপালে ভারতের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ঔঠতে পারে, সেজন্য পরোক্ষ ও গোপন কর চাপিয়ে সেই অজ্ঞ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই ছিল এর লক্ষ্য। জাতীয় নেতাদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করকে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বলে মনে করেছিলেন। কেননা "তাতে দরিদ্র কর-দাতাকে শুধু সেইটুকু অতিরিক্ত কর দিতে

হবে বিনিময়-জনিত ঘাটতি পূরণের জন্য যেটুকু একান্ত আবশ্যকীয়, কিন্তু গোপনে সংগৃহীত করের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।"

১৯০১ সালের পরে যখন বাজেটীয় উদ্বৃত্তের পরিমান ক্রমশই বেড়ে যেতে শুরু করল তখন জাতীয় নেতারা আবার অভিযোগ করলেন, এই বৃদ্ধি আসলে ১৮৯৩ এবং ১৮৯৮ সালের মুদ্রা আইনের মাধ্যমে চাপানো পরোক্ষ করের ফল। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন, "বাস্তব রাজনৈতিক কারণেই" ভারত সরকারের পক্ষে মুদ্রা আইন বাতিল করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবং সেজন্য দাবি করলেন, যে সব দরিদ্র করদাতা মুদ্রা আইনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের কর-রেহাই দেবার প্রয়োজনে এই উদ্বৃত্ত ব্যবহার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে জি.কে গোখেল একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন :

"পরোক্ষ কর না-চাপিয়েই টাকার বিনিময় মূল্য বাড়ানোর মত একটি অসম্ভব ব্যাপার যদি সম্ভবপর হয়ে থাকে, তবে টাকার মূল্য ১ শি ৬ পে থেকে ১ শি ৯ পে কিংবা ২ শি. অথবা আরো বেশি করতেই বা অসুবিধা কোথায়? সেক্ষেত্রে তো উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরো বহুগুণ বেশি হবে! লর্ড জর্জ হ্যামিলটন দাবি করেছেন এই কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভারতের কোনো শ্রেণীর মানুষেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই—তা যদি ঠিক হয়, তাহলে তো সরকারের পক্ষে উদ্বৃত্ত বাড়ানোর এমন চমৎকার সহজ সরল একটি পদ্ধতি আরো উৎসাহের সঙ্গে অবলম্বন না করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না!"[২১]

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা আরো ভালোভাবে বিষয়টিকে ধরতে পেরেছিলেন তাঁদের মতে, টাকার মূল্য বাড়ানোর ফলে ইংল্যান্ডে প্রেরিত সম্পদের পরিমাণ অর্থাৎ সম্পদ নিষ্কাশন কমে গিয়েছে, এই দাবি একেবারেই অযৌক্তিক, "সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত এবং একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রতারণা"। কৃত্রিমভাবে এবং একতরফা টাকার স্বর্ণমূল্য বাড়িয়ে ভারতের পক্ষে সামান্যতম সোনা বাঁচানোও ছিল অসম্ভব, কেননা বিদেশে ভারতীয় পণ্য বিক্রি করেই ভারতকে স্বরাষ্ট্র ব্যয় (হোম চার্জেস) মেটাতে হচ্ছিল, রপ্তানির পরিমাণ কতটা হবে তা নির্ভর করতো বিদেশী বাজারে সোনার দামের উপর, টাকার অঙ্কে ভারতে সোনার কি দাম, তার উপর নয়। নিকট অতীতেই দেখা গেছে, সোনার মূল্যের হিসেবে সমস্ত পণ্যের দাম কমে যাওয়ার ফলে ভারত আরো বেশি পরিমানে পণ্য রপ্তানি করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই সোনার হিসেবে পণ্যের দাম না বাড়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে আগে যে পরিমাণ পণ্য বিদেশে পাঠাতো হ'ত সেই পরিমাণেই পণ্য পাঠাতে হবে, তা ভারত সরকার নতুন কর বসিয়ে বা পুরানো করের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে যেভাবেই ঐ পণ্য সংগ্রহ করুন না কেন।

দাদাভাই নৌরোজি আরো একধাপ এগিয়ে ছিলেন। তাঁর মতে, ভারত যদি স্বর্ণ-মানের অধীনেও থাকত তাহলেও এই বিনিময়-জনিত ক্ষতি তার পক্ষে

এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত না।[৮৮] কেননা ভারতের অবস্থা ছিল সোনা ব্যবহারকারী ঋণগ্রস্ত দেশগুলির মতো, তাদেরও সোনার মাধ্যমেই এইসব ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। এর অর্থ কখনই এই নয় যে, বিনিময় মূল্যের অবনমনের ফলে ভারতের ক্ষতি হয় নি। ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু সেটা সোনার মূল্যবৃদ্ধির ফলে। ভারতীয় মুদ্রামানে পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। কাজেই "একমাত্র সোনার মূল্যের পরিবর্তনই ভারতবর্ষকে বাঁচাতে পারে—অথবা তাকে আরো বেশি ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।"[৮৭]

১৮৯৩ সালে কারেন্সি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দাদাভাই এই প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য সবচেয়ে সহজ ও সরলভাবে উপস্থিত করেছিলেন। টমাস ফ্যারের তাঁকে প্রশ্ন করেন: "আপনি বলছেন বিনিময় মূল্যের-অবনমনের ফলে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে, আবার আপনি এও বলছেন যে বিনিময়ে উন্নতি হলেও ভারতের কোন লাভ নেই—এর অর্থ ?" উত্তরে দাদাভাই জানান:

"না, আমি কখনই এ কথা বলি নি। আমি শুধু বলেছি, ভারতবর্ষের লাভ ক্ষতি নির্ভর করছে সোনার মূল্যের উপর। সোনার মূল্য কমলে টাকার বিনিময় মূল্যের উন্নতি হবে, এবং অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকলে, তখন ভারতকে অবশ্যই বিদেশে কম সম্পদ পাঠাতে হবে। কিন্তু সোনার মূল্য বেড়ে গেলে অর্থাৎ টাকার বিনিময় মূল্য আরও কমে গেলে, ভারতকে আরো অনেক বেশি উৎপন্ন পণ্য বাইরে পাঠাতে হবে।"

জাতীয় নেতৃবৃন্দের কারও কারও বক্তব্য ছিল—টাকার মূল্যবৃদ্ধি হ'লে আসলে ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ নিষ্কাশন আরো বাড়বে: কেননা, স্টারলিং দায় থেকে সামান্য রেহাইও পাওয়া যাবে না, অথচ প্রধানত ইংল্যান্ডে গচ্ছিত ভারতের রৌপ্য ঋণের মূল্য টাকার মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তাঁরা এও দেখিয়েছিলেন যে, টাকার মূল্যবৃদ্ধি হলে প্রশাসনের ব্যয়ভারও বেড়ে যাবে, কেননা তখন ইউরোপীয় বা ভারতীয় উভয় ধরণের কর্মচারির বেতন দিতে হবে বর্ধিত মূল্যের টাকায়, আর তার ফলে "কোটি কোটি মেহনতি মানুষ যারা সম্পদ সৃষ্টি করছে এবং সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় ভিত্তি তাদের হাত থেকে সম্পদ পাচার হয়ে চলে যাবে সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবিধে-ভোগী শ্রেণীর হাতে।"

এছাড়া, ডি ই. ওয়াচা আর একটি ক্ষতিকর পরোক্ষ প্রভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। স্বর্ণমানাধীন দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি ভারতের পক্ষে তেমন অসহনীয় ছিল না, কেননা চীন ও অন্যান্য রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হ'ত। কিন্তু নতুন মুদ্রা আইনের ফলে দূর প্রাচ্যে রপ্তানির পরিমাণ কমে যাবে এবং ইংল্যান্ডে টাকা পাঠানোর জন্য যে বোঝা তা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাড়বে।

৪ টাকার মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব

ভারতের নেতৃবৃন্দ শুধু ভারত সরকারের মুদ্রা আইনের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেননি। মুদ্রা আইনের ফলে জনসাধারণের বিশেষত এবং "উৎপাদনের" অর্থনৈতিক স্বার্থ কিভাবে বিপন্ন হয়েছে বা হতে পারে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

প্রথমত তাঁরা দেখান যে, টাকার মূল্যবৃদ্ধি "দেশীয় শিল্পের সমূহ ক্ষতি করেছে।" তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন যেভাবে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে সামগ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবশ্য বাণিজ্য নিয়ে এই উদ্বেগ ছিল অনেকটাই বাহ্য, আসলে তাঁরা শিল্প সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, টাকার মূল্য-বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বা সামগ্রিকভাবে রপ্তানি বাণিজ্য কতটা বিপন্ন হয়েছে, তা নিয়ে তাঁদের সত্যিই তেমন কোন মাথা ব্যথা ছিলো না, চীন ও জাপানে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানির মারাত্মক ক্ষতিই ছিল তাদের ক্ষোভের প্রাথমিক কারণ। এই দুটি দেশের শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো, কেননা এই দুটি দেশেই রৌপ্যমান বজায় ছিল, অথবা সোনা-রূপার বিনিময়ের হার ছিল নিম্ন, যার ফলে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় দামের দিক থেকে এদের পণ্য ছিল অনেক সুবিধেজনক। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিলেন। এই শিল্পের স্বার্থেই প্রাচ্যের বাণিজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[২] এবং সেজন্যই টাকার মূল্য বৃদ্ধির ফল স্বরূপ বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁরা অনতিবিলম্বে উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জি. কে গোখেল ১৯০২ সালে অভিযোগ করেন যে ভারতের সুতাশিল্প "মূলত সরকারের মুদ্রানীতির ফলেই ভয়ংকর মন্দার কবলে পড়েছে।" এবং ১৯০৪ সালে অম্বালাল মাকারাল দেশাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে জানান—"চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতীয় পন্যের বিনিময় মূল্য কমে যাওয়ার (আসলে বাড়ার) ফলে গত কয়েক বছরে বোম্বাই-এর প্রায় ২০ টি মিল বন্ধ হয়ে গেছে।"

কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনে ভি.ভি থাকারসে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন সুতা-কল মালিক। কয়েক বছর যাবৎ দেশের বস্ত্রশিল্পে যে ভয়ংকর মন্দাবস্থা দেখা দিয়েছিল তার জন্য মুদ্রানীতিকে দায়ী করে তিনি মন্তব্য করেন যে, টাকার মূল্য বাড়ার ফলে চীনের মত রৌপ্য-ব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে বিনিময়ে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য বেড়ে গেছে এবং তা চীনের বাজারে জাপানের মতো দেশের বস্ত্র শিল্পকে (যার এই ধরণের কোন সমস্যা ছিলো না) পরোক্ষ সুবিধে করে দিয়েছে।

চীনের চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কাপড় আসছিল জাপান থেকে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন : "যদি কখনো দেখা যায় যে, এক সময় যেটা ভারতের ছিল সেই পুরো বাজারটাই জাপানের দখলে চলে গেছে, আমি একটুও বিস্মিত হবো না। দূর প্রাচ্যের প্রতিযোগিদের হাতে প্রতি বেলে ২০ টাকা (Rs 20 per bale) দাম হিসেবে তুলে দিতে হচ্ছে বলেই আমাদের সূতি শিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে।"[২৩]

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কতটা সঠিক ছিল, সেই আলোচনায় না গিয়েও এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতের নেতৃবৃন্দ বাণিজ্য সংক্রান্ত-সমস্যাটিকে কেবল সূতীবস্ত্র শিল্পের স্বার্থের সংকীর্ণ নিরিখে বিচার করার ফলে সরকারি মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রশ্নে তাঁদের সমালোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। বহু সমালোচকের মতে, একবার যদি এটা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, চীন ও জাপানে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি টাকার মূল্য বৃদ্ধির ফলে, অংশত হলেও, অনেকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো[২৪], তবে জাতীয়তাবাদীরা লড়াই এর যে ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন সেখানে তাঁরা অনাক্রম্য। অবশ্য সূতি শিল্পে মন্দার একমাত্র কারণ মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন, এই জাতীয় একদেশদর্শী বক্তব্য পুনর্বিবেচনার চেষ্টা নেতারা নিজেরাই অবিলম্বে শুরু করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯০১ সালে ডি.ই. ওয়াচা স্বীকার করেন, অতি উৎপাদন, দুর্বল পরিচালনা, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি অন্যান্য অনেক কারণও ওই মন্দাবস্থার জন্য কিছু কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল। সরকারি মুদ্রানীতির গুরুতর কুফলের কথাও তিনি বলেছিলেন, তবে "সম্ভবত তা অভিযোগকারীরা যতটা বাড়িয়ে বলছেন ততটা নয়।"

সূতি শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছিল সেই একই যুক্তিতে ভারতের নেতৃবৃন্দ চা এবং অন্যান্য বাগিচা শিল্পের স্বার্থেও বিনিময় মূল্যের নিম্নহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন[২৫] — যদিও এ নিয়ে আন্দোলন করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। সম্ভবত কাংড়া উপত্যকার চা বাগিচার মালিক ক্যাপ্টেন এ ব্যানন-এর মতো কিছু ইংরেজ শিল্পপতির সমর্থন পাওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মুদ্রা-সংক্রান্ত বিষয়ের দুই জাতীয়তাবাদী বিশেষজ্ঞ দাদাভাই নৌরাজি ও ডি. ই ওয়াচা উভয়েই মুদ্রার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শুধু বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারেই মনোযোগ নিবিষ্ট করার এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বার্থে মুদ্রা সঙ্কোচনের নীতি পরিহার করে মুদ্রার যোগান বাড়ানোর প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করেছিলেন।

১৮৯৩ এবং ১৮৯৮ সালে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা ছিল, কৃষকরা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অভিযোগ করা হয়েছিল—এতে কৃষকরা নিষ্পেষিত হবেন। এবং নিম্নলিখিত কারণে সরকারি মুদ্রানীতির দায় তাদেরই বহন করতে হবে—

প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ বিপর্যয়ের সময় দরিদ্র চাষী ও মেহনতি মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় যে সঞ্চয়, তা মূলত রৌপ্যালংকারে গচ্ছিত থাকে। পণ্য হিসেবে রুপোর মূল্যহ্রাস হওয়ার ফলে অবশ্যই এই সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য টাকার অংকে সমানুপাতিক হারে কমে যাবে। "ভারতের দরিদ্র মানুষের সঞ্চয়ের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বাজেয়াপ্তকরনের" এই সরকারি প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে আর সি দত্ত লিখেছিলেন ঃ

"দরিদ্রদের সঞ্চয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোনো প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রাহ্য হ'ত না। এবং এটা ভেবে নেওয়া অসংগত হবে না যে, এরকম কোনো প্রস্তাব ইতালির মত কোনো দরিদ্র ইউরোপীয় দেশে গ্রহণ করা হলে, সেই উপদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠত।"

১৯০২ সালে জি কে গোখেল আরো একটি ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, তা হল যখন অন্যান্য পণ্যের দাম কমেনি তখনও রৌপ্যপিণ্ডের "দাম অনেকটা কমে গিয়েছিল। "অমৃত বাজার পত্রিকা" এবং "মাহ্‌রাট্টা" এই গুরুতর অন্যায়" রোধ করার জন্য একটি চমৎকার প্রস্তাব দেয় ঃ সরকারের কর্তব্য টাঁকশাল বন্ধ হবার আগে রুপোর যে দাম ছিল সেই দামে জনসাধারণের কাছ থেকে সমস্ত রুপো কিনে নিয়ে সোনার মাধ্যমে তার দাম দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ রায়তরা এবং অন্যান্য দরিদ্র ভারতীয়রা সাধারণভাবে দেনায় জর্জরিত ছিল ; তার উপর টাকার মূল্য বৃদ্ধি করার অর্থ তাদের ঋণের বোঝা আরও বাড়ানো, অথবা আর. সি. দত্তের ভাষায়, যারা দরিদ্র মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে ধনী সেইসব শ্রেণীর মুনাফা আরো বাড়িয়ে দেওয়া, এবং দরিদ্র ঋণগ্রস্ত শ্রেণীর মানুষ, যে ঋণের বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে চলেছে তার উপর আরো বোঝা চাপানো।

তৃতীয়তঃ চাষীকে কৃত্রিম উপায়ে বর্ধিত মূল্যের টাকায় পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হবে—যার অর্থ আগের মতো একই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করতে তাকে আরও বেশি পরিমাণে ফসল বিক্রি করতে হবে। অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, টাকার মূল্য-বৃদ্ধি-জনিত এই চোরা করের বোঝার অধিকাংশটাই বহন করতে হবে কৃষক শ্রেণীকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ দেখালেন, একই কারণে খাজনার বোঝা যেখানে অর্থে প্রদেয় তা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১২]

এখন প্রশ্ন হল ঃ সরকারের মুদ্রানীতির ফলে যদি শিল্প ও কৃষি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে কার স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিলো ? এ-বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত ছিলেন যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের

স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র অতিরিক্ত নতুন কর চাপানো বা ব্যয় সংকোচনের অনিবার্যতা থেকে সরকারকে বাঁচানোর জন্যই নয়, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ইউরোপীয় শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অর্থাৎ সংক্ষেপে "সমস্ত ইংল্যাণ্ডের স্বার্থসিদ্ধি।" তাঁদের মতে, টাকার মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছিল কতগুলি লক্ষ্য সাধনের প্রয়োজনে। যেমন—প্রথমত, সরকারি কর্মচারি, বিশেষত সেনা বিভাগে যে অসংখ্য বৃটিশ কর্মচারি ছিল, তাদের বেতনে অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য। দ্বিতীয়ত, বিদেশী বণিকদের সুবিধের প্রশ্নটা সামনে রাখা হয়েছিল, যাতে "কতিপয় ইংরেজ পৃথিবীর যে-কোনো সভ্য দেশে যে সব সাধারণ ঝুঁকি আছে তার কোনোটা না নিয়েই নিশ্চিন্তে সোনা কেনা-বেচা করে যেতে পারে।" তৃতীয়তঃ নতুন মুদ্রা আইনের আর একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাটিতে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশে সাহায্য করা।

টাঁকশাল বন্ধ হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, জাতীয়তাবাদীদের এই যুক্তি যে ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং সরকারও যাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল, তা হ'ল, টাকার ঘাটতি হ'লে তার ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ১৮৯৩ এবং ১৮৯৯ সালের পরবর্তী কয়েকটি বছরে ছাড়া এই মূল ধারণাটি বাস্তবে সমর্থিত হয়নি, বিশেষত খাদ্য-শস্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই। জাতীয়তাবাদীদের আশংকানুযায়ী টাঁকশাল বন্ধের অব্যবহিত পরেই কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্যের দাম কমেছিল ঠিকই, কিন্তু খাদ্য-শস্যের দামে ১৮৯৩ এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল কেবল ১৮৯৪, ১৮৯৫ এবং ১৮৯৯ সালে। এই পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে আমরা এখন যাবো না। একটা মৌলিক ধারণাকে মিথ্যে হয়ে যেতে দেখার পর জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, সেটাই লক্ষ্য করার মতো।

মুদ্রা পরিবর্তনের ফলে সাধারণ দামস্তরের অবনতি হয় নি—এই বক্তব্যের উত্তরে আর সি দত্ত ১৮৯৮ সালে দেখিয়েছিলেন যে, অন্তত খাদ্য শস্যের দাম সত্যিই কমে গিয়েছিল এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জি. কে. গোখেলও ১৯০২ সালে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন যে সাধারণ দামস্তর দ্রুত নতুন টাকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তবে, তাঁর মতে, এই বিলম্বের কারণ ছিল অনর্থনৈতিক —যেমন "ভারতবর্ষের মতো একটি অনগ্রসর দেশের সনাতনী শক্তিগুলি", ১৮৯৬-১৯০১ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত আকাল, এবং বিভিন্ন বাইরের ঘটনা। এইসব কারণ যে দীর্ঘকাল কার্যকর থাকবে না, এবং টাকার কৃত্রিম মূল-বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে আজ হোক কাল হোক সাধারণ দামস্তর যে নীচে নামবেই এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।[২৫] ডি ই. ওয়াচার মতে, দামস্তর যে সব কারণে কমে ন

তার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি হ'ল—১৪ কোটি নতুন টাকা ছাড়া হয়েছিল। ১৯০১ সালে তিনি মন্তব্য করেন, সরকারের এই পদক্ষেপ "টাকার এখন বাহুল্য" জাতীয় তত্ত্বের অসারতাই শুধু প্রমাণ করেনি, "বাস্তবে দেশের অর্থনীতিতে টাকার আটো-সাঁটো ভাবেরও কিছুটা উপশম ঘটিয়েছিল।" একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমরা এখানে অন্তত একটি জাতীয়তাবাদী পর্যবেক্ষকের—২৮ শে জুন ১৮৯৮ সালের 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার—উল্লেখ করতে পারি, যাতে "সাফল্যের তুলনায় অধিকতর সফল আর কিছু নেই" জাতীয় প্রবচনের তোয়াক্কা না করে আসল কারণটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পত্রিকাটি উল্লেখ করে, স্টারলিং এর সঙ্গে টাকার সম্পর্কে উন্নতি হওয়ায় এটা প্রমান হয় না যে টাঁকশাল বন্ধের নীতি সঠিক ছিল অথবা টাকার বিনিময় মূল্যের উন্নতির পেছনে এই নীতিরই অবদান ছিল সর্বাধিক। আসলে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল "বাজার থেকে কাউন্সিল বিলগুলি তুলে নেওয়ার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব বিরামহীনভাবে ঋণ করার জন্য, এর সঙ্গে ১৮৯৩ সালের আইনের স্বাভাবিক প্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই"।[২৬]

জাতীয়তাবাদীদের এই বক্তব্য সবচেয়ে জোরালোভাবে উপস্থিত করেছিলেন দাদাভাই নৌরোজি। তাঁর মূল যুক্তিধারা এতো সরল ছিল যে অনায়াসেই ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। তিনি বললেন, "দামের কী হল—অর্থাৎ দাম বাড়ল না কমল তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যেহেতু দামের ওঠা-নামা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে তাই দামের উপর কোনো একটি বিশেষ কারণের প্রভাবকে প্রমান হিসাবে উপস্থিত করা বা সেই উদাহরণ উপস্থিত করা হেত্বাভাসমূলক।" সার্বিক অর্থ-নৈতিক বিশ্লেষণের জন্য "টাঁকশাল বন্ধের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ফলাফলকে আলাদা-ভাবে অন্যান্য বিষয়-নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখতে হবে।" এবং এইভাবে দেখলে, টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য-মান বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের বেশি পরিমাণে রাজস্ব দিতে হয়েছে, এই প্রতিজ্ঞাটি "পণ্যসমূহের প্রকৃত দাম যাই হোক না কেন তার সঙ্গে সম্পর্কহীন।" অন্যান্য নানা কারণের জন্য বাস্তবে দাম যদি কমে না থাকে, তাহলে তার অর্থ এই যে, ঐ অন্যান্য কারণগুলি সক্রিয় থাকলে পণ্যের দাম বেড়ে যেত এবং কৃষকেরাও সেই অনুপাতে উপকৃত হোত। কাজেই "টাঁকশাল বন্ধ করার গোপন কায়দায়" সরকার ঐসব "অনুকূল অন্যান্য কারণের" সুবিধে থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করেছে। অন্য আর একভাবেও তিনি এই যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন: "যেহেতু পুরোনো ও নতুন টাকার রৌপ্যমূল্য ভিন্ন – ধরা যাক যথাক্রমে ১৮৪ এবং ২৬৯ গ্রাম রূপা – দাম যাই হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট বাজারে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন পরিমান রূপার পণ্যমূল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। এর পরিমাণ

থেকেই টাকার মূল্য বৃদ্ধির ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চাষীরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল তা বোঝা যায়"।

৭ রাজনৈতিক তাৎপর্য

জাতীয়তাবাদীদের মূল বক্তব্য ছিল, বিপুল পরিমাণ "হোম চার্জেস" বা স্বরাষ্ট্র ব্যয় মুদ্রা ব্যবস্থার সংকটের আসল কারণ। এর থেকে তাঁরা এই অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকত তবে মুদ্রা সমস্যার উদ্ভবই হোত না। তবে সে যাই হোক না কেন, সংকট যখন একবার সৃষ্টি হয়েছেই তখন তাঁরা একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন, ভারতের জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেই তা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

যখন জাতীয়তাবাদীদের সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৮৯৩ সালে টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হ'ল, এবং তারপর স্বর্ণমান চালু করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ'ল, তখন অনেক ভারতীয় নেতারই একটা অস্বস্তিকর উপলব্ধি হয়েছিল, তা হ'ল—ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না। "মাহরাট্টা" পত্রিকা ১৮৯৩ সালের ১২ই মার্চের সংখ্যায় সংক্ষেপে এই শাসনব্যবস্থার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলঃ "এই সরকার আমলাদের, আমলাদের দ্বারা এবং আমলাদের জন্য পরিচালিত"।[২৮] ১৮৯৮ সালে আর সি দত্ত আক্ষেপ করে লিখেছিলেনঃ "ভারত সরকারের কাজ-কর্ম দেখে মনে হচ্ছে যেন সরকার এবং বিদেশী বণিকদের প্রয়োজন মেটাতেই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব, জাতীয় সুখ শান্তির প্রশ্নটা যেন একেবারেই গুরুত্বহীন এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়দের মতামতও যেন মূল্যহীন"। ১৮৯৮ সালে ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে দাদাভাই নৌরজিও সমান স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষ যেন এমন এক পাপিষ্ঠ দেহ যার উপর এমন কি হাতুড়েরা পর্যন্ত যে কোনো রকম কাটা-ছেঁড়া করতে পারে এবং যে কোনো রকমের নির্মম, জঘন্য ও যেমন খুশি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়। ভারতবর্ষের কি হ'ল, সত্যিই তাতে কিই বা যায় আসে?·· ভারতবর্ষ আমাদের পদানত ক্রীতদাস, তাকে সব কিছু দিতে বাধ্য করা যায়।···· করদাতাদের সঙ্গে এই বজ্জাতি করার সাহস এখানকার সরকারের নেই। ভারতের সরকার আগে ভাবে বিদেশী 'স্বার্থের' (আমলা ও অন্যান্যদের স্বার্থের) কথা, তারপর সাধারণ প্রজাদের, অবশ্য যদি বিদেশী 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট' বলে তাদের কথা একান্তই ভাবতে বাধ্য হন।"

বস্তুত মুদ্রাসংটের সঠিক চরিত্র নিরূপণ ক'রে তার নিরাময়ের জন্য জাতীয়

নেতৃত্ব যে সব দাওয়াই বাৎলেছিলেন তার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। "হোম চার্জেস" সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হবে অন্যথা অন্তত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তা কমিয়ে দিতে হবে এবং সামরিক ব্যয়ের সংকোচন করতে হবে—এই সুপারিশের অর্থ বিদেশী শাসকদের শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করতে বলা। সে যাই হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সরকারের মুদ্রা নীতিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বিনিময় ক্ষতিপূরণ ভাতা বা Exchange compensation Allowanceএর প্রশ্নে তাঁদের বক্তব্য ভালোমতো বিচার করলে, এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়।

৮. বিনিময় ক্ষতিপূরণ ভাতা

মুদ্রা সংস্কারের মতো একটি মুখ্য বিষয়ের থেকেও বিনিময় ক্ষতিপূরণ ভাতার মতো একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয়কে কেন্দ্র করেই ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত রাগ, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ একেবারে ফেটে পড়েছিল, এবং জাতীয়তাবোধের আগুনে দেশ জ্বলে উঠেছিল। টাকার স্বর্ণমূল্য কমে যাওয়ার ফলে এদেশে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারিদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থের মূল্য কমে যায়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ১৮৯৩ সালে ভারত সরকার এই বিশেষ ভাতা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভাতার পরিমাণ এমনভাবে ঠিক করা হয়েছিল যাতে একজন আমলা প্রতি টাকায় বিশেষ সুবিধেজনক ১ শি ৬ পে হারে তার আয়ের অর্ধেক—বৎসরে সর্বাধিক ১০০০ পাউন্ড—ইউরোপে পাঠাতে পারে। টাকা পাঠাক আর না পাঠাক, এই ভাতা তাদের দেওয়া হ'ত। বাস্তবিক ভাবে এর ফলে এইসব আমলা ও কর্মচারিদের বেতন বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৯৩-১৮৯৮ সালে এই খাতে মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, ১৮৯৫-৯৬ তে এই পরিমান সর্বাধিক হয়েছিল (প্রায় ১ ৩৩ কোটি টাকা)।

বৃটিশ আমলারা যখন এই ক্ষতিপূরণ ভাতার দাবি প্রথম উত্থাপন করে তখনই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পরে সরকার যখন এ দাবি মেনে নিলেন তখন দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পরবর্তী কয়েক বছর এটা ছিল। এই ভাতার নিন্দায় জাতীয়তাবাদীরা অত্যন্ত কড়া ও ঝাঁঝালো ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। বিশেষত ইউরোপীয় কর্মচারিদের সম্পর্কে প্রায় ঘৃণার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সরকারি সিদ্ধান্ত যে ধরনের এবং যে মাত্রায়—বলা যায় যে প্রকৃতির—ক্ষোভের উদ্রেক করেছিল এবং সাধারণভাবে মধ্যপন্থী বা আপোষপন্থী বলে পরিচিত নেতারাও যে নির্ভীক ও সংগ্রামী কায়দায় তা প্রকাশ করেছিলেন, তার চমৎকার সুলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯৮৩ সালের ২৭শে আগস্টের "কাইজার ই হিন্দ" পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত, প্রতিবেদন :

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বৃটিশ প্রশাসন ও তাদের আচরণ সম্পর্কে যখন নিরপেক্ষ ইতিহাস তার অবিনশ্বর রায় নথিভুক্ত করবে তখন একটি বিদেশী ও সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন আমলাশ্রেণীকে অতীত ও বর্তমান নজিরবিহীন বিলাসিতার মধ্যে লালন করার তাগিদে কীভাবে এই বিশাল দেশের অগণিত মূক, অসহায় ও দরিদ্র জনসাধারণের উপর বিপুল ও অসহ্য ব্যয়ভার নির্মম ও নির্লজ্জভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটাই হবে তার সম্ভবতঃ সবচেয়ে নিন্দামুখর অংশ। হেস্টিংস থেকে শুরু করে ল্যান্সডাউনের শাসনকাল পর্যন্ত ভারত সরকার যেভাবে একের পর এক অর্থনৈতিক অবিচার ও লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে এসেছে, তার বিষাদময় তালিকা বাস্তবিকই শেষ হবার নয়। অবশ্যই এই তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ ও ভয়াবহ বলে মনে নাও হতে পারে। তাই অতীতের সমস্ত অন্যায় অবিচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও নতুন ও গুরুতর অন্যায়। এই কলঙ্কজনক কাজ ল্যান্সডাউনের জন্য রাখা ছিল। নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য তিনি যে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন না, তা কে বলতে পারে? এই ঔদ্ধত্য ও সর্বাধিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য তিনি কি মর্যাদাজনক পুরস্কার পাবেন না? মার্কুইস ল্যান্সডাউন তাঁর মহামান্য বৃটিশরাজের ভারতীয় প্রজাদের উপর যে নিপীড়ন চালিয়েছেন, তাতে মহামান্য বৃটিশরাজ যে খুশি হয়ে তাঁকে ডিউকের মর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি মুদ্রা আইনের সংশোধন-জনিত ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ভাতার জনক হিসাবে যে সম্মান বা অসম্মানের অধিকারী হয়েছেন, তার জন্য কে অসন্তোষ প্রকাশ করবে? ক্ষুধার্ত করদাতাদের বঞ্চিত করেছে যে বিদেশী অতিলোভী কর গ্রহীতারা, তাদের জন্য তিনি চমৎকার সুস্বাদু কেকের ব্যবস্থা করে দেন নি কি? এইভাবে লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁর শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখলেন। ভূখণ্ড ও অর্থের লালসায় লর্ড লিটন যে লুণ্ঠন ক্রিয়া শুরু করেছিলেন ও লর্ড ডাফরিন যা অব্যাহত রেখেছিলেন, ল্যান্সডাউন তা সম্পূর্ণ করেছেন। ভারতের প্রশাসন প্রকাশ্য দিবালোকে যে সমস্ত অন্যায় অবিচার দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক ক্রিয়াকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের যে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা উচিত, এটা মনে করিয়ে দেওয়ার কি কোনো প্রয়োজন আছে? এইসব অ খ্রীষ্টানসুলভ কাজ-কর্মের যারা কর্তা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিচারের ব্যবস্থা দেখবার জন্য আমাদের জ্বলে উঠতে হবে। নিপীড়নের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। সব মিলিয়ে এরকম নির্লজ্জ বর্বরতা আমরা আগে কখনো দেখিনি। যে কোনো সরকার এর জন্য লজ্জায় লাল হ'ত। কিন্তু যেহেতু ভারতে বৃটিশ সরকার একটি খ্রীষ্ট মতাবলম্বী সৎ সরকার, এটা ধরে নিতে হবে যে পলের সম্পদ লুঠ করে পিটারকে দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে।"

"বিনিময়-জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা" প্রসঙ্গে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী

পত্রপত্রিকাতেও একই ধরণের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল—'বর্বরতা' 'নিষ্ঠুরতা', 'লুণ্ঠন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছিল। কলকাতার ভারতসভা এবং পুনার সর্বজনিক সভা প্রতিবাদ জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ১৮৯৩ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই ভাতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ নথিভুক্ত করা হয়; পরবর্তী দশ বছরও প্রতিটি অধিবেশনে এটি বিলোপের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জননেতারাও এ-বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একে "একটি অপরাধ ও অপরাধের থেকেও জঘন্য" এবং "অনুচ্চারণীয় নিলজ্জ ঘটনা" বলে বর্ণনা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন, "একে কি একটি সভ্য খৃষ্টমতাবলম্বী সৎ প্রশাসন বলা যায়!" দাদাভাই নৌরোজিও এই পদক্ষেপকে 'ভারতের দারিদ্রের উপর একটি হৃদয়হীন, স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর জুলুমবাজি" বলে বর্ণনা করে মন্তব্য করেন: "এরা শাইলকের থেকেও জঘন্য, শুধু একতাল মাংসখণ্ড নিয়ে এরা খুশি নয়, তার সঙ্গে এক আউন্স রক্তও চাই"।

বিনিময়-জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রবর্তন ক'রে যে অবিচার করা হয়েছিল তা ভারতীয় নেতাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কেননা, এর ফলে এমন এক সময় সরকারি অর্থভাণ্ডারের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছিল যখন এই ভাণ্ডার প্রায় শূন্য, নতুন সংকটের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, এবং নতুন নতুন শুল্কের আকারে কর প্রবর্তনের আশংকায় সমস্ত দেশ বিপন্ন। স্বভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে, ঐসব নতুন শুল্ক বিনিময়-জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রবর্তনেরই প্রত্যক্ষ ফল, এবং বৃটিশ কর্মচারিদের স্বার্থেই তা চাপানো হয়েছে। "সকাল-সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও যাদের দুবেলা অন্ন-সংস্থান হয় না", সেই দরিদ্র ভারতবাসীর নতুন কর-ভার বহন করার মতো অবস্থা আর ছিল না, অথচ তাদের উপরই আরো বোঝা চাপিয়ে যারা একটু কম বিলাসে দিনযাপনের কথা ভাবতে পারতেন, সেইসব ইউরোপীয় কর্মচারির জন্য আরো স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই ছিল এই ভাতার লক্ষ্য। ভারতীয় নেতাদের এই উপলব্ধিকে ১৮৯৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন: "সরকারের উচ্চ বেতনভূক কর্মচারিদের দুবেলা ব্র্যাণ্ডি মাংস ও শ্যাম্পেন যোগান দিতেই হবে, এবং তার জন্যই দরিদ্র ভারতবাসীর দুবেলা দুমুঠো নুন ভাত পাবার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হবে।" উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের "জামি উল উলুম"-ও লিখেছিল: "এইসব কর্মচারিদের বেতন দেওয়ার ক্ষমতাও ভারতবাসীর নেই, অথচ ডাকাতরা আরো বেশি চায়।"[১৩৯]

বিনিময় জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা যে শুধু বোঝাই নয়, এই ব্যবস্থা যে অন্যায়

ও অপ্রয়োজনীয়ও, সে বিষয়ে ভারতীয় নেতারা নিসংশয় ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। প্রথমতঃ সোনার হিসাবে টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় ভারতে কর্মে নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মচারিদের প্রকৃত অর্থে কোন ক্ষতি হয় নি, কারণ ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থের মূল্য যেটুকু কমে গিয়েছিল স্বদেশে ভোগ্যপণ্যের মূল্যের অবনতি ঘটার ফলে তা যথেষ্ট পরিমাণেই পূরণ হয়ে গেছে। ১৮৮৬ সালেই দাদাভাই এটা দেখিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় বললে, "এটা ঠিক যে তারা যে টাকা পাঠাচ্ছে তার বিনিময়ে কম সোনা পাবে, কিন্তু ইংলণ্ডে সোনার ক্রয়-ক্ষমতাও আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে"। দ্বিতীয়তঃ এইসব কর্মচারিদের বেতন ছিল অত্যধিক. "ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এতো বেশি যে বিনিময় হারে অবনতি ঘটার পরেও তা যথেষ্ট।"[২৮] তৃতীয়তঃ ভারতীয় নেতারা দেখালেন, যে যেহেতু ঐ কর্মচারিরা টাকায় বেতন গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, আইনগতভাবে এই বিশেষ সুবিধে তারা দাবি করতে পারেন না, কাজেই তাদের বেতনকে বিনিময় হারের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। অতীতে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যখন বেশি হয়েছিল বা হচ্ছিল তখন তো এই কর্মচারিরা চুক্তি অনুযায়ী টাকার মাধ্যমে বেতন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি, কাজেই ভবিষ্যতেও করবেন না। এই প্রসঙ্গে গোখেল দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, যেখানে বর্তমানে ২½% হারে সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব সেখানে সরকার রেলওয়ে কোম্পানিগুলিকে ৫% হারে সুদ দিয়ে যাচ্ছে, কারণ চুক্তি অনুসারে সেটাই দেয়। "অতএব", তিনি প্রশ্ন করেন, "ভারতের আর্থিক স্বার্থেও যখন বর্ত্তমান চুক্তিগুলিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়, তখন আর্থিক ক্ষতি করেই বা তা কেন করা হবে?"

ভারতীয় নেতারা স্পষ্ট করে এই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে, এই ভাতা সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণেও সরকার পরিচ্ছন্নতা ও ন্যায়-বিচারের পরিচয় দেয়নি। প্রথমতঃ এই ভাতা প্রকৃত প্রেরিত অর্থের পরিমানকে ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়নি, দেওয়া হচ্ছিল বেতনের অর্ধেকের উপর, তা সে বিদেশে প্রেরিত হোক বা না হোক। দ্বিতীয়তঃ এই ভাতা সেইসব কর্মচারিদেরই প্রাপ্য যারা টাকার মূল্য কমার আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছে, যারা "চোখ কান খোলা রেখে অবমূল্যায়নের পর নির্দিষ্ট বেতনের চুক্তি মেনে নিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছে" তাদের ক্ষেত্রে এই ভাতা প্রদান অনুচিত। তাছাড়া, এই ভাতা বর্ণ-বৈষম্যমূলক, কেননা যেসব ভারতীয় কর্মচারিদের আত্মীয় পরিজনের শিক্ষার জন্য বিদেশে টাকা পাঠাতে হয়, তাদের এই ভাতা দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনা থেকে ভারতের নেতারা দ্রুত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। "ভারতের জন-

সাধারণের স্বার্থকে অবহেলা করার এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষন করার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার" জন্য তাঁরা সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁরা অভিযোগ করলেন সরকার অর্থের অভাবের অজুহাতে স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নতি ও প্রশাসনিক সংস্কারের মতো আশু প্রয়োজনকে মুলতুবি রাখলেও বিনিময়-জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতার মতো একটি অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চালু করে ভারতীয় অর্থভাণ্ডারের উপর বোঝা চাপাতে একটুও দ্বিধা করেন নি। ১৮৯৩ সালের ২২শে আগস্ট "অমৃত বাজার পত্রিকা" ক্রোধের সঙ্গে মন্তব্য করে, "যেখানে দেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানোর মতো আর্থিক সংগতি নেই সেখানে ভারতীয় রায়তদের শোষণ করে মোটা হওয়া মোটা মাইনের সরকারি চাকুরেদের আরো চর্বি বাড়ানোর জন্য সরকারের অর্থের অভাব হয় না।" জি. কে গোখেলের অভিযোগও ছিল একই রকম :

"যখন গত পাঁচ বছর অর্থের অভাবের অজুহাতে দেশের মানুষের শিক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ও এক কানাকড়ি বাড়ানো সম্ভব হয়নি, তখন সরকার এক কলমের খোঁচায় শিক্ষাখাতে মোট সরকারি ব্যয়ের চেয়েও বেশি পরিমাণ টাকা ইউরোপীয় কর্মচারিদের দিয়ে দিচ্ছেন।"

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আরো একটি অভিযোগ করেছিলেন। মোটা মাইনের বৃটিশ কর্মচারিদের বেতন পরোক্ষভাবে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হলেও যেসব ভারতীয় কর্মচারিরা অত্যন্ত কম বেতনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কেরানি বা আমলা পদে নিযুক্ত আছেন, তাদের বেতনের উন্নতি হয়নি।

এইসব ঘটনাই প্রমাণ যে সম্পূর্ণত ইংলণ্ডের স্বার্থেই ভারত শাসিত হয়েছে। সন্দেহ নেই যে এই চিন্তা যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল। দাদাভাই নৌরোজি ছিলেন সর্বদাই আশাবাদী, এমনকি তিনিও হতাশার সঙ্গে লিখেছিলেন : "যখনই ইউরোপের স্বার্থের প্রশ্ন, তখন আইন ও হৃদয় অনায়াসে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় : তখন স্বৈরাচার ও বাহুবলই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র আইন ও যুক্তি"। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : "এই প্রস্তাব এমন একটি নীতির মূর্ত প্রকাশ যা সরকার নিয়মিত অনুসরণ করে আসছে। কী সেই নীতি ? —আমরা এ মাটির সন্তান, এ দেশের মজুর এবং অত্যন্ত নীচুশ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ, আমলাতন্ত্রের ঈশ্বরদের সেবা করার জন্যই আমাদের জন্ম"।[২২]

১৮৯৩ সালের ৩১শে আগস্ট "গুজরাট দর্পণ" নিম্নলিখিত ভাষায় তার ক্রোধ ও হতাশা ব্যক্ত করেছিল :

"লক্ষ লক্ষ মানুষের এইসব অভিভাবকদের কথা আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক ! এরা ৩০ কোটি মানুষকে পিতৃস্নেহে প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের মুখে পাঠিয়েছেন। দেশটা লুণ্ঠিত হচ্ছে, একথা ভাবলে

আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারি না। লুণ্ঠিত হচ্ছে,—তাদের দেশের অসংখ্য রাজহাঁসের মধ্য থেকে যেগুলোকে এখানে পাঠানো হয়েছে এদেশের ৩০ কোটি মানুষকে পালন করতে, শিক্ষিত করতে, সহ্য করতে, শাসন করতে, লাথি মারতে এমন কি প্রয়োজনবিশেষে মেরে ফেলতে—সেই রাজহাঁসদের খাইয়ে মোটা করার জন্য। এইসব পরম হিতৈষীদের হাত থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!"

অন্যান্য অনেক ভারতীয় নেতাও একই ধরণের সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন। বস্তুত, বিনিময়-জনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা বৃটিশ শাসনের চরিত্র ও ভারতে বৃটিশ কর্মচারিদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করেছিল।

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এরকম সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ টাকার বিনিময় মূল্যের অবনমন ও নিম্নহার সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করার সময় একদিকে উদীয়মান বস্ত্রশিল্প ও কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে অন্য কয়েকটি গোষ্ঠী ও শ্রেণীর স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, এমনকি তার বিরুদ্ধে বলেছেন।

বেতনভুক ভারতীয়রা এইরকম একটি গোষ্ঠী। এদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারি কর্মচারি, যাদের প্রত্যেকের আয়ই ছিল নির্দিষ্ট। এদের মধ্যে যারা বেশি মাইনে পেতেন, তাঁরা ছিলেন আমদানিকৃত বিলিতি ভোগ্য-পণ্যের ক্রেতা। টাঁকশাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার এবং তার ফলস্বরূপ ভারতে জিনিসের দাম কমতে থাকার ফলে স্পষ্টতই এই শ্রেণীর সুবিধে হয়েছিল। জাতীয় নেতৃত্ব এই শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বলেছেন—পরোক্ষে বা গোপনে নয়, কখনো কখনো প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট-ভাবে। একইভাবে মহাজনরাও টাকার মূল্য-বৃদ্ধি-জনিত পরিস্থিতির সুবিধেটা ভালোই পেয়েছিলো। এক্ষেত্রেও জাতীয় নেতৃত্ব শুধু যে কোনো সহানুভূতি দেখাননি তাই নয়, সরকারি মুদ্রানীতির বিরুদ্ধে তাঁদের একটি জোরালো যুক্তিই ছিল, মুদ্রা সংস্কারের ফলে এই শ্রেণীই সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। এইসব মহাজন ও বেতনভোগী সরকারি কর্মচারিদের লাভের ব্যাপারে জাতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের নবম অধিবেশনে ডি ই ওয়াচা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে সংক্ষেপে সুন্দর করে উপস্থিত করেছিলেন ঃ "মেহনতী জনগণ ও অতিরিক্ত করভারে ন্যুব্জ কৃষকশ্রেণী সরকারি কর্মচারি ও মহাজনদের অতিভোজনের দায় মেটাতে গিয়ে ক্রমশ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে"।

কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, জাতীয় নেতারা কার্যত মজুর শ্রমিকদের স্বার্থও উপেক্ষা করেছিলেন। জিনিসপত্রের দাম বাড়লে এদের মজুরিতে কুলোত না; দাম কমায় এরা অবশ্যই লাভবান হয়েছিল। মজার ব্যাপার, মজুর ও শ্রমিকদের এবং দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণের সঙ্গে জিনিষপত্রের দামের এই সম্পর্ককে অন্য প্রসঙ্গে

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেরাই সোচ্চারে স্বীকার করেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু, মুদ্রা সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় তাঁরা বিষয়টিকে আমলই দেননি।[৩০] তবে মুদ্রা-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করেছিলেন, এমনকি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও বলেছেন, সেটি বণিকশ্রেণী, বিশেষ করে আমদানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বণিক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়ঃ

(ক) আগেই যেটা উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের সঠিক মুদ্রানীতি কী হওয়া উচিত সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন নি।[৩১]

(খ) ভারতীয় নেতারা যে মুদ্রানীতি সুপারিশ করেছেন তা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বণিকদের একটা বড় অংশ যা দাবি করেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯২ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রায় বাহাদুর ধনপত সিং নিম্নলিখিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ "বিনিময়ের বর্তমান হার বাণিজ্যের পক্ষে ধ্বংসাত্মক; এই মুহূর্তেই যদি রূপোর মূল্যবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসবে যখন কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বহু নামী প্রতিষ্ঠানে তালা পড়বে"[৩১] ঐ বছরই যখন ইণ্ডিয়ান কারেন্সি এসোসিয়েশন টাঁকশাল বন্ধ ও স্বর্ণমান অবলম্বনের জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করে, তখন ভারতীয় বণিকদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৮৯২ সালের জুন মাসে করাচীর সাতাত্তর জন এবং অক্টোবর মাসে বম্বের ৬৭৪ জন বড় ব্যবসায়ী বিনিময় হারের স্থায়িত্বের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে পেশ করে। তাঁদের যুক্তি ছিল, "বিনিময় হারের অস্থিরতা"র ফলে কারবারের নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে এবং সমস্ত "বৈধ ব্যবসায়িক আদান-প্রদান বিশুদ্ধ ফাটকা ও জুয়াখেলায়" রূপান্তরিত হবার ঝোঁক বাড়ছে। স্যার সাপুরজী ভারুচা নামে বম্বের এক খুব বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিক টাঁকশাল বন্ধ ও স্বর্ণমান অবলম্বনের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছিলেন, কেননা টাকার মূল্যের ক্রমাবনতি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল এবং এর ফলে বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশ বাধা পাচ্ছিল। একইভাবে বাঙালী বণিক সম্প্রদায়ের মাথা জয় গোবিন্দ ল-ও ১৮৯৮ সালে সবার আগে "বিনিমর হারের স্থায়ীকরণের" দাবি জানিয়ে বারবার সরকারের উপর চাপ দেন।

(গ) পরিশেষে, কোনো কোনো ভারতীয় নেতা এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বণিকদের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় সোচ্চারও হয়েছিলেন। এই বণিক-দের অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী। এঁদের 'অসন্তোষ মনের মধ্যে পুষে না

রেখে' নিজেদের রাস্তা নিজেরাই দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। দাদাভাই নৌরোজির লেখায় এই বৈরিতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো:

"সবার আগে উল্লেখ করতে হবে বণিকদের যারা রায়তকে মেরে নিজেদের কারবারে ঝুঁকির হাত থেকে একটু রেহাই পাবার জন্য স্বর্ণমুদ্রার সমর্থনে আন্দোলন চালাচ্ছে। কারবারের মুনাফাটুকু এদের পকেটস্থ হবে, অথচ এর ফলে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে তার ফল ভোগ করতে হবে রায়তদের।— দরিদ্র রায়তকে অবশ্যই মুষ্টিমেয় বড়লোক কারবারীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে! হায়, ঈশ্বর, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন।"[৩২]

বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের ও তাদের দাবিকে জাতীয়তাবাদীরা এইভাবে দেখেছিলেন অথচ কাপড় কলের মালিকদের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। শুধু তাঁদের মুদ্রানীতিই নয় যে যুক্তিতে তাঁরা ঐ নীতি অবলম্বনের দাবি জানিয়েছেন তার সংগে বম্বের মিল মালিকদের দাবির হুবহু মিল ছিলো। ১৮৯৩, ১৮৯৮, ১৮৯৯, ১৯০০ এবং ১৯০১-এর বম্বে মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক রিপোর্ট এবং ১৮৯৩ সালের ১লা ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত জে. এন. টাটার সাক্ষাৎকার লক্ষ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনেক মিল-মালিককেই নিজের শিল্পের সপক্ষে জনমত তৈরির জন্য কংগ্রেসের প্লাটফর্মকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিলো। এবং এই কারণেই জে. এ. ওয়াদিয়া, ভিঠলদাস ডি থ্যাকারসে, সোরাবজী কারাকা এবং অম্বালাল সকরলাল দেশাই এর মত বড় বড় শিল্পপতিরা এই সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব যে টাকার অবমূল্যায়নকে সমর্থন করেছিলেন, আমাদের মতে, তার একমাত্র না হলেও একটা বড় কারণ, স্বদেশী পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে দেশে শিল্পায়ণের লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা। এটা ঠিক যে, টাকার মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাদের এই সমালোচনার কিছুটা ভিত্তি অবশ্যই ছিলো, কিন্তু তাঁরা যতটা দাবি করেছেন সম্ভবত ততটা নয়।[৩৩] তাছাড়া এটাও সত্য যে 'হোম চার্জেস' দেওয়ার জন্য সরকারের যে ঘাটতি হচ্ছিল তা ১৮৯৩ ও ১৮৯৯-এর মুদ্রা আইন করে প্রকৃত অর্থে রোধ করা যায় নি, শুধু তার বিপুল বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এবং এইভাবে প্রত্যক্ষ ঘাটতি চলতে থাকলে সরকার "হোম চার্জেস" কমাতে ও ব্যয় সংকোচন করতে বাধ্য হতো। কিন্তু তাসত্ত্বেও, এটা মনে করার সংগত কারণ আছে যে, শেষ পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পের স্পষ্ট ও প্রকৃত ক্ষতির সম্ভাবনাই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হয়েছিলো। এবং তার জন্যই মুদ্রা সমস্যায় তাঁরা এতটাই আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন যে সরকারের অনুনয়-বিনয় তাঁদের টলাতে পারে নি। অবশ্যই

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। সেই সময়ে এই শিল্প উৎপন্ন পণ্যের বাজারের জন্য মূলত পূর্ব এশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৯৫-৬ সালে ভারতীয় মিলগুলিতে মোট উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ৪৩০,৪৭২০০০ পাউন্ড, এর মধ্যে প্রায় ১৮৫,৫৯১০০০ পাউন্ড বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিলো, অধিকাংশটাই চীনে।[৩৪] বাস্তবে ১৮৭৫ সালের পর ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশের মূলে ছিল ভারতের তাঁত-জাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণের দ্রুত বৃদ্ধি। এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, নিম্ন বিনিময় হার ভারতে এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যের সংরক্ষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলো।[৩৫] এই শিল্পের পরবর্তী ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা নিঃসন্দেহে এটাই দেখি যে, সস্তা শ্রম ও কাঁচামালই এই শিল্পের অব্যাহত উন্নতির মূলে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সরকারের মুদ্রা-নীতির ফলে ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যে এই একমাত্র ভারতীয় আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, এই সত্যটিকে অস্বীকার করা যাবে না। সরকারের মুদ্রানীতি যাঁরা রচনা করেছিলেন সেই আমলারা পর্যন্ত এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। অর্থমন্ত্রী ডেভিড বারোর এই সমস্যা সমাধানকল্পে ১৮৯৩ সালে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মতি ছিল। প্রস্তাবটি এইরকম :

"এইসব বিরোধিতার একমাত্র উত্তর হোল, স্বর্ণমান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কোনো একটি বা সীমিত কয়েকটি কারণেই গ্রহণ না করা ; এটা করা যাবে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর। আমাদের দেখতে হবে যে এর ফলে সুফল কতটা হবে, এবং সেইমত কাজ করতে হবে।"

এই প্রশ্নে সরকারী মহল ও জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখা গিয়েছিল ঐ 'সুফলকে' কেন্দ্র করে। তাঁদের সুফলের ধারণা ছিল পরস্পর বিপরীত। সরকারের বক্তব্য ছিল, "রূপা ব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে যদি আমাদের ক্ষতি হয়ও স্বর্ণ-ব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের লাভ থেকে তা পুষিয়ে যাবে! কেননা আমাদের বাণিজ্য প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির সঙ্গে অনেক বেশি ও গুরুত্বপূর্ণও।" অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন, রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ কম হলেও স্বর্ণ-ব্যবহারকারী দেশের তুলনায় তার গুণগত মান অনেক বেশী। এবং স্বভাবতই দেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে স্বদেশী বস্ত্রশিল্প—যাকে তারা মনে করতেন দীর্ঘকালীন শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত—তার সমৃদ্ধির আশায় বাণিজ্যের পরিমাণগত দিকটাকে তাঁরা সানন্দে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আসলে, দেশের শিল্প বিকাশের জন্য ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব জ্ঞাতসারে বা

অজ্ঞাতসারে একটি অপছন্দের ব্যাপারকেও মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন—সেটা সম্পদ-নিষ্কাশন (drain)। কেননা, এটা স্পষ্ট যে, বিনিময় হারের ক্রমাবনতির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হচ্ছিল। অন্তত নতুন বিনিময় হারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নেওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালে দেশে ও বিদেশে ভারতের রপ্তানির দাম আমদানির দামের তুলনায় অনেকটা কম ছিল। যে অর্থনৈতিক নিয়মে বিদেশী পণ্যের আপেক্ষিক দাম বাড়লে ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত হওয়ার কথা, সেই একই নিয়মে যতদিন বিনিময় মূল্যের নিম্নগতি অক্ষুন্ন থাকবে ততদিন আমদানির আনুপাতিক দাম বেশি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। এর আগে দশম পরিচ্ছেদে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, ভারতীয় নেতারা বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারের বিরোধিতা করার সময় দেখা গেছে, তাঁরা সদ্যজাত ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে সম্পদ নিষ্কাশনের ঝুঁকি নিতেও গররাজি ছিলেন না। যদিও শিল্প বিকাশের জন্য বিনিময় মূল্যের ক্রমাবনমনের পদ্ধতি সম্ভবতঃ সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও অবাঞ্ছিত।

এর থেকে আমরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মুদ্রানীতির আর একটি দিক সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁদের কৃতিত্ব তাঁরাই সর্বপ্রথম ভারতীয় সমস্যার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করেছিলেন। ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে পরাধীন হওয়ায় দেশের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির উপর ভারতবাসীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই রাজনৈতিক দাসত্বের তাৎপর্য ছিল দ্বিবিধ: প্রথমত, দেশীয় শিল্পকে প্রয়োজনে সংরক্ষণ করার মতো শুল্কনীতি গ্রহণের অধিকার ভারতের ছিল না: দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলকভাবে তাকে "হোম চার্জেস" দিতে হোত। এই দুই অশুভ অবস্থার প্রতিকারের উপায় হিসাবে ভারতীয় নেতারা নিম্ন বিনিময় হারকে কার্যকরী ভেবেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এর ফলে একদিকে দেশীয় শিল্প সংরক্ষিত হবে এবং অন্যদিকে "হোম-চার্জে"স-এর পরিমাণ কমবে, কেননা আজ হোক কাল হোক সরকারকে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে হবে এবং আরো বেশি সংখ্যায় ভারতীয়কে চাকুরীতে নিয়োগও করতে হবে। ঘটনা যাই হোক, নিম্ন বিনিময় হার যে "হোম-চার্জেসে"র সমস্যাটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যদিও তাঁরা যে প্রতিষেধকের কথা ভেবেছেন, তা উভয়দিক থেকেই খুবই মহার্ঘ ছিল, সম্ভবত স্বাভাবিক অবস্থায় অভাবনীয়ও, তবুও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এটি সুপারিশ করেছেন, কারণ, খুব সম্ভব, তাঁরা ভেবেছিলেন যে ভারতের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় নিমজ্জিত দেশে এইটিই ছিল একমাত্র পথ।

টীকা

১। ইংলণ্ড ও ভারতের কিছু লোকের ধারণা ছিল. ১৮৭৩ সালের পর বিশ বছর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধির, প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার, কারণ টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস। কিন্তু সাধারণভাবে এটা কেউ বিশ্বাস করতেন না, এখনও করেন না। সে যাই হোক না কেন, ভারতের বণিক সম্প্রদায় অন্তত তাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হ্রাসমান বিনিময় মূল্যের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৩ সালের ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির প্রতিবেদনের ২৫-২৬ অনুচ্ছেদ এবং ১৮৮৬-৭ ও ১৮৯১-৯২ সালের "আর্থিক বিবৃতি" দ্রঃ।

২। বেসামরিক ও যাজক, ধর্ম, ইংরেজরা এবং নৌসেনা ও সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ইউরোপীয় অফিসাররা ১৮৯৩ সালে গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন, সেটি দ্রঃ। ১৮৯৩ সালের ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির মিনিটস ও পরিশিষ্টাংশে তা আছে।

৩। ভারতের পরপর তিনজন ভাইসরয় এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন—ল্যান্সডাউন, বক্তৃতাবলী, খণ্ড-২. পৃঃ ৬২১ ; এলগিন, বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৪৮৯ ; এবং কার্জন বক্তৃতাবলী, খণ্ড-২. পৃঃ ২৭৬ দ্রঃ। আরো দ্রঃ—১৮৯৩ সালের ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির প্রতিবেদন—অনু, ২৮।

৪। দ্রঃ—জি. ডবলিউ, ফরেস্ট : "এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি মার্কুইজ অব ল্যান্সডাউন এ্যাজ ভাইসরয় এ্যাণ্ড গভর্নর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া. ১৮৮৮ ৯৩", পৃঃ ৫৫-৬। ইণ্ডিয়ান কারেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের বিস্তারিত মতামতের জন্য দ্রঃ—১৩ই জুলাই ১৮৯২ সালের প্রসিডিংস এবং ল্যান্সডাউনের বক্তৃতাবলী, খণ্ড-২, পৃঃ ৫১৮-২০। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতামতের জন্য দ্রঃ—১৮৯২ সালের ২৯শে মে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা।

৫। "কোনো দেশ স্বর্ণ বিনিময় মান অবলম্বন করছে তখনই বলা যাবে যখন সেই দেশে সোনার প্রচার ততটা নেই এবং স্থানীয় অর্থের বিনিময়ে সোনা সর্বদা প্রাপ্যও নয়, কিন্তু সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশে পাঠানোর জন্য স্থানীয় অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ হারে সোনা যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সোনা যতটা সম্ভব বিদেশে সঞ্চিত রাখে". (কেইনস. পৃঃ ৩০ ৩১)।

৬। কেইনস, পৃঃ ১৩৩। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"তারা (অর্থাৎ ভারত সরকার) তাদের নীতি রচনা করেছে অনেকটা এইরকম—যেন, জনসাধারণ প্রবল ক্ষুধায় মুদ্রা খেয়ে নিচ্ছে, ঠিক যেভাবে কোনো-কোনো দেশের মানুষ বিয়ার খায় সেইভাবে" (পৃঃ ১৩৪)।

৭। জি. ভি. যোশি রূপোর স্বর্ণমান নেমে যাচ্ছে দেখেও বিস্ময়করভাবে অনুদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অল্পদিনের মধ্যেই চাহিদা-যোগানের নিয়মে ভারসাম্যাবস্থা ফিরে আসবে, এমনকি রূপোর দাম বাড়তেও পারে।

৮। এক্ষেত্রেও জি. ভি. যোশি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি টাকার পরিবর্তে স্টার্লিং-এ ঋণ-গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন, কেননা স্টার্লিং-এর ঋণ এ সুদের হার ছিল কম। যোশি বিশ্বাস করতেন সস্তা টাকায় যে লাভের সম্ভাবনা বিনিময় মূল্য কমিয়ে তা বাতিল করা যাবে না।

৯। দ্রঃ—এস. এইচ. ভকিল: "দ্য কারেন্সি প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড স্যার ডেভিড বার্বো. দ্য এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, এ্যান্ড দ্য রুপি", বোম্বাই, ১৮৯২, পৃঃ ২ (সম্ভবত এইটিই প্রথম একজন ভারতীয় লেখকের করা ভারতের মুদ্রা সমস্যার পর্যালোচনা)।

১০। লর্ড এলগিন একইরকম মিথ্যার ভিত্তিতে সরকারি মুদ্রানীতির পিছনে জনসমর্থন আছে বলে দাবি করেছিলেন। আরো সম্প্রতি পার্সিভ্যাল স্পিয়ারও ঐ ভুলই করেছেন: "কংগ্রেসের পশ্চিম-ভারতীয় বাণিজ্যমনা সদস্যারা টাকার বিনিময় মূল্যহ্রাস রোধে ব্যর্থতার জন্য সরকারের সমালোচনা করেছিলেন"....'ইন্ডিয়া এ মডার্ন হিস্টরি', (এ্যান আর্বর, ১৯৬১, পৃঃ ৩১২)।

১১। প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র একজনই—'হিন্দুস্তান' কাগজের মালিক রাজা রামপাল সিং.—এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে স্বর্ণমানের সপক্ষে বলেছিলেন।

১২। "কমিটির সদস্যারা সবাই সরকারি কর্মচারি কিংবা কর্মচারি নন এমন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, এবং ব্রিটিশ পুঁজি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের স্বার্থের প্রতিভূ, কাজেই কে সাক্ষ্য দেবে? ঐসব এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারিরা এবং ব্রিটিশ পুঁজি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রতিনিধিরা?" (১৮৯৮ সালের ২৭শে মে "ইন্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা নৌরোজির চিঠি)।

১৩। ১৯০০ সালে ফিরোজশাহ মেহতা মন্তব্য করেন: এটা "টাঁকশাল বন্ধ করার পরোক্ষ ফল-স্বরূপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ঘটনা; কেননা টাঁকশাল বন্ধ হওয়ায় লোকে দুর্ভিক্ষের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।"

১৪। ১৮৯৮ সালে ওয়াচা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জানিয়েছিলেন, তদানীন্তন প্রচলিত মুদ্রা ঠিকই ছিল: "এই মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ কখনই অভিযোগ করেনি; বিশেষজ্ঞদের মতেও ভারতের মানুষের পক্ষে এটি সবচেয়ে উপযোগী ও সুবিধেজনক এবং সর্বপ্রকারেই তাদের বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে সহায়ক।"

১৫। ১৮৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি লাহোরের "রফিক-ই হিন্দ" লেখে: "একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল, সরকার আমদানি কর তুলে দিয়ে ভারতের ক্ষতি করে ইংলন্ডকে লাভবান করাতে চাইছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক ঈশ্বর তাই বিনিময় মূল্যের প্রশ্ন তুলেছেন সরকারের ঐ প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেবার জন্য।"

আর সি· দত্তও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিনিময় মূল্যের নীচু হার ভারতীয় শিল্পের পক্ষে ভালো। ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি "ব্রাহ্ম জনমত" লিখেছিল—ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের রপ্তানির পরিমাণ যে কমে গিয়েছে তার কারণ বিনিময় হার হ্রাস; আমদানি শুল্ক তুলে দিয়ে যে ত্রাণ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাও যথেষ্ট হয়নি।

১৬। জে. এ., ওয়াদিয়া-ও ১৯০১ সালে একই বক্তব্য রেখেছিলেন, তবে অন্য প্রসঙ্গে।

১৭। রায়, "দারিদ্র", পৃঃ ১২৯-৩১।

১৮। ১৮৯২ সালের ১৭ই জুলাই "অমৃতবাজার পত্রিকা" এই ব্যাপারে একটি সুন্দর যুক্তি উপস্থিত করে। "পত্রিকা" লিখেছিল, টাকার অবমূল্যায়ণ হলে স্বাভাবিক কারণেই রপ্তানি বৃদ্ধি পেত এবং ভারতে রুপোর আমদানি বেশি হত, আর তার ফলে ভারতের রুপোর দাম যেত কমে, এই "অবমূল্যায়ন ভারতে ও বিদেশে একই হারে ঘটত।" কিন্তু এই অর্থনৈতিক কার্য-কারণের জালটি ছিন্ন করে দিয়েছিল একটি ঘটনা।

ভারতের রপ্তানি উদ্বৃত্তের সবটাই যেত "পাচার' হয়ে, যে কারণে রপ্তানির মূল্য প্রকৃতপক্ষে কমে গিয়েছিল, এবং দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১৯। ১৮৯২ সালের ১৭ই জুলাই "অমৃতবাজার" লিখেছিল: "বিনিময় সমস্যা ভারতকে সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাকৃতিক বিধান, তা সে যত দুর্বলই হ'ক না কেন। ভারত যে অস্বাভাবিক "নিষ্কাশনের" কবলে পতিত, এটা তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ "।

২০। ১৮৯৩ সালের কারেন্সি কমিটি এই যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়ে মন্তব্য করেছিল: "আমরা একটি পূর্বস্বীকৃত প্রতিজ্ঞা থেকে এগিয়েছি, তা হ'ল বর্তমান অনুপাত বা এর থেকে খুব কমই বিচ্যুত অনুপাত—রক্ষিত হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, টাকার বর্তমান দাম এখুনি পরিবর্তিত হচ্ছে না।"

২১। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে ভি. ডি. থ্যাকারসে একইরকম প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

২২। ওয়াচা দেখিয়েছিলেন যে, ভারতের সুতী কলের উৎপন্নের অধিকাংশই চীন ও জাপানে যেত।

২৩। আমেদাবাদের আর একজন মিল মালিক, মোরারজী কারাকা, তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কারাকাও জোর দিয়ে বলেন যে, মুদ্রা আইন প্রকৃত অর্থেই এদেশের মিল শিল্পকে হত্যা করেছে।

২৪। রায় এবং এলগিন ও কার্জনের মত অন্য অনেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে যেহেতু ভারতের বাণিজ্যের শতকরা আশি ভাগই স্বর্ণমান অনুসরণকারী দেশের সঙ্গে, সেজন্য টাকার সঙ্গে সোনার সুস্থিত সম্পর্ক তৈরি হলেই ভারত লাভবান হতে বাধ্য।

আমরা বারবারই দেখিয়েছি ভারতীয় নেতারা কখনই সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন শুধু সেই ক্ষুদ্র অংশে, যেটি দেশের শিল্পায়ণ প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল।

২৫। কয়েক বছর পরে, ১৯০৮ সালে, গোখেল সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন: "সত্যি কথা বলতে কি, সরকারি মুদ্রা আইনে টাকার যে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে তার ফলে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন তার পরে দেশের পণ্যের দামস্তর নেমে যাবে। টাঁকশালে স্বাধীনভাবে রুপোর টাকা তৈরি করতে দেওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর এই প্রক্রিয়াটি দুর্ভিক্ষ, অভাব এবং সম্ভবত স্বল্প পরিমাণে হলেও সঞ্চিত মুদ্রা বাজারে আসার ফলে, প্রতিহত হয়েছে। এরপর পৃথিবী জুড়ে পণ্যের স্বর্ণমূল্যের সাধারণ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ভারতে দাম বাড়তে সাহায্য করেছিল।...আমাদের মুদ্রা-বিষয়ক পরিসংখ্যান থেকে এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে...১৮৯৮ সালের আগে এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মিঃ হ্যারিসন-এর হিসাবমত ভারতে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি টাকা। গত দশ বছরে সরকার এর সঙ্গে নীট যোগ করেছে আরও ১৩০ কোটির বেশি। আমার মনে হয়, এই হঠাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ দাম বাড়তে বাধ্য।" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ১৭৭ ৯)

২৬। এই পাকামি সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষ করে আমরা যদি মনে রাখি, ফাউলার কমিশন ঠিক বিপরীত মত—যদিও সন্দিগ্ধভাবে—প্রকাশ করেছিল। দ্রঃ—১৮৯৮ সালের ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির প্রতিবেদন, অনুঃ ৫৮। "বেঙ্গলী" যে অভিমত দিয়েছিল তা পরে জে.এম কেইনসের সমর্থন পেয়েছে। আর একজন ভারতীয় লেখক, রানছোরলাল ছোটেলাল, যিনি সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী নেতা নন, আমেদাবাদের একজন মিল

মালিক ও বোম্বাই-এর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ১৮৯৪ সালে সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন নিজের উদ্যোগে নতুন টাকা ছাপার জন্য। তাঁর যুক্তি: "ভারত রৌপ্যমান থেকে একবার বিযুক্ত হলে এবং টাকা প্রতীকী মুদ্রায় পরিণত হলে, তখন টাকার যোগান অতুল না প্রতুল তার কোনো প্রভাব আর ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণে পড়বে না। বিনিময় হার তখন নির্ভর করবে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের উপর। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিস্থিতিতে টাকার অপ্রতুলতা শিল্প ও কৃষিকে ব্যাহত ক'রে এবং ফলত রপ্তানির গতিরোধ ক'রে, টাকার মূল্য কমাতে সাহায্য করবে।" ("মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে চিঠিপত্র", বোম্বাই, ১৮৯৫)।

২৭। ১৮৯৩ সালের কারেন্সি এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর ঐ বছর ২রা জুলাই "মাহরাট্টা" এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছিল: এই দেশের মানুষের স্বার্থের কথা না-ভেবেই আইনটি পাস করা হয়েছে, "অন্য কোনো দেশের মুদ্রাব্যবস্থায় এই ধরণের মৌলিক পরিবর্তন এত সহজে করা যেত না!"

২৮। ১৮৯৪ সালে জেনারেল চেসনি তাঁর "ইণ্ডিয়ান পলিটি" (পৃঃ ৩৩৬-৯) বইয়ে ইংরেজ অফিসারদের "দুর্দশা"র যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে বোঝা যায় এই মনোভাব ও এ-বিষয়ে ইংরেজ কর্মচারিদের অবস্থান কতটা পৃথক ছিল। চেসনি লিখেছেন: "শুধু ভাত খেলে আর ক্যালিকোর পোষাক পরিধান করলে তবেই টাকার অবমূল্যায়নের ফলাফল থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব হত।...ফলত, ভারতে নিযুক্ত সামরিক বা বেসামরিক একজন ছোট অফিসারের জীবন ছিল দারিদ্র ও কষ্টে ভরা"। চেসনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু করা না হয় তাহলে ইংরেজ অফিসাররা "নানা ধরণের প্রলোভনের ফাঁদে" ধরা দিতে বাধ্য হবেন।

২৯। এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন: "বোম্বাই-এর মান্যগণ্য লোকেরা, পাঞ্জাবের মানুষ, উত্তর ভারত ও বাংলার সবাই—আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াই; যতদিন না এই অন্যায়-অবিচারের দেবতাদের বোঝাতে পারছি, ততদিন আমরা ক্ষান্ত হব না; আমরা ক্ষান্ত হব না ততদিন, যতদিন না এই দেশটা আমাদের নয় তাদের, এই বিভ্রান্তি থেকে তারা মুক্ত হচ্ছে।"

৩০। স্বর্ণমানের অন্যতম সমর্থক এম বি ভারুচা ১৯০৩ সালে স্বল্প-বিনিময় হারের প্রবক্তাদের সমালোচনা করে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন—"সুতো কলের এইসব প্রতিনিধিরা কেন টাকার মূল্য কমিয়ে ৬ পেঃ মূল্যের রুপোর সমান করতে চাইছেন? উদ্দেশ্য, শ্রমিকদের আরো শোষণ করা। শ্রমিক শোষণে লিপ্ত এইসব ভদ্রলোকেরাই এখন দরিদ্র রায়তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়েছেন" (ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে বক্তৃতাবলী, পৃঃ ২৬)

৩১। বাংলার "সহচর" ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। পত্রিকাটি আগাগোড়া স্বর্ণ-মান প্রবর্তনকে সমর্থন ক'রে কম ও অস্থির বিনিময় হারের বিরোধিতা করেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ও ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধিই ছিল প্রধান যুক্তি।

৩২। দুর্ভাগ্যবশত, আমি চেম্বার-এর ১৮৯৩ ও ৯৪ সালের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে ১৮৯৭-৯৮ সালের প্রতিবেদন থেকে চেম্বারের চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে বিনিময় হারের অনিশ্চয়তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা চালু রাখার এবং টাকার বিনিময়যোগ্যতা ও অনুপাতকে সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

৩৩। নৌরোজি ঃ পভার্টি, পৃঃ ৫৬১ ; এবং ৫৪৭। ১৮৯৩ সালে ইণ্ডিয়ান কারেন্সি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দাদাভাই একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, ১৯০১ সালে জে, কে, ওয়াদিয়া বলেছিলেন, তিনি "রায়তদের চিরন্তন ক্ষতির থেকে ব্যবসায়ীদের সাময়িক লোকসানকে শ্রেয়" মনে করেন।

৩৪। ১৮৯৮ সালে কারেন্সি কমিটির প্রশ্নের উত্তরে রমেশচন্দ্র দত্ত এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৩৫। আমরা ১৮৯০-৯৬ সালকে বেছে নিয়েছি কারণ স্ট্যাটিসটিকাল এ্যাবস্ট্রাকটে ঐ বছর থেকে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে।

৩৬। রুপো ও টাকার দাম যখন পড়ছিল সেই সময় দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় সুতোর রপ্তানি কয়েকগুণ বাড়লেও ইংলণ্ড থেকে রপ্তানি করা সুতোর পরিমাণ স্থির ছিল।

৩৭। দাদাভাই নৌরোজি একেই "শাসনব্যবস্থার বৈদেশিকত্ব" বলেছেন।

৮

শ্রম

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক কলকারখানা, খনি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাগিচা শিল্পের বিকাশের ফলে ভারতীয় সমাজে সম্পূর্ণ নূতন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সেটি শিল্প-শ্রমিক শ্রেণী। ১৮৮০—৮১ সাল পর্যন্ত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ঐ বছর কাপড় কল, চটকল ও কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭, ৯৫৫ ; ৩৫, ২৩৫ এবং ১১,৯৬৯। ১৯০৫-৬ নাগাদ এই নূতন শ্রেণীর আয়তন অন্তত সংখ্যার হিসেবে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ঐ বছর কাপড়কল, চটকল এবং কয়লা-খনি গুলিতে যথাক্রমে ২১২,৭২০ ; ১৪৪, ৮৭৯ এবং ৮৯,৯৯৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিল। কেবলমাত্র যন্ত্রশক্তি-চালিত আধুনিক কলকারখানাতেই কাজ পেয়েছিল প্রায় ৭0,000 শ্রমিক।

আধুনিক শিল্প এবং তার সহযোগী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার কুফলও দেখা গেল, যা এর আগে কয়েক প্রজন্মের ইংরেজ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিসহ করেছিল। নতুন নতুন কলকারখানায় নিযুক্ত প্রথম দিকের ভারতীয় স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু শ্রমিকদেরও আধুনিক মানুষের জানা সবরকম নির্মম ও নক্কারজনক শোষণের শিকার হতে হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না, যার ফলে তাদের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হ'ত। শুরুতে একটি কারখানায় কাজ হ'ত দিনের আলোয়, অর্থাৎ শীতকালে, দৈনিক ১১½ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহে ৮০½ ঘণ্টা এবং গরমের সময় দৈনিক ১৪ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহে ৯৮ ঘণ্টা। ১৮৮৭ সাল নাগাদ বিদ্যুতের আলো এল। তারপর দৈনিক কাজের সময় আরো বেড়ে দাঁড়ালো' বিভিন্ন অঞ্চলে ১২½ থেকে ১৬ ঘণ্টা। সব চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল কলকাতার চটকল শ্রমিকদের। তাদের কাজ করতে হত দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা।[১] কায়িক দুর্ভোগ সইতে হত আরো বেশি। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা ছাড়াও অনেককেই কারখানায় যাওয়া আসার জন্য রোজ দু'তিন ঘণ্টা করে হাঁটতে হ'ত।

তার উপর এই দুঃসহ কাজের ভার লাঘব করার জন্য নিয়মিত বিরতির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কোনো কোনো কারখানার মালিক অবশ্য বিশ্রামের সময় দিত, কিন্তু খুবই সামান্য--মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মিনিট। অন্যত্র "তাও

মিলত না। মেসিনের সঙ্গে কাজ করতে করতেই "শ্রমিকদের খেয়ে নিতে হ'ত।" তাছাড়া নিয়মিত ছুটির দিন বলেও কিছু ছিল না। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন মন্তব্য করেছিল, "ভারতের কল কারখানায় সারা বছরে গড়ে মাত্র ১৫ দিন ছুটি দেওয়া হয়, যেখানে ইংল্যান্ডে ছুটি থাকে বছরে বাহান্নটা রবিবার এবং বাহান্নটা অর্ধ শনিবার ছাড়াও আরো দশদিন, অর্থাৎ মোট ৮৮ দিন।" এই অমানুষিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেত। যার জন্য প্রায়ই দেখা যেত তারা "মেসিন থেকে ছাড়া পেয়ে কারখানার দরজা পেরোনোর আগেই কারখানার মেঝেতে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।"

আরও জঘন্য ব্যাপার, ১৮৯১ সালের আগে নারী শ্রমিকদের কাজের সময়ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান ছিল। ঐ বছর এ ব্যবস্থা রদ ক'রে সর্বোচ্চ কাজের সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হ'ল, দৈনিক ১১ ঘণ্টা। গোড়ার দিকে শিশু শ্রমিকদের ছিল একই হাল। ১৮৮১ সালের আগে পর্যন্ত তাদের পুরুষদের সমান কাজ করতে হত। যার ফলে মাঝে মাঝেই দেখা যেত "নিদারুণ পরিশ্রান্ত হয়ে তারা মেসিনের পাশে পড়ে রয়েছে।" ১৮৮১ সালের ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্টে শিশুদের কাজের সময় সীমা বেঁধে দিয়ে দিনে ৯ ঘণ্টা করা হয়েছিল। শিশু বলতে বোঝানো হ'ল ৭ থেকে ১২ বছরের বালক বালিকাকে। কিন্তু তাসত্ত্বেও "বহু ক্ষেত্রেই শিশুদেরও পুরুষদের মতই সমান সময় কাজ করতে হত।" এরপর ১৮৯১ সালের ফ্যাক্টরি আইনে শিশুদের কাজের সময় আরো কমিয়ে দৈনিক ৭ ঘণ্টা করা হয়েছিল, এবং শিশুর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়স-সীমা নির্ধারিত করা হয়েছিল যথাক্রমে ৯ এবং ১৪ বছর। কিন্তু এই নিয়ম বাস্তবে প্রায়ই ভঙ্গ করা হ'ত।

প্রথম থেকেই ছোটো ছোটো আর বছরের নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকে এমন সব কারখানা—যেমন তুলা ঝাড়াই, পেষাই কল ইত্যাদিতে—কাজের পরিবেশ ছিল আরো ভয়াবহ। ১৮৮৫ সালের বোম্বাই ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন দেখিয়েছিল যে খান্দেশের ঝাড়াই পেষাই কলগুলিতে অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল নারী ও শিশু। তাদের কাজ করতে হত ভোর চারটা কি পাঁচটা থেকে রাত সাতটা, আটটা, এমন কি ন'টা পর্যন্ত : "বেশি চাপের সময় কখনো কখনো তাদের এক নাগাড়ে আট দিন দিবারাত্রি কাজ ক রে যেতে হতো —একেবারে ভেঙে না-পড়া পর্যন্ত।" কমিশনের কাছে পেশ করা সাক্ষী সাবুদ উদ্ধৃত ক'রে কমিশন এইসব কারখানার "ভয়াবহ অবস্থার" এবং "একদিকে নিদারুণ অভাব অনটন, অন্যদিকে নিষ্ঠুর অর্থলিপ্সা"র ছবি তুলে ধরেছিল। একজন সাক্ষীর স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি এরকম দৃশ্যও দেখেছেন, "নারী শ্রমিক ঘুমন্ত অবস্থায় যান্ত্রিক ভাবে মেসিনে তুলোর জোগান দিয়ে চলেছে, তার বুকের উপর একটি শিশু, সে একবার স্তন্যপান করছে, পরের মুহূর্তে মেসিনে তুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে।"

অবস্থাটা আরো অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, এই অমানুষিক হাড়-ভাঙা খাটুনির পারিশ্রমিক ছিল, যে কোনো বিচারে, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যেমন, বোম্বাইয়ের তুলাকলের পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন ছিল বছরের অধিকাংশ সময় মাসিক ৭ থেকে ২০ টাকার মধ্যে। ছোটো ছোটো তুলা ঝাড়াই কলে দৈনিক প্রায় ১৮ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া যেত তিন থেকে চার আনা। তদুপরি - একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা — শিল্পের উন্নতি বা শ্রমের উৎপাদন-শীলতা বাড়লেও প্রকৃত বেতনে খুব একটা পরিবর্তন দেখা যেত না।[২] স্মরণ রাখা দরকার, এটা ঘটেছে যখন শিল্পক্ষেত্রে রমরমা অবস্থা, এবং যখন অনেক কারখানা মাত্র চার বছরের মধ্যে তাদের মূলধন উশুল ক'রে নিয়েছে।

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্ব দেশবাসীর দুঃখ কষ্টে খুবই বিচলিত বোধ করেছেন। কিন্তু আধুনিক শিল্প পুঁজিবাদের বিভিন্ন কুফল এবং নতুন সামাজিক শ্রেণীর আর্থিক দুরবস্থা ও শোষনের ব্যাপারে তাঁরা কী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এর সঙ্গে জড়িত ছিল পরস্পর বিরোধী দুটি স্বার্থ—উভয়ই আংশিকভাবে হলেও, ভারতীয়, সুতরাং জাতীয়। এই প্রসঙ্গে চরমতম দারিদ্র্যে ও উল্লেখ করা যেতে পারে, তার জন্য কিছুটা পরিমাণে দায়ী ছিল ভারতীয়দেরই একাংশের লোভ।

উদীয়মান ভারতীয় নেতৃত্বের শ্রমনীতি বিশদভাবে পরীক্ষা করার আগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই শ্রমনীতি স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠেনি; এর জন্ম হয়েছিল মূলত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি অথবা তাদের কাজের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রন করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকে। দ্বিতীয়ত — ভারতীয় নেতৃত্বের মনোভাব বিশ্লেষণের জন্য শ্রমসংক্রান্ত নানা সমস্যার প্রসঙ্গে নেতাদের বিভিন্ন অংশের প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট মন্তব্য যতটা মূল্যবান প্রায় ততটাই মূল্যবান ঐ সব প্রসঙ্গে তাঁদের মন্তব্যের অনুপস্থিতি। তৃতীয়ত - আধুনিক কলকারখানার অধিকাংশেরই মালিকানা অংশত অথবা পুরোপুরি ভারতীয়দের ছিল, কিন্তু বাগিচা শিল্প ও রেল-ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি বিদেশী মালিকানাধীন এবং এই দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল।

১. ১৮৮১ সালের কারখানা আইন ও জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া

লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি প্রথম উত্থাপিত হয় ইংল্যান্ডে। সেখানকার লোকহিতৈষী মানুষেরা এবং বস্ত্র উৎপাদকেরা ভারতে কলকারখানায় নিযুক্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণয়নের দাবিতে

একযোগে সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাংসদরা এবং ম্যানচেস্টার চেম্বার অব কমার্সের মত বেসরকারি সংগঠন, ভারত সচিবকে এ ব্যাপারে নিয়মিত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তাঁর প্রনোদনায় ও নির্দেশে বোম্বাই সরকার ১৮৭৫ সালের ২৫শে মার্চ বোম্বাইয়ের কলকারখানার শ্রমিকদের কাজের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ও উন্নতিবিধানে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে একটা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি : কমিশনের প্রতিবেদনে মাত্র দু'জন স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট এবং অন্য একজন সদস্য, ডাঃ ব্লানে। এই প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এক ঘণ্টার বিরতি সহ দৈনিক বারো ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া এবং সপ্তাহে একদিন ছুটি, ৮ বছরের কম-বয়েসি শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা ও ৮ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের কাজের সময় দৈনিক আট ঘণ্টা করার জন্য একটি সরল আইন প্রণয়ণের সুপারিশ করা হয়। কমিশনের আরো ৭ জন সদস্য ছিলেন, এবং মজার ব্যাপার, তাঁদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন সুতী শিল্পে অর্থ লগ্নিকারী। এরা কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে যে-কোনোরকম আইনের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে বোম্বাই সরকার এ বিষয়ে আর অগ্রসর না হবার পক্ষে একটা অজুহাত পেয়ে গেলেন। যুক্তি দেওয়া হ'ল, সরকারি হস্তক্ষেপ করার পক্ষে মতামত যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই ধরণের হস্তক্ষেপ করতে গেলে বোম্বাইয়ের এই উঠতি শিল্পের লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি হবে।[৩]

এরপর ইংলণ্ডে ভারতের কারখানার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি আরো জোরদার হয়ে উঠে। বোম্বাইবাসী কিছু পরোপকারী ব্যক্তির সক্রিয় সমর্থন এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, সোরাবজি শাপুরজি বেঙ্গলী। কারখানা আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলনকে উৎসাহ যোগাতে পুরুষ, নারী ও শিশু শ্রমিকের কাজের সময় মাঝে এক ঘণ্টার বিরতি সহ, যথাক্রমে ১১, ১০ এবং ৯ ঘণ্টা করার প্রস্তাব করে তিনি একটি খসড়া আইন রচনা করেন। ভারত সরকার অবশ্য তাঁকে ঐ আইনের প্রস্তাব বোম্বাই আইন সভায় উত্থাপনের অনুমতি দেননি। কারখানা আইনের অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে ছিল পুনা থেকে প্রকাশিত মিশনারি সংবাদপত্র দৈনোদয়া। পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও জাগরণের ক্ষীণ আভাস দেখা যাচ্ছিল। যেমন, ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বরে জনৈক রাঘব সখারাম—যিনি নিজেই ছিলেন শ্রমজীবী—এবং দেওয়ান চমনলালের মতে ভারতের সর্বপ্রথম শ্রমিক নেতা—মিল শ্রমিকদের এক সভার আয়োজন করেন। ৫৭৮ জন শ্রমিকের স্বাক্ষর যুক্ত একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। তাঁদের দাবি ছিল সপ্তাহে একদিন ছুটিসহ দৈনিক ৯ ঘণ্টার কাজ। কিছুদিন পর ৬৩৪ জন

শ্রমিকের দ্বারা স্বাক্ষরিত আর একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন বালাজি রামচন্দ্র ফাকড়।

একদিকে ইংল্যান্ড ও ভারতে বিক্ষোভ এবং অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের তীব্র বিরোধিতা, এই দুইয়ের ফলে ভারত সরকার ১৮৭৯ সালের ৭ই নভেম্বর সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের দরবারে একটা নিরীহ ধরনের আইনের প্রস্তাব পেশ করে। অনেক পরিবর্তন ও তরলীকরণের পর ১৮৮১ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে তা ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৮৮১ নামে গৃহীত হয়েছিল। এই আইনে প্রধানত শিশু শ্রমের বিষয়টি ছিল। কারখানায় কাজে নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত হ'ল ৭ বছর। শুধু তাই নয়, ৭ থেকে ১২ বছরের শিশুদের দিনে ৯ ঘণ্টার বেশি কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হল। তাছাড়া, তাদের দৈনিক এক ঘণ্টা বিরতি এবং মাসে চারদিন ছুটির ব্যবস্থা করা হ'ল। তাছাড়া, বিপজ্জনক মেসিনপত্র সতর্কভাবে বেড়া দিয়ে রাখার এবং দুর্ঘটনা ঘটলে সত্বর স্থানীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তবে এই আইন শুধু সেই সব কারখানার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল যে সব কারখানায় যন্ত্রচালিত শক্তি ব্যবহার করে ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক নিয়ে বছরে চার মাসের বেশি কাজ হ'ত। নীল তৈরির কারখানা, চা এবং কফি বাগিচাকে আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের কাজের সময় নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করা হয়নি।

কাজেই ১৮৮১ সালের ভারতীয় কারখানা আইনটি ছিল নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং নির্বিষ একটা ব্যাপার। স্বয়ং সরকারও তা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বার্তায় অস্থায়ী সচিব লিখেছিলেন, আইনটি প্রণয়ন করার সময় মিল মালিকদের এবং বণিক ও অন্যান্য সংগঠনের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। · বাস্তবিকপক্ষে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর চাইতে নরম আইন প্রণয়ন সম্ভব ছিল না।'

প্রথমে কারখানার জন্য আইন প্রণয়নের আন্দোলন এবং তারপর ১৮৮১ সালে ভারতীয় কারখানা আইন রচিত হওয়ার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিক্রিয়া বলতে গেলে শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য তার সঙ্গত কারণও ছিল। কেননা, বিতর্ক দেখা দিয়েছিল প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের কাপড় কলগুলিকে নিয়ে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কারখানার শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব ছিল মোটের উপর উদাসীন অথবা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রায় সকলেই, যেমন দাদাভাই নৌরোজি, এম. জি. রাণাডে, কে. টি. তেলাং ও ফিরোজশহ মেটা এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সির

নেতারাও যে নতুন সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছিল তাদের দুঃখদুর্দশা এবং সমস্যা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। বোম্বাই এর জনজীবনে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং ১৮৭৫ সালের বোম্বাই ফ্যাক্টরি কমিশনের অন্যতম সদস্য ভি. এন মণ্ডলিক অন্যান্যদের সঙ্গে একযোগে শ্রমিক স্বার্থে আইন প্রণয়ণের বিরোধিতা করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের নেতারাও—যেমন, বোম্বাইয়ের বালগঙ্গাধর তিলক, আগরকর, চন্দ্রভারকর এবং বাংলাদেশের সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ—সবাই ছিলেন শ্রমিকদের সমস্যার ব্যাপারে সমান অসংবেদী. এমনকি বিরুদ্ধভাবাপন্নও। বোম্বাইয়ের 'মারহাট্টা' ও 'ইন্দুপ্রকাশ' এবং বাংলার 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকার' এরাই ছিলেন যথাক্রমে সম্পাদক এবং এই সব সংবাদপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—অথবা আদৌ কোনো মন্তব্য দেখা যায়নি তা উক্ত নেতাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রতিফলন বলে ধরে নিলে, এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি মূলত, বোম্বাইয়ের চারটি সংবাদপত্র - শ্রমিকদের সপক্ষে কিছু কিছু লিখছিল। যেমন, ১৮৭৪ সালের ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের অনুরূপ একটি ভারতীয় আইন প্রণয়ণের দাবি জানিয়ে ১৮৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর 'অখবার-এ সওদাগর' লিখেছিল : "মিল মালিকেরা এই দুর্ভাগাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের নিষ্ঠুরভাবে খাটায়। শ্রমিকদের সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছুটি পাওয়া উচিত, এবং তাদের কাজের সময় হওয়া উচিত সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা।" ১৮৭৮-এর ২৯শে ডিসেম্বর, 'লোকমিত্র' মিল মালিকদের "স্বার্থান্ধ" বলে অভিহিত ক'রে "শ্রমিকদের কাজের সময় উপযুক্তভাবে হ্রাস' করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিল। ১৮৭৮র ২৯শে ডিসেম্বর, এবং ১৯শে জানুয়ারি "রাস্ত্ গোফ্তর" এস এস. বেঙ্গলীর খসড়া প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। এই কাগজটি ১৮৭৯-এর ৭ই ডিসেম্বরও ১৮৮০-র ৭ই নভেম্বর, এবং 'অখবার-এ সওদাগর ১৮৮০-এর ৭ই নভেম্বর, "ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর" ১৮৮১-র ২২শে মার্চ সরকারি আইনের প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়।

তবে দয়াধর্ম ও মানবিকতার তাগিদে মুষ্টিমেয় যারা প্রথমদিকে শ্রমিকদের পক্ষ নিয়েছিল অল্প কিছুদিন পরে তারা নীরব হয়ে গিয়েছিল। 'লোকমিত্র' তো ১৮৭৯ সালেই শ্রম আইন প্রণয়নের বিরোধী হয়ে পড়েছিল। সরকারি বিলের পক্ষে মত দিয়েও "ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর" ১৮৮০ সালের ৭ই নভেম্বর "প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের ব্যাপারে এবং কারখানার আভ্যন্তর আর্থিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের" বিরোধিতা করেছিল। পরের বছরই এই কাগজটিও বিরোধীপক্ষে যোগ দেয়। এমন কি "অখবার-এ সওদাগর" পর্যন্ত কারখানা আইন সমর্থন করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে। একমাত্র "রাস্ত্ গোফ্তার" শ্রমিকদের

সমর্থনে শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিল। বাংলাদেশের একটিমাত্র সংবাদপত্রই—'সোমপ্রকাশ'—১৮৮১ সালে কারখানা আইন প্রণয়ণের পক্ষে ছিল। এবং গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে একমাত্র "পুণা সার্বজনিক সভা' ১৮৭৯ সালের খসড়া বিলের সমালোচনা করলেও সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার পক্ষে বলেছিল।

বিপরীত দিকে, ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কারখানা আইনের প্রয়োজন প্রবলভাবে অস্বীকার করেছিল। এই ধরণের সম্পূর্ণ "অনাবশ্যক" আইন প্রণয়ণের বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাতে থাকে। ১৮৭৫ সালে 'জম-এ জমশেদ", "বোম্বাই সমাচার", "অরুনোদয়" প্রভৃতি বোম্বাই ফ্যাক্টরি কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল এই যুক্তিতে যে এটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। ১৮৭৮ সালে এস এস বেঙ্গলী যখন খসড়া আইনের প্রস্তাব পেশ করেন, বোম্বাই এবং অন্যান্য প্রদেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি প্রবল আপত্তি তোলে। এমনকি ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারপন্থী, প্রগতিশীল অংশের মুখপাত্র কলকাতার, "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন"ও ১৮৭৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, কারখানার শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের কোনো প্রয়োজন নেই। ১৮৮০ সালের ১৬ই মার্চ "অমৃত বাজার পত্রিকা" স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় এস এস. বেঙ্গলীর প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভূষিত করেছিল।

১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে সরকার আইনসভায় কারখানা আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করার পর কাউন্সিল এবং সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবটি আলোচিত হয় এবং তারপরেই ১৮৮১ সালের ভারতীয় কারখানা আইন প্রণীত হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তখন প্রবল বিরোধিতা করেছিল। এমনকি প্রধান জাতীয়তাবাদী এবং সামাজিক সংস্কারপন্থী পত্র-পত্রিকাও—যেমন ইন্দুপ্রকাশ(২২শে মার্চ ১৮৮০ এবং ৪ঠা অগাস্ট, ১৮৮৪), গুজরাটি (২৮শে নভেম্বর, ১৮৮০ এবং ২৭শে মার্চ, ১৮৮১) ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর (২০শে মার্চ, ১৮৮১, নেটিভ ওপিনিয়ন (২৭শে মার্চ এবং ১৯শে জুন, ১৮৮১) এবং দ্যান প্রকাশ (৩০শে জুন, ১৮৮১), এই আইনের বিরোধিতা করেছিল। যথেষ্ট সংযমী কাগজ, বোম্বাইয়ের দেশপ্রেমিক মানুষের মুখপত্র হিসাবে পরিচিত "কোয়ার্টারলি জর্নাল অব দি পুনা সার্বজনিক সভা" লিখেছিল: "কারখানার শ্রমিকদের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের সপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই।"

১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ বালগঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত 'মারহাট্টা"ও এই আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বাংলার দুই প্রধান জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র"অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "বেঙ্গলী", ছাড়াও এমনকি " পাবলিক ওপিনিয়ন"ও এই আইনের নিন্দা করে। এলাহাবাদের "হিন্দী

প্রদীপ''ও একই মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। এছাড়াও বোম্বাই ও বাংলার অসংখ্য অন্যান্য সংবাদপত্র এই আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের সময় এবং ১৮৮১ সালে তা ভারতীয় কারখানা আইনের রূপ নেওয়ার পরে সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়।

কখনও-কখনও কারখানা আইনের বিরোধীরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে এমন মজার আর অভাবনীয় সব যুক্তি দেখিয়েছেন যা এ যুগের মানুষের কাছে নিতান্তই হাস্যকর, এমনকি বর্বরোচিত, বলে মনে হতে পারে। যেমন, এই আইন কেন অনাবশ্যক তা দেখাতে গিয়ে তারা উল্লেখ করেছেন, শ্রমিকরা কোনো অভিযোগ করেনি কিংবা নিরাপত্তার দাবি জানায়নি, বরং তারা নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দীর্ঘসময় কাজ করতে চেয়েছে।[৪] ১৮৮০ সালের ১২ই নভেম্বর "অমৃতবাজার পত্রিকা" এই বক্তব্যকেই সংক্ষেপে প্রকাশ করে লিখেছিল: "শ্রমিকদের উপর যদি এতই জুলুম চাপানো হচ্ছে তবে তারা অন্য কোথাও কাজ নিচ্ছে না কেন? চাকরি খোয়াবার ভয়ে তারা ভীত কেন? সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তথাকথিত 'জুলুম' সত্ত্বেও তারা কাজ ছাড়তে চায় না।" এর আগে, ১৮৮০ সালের ১৬ই জানুয়ারি এই পত্রিকা পরোপকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে একটি দারুন যুক্তিপূর্ণ (? উপদেশ দিয়ে বলেছিল, তাঁরা যেন আইন পাসের জন্য সরকারের কাছে ধর্ণা না দিয়ে শ্রমিকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিতে আহ্বান জানান।

আর একটি যুক্তি ছিল এইরকম। কারখানায় কর্মরত নারী, পুরুষ বা শিশু কারোরই বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, কেননা তারা অত্যাচারিত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং মালিকেরা তাঁদের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল।[৫] আইন প্রণয়ণের বিরোধীরা বেশ জোরের সঙ্গেই দাবি করেন যে, বাস্তবে শ্রমিকেরা "দরিদ্র বা দুর্দশাগ্রস্ত" তো ননই, বরং "অন্যদের তুলনায় ধনী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।" এই প্রসঙ্গে বলা হয়: "কারখানাতে কাজ এদেশের শ্রমিকদের কাছে কষ্টকর নয়, কারণ কারখানার কাজ হাল্কা ও সহজ হওয়ায় এ ধরণের কাজের ব্যাপারে তাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এবং এটা তারা পছন্দও করে"। ভারতের শাসকদের অভিযুক্ত করে বলা হয়েছে, "এ দেশের সমাজ-জীবন সম্পর্কে কোনো ধ্যানধারণা না থাকার ফলে তাঁরা সর্বদাই সম্পূর্ণ অনুপযোগী প্রতিবিধান চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।" এবং এসব না-করে বিদেশী শাসকেরা যদি দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথাটা মনে রাখতেন এবং সত্যই যদি তাঁরা দেশের বিশেষ করে শ্রমিকদের প্রকৃত অভাব মেটাতে চাইতেন "তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন, কী ক'রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অটুট রাখা যায় অথবা অত্যধিক খাটুনি রদ করা যায় সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চাইতে অনেক বেশি গুরুতর সমস্যা খাদ্যের অভাব এবং কী ক'রে সেই অভাব মেটানো যায়।" মোটকথা, সমালোচকরা দেখাতে চেয়ে-

ছিলেন, ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় মিল-মজুরদের অবস্থা ছিল অনেক ভাল।

কথাটা অবশ্য শিশুদের বেলায় মিথ্যা ছিল না। কেননা চাষের বা অন্য কাজে তাদের কারখানার তুলনায় অনেক বেশি সময় খাটতে হত।[৬] ১৮৭৮এর ২৯শে ডিসেম্বর, "নেটিভ ওপিনিয়ন" এ দাবিও করেছিল যে "যেসব শিশুরা স্কুলে যায় তাদের চাইতে কারখানার শ্রমিক শিশুদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল।" 'জর্নাল অব দি পুনা সার্বজনিক সভা'র ১৮৮১ সালের জুলাই সংখ্যায় "ভারতে কারখানা আইন" প্রসঙ্গে একজন অনামী লেখক মন্তব্য করেছিলেন, "কারখানায় কর্মরত শিশুদের কাছে তাদের কাজ মোটেই শক্ত একঘেয়ে বা ক্লান্তিকর ব'লে মনে হয় না।" তাঁর মতে, কারখানা আইন করা হলে বারো বছরের কমবয়সী এইসব শিশুদের কাজ থেকে বরখাস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, কেননা অবাঞ্ছিত ইন্‌স্‌পেক্‌টারদের বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব কম রাখতে মালিকেরা তখন এই পন্থাই বেছে নেবে। এবং এইভাবে পাইকারী হারে শিশু শ্রমিক ছাঁটাই হবে, অথবা কারখানা আইনের বিধান মানতে গিয়ে যে ক'টি ভাগ্যবান শিশুর চাকরি বজায় থাকবে তাদেরও বেতন ক'মে যাবে। যার ফলে এমনিতেই হত-দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের আয় আরো কমে যাবে, এবং বরখাস্ত হওয়া শিশুদের রুটি রুজি বন্ধ হওয়ায় তারা বাপমায়ের গলগ্রহ হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও মারাত্মক, এই আইন হলে, "শিশু অপরাধীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে" কেননা "কর্মচ্যুত ছেলেরা হয় ভিক্ষা করবে নয়তো ধার করবে, অথবা চুরি করতে বাধ্য হবে।"

তবে, কারখানা আইনের বিরোধীদের সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল অন্য। তাঁরা আশঙ্কিত ছিলেন এই আইনের ফলে সদ্য গড়ে-ওঠা বস্ত্রশিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে, এবং তার ফলে ল্যাংকাশায়রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমে যাবে। কিছু জাতীয়তাবাদী তো ধ্বংসের চেতাবনিই দিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ "মারহাট্টা" আর্তনাদ করেছিল : "আমাদের কল-কারখানা সব শেষ হয়ে গেল ; এই শিশুশিল্পের ধ্বংস এখন অনিবার্য।" কিছু ভারতীয় নেতা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে শিল্পের বিকাশের বৃহত্তর স্বার্থে কারখানা শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৭৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর "অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখল, "এই নবোদিত শিল্পের ধ্বংসের চেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ মৃত্যুহার অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। ......উৎপাদন সম্পূর্ণ স্থিতিশীল হওয়ার পরই আমরা শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে পারব।"[৭]

এছাড়া, আর একটি যুক্তিও উপস্থিত করা হয়েছিল। বলা হ'ল, এই আইন শ্রমিকদের পক্ষেও ক্ষতিকারক, কেননা বস্ত্রশিল্পের বিকাশ যদি

বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তাঁদের উপার্জন এবং কাজের সুযোগে টান পড়বে। অর্থাৎ স্বর্ণডিম্বের লোভে হাঁসটাকেই মেরে ফেলার মতন ব্যাপার হবে।

"বিপদের ঝুঁকি নিয়েও যেসব বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান নীরবে কাজ করছে" তাদের ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপের চিন্তাকেও কোনো কোনো ভারতীয় লেখক আপত্তিকর মনে করেছিলেন। তাঁদের মতে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিজেরা মিটিয়ে নেওয়াই ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবে সে যাই হোক, নেতাদের বক্তব্য ছিল: সরকার যদি এই বিষয়ে আইন পাস করার জন্য সত্যিই বদ্ধপরিকর হন, তাহলে আইনটা সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে হবে, যাতে বোম্বাইয়ের ভারতীয় মালিকানার শিল্পের তুলনায় অন্যান্য প্রেসিডেন্সির ইংরেজ-মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা না-পায়। একই কারণে, ইউরোপীয় মালিকানাধীন চা ও কফি বাগিচা, নীল তৈরির কারখানা, ইংল্যান্ডে সুতোর রপ্তানি এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করত এমন ছোট ছোট তুলা ঝাড়াই-পেষাই কলকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখায় তাঁরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তিটা আরো জোরালো হয়েছিল এই কারণে যে ছোট ছোট তুলা ঝাড়াই ও পেষাইকলে, চা বাগিচা এবং নীলের কারখানায় কাজের পরিবেশ ছিল বোম্বাইয়ের আধুনিক কাপড়ের মিলের তুলনায় অনেক খারাপ। এই কারণেই বলা হয়েছিল যে, "সরকার যদি পরোপকার করতে এতই আগ্রহী, তবে সরকারের উচিত প্রথমোক্ত শিল্পক্ষেত্রের প্রতি ভালো ক'রে নজর দেওয়া।"

এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠল, ভারত সরকার একটি কারখানা আইন প্রণয়ন করতে এত উদগ্রীব কেন? যাঁরাই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন সেই সব লেখকই একই প্রায় কথা বলেছেন। এ সবই হচ্ছে "ল্যাংকাশায়ারের ঈর্ষাপরায়ণ শিল্পপতিদের অন্যায় এবং অপ্রতিরোধ্য চাপের" ফলে। তাদের উদ্দেশ্য, পর-হিতৈষণা, দয়াধর্ম ইত্যাদির আড়ালে এদেশের কাপড়ের পড়তা বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিযোগীকে অসুবিধায় ফেলা। উদাহরণস্বরূপ, আইনটা চূড়ান্তভাবে পাশ হলে ১৮৮১ সালের ২০শে মার্চ "ইন্ডিয়ান স্পেক্টেটর" বক্রোক্তি করে লিখেছিল: "ম্যানচেস্টারের মহাপুরুষেরা কলকাঠি নাড়ার ফলে দূরদৃষ্টিহীন দু'চারজন ব্যক্তি পরোপকারের নামে যেভাবে কাঁদুনি গাইতে আর নালিশ জানাতে শুরু করেছিলেন তাতে সম্ভবত আমাদের ভীমরতিগ্রস্ত সরকার ভেসে গিয়েছেন।" ১৮৮১ সালের ২৪শে "মার্চ ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন"ও অতি সংক্ষেপে রায় দিয়েছিল: "ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে ম্যানচেসটার অন্যায় গোপন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে।"

কিছু কিছু ভারতীয় লেখক প্রথম ভারতীয় কারখানা আইন পাস হওয়া পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ থেকে দ্রুত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

১৮৮১সালের ১৪ই মার্চ জঙ্গি "অমৃত বাজার"পত্রিকা লিখল : "ভারতবর্ষ আসলে কী? ম্যান্‌চেস্‌টারের তুলা উৎপাদনকারী সম্পত্তি। ভারতবর্ষের রায়ত কী? ম্যান্‌চেস্‌টারের প্রয়োজনে তুলা উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট এক ধরনের জীব।" পুনার উদীয়মান জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র "মারহাট্টা" ১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ সক্রোধে মন্তব্য করেছিল—"আমরা এতদিন যেকথা ব'লে এসেছি এবার তা স্পষ্ট হ'ল : ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছে ব্রিটিশের প্রয়োজনে, ভারতের নিজের জন্য নয় ;" ভারতবাসীর অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত "আমরা হচ্ছি একটা বিজিত জাতি এবং বিজিত জাতি হিসাবেই আমাদের শাসিত হতে হবে।"[৯] এরপর দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে কাগজটি লিখল : "আবেদন-নিবেদনের পথ পরিহার করুন, নিজেদের পায়ে দাঁড়ান।" এই নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা কার্যকর পন্থা হতে পারে বয়কট, এবং সেজন্য সবার কাছে আবেদন জানিয়ে কাগজটি লিখল, "আসুন আমরা সবাই একত্র হই এবং শপথ নেই আমরা আর ম্যান্‌চেস্‌টারের কাপড় পরব না। যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা সফল করতে পারি, তাহলে শত কারখানা আইনও আমাদের শিল্পোদ্যমের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, যদি না সরকার গায়ের জোরে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।··দেখতে হবে ম্যান্‌চেস্‌টারের ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষ থেকে যেন আর তুলা না পায়।"

২. ১৮৯১ সালের কারখানা আইন এবং জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া

১৮৮১ সালের কারখানা আইন মিল শ্রমিকদের সুরক্ষার ঠিক ব্যবস্থা করতে না পারায় এটি রচিত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই সংশোধনের দাবি ওঠে। শ্রমিক দরদীরা সুস্পষ্ট কারণেই এই আইনের বিধানে সন্তুষ্ট হননি ; অন্যদিকে ল্যাংকাশায়ারের উৎপাদকেরাও ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের উন্নতি দেখে এবং এদেশে বিলিতি কাপড়ের আমদানি ক্রমাগত কমে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট থেকেছে।

১৮৮২ সালে বোম্বাই সরকার মীড কিং নামে একজন ইংরেজ কারখানা পরিদর্শককে বোম্বাই অঞ্চলে কারখানা আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি বিভিন্ন কারখানায় গুরুতর ত্রুটি লক্ষ করে আইনটি মোটেই পর্যাপ্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন,[১০] এবং অবস্থার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবও দেন। তাঁর প্রস্তাবগুলির গ্রহণযোগ্যতা ছাড়াও সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখার জন্য বোম্বাই সরকার ১৮৮৪ সালের ২৩শে মে আর একটি কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনারদের মধ্যে চারজন ছিলেন মালিকদের প্রতিনিধি। কমিশন সুপারিশ করল, আইনটিকে এমনভাবে সংশোধন করা হ'ক যাতে শিশু ও নারীদের কাজের সময় যথাক্রমে ৯½

এবং ১১½ ঘণ্টার বেশি না হয়, তারা মাসে চারদিন করে ছুটি পায়, এবং শিশুদের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ধার্য করা যায় যথাক্রমে ৯ এবং ১৪ বছর[১১]। কমিশনের প্রতিবেদন ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আইনটির ব্যাপক সংশোধনের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করলেন না। বিষয়টি তখনকার মতন চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে রইল না। ভারতে ইংল্যান্ডের মতন কঠোর কারখানা আইন প্রয়োগের জন্যে অচিরে আন্দোলন শুরু হ'ল। ইংলন্ডের সাংসদরা বারবার বিষয়টিকে হাউস অব কমন্স-এ এবং অন্যত্র উত্থাপন করতে লাগলেন। ইংল্যান্ডের বণিকসভাগুলি ইতিমধ্যেই তুলাকর উঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঠেকানো যায়নি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তারা ভারতসচিবের কাছে একটার পর একটা আবেদন হাজির করতে লাগল, এবং ভারতসচিবও ক্রমাগত ভারত সরকারকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য তাগাদা দিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় একটা নতুন ঘটনা লক্ষ করা গেল। শ্রমিকরা নিজেরাই দাবি জানাতে শুরু করেছিল—যদিও খুবই সঙ্কুচিতভাবে, দয়াধর্ম ও মানবিকতার যুক্তিতে। তারা অধিকার ন্যায়বিচারের প্রশ্ন তোলেনি, দাবি পেশ করেছিল সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধের আকারে। শ্রমিকদের সপক্ষে এই আন্দোলনের প্রানপুরুষ ছিলেন এন এম. লোখণ্ডে, যিনি ১৮৮০ সালে ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক "দিনবন্ধু" প্রকাশ করেন। কাগজটি শুধু মিল শ্রমিকদের কথাই লিখত।[১২] ১৮৮৪ সালের নভেম্বরে লোখণ্ডে বোম্বাইয়ের বস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে দুটি সভা করেন। ঐ সভায় রবিবার ছুটির দিন ধার্য করার, কাজের সময় ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে সীমিত রাখার, দুপুরে আধ ঘণ্টা বিশ্রামের, প্রতি মাসের বেতন পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দেওয়ার এবং দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এইসব দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি, প্রস্তুত করা হয়, যাতে ৫৫০০ জন শ্রমিক স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ১৮৮৪-র অক্টোবর মাসে নিজেকে মিল-শ্রমিক সঙ্ঘের চেয়ারম্যান ব'লে পরিচয় দিয়ে লোখণ্ডে বোম্বাই ফ্যাক্টরি কমিশনের কাছে ঐ স্মারক লিপি পেশ করেন। এরপর সাত বছর ধরে লোখণ্ডে ও অন্যান্যরা সভা সমিতি ক'রে এবং স্মারকলিপি পেশ ক'রে ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন সরকার যাতে আইন পাশ করে শ্রমিকদের দাবি পূর্ণ করেন। অবশ্য সেজন্য লোখণ্ডের এই প্রচেষ্টাকে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ব'লে ভাবলে ভুল করা হবে, কেননা আসলে এটা কোনো আন্দোলনই ছিল না,[১৩] লোখণ্ডেও বাস্তবিকভাবে শ্রমিক-সংগঠক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শ্রমিক-দরদী, যা তাঁর কাগজের নামেই স্পষ্ট। এবং সেজন্যই

সরকার নীল বিদ্রোহকে যারা সংগঠিত করেছিল বা সাহায্য করেছিল তাদের মত তাঁকেও বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে শাস্তি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি, বরং তাঁকে ১৮৯০ সালের ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের স্থানীয় সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতের জন্য উপযুক্ত কারখানা আইন প্রণয়ণের দাবিতে ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এদেশের ভারতীয় এবং ইংরেজ উৎপাদকেরাও সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতি-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল—ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য আইনের রক্ষা-কবচের প্রয়োজন নেই ; নতুন আইন এ দেশের শিশু শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ; আর তাছাড়া, এই ধরণের স্পর্শকাতর বিষয়ে বাইরে থেকে অন্য কারও হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।

বিভিন্ন দিক থেকে এই ধরণের চাপে ক্লিষ্ট ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ১৮৯০ সালের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে ১৮৮১ সালের কারখানা আইন সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব আইন সভায় পেশ করে।[১৪] এই প্রস্তাব অবশ্য এমন ছিলনা যাতে ভারতীয় কারখানা আইন ইংল্যাণ্ডের কারখানা আইনের তুল্য হয়ে উঠতে পারে। এটা ইংল্যাণ্ডের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে বিক্ষুব্ধ করেছিল, তারা আরো কড়া ব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত তাদের উৎসাহিত করেছিল। যদিও ভারত সচিব খসড়া প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও তিনিও এখন আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলেন এবং আর একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব দিলেন। ভারত সরকারও ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই, বাংলা প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আর একটি কমিশন নিয়োগ করেন।

এই কমিশনের সুপারিশের মধ্যে ছিল—নারী শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময় ১১ ঘণ্টায় সীমিত করা, শিশুদের কাজের সময় কমিয়ে ৬/৮ ঘণ্টায় আনা, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষসহ সব কর্মীর জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা, আর সব প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যই দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে আধঘণ্টার ছুটি। একমাত্র এস এস বেঙ্গলী ছাড়া অন্য সব সদস্যই এই অভিমত দিয়েছিলেন যে, নারী শ্রমিকদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তাদের কাজের সময় সম্পর্কে আরোপিত বিধি নিষেধ কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। তবে কমিশন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের কাজের সময়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল।

কমিশনের ফলাফলে ভারতীয় শিল্পপতিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল, এটাই শ্রমসংক্রান্ত ব্যাপারে আইনগত হস্তক্ষেপের শেষ কথা হবে।[১৫] কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং ভারত সচিব খুশি হতে

পারে নি, তাঁরা আরো পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। বাস্তবিকপক্ষেই, শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ ছিল অকিঞ্চিৎকর।[১৬]

কমিশনের সুপারিশ এবং ভারত সরকার ও ভারত সচিবের মধ্যে পত্র বিনিময়ের ফলশ্রুতিতে কারখানা আইনের সংশোধনের প্রস্তাবটিকে ঢেলে সাজানো হয়। এবং অবশেষে ১৮৯১ সালের ১৯শে মার্চ ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) অ্যাকট, ১৮৯১ পাস হল। যে সব কারখানা যন্ত্রশক্তির সাহায্যে চলত, এবং যেখানে ৫০ জন অথবা তার বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজ করত ও বছরে ১২০ বা তার বেশি দিন কাজ হ'ত, তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হ'ল। আইনে সবার জন্যে সপ্তাহে এক দিন ছুটি এবং দৈনিক আধ ঘণ্টা মধ্যাহ্ন বিরতির ব্যবস্থা হ'ল। নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১½ ঘণ্টা বিরতি-সহ দৈনিক ১১ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হ'ল; এবং একমাত্র বাংলাদেশের যেসব কারখানায় শিফট প্রথা চালু ছিল সেগুলি ছাড়া অন্যত্র রাত্রিতে কাজ নিষিদ্ধ হল। শিশুদের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়স বেঁধে দেওয়া হ'ল যথাক্রমে ৯ এবং ১৪ বছর—তাদের কাজের সময় নির্দিষ্ট হ'ল দৈনিক সাত ঘণ্টা। এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিধিনিয়ম প্রণয়ণের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে দেওয়া হল।

লক্ষ্যণীয় যে, সব চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল ছোট ছোট কিংবা বছরের নির্দিষ্ট সময় চালু থাকে এমন কারখানায়, অথচ তাদের এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া সারা দেশের জন্য সমান ১১ ঘণ্টা কাজের, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসার জন্য সাহায্যের দাবিও গ্রাহ্য হয়নি।[১৭] তার উপর, কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আগের মতই ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেল, ফলে এই কারখানা আইনের নিয়ম কানুনও "প্রতিনিয়তই অমান্য হতে লাগল।"

১৮৯১ সালের কারখানা আইনের ব্যবস্থায় ল্যাংকাশায়ারের মিল মালিকরা অখুশি রয়ে গিয়েছিল। এর পরের কয়েক বছর ধ'রে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ডানডীর চটকল মালিকরা।[১৮] কিন্তু আবার একই সঙ্গে ১৮৯১ সালের পরবর্তী কয়েক বছরে ব্রিটেনে ভারত সরকারের সমর্থকও জুটে গিয়েছিল।[১৯] সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ইতিমধ্যে ব্রিটেনেও এমন লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল যারা ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশ বড় ধরণের মূলধন লগ্নি করে ফেলেছিল, অথবা লগ্নি করার কথা ভাবছিল। অন্যদিকে ভারতে পরবর্তী কয়েক বছরে পরোপকারীদের উৎসাহে ভাটা পড়েছিল। এবং এটা অব্যাহত ছিল যতদিন পর্যন্ত না "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" ১৯০৫ সালে আবার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে।

এবারও দেখা গেল, শ্রম আইন সম্পর্কিত নানা সমস্যার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া ছিল মোটামুটিভাবে মালিকদের পক্ষে এবং শ্রমিকদের প্রতি

সহানুভূতিহীন। শ্রম সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করা হ'ল। সরকার ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তি কারখানার আভ্যন্তর ব্যাপারে আইনের হস্তক্ষেপের যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাতে আপত্তি জানানো হ'ল। 'মারহাট্টা' পত্রিকার জনৈক বিভাগীয় লেখক ১৮৯০-এর ২৬শে অক্টোবর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সারমর্ম সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থিত করে লিখেছিলেন : "এলাহাবাদের কাগজের মন্তব্যে সত্যতা আছে। ইংরেজ শ্রমিকদের মতন ভারতীয় শ্রমিকদেরও যদি ভালো ভালো এবং বেশ কড়া আইন দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হয়, তাহলে তাদের যে অবস্থা হবে তার তুলনায় বর্তমানে তারা অনেক ভালো আছে।"

কিছু জাতীয়তাবাদী লেখক অবশ্য ১৮৯০ সালের কারখানা কমিশনের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এইসব সুপারিশের সংযম, ন্যায়পরায়ণতা এবং যৌক্তিকতার জন্য, অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, এই কারণে যে, সুপারিশে এমন কিছু ছিল না যা শিল্পের অথবা শিল্পের মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সেজন্যই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ১৮৯০ সালের খসড়া বিল অথবা ১৮৯১ সালে পাস হওয়া আইনের সমালোচনা করেনি অথবা করলেও খুবই লঘুভাবে করেছে।[২০] আসলে খসড়া বিলে যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল তার অনেক কয়টিই মালিকপক্ষ আগেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, ফলে আইনটিকে এরা দেখেছিলেন ম্যানচেস্টারের মুখের উপর একটা জবাব হিসেবে। শুধু একটি ভয়ই পেয়েছিলেন, তা হ'ল, এই নিরীহ আইনকে হয়তো বা ভবিষ্যতে মালিকদের উপর কঠোরতর বিধিনিষেধ আরোপের সূক্ষ্ম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। জাতীয়তাবাদীদের এই অংশ এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, দুঃখদুর্দশা ভোগ করা বা অসুবিধার মধ্যে থাকা দূরের কথা মিল-শ্রমিকেরা বরং সুখী ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করে! ১৮৮৯ সালের ১৭ই মে, 'দি হিন্দু' লিখেছিল : "বাস্তবিকভাবে কারখানা শ্রমিকদের যে দুঃখ কষ্টের কথা বলা হয় তার সবটাই বানানো।"[২১] ১৮৯০ সালের ১৫ই মে "নেটিভ ওপিনিয়ন"ও একটু দার্শনিকতার রং চড়িয়ে একই মনোভাব প্রকাশ করেছিল—"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলা ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কারখানার মজদুরেরা ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের তুলনায় বেশি স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে। এর কারণ এই নয় যে, তারা বেশি বেতন পায়, কারণ এটাই যে, তাদের জীবনযাত্রা সরল, চাহিদা সামান্য, তাদের খাদ্যসামগ্রী সস্তা এবং হাড়-কাঁপানো শীত থেকে বাঁচার জন্য তাদের গাদা গাদা কাপড়ও পরতে হয় না"।[২২] বোম্বাইয়ের এক সুপরিচিত চিকিৎসক বোম্বাই গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই শাখার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা শ্রীকে. এম. বাহাদুরজি এম. ডি (লণ্ডন), ১৮৯১ সালে লিখিত এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পুরোপুরি সন্তোষজনক এবং তাদের স্বাস্থ্যের

অবনতির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না ; নারী শ্রমিকেরা তো বিশেষ ক'রেই শক্ত-সমর্থ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী"। এমনকি তুলো ঝাড়াই ও পেষাই কলেও বাধা নিষেধ আরোপ করে কারখানা আইন প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে তাঁর মনে হয়নি।—যদিও মৃদুভাবে এটা স্বীকার করেছিলেন যে ঐসব কারখানায় কাজের পরিবেশ খুব সুবিধের নয়!

জাতীয় নেতৃত্বের এই অংশটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেবারও বিশেষভাবে বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় শ্রমিকদের অত্যধিক খাটানো হ'ত অথবা তাদের অতি দীর্ঘ সময় ধরে কষ্টসাধ্য কাজ করতে হত—এইসব অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছেন। কেননা তাদের বক্তব্য ছিল, আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে অতি দীর্ঘ সময় মনে হয় আসলে সেটা মোটেই তা নয়। এই কথাই ১৮৮৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর, "মারহাট্টা" লিখেছিল : মনে রাখতে হবে, "ভারতীয় শ্রমিকের ধীরে সুস্থে কাজ করার প্রবণতা আছে। আপনি তাকে দিয়ে টানা কয়েক ঘণ্টার কাজ করান, দেখবেন সে মোটেই বেশি খেটে মরছে না, কিছুক্ষণ পর পরই একটা না একটা অছিলায় বাইরে গিয়ে আরাম করছে।" ১৮৮৯ এর ১৮ই জানুয়ারি "সুলভ সমাচার" ও একই অভিমত প্রকাশ করেছিল —ভারতীয় কারখানায় কাজের সময় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এবং বিদেশি শ্রমিকের তুলনায় বেশি ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ভারতীয় শ্রমিকের মানসিক গঠনের সঙ্গে মানানসই। তাছাড়া, কাজের সময় কমিয়ে দিলে শ্রমিকেরাও উপকৃত হবে না, কেননা এতে তাদের বেতন কমে যাবে।

সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যাপারে খুব একটা আপত্তি ওঠে নি, কেননা, আগেই বলা হয়েছে, ১৮৯০ সালের জুন মাসেই মালিকেরা এটা মেনে নিয়েছিলেন।[২৩]

সবচেয়ে বিস্ময়কর, নারী শ্রমিকদের কাজের সময় ইত্যাদি সম্পর্কে আইনের ব্যবস্থার বিরোধিতা করা হয়েছিল। সমাজ সংস্কারের এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ও সহবাস সম্মতির বয়সের জবরদস্ত ও নির্ভীক প্রবক্তা "ইন্দুপ্রকাশ' পর্যন্ত লিখেছিল : "দুঃখের বিষয় হ'ল, সরকার ভারতীয় কলকারখানায় স্ত্রী শ্রমিকদের কাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন মনে করেছেন—নতুন আইনে তাদের রাত্রে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়েছে, এবং যে এগারো ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার মধ্যে আবার বাধ্যতামূলকভাবে দেড় ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা অছে"[২৪] আরো গোঁড়া "মারহাট্টা"ও এ-ব্যাপারে ঐ সমাজ সংস্কারকের থেকে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। ১৮৯০ সালের ৭ই ডিসেম্বর "মারহাট্টা" লিখেছিল : যেহেতু "কমিশনাররা তাদের প্রতিবেদনে কোথাও বলেননি, কারখানায় অনিয়ন্ত্রিত সময় ধরে কাজ করার ফলে স্ত্রী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, আমরা মনে করি সরকারের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।" আরো পরে, ১৮৯২ সালের

মার্চ মাসে, যখন খবর পাওয়া গেল যে আমেদাবাদে নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে, তখন অনেক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দাবি করেছিল যে নারী শ্রমিকের কাজের সময় ১১ ঘণ্টায় সীমিত রাখার যে বিধান কারখানা আইনে আছে তা তাদের স্বার্থেই স্থগিত রাখতে হবে। লক্ষ করার বিষয় হ'ল, কোনো কাগজেই মালিকদের সমালোচনা ক'রে অথবা তাদের এই স্বার্থপরতা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে একটি শব্দও লেখা হয়নি।

অনুরূপভাবে, কারখানা আইনে শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় কমানো ও সর্বনিম্ন বয়সসীমা বাড়ানোর যে ব্যবস্থা ছিল তাও অননুমোদিত হয়েছিল এই যুক্তি দেখিয়ে যে এর ফলে দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারের আয় কমে যাবে। ১৮৯১ সালে "সুরভি ও পতাকা" আক্ষেপ করে লিখেছিল, "এখন জোয়ান ছেলেমেয়েরা আর তাদের বাপ-মাকে সাহায্য করতে পারবে না।" তাছাড়া, সেই সেকেলে যুক্তিও ছিল—শিশুরা নাকি বেকার থাকলে অপরাধীতে পরিণত হয়.। সমাজসংস্কারের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, "দি হিন্দু" ১৮৯১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এই যুক্তিই উপস্থিত করে লিখেছিল—"আমাদের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা হয় কাজ করে বাপ-মাকে সাহায্য করে, নয়তো অবসর সময় এমন কিছু করে যাতে পুলিস বা সি-আই ডি-রা কাজ পায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কারখানায় কাজ পেলে তারা নষ্টামি করার বিশেষ সুযোগ পায় না।"

জাতীয় নেতৃত্বের এই অংশ একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তা হ'ল, কারখানা আইন পরিণামে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি তো করবেই না বরং ভারতের উদীয়মান বস্ত্র-শিল্পকে ধ্বংস করবে। লক্ষণীয় যে, শ্রমিকদের প্রসঙ্গে মাত্র একবারই কংগ্রেস মঞ্চ থেকে কিছু বলা হয়েছিল—এবং সেটা এই বিষয় নিয়েই। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কারখানা আইনের প্রয়োগ এবং তজ্জনিত উৎপাদন-ব্যয়-বৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বস্ত্র শিল্পের বাজারে ইংল্যাণ্ড ছাড়াও জাপান ইতিমধ্যেই ভারতের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।[২৫] জাতীয়তাবাদীদের আর একটি বক্তব্য ছিল—ভারতের শিল্প যদি পঙ্গু হয়ে পড়ে তবে শ্রমিকদেরও ভীষণ ক্ষতি হবে. কেননা তারা কর্মসংস্থানের একটা বড় সুযোগ হারাবে। ১৯০০ সালের ১০ই জানুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় সংক্ষেপে এটা ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে—"যে শ্রমিক-দরদীরা দয়া পরবশ হয়ে নিঃস্বার্থে শ্রমিকদের কাজের সময় কমাবার এবং তাদের সপ্তাহে একদিন ছুটি পাইয়ে দেবার জন্য প্রচেষ্ট, মিলগুলি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা কি তাদের খাবার জোগাবেন? ভারতে আসলে যেটা প্রয়োজন তা হ'ল পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য। এবং সেটা সংগ্রহ করার জন্য মানুষ সবকিছু করতে—এমন কি দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতেও—প্রস্তুত।"

আসলে ১৮৮১ সালের কারখানা আইনের বেলায় যেমন ১৮৯১ সালেও তেমনি

জাতীয়তাবাদীরা কারখানা আইন যে সমর্থন করেননি তার পিছনে একটি আশংকা কাজ করেছে। তা হ'ল—নিপীড়িত ভারতীয় শ্রমিকদের সাহায্য করার মহৎ প্রেরণা থেকে এটি উদ্ভূত হয়নি, এর মূলে রয়েছে ল্যাংকাশায়ারের ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর গলা টিপে মারার বাসনা। ১৮৮৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল বেঙ্গলী এটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল: "ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের মালিকরা এবং তথাকথিত শ্রমিকদরদীরা ভারতের জন্য যে উৎকণ্ঠা বোধ করছেন তা আসলে 'শিকারের প্রতি শিকারী পশুর মনোভাবেরই' সামিল"। এঁদের মতে, প্রকৃতপক্ষে, সরকারের যে নীতি একসময় বস্ত্রের উপর থেকে আমদানি শুল্ক তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের ঘাড়ে অবাধ বাণিজ্য চাপিয়ে দিয়েছিল, কারখানা আইনও পাশ করা হয়েছে সেই একই নীতির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগের জন্য।[২৬]

কিছু জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা অবশ্য শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বনের চেষ্টা করে এবং ন্যায্য দাবিগুলিকে মেনে নিতে মিল-মালিকদের অনুরোধ করে। এক সময়ে কারখানা আইনের সবচেয়ে তীব্র সমালোচক হলেও, "মারহাট্টা" এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। অবশ্যই মারহাট্টা বা ঐ ধরণের আরো কয়েকটি কাগজের এই পরিবর্তনের কারণ, সম্পাদকীয় দফতরে অথবা কাগজের মালিকানায় পরিবর্তন।[২৭] শ্রমিকদের যে সব দাবি দাওয়া এরা সমর্থন করে তার একটি, কাজের সময় কমানো। এ-ব্যাপারে রীতিমত বিপ্লবী প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল যেমন দৈনিক কাজের সময় ৯ ঘণ্টা, এমন কি ৮½ ঘণ্টা করার প্রস্তাব। এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রস্তাবটির পক্ষে যে দার্শনিক যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তা শ্রেণী সংঘাত ও রাষ্ট্রের কল্যানমূলক দায়িত্বের ধারণার কাছাকাছি। ৮৮৪-র ১ লা জুলাই "মারহাট্টা" একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখে যাতে বলা হয়: "মনিবের নীতিই হ'ল, চাকর-বাকর বা কর্মচারীর কাছ থেকে যতটা সম্ভব কাজ উশুল ক'রে নেওয়া। আবার চাকররাও চেষ্টা করে আরো আরো বেশি টাকা কামাতে, এমনকি তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তথাপি! এই কারণেই সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।" কারখানায় কর্মরত শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, সপ্তাহে একদিন ছুটি এবং দিনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টার বিরতি, চিকিৎসা সাহায্য, কারখানার সন্নিকটে বাসযোগ্য কোয়ার্টারস্ নির্মাণ, সাপ্তাহিক অন্ততপক্ষে মাসিক বেতনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিও এই জাতীয়তাবাদীরা সমর্থন করেছিলেন।

৩. দি ইণ্ডিয়ান মাইনস্ অ্যাক্ট্, ১৯০১

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভপর্যন্ত কাজের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার মত কোনো আইন ছিল না। কর্মসংস্থানের দিক থেকে, খনিজ শিল্প বলতে তখন কয়লা খনিকেই বোঝাত। ১৯০০-১ সালে কয়লা খনিতে মোট ৬,১১৮,৬৯ টন কয়লা

উৎপাদন হয় ; শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৮৯, ২৪৮। ভারতের কয়লাশিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভূগর্ভে কাজের জন্য প্রচুর সংখ্যায় নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। খাদে কয়লা কাটায় নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়াও, কয়লাখনির অন্য সব শ্রমিকদের কাজের পরিবেশও ছিল খুবই খারাপ, সত্যিই শোচনীয়—ভয়াবহ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। তদুপরি, উপযুক্ত সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনা লেগেই থাকত। এসব সত্ত্বেও খনি শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি এতকাল আকৃষ্ট হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে, ভারতীয় কয়লা শিল্পের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ছিলই না। তাছাড়া, এই শিল্পের অধিকাংশই ছিল বিদেশি মালিকানাধীন। কিছু ভারতীয় প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই ছোট ও নিম্ন আয়ের খনি।

অবশেষে, ১৮৯৯ সালে সরকার আইন সভায় ইণ্ডিয়ান মাইন্‌স্‌ বিলটি পেশ করে এবং সেটা ভারতীয় খনি আইন, ১৯০১ নামে পাস হয়। আইনটি ছিল খুবই নরম ধরণের। তবে, দায়সারা ভাবে হলেও, খনি পরিদর্শন এবং নারী ও শিশুর কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল।[২৮]

খনি আইনের লক্ষ্য ছিল সীমিত, এবং সেই সীমিত লক্ষ্য পূরনের জন্যও যে আইনের বিধান প্রয়োজন তা! তথাপি জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরাই এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন তারা প্রায় সবাই এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। কারখানা আইন বিরোধিতায় যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল, এক্ষেত্রেও সেইসব যুক্তির অবতারণা করা হ'ল। খনিজ শিল্পের মতন একটি শিশু শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরণের আইনের প্রয়োজন অস্বীকার ক'রে দাবি করা হ'ল, খনিতে নাকি কাজের পরিবেশ ছিল বেশ সন্তোষজনক। লক্ষণীয় যে, এমনকি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও একই কথা বলেছিল। ১৯০০ সালে কংগ্রেসে খনি সংক্রান্ত বিলে "শ্রমিক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে যেসব ধারা রয়েছে সেগুলি বাদ দেওয়া"-র দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের উত্থাপক ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে মাইনিং অ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গল-এর অনুরোধেই তিনি প্রস্তাবটি পেশ করেন। কাজেই, সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে নারী শ্রমিকদের খনির নিচে নামা নিষিদ্ধ করার যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে ভূপেন্দ্রনাথ যে প্রতিবাদ জানাবেন এবং শিশুদের বয়সের উর্ধসীমা চোদ্দ বছর করার বিষয়ে এই বলে আপত্তি জানাবেন যে এই বয়স-সীমা বড্ড বেশি, কেননা এদেশে চোদ্দ বছরে মেয়েরা মা হয়ে যায়, তাতে আশ্চর্যের কি আছে! ভূপেন্দ্রনাথ বসু এমনকি খনি পরিদর্শক নিয়োগের ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছিলেন, এই যুক্তি দেখিয়ে যে, তাতে নাকি মালিকদের অযথা আতঙ্কিত করা হবে!

১৮৯১ সালের ভারতীয় কারখানা আইনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের যেসব আপত্তি ছিল, ভূগর্ভে নারী ও শিশুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও তারা একই

আপত্তি জানিয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালের বিলে ৪ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের ভূগর্ভে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে যে ধারা রাখা হয়েছিল তার বিরোধিতা করা হ'ল এই যুক্তিতে যে, এর দ্বারা নাকি চিরাচরিত পারিবারিক বন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। এর সঙ্গে আর একটি বস্তাপচা যুক্তিও উপস্থিত করা হ'ল। তা হ'ল—ঐ শ্রমিকেরা নিজেরা এ ধরণের আইন চাননা। ১৮৯৯ সালের ২৪শে মার্চ "হিতবাদী" এই কথাটাই লিখেছিল—"খনি মজদুর সরকারের কাছ থেকে গায়ে-পড়া করুণাবর্ষণ চায়না, সে বলবে, 'ভিক্ষে চাই না বাবা, তোমার কুকুর সামলাও'।"[২৯]

শুধু যোগ্য ব্যক্তিই ম্যানেজার হিসাবে নিয়োজিত হতে পারবেন—অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা এই ধারার বিরুদ্ধেও প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁরা সঙ্গতভাবেই দেখিয়েছিলেন, যেহেতু এদেশে খনিবিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, পাস করা ভারতীয় ম্যানেজার পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ভারতীয় মালিকানাধীন যে সব ছোট ছোট খনি রয়েছে তাদের এমনিতেই অনেক বড় বড় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে টিকে থাকতে হয়, তাদের পক্ষে বেশি মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখা অসম্ভব। কাজেই, তাঁরা দাবি করলেন, খনি বিদ্যার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হ'ক, এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন অন্তত সাময়িকভাবে এই ধারা স্থগিত রাখা হ'ক।

কারখানা আইনের মত খনি সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রেও নেতারা এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিলেন যে, এই আইন খনিজ শিল্পের, বিশেষ করে ভারতীয় মালিকানাধীন খনির ক্ষতি করবে। তারা খোলাখুলিভাবেই অভিযোগ করেন, এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ইংল্যান্ডের কয়লা শিল্পকে সাহায্য করা।[৩০]—যদিও এক্ষেত্রে তাঁদের এই অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি বিশেষ ছিল না।

৪. জাতীয়তাবাদী নীতির ভিত্তি

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি বৃহৎ অংশ ভারতীয় কলকারখানা এবং খনি শ্রমিকদের ক্রম-বর্ধমান সমস্যা ও তার সমাধান-কল্পে শ্রমিকদের অনুকূলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবের কোনো না কোনো দিক নিয়ে মন্তব্য করেছেন এবং বিরোধিতা করেছেন; অন্যদিকে, আর একটি ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকদের ছোট-খাটো দাবি দাওয়ার প্রতি সমর্থনও জানিয়েছিলেন। এতক্ষণ এই উভয় গোষ্ঠীর মতামতই পর্যালোচনা করা হ'ল। এতে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র ল্যাংকাশায়ারের ভূমিকার প্রসঙ্গে ছাড়া বিরোধিতা কখনই প্রচণ্ড অথবা বিস্তৃত আকার নেয়নি, বরং তা অনেকটাই ঐকান্তিকতাহীন ছিল। অনুরূপভবে, শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থনও ছিল সমান আন্তরিকতাহীন; তাছাড়া, সমর্থনকারীদের সংখ্যার বিচারেও কম গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটির মূলে ছিল একই কারণ। ভারত সরকারের

কাজকর্মের প্রকৃতিই ছিল এমন যে তা পুরোপুরি মালিকদের পক্ষে গেছে ; তারা যে আইনের প্রস্তাবই এনেছে বা যেসব আইন পাশ করেছে, মালিকদের চোখে দেখলে সেগুলি সর্বদাই নির্বিষ। বোম্বাই মিল মালিক সমিতির ১৮৯১ সালের প্রতিবেদন দেখলে এই অনুমানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। ১৮৯১ সালের কারখানা আইনের প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছিল : "যেসব পরিবর্তন এই সমিতির সদস্যরা মেনে নিতে চেয়েছে আইনের সংশোধনীগুলি তার বাইরে কিছু বলেনি, সুতরাং বিলটি নিয়ে আলোচনায় বিরোধিতা করার কোনো প্রশ্নই নেই।"[৩১] মালিকপক্ষ যে প্রস্তাবিত ও প্রণীত আইনগত ব্যবস্থাগুলির প্রায় সবই মেনে নিতে রাজি ছিল, তা কিছু সমসাময়িক ভারতীয় সংবাদপত্রের নজর এড়িয়ে যায়নি। সত্য কথা বলতে কি, মালিকেরা যেভাবে ১৮৮৫ ও ১৮৯০ সালের কারখানা কমিশনের সুপারিশকে এবং ১৮৯১ সালের কারখানা আইনকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন, তাতে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, জাতীয়তাবাদীদের এই আইনগত ব্যবস্থার বিরোধিতা ছিল আসলে "বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ" গোছের।[৩২]

তবে, ভারতীয় নেতৃত্ব প্রস্তাবিত অথবা প্রকৃত শ্রম আইনের কতটা সমর্থক আর কতটা বিরোধী ছিলেন তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল, তাদের মধ্যে নিপীড়িত, শোষিত কলকারখানা ও খনি শ্রমিকদের প্রতি সক্রিয় সমবেদনার প্রায় সার্বিক অভাব। ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তা বিষয়ে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রায় সবাই এ-বিষয়ে নীরব ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতি এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা, "ন্যায়মূর্তি" রাণাডে, শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চুপ থেকেছেন।[৩৩] ভারতের জনগণের দারিদ্র্যের কথা যাঁর হৃদয়ে রক্ত মোক্ষন করত সেই দাদাভাই নৌরজি কারখানা শ্রমিকদের দুস্থ জীবনযাত্রার বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করেননি। সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতি এবং তার প্রত্যেকটি দিক যিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিজের নখ-দর্পণে রেখেছিলেন, সেই জি. ভি. যোশি শ্রম অর্থনীতির বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তও তার বিশাল 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'য় অথবা অন্যান্য অসংখ্য রচনায় এবং প্রকাশ্য ভাষণে কোথাও কারখানা শ্রমিকদের ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন জি, সুব্রহ্মনীয় আইয়ার কারখানা শ্রমিকদের প্রতি কম-বেশি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। জি. কে. গোখলে তাঁর বিখ্যাত সব প্রকাশ্য অথবা সংসদীয় ভাষণের কোনোটিতেই শ্রমিকদের সমস্যার কথা তোলেননি।[৩৪] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতাবলীতে শ্রমিক সমস্যার একমাত্র যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে কারখানা শ্রমিকদের দুর্দশার প্রতি তাঁর চরম সহানুভূতিহীনতাই প্রকাশ পায় ; তাঁর সম্পাদিত "বেঙ্গলী" কাগজও সাধারণভাবে কারখানা আইনের বিরোধিতাই করেছে। কারখানা

শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখনই কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, খনি আইনের ব্যাপারে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেটি ছিল শ্রমিক-বিরোধী। তাছাড়া প্রথম সারির অধিকাংশ সংবাদপত্রই—যথা "অমৃতবাজার পত্রিকা", "হিন্দু", "মারহাট্টা", "কেশরী", "ইন্দুপ্রকাশ", "জ্ঞানপ্রকাশ", "নেটিভ ওপিনিয়ন", "অ্যাডভোকেট", "ট্রিবিউন" ইত্যাদি—শ্রমিকের সমস্যা সম্বন্ধে হয় নীরব থেকেছে, নয়তো বিরুদ্ধে বলেছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই পূর্ণ নীরবতা হয়ত চোখে পড়ত না। কিন্তু আমরা যখন স্মরণ করি কলকারখানা শ্রমিকদের অবস্থা সত্যই কতটা জঘন্য ও বেদনাদায়ক ছিল এবং সে সময়—বিশেষ ক'রে ১৮৮১-১৮৯১ সময়কালে—একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছিল, তখন এই নীরবতা তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে ওঠে, হয়তো বা অশুভ বলে মনে হয়। কথা বলা যখন একান্তই কাম্য তখন নীরবতা অনেক কিছুই জানিয়ে দেয়। আর সব কিছু বাদ দিলেও, যেভাবে নারী এবং শিশু শ্রমিকদের কলকারখানা ও খনিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হ'ত তা অন্তত বাংলার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদের, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমাজ-সংস্কারকদের, পুণার প্রগতিবাদীদের এবং লাহোরের আর্য-সমাজীদের ক্রোধানল উদ্দীপিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই উদাসীনতার একটা ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যায় বিচারপতি রাণাডের লেখা একটি খাপছাড়া বাক্যে। "দা রি-অর্গ্যানাইজেশন অব রিয়্যাল ক্রেডিট ইন ইণ্ডিয়া" নামে প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "ভারতের কারখানা আইন যুক্তিসঙ্গত হলেও বিশাল ভারতীয় জনসমুদ্রে একটি বারিবিন্দুকেই শুধু স্পর্শ করে"। তবে, আমাদের মতে, এর চাইতেও বেশি সম্ভাব্য ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হ'ল, ভারতীয় নেতারা একাগ্রভাবে এবং অবিমিশ্র নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু দ্রুত শিল্পায়নই চেয়েছিলেন, এবং সেজন্যই ধনতান্ত্রিক কলকারখানার উৎপাদন প্রথা থেকে উদ্ভুত নানা দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে তারা অন্ধ ছিলেন। অবশ্যই এর দ্বারা তাঁদের দোষস্খালন হয় না। আসলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, কর্মসংস্থানের দ্রুত অবনতি এবং জমির উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ইত্যাদি সব সমস্যার একমাত্র সমাধান দ্রুত শিল্পায়ন। এবং এই চিন্তায় তাঁরা এত নিমগ্ন ছিলেন যে, যে-কোনো কারখানা আইন প্রবর্তনের চেষ্টার পিছনে হয় তাঁরা ম্যানচেস্টারের হাত দেখতে পেতেন—যা বাস্তবিকই সরাসরি হস্তক্ষেপ করত—অথবা বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়া দেখতেন। শুধু তাঁদের চোখে পড়েনি নবোত্থিত শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব প্রয়োজন ও স্বার্থ! এইভাবেই তাঁরা শিল্প পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা হয়ে পড়েছিলেন, কিংবা অন্ততঃ তাঁদের ইচ্ছায় চালিত হয়েছেন। শিল্পায়নের সমস্যাকেও তাঁরা দেখেছিলেন পুরোপুরি মালিকের দৃষ্টিকোন থেকে। বিদেশি শিল্পের সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পকে সুবিধে করতে হলে একমাত্র উপায় উৎপাদন ব্যায় যতটা সম্ভব কমাতে হবে, এবং তার জন্য প্রয়োজন হ'ল কম মজুরি দেওয়া, অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করানো, অর্থাৎ সংক্ষেপে শোষণ তীব্রতর করা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের বক্তব্যও ছিল তাই। ল্যাংকাশায়ারের শিল্পপতিরা অভিযোগ করছিল, নিদারুণ শ্রমিক শোষণ ভারতের শিল্পকে পরোক্ষে সংরক্ষন করেছে। ভারতীয় নেতারাও পরোক্ষভাবে বা প্রকারান্তের তা মেনে নিয়েছিলেন। মুনাফা কিছুটা কমিয়েও যে প্রতিযোগিতায় সুবিধে করা যায়, সেটা তাঁদের কখনোই মনে হয়নি; শ্রমিকদের উৎসাহ-বর্ধক ভাতা দিয়ে বা, অন্যান্য উপায়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কথাও তাঁরা ভাবেননি। অথচ এই সময়ে ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা খুবই দ্রুত বাড়ছিল, এবং ভারতীয় মিলগুলির মুনাফা ছিল এমনিতেই খুব বেশি,[৩৫] ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না-করেই অনায়াসে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা যেত। বাস্তবিকভাবে সে সময়কার ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব আধুনিক শিল্পের স্বার্থ বলতে শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থই বুঝতেন।

একথা বলার অর্থ অবশ্যই এমন ইঙ্গিত দেওয়া নয় যে সেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নেতারা এমন কিছু করতে পারতেন—বা তাঁদের করা উচিত ছিল – যা নবোত্থিত দুটো নতুন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংঘাতকে তীব্রতর করবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অন্য কোনো কারণে না হলেও, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই তখন সমগ্র জনসাধারণকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল শুধু সুবিধে-জনকই নয়, অত্যাবশ্যকও! এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে ঐ সংগ্রামই সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ, কাজেই এমন কিছু করা সঙ্গত নয় যার দ্বারা জনসাধারণের ঐক্য বিনষ্ট হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই দাদাভাই নৌরজি একটি অনুশাসন বাক্য রচনা করেছিলেন: "কংগ্রেস সেই সব বিষয়েই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে যেগুলির সঙ্গে সমগ্র জাতি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট; সমাজ সংস্কার অথবা শ্রেণীগত সমস্যার সমাধানের ভার বিভিন্ন শ্রেণীকে কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।" জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ বা স্বার্থের সংঘাত, এমনকি বিবাদের সম্ভাবনা ছিল, এবং তা ঘটেছেও এবং কীভাবে তার মীমাংশা করা যাবে এই প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়েছে। মালিক এবং শ্রমিকের বিরোধে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ছেড়ে দিয়ে আপোষ-মীমাংসা করার পরামর্শ জাতীয় নেতারা কখনই দেননি; হয় তাঁরা নীরব থেকেছেন, যার অর্থ প্রবলতর পক্ষকে সমর্থন, অথবা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে শ্রমিককে তার স্বার্থ বিসর্জন দিতে বলেছেন। এর ফলে, শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার

চরিতার্থ হয়েছে অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে মূলত শ্রমিক-শ্রেণীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, যে-ইংরেজ পুঁজিপতি এবং আমলারা ছিল জাতীয়তাবাদীদের চক্ষুশূল, শ্রমিক স্বার্থের বিরোধিতা করার সময় এমনকি তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতেও নেতারা দ্বিধা বোধ করেননি।

৫. বাগিচা শ্রমিক এবং "এমিগ্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৮২"

ইংরেজ মালিকানাধীন বাগিচায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বেলায় কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের মনোভাব ছিল উল্টো। এটা সব চাইতে ভালো বোঝা যায় অসমের বিভিন্ন চা বাগিচায় যে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করত, যাদেরকে সাধারণত অসমের কুলি বলা হত, তাদের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ সম্বন্ধে নেতাদের মনোভাব থেকে। এইসব বাগিচা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশায় ভারতীয় নেতারা সর্বান্তকরণে সহানুভূতি জানিয়েছেন; বিদেশী পুঁজিপতিদের হৃদয়হীনতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। এবং এইসব মূক, অসহায় শ্রমিকের দুর্ভাগ্যে উচ্চস্বরে বিলাপ করেছেন, এবং তাঁদের হয়ে বলতে দ্বিধা করেন নি। এইক্ষেত্রে তাঁরা জাতীয়তাবোধে উদ্বেলিত হয়েছেন—কুলিদের দুর্দশা অবমাননার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হৃতমান জাতির সুপ্ত আত্মগরিমাবোধকে জাগ্রত করেছেন, এবং তার মধ্য দিয়ে অবশ্যই অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে জাতীয়তাবাদের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। নীতিগত অবস্থানের এই পার্থক্য ছিল সচেতন। অংশত এই কারণে যে এক্ষেত্রে মালিকরা ছিল বিদেশি। ১৮৯১ সালের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পি, আনন্দ চারু ১৯০১ সালে অসম শ্রমিক এবং প্রবসন বিলের উপরে আইনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, যেখানে মালিক এবং কর্মচারি একই জাতির এবং বিশেষ করে সেই কারণেই তাদের মধ্যে বিরোধ অনেক কম, এবং ভ্রাতৃত্ববোধ অনেক বেশি, সেখানে এরকম আইন প্রণয়ণের দাবি হয়ত উঠবে না। এ রকম পারস্পরিক সৌহার্দ এবং দেওয়া নেওয়ার মনোভাব তৈরির অনুকূল পরিবেশ যখন থাকে না, অথবা কম থাকে, তখনই অবচেতন মনের একতরফা বাড়াবাড়ি করার প্রবণতা খর্ব করার জন্য এই ধরণের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়।

আরেকটি ব্যাপারও অবশ্য ভারতীয় নেতাদের মতামতকে প্রভাবিত করেছিল। অসমের চা বাগিচার শ্রমিকদের বেশির ভাগই ছিলেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। এবং তাদের কাজের পরিবেশও ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

ভারতে চা শিল্পের প্রকৃত সূত্রপাত ১৮৫১ সালে। তখন থেকেই বাগিচা শিল্প দ্রুত উন্নতি করেছে। আলোচ্য সময়কালে অধিকাংশ চা-বাগানই ছিল অসমে। ১৯০৩ সালে এতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪,৭৯,০০০ জন স্থায়ী

এবং ৯৩,০০০ জন অস্থায়ী। অসমের জনবসতি তখন খুবই কম এবং চা-বাগিচা প্রায়শই হ'ত বসতিহীন পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অধিকাংশকেই নিয়ে আসা হ'ত বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে। প্রতি বছর এই রকম হাজার হাজার মানুষকে দূর দূরান্ত থেকে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায়, অদ্ভুত ধরনের জ্বর-জারি আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে আনতে হলে প্রয়োজন ছিল আর্থিক প্রণোদনার। সেটা আসামের চা বাগানের মালিকেরা দিতে চাইত না, আর তার বদলে আশ্রয় নিত জুয়াচুরির ও দমন পীড়নের। শুধু তাই নয়, তাদের এই ঘৃণ্য কাজে সহায়ক শাস্তিমূলক আইন পাস করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিত।[৭৬] অসমের চা বাগিচার শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী এইভাবেই শুরু। অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাদের উপলব্ধি করতে হ'ত, বিদেশী পুঁজিপতিরা এদেশের 'অর্থনৈতিক উন্নতির' যে ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে তারা তাদের গ্রামীণ জীবনের সার্বোচ্চ দারিদ্র্যের ফুটন্ত কড়াই থেকে এসে পড়েছে চুক্তিবদ্ধ গোলামির জ্বলন্ত উনোনে।

বহু বছর ধরেই অসমের চা বাগানে শ্রমিক নিয়োগের কাজ করত কন্‌ট্রাক্টরেরা —১৮৬৩ সালে প্রণীত, এবং ১৮৬৫, ১৮৭০ ও ১৮৭৩ সালে সংশোধিত, বাংলার দেশীয় শ্রমিক চলাচল আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী। বাহ্যতঃ আইনটা রচিত হয়েছিল শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, এবং এই আইনে বলা ছিল, এই ধরণের কাজের জন্য লাইসেন্স লাগবে। কিন্তু আসলে ১৮৬৫ সালে সংশোধিত আইনটি মালিকেরই স্বার্থ রক্ষা করেছিল। শুধু না জানিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়াই নয়, কাজে গাফিলতিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত। তাছাড়া, এই আইন 'পলাতকদের' জেলার সীমানার মধ্যে গ্রেফ্‌তার করার অধিকারও মালিকদের দিয়েছিল। অবশ্য শ্রমিকদের শায়েস্তা করার জন্য মালিকরা পূর্ববর্তী ১৮৫৯ সালের ১৩ নম্বর আইনও কাজে লাগাতো—দাদন গ্রহণ করা শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করলে এই আইনের চোখে সেটা চুক্তিভঙ্গ বলে গণ্য হতো, যেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইনের) ৪৯০ এবং ৪৯২ ধারাও ছিল। এই দুটি ধারায় কোনো শ্রমিককে মালিক খরচ দিয়ে নিয়ে গেলে যাত্রাকালে এবং কর্মস্থলে চুক্তিভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু এইসব আইনের ব্যবস্থাও চা বাগানের জন্য আরো শ্রমিকের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বিষয়টা অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার ১৮৮১ সালে একটা কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশন প্রতিবেদনে জানাল প্রচলিত আইনের সাহায্যে মালিকেরা শ্রমিকদের আলস্য কিংবা কাজ ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অক্ষম, চুক্তি

অনুযায়ী কাজ আদায় করতে পারেনা, তাছাড়া এই আইনগুলিতে সর্দারদের উপর অযথা নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এরপর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী "দি ইনল্যাণ্ড এমিগ্রেসন অ্যাক্ট" বা অন্তর্দেশীয় প্রবসন আইন, ১৮৮২ পাস হ'ল এবং ১৮৫৯ সালের ১৩ নম্বর আইন বাদে পূর্বেকার অন্য সব আইন বাতিল হ'ল। ১৮৮২ সালে নতুন আইনে নিয়োগকারী এজেন্টদের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। চুক্তিপত্রে সই করানোও অনেক সহজ হয়ে গেল। পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকদের বেতন নির্ধারিত হ'ল, প্রথম ৩ বছরের জন্য যথাক্রমে ৫ এবং ৪ টাকা ও পরবর্তী ৪-র্থ এবং ৫-ম বৎসরের জন্য ৬ এবং ৫ টাকা। কোনো চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক না জানিয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেলে তাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার অধিকার মালিককে দেওয়া হ'ল, শুধু কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বাস করেন এমন জায়গার পাঁচ মাইলের মধ্যে ছাড়া।[৩৭]

অসমের কুলিদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশায় এবং সরকার কর্তৃক চুক্তিশ্রম প্রথাকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার ও সাহায্য দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের নেতারা, তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৭০-এর দশকেই বাংলা সংবাদপত্র এই প্রথার কুফল নিয়ে লিখতে শুরু করে। অসমের শ্রমিকদের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হয় তার রোমহর্ষক সব বিবরণ পাঠকের সুপ্ত দেশাত্মবোধ জাগ্রত ক'রে চলেছিল।

১৮৮০ সাল নাগাদ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন 'কুলি কাহিনী' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইতে অসম কুলিদের দুরবস্থা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। বইটি তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৮৮১ সালে ভারতীয় প্রবসন বিল পেশ এবং ১৮৮২ সালে আইনাকারে গৃহীত হ'লে, কুলিদের ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে চা বাগানের মালিকদের মর্জির উপর ছেড়ে দেবার জন্য সমগ্র ভারতীয় সংবাদপত্র জগত ধিক্কার জানায়। ১৮৮১ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'দি বেঙ্গলী' লিখল, "এই বিলে ব্যক্তি স্বাধীনতার পবিত্র অধিকার নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে" এবং এটি আসলে "ক্রীতদাস আইন"। ১৮৮১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর "ব্রাহ্ম পাবলিক" ওপিনিয়ন মন্তব্য করে : "কুলিরা গরু ভেড়ার থেকে বেশি কিছু নয়, এই বিলে তাই ভাবা হয়েছে।" সুদূর বোম্বাই থেকে "ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর" ধিক্কার জানিয়ে লেখে : "হতভাগ্য বঙ্গদেশীয় কুলিদের কাছে ব্যাপারটা আসলে আইনসঙ্গত ক্রীতদাসত্ব।" কাগজটি মন্তব্য করেছিল, "শ্রমিককে এর আগে কখনোই এ ভাবে সম্পূর্ণভাবে পুঁজির দয়ার কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।" এই সময় বাংলার উদীয়মান নব প্রজন্মের জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্র "দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন" একটি বিশদ স্মারকলিপি ভারত সরকারের কাছে পেশ ক'রে। তাতে বিলের কয়েকটি ধারার

বিশেষত ১৭০ এবং ১৭২ এর সমালোচনা করা হয়। এই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয় বিষয়টিকে বরং চাহিদা ও জোগানের নিয়মের উপরে ছেড়ে দেওয়া হ'ক। অধিকাংশ সমালোচকই অভিযোগ করেন, বাগিচা মালিকদের চাপে প'ড়ে এবং তাঁদের স্বার্থ পূরনের উদ্দেশ্যেই আইনটা পাশ করা হচ্ছে।[৩৮]

কয়েক বছরের মধ্যেই আইনের ফলাফল সমালোচকদের ঘোরতম আশংকা এবং ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য ব'লে প্রমাণ করেছিল। পরবর্তী কয়েক দশক ধরেই জাতীয় নেতৃত্ব এই প্রবসন আইনের বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছেন; এবং অসম চা বাগিচা শ্রমিকদের করুণ অবস্থায় সারা দেশের হৃদয় বিগলিত হয়েছে। প্রবসন আইনটি সারা দেশে "ক্রীতদাস আইন" নামে পরিচিত হয়েছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রে যে সব "ফুসলানি, নারীহরণ, অত্যাচার, ধর্ষণ এমনকি খুনের" ভয়াবহ কাহিনী প্রকাশিত হ'তে লাগল তা ভারতের আপামর জনসাধারণকে, বিশেষ ক'রে বাংলার মানুষদের, সে সময় দুঃখে অভিভূত করেছে।

'ভারত-সভা" (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন) চা শ্রমিকদের ব্যাপারে উৎসাহ বরাবরই দেখিয়েছে। ১৮৮৬ সালে সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করতে পাঠিয়ে সভা পুনরায় ঐ শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। গাঙ্গুলী (তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) কী নারকীয় অত্যাচার চালানো হ'ত এবং কুলিদের কী ভাবে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হ'ত তার বর্ণনা "বেঙ্গলী" এবং "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশ করলেন। এর আগে সভা অসম কুলিদের দুরবস্থার প্রতি ভাইসরয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবার সহ-সম্পাদকের অভিজ্ঞতা এবং ইতিমধ্যে আদালতে প্রদত্ত কয়েকটি বিচারের রায়ের উপর ভিত্তি ক'রে ১৮৮৮ সালের ৫ই মে ভারত সরকারের কাছে আর একটি বিশদ স্মারকলিপি পেশ করল। পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই ভারত-সভা এই ব্যাপারে সমান আগ্রহ দেখিয়েছিল। ভারত সরকার ও ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেছিল।

কালক্রমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও অসমের কুলিদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা শুরু করে। তবে মজার ব্যাপার হ'ল, কংগ্রেসে এটি উত্থাপনের প্রথম দিকের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৮৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে বাংলার প্রতিনিধিরা অসম কুলিদের উপর আইনের সাহায্যে বর্বর অত্যাচারকে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করলে তা একটি অভিনব যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয়। বলা হয় যে, যেহেতু এটি প্রাদেশিক বিষয় কাজেই সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেসে আলোচ্য নয়। পরের বছর এলাহাবাদ অধিবেশনে বিষয়টি দ্বিতীয়বার উত্থাপনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল।[৩৯] কিন্তু এ ব্যাপারে সারা দেশেই জনগণের মনোভাব ক্রমাগত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতৃত্বকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস চা-বাগান

শ্রমিকদের সমস্যাকে স্বীকৃতি দিল। প্রবসন আইন রদ করার আবেদন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রস্তাবের উত্থাপক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সমর্থক বিপিনচন্দ্র পাল উভয়েই চা শ্রমিকদের ক্রীতদাস-প্রায় জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।[৪০] এরপর পরপর চার বছর কংগ্রেসে একই বক্তব্য পুনরুচ্চারিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে, ১৮৮৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের অভিজ্ঞতায় হতাশ হয়ে বাংলার নেতারা ১৮৮৮ সালের ২৫শে অক্টোবর, প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার আয়োজন করলেন। সভার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল অসম কুলি সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করা। এই প্রাদেশিক সম্মেলন খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। উদ্যোক্তারা এটিকে বার্ষিক অধিবেশনের রূপ দিলেন। অসম কুলিদের বিষয়টি এবং প্রতিটি সম্মেলনেই সক্রিয় সমর্থন পেয়েছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত "ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া"য় ভারতীয় চা শিল্পের এই "দুরপনেয় কলঙ্কের" প্রতি কঠোর ধিক্কারে সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। তিনিও এই "প্রায় ক্রীতদাস প্রথা"-র বিলুপ্তির দাবি জানান।

তবে, প্রবসন আইনের এবং চা বাগিচায় ঘোর অনাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি। এই পত্রিকাগুলি কুলিদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও একাত্মতাবোধ ঘোষণা করেছিল। বছরের পর বছর ধরে এরা অসম কুলিদের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এতটাই প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে শেষদিকে এমনকি ক্রোধ এবং বেদনা প্রকাশের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছিল। ১৮৮৮ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল সারা ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়। এ-ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত "বেঙ্গলী" এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত "সঞ্জীবনীর" ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।[৪১]

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এবং বিভিন্ন লেখকেরা শ্রমিক সংগ্রহের এবং তাঁদের চালান দেবার ব্যবস্থাটিকে আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য-বস্তু হিসাবে বেছেনিয়েছিলেন। ধূর্ত দালালরা কেমন করে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষগুলিকে ভয় দেখিয়ে, এমন কি জোর করে, ধরে নিয়ে এসে মিথ্যা আশা আর কপট প্রতিশ্রুতির ছলনায় ভুলিয়ে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে বাধ্য করত, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ এঁরা দিয়েছেন।[৪২] ঐ কুলিরা বাগানে পৌঁছোবার পর থেকেই শুরু হত তাদের উপর অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচার। অবৈধভাবে জোর করে তাদের বাগানে আটকে রাখা হত; কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাকে দণ্ডবিধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া হ'ত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৮৬ সালের প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, তিনি সেইসব অন্ধকার কারাগার স্বচক্ষে দেখেছেন যেখানে অনিচ্ছুক শ্রমিককে অবৈধভাবে আটকে রাখা হত। শারীরিক নির্যাতন যে চা বাগানের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, সেটাও তিনি দেখে এসেছিলেন। অন্য লেখকরাও শ্রমিকদের উপর এই ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং[৪৪] জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকাতে বহু খুন ও নারীধর্ষণের কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কুলি বা তার শুভাকাঙ্খী কেউ আদালতে গেলে বিচারের রায় যেত বাগিচা মালিকের পক্ষে। বিচার প্রহসনে পরিণত হত।

চা-বাগানে আসলে কি চলছিল তা বোঝা যেত সেখানকার উচ্চ মৃত্যুহার দেখলে।[৪৪] ভারতীয় নেতারা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করলেন, কাজের ধরন এবং পরিবেশের তুলনায় এখানে শ্রমিকেরা যে বেতন পেতেন তা অকিঞ্চিৎকর; দণ্ডমূলক আইন প্রবর্তনের একটা প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই বেতন-স্তর কম রাখা, "অন্য জায়গায় কাজ করলে তারা যা পেত তার চাইতে কম টাকায় তাদের কাজ করতে বাধ্য করা—অর্থাৎ তাঁদের ঠকানো"[৪৫] কোন কোনো নেতা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে অথবা আসামে শ্রমিকের কোনো অভাব ছিল না, উপযুক্ত বেতন দিলে যত ইচ্ছে শ্রমিক পাওয়া যেত। শুধু তাই নয় এদেশের শ্রমিক জন্ম থেকেই পরিশ্রমী, কাজেই না খেতে পেয়ে মরবে তবু বেশি খাটবে না এবং সেজন্য তাদের কাজ করতে বাধ্য করে শাস্তিমূলক আইন দরকার -এই বক্তব্যেরও তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন। "তাঁরা অভিযোগ করলেন, আসলে ইউরোপীয় মালিকেরা চান দেশীয় মানুষেরা ক্রীতদাসের মতন খাটবে", "আর সেভাবে খাটতে অস্বীকার করলে তাদের অলস বলে বদনাম দেওয়া হবে, বলা হবে তারা 'শ্রমের মর্যাদা' কাকে বলে জানে না, এবং তারপর নানা ফন্দি-ফিকিরের সাহায্যে তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়া হবে।"

ভারতীয় নেতারা এটা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে অসমের কুলি শ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল ক্রীতদাস প্রথার একটা রূপ, এই কুলিদের অবস্থা কোনো দিক থেকেই প্রাচীন যুগের দাসদের অথবা একালের নিগ্রো দাসেদের তুলনায় ভালো ছিলনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৮০ দশকে শিক্ষিত বাঙালীরা কেমন উৎসাহভরে 'আঙ্কল্ টম'স কেবিন' উপন্যাসটি পাঠ করত এবং কীভাবে "অসম চা-শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্তির আগেকারনিগ্রো শ্রমিকদেব অবস্থার তুলনা করত' বিপিনচন্দ্র পাল তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। এবং বেশ কয়েক বছর পর ১৯০১ সালের ২৬শে আগস্ট "নিউ ইণ্ডিয়ায়" একটি লেখায় তিনি মন্তব্য করেন ঃ "দণ্ডযোগ্য এই শ্রমপ্রথা হচ্ছে দাসপ্রথারই ঈষৎ মার্জিত এবং আধুনিকীকৃত রূপ।"

কিন্তু অসমের চা-বাগিচার ফলে কি দেশের অজানা সম্পদের বিকাশ

ও তজ্জনিত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও বেতনপ্রাপ্তির দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দেশ লাভবান হয়নি ? ভারতীয় লেখকদের কেউ কেউ এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু নরম-পন্থী, তাঁরা এই সব উপকারের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেও বলেছেন: "মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর দরিদ্রতম, মূঢ়তম এবং সর্বাপেক্ষা অসহায় প্রজাদের এক বিরাট অংশের জীবন এবং স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এই উপকার কাম্য নয়।" আর যাঁরা অধিকতর বিক্ষুব্ধ তাঁদের মত ছিল, এই ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত: "চা শিল্প যদি ধ্বংসও হয়ে যায় এবং অসম হিংস্র জীব জন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হয় তাহলেও ক্রীতদাসের মতন কুলি কেনা-বেচার এই ভয়ানক কুপ্রথার অবসান" শ্রেয়।

৬. উপায়ের সন্ধানে

এই অবস্থা অবশ্যই বেশিদিন চলতে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই ১৮৮৭ সালে 'সঞ্জীবনী' সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিল: "ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকেরা এই নিদারুণ অত্যাচার বন্ধ করার চেষ্টা করুন। ইংরেজ বণিকগণ, তোমরা তোমাদের স্বর্ণলিপসায় মানুষের জীবনে যে পরিমাণ দুর্দশা নিয়ে আসছ, তা ভুলে যেওনা। বেশি দিন এ ভাবে চলতে পারে না। ঈশ্বরের বিচারে তোমাদের মতন অনেক পরাক্রান্ত জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। উন্মাদের মতন এই আচরণ বন্ধ কর, নাহলে এক দিন তোমাদেরও জবাব দিতে হবে। আমাদের দেশ থেকে তোমাদের সমস্ত রকম দানবীয় আচরণের রেশ মুছে ফেলার চেষ্টা কর।"

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভারতের নেতারা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ১৮৫৯ সালের শ্রমিজীবীদের চুক্তিভঙ্গ আইনের এবং ১৮৮২ সালের অন্তর্দেশীয় প্রবসন আইনের প্রয়োগের ফলে যে নিপীড়নমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কুলিরা আসলে কি অবস্থায় রয়েছে সেটা উপলব্ধি করার জন্য। এবং একটা স্বাধীন তদন্ত কমিসন নিয়োগের জন্য। দ্বিতীয়ত, নেতারা দাবি করলেন, যেহেতু শ্রমিকেরা সকলেই অজ্ঞ এবং ধনী ও শক্তিশালী চা মালিকের হাতে সম্পূর্ণ অসহায়, সরকারের উচিত মালিকদের অত্যাচারের হাত থেকে এই শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। তাঁরা যে প্রস্তাব করেন তার একটি, যে সব ম্যানেজারেরা শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন তাঁদের দ্রুত ও উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করা হ'ক। তবে ভারতীয়দের সর্বপ্রধান দাবি ছিল, সমস্ত রকম দণ্ডমূলক আইন রদ এবং স্বেচ্ছা-প্রবসনের রীতি প্রবর্তন, যাতে "চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিশাল শ্রম-বাজার থেকে চা বাগানগুলি শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারে।"

অসম কুলিদের দুঃখ লাঘবের উদ্দেশ্যে এইসব আবেদন নিবেদন এবং

সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেও নেতাদের কেউ কেউ অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে বিদেশী সরকার ইউরোপীয় চা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সম্ভবত রাজি হবে না। অসম কুলিদের সব চাইতে কট্টর সমর্থক "সঞ্জীবনী" এই সচেতনতা থেকেই সবাইকে স্বাবলম্বী হতে আহ্বান জানিয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ১৪ই আগস্ট এই পত্রিকা সম্পাদকীয় কলমে দেশের পৌরুষের কাছে আবেদন করে বলেছিল,—ভারতীয়রা যদি এখনো তাদের পুরুষত্ব বিসর্জন না দিয়ে থাকেন তবে "তাঁদের কর্তব্য হবে এমন এক দাবানলের সৃষ্টি করা যা কুলি আইনকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে।"

বর্তমান কুলিদের এবং ভবিষ্যতে যারা কুলি হবে তাদের আইনগত ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার জন্য ও বাগিচা মালিকদের কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য সঞ্জিবনী একটি সমিতি গঠনেরও পরামর্শ দেয়। এই কাগজের নিয়মিত লেখকদের একজন এমনকি এই প্রস্তাব দেন যে, শিক্ষিত ভারতীয়দের উচিত হবে চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করা কেননা "অসমের চা পানের অর্থ, হতভাগ্য নির্যাতিত কুলিদের রক্ত পান করা।" কিন্তু মজার বিষয় হ'ল (যদিও এটা বিস্ময়কর নয়), কেউই কিন্তু তখন ঐ চা-বাগানের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মারফতে সংগঠিত হওয়ার বা অন্যভাবে নিজের পায়ে দাড়ানোর পরামর্শ দেননি। কুলিরা নিজেরাই কখনো কখনো মারপিট বা দাঙ্গা হাঙ্গামার পথ বেছে নিয়েছে. কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে এ-বিষয়ে উপযুক্ত নীতি-নির্দেশ কোনোদিনই পায়নি।

৭. অসমের শ্রমিক ও ১৯০১ সালের প্রবসন আইন

ভারতীয় রাজনীতিতে চা শ্রমিকের প্রসঙ্গটা আরও একবার গুরুত্ব পেয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এ নিয়ে বার বার আন্দোলন এবং তাছাড়া অসমের উদারপন্থী নির্ভীক চিফ কমিশনার হেনরি কটনের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারত সরকার আর একটা আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। তদনুসারে ১৮৯৯ সালের ১৩ই অক্টোবর আইনসভায় অসম শ্রমিক এবং প্রবসন বিল পেশ করা হয়; আইন পাস হয় ১৯০১ সালের ৮ই মার্চ। এই আইনে কিছুটা দায়সারাভাবে হলেও চাকরিতে নিযুক্তির নিয়ম কানুনে[৪৬] উন্নতি আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা অচিরে ব্যর্থ হয় এবং আগের মতই গুরুতর অবস্থা চলতে থাকে।[৪৭] এই আইনের একটি ধারা—যেটা সমগ্র আইনের উদ্দেশ্য তথা ফলাফলের বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না—গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছিল। ১৮৯৯ সালে যখন আইনটির প্রস্তাব পেশ করা হয় তখন এই প্রস্তাব ১৮৮২ সালের আইন অনুসারে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন মাসে এক টাকা বৃদ্ধির কথাছিল; কিন্তু সিলেক্ট কমিটি

সেটিকে এমনভাবে সংশোধন করল যাতে পুরুষ ও নারী শ্রমিকের বেতন দাঁড়াল প্রথম বছরে মাসে ৫ এবং ৪ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে ৫½ এবং ৪½ টাকা এবং চতুর্থ বছরে ৬ এবং ৫ টাকা। সুতরাং দেখা গেল নতুন এই আইন অনুসারে প্রথম এবং চতুর্থ বছরের বেতনের হার হল আগেকার আইনের ব্যবস্থার সমান। স্বভাবতই জাতীয়তাবাদীরা এই আইনকে আসলে চা মালিকদের স্বার্থ সিদ্ধির এবং জোর করে শ্রমিকদের কাজে বাধ্য করার একটা হাতিয়ার বলে অভিহিত করেন। যদিও বেতন বৃদ্ধির ধারাটিকে তাঁরা সমর্থন করেছিলেন, এই কারণে যে বেতন বৃদ্ধির হার অতি তুচ্ছ হলেও হতভাগ্য কুলিদের জন্যে সামান্য একটু কিছুও তো করা হয়েছিল।[৪৮]

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল যখন চা মালিকদের পক্ষ থেকে জে. বাকিংহাম মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত ধারাটার প্রয়োগ দু-বছরের জন্য স্থগিত রাখতে চেয়ে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনলে সরকার সেটি গ্রহণ করে। আসলে এর আগেই, বিতর্ক যখন চলছিল লর্ড কার্জন স্বয়ং তাতে অংশ নিয়ে চা মালিকদের এই ছাড়ের জন্য সরাসরি আবেদন জানাতে বলেছিলেন। এর দ্বারা কুলিদের জন্য সবেমাত্র যে যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা আদায় করা গিয়েছিল তাও নস্যাৎ হয়ে যাবে বলে আসামের জনপ্রিয় চিফ কমিশনার সংশোধনীর বিরোধিতা করায় লর্ড কার্জন প্রকাশ্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তাতে আগুনটা আরো চাগিয়ে দেওয়া হল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জগৎ ও নেতারা একযোগে বিদেশী চা মালিকদের কাছে লর্ড কার্জনের এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। এই ঘটনাকে তাঁরা "ভারতবর্ষের মানুষদের ঠকিয়ে ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সযত্নে সুরক্ষিত করা"র কৌশলের আর একটা ঘৃণ্য উদাহরণ বলে অভিহিত করলেন।[৪৯] ১৯০১ সালের ১০ই মার্চ 'বেঙ্গলী' লিখল: "ইংরেজ শাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপীয় পুঁজিপতি ও বণিকদের স্বার্থরক্ষা, তার জন্য প্রয়োজন হলে এমনকি বিবেক ও মানবিকতা বিসর্জন দিয়েও।" ভারত সরকারকে ধিক্কার জানানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য জাতীয়তাবাদীরা কুলিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য হেনরি কটনের সততা ও সৎসাহসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

৮. ১৯০৩ সালের মাদ্রাজ বাগিচা শ্রমিক আইন

বিদেশী সরকার সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের ক্রোধ এবং বাগিচা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি আর একবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল ১৯০৩ সালে যখন মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ বাগিচা শ্রমিক আইন পাস করল। বহুলাংশে ১৯০১ সালের আসাম বাগিচা শ্রমিক এবং প্রবসন আইন এর ধাঁচে গড়া এই আইনেও পালিয়ে যাওয়া কুলিদের গ্রেফতার ও শাস্তির এবং অনুপস্থিতি ও আলস্যতার জন্য জরিমানা

আদায়ের ও কারাবাসের বিধান ছিল। অসম আইনের বেলায় যেমন হয়েছিল মাদ্রাজ আইনকেও জাতীয়তাবাদী নেতারা একইভাবে দানবীয়, ঘৃণ্য, অমানবিক, অন্যায় ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করলেন। তাঁরা অভিযোগ করলেন, এই আইনে অন্যায়ভাবে কুলিদের স্বাধীনতা খর্ব করে দক্ষিণ ভারতের বাগিচা শিল্পে দাস প্রথা বৈধ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। সর্বদাই বিদেশী পুঁজিপতি ও বাগিচা মালিকদের ক্রীড়নক হয়ে তাঁদের সেবা করতে উন্মুখ বলে সরকারকে তাঁরা ধিক্কার দিলেন।

৯. ব্যাপকতর সমস্যাবলী

বাগিচা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু জাতীয় নেতা এর সঙ্গে জড়িত রাজনীতি ও অর্থনীতির কয়েকটি বৃহত্তর প্রশ্ন নিয়েও প্রকাশ্যে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। বাগিচা শ্রমিকদের প্রতি সরকারের মনোভাবের সঙ্গে ঐ সব প্রশ্নের যে একটা ব্যাপক সম্পর্ক ছিল তাঁরা সেটাই ধরতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, জাতীয় কংগ্রেস, সর্বভারতীয় সংবাদপত্র এবং আইনসভার ভারতীয় সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার যেভাবে বাগিচা-মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন পাশে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলেন, তাতে ভারতীয় নেতারা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে সরকার এই দেশের জনসাধারণের মতামতকে কোনো গুরুত্বই দেন না।[৫০] তাঁরা আরো লক্ষ করেছিলেন যে, পুনর্গঠিত নূতন আইনসভা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, এবং সরকার আইনসভার ভারতীয় সদস্যদের ইচ্ছাকে কোনো রকম সম্মান দেখান নি। সেজনাই জি এস- আইয়ার মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমান ভারতীয় আইন ব্যবস্থার মতন এমন পরিপূর্ণ প্রহসন কোনো আইন ব্যবস্থায় কখনও দেখা যায়নি। যাঁরা একটু বেশি ধরণের নরমপন্থী এবং বিদেশী শাসকদের বিচার-বোধ এবং প্রগতিশীলতায় আস্থাশীল ছিলেন এমনকি তারাও আশাহত হয়েছিলেন। মাদ্রাজ বাগিচা শ্রমিক আইন সম্পর্কে "কাইজার-ই হিন্দ" ১৯০৩ সালের ৮ই মার্চ সংখ্যায় যে মন্তব্য করেছিল, তাতে সেটা স্পষ্ট ধরা পরে। পত্রিকাটি লিখেছিল ঃ

"আমাদের প্রশ্ন, এঁরাই কি নিরপেক্ষ আইনপ্রণেতা, যাঁরা দাবি করেন তাঁদের ভূমিকা পিতৃসুলভ অথচ কাজের বেলায় একটা স্বার্থান্ধ শ্রেণীর আদেশে মূক অসহায় মানুষদের ক্রীতদাসে পরিণত করে ফেলতে দ্বিধা করেন না? ইংরেজদের রাজনীতিই শুধু নয় তাঁদের বিচারবোধেরও যে অবক্ষয় ঘটেছে, এটাই কি তার আরও একটা জাজ্বল্য প্রমাণ নয়? বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যক্তিত্ব এবং নীতিবোধের অবনতির অশুভ ইঙ্গিত স্পষ্ট, যা সাম্রাজ্যের পক্ষে মোটেই মঙ্গল-দায়ক নয়। ঈশ্বর ব্রিটিশ জাতিকে সমাগত বিপদ থেকে রক্ষা করুন!"

১৯০৩ সালের ১০ই মার্চ 'কেশরী' সমস্যাটিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক

সাম্রাজ্যবাদের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছিল। "এযুগের গলাকাটা প্রতিযোগিতার মধ্যে বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে সভ্যতার আলোক পোঁছে দেবার অজুহাতে তাদের বস্তুগত ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করছে"—এই ঘটনার উল্লেখ করে 'কেশরী' অভিযোগ করেছিল—"যেখানেই ইউরোপীয়রা বাণিজ্য করতে অথবা উপনিবেশ গড়তে গিয়েছে সেখানেই তাঁরা সে দেশের মানুষকে ক্রীতদাসের মতন কাজ করতে বাধ্য করেছে," "দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো" কাফের "আর ভারতের আসাম চা বাগানের কুলিদের প্রতি আচরণ এরই উদাহরণ।" উপসংহারে কেশরী এই ভেবে দুঃখ প্রকাশ করেছিল যে "কিছু সংখ্যক মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়বে আর বাকিরা তাদের জন্য খেটে মরবে!"

কিছু ভারতীয় নেতা চা শ্রমিকের সমস্যাটাকে শ্রমিকশ্রেণী এবং ধনিকশ্রেণীর পারস্পরিক সমস্যার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছিলেন, এবং নিজেদের প্রথোমক্ত শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। যেমন, জি. এস. আইয়ার। তিনি বুঝেছিলেন, চা শ্রমিক সংক্রান্ত সরকারি নীতির মূল কারণ, সরকারের দৃষ্টিতে চা শিল্পের সঙ্গে শুধুমাত্র মালিকদের স্বার্থই জড়িত। রমেশচন্দ্র দত্তও অনুভব করেছিলেন সরকারের উপর পুঁজিপতিদের প্রভাব এত বেশি যে শ্রমিক-দের জন্য কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। "সঞ্জীবনী"ও একই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিল: শেষ বিশ্লেষণে অসমের সংগ্রাম মূলত শ্রমিক-মালিক বিরোধ। এই নূতন উপলব্ধি এবং জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এর গুরুত্ব ১৯০১ সালে বিপিনচন্দ্র পাল একটি বক্তৃতায় তুলে ধরেন। বিষয়টার গুরুত্ব ও অভিনবত্বের জন্য একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে:

"সভাপতি মহাশয়, বিষয়টি বহু পুরনো—বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রশ্ন! সর্বশক্তিমান ডলারের কল্যাণে পুঁজিপতিরা তো এমনিতেই শক্তিশালী। তাঁরা এখন একত্রিত হয়েছেন শুধু শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেই নয়, আইনে যারা অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং হাইকোর্ট দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে তাদেরকে বাঁচাতেও। এই অবস্থায় শ্রমিকরাও কি ঐক্যবদ্ধ হবে না? আপনারা সকলেই শ্রমিকদের প্রতিনিধি। সভাপতি মহাশয়, আমরা রাজাই হই বা প্রজাই হই, এই দেশে আমরা সবাই শ্রমিকদের সঙ্গে এক আসনে বসে রয়েছি। এবং তারা রয়েছেন বিপরীত দিকে, পুঁজিপতি-দের সারিতে।"

একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন পি. আনন্দ চারলু অসম শ্রমিক এবং প্রবসন বিলের উপর প্রদত্ত বক্তৃতায় যদিও অনেক সংযতভাবে। তাঁর অন্যতম যুক্তি ছিল, "উদ্যমী, উৎসাহী এবং কর্মনিষ্ঠ পুঁজিপতিদের সাফল্যের মূলে শ্রমিক শ্রেণীর অবদানও কম নয়," সুতরাং তাঁদের দাবিও অনুপেক্ষনীয়। অপর

যুক্তি : "মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে মালিকের পক্ষে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা বহন করা সহজতর···কিন্তু বেতন বৃদ্ধি বিনা শ্রমিকের চলে না। মালিকের কাছে প্রশ্নটা বিলাসিতা একটু কমানোর, কিন্তু শ্রমিকের কাছে এর অর্থ নিদারুণ দারিদ্র্য।"

তবে, বাগিচা শ্রমিকদের প্রতি জাতীয় নেতৃত্বের এই সহানুভূতির আসল কারণ ছিল এই শিল্পের মালিকদের বিদেশী চরিত্র। ভারতীয় মালিকানার অধীনে যে সব শিল্প ছিল তাদের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সহানুভূতি দেখা যায়নি। ব্যাপারটা নাটকীয়ভাবে বোঝা গেল ১৯০১ সালের ৮ই মার্চ অসম শ্রমিক এবং প্রবসন আইন পাস হবার ঠিক দু সপ্তাহ পরে আইন সভায় ভারতীয় খনি বিল আলোচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে। সমগ্র ভারতীয় সংবাদপত্র ও আইনসভার ভারতীয় সদস্যরা একযোগে খনিতে কর্মরত নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে যৎসামান্য প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেছিলেন।

শ্রমিকদের ব্যাপারে এই দু-মুখো নীতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের মধ্যেও প্রকট ছিল। কংগ্রেস ১৯০১ সালে ভরতীয় খনি বিলে যে সব ধারায় "শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে" সেগুলি বাদ দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিল। অথচ ঠিক তার এক বছর পরেই অসম কুলিদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

পরিণামে নাটকী—হয়ত বা ট্র্যাজি-কমিক জাতীয়—এবং অবিশ্বাস্য রকমের অসূয়াদোষদুষ্ট এই স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদাহরণ রেখেছিল 'হিন্দু' পত্রিকা, ১৯০৩ সালের ৩রা মার্চ এক সম্পাদকীয়তে। আমরা আগেই দেখেছি বাগিচা মালিকদের স্বার্থে পক্ষপাতমূলক সমস্ত রকম আইনের সব চাইতে কট্টর বিরোধীদের মধ্যে 'হিন্দু' ছিল অন্যতম, এবং এই সব আইনকে 'হিন্দু সর্বদাই ক্রীতদাস আইন বলে অভিহিত করেছে। মাদ্রাজ বাগিচা বিলের বিরুদ্ধেও 'হিন্দু' বার বার জোরালো বক্তব্য রেখেছে—১৯০৩ সালের ৩রা মার্চের সম্পাদকীয়তেও তাই করা হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ঐ সম্পাদকীয়তেই এই দাবি পেশ করা হয়েছিল যে "দক্ষিণ ভারতের মালিকদের জন্যও অনুরূপ একটি আইন প্রণয়ন করা হ'ক কেননা তাঁরা শুধু শ্রমিক জোগাড় করতেই নয়, তাঁদের দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করাতেও, নানা অসুবিধা ভোগ করেন"। এই রকম একটি শ্রম-আইন দক্ষিণের ভূ-স্বামীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন কেননা, শাস্তির ব্যবস্থা তাদের "দারুণ উপকারে" লাগবে। এই বক্তব্যকে জোরদার করতে 'হিন্দু' জাতীয়তাবাদের শরণ নিয়ে লিখেছিল : "ভারতীয় কুলিদের শ্রেণী-স্বার্থে বিশেষ কোনো আইনের প্রয়োজন নেই ; কুলিরা যদি ইউরোপীয় বাগিচা মালিকদের দাসত্ব করতে বাধ্য হন তাহলে তাদের ভারতীয় কৃষি মালিকদের দাসত্ব করতে বাধ্য

করাও অন্যায় হবে না—শুধু একটি শ্রেণীরদাসত্ব করার জন্যই এই ভারতীয় কুলিদের জন্ম হয়নি।" এই ধরণের বক্তব্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য অনাবশ্যক। 'হিন্দু' ঐ সম্পাদকীয়র শেষে যে দাবি জানিয়েছিল তাতে অজ্ঞাতসারে এক কপট নীতিবোধ নিষ্করুণভাবে ফুটে উঠেছিল। 'হিন্দু'র সিদ্ধান্ত ছিল: "সুদূর পাহাড়ি অঞ্চলের চা মালিকদের করুণার উপর কুলিদের ছেড়ে দেওয়া যে ধরণের অন্যায় ঠিক তেমনই অন্যায় অনুরূপ আইনের (শাস্তিমূলক আইনের) সাহায্য থেকে তাঁদের (ভারতীয় ভূ-স্বামীদের) বঞ্চিত করা।" তবে অবশ্যই 'হিন্দুর' একটা সান্ত্বনা ছিল! শুধু এই পত্রিকাই এ রকম হাস্যকর দাবি করেনি। দু মাস পরে তামিল সংবাদ জগতের আর এক জাতীয়তাবাদী স্তম্ভ "স্বদেশ মিত্রন্"ও অনুরূপ দাবি পেশ করে।

১০ জি. আই. পি রেলওয়ের সিগনালারদের ধর্মঘট।

অভারতীয় মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের মনোভাব অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ১৮৯৯ সালের জি আই. পি. রেলওয়ের একটি ঘটনাতেও। ঐ বছর মে মাসে এই রেলওয়ের আটশ'রও বেশি সিগনালার বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে। দাবিগুলির মধ্যে ছিল বেতন হ্রাস বন্ধ করা, নিয়ম-সম্মতভাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা, কাজের সময় বেঁধে দেওয়া এবং নিয়মিত ছুটির ব্যবস্থা। দাবিগুলি রেল কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ধর্মঘটের ফলে এই রেলওয়ের বেশ ক্ষতি হয়েছিল—মাল পরিবহন অনেক কমে গিয়েছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন কি বন্ধ রাখতে হয়েছে, তাছাড়া ট্রেন চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়ায় যাত্রী পরিবহনেও গুরুতর অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। সম্ভবতঃ এটাই ছিল ভারতীয় শ্রমজীবীদের যে কোনো অংশের দ্বারা সংগঠিত প্রথম ধর্মঘট।[৫১] সিগনালারদের একটা রীতিমতন নিয়মমাফিক সংগঠন ছিল, যার হেড কোয়ার্টারস্ ছিল শোলাপুর, এবং তাদের নিয়োজিত সলিসিটার কোম্পানিও ছিল। ধর্মঘটের আগে দু বছর ধরে আন্দোলন চলেছিল এবং একটি দাবির তালিকা ও চরমপত্র ও পেশ করা হয়েছিল।

যদিও এই ধর্মঘট ছিল 'বাবু' শ্রেণীর কর্মীদের ধর্মঘট, কিন্তু একদিক থেকে এটি ছিল এ যাবৎ সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক যত রকম আইন প্রণয়ন করেছিল বা করতে চেয়েছিল তার তুলনায় একটি র‍্যাডিকাল পদক্ষেপ, বিশেষতঃ ভারতের সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী।[৫২] কাজেই কারখানা শ্রমিকদের প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদাসীনতার কথা স্মরণ রাখলে এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক ছিল যে সিগনালারদের এই ধর্মঘটের ব্যাপারে নেতারা প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা না করলেও নিরপেক্ষতা

অবলম্বন করবেন, অথবা খুব বেশি হলে মৃদু ভর্ৎসনা করবেন। অথচ বাস্তবে দেখা গেল, মাত্র একটি বাদে বোম্বাইয়ের সবকটি প্রধান সংবাদপত্র ধর্মঘটকে দারুণভাবে সমর্থন করল।[৫৪] সম্ভবতঃ তার চাইতেও বিস্ময়কর, এই ধর্মঘট দূরের "অমৃত বাজার পত্রিকা', "হিতবাদী" "হিন্দু" এবং "হিন্দুস্তানীর" মত সংবাদপত্রগুলিতেও সহানুভূতির ঢেউ তুলেছিল। বাল গঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত সংবাদপত্র "মারহাট্টা" এবং "কেশরী" ধর্মঘটীদের দাবিকে তাদের নিজেদের দাবি করে নেয় এবং মাসের পর মাস তা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

এইসব ভারতীয় সংবাদপত্র এই অভিমত প্রকাশ করে যে, সিগনালাররা ধর্মঘট করে ঠিকই করেছেন, কেননা বহুদিন থেকেই তাঁদের বেতন ছিল অল্প, অথচ তাদের বেশি খাটতে হত, এবং তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হত তা অসঙ্গত। এই অবস্থায় তাদের দাবি ছিল খুবই ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত, কাজেই সহানুভূতি এবং সমর্থনের যোগ্য। তারা এই পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে পরিচালন কর্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে তাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করাতেই।[৫৫]

কয়েকটি সংবাদপত্র এমনকি নিছক সহানুভূতির স্তর অতিক্রম করে রীতিমত ধর্মঘটীদের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল, এবং ধর্মঘটীদের দৃঢ়তা এবং একতার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল। ১৮৯৯ সালের ২৮শে মে "মারহাট্টা" লিখেছিল—এই ধর্মঘটের গুরুত্ব সাময়িক নয়: ধর্মঘটীরা একতা এবং আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অন্যদের কাছে অনুসরণীয়। অনুরূপভাবে, ১৮৯৯ সালের ৭ই জুন, "হিন্দুস্থানী" দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিল—ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে সিগন্যালাররা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভারতবর্ষের অন্যান্যরা যেন সেই ধরণের উচ্চ পর্যায়ের নীতিবোধে উন্নীত হবার চেষ্টা করেন। এই কাগজগুলি নিরন্তর ধর্মঘটীদের উৎসাহ দিয়েছে সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকতে, এমনকি তাতে যদি চাকরি যায় তাও। যাঁরা কাজে যোগ দিয়েছিল কাগজগুলি তাদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়েছিল।

ভারতীয় সংবাদপত্রাদি রেলকর্মচারিদের সম্পর্কে রেলওয়েজ কর্তৃপক্ষের মনোভাবের ও আচরণের, তীব্র নিন্দা করেছিল। তারা রেল কর্তৃপক্ষের "জনগণের স্বার্থে ব্যবস্থা নেওয়ার" যুক্তিকে একটা বাজে অজুহাত বলে উড়িয়ে দেয়, এবং জনসাধারণ যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল তার জন্য সরাসরি রেল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করে। তারা রেল কোম্পানিকে কর্মীদের ন্যায্য অভিযোগসমূহের প্রতিকার করতে এবং একজন সালিশ নিয়োগ করে বিবাদ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানায়।[৫৬] কর্মীরা সালিশ নিয়োগের এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

শুধু এই নয়, জাতীয়তাবাদী পত্রাদি সরকারকেও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে

রেল কর্তৃপক্ষকে সিগনালারদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, মানবিকতার কথা ছেড়ে দিলেও সরকারের এ ব্যাপারে একটা দায়িত্ব আছে, কেননা জি আই. পি. রেলওয়ে একটি গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মঘটের ফলে যে লোকসান হচ্ছে সেটা সরকারকেই অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত করদাতাদেরই বহন করতে হবে।[৫৬] এই প্রসঙ্গে ১৮৯৯ সালের ২৮শে মে "মারহাট্টা" মন্তব্য করে: "জনসাধারণের প্রগাঢ় সহানুভূতিপুষ্ট একটা অংশকে পর্যুদস্ত ও নিরাশ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা জনসাধারণকে দিতে বাধ্য করা স্পষ্টতই গুরুতর অন্যায়।" জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির আর একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, সরকারের এই ধর্মঘটের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার আছে এবং সেটি তার দায়িত্বও, কেননা রেলপথ জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এতে কোনোরকম বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলা ঘটলে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই নয়, যাত্রীদের নিরাপত্তায়ও ব্যাঘাত ঘটবে। একই সঙ্গে কাগজগুলি এটাও উল্লেখ করে যে সরকার যে শুধু হস্তক্ষেপ করতে বা নিরপেক্ষ থাকতে অস্বীকার করছেন তাই নয়, সক্রিয়ভাবে রেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে চলেছেন, যা অতীব নিন্দার্হ।

সিগন্যালারদের প্রতি এই ব্যাপক সমর্থন মামুলি মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কাছে ধর্মঘটীদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের আবেদন জানানো হয়েছিল। বহু মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়েও এসেছিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নানা জায়গায়—যেমন, আহমেদনগর, অমরাবতী, ধুলিয়া এবং নাগপুরে—চাঁদা তোলার জন্য প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন হয়েছিল।[৫৭] বোম্বাইতে ফিরোজশাহ্ এম মেটার বাড়িতে ১৯শে মে বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের এক সভা হয়, তাতে ধর্মঘটীদের সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাস্থলেই ২,৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এবং সমপরিমাণ অর্থ পরের দিনই পাওয়া যাবে এমন প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। বাংলা প্রদেশেও এই তহবিলের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতী ঘোষাল সম্পাদিত বাংলা মাসিকপত্র "ভারত" অর্থ সংগ্রহ করেছিল। ধর্মঘট ব্যর্থ এবং প্রায় ৭০০ সিগন্যালার বরখাস্ত হলে, তাঁদের জন্য বোম্বাইতে জনসাধারণের উদ্যোগে একটা অর্থভাণ্ডার খোলা হয়েছিল, যার অন্যতম কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ডি. ই ওয়াচা। ১৮৯৯ সালের ১৬ই জুলাই "মারহাট্টা" এই প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। এমনকি সুদূর কলকাতার "অমৃত বাজার পত্রিকা" ১৮৯৯ সালের ৪ঠা জুলাই জমিদারদের ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আবেদন জানিয়েছিল ঐ বরখাস্ত কর্মীদের চাকরি দেওয়ার জন্য।

এই ধর্মঘটের সমর্থনে ভারতীয় নেতাদের র‍্যাডিকাল মনোভাবের মূল কারণ অবশ্যই নিহিত ছিল তাঁদের জাতীয়তাবোধে। ধর্মঘটী সিগন্যালাররা ছিলেন ভারতীয়, আর রেল কোম্পানি ছিল ইংরেজ মালিকানা ও পরিচালনাধীন। এই একটিমাত্র বিষয়ই এই দ্বিপাক্ষিক বিরোধকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করে একটা জাতীয় সমস্যার স্তরে উন্নীত করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্তও হয়েছে। যেমন, "মারহাট্টা" অভিযোগ করেছিল, রেল কোম্পানি সিগন্যালারদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার মতন বেতন দিতে অনিচ্ছুক তার কারণ তারা ভারতীয়। ১৮৯৯ সালের ২১শে মে কাগজটি লেখে :

"কিন্তু ম্যানেজার হয়ত ভেবেছিল একজন কালা আদমির কোনোমতে বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি পাবার কোনো অধিকার নেই! তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঐটুকু দেওয়া হচ্ছে যাতে সে হাসিমুখে শ্বেত সাহেবদের বোঝা বইতে পারে, যাতে সভ্যতার বাণী প্রচারের যে গুরুদায়িত্ব ঈশ্বর সাহেবদের স্কন্ধে অর্পণ করেছেন সেই গুরুদায়িত্ব তারা যেন ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিকে শোষণ করে পালন করতে পারে। সব মুনাফা তাঁরা পাবেন, কালা আদমির জন্য শুধুমাত্র প্রভুর সেবা করার আর তাঁরই প্রয়োজনে বংশ রক্ষার জন্য যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কোনো অবশিষ্টই থাকবে না।"

"অমৃত বাজার পত্রিকা"ও পুরো ব্যাপারটির মধ্যে গোপন একটা জাতিগত বিভেদের অস্তিত্ব লক্ষ করেছিল। ১৮৯৯-এর ২২শে জুন এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হ'ল : "বোম্বাই সরকার এই অভিযোগ কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবেন না যে তারা রেল কোম্পানিকে সাহায্য করেছেন আর সিগন্যালারদের পথে বসিয়েছেন নিছক এই কারণে যে শেষোক্তরা দেশীয় মানুষ আর প্রথমোক্তরা শাসক শ্রেণীভুক্ত।" এই প্রসঙ্গে, ১৪ই মে "গুজরাটি" এবং ১৬ই মে 'জমএ-জমশেদ' স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে দু বছর আগে যখন একই রেল কোম্পানির ইউরোপীয় গার্ডেরা ধর্মঘট করেছিল তখন রেল কোম্পানি ও সরকারের মনোভাব ছিল অন্য রকম, গার্ডদের দাবিদাওয়াও মেনে নেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ১৬ই জুলাই "মারহাট্টা"এর থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সিগনালারদের লড়াই ছিল জাতীয় সম্মানের জন্য "তাঁদের প্রেরণা ছিল নিজেদের ও সমাজের আত্ম-সম্মান রক্ষা করা।"

সিগন্যালারদের ধর্মঘট সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের মনোভাব যে জাতীয়তাবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা অন্যভাবেও স্পষ্ট হয়। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে অসংখ্য ধর্মঘট হয়েছিল, কিন্তু প্রথম সারির কোনো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই ঐগুলিকে সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করেনি অথবা সমর্থন করেনি। বরং দেখা গেছে যে, যে"অমৃত বাজার পত্রিকা"বেতন বৃদ্ধির

দাবিতে সিগনালারদের ধর্মঘটের সমর্থনে এত সরব ছিল, সেই অমৃত বাজারই কিন্তু কয়েক মাস পরে বেতন হ্রাসের প্রতিবাদে বোম্বাই কাপড় কল শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের নিন্দা করতে দ্বিধা করেনি। ১৯০০ সালের ১০ই জানুয়ারি একটি লেখায় "অমৃত বাজার পত্রিকা" এই যুক্তিই উপস্থিত করেছিল যে, মালিকদের পক্ষে বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, তাদের বেশি দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করলে তার একটাই অর্থ হবে,—একটি ভারতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ধর্মঘটীদেরও "শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মরতে হবে"।

১১. নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা

শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ এবং শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘাত ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করার সংগে সংগেই জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারো কারো মধ্যে এই নবোত্থিত শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা ও তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে, এই নব্য চিন্তাধারা মাত্র কয়েকজন নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সবাইকে একই ভাবে এবং একই পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে বোম্বাই মিল মালিক সমিতির এক সভায় ডি. ই. ওয়াচা প্রথম এটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। ওয়াচা নিজে ছিলেন মিল মালিকদের প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্য ছিল, বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন খরচ দুভাবে কমানো যায়—প্রথমত, শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচা তুলোর গুণমান উন্নত করে, এবং দ্বিতীয়ত, "শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতি" ঘটিয়ে। ওয়াচা বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন, অতিরিক্ত সময় কাজ, অল্প বেতন, এবং খাদ্যসামগ্রীর উপর কর অবধারিতভাবে শিল্পের বিকাশকে পংগু করেছে, অথচ অন্যদিকে যেখানেই দেখা গেছে যে কাজের সময় কম বেতন বেশি, খাদ্যদ্রব্য সুলভ, এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে, সেখানেই শিল্পের লক্ষনীয় উন্নতি ঘটেছে। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াচা একই বক্তব্য আবার উপস্থিত করেছিলেন। তিনি কাজের সময় দিনে দশ ঘণ্টাতে বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। "শিল্প থেকে অতিরিক্ত লাভের লালসা" এবং "স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসীকে হত্যা করার" নীতির বিরুদ্ধে মিল মালিকদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেন, এর ফলে শ্রমিক সমস্যা ভবিষ্যতে মিল মালিকদের "শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" এবং সেজন্য মিল মালিকদের উচিত হবে সরকার অথবা অন্য কারও হস্তক্ষেপের জন্য ফেলে না রেখে নিজেদের স্বার্থেই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা শুরু করা।

বিপিনচন্দ্র পাল আর একজন নেতা যিনি এই নতুন শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাবের তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯০১-০৫ সালের মধ্যে লেখা তাঁর অধিকাংশ রচনাই হারিয়ে গেছে—অন্তত আমি খুঁজে পাইনি।

'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে যে সাপ্তাহিক তিনি ১৯০১ সালে প্রকাশ শুরু করেন শুধু তারই এলোমেলো কয়েকটি সংখ্যা বিভিন্ন পাঠাগারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ঐগুলি ভালো করে পড়লে সন্দেহ থাকে না যে শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ১৯০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর "নিউ ইণ্ডিয়ার" সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন : "দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে" বিশ লক্ষ শ্রমিকের অবস্থার "তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।" এই শ্রমিক শ্রেণী "কিছুটা আধুনিক পরিবেশে" কাজ করে, কাজেই এদের মাধ্যমেই নতুন নতুন চাহিদা এবং অর্থনৈতিক প্রগতির নতুন ভাবনা জনসাধারণের কাছে পৌঁছোতে পারে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাতে এই শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি হয় তা দেখতে হবে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার সরকারি প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন যে, যেহেতু পুঁজিপতিদের প্রভাব 'প্রচণ্ড' সেজন্য সরকার এ যাবৎ বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি। ১৯০২ সালের ১৪ই এপ্রিল, নিউ ইণ্ডিয়ার আর একটি সম্পাদকীয়তে তিনি দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য একটি আইন প্রণয়নের কথা বলেছিলেন।

তবে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে প্রথম সুসম্বন্ধ আলোচনা করেন জি. সুব্রহ্মণীয় আইয়ার—১৯০১ সালে "হিন্দুস্তান রিভিউ অ্যাণ্ড কায়স্থ সমাচার" পত্রে প্রকাশিত তাঁর "আওয়ার লেবার প্রবলেম" নামে প্রবন্ধে এবং ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর "সাম ইকনমিক আসপেক্ট্স অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া" নামে গ্রন্থে। তিনিই প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি বিষয়টিকে শ্রমিকদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চেষ্টা করেন।[৫৮] তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, একদা পশ্চিম জগতে যেভাবে হয়েছিল ঠিক সেইভাবে ভারতেও শ্রমিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের সাম্প্রতিক ঘন ঘন শ্রমিক ধর্মঘট তার লক্ষণ। তাঁর মতে, এর মূল কারণ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা। "দারিদ্র্য ও দুর্দশা তার ভাগ্যের বৈশিষ্ট্য"। অবস্থাটা আরো সঙিন করে তুলেছিল তাদের অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব এবং বুদ্ধিহীনতা, যার ফলে "শক্তিশালী, শিক্ষিত মালিক শ্রেণীর সঙ্গে সংঘাত বাধলে তারা অসহায় বোধ করে।" আয়ার সতর্ক করে দেন, এ অবস্থা বেশিদিন চলবে না, এমন একদিন আসবে যখন ভারতের শ্রমিক শ্রেণীও জেগে উঠে সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক অধিকার, ও উচ্চতর বেতনের দাবি জানাবে এবং তা আদায় করে ছাড়বে।

এরই সঙ্গে জি. এস. আইয়ার আধুনিক শ্রমিকদের কল্যাণের ব্যাপারে অনীহার জন্য সরকার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য অসংখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে লিখেছিলেন :

"এইসব হতভাগ্যদের দারিদ্র্য দুর্দশা ও অধঃপতন দেখতে আমরা এতটাই

অভ্যস্ত যে এ বিষয়ে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছি—কি আমাদের শাসকবর্গ, কি আমরা নিজেরা, কেউই এদের জন্য এতটুকু বিবেক-দংশন অনুভব করি না, যদিও জানি উচ্চশ্রেণীর ও রাষ্ট্রের শত শত বৎসরের অবহেলা আর নিপীড়নের ফলেই আজ এদের এই অবস্থা।"

এই প্রসঙ্গে তিনি লেসো-ফেয়ার বা অবাধ নীতিরও বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে "প্রতিযোগিতার সূত্র প্রযোজ্য নয়, কেননা প্রতিযোগিতা এখানে অত্যন্ত অসম ; শ্রমিকেরা নামত স্বাধীন হলেও তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের দাসমাত্র—তার সামনে বিকল্প দুটি, হয় অনশনে থাকা নয়তো যে কোনো মূল্যে শ্রম বিক্রয় করা।" আসলে "এই অনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার—অথবা চাহিদা ও জোগানের সূত্র ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে আরো গরিব করেছে, যার জন্য ভারতীয় শ্রমিকের এই হাল"। কিন্তু লেসো ফেয়ারের বিকল্প কী? জি. এস আইয়ারের মতে, বিকল্প হ'ল সম্ভাব্য "মালিকদের হৃদয়ে এই অসহায় দরিদ্র মানুষদের প্রতি মমত্ব এবং দয়াধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।" এই পরামর্শ কতটা কার্যকর হবে সে সম্পর্কে অবশ্য তাঁর নিজেরই ঘোর সন্দেহ ছিল, কেননা ঐ "মানসিকতার বিকাশের সম্ভাবনা অনিশ্চিত তাছাড়া বাস্তবে এর প্রয়োগও হবে খেয়ালখুশি মত, খাপছাড়াভাবে।" তাহলে একটাই পথ খোলা থাকে : "এই অসীম এবং বাস্তবে অসম প্রতিযোগিতা, ভুল করে যাকে বলা হয় মুক্ত প্রতিযোগিতা,-তার হাত থেকে দুর্বলতর শ্রেণীকে বাঁচাতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র—তারই উচিত এই দায়িত্বভার গ্রহণ করা।"

একই সঙ্গে জি এস আইয়ার এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রমিকদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব সংগঠনও গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা মালিকদের আগ্রাসনের মুখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। লক্ষ করা যায় যে কোনো কর্মী মালিকের কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদে কাজ ছেড়ে দিলে অন্য একজন কম বেতনে কাজটা নিতে প্রস্তুত থাকে। এবং শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ নয় বলেই শেষোক্ত শ্রমিককে "কোনো রকম শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় না।" অন্যান্য দেশে দেখা যায় ঠিক এর বিপরীত চিত্র—শ্রমিকেরা বিশেষ সীমার নিচে বেতনহ্রাস মেনে নেয় না ; প্রয়োজনে ধর্মঘট করে। এই প্রসঙ্গে, আয়ার ইংরেজ শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন : সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখার এবং ১৮২৪ সালে সঙ্ঘবদ্ধ হবার আইনগত অধিকার অর্জন করার পর তারা অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে ; এবং এই "সংগঠিত শ্রম" পাশ্চমী সভ্যতায় "খেটে খাওয়া মানুষদের একটা বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করেছে।" আয়ার সেজন্য দেশের শ্রমিকদের "ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে মালিকরা তাদের অধিকার সঙ্কোচন করলে রুখে দাঁড়াতে"[৪৮] আহ্বান

জানান এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যেও আবেদন জানিয়ে বলেন, তারা যেন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে যথাসম্ভব সাহায্য করে।

জি. এস. আইয়ার ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ যিনি কৃষি শ্রমিকদের সমস্যাও অনুধাবনের চেষ্টা করেছিলেন। উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তিনি পুরো একটি অধ্যায় এই প্রসঙ্গে নিয়োজিত করেছেন। কৃষি শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিনি তাদের বেতনবৃদ্ধির দাবি জানান, এবং সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সরকার যেন জমিদারদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কৃষি-শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করেন।

অন্য আর একজন ভারতীয় লেখকও শ্রমিকদের সমস্যা সম্বন্ধে প্রখর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি হলেন 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৮ এর আগষ্ট সংখ্যার 'ডন'-এ প্রকাশিত 'আস্পেক্ট্স অব ইকনমিক লাইফ ইন ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' এবং ১৯০০ সালের মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক প্রবলেমস' থেকে এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত সম্পর্কে জানা যায়। পশ্চিমী দেশগুলির শিল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায় সমসাময়িক অন্য যে কোনো ভারতীয়ের তুলনায় বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কৃষক এবং শ্রমিকের মঙ্গল চিন্তাই যে তাঁর প্রেরণার মূল উৎস ছিল, একথা তিনি নিজেই বলেছেন।[৮৯] শ্রমিক সমস্যার যে বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন তা অন্য একটা কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, অফিস-কর্মী ইত্যাদি বিকাশমান পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ প্রথম তাঁর লেখাতেইদেখা গিয়েছিল। এঁরা উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু আবার নূতন সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গেও একাত্ম হতে পারেননি। সম্ভবত এটা কোনো আপতিক ব্যাপার নয়। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গিয়েছিল বাংলা প্রদেশে। কেননা এই প্রদেশে শিক্ষিত অফিসকর্মী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল, অথচ দেশীয় পুঁজিপতির সংখ্যা ছিল নগণ্য।

ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে হবে, এটাই ছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সরল প্রতিজ্ঞাটিই যথেষ্ট নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়, তা হল, কে এই বিকাশ ঘটাবে, এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণই বা থাকবে কার? ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে শ্রী মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছিলেন যে ঐদেশে শিল্পায়ণের লভের সবটুকুই পুঁজিপতিদের পকেটে গেছে। এবং আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে যা ঘটেছে তা হল:

"শ্রমজীবী মানুষ যারা বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বড় বড় ভূম্যাধিকারীর

স্বারা নিপীড়িত হয়েছে, এখন তারা পুঁজিপতি মালিকদের হাতেও একই রকম দুর্ভোগ ভুগছে……যদিও একদিক থেকে দেখলে (রাজনৈতিক ভাবে) তারা এখন স্বাধীন, কিন্তু অন্যদিকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, পুঁজিপতি মালিকের উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল।"

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এর বিখ্যাত গ্রন্থ "স্টেট অব ওয়ার্কিং ক্লাসেস ইন ইংল্যাণ্ড ইন ১৮৪৪" থেকে তথ্য আহরণ করে মুখোপাধ্যায় তখনকার ব্রিটিশ শ্রমিকদের নিদারুণ দারিদ্র ও দুরবস্থার করুণ চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট —আধুনিক কালে আইন প্রণয়ন করেও ঐ অবস্থার প্রতিকার করা যায়নি, কেননা আসল পাপ "অনেক গভীরে"। কাজেই ভারতবর্ষেও যদি পশ্চিমী ধরণের শিল্প ধারার প্রচলন হয়, তাহলে এর ফলে অবধারিতভাবে "দেশী অথবা বিদেশী সংখ্যালঘু পুঁজিপতিশ্রেণীর সৃষ্টি হবে, যাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব বৃদ্ধিতে জনগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে না।"[৫০] অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষ পরিণত হবে "আত্মসম্ভ্রম-খোয়ানো, মালিকদের-স্বারা-তাড়িত, অসহায় মানুষ-যন্ত্রে, কাঠ-কাটা আর জল তোলা হবে তাদের কাজ।"[৫১] এই অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে একদিন একত্রিত হতে হবে, বিশলাকারের শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং তারপর "স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে পুঁজিপতির বিরুদ্ধে শ্রম-সংগ্রাম" শুরু করতে হবে। ফলত, তারা "শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে একটি স্থায়ী বিঘ্ন হবে" এবং বাস্তবিকপক্ষে "সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা" হয়ে থাকবে।

মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের এই দ্বিবিধ পরিণতি সমাজকে একটা বড় ধরণের উভয়-সংকটের মধ্যে নিয়ে যাবে। শ্রমিক সংগঠন সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক, কিন্তু সংগঠনের অভাব আরো মারাত্মক —"কেননা, সংগঠিত পুঁজিপতি শ্রেণীর বাধাহীন বিকাশ ঘটতে থাকলে শেষ পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে ক্রীতদাস প্রথা দেখা দেবে।"[৫২] এই অবস্থায় সবারই কর্তব্য সুস্থির হয়ে বিচার-বিবেচনা করে এটা উপলব্ধি করা যে "সব ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের গোড়াতেই গলদ রয়েছে।" সেজন্য দেখতে হবে "ভালো-মন্দ মিশিয়ে পুরোটাকেই" আত্মস্থ করা ছাড়া ভারতের শিল্পসমস্যার সমাধানের অন্য কোনো পথ আছে কিনা।

মুখোপাধ্যায় এই সমস্যার যে সমাধানের কথা ভেবেছিলেন, তার দুটো দিক— নৈতিক এবং বৈষয়িক। সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে "প্রতিযোগিতার দর্শনের স্থান নেবে উচ্চতর নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো নীতি।" অর্থনৈতিক সমস্যাকে দেখতে হবে "সমষ্টিবদ্ধ নৈতিক জীবনযাত্রার বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গ হিসাবে।" এই নতুন সমাজ সংগঠনে বৈষয়িক উন্নতি হলেও, তার স্থান হবে গৌণ। সবাইকেই উপলব্ধি করতে হবে যে

"সমস্ত রকম প্রগতিরই চরিত্র হল, তা প্রাথমিকভাবে অ-বৈষয়িক অর্থাৎ অপার্থিব।"[৫৩] পার্থিব স্তরে আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ণের কুফল এড়ানো যাবে আধুনিক শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিকে যথা সম্ভব বাতিল করতে এবং তার বদলে প্রধানত শ্রমিক-কারিগর-কৃষকদের শিল্প-পরিবার-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারলে। এইসব পারিবারিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি থাকবে বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠন যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, খনি, রেলওয়ে, রাসায়নিক এবং ধাতু শিল্প ইত্যাদি সহায়ক হিসেবে, যেগুলির জন্য বহুমূল্য যন্ত্রসম্ভার এবং প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। "সার্থকভাবে পরিচালিত হ'লে এই সব বড় উদ্যোগ ক্ষতিকারক তো হবেই না বরং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হবে।" মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সংগঠন এক স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মান সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম দেবে, এবং দৈনন্দিন কাজই হবে তাদের সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। এইভাবে তাঁর প্রস্তাবিত উৎপাদন ব্যবস্থায় নৈতিক এবং অর্থনৈতিক, উভয়বিধ উপাদানকে একত্রিত করে মুখোপাধ্যায় অতদিন আগেই—১৯০০ সালে—প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিল্প-ভিত্তিক সমাজের আদর্শ গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন:

"আমার বক্তব্য, জাতীয় অগ্রগতিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরতে হবে উচ্চতর কৃষ্টির আদর্শ এবং তা প্রসারিত করতে হবে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, সামরিক, বাণিজ্যিক মজুরি ও শ্রম ইত্যাদি সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রে। সমাজ-সংগঠনে প্রতিটি শ্রেণীর থাকবে বিশিষ্ট, স্বীকৃত এবং স্বাধীন ভূমিকা। কিন্তু সকলেই পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সমন্বিত হয়ে সমগ্রের উপকারার্থে কাজ করে যাবে, যাতে প্রতিটি উচ্চগামী সমগ্র শ্রেণীর এবং সমগ্র সমাজের আধ্যাত্মিক বিকাশ সুনিশ্চিত হয়।"

টীকা

১। ভারতীয় কারখানায় শ্রমিককে দীর্ঘ সময় কাজ করানো হ'ত বলে রক্ষণশীল "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" ১৯০৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালিকদের নিন্দা করে লিখেছিল—তারা "তাদের অনন্ত মুনাফার ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য দুর্ভাগা শ্রমিকদের রক্ত শুষে নিচ্ছে" (আহমেদ মুখতার-এর "ফ্যাকটরি লেবার ইন ইণ্ডিয়া" তে উদ্ধৃত)।

২। দাস: ফ্যাক্টরি লেব্যর ইন ইণ্ডিয়া; পৃষ্ঠা ১৪৫-৪৬; ১৫২-৩। কাজিনস্কির "এ শর্ট হিস্ট্রি অব লেবার কণ্ডিসন্স্ ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড দি এম্পায়ার" থেকে একটি সারনি উদ্ধৃত করে ওয়াদিয়া এবং মার্চেন্ট দেখিয়েছেন ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ভারতের কারখানাগুলিতে কীভাবে প্রকৃত বেতনের ক্রমাবনতি ঘটেছিল। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আর্থিক বেতন বৃদ্ধির একটা সুসঙ্গত প্রবণতা লক্ষ করা যায়, কিন্তু প্রকৃত বেতনে দেখা যায় পড়তির লক্ষণ।"

৩। দাস ঃ ফ্যাক্টরি লেজিসলেশন ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৬। সরকার কিন্তু সাফাই গেয়ে বলেছিল ঃ "মিল মালিকদের অত্যাচার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ শ্রমিকরা বা অন্য কেউ কখনও সরকারের কাছে করেনি।"

৪। মজার ব্যাপার হ'ল, যখন জাতীয়তাবাদী নেতারা বাগিচা শ্রমিক বা কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বলেছেন, তখন এই যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। এবং তার জন্য তাঁরা কোনো দ্বিধাবোধও করেননি। হঠাতই তাঁরা মূকদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

৫। ১৮৭৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি "দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" লিখেছিল ঃ "শ্রমিক এবং মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি চমৎকার। শ্রমিকদের কখনোই ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটানো হয় না। তাদের বেতনও নির্দিষ্ট। এবং তা এত সুন্দরভাবে এবং সময়মত মিটিয়ে দেওয়া হয় যে তার জন্য বেশ কিছু ইংরেজ ও দেশীয় কোম্পানি ধন্যবাদার্হ। দুটি একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশির ভাগ মিলই এমন জায়গায় তৈরি হয়েছে যেখানে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত সব ব্যবস্থাই বর্তমান। তাছাড়া, কারখানার শ্রমিকদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেবার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও আছে।"

৬। চিঠিটিতে এই কথাগুলি ছিল—"কারখানায় শিশু শ্রমিকরা দেখতে কিংবা তাদের স্বাস্থ্য আগের থেকে এখন অনেক ভালো। তারা অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত হলে এত ভালো থাকত না—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।...তারা ভালো খেতে পায়, জামা-কাপড়ও ভালো পায়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের থেকে অনেক বেশি আনন্দে থাকে।"

৭। একই ভাবে, ১৮৭৯-র ৮ই জানুয়ারি "আকবর ই আম" লিখেছিল. ঃ "যদি শ্রমিকদের বেশি খাটানোও হ'ত বলার কিছু ছিল না, কারণ তাতে দেশেরই লাভ হয়েছে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের শুধু বেশি খাটতে হয় তা নয়. তাদের প্রাণও দিতে হয়। ভারতের পক্ষে শিল্পায়নও যুদ্ধের থেকে কম জরুরি নয়, কেননা এর উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ মুক্তি নির্ভর করছে।"

৮। "রাস্ত গোফতার" আইনটিকে সৈন্য বাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করার দাবি জানিয়েছিল।

৯। মারহাট্টা কিছু অত্যন্ত অকালপক্ক সুলভ মন্তব্য করেছিলঃ "আগে জনসাধারনকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা না করে রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। অজ্ঞ জনসাধারণ জানুক, ম্যানচেস্টার কতটা সক্রিয়, তারা জানুক এবং বুঝুক সরকার কীভাবে চলে, তারা জানুক, আমরা কী এবং আমাদের কী হওয়া উচিত, তাহলেই আমাদের সব প্রচেষ্টা সফল হবে।"

১০। ১৮৯১-র ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইন যখন রচিত হয় তখন—ঐ বছরেই ২৬শে মার্চ—"নেটিভ ওপিনিয়ন"ও একই আবেদন রেখেছিল।

১১। দ্রঃ—রিপোর্ট অব দি বোম্বাই ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন, ১৮৮৫, পৃঃ ১০-১৫। যে সব কারখানায় বছরে ছ মাসের কম কাজ হত সেখানে নারী এবং শিশুদের দৈনিক দু'ঘণ্টার বিরতিসহ ১৬ ঘণ্টা কাজের সুপারিশও কমিশন করেছিল। এটা অবশ্যই কমিশনের মানবহিতৈষিণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়। বোম্বাইয়ের শ্রমিকপন্থী কিন্তু জাতীয়তা-বিরোধী সাপ্তাহিক "দীন-বন্ধু" ১৮৮৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি, কমিশনের সুপারিশকে ধিক্কার জানিয়ে লিখেছিল ঃ যে রিপোর্টটি "সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কমিশনাররা আসলে মিল মালিকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছেন ..। কাজেই সরকার যদি কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করেন তাহলে মিল-শ্রমিকদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে।"

১২। দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে প্রতিবেদনে (বোম্বাই) ১৮৮০-র ৯ই অক্টোবরের পরের তথ্য প্রাপ্য। সংবাদপত্রটির প্রথম সংখ্যা সম্ভবত প্রকাশিত হয় ১৮৮০-র ৩রা অক্টোবরে। আর, কে দাস ভুল করে সালটি ১৮৯০ লিখেছেন এবং অন্যান্য লেখকরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

১৩। বোম্বাই-এ কারখানা আইনের ব্যবহার সম্পর্কিত ১৮৯৫ সালের রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য পাওয়া যায় :···"বোম্বাইয়ের মিল শ্রমিকদের কোনো সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেই। যদিও পূর্ববর্তী ফ্যাক্টরি কমিশনের সদস্য শ্রীএন. এম. লোখণ্ডে নিজেকে বোম্বাই মিল শ্রমিক সমিতির সভাপতি বলে দাবি করেছেন, কিন্তু ঐ ধরণের কোনো সংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের অস্তিত্ব নেই। তার না আছে সদস্য তালিকা, এবং তহবিল, না নিয়ম কানুন। আমি জানতে পেরেছি যে, আসলে তিনি যা করেন তা হ'ল, কোনো শ্রমিক তার কাছে গেলে তাকে বিনে পয়সায়উপদেশ দিয়ে থাকেন।" ১৮৯২ সালের কারখানা পরিদর্শকের রিপোর্টে আছে : উক্ত সমিতির "শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ককে কোনোভাবেই প্রভাবিত করার—এমনকি সাময়িকভাবেও—ক্ষমতা নেই।"

১৪। এই খসড়া বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল নারী শ্রমিকের কাজের সময় দিনে ১১ ঘণ্টায় সীমিত রাখতে হবে আর নারী ও শিশুদের মাসে চারদিন ছুটি দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

১৫। মালিকদের খুশি হবার মত কারণ অবশ্যই ছিল। কমিশন তাদের স্বার্থ খুব ভালো-ভাবেই মনে রেখেছিলেন। এবং সেজন্য শুধু সেইসব সুপারিশই করা হয়েছিল যেগুলি মালিকপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য, অথবা যেগুলি তাঁরা ইতিমধ্যেই কার্যে রূপায়িত করে চলেছেন।

১৬। কমিশনের অন্যতম সদস্য এবং বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসাবে লোখণ্ডে. আগে বহুবার পেশ-করা দাবিমত, নারী, পুরুষ ও শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় যথাক্রমে ১০ ১/২. ৯এবং ৫ ১/২ঘণ্টায় সীমিত করার এবং শিশুদের চাকরিতে নিযুক্তির সর্বনিম্ন বয়স বাড়িয়ে ৯ বছর করার কথা বলেন।

১৭। কারখানায় ইলেকট্রিক আলো প্রচলিত হবার ফলে কাজের সময় ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সেজন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় ডিউটির দাবি আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৮। ডানডী আন্দোলন অবশ্যই ল্যাংকাশায়ারের আন্দোলনের মতন অতটা ফলপ্রসূ হয়নি। তার কারণ, ভারতীয় চটশিল্পও ইংরেজ পুঁজিপতিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত।

১৯। "টাইমস" পত্রিকার সমর্থন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, "টাইমস" আগে ভারতীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল।

২০। ১৮৯০ সালে আইনের প্রস্তাব এবং ১৮৯১ সালে আইনটি সম্পর্কে সংবাদপত্রে খুব একটা মন্তব্য দেখা যায়নি। তার কারণ, সংবাদপত্রগুলি তখন "এজ অব কনসেন্ট" বিল নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

২১। ১৮৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর 'হিন্দু' আরও বেশি আশাব্যঞ্জক কথা লিখেছিল। শ্রমিকদের অবস্থা বেশ ভালো এবং তারা বেশ আনন্দেই থাকে, একথা জানিয়ে সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন—তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন. "কীভাবে তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছে, তাদের প্রতি কত যত্ন নেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল।"

২২। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সরকারি মুখপাত্ররা যখন চাহিদার সঙ্গে আয়ের অপেক্ষিকতার প্রশ্ন তুলে দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতে দারিদ্র্য বলে কিছু নেই, তখন এই জাতীয়তাবাদী নেতারাই তাদের ঐ যুক্তিকে "অবৈজ্ঞানিক, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন" বলে খারিজ করে দিয়েছিলেন।

২৩। কয়েকটি সংবাদপত্র এই প্রস্তাবটিরও সমালোচনা করেছিল। তবে জুন,১৮৯০-এর আগে প্রসঙ্গত, 'হিন্দুস্তান' ১৮৮৯-এর ২২শে মে লিখেছিল, এই ব্যবস্থার ফলে মিল মালিকেরা

নাকি তাঁদের লাভের সাতভাগের এক ভাগ থেকে বঞ্চিত হন। মজার কথা হ'ল, তখন হিন্দুস্তানের সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং মদন মোহন মালব্য এবং মালিক ছিলেন সে যুগের কংগ্রেস মঞ্চের আর একজন জাঁদরেল বক্তা রাজা রামপাল সিংহ।

২৪। কাগজটির সপক্ষে এটুকু বলা যায় যে এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির কারণ ঐ সম্পাদকীয়তেই স্পষ্ট ক'রে ফুটে উঠেছিল: "শ্রমিকদের স্বার্থের ব্যাপারটা ছাড়াও·· এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত যে, সরকার কি এদেশের মালিকদের স্বার্থটাও দেখতে বাধ্য নন?—এই ধরনের সব আইনের ফলে তাদের উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে।" স্পষ্টত, 'ইন্দু প্রকাশের' পক্ষে নবোদিত শিল্প পুঁজিবাদের বিরোধিতা করার চাইতে অবক্ষয়ী হিন্দু গোঁড়ামির বিরোধিতা করাই সহজতর ছিল।

২৫। আসলে ব্যানার্জী ডান্ডির ফলে আক্রান্ত বাংলার বিদেশী মালিকানাধীন চটশিল্পকেও রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

২৬। ইংলণ্ডের জনহিতৈষীরা দাবি করেছিলেন তাঁরা এই ব্যাপারে মানবিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কে, এল, নুলকর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ফ্যাক্টরি বিলের উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের বিদ্রূপ করে বলেন—"তাঁরা হয়ত বিশ্বাস করেন, মাত্র কয়েক বছর আগেই সুতীজাত পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে এবং তার ফলে ঘাটতি পূরনের জন্য সরকারকে লবণ কর বসাতে বাধ্য করে তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে তাঁরা ভারতের দরিদ্র মানুষের স্বার্থকে কতটা নিস্পৃহ-ভাবে রক্ষা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ। সেজন্যই তাঁরা এই ধরনের নিঃস্বার্থ বন্ধুর চেয়ে বর্বরদেরও স্বাগত জানাতে রাজি, যাতে অন্তত সস্তায় লবন বা জামা-কাপড় প্যাওয়া যাবে।"

২৭। উদাহরণ: ১৮৮৪ সালে মারহাট্টার সম্পাদক ছিলেন র‍্যাডিক্যাল সমাজ-চিন্তক জি, সি, আগরকর। ১৮৮৭ সালে মালিক ও সম্পাদক দুইই পরিবর্তিত হয়। অবশ্য ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসেও আগরকর এই কাগজে লিখেছেন। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে আর একবার সম্পাদক পরিবর্তন হয়।

২৮। ১৯০১ সালের ভারতীয় খনি আইনে ভারত সরকার কর্তৃক একজন চীফ ইনস্পেক্টর এবং স্থানীয় সরকারগুলির দ্বারা ইনস্পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। চীফ ইনস্পেক্টরের বিবেচনায় কাজটা উপযুক্ত না হলে বা স্বাস্থ্য অথবা নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হলে নারী ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল। উপযুক্ত বায়ু চলাচল ও অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইনসপেক্টরদের। ১২ বছরের কম বয়সীদের শিশু বলে গণ্য করার কথাও বলা হয়েছিল। তাছাড়া, ম্যানেজারদের যোগ্যতা ও কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে নিয়মাবলী রচনা করার কথাও এই আইনে বলা হয়েছিল।

২৯। ১৯০২ সালের ২০শে এপ্রিল "দা বেঙ্গলী" অশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে এই খনি আইনের ফলে ভারতীয় শ্রমিকদের যে বিশেষ গুণের প্রশংসা গ্রান্ডির মত বহু বিদেশী করেছেন সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।

৩০। এর আগে ১৮৯৪ সালের ৪ঠা জুলাই "সহচর" একটি মজার তত্ত্ব উপস্থিত করে। প্রস্তাবিত খনি আইনের নাকি উদ্দেশ্যই ছিল কয়লার দাম বাড়িয়ে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করা। কাগজটি তিক্ততার সঙ্গে মন্তব্য করেছিল: "যে দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো হচ্ছে আসলে তার সবটাই 'জুয়াচুরি'।"

৩১। সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মিঃ জর্জ কটন বার্ষিক সভায় স্পষ্টাস্পষ্টিই বলেছিলেন—"কমিশনের সুপারিশ ১৮৮৪ সালের আইনে প্রতিফলিত এবং এই সভাকক্ষে বহুবার উত্থাপিত বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি এক। এটা নিশ্চয়ই সন্তোষজনক।··· আমার মনে হয়, মিল মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের এই আইনের (অর্থাৎ ১৮৯১ সালের কারখানা আইনের) বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। বরং সরকার যে ব্যবস্থা

নিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে।" জে এল, ম্যাকে-ও বলেছিলেন ঃ "আমার মনে হয়, সরকার অত্যন্ত সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গেই আমাদের স্বার্থরক্ষা করেছেন।"

৩২। হিন্দিতে "মুদাই শুস্ত আউর গুয়া চুস্ত" বলতে এটাই আরো ভালো বোঝায়।

৩৩। ডি,জি, কার্ভে তাঁর "রাণাডে দ্য প্রফেট অব লিবারেটেড ইন্ডিয়া"-তে বলেছেন, রাণাডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন. "শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাতে কষ্টের পরিমান সবচেয়ে কম হয়।" তবে, রাণাডের লেখা ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীতে কিংবা অন্য কোথাও শ্রম ও শিল্প বিষয়ে এ-ধরনের কোনো উল্লেখ পাইনি। দুর্ভাগ্যবশত কার্ভেও কোনো সূত্রের কথা বলেননি। অন্যদিকে. ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন ঃ "তাঁর লেখাতে শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সমস্যা বা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে মূলধন কেন্দ্রীভবনের কুফল কিংবা শ্রমিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা অথবা মালিকদের শোষণের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের কোনো উল্লেখ খুঁজলে পাওয়া যাবে না" ("দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অব রাণাডেস ইকনমিক্স", ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ইকনমিক্স, জানুঃ '৪২)

৩৪। বরং তিনি ১৯১১ সালে সুতীকলের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের কাজের সময় কমিয়ে ১২ ঘণ্টা করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলেন।

৩৫। ১৮৮৭ সালে ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর জেমস জোনস একটি প্রতিবেদনে বলেছিলেন, বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পের তখন রমরমা অবস্থা এবং কয়েকটি মিল মাত্র চার বছরের মধ্যেই তাঁদের মূলধন উশুল করে নিয়েছে।

১৯০৫ ও ৬ সালের হিসেবে দেখা যায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের গড় নীট মুনাফা হয়েছিল ২২৭ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে ঐ দুবছরে বেতন বাবদ খরচ হয়েছিল মাত্র ২০৯ লক্ষ টাকা।

৩৬। আসামে মূলত চুক্তিবদ্ধ শ্রমের প্রথা ছিল। শ্রমিকেরা চুক্তিমত কয়েক বছরের জন্য যেত। কোনো শ্রমিক চুক্তি ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি পেতে হ'ত। সরকারি এই ব্যবস্থার ফলে বাগিচা মালিকরা উপকৃত হয়েছিল। বস্তুত, ভারতের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে চুক্তির ব্যবস্থার ফল হয়েছিল এই যে শ্রমিকেরা একবার বাগানে উপস্থিত হওয়ার পর পুরোপুরি মালিকের হাতের মুঠোয় চলে যেত। ১৯০১ সালে "আসাম লেবর এ্যান্ড এমিগ্রেসন বিল" সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৎকালীন আইন বিষয়ক সদস্য টি. র‍্যালে শ্রমিকদের এই অবস্থা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন—"এই বিলে যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হয়েছে রাখ-ঢাক না করে বললে সেটি এমন একটি লেনদেন যাতে একজন কী করছে বুঝতে পারার আগেই আসামে থাকার ব্যাপারে চার বছরের জন্য চুক্তি প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা পড়ছে। চুক্তি পালন করতে অস্বীকার করলে গ্রেফতার হওয়ার ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবার ভয় আছে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আইনে এ-ধরণের শর্ত থাকে না। আমরা একে ব্রিটিশ ভারতের আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছি আসামের বাগিচা মালিকদের প্ররোচনায় এবং তাদের স্বার্থে।...সত্য কথা হ'ল. এই আইনের মূল উদ্দেশ্য বাগিচা মালিকদের স্বার্থরক্ষা, কুলীদের স্বার্থ দেখা নয়।"

৩৭। এমন কি নিয়োগকেন্দ্রেই চুক্তি মানতে অস্বীকার করলে ১ মাস পর্যন্ত জেল দেওয়া যেত ; আর পথে কিংবা বাগান থেকে পালালে জেলবাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৩ মাস। কাউকে কাজ ছেড়ে দেওয়ার উস্কানি দিলে অথবা পালিয়ে যাওয়া কুলীকে আশ্রয় দিলে শাস্তির বিধান ছিল ১ মাসের জেল অথবা ২০০ টাকা জরিমানা কিংবা উভয়ই।

৩৮। ১৮৮১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর "বেঙ্গলী" লিখেছিল ভারতের স্বশাসনের অধিকার থাকলে এ-ধরণের আইন পাস হ'ত না।

৩৯। বিপিনচন্দ্র পাল দ্বিতীয় প্রচেষ্টার যে বিবরণ দিয়েছেন তা ভুল, সম্ভবত বার্ধক্যজনিত

স্মৃতিভ্রংশের ফল। সঠিক বিবরণের জন্য দ্রঃ—Rep. INC for 1988, পৃঃ ১৫৮-৬২।

৪০। প্রস্তাবটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর, কে, সরকার ঘোষণা করেছিলেন—"এর থেকে বর্বর কোনো ব্যবস্থা এদেশের অন্য কোনো আইনে নাই।"

৪১। বিশেষত ১৯৪৬ সালের কাগজ দ্রঃ। তখন সব সংবাদপত্রই কুলি আইনের বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ চালিয়েছিল। সঞ্জীবনী-তে এর বিরুদ্ধে তথ্য-সমৃদ্ধ কয়েকটি প্রবন্ধ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

৪২। ১৮৯৬ সালে জে. সি ঘোষ কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জানান—"আমি দেখেছি বেচারা নারী-পুরুষ ব্রহ্মপুত্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর দুর্ভাগ্য এড়াতে।" একই অধিবেশনে আর, কে, সরকার বর্ণনা দিয়েছিলেন—"অজ্ঞ, অসাবধান মানুষের উপর সৈন্যবাহিনীকে রীতিমত লেলিয়ে দেওয়া হয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ঐসব সৈন্যরা বাড়িতে ঢুকে পড়লে যতটা পিণ্ডারি ত্রাসের সঞ্চার হয় জলদস্যুদের আক্রমণেও ততটা হ'ত না।"

৪৩। কে, সি. ঘোষ ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিদের সামনে প্রচুর সংখ্যক নারী ও পুরুষ শ্রমিককে একসঙ্গে চাবুক মারায় ঘটনার বর্ণনা দেন হয়েছিল। চিফ কমিশনারের অসম শ্রমিক প্রবসন সংক্রান্ত ১৮৮৭ সালের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত ক'রে তিনি দেখান কীভাবে নারী শ্রমিকদের "ম্যানেজারের বাংলোর সামনে খুঁটিতে বেঁধে কোমরেয় উপরে কাপড় তুলে দিয়ে নগ্ন নিতম্বে ঘোড়ার পাদানির মোটা চামড়ার দড়ি দিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল।"

৪৪। "স্বাধীন শ্রমিকের তুলনায় আসামের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মধ্যে মৃত্যুহার ভয়ংকর রকম বেশি" (কার্জন, বক্তৃতাবলী, II. পৃঃ ২৪৩)।

৪৫। ১৮৯৩ সালের ১০ই মার্চ ভারত সভার স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল ঃ "কুলিদের যদি এমন বাগানে কাজ করতে হয় যার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর কিংবা যা তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে, তাহলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাদের যতটা ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন দেওয়া উচিত।"

৪৬। বিশেষ করে ১৯০১ সালের এমিগ্রেসন এ্যাক্টের ৩য় অনুঃ দ্রঃ। কোনো শ্রম-বিভাগে বা তার কোনো অংশে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করার অধিকার স্থানীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। শাস্তি-সম্পর্কিত ধারাও মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল।

৪৭। এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ১৯০৩ সালে আসামের চা বাগানগুলিতে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল।

৪৮। কাউন্সিলে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন যথাক্রমে প্রথম তিন বছর ৫ টাকা ও ৪ টাকা এবং চতুর্থ বছরে ৬ টাকা ও ৫ টাকা করার জন্য জে, বাকিংহাম সংশোধনী প্রস্তাব আনলে সব ভারতীয় সদস্য তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

৪৯। রমেশচন্দ্র দত্ত আর একটি উদাহরণের সাহায্যে শ্রমিকদের প্রতি সরকারের মনোভাব এবং বাগান মালিকদের প্রতি মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে যখন চা-মালিকেরা দাবি করে চা রপ্তানির উপর সেস্ ধার্য করে তার থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে ভারতে চা-পানের অভ্যাস বাড়াবার জন্য প্রচার চালাতে হবে, "ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে তার সুউচ্চ মর্যাদার আসন থেকে নেমে এসে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করল, এবং এইভাবে চা-মালিকদের চা বিক্রির দালালে পরিণত হল।"

৫০। জি, এস, আয়ার উল্লেখ করেন—"একমাত্র যে সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল সেটি হ'ল চেম্বারে অব কমার্স। ঐসব ব্যক্তিরা ছিলেন এই সংস্থার প্রতিনিধি।"

৫১। আমরা যতদূর জানি এই ঘটনাটি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকাররা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা এই ধর্মঘটের উল্লেখ পর্যন্ত

করেন না। সাধারণত এর আগে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ডদের ধর্মঘটের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় কর্মীরা যে ঐ ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেটা বলা যায় না। আসলে, ১৮৯৯ সালের আগে বোম্বাই এবং কলকাতার কাপড় কলে বহু ধর্মঘট হয়েছিল, তবে সেগুলি সবই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংগঠিত, খুব বেশি হলে আধা-সংগঠিত।

৫২। "কাইজার-ই হিন্দ" এটা লক্ষ করেছিল। ১৮৯৯ সালের ১৪ই মে এই কাগজে মন্তব্য করা হয়ঃ "সাফল্যলাভ করলে এটা অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে সংক্রামিত হবে।"

৫৩। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল "কাইজার-ই-হিন্দ", "মারহাট্টা", "কেশরী", "ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর" ও "ইন্দুপ্রকাশ" থেকে শুরু করে "সুবোধ পত্রিকা" এবং "মোরা বৃত্ত" পর্যন্ত সব পত্রিকাই ছিল সমর্থকদের দলে।

৫৪। "অমৃতবাজার পত্রিকা" সমস্যাটিকে সূত্রাকারে উপস্থিত করে—"এইসব ধর্মঘট আসলে নিপীড়িতদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।..... কোথাও কোনো ধর্মঘট হলেই বুঝতে হবে সত্যিকারের ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে, যার জন্য তারা অন্নদাতার বিরুদ্ধাচরণ করার ঝুঁকি নিয়েছে।"

৫৫। ১৮৯৯ সালের ১৪ই মে "দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর" সমঝোতার কথা বলেছিলঃ "ভালো হ'ক মন্দ হ'ক, আমাদের এখন শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে। এটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এটা ঠিক যে শ্রমিকদের সংগঠিত করার অর্থই হচ্ছে, তাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সেজন্য মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধিকে আটকানোর একমাত্র পথ হল, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলেই সমঝোতার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।"

৫৬। ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে "বোম্বাই সমাচার"-এর একটি সংবাদে বলা হয় যে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ফিরোজশাহ মেহতার চেম্বারে মিলিত হয়ে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

৫৭। আমেদাবাদের জনসভার সংবাদ দিয়ে "জগদাদর্শ" লিখেছিল যে একজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক "ধন্দ মন্মদ"-এর সিগন্যালারদের দুমাসের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

৫৮। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি স্পষ্টতই শ্রমিক-দরদী মনোভাব গ্রহণ করেন। এর আগে "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি ধারাবাহিকভাবে মালিকপক্ষের সমর্থনে এবং শ্রমিকদের বিপক্ষে লিখেছেন। ১৯০০ সালে তিন ঐ দায়িত্বভার ত্যাগ করেন।

৫৯। এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিলঃ "কোথাও কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটলে শুধু শ্রমিকরাই সেটা ধরতে পারে।"

৬০। "ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা" নামে প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি ঘোষণা করেন—"আমি ভবিষ্যৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর কল্যাণ সম্পর্কে ততটা উদ্বিগ্ন নই, যতটা উদ্বিগ্ন ওদের প্রভুত্বাধীন বিশাল শ্রমজীবী মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে। এদের স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে অর্জিত যে-কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গরীমার সম্ভাবনার থেকে আমার কাছে সর্বদাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রায়ত ও কারিগরদের ভবিষ্যৎ।"

৬১। মুখার্জী এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে শোষণের ব্যাপারে ভারতীয় ও বিদেশী মূলধনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না, যদিও অন্যান্য দিক থেকে—যেমন সম্পদ পাচারের ব্যাপারে—বিদেশী মূলধন অনেক বেশি ক্ষতিকর।

৬২। লক্ষণীয় যে, তাঁর মনোভাবে প্রগাঢ় সহানুভূতির সঙ্গে মিশে ছিল, অবজ্ঞা যদি বা না-ও হয়, বেশ কিছুটা অনুকম্পা। তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে বি, সি, পাল-এর মানসিকতার তুলনা করা যেতে পারে। পাল আধুনিক শিল্প শ্রমিককে প্রগতিশীল ধ্যানধারণার বাহক হিসাবে দেখেছিলেন।

৬৩। মুখার্জী আর এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে যতদিন পশ্চিমী শিল্পব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ততদিন যারাই শ্রমিকদের সম্পর্কে ভাবেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে শ্রমিক সংগঠনকে সমর্থন জানানো।

৬৪। তাঁর মতে, ভারত এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে উপযুক্ত কারণ সাংস্কৃতিক বা দার্শনিক দিক থেকে এবং ধর্মে ভারত চিরকালই "স্বচ্ছলতর জীবনযাত্রার থেকে উচ্চমার্গের চিন্তাকে" বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

৯

কৃষি—১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষে কৃষি সমস্যাই ছিল সম্ভবত সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক কাজ ছিল কৃষি। প্রায় আশি শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কৃষি-নির্ভর। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ধাক্কায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা দেশে যে ক্রমবর্ধমান গ্রাম-নির্ভরতা দেখা দিয়েছিল তা ভারতের চিরন্তন কৃষি-নির্ভরতাকে আরো প্রকট করে তুলেছিল। রমেশচন্দ্র দত্তর ভাষায়: চাষ ভালো হলে সবারই শ্রীবৃদ্ধি ঘটত, আর খারাপ হলে মড়ক দেখা দিত।

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ; কৃষকরাও ছিলেন ভীষণ দরিদ্র। ব্যাপারটা নাটকীয়ভাবে স্পষ্ট হয় ১৮৭৬-৭৮-এর এবং তারপর ১৮৯৬ থেকে ১৯০১সালের মধ্যে কয়েকটি বড় বড় দুর্ভিক্ষে, যা ভারতকে গ্রাস করেছিল। ১৮৭৬-৭৮সালের দুর্ভিক্ষ ছিল "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ"। কৃষকদের অবস্থা যে কতটা খারাপ হয়েছিল তার আরো একটা প্রমাণ; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, যা পরিণতিতে বাংলাদেশের পাবনায় ১৮৭৩ সালের দাঙ্গার, দাক্ষিণাত্যের ১৮৭৫ সালের কৃষি দাঙ্গার, বোম্বাইয়ের১৮৭৮-৭৯ সালের কাড়কে অভ্যুত্থানের, এবং অসমের ১৮৯৪-এর কৃষি দাঙ্গার রূপ নিয়েছিল। এইসব ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং কৃষক বিক্ষোভের ফলেই কৃষকদের সমস্যাবলী ও দারিদ্রের ঘটনা এক সময় সরকার এবং জাতীয় নেতৃত্বের নজরে আসে।

কৃষি সমস্যার বিভিন্ন দিক, সরকারের কৃষিনীতি, এবং কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের মনোভাব নিচে আলোচিত হ'ল। এই আলোচনাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—১) ভূমিরাজস্ব অথবা কৃষক ও সরকার (২) কৃষক এবং ভূস্বামী (৩) কৃষক ও মহাজন (৪) পুঁজিবাদী কৃষি-ব্যবস্থা এবং (৫) কৃষি ও শিল্প।

১ ভূমি-রাজস্ব অথবা কৃষক ও সরকার

বহুবিধ ঐতিহাসিক কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে নানা প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ও ভূমি-রাজস্বের অদ্ভূত সংমিশ্রণ দেখা যেত। এখানে অবশ্য এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ নেই, শুধু সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই

সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং তা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণার বেশি কিছু হবে না। বাংলা প্রদেশে ও উত্তর মাদ্রাজে জমিদাররা ভূমির স্বত্ব ভোগ করতেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী। এর জন্য তাদের সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হারে ভূমি রাজস্ব দিতে হত। কিন্তু উত্তর ভারতে ভূমি স্বত্ব ভোগ করতেন জমিদার অথবা গ্রাম সমাজ, এবং ভূমি রাজস্ব কিছুকাল পর পর নূতন করে নির্ধারিত হত। অন্যদিকে, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে প্রচলিত ছিল রায়তওয়ারি প্রথা, ভূমির স্বত্ব ছিল মালিক কৃষকদের, যারা সরাসরি সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতেন। এদের প্রত্যেকের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নিয়মিতভাবে কিছুকাল পর পর নতুন সেটেলমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত হত। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের নীতিও বিভিন্ন সময়ে এবং অঞ্চলে একেক রকম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার বাইরের অঞ্চলগুলির জন্য মোটামুটি একই রকম নীতি গ্রহণ করা হয়। অন্তত কাগজপত্রে। যে সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল, জমিদার বা গ্রামসভার অধীন অঞ্চলে জমি নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে উদ্ভূত প্রকৃত অথবা অনুমিত খাজনার অর্ধেকটা সরকার ভূমিরাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করবে, আর রায়তওয়ারি অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ হবে অর্থনৈতিক খাজনা অথবা নীট সম্পদের অথবা নীট উৎপাদনের অর্ধেক[১]। এই নীতি অবশ্য বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত না। এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করে দেখা হত—যেমন বর্তমান রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গতি, জমির করভার বহন করার ক্ষমতা, স্থানীয় লোকের সাধারণ অবস্থা, জমির বিক্রয়-মূল্য ইত্যাদি। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর সময় বিশেষ করে—কিছুটা ভাসা ভাসা ভাবে হলেও—নীট উৎপাদনকে ভিত্তি করা হত এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ও বিবেচনা করে দেখা হত।[২]

আমাদের আলোচ্য সময়কালে ভূমি-রাজস্ব ছিল সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস। ১৮৮১-২ সালের মোট ৪৬·৮৬ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯·৬৭ কোটি টাকা। ১৯০১-০২ সালে এই পরিমাণ ছিল ৬০·৭৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৩·৯৯ কোটি টাকা। এই হিসাব থেকেই বোঝা যায় এই সময়ের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বেশ উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য সরকারি ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা হয়েছিল মূলত চাষের প্রসার ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে।[৩]

ভারতীয় কৃষির সমস্যাগুলির মধ্যে জাতীয় নেতাদের চোখে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি ও ভূমি-রাজস্বের হার। তাঁদের মতে, সরকারের রাজস্বনীতিই ছিল ভারতীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা এবং কৃষির পশ্চাদগামিতার বড় কারণ। সরকারি নীতি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের এই সমালোচনার সূত্রপাত করেন জাস্টিস রাণাডে, আলোচ্য সময়কালের প্রথম দিকে

পুনা সার্বজনিক সভার মুখপত্রে ভারতের কৃষি সমস্যা সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে। ১৮৭৯ সালে লিখিত "অ্যাগ্রারিয়ান প্রবলেম অ্যান্ড ইটস সল্যুসন" নামে প্রবন্ধে রানাডে অভিযোগ করেন যে, "বোম্বাই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপের ফলে দেশ ফতুর হয়ে গিয়েছে।" তিনি এই 'অপ্রিয় সত্যটির' প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত "ল্যান্ড ল রিফর্ম অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্কস" প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "বর্তমান রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত ভূমি-রাজস্বের চাপ যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন" অন্য কোনো রকম কৃষি সংস্কারের দ্বারা "কোনো স্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।" এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন: "আমাদের পার্থিব অগ্রগতির পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় দুটি—জমির উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার এবং ইচ্ছা মতন যখন তখন রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষমতা।"

সরকারের ভূমি-রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদে ক্রমে দেশের অন্য নেতারাও কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। ফলে ১৮৯১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হয়। কংগ্রেস এই অভিমত ব্যক্ত করে যে দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও অনাহারের নানা কারণের মধ্যে সর্বপ্রধান হল, "ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অদূরদর্শী নীতি, যার ফলে, এ-দেশের জনসংখ্যার নয়-দশমাংশের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় যে কৃষি তার কোনো রকম উন্নতি তো হচ্ছেই না বরং ধীরে ধীরে, নিশ্চিত রূপে, অবনতি ঘটছে।" এরপর ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সাল অবধি এমন একটি বছরও যায়নি যে বছর কংগ্রেসের অধিবেশনে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের কোনো না কোনো দিক নিয়ে প্রস্তাব পাস হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পর পর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায়, জাতীয়তাবাদীদের এই সমালোচনা রমেশচন্দ্র দত্তর নেতৃত্বে উত্তাল এক প্রচার-ঝঞ্ঝার রূপ নিয়েছিল। রমেশচন্দ্র একটির পর একটি প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় বিষয়টিকে তুলে ধরেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত তাঁর "লর্ড কার্জনের কাছে খোলা চিঠি" এবং দু'খণ্ড প্রকাশিত "ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ায়" এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল। এই সব রচনা ও ভাষণে রমেশচন্দ্র বার বার এই অভিযোগ এনেছেন যে ভূমিরাজস্ব নীতি কৃষি ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ভারতবাসীর দারিদ্র্য এবং, ফলত, দুর্ভিক্ষের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

রমেশচন্দ্র তাঁর এই সংগ্রামে জোরালো ও মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলেন জি.ভি. যোশির কাছ থেকে। 'জে' এই ছদ্মনামে যোশি ১৯০০-১ সালে 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ায়' একের পর এক পত্র লিখে বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব বিভাগকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। আরেকজন, গোকুলদাস কে পারেখও গুজরাটের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালান। এছাড়া, আরো অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রও কৃষির অবনতি এবং কৃষকের দারিদ্র্যের

মূল কারণ হিসাবে ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনকে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সব সমালোচনাই ছিল প্রধানত বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে। বাংলা প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। তাছাড়া, 'সাহারানপুর নীতির' প্রয়োগের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবের রাজস্বের পরিমাণ যা ছিল তাকেও মোটের উপর সন্তোষজনক বলেই মনে করা হ'ত।

যে সব বিষয়ে সমগ্র ভারতীয় নেতৃত্ব ঐকমত্য ও ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল ভূমি রাজস্ব তার অন্যতম। সরকারি নীতি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনা রমেশচন্দ্র দত্তর রচনা থেকে বেশ ভালোভাবেই জানা যায়। সেজন্য আমি এখানে বিষয়টির সামান্য কয়েকটি দিক নিয়েই শুধু আলোচনা করব এবং জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থিত করব। আমার আলোচনা মূলত কেন্দ্রীভূত হবে কীভাবে এই সমালোচনা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখানোর প্রচেষ্টায়।

২. কুফল

আমাদের আলোচ্য সময়ে, ভারতীয় নেতাদের মতানুসারে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল—রাজস্বের অত্যন্ত উচ্চ হার। প্রতিবার রাজস্ব নির্ধারণের সময় এই হার বাড়তে বাড়তে এক সময় কৃষকের পক্ষে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল, এবং ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা টাকা আদায়ের একটা ফন্দিতে পর্যবসিত হয়ে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। নেতাদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, বহুক্ষেত্রেই ধার্য ভূমি রাজস্ব ছিল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত জমির নীট খাজনার সর্বোচ্চ সীমা অর্থাৎ নীট উৎপাদনের অর্ধেকের তুলনায় অনেক বেশি। রাজস্বের পরিমান অনেক সময় এমন কি মোট উৎপাদনের কুড়ি শতাংশও ছাড়িয়ে গেছে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে কখনো কখনো রাজস্বের হার এত উচ্চ ছিল যে অর্থনৈতিক খাজনার প্রায় সবটাই গ্রাস করে ফেলত। অনুর্বর জমির এবং কম উৎপাদনশীল ও অলাভজনক জমির ক্ষেত্রে সরকারের দাবির ফলে এমনকি কৃষকের মজুরি এবং মূলধনের লাভেও টান পড়ত। বিচারপতি রাণাডে ১৮৭৯ সালে এটা দেখিয়েছিলেন—

"অপেক্ষাকৃত কম উর্বর সব জমিতেই উৎপন্ন ফসলের মূল্য থেকে রায়তের চাষের খরচ এবং বেঁচে থাকার খরচই কেবল ওঠে, কোনো মুনাফাই হয় না। রায়ত নিজের জমি নিজে চাষ করে বলেই বেঁচে থাকে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক খাজনা বলে কিছু থাকতে পারে না। চাষীকে সরকারের খাজনা মেটাতে হয় ধার করে অথবা জমির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অন্য উৎস থেকে উপার্জিত অর্থের দ্বারা।"

রাজস্বের এই উচ্চ হারের ফলে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ভূমিসম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার দাখিল হ'ত, এবং কৃষক-মালিক প্রকৃতপক্ষে পরিণত হ'ত রাষ্ট্রের অধীন ভূমিদাসে।

জাতীয়তাবাদীদের প্রায় সব লেখায় এবং ভাষণে এ-বিষয়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল। কোনো কোনো নেতা অত্যধিক রাজস্বের অন্যান্য আরো প্রমান দেখিয়েছিলেন—যেমন, অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে জোর করে রাজস্ব আদায় করা হ'ত, বকেয়া রাজস্বের জন্য বহু জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, বিপন্ন চাষীর জমি যে কোনো দামে বিক্রির এবং জমি বন্ধকির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইত্যাদি। এছাড়া, ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষ এবং অনাহার জনিত মৃত্যুও একই ইঙ্গিত বহন করত। জমির ক্রমবর্ধমাণ মূল্যবৃদ্ধি এবং দেশের সর্বত্র জমি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে রাজস্বের হার কম, কেননা তা নিম্ন রাজস্ব হার ফল—এই তত্ত্ব জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের মতে, এই ঘটনা বরং এটাই প্রমাণ করেছে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জমির জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ছিল, অথচ শিল্পক্ষেত্রে শ্রম নিয়োগের সুযোগ ছিলনা, ফলে সমগ্র দেশ ক্রমাগত গ্রামে পরিণত হচ্ছিল। মূলধন লগ্নি করার সুযোগ সীমিত হবার ফলেও জমির মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে—এই যুক্তিও তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল—কৃষকের ব্যক্তিগত উদ্যমে জমির উন্নয়ন সাধন করা হলে তার উপর রাজস্ব ধার্য হবে না ব'লে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাস্তবে তা রক্ষিত হয়নি। সেটেলমেণ্ট অফিসাররা উন্নয়নের উপর কর বসাতে দ্বিধা করেন নি। এটা করা হচ্ছিল নতুন করে জমির শ্রেণী বিন্যাস করার নামে অথবা চাষীদের নিজস্ব উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি উদ্যোগকে এক করে ফেলে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে জমির উন্নতির ফলে যে অতিরিক্ত আয় হত সেটাকে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণ থেকে উৎপন্ন 'অনুপার্জিত আয়' হিসাবে ধরে নিয়ে।

জাতীয় নেতৃত্ব ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার আরেকটি প্রধান ত্রুটির কথা বলেছিলেন। সরকারের চাহিদা ছিল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝেই রাজস্বের পুনর্বিন্যাসের ফলে তা নিয়মিত পরিবর্তিত হত। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নয়। রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটত এমন সব অস্পষ্ট, অনিশ্চিত, অবাস্তব বা খাপছাড়া কারণে যা চাষীর পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব হ'ত না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সেটেল্‌মেণ্টের সময় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিরা বাহাদুরি প্রদর্শনের প্রচুর সুযোগ পেত এবং আইনগত বা ব্যক্তিগত কোনো-রকম বাধা না-থাকায় যথেচ্ছ ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করত।

তৃতীয়ত, ভারতীয় নেতাদের মতে, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর। রাজস্ব আদায় করা হত অনমনীয় ভাবে। আদায়ের পদ্ধতি ও সময়

ছিল অসুবিধেজনক, দমনমূলক এবং ভারতীয় কৃষির পরিস্থিতির সঙ্গে অসমঞ্জস। ফসলহানি এবং দুর্ভিক্ষের কথা বিবেচনা করা হত না। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখেও একইভাবে রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি করা হ'ত। ফলে কৃষক যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, তখনও তাকে সরকারি রাজস্ব তহবিলে তার নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করতে বাধ্য হতে হ'ত।

কিছু ভারতীয় নেতা অঞ্চলভেদে এবং শ্রেণীভেদে ভূমি-রাজস্বের বোঝার তারতম্যের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, রাজস্বের বোঝা সমস্ত অঞ্চলে সমানভাবে পড়েনি। যেমন, বাংলায় এই বোঝার পরিমাণ ছিল তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া, সমাজের অন্য সব শ্রেণীর তুলনায় কৃষককে অনেক বেশি বোঝা বহন করতে হ'ত। কোনো কোনো নেতা এই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার এই ত্রুটিগুলির অধিকাংশেরই মূলে ছিল রিকার্ডিয় করতত্ত্বের প্রতি ভারত সরকারের আনুগত্য এবং এই বিশ্বাস যে সরকারই সব জমির প্রকৃত মালিক। এবং সেজন্য তাঁরা সরকারি রাজস্ব নীতির মূলে যে সব তাত্ত্বিক ধারণা ছিল সেগুলিকেও আক্রমণ করেছিলেন। এ-বিষয়ে "ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি", শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

নেতাদের মতে, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষি নিম্নরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল :

প্রথমত, উচ্চহারে রাজস্ব কৃষকদের সম্ভাব্য সঞ্চয়ের একটা মোটা অংশ শুষে নিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের পুঁজিকে নিঃশেষ করে দিয়ে জমিতে লগ্নি দুরূহ ক'রে তুলেছিল, যার ফলে সাধারণভাবে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উচ্চহারে রাজস্ব পল্লী অঞ্চলের মানুষদের নিঃস্ব করে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও পৌনঃপুনিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। ফসল ভালো হলেও কৃষকেরা ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারত না, ফলে অতি সহজেই দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর শিকার হ'ত। আসলে কৃষকের টিঁকে থাকার অক্ষমতাই খরাকে দুর্ভিক্ষের রূপ দিত। তাছাড়া, কম-ফসলী জমিতে উচ্চহারে রাজস্ব স্বাভাবিক সময়েই দুর্ভিক্ষের অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করত। তৃতীয়ত, অবিরত রাজস্ব পুনর্নির্ধারণ, স্বল্প কালের জন্য সেটেলমেণ্ট, রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, কৃষকের নিজের চেষ্টায় উন্নত করা জমির উপর নূতন করে রাজস্ব চাপানো—এ সবই ভূমিস্বত্বের স্থায়িত্বকে অনিশ্চিত ক'রে তুলেছিল। এর সঙ্গে উচ্চ হারে রাজস্ব কৃষকের মন থেকে সঞ্চয় করার অথবা জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে উদ্যোগী হওয়ার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্পৃহা নষ্ট করে দিয়েছিল। অনিশ্চিত ভূমিস্বত্ব এবং রাজস্ব বৃদ্ধি কৃষককে ভীত ক'রে তুলেছিল। সে বুঝতে পারত না, তার কী করা উচিত—প্রাণপণ

খাটা, না গা ছেড়ে দেওয়া—কেননা, সে জানত না তার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসল পাবে কিনা। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিই ভারতের কৃষককে অলস এবং বেহিসাবি করে তুলেছিল। এটাই ছিল গ্রামাঞ্চলের উদ্যমহীনতার আসল কারণ। এরই ফলে কৃষির কাজে দেখা দিয়েছিল গতিহীনতা, এমনকি অবক্ষয়, আর সারা দেশের পল্লী অঞ্চলে সর্বব্যাপী দারিদ্র্য। ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থার কারণ তার উদ্যমহীনতা, আলস্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীনতা ইত্যাদি এবং এ-সবই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এই তত্ত্বকে অনেক নেতাই বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাদের মতে, এ সবের অনেকটাই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অবদান। এমনিতে ভারতীয় কৃষক মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তাশীল। চতুর্থত, উচ্চ রাজস্ব হার, তার সঙ্গে অনিশ্চয়তা, জমিতে লগ্নি অনুৎ-সাহজনক, হয়ত বা অসম্ভব, করে তুলেছিল, যার জন্য কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী কৃষির প্রসার ঘটেনি।[8] পঞ্চমত, সরকার ভূমিরাজস্ব বাড়ানোর ফলে জমিদার ও অন্যান্য ভুস্বামীরা জমির খাজনা আরো বেশি মাত্রায় বাড়াবার অজুহাত পেয়েছে, এবং প্রকৃত চাষী আরো নিপীড়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রমেশচন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন, যেসব ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব ছিল খাজনার একটা নির্দিষ্ট অংশ সেসব ক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগের লোকেরা প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল জমিদারদেরও খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অথবা জোর করে খাজনা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য করতেন, যাতে সরকার বেশি করে কর বসাতে পারেন। ষষ্ঠত, একদিকে কৃষি উৎপাদনে বড় ধরনের উন্নতির অভাব, অন্যদিকে বিপুল পরিমান রাজস্ব ও তার সঙ্গে অনমনীয় ও কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থা, বিধ্বস্ত রায়তকে আরো দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। জমি বাঁচাতে হবে, অথচ রাজস্ব বিভাগের দাবি মেটানোর ক্ষমতা নেই, এই অবস্থায় অনিবার্যভাবে সে মহাজনের কবলে পড়েছে, যার থেকে কোনোদিনই আর মুক্ত হতে পারেনি। ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি ও অসুবিধেজনক পদ্ধতির ফলস্বরূপ বহু রায়ত তাড়াহুড়ি উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতেন এবং তার ফলে বাজারে যোগান চাহিদার তুলনায় বেড়ে গিয়ে কৃত্রিমভাবে দাম কমিয়ে দিত ও রায়ত ক্ষতিগ্রস্থ হ'ত।

কিছু নেতা আবার ভূমি রাজস্বের সমস্যার সঙ্গে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের বিষয়টিকেও যুক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁরা দেখালেন উচ্চহারে রাজস্বের কুফল আরো বেশি করে অনুভূত হয়েছে এই কারণে যে, এর একটা বড় অংশ দেশের বাইরে চ'লে যাচ্ছিল, তা এ দেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়নি।

৩. প্রতিকার

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনার এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট, ভারতীয় নেতৃত্ব বিশ্বাস করতেন যে, রাজস্ব ব্যবস্থার

উপযুক্ত সংস্কার না করা গেলে এ দেশের কৃষি সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কেননা, তাঁদের চোখে, ঐ রাজস্ব ব্যবস্থাই ছিল সব সমস্যার মূলে। বিচারপতি রাণাডে সংক্ষেপে এই কথাই বলেছিলেন—

'কৃষকেরা আসলে যা চান তা হল, রাজস্ব ব্যবস্থার মরণ-ফাঁস থেকে মুক্তি। এটা তাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে, এবং সমাজের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার সংগ্রামে তাদের নিরাশ করেছে। এই ফাঁসটা একটু আলগা হলেই, বৈষয়িক উন্নতির প্রেরণা ও শক্তি অর্গলমুক্ত হবে, তখন পুরনো ক্ষতও নিরাময় হবে।'

কিন্তু কীভাবে "এই মরণ ফাঁস" আলগা করা যাবে? এ প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী-দের উত্তর ছিল: উচ্চ হারে রাজস্ব ও যে কোনো সময়ে তা আরও বাড়ার আশঙ্কার ফলে মালিকানা হারানোর ভয় ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার কু-ফলের মূল কথা। সেজন্য প্রতিকারের প্রধান উপায় অবশ্যই হবে ভূমিস্বত্বকে সুরক্ষিত করা, যাতে স্বত্বভোগীরা নিজেদের প্রকৃত ভূ-স্বামী বলে ভাবতে পারেন এবং সত্য সত্যই জমির স্বাধীন মালিকে পরিণত হন। বিচারপতি রাণাডে বার বার বলেছেন, ভারতের আসল প্রয়োজন হচ্ছে "সম্পত্তির মালিকানার ম্যাজিক।" জি ভি যোশি ১৮৯০ সালে এই মতই স্পষ্ট করে লিখেছিলেন।—

"স্বার্থবোধ হচ্ছে এমন এক চালিকা-শক্তি যা পৃথিবী জুড়ে আত্মোন্নতির প্রেরণা জুগিয়েছে। এমনকি আমাদের এই 'পদ্মভোজীর দেশেও'। যতই আমরা বেদান্তের পরার্থবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হই না কেন, মানুষের প্রকৃতি এবং কাজের ধারা অন্যরকম হতে পারে না। 'কাউকে এক খণ্ড পাথুরে জমির সুরক্ষিত অধিকার দাও, দেখবে সে সেটাকে বাগান করে ফেলেছে'—এটা ফ্রান্সে বা নরওয়েতে যেমন সত্য ভারতেও তেমনি। স্ব-কর্ষিত জমিতে 'সুরক্ষিত অধিকার' এবং নিজের শ্রমের ফল পুরোপুরি ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়া স্বার্থ সম্পর্কে রায়তদের বর্তমান উদাসীনতা দূর করার অন্য কোনো উপায়ের কথা ভাবা যায় না।"

ভারতীয় নেতারা যে সব প্রতিকারের কথা বলতেন রমেশচন্দ্র দত্ত তা সুন্দর করে সংক্ষেপে লিখেছিলেন ১৯০০ সালে লেখা লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর পঞ্চম খোলা চিঠিতে। "লর্ড কার্জনের ভূমি প্রস্তাবের দ্বিতীয় জবাবে" তিনি একই বক্তব্য চুম্বকাকারে বলেন: "একটি কৃষিপ্রধান দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ভূমিরাজস্বের স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং কার্যোপযোগী সীমা বেঁধে দেবার উপর ... ।"

জাতীয় নেতারা যে সব ব্যবস্থা সুপারিশ করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে আলোচিত হল:

প্রথমত, ভূমির করভার কমিয়ে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে

যাতে চাষীর হাতে কিছু ন্যায্য উদ্বৃত্ত থেকে যায়—অর্থাৎ যাতে সে খেয়ে-প'রে বেঁচে থেকে ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করতে এবং জমির উন্নয়নের জন্য মূলধন লগ্নি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, নতুন সেটেলমেন্টের সময় রাজস্ব বৃদ্ধির সীমা এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে রায়ত নিশ্চিত হতে পারে যে তার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের সুফল সেই ভোগ করবে, কেননা তাহলেই সে নিজের জমির উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হবে। কোনো কোনো নেতার মতে, ভারতের পরিস্থিতিতে রাজস্বের হার হওয়া উচিত ছিল নীট উৎপাদনের অর্ধেক, অথবা খাজনার অর্ধেক, কিংবা, সঠিকভাবে এবং সততা সহকারে হিসেব করা হলে, প্রদেয় খাজনার অর্ধেক। যদিও সেটাও কৃষকের পক্ষে বেশ গুরুভার এবং ন্যায্য রাজস্বের থেকে বেশিই।

সরকারের ভূমিরাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানের উত্তেজনার মুখে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি অতিরিক্ত দাবিও করেছিলেন—তা হল, রাজস্বের সর্বোচ্চহার মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এর আগে ১৮৭৯ সালে রাণাডে দাক্ষিণাত্যের জন্য মোট উৎপাদনের এক ষষ্ঠাংশকে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার কথা বলেছিলেন। তবে, এই প্রসঙ্গে জি ভি. যোশির সুপারিশই ছিল মৌলিক। তিনি অলাভজনক জমির উপর একেবারেই রাজস্ব না বসানোর প্রস্তাব করেন। কেননা, এই ধরণের জমি কোনো উদ্বৃত্ত অথবা খাজনা উৎপাদন করে না, যার জন্য রাজস্ব প্রাপ্য হতে পারে। বাস্তবে এইসব জমির ক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব হিসাবে যা আদায় করে তা আসলে "চাষীর যৎসামান্য আয়—যা বেঁচে থাকার পক্ষেও যথেষ্ট নয়—এবং যৎসামান্য খাদ্যসামগ্রীর একটা মোটা অংশ, যদিও তাতে কখনোই হাত দেওয়া উচিত নয়।"

ভারতীয় নেতাদের দ্বিতীয় দাবি ছিল, দেশের যে সব অংশে সাময়িক বন্দোবস্ত চালু ছিল সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন। এটাই ছিল কৃষির বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা সমর্থিত দাবি (পরে এ বিষয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হবে)। নেতাদের প্রস্তাব ছিল, যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হচ্ছে ততদিন যেন সরকার নতুন সেটেলমেন্টর সময় একতরফা রাজস্ব বৃদ্ধির হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করে। কী কী কারণে রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাবে, কতটা পর্যন্ত করা যাবে, এবং কী উপায়ে করা যাবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট লিখিত নির্দেশ দিতে হবে, যাতে রায়ত সবকিছু স্পষ্টভাবে জানতে এবং বুঝতে পারে। এর ফলে সেটেলমেন্ট অফিসাররাও নিজেদের "খেয়ালখুশি মতন" কারচুপি করতে পারবে না, কৃষক নিজের উদ্যোগে জমির যে উন্নতি করেছে তার উপর কর না বসাবার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য হবে, সেটেলমেন্টের সময়কাল আরো প্রলম্বিত হবে, এবং সবশেষে, কর বৃদ্ধির বিষয়টি দেওয়ানি বা অন্য কোনো স্বাধীন আদালতের বিচার্য হবে।

তৃতীয়ত, নেতারা প্রস্তাব করেছিলেন রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরো নমনীয় এবং রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতিকে আরো উন্নত ও সহনশীল করে তুলতে হবে। যেটা সম্ভব সুবিধাজনক সময়ে কয়েক কিস্তিতে কর মেটাবার ব্যবস্থা করলে দুর্ভিক্ষ এবং অনটনের সময়—প্রশাসনিক দয়ায় নয়—নীতিগতভাবে যতদূর সম্ভব আদায় স্থগিত রাখলে কিংবা খাজনা মকুবের ব্যবস্থা করলে, যাতে অনটন অথবা দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে হতভাগ্য চাষীরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।[৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নগদ অর্থের বদলে উৎপন্ন দ্রব্য বা অন্য কিছুর মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার নীতি নেতাদের অনেকেরই পছন্দ ছিল, কিন্তু এ নিয়ে তাঁরা বেশি পীড়াপীড়ি করেননি, কেননা তাঁরা জানতেন যে প্রচলিত রীতি থেকে প্রস্তাবটা এতটাই ভিন্ন যে সেটা গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

জাতীয় নেতৃত্বের এই রাজস্ব নীতির একটা উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, কৃষকদের সংগঠিত করে রাজস্ব সংক্রান্ত দাবি আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কোনো প্রকৃত প্রচেষ্টা ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত ১৮৯৬ সালে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে সংগঠিত দুর্ভিক্ষ কবলিত মহারাষ্ট্রে কর দেওয়া বন্ধ করার আন্দোলন। ১৮৯৬-এর দুর্ভিক্ষের সময় কর আদায় স্থগিত রাখার এবং কর মকুব করার আদেশ জারিতে সরকারের অনিচ্ছা ও বিলম্বে উত্যক্ত হয়ে তিলক জনসাধারণকে সংগঠিত করে প্রচলিত দুর্ভিক্ষ নিবারণী আইনে প্রদত্ত অধিকার আদায়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'কেশরী' পত্রিকা, প্রচারপত্র, জনসভা, এবং এই সময় তাঁর নেতৃত্বাধীন পুণা সার্বজনিক সভার প্রতিনিধিদের প্রচার সফরের মাধ্যমে তিলক দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের জানান যে, দুর্ভিক্ষের সময় তাদের সাহায্য করার জন্যে আইন আছে, এবং সরকারের নৈতিক দায়িত্ব তাদের জীবন রক্ষা। দুর্ভিক্ষ আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারিরা দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকদের উপযুক্ত ত্রাণ সাহায্য দিতে বাধ্য। কাজেই, তাদের অবশ্য কর্তব্য, বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই আইন প্রয়োগের দাবি জানিয়ে কর্মচারিদের বিধিসম্মত কাজ করতে বাধ্য করা। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে অক্ষমতার জন্য কৃষকরা যদি কর দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আইনের প্রয়োগকেই সাহায্য করা হবে।

তিলকের এই আন্দোলন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের কর বন্ধ আন্দোলন।[৭] তিলক অস্বীকার করলেও, সরকার সেটা বুঝেছিল। ফলত, সরকার পুণা সার্বজনিক সভার প্রতিনিধিদের, এমনকি সভার বিরুদ্ধে এবং সবশেষে স্বয়ং তিলকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তিলককে ১৮৯৭ সালে গ্রেফতার করা হয়, এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে আঠোরা মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করাহয়। আসলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ শাসকবর্গ দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের মধ্যে তাঁর ১৮৯৬ সালের শীতকালীন প্রচারাভিযানের বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় শঙ্কিত বোধ করেছিল। তিলক নিজেও এর গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্ট উপলব্ধি

করেছিলেন এবং তার থেকে যথাযথ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগে অন্য রাজনৈতিক নেতারা সমর্থন জানাননি। এমনকি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ১৮৯৬ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কোনো রকম সক্রিয় সাহায্য করতে অথবা তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়। তিলক কংগ্রেসের এই নিষ্ক্রিয়তাকে ধিক্কার জানিয়ে ১৮৭৯ সালের ১২ই জানুয়ারি "কেশরীতে" লেখেন—

"গত বারো বছর ধরে আমরা চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে ফেলেছি—যদি আমাদের কথা সরকারের কানে যায়। কিন্তু তাতে সরকারের কিছুই আসে যায় নি। আমাদের বক্তব্যে সরকারের বিশ্বাস নেই—অন্তত তাই তাঁরা দেখাতে চান। সুতরাং আমাদের অভিযোগ তাঁদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করাবার জন্যে আইনসম্মত কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের অবশ্যই অজ্ঞ গ্রামবাসীদের সর্বোত্তম রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, আর কি করে আইনসম্মত উপায়ে সংগ্রাম করা যায় তা শেখাতে হবে। শুধু তাহলেই সরকার উপলব্ধি করবেন যে কংগ্রেসকে অবজ্ঞা করার অর্থ সমগ্র ভারতীয় জাতিকে অবজ্ঞা করা। এবং কংগ্রেস নেতারাও তখনই সফলতা অর্জন করবেন। কিন্তু এ কাজের জন্যে প্রয়োজন বহু সংখ্যক একাগ্রচিত্ত কর্মী রাজনীতি যাঁদের কাছে ছুটির দিনের চিত্তবিনোদনের উপায় মাত্র নয়, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং চুড়ান্ত দক্ষতা সহকারে পালনীয় নিত্য কর্তব্য।"

ভারতের মতন দেশে কৃষকদের যে একটা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ভূমিকা রয়েছে এটা তিলক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লেখেন:

"দেশের যারা প্রাণস্বরূপ সেই কৃষকদের চতুর্দিকে যে জড়তা এবং উদাসীনতার কুজ্ঝটিকা বিরাজমান একমাত্র তার অপসারণের মধ্য দিয়েই দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব। আমাদের এই কুজ্ঝটিকা অপসারণ করতেই হবে। আর তা করতে হলে কৃষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ একাত্ম হতে হবে,—আমাদের উপলব্ধি করতে হবে তারা আমাদেরই, এবং আমরাও তাদেরই।"

৪. ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ভারতীয় নেতারা রাজস্ব-হ্রাস এবং করবৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি ও কর সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের দাবি জানিয়েছিলেন কৃষকদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার জন্যে। রোগের মূল কারণ দূর করার কথা তাঁরা ততটা বলেননি। তাঁরা মনে করতেন রাজস্ব সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এবং রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন। কেননা জমির সত্ত্বাধিকারী যদি উপলব্ধি করতে পারে যে সেটলমেণ্ট অফিসারের কব্জা থেকে সে চিরতরে মুক্তি পেয়েছে, শুধু তখনই সে জমিটা

তার নিজের বলে নিশ্চিন্ত হতে পারবে, এবং ফলত, পল্লী অঞ্চলে 'মালিকানার ম্যাজিক' কাজ করবে। স্বভাবতই রায়ত মূলধন সঞ্চয়, জমির উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে উৎসাহিত হবে।

এই কারণেই, আমাদের আলোচ্য সময়কালের গোড়ার দিকে বিচারপতি রাণাডে কৃষি-সম্পর্কিত তাঁর প্রায় সমস্ত রচনায় ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছেন।[৮] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ৯৮৮৯ সালে একটি প্রস্তাবে এই দাবি উত্থাপন করে সরকারকে অনুরোধ জানায়—

"আর বিলম্ব না করে সরকার যেন অন্তত যেখানে জনবসতি ঘন এবং ভালো আবাদী জমি রয়েছে, সেই সব অঞ্চলে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বিষয়টা আর একবার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেন।"

এরপর থেকে প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনেই এ বিষয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত-সহ প্রায় সমস্ত প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সংবাদপত্র ও বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

জাতীয়তাবাদীদের এই দাবির ব্যাপারে বেশ কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতির অনেক ছাত্র এবং ভারতীয় নেতৃত্বের কিছু সমালোচক এই দাবিকে ১৭৯৩ সালের বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সঙ্গে এক করে দেখেছেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় নেতারা এই দাবি করে বঙ্গদেশে প্রচলিত জমিদারি ব্যবস্থাকে দেশের অন্যত্র—রায়তওয়ারি অঞ্চলে—সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এদের অনেকে স্পষ্টভাবে অথবা প্রকারান্তরে নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তাঁরা সুবিধাভোগী জমিদারদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছেন এবং হতভাগ্য, নিপীড়িত কৃষকদের স্বার্থকে শুধু উপেক্ষাই নয়, এমনকি তার বিরোধিতা পর্যন্ত করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তকে বিশেষভাবে জমিদারদের স্বার্থের প্রধান প্রবক্তা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, তিনি ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর স্বপক্ষে অনবচ্ছিন্নভাবে বলেছিলেন। যেহেতু রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোনো প্রামান্য ভিত্তি নেই, ব্যাপারটার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিভ্রান্তির মূল কারণ অবশ্য অনেক পুরনো। তখনকার দিনের অনেক নেতাই কিছু পরিমাণে এর শীকার হয়েছিলেন। তবে পরবর্তী লেখকেরা সম্ভবত সব চাইতে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন ১৯০২ সালের ভারত সরকারের 'ভূমিরাজস্ব নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের' দ্বারা। প্রস্তাবটা যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ হয় খসড়া তৈরির সময় কার্জন ভূমি রাজস্ব নীতির সমালোচকদের বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এই বিভ্রান্তির বীজ বপন করেছিলেন। কেননা

ঐ সুপরিচিত প্রস্তাবে লর্ড কার্জন প্রথমে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সঙ্গে বাংলার ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে এক করে দেখিয়েছেন এবং তারপর জোর দিয়ে বলেছেন, এই চিন্তাধারার অনুসারী বর্তমান "সমালোকচকে জনকয়েক এক সময় সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দাবি তুলেছিলেন।" এরপরই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে,—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি ; একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে বাংলার কৃষকের অাস্থা দেশের অন্যান্য জায়গার কৃষকের তুলনায় ভালো ; বাংলার কৃষকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে তারা জমিদারের প্রজা, এবং সুখে থাকা তো দূরের কথা, জমিদারের অত্যাচারে আর অত্যধিক খাজনা দিতে দিতে তারা ফতুর হয়ে গেছে : অনুপস্থিত জমিদারতন্ত্র, এবং "সহানুভূতিহীন কর্মচারির মাধ্যমে জমিদারি পরিচালনা", জমিদার এবং প্রজার মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক, এবং অসংখ্য মধ্যস্বত্ব ভোগীর উপস্থিতি ইত্যাদিও এর ফলে বেড়েছে। সবশেষে, কার্জন দাবি করেন যে, বঙ্গদেশের কৃষক যেটুকু নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা অর্জন করেছে তার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, কারণ কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সরকার বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব অইন করেছে। এবং এর পরই তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, সরকার কখনোই "সজ্ঞানে একথা মেনে নিতে পারে না যে কৃষকের স্বার্থে এই ধরণের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা আদর্শ, কোনো সভ্য দেশের অভিজ্ঞতাই এটা সমর্থন করে না ।'

বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে কার্জনের এই বক্তব্য। সচেতন ভাবেই হক বা অজ্ঞানতাবশত হ'ক কার্জন রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবিকে বঙ্গদেশে প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন। এবং পরোক্ষে, অতি সূক্ষ্মভাবে, সমালোচকদের জমিদারপন্থী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার জমিদারদের বিরুদ্ধে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে সহযোগিতা না করার জন্য তাঁদের বিদ্রূপও করেছিলেন।

পরবর্তী অনেক লেখকই কার্জনের সূত্র ধরে এগিয়েছেন। ফলে, দিনে দিনে বিভ্রান্তিটা বেড়েই চলেছিল। ১৯০৮ সালে জে. ডি. রীস্ লিখলেন : "জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কংগ্রেস আন্দোলনের" আসল উদ্দেশ্য হল "জমিদারদের কাছে থেকে সরকার যে কর আদায় করে প্রধানত কৃষকদের জন্য ব্যয় করে", সেটা তুলে নিতে সরকারকে বাধ্য করা।[৯] ১৯১১ সালে কার্জনের ভারত শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর জীবনীকার লোভ্যাট ফ্রেজার রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে তিনি "প্রধানত ধনী ব্যক্তিদের হয়ে বলেছেন"। শুধু তাই নয়, একটু বেপরোয়াভাবেই ফ্রেজার মন্তব্য করে বসেন যে, "সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা বিচিত্র দিক হল, যথার্থ দরিদ্রের হয়ে বলার অথবা তাদের রক্ষা করার কেউ

নেই—একমাত্র সরকার ছাড়া·····।" জাতীয়তাবাদীদের অবস্থান সম্পর্কে এই ভুল ধারণার আর একটি উদ্ভট নিদর্শন ১৯২১ সালে প্রকাশিত কে. টি. শাহ্-র "সিক্সটি ইয়ার অব ইণ্ডিয়ান ফিন্যান্স্" গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশ—

"যদি আমরা পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তর রচনাকে এই বিষয়ে বিগত শতাব্দীর জনমতের প্রতিফলন বলে গ্রহণ করি, তাহলে দেখা যাবে, ভারতীয় প্রচারকদের মধ্যে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অন্যান্য প্রদেশেও সম্প্রসারিত করে ভূ-সম্পত্তির উপর ইংলণ্ডের অনুরূপ জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল।"

এইরকম ভুল ধারণার প্রকাশ দেখা গেছে অন্য তিন বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ পি. জে. টমাস, পি. এস. লোকনাথন এবং বি আর মিশ্রর রচনাতেও।[১০] আরো সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দুই ঐতিহাসিক—প্যার্নাসি ছায়া ঘোষ এবং বি. বি. মিশ্র ঐ ভুলই করেছেন, সম্ভবত আরো কম যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে। শ্রীমতী ঘোষ তাঁর ডক্টরেট থিসিস "দি ডেভেলপমেন্ট অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ১৮৯২-১৯০৯"এ কংগ্রেসের রাজস্ব সংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবিকে এমনভাবে দেখিয়েছেন যে এটা যেন বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটাকে সম্প্রসারিত করার দাবি। লেখিকা এমনকি এ কথাও বলেছেন যে, রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ১৮৯৯ সালের সভাপতির ভাষণে "বাংলার অনুরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্তনের জন্যে সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন।" বি. বি মিশ্র তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "দি ইণ্ডিয়ান মিড্ল ক্লাসেজ—দেয়ার গ্রোথ ইন মডার্ন টাইমস্"-এ লিখেছেন যে ১৮৮৮ সালে কংগ্রেস অনুরোধ জানায়, "বঙ্গীয় ধরণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের সর্বত্র প্রচলিত করা হক। যদিও দেখা গেছে যে এই বন্দোবস্ত প্রজাদের পক্ষে দারুন অসুবিধাজনক, এবং তাদের কষ্টের কারণ হয়েছে।"[১১] অভিমতটি ব্যক্ত হয়েছে 'মিড্ল লাস অপোজিসন টু টেনান্ট রাইট্স্' শীর্ষক একটি অনু-অধ্যায়ে। লেখক বলতে চেয়েছেন, ১৮৮০-এর দশকে সরকার যে আইনসভাগুলির সম্প্রসারণে অনীহ ছিল, তার কারণ এই আশঙ্কা যে আইনসভার সম্প্রসারণ বা ভারতীয়করণ ঘটলে প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মত প্রগতিশীল আইন প্রনয়নের কাজ বাধা পাবে। তাঁর মতে, "আইন-সভার ভারতীয় সদস্যদের কৃষক-বিরোধী ভূমিকা থেকেই শুধু এই আশঙ্কা দেখা দেয়নি, ভারতের শিক্ষিত মানুষের রাজনৈতিক মুখপাত্র জাতীয় কংগ্রেসের দাবির প্রকৃতিও ছিল এর কারণ।" আরেকজন সাম্প্রতিক লেখক, পার্সিভ্যাল স্পিয়ার, "পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারত থেকে আগত কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ সামান্যই জড়িত ছিল" এটা স্বীকার করলেও মন্তব্য করেছেন, "সাধারণ-

ভাবে জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত বাংলার সদস্যরা অনেক ত্রুটির জন্যই সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করতেন।"

বাস্তবে কিন্তু আমাদের আলোচ্য সময়কালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাতীয় নেতৃত্বের প্রায় সবাই বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরকারের রাজস্ব দাবির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় বারবার তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কথা বলে তাঁরা দেশের অন্যান্য অংশে বাংলার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রচলন অথবা ১৭৯৩ সালের জমিদারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দাবি করেন নি। তাঁরা চেয়েছেন রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তার স্থায়িত্ব। তাঁরা জানতেন, তাঁদের ভুল বোঝা হবে। সেজন্য তাঁরা এই পার্থক্য দেখিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জমিদারি অথবা রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত যাই থাকুক না কেন, তাঁদের কথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সঙ্গে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বা রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতির কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা রাজস্ব-হারের অথবা উপরোক্ত দুই ব্যবস্থায় কর নির্ধারণ যে নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় সেই নীতির বিষমতা দূর করার কথাই শুধু বলেছেন।

এখানে স্থানাভাবে এই বিষয়ে নেতারা যে সব স্পষ্ট, দ্বর্থহীন উক্তি করেছেন তার সবগুলির উল্লেখ সম্ভব নয়। কয়েকটিমাত্র বক্তব্য শুধু উদ্ধৃত করব। বাংলার বহু-নিন্দিত নেতাদের উক্তিকেই বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

লালমোহন ঘোষ ছিলেন বাংলার অন্যতম প্রধান এবং সম্ভবত তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নেতা। তিনি ১৮৭৯ সালে লিখেছিলেন ঃ

"আমার মনে হয় বঙ্গদেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাকে কিছুটা পরিমার্জিত করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি সারা দেশে প্রবর্তন করা যায় তার চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আমরা চাই এই বন্দোবস্ত হবে সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে, বাংলার জমিদারদের মতো মধ্যবর্তী কোনো শ্রেণীর সঙ্গে নয়। আসলে আমরা ইউরোপ মহাদেশের সুইজারল্যান্ড অথবা অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার মত একটা ব্যবস্থা চাই।" (বক্তৃতাবলী)।

১৮৮০ সালে বিচারপতি রাণাডে বলেছিলেন যে, "জমিতে উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট ভিত্তিতে চিরস্থায়ী রায়তওয়ারি বন্দোবস্তই ···· শুধু কৃষি সমস্যার সমাধান করতে পারে।" চার বছর বাদে তিনি এই কথাই আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—

"আমরা এখানে বলতে চাই, এই কাগজে এবং অন্যত্র এ যাবৎ আমরা যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছি, প্রায়ই তার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। আমরা কখনোই রায়ত-ওয়ারি ব্যবস্থা বাতিল করতে অথবা তার জায়গায় জমিদারি বন্দোবস্ত চালু করতে চাইনি।·· এই প্রেসিডেন্সিতে রায়তওয়ারি প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে

আসছে, এবং আমাদের পল্লীসমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে এটিই একমাত্র উপযুক্ত প্রথা। আমরা দাবি করেছে এই প্রেসিডেন্সির কৃষকদের জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবি জানিয়ে ইন্দুপ্রকাশ ১৮৮১ সালের ৭ই মার্চ লিখেছিল ঃ

"দেশের এই অঞ্চল থেকে কেউই এই প্রেসিডেন্সিতে জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেননি। ইন্দু (প্রকাশ) কৃষির শ্রীবৃদ্ধির কারণে বাংলার যে প্রশস্তি গেয়েছে, সেটা সেখানকার ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর জন্য…। কিন্তু এ কথার অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, আমরা রায়তের পরিবর্তে জমিদার চাই। আমাদের বক্তব্যের এই রকম ব্যাখ্যা করা হলে সেটা সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতারই পরিচায়ক হবে।"

১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'মারহাট্টা' যে রকম সুস্পষ্ট ও অবধারিতভাবে প্রশ্নটাকে উত্থাপন করেছিল, তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি কাঙ্ক্ষিত হয় সরকারকে অবশ্যই কিছু ছাড়তে হবে। কিন্তু সেটা যেন কৃষকের ঘরে যায়, মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা বা জমিদারেরা যেন তা আত্মসাৎ করতে না পারেন। জমিদার তৈরি করে সরকার উদ্যম ও মিত-ব্যয়িতাকে উৎসাহিত করার বদলে রায়তকে জমিদারের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাংলার জমিদারি প্রথা নিশ্চয়ই অর্থনীতিবিদরা যাকে কৃষক-মালিকানা বলেন তা নয়। কৃষক-মালিকানার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হবে চিরস্থায়ী রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত। ….এই ব্যবস্থাটার জন্যই আমরা সংগ্রাম করে চলেছি।"

১৮৮৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর উপর একটি প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে শেখ রাজা হুসেন খান বলেছিলেন, তিনি সরকারের পাওনা নির্দিষ্ট করে দিতে চান, যা অবশ্যই বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর অনুরূপ হবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিস্বত্ব প্রথা প্রচলিত আছে, সেজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে বাধ্য"। ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর 'হিন্দু'ও অস্বীকার করে যে জাতীয়তাবাদীদের দাবি ছিল জমিদারি প্রথার প্রবর্তন এবং জোর দিয়ে বলে ঃ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কোনো বুদ্ধিমান সমর্থকই জমিদারি ব্যবস্থার পক্ষপাতি হতে পারেন না"। ১৮৯১ সালের ২রা জানুয়ারি পত্রিকাটি আরো স্পষ্ট করে লিখেছিল ঃ

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর আধুনিক প্রবক্তারা চান না যে একটা বিরাট জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ক। তাঁরা চান না জমি থেকে সরকারের প্রাপ্য অংশটুকুতে এমন এক শ্রেণী এসে ভাগ বসাক, যারা না করে পরিশ্রম, না অন্য কাজ। তাঁদের

কাম্য এমন ব্যবস্থা যাতে বাংলার জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি থাকবে না, অথচ সব সুবিধে পাওয়া যাবে।"

সে যুগের বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকা ও সরকার ও কৃষকদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করেছিল, এবং এই প্রসঙ্গে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তর নিন্দা করেছিল। ১৮৯০ সালের ২৮শে জুন "বেঙ্গলী" দেখায় যে জমিদারি ব্যবস্থার ফলে জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মধ্য স্বত্বভোগী বিরাট এক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। 'বেঙ্গলী' লিখেছিল ঃ

"আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থন করি। এই বন্দোবস্ত যদি সরাসরি রায়তদের সঙ্গে হত, তাহলে খুব ভালো হত। কিন্তু, জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি করে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাংঘাতিক ভুল করেছেন। বর্তমানে দেশের যে সব অংশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত নেই সেই সব জায়গায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারিত করার প্রস্তাবের বিরোধিতা আমরা অবশ্যই করব। জমির বিলিব্যবস্থা সংক্রান্ত রাষ্ট্রের নীতি এটাই হওয়া উচিত যে, কৃষক প্রকৃতপক্ষে জমির অধিকারী, সে জমি চাষ করে এবং তার উন্নতিসাধন করে, কাজেই সে যাতে সরকারকে ন্যায্য এবং নির্দিষ্ট কর দিয়ে নিজের শ্রমের ফল নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।"

১৮৯৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর উপর আনা এক প্রস্তাব সমর্থন করে বাল গঙ্গাধর তিলক সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে তিনি জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করেন না। তাঁর সমর্থন রায়তদের পক্ষে। তিনি দেখান যে, যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল তার মূল কথা, ভূমিরাজস্ব নির্দিষ্ট করার এবং তাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা। সেট্‌ল্‌মেণ্টের অথবা সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতির বিষয়ে প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি।[১৪] আর একজন নেতা, মহারাষ্ট্রের ভি. আর. নাথুও ১৮৯৪ সালে, কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে একই কথা বলেছিলেন এবং 'বিদেশীদের' সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, "তারা যেন মনে না করেন এদেশের জনসাধারণের অধিকাংশই বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে যেটা বোঝায় সেটাই চায়।" ১৯০১ সালে "ভারতের দুর্ভিক্ষ" নামে লিখিত একটি পুস্তিকায় পি. সি রায় বাংলার জমিদারদের ভূমিকার নিন্দা করে দাবি করেছিলেন, অত্যাবশ্যকীয় এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভবিষ্যতে হবে "শুধু রায়ত আর রাষ্ট্রের মধ্যে—তাতে জমিদার, তালুকদার অথবা মালগুজারের মত কোনো মধ্যস্বত্ব ভোগীর স্থান থাকবে না"। তিনি সরকার ও জনগণকেও অনুরোধ করেছিলেন এমন কিছু না করতে "যা ধূর্ত লোকের হাতে পড়ে রায়তকে নিপীড়ন করার যন্ত্রে অথবা তার মৃত্যু-ফাঁদে পরিণত হতে পারে।" ১৯০২ সালের ভূমি রাজস্ব প্রস্তাবে কার্জন ভারতীয় নেতাদের দাবির যে ভুল ব্যাখ্যা তুলে

ধরেছিলেন সেটা জি. সুব্রহ্মানীয় আইয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "লর্ড কার্জনের ভূমি রাজস্ব এবং দুর্ভিক্ষ বিষয়ক প্রস্তাব" নামে একটি প্রবন্ধে তিনি দেখান ঐ প্রস্তাবে ভুল ক'রে অনুমান করা হয়েছে যে—

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবি তুলে ভূমিরাজস্ব নীতির সমালোচকেরা জমিদারি ব্যবস্থা দাবি করছেন। শ্রীদত্ত এবং অন্যরা সর্বদাই সজাগ যাতে তাঁদের সম্বন্ধে এই ধারণা না জন্মায় যে তারা রায়ত ও রাষ্ট্রের মাঝখানে এক মধ্যস্বত্ব-ভোগী জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাঁদের প্রস্তাব ·· চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে সরাসরি কৃষক এবং সরকারের মধ্যে ··যেহেতু জমিদারি প্রথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নয় এবং যেহেতু প্রস্তাবটা হচ্ছে রায়ত ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সরাসরি বন্দোবস্তের, সেজন্য বর্তমান আলোচনায় জমিদার নামক বিরক্তিকর শ্রেণী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।"

সবশেষে উল্লেখ্য, বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা এবং রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত অন্য নেতাদের তুলনায় কোনো অংশে কম সচেতন ছিলেন না। অনেক আগেই, ১৮৭৪ সালে, তরুণ অফিসার রমেশচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং ব্যবস্থাটিকে "কর্ণওয়ালিসের ভীমরতি প্রসূত" আখ্যা দিয়েছিলেন। আরো উল্লেখ্য, সরকারি আমলা হিসাবে জমিদার মহলে তিনি এই দুর্নাম অর্জন করেছিলেন যে "জমিদার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রতি তিনি বিরূপ।"

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রতি রমেশচন্দ্রের বিরূপতা অনেকটা কমে এসেছিল। এমন কি, এক ধরণের শর্ত সাপেক্ষ প্রশংসাও করেছেন। তবু, এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল যে, দেশের বাকি অংশে এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অসম্ভব, এবং সম্ভবতঃ অসঙ্গতও। ১৮৯৭ সালে তিনি মন্তব্য করেন: ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি সম্পর্কে সব আপত্তিই দূর হয়ে যাবে যদি "প্রত্যেকটি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুযায়ী এই নীতির প্রয়োগ করা হয়।" ১৮৯৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলার ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানানো হয়েছিল বলে পি. সি. ঘোষ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র এ ধরণের কোনো দাবি তো করেনইনি বরং প্রকৃতপক্ষে স্পষ্টই বলেছিলেন "দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সব ভিন্ন ভিন্ন প্রথা বর্তমান—যেমন, বাংলার জমিদারি, অযোধ্যার তালুকদারি, উত্তর-পশ্চিমের মহালওয়ারি, মধ্য ভারতের মহাগুজারি অথবা দক্ষিণ ভারতের রায়তওয়ারি ইত্যাদি- সেগুলির গুণাগুন আলোচনায়" তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। এবং তারপরই তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন: "কৃষক কোন্ ব্যবস্থা বা কোন্ বন্দোবস্তর মধ্যে বাস করে তাতে কিছু আসে যায় না। নিজের জমিতে সে যা উৎপাদন করে তার পর্যাপ্ত অংশ সে যাতে পায়

তা নিশ্চিত করুন… এতে শুধু সে বাঁচবে না, দেশও বেঁচে যাবে।"[১৫] ১৯০০ সালে লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর চতুর্থ পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করেছিলেন এই ব'লে যে—

"বর্তমানে আমি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বাংলায় প্রচলিত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ চাই না। আপনার উদ্দেশ্যে আমি যে তিনটি পত্র রচনার সম্মান অর্জন করেছি তার কোনোখানেই আমি এরকম কোনো কথা বলিনি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষ সেই ব্যবস্থার অধীনে বসবাস ক'রে আসছে।….আমি যা চেয়েছি তা হ'ল, কৃষক যে প্রদেশের যে ভূমি ব্যবস্থার আওতায় বাস করে তার মধ্যেই তার উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

লক্ষ্যণীয় যে ভারতের নেতারা, বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবি করার সময় অবধারিতভাবে যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তা হল—"ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" এবং "ভূমি থেকে সরকারের প্রাপ্যকে নির্দিষ্ট ও চিরস্থায়ী করা।" কাজেই, তাঁরা নির্দিষ্ট করে কী চেয়েছিলেন বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাছাড়া, অতীতে এই প্রশ্নে সরকারী স্তরের বিতর্কে নেতারা যেভাবে ভারত সচিবের ১৮৬২-র ৯ই জুলাই-এর, এবং ১৮৬৫-র ২৪শে মার্চ-এর নির্দেশাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে এই সব নির্দেশাবলী পুরোপুরি কার্যে রূপায়িত করতে পারলে ভারতবাসীরা খুবই উপকৃত হতেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবি করে সর্বত্র বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি, জমির উপর সরকারের দাবিকে সীমিত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতের বিভিন্ন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার সময় রমেশচন্দ্র দত্ত রায়তওয়ারি ব্যবস্থার যে মারাত্মক ত্রুটির কথা বলেছেন,—সেটি ব্যবস্থার ধরণ বা কৃষক মালিকানা নয়, রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার অস্থায়িত্ব। শুধু তাই নয়, রায়তওয়ারি প্রথার জনক টমাস মনরো রায়তওয়ারি প্রথায় রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুপারিশ করেছিলেন বলে রমেশচন্দ্র তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।[১৬]

জাতীয়তাবাদীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবির প্রকৃত স্বরূপ কী ছিল তার প্রমাণ হিসাবে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তববোধে এবং আপোষমূলক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা পরিমার্জিতরূপে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রস্তাব এনেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল দামস্তরে পরিবর্তন ঘটলে ঐ পরিবর্তনের সীমার মধ্যে রাজস্বের পরিমাণে পরিবর্তন আনা যাবে।[১৭]

১৮৮২-র অক্টোবর এবং ১৮৮৩-র মে মাসের ডেসপ্যাচে লর্ড রিপন একটি আপোষমূলক প্রস্তাব রাখেন যাতে বলা হয় যে, (ক) আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি, (খ) মূল্য বৃদ্ধি (গ) সরকারি খরচে উন্নয়নকার্যের ফলে উৎপাদন

বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছাড়া নতুন করে জরিপ করা বা রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না। নেতারা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সমর্থন করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি ছিল এই যে, যেসব অঞ্চলে চাষযোগ্য জমির একটা বিরাট অংশ এখনো চাষের আওতায় আনা হয়নি সেখানে এই ব্যবস্থা চালু হলে জমির মালিকেরা প্রচুর 'অনুপার্জিত আয়' ভোগ করবেন। এ ব্যাপারে নেতাদের বক্তব্য ছিল ঃ যেসব অঞ্চল সরকারের নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নত শুধু সেই সব অঞ্চলেই তাঁদের দাবি সীমাবদ্ধ থাকবে। স্পষ্টতই, এই সংশোধিত দাবি মূল্য-স্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে এটা ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না যে, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব নির্ধারণের নীতি স্থির করা, ভূমিস্বত্বের নতুন ব্যবস্থা নয়।

উল্লিখিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হ'ল, জাতীয় নেতাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দাবি যখন এতটাই স্পষ্ট তখন এ নিয়ে এত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, বিভ্রান্তি অন্তত অংশত ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর আক্রমণের মূলে জাতীয়তাবাদীদের যে মনোভাব কাজ করেছে তাকে বিকৃত করে দেখানো যায় এবং ভারতীয়রা অতিরিক্ত কর ধার্য সম্পর্কে যে মূল অভিযোগ এনেছিলেন তার থেকে ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া যায়। অস্বীকার করা যাবে না যে, খেতাবধারী খানদানি সাহেবেরা, বংশানুক্রমিক লর্ডরা, যাঁরা আইরিশ প্রজাদের সুরক্ষা ও সাহায্যের সমস্ত রকম প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতেন, আয়ারল্যাণ্ডের সেই বিশাল জমিদারির মালিকেরা, টোরি পার্টির রথী-মহারথীরা, ব্রিটেনে জমি জাতীয়করণের বিরোধীরা এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ বেতনভুক আমলারা—সংক্ষেপে ইংল্যাণ্ডের এসটাব্লিশমেন্টের অঙ্গীভূত ব্যক্তিরা যখন ভারতের কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন আর ভারতীয় নেতাদের সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহের প্রবক্তা বলে অভিযুক্ত করেন তখন ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত এবং ভণ্ডামিপ্রসূত বলেই মনে হয়। এটা ভারতীয় নেতাদের নজর এড়িয়ে যায়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে সফল হয়নি বলে কার্জন যে দাবি করেছিলেন তার জবাবে রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০২ সালে মন্তব্য করেন ঃ "ইংল্যাণ্ডের ভূস্বামীরা নিজেরা ১৭৯৮ সালে পিট-এর আইনে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ভোগ করলেও এবং তাকে তারিফ জানালেও ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে তাঁরা এক নূতন বুলি আওড়াতে শিখেছেন—তাঁদের নিজেদের পক্ষে যেটা ভালো ভারতীয়দের পক্ষে নাকি সেটা ভালো নয়।"

তবে, এতটা ভুল বোঝার কারণ সম্ভবত নিছক বিকৃত তথ্য পরিবেষণই নয়। আসলে, কোনো কোনো ভারতীয় নেতার ভূমিনীতির কিছু দিক এবং তাঁদের

কারও কারও রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সমর্থনে বক্তব্যের ধরনের জন্য হঠাৎ করে কোনো পর্যবেক্ষকের ভুল বোঝার এবং বিভ্রান্ত হবার অবকাশ ছিল। যেমন—কখনও কখনও জাতীয় নেতারা এবং বিশেষ করে শেষের দিকের বছরগুলিতে জাতীয় কংগ্রেসের দাবি উত্থাপন করার সময় শুধু 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন এবং 'ভূমি রাজস্বের' এই শব্দ দুটোকে বাদ দিয়েছিলেন। অবশ্য এই ত্রুটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা, এটা যে নিছকই ভাষাগত আলস্যের ফলেই হয়েছিল তা স্পষ্ট। কংগ্রেসের আগেকার দিকের প্রস্তাবগুলি এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত জাতীয়তাবাদীদের রচনা বা প্রকাশ্য ভাষণসমূহ পড়লেই সেটা বোঝা যায়।

দ্বিতীয় কারণটা ছিল তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর বহু সমর্থক এবং বিশেষ করে রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের একটি মনোরম চিত্র তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী করতে পারে বঙ্গদেশ তার বাস্তব উদাহরণ। তাঁরা দাবি করেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় এই প্রদেশে সব চাইতে কম ক্ষতি হয়েছে, কেননা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কল্যাণে অন্যান্য প্রদেশের হতভাগ্য রায়তদের তুলনায় বাংলায় কৃষকদের অবস্থা ছিল অনেক ভালো, এবং সেজন্য তারা দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত মাঝে মাঝেই এটা বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলেছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "বাঙালিদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।" শুধু তাই নয়, বার বার এ দাবি করেছেন যে বাংলার জমিদারেরা ন্যায্য এবং স্বল্প পরিমান খাজনা ধার্য করতেন, এবং এই খাজনার হার গড়ে উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের বেশি হত না।[১৮] অবশ্য বাংলায় ও ভারতের অন্যত্রও এরকম কিছু নেতাও ছিলেন যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর নিন্দা করেছেন কৃষককে জমিদারের করুনার উপর ছেড়ে দেবার জন্য। যেমন, পি সি. রায়। ১৯০১ সালে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন ঃ

"জমিদার নামে পরিচিত খুবই গন্ডিবদ্ধ এবং স্বার্থান্ধ এক শ্রেণীর মানুষের ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর কারো উপকারে আসেনি—না রাষ্ট্রের,না কৃষকের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর আওতায় বসবাসকারী কৃষকেরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের মতই উচ্চ হারে করের দ্বারা নিপীড়িত ; তাঁরা অন্যদের তুলনায় ভালো ব্যবহারও পান না।...বাঙালি কৃষক যদি সচ্ছলতা অর্জন করে থাকেন, তার কারণ জমিদারের সাহায্য নয়। বস্তুত জমিদাররা থাকা সত্ত্বেও এটা হয়েছে। গড়পড়তা একজন বাঙালি জমিদার—বিশেষ করে অনুপস্থিত জমিদার বাবুটি—দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা বেনিয়া, সাওকার আর মহাজন নামে পরিচিত কৃষকের শত্রুদের মতই সমান পাষণ্ড, সমান চামার।"[১৯]

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলার কৃষকেরা সচ্ছল হয়েছিল—এমন দাবি রমেশচন্দ্র করেননি। তিনি সর্বদাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলা-ফলের সঙ্গে ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের ফলা-ফলকে যুক্ত করে দেখেছন। তাঁর কাছে ১৭৯৩ সালের রেগুলেসন এবং ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের আইন দুটি শুধু পরস্পরের পরিপূরকই নয়, প্রকৃতপক্ষে একই মুদ্রার দুটি দিক বলে মনে হয়েছে। এই দ্বিবিধ আইনের ফলেই বাংলার কৃষকের অবস্থা অন্যান্য জায়গার কৃষকদের তুলনায় উন্নতি হয়েছিল। রমেশচন্দ্র ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ ছিলেন, ঠিক তেমনি, একই সঙ্গে, একই ভাবে, এবং একই রকম সোচ্চারে এবং নির্দ্বিধায় তিনি ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন দুটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। কার্জন তাঁর ১৯০২ সালের প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র এবং অন্যান্য নেতাদের অভদ্রভাবে বিদ্রূপ করে বলেন যে জমিদারদের খাজনার দাবির উপর একটা সীমা আরোপের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। রমেশচন্দ্র তাতে ক্ষুব্ধ হন এবং সবিনয়ে কার্জনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি বরাবরই ব'লে এসেছেন ভূমিস্বত্ব আইনগুলিই বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাফল্যকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। এবং ১৮৮৫ সালের ভূমিস্বত্ব আইনের রচনায় তাঁর নিজের অবদানও নেহাৎ তুচ্ছ ছিল না। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র এটাও উল্লেখ করেন যে ১৮৭৪ সালেই তিনি রায়ত ও জমিদারের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবি জানিয়ে বলেছিলেন: "ব্যাপকভাবে জরিপ করে প্রদেয় খাজনার হার নির্নীত হ'ক, এবং সেই হারকে চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট ব'লে ঘোষণা করা হ'ক।"[২০]

তৃতীয়ত, ভারতের অধিকাংশ নেতাই জমিদারি ব্যবস্থার অবলুপ্তি দাবি করেননি। রায়তের ভালো-মন্দর প্রশ্নে তাঁরা জমিদারি প্রথা এবং রায়তওয়ারি প্রথার মধ্যে সামান্যই তফাৎ দেখতে পেতেন। এর মূল কারণ ভূস্বামী প্রেম নয়। আসলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভূস্বামী প্রথার দোষাবলীর কথা মনে রাখলে জমিদার এবং রায়তওয়ারি ব্যবস্থার মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেবার প্রশ্ন নেই। কেননা, এরা একই ব্যবস্থার দুটি ভিন্ন রূপ—একটি বেসরকারি জমিদারি ব্যবস্থা, অন্যটি সরকারি জমিদারি ব্যবস্থা। প্রথমটির ক্ষেত্রে জমিদার খাজনা আদায় করেন, শেষেরটিতে সরকার নিজে সেটা করে। কৃষকের কাছে দুটোর মধ্যে প্রকৃত প্রভেদ সামান্যই।[২১]

রমেশচন্দ্র দত্ত দেখিয়েছিলেন যে, ভূস্বামীদের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষা করার সদিচ্ছা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রায়তওয়ারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি। আসল উদ্দেশ্য ছিল, লাভের বখরা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের না দিয়ে নিজের লাভ যতদূর সম্ভব বেশি রাখা। অর্থাৎ কোম্পানি জমিদারদের লাভে বাধা

দিতে চেয়েছে, রায়তদের উন্নতি তার লক্ষ্য ছিল না।[২২] এই ব্যবস্থার কল্যাণে কোম্পানি কৃষকদের এমনভাবে নিজের প্রভুত্বাধীন করতে পেরেছিল যা একমাত্র ক্রীতদাসের উপর ক্রীতদাস-মালিকের প্রভুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। তাদের বেঁচে থাকার জন্য যা একান্ত আবশ্যক তা বাদ দিয়ে সব কিছুই কোম্পানি নিয়ে নিতে পারত।

কোনো কোনো নেতা অবশ্য মনে করতেন যে, অন্য কিছু না হ'ক অন্তত দুটি বিষয়ে জমিদারি ব্যবস্থা রায়তওয়ারি ব্যবস্থার তুলনায় ভালো ছিল। প্রথমত, সরকার জমিদারের অত্যাচার এবং অত্যধিক কর বৃদ্ধির হাত থেকে রায়তদের বাঁচাতে জমিদারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন বা করতে পারেন। কিন্তু, রাজস্ব বৃদ্ধি অথবা কৃষকের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের সরকারি ক্ষমতার উপর কোনোরকম বৈধ বা অন্য ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের প্রশ্নে বরাবরই তার অনীহা। একবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়ে গেলে জমিদার অথবা অন্য ভূস্বামীদের করবৃদ্ধি করার ক্ষমতাকে খর্ব করে এর সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এবং সেটাই করা উচিত। কাজেই, জমিদারদের করবৃদ্ধিতে অনুমতি দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, এমনকি চাপ দিয়ে কৃষককে শোষণ করতে বাধ্য করার নীতি অনুসরন না করে, সরকারের কর্তব্য জমিদারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে আদর্শ স্থাপন করা যা তারা ভালোভাবেই করতে পারে।[২৩] দ্বিতীয়ত, কিছু নেতার মতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার তুলনায় জমিদারি ব্যবস্থা ভালো ছিল, কারণ এতে সম্পদ বিদেশে চলে যেত না। তাঁদের বক্তব্য, কৃষককে যদি মোটা খাজনা দিতে বাধ্যই করা হয় তবে সেটাই খাজনা ভারতীয় ভূস্বামীর হাতে যাওয়াই শ্রেয়। কেননা, তাতে টাকাটা দেশের মধ্যেই খরচ হবে। বিদেশী সরকারকে দিলে, সেটা দেশের বাইরে চলে যাবে।[২৪]

চতুর্থত, বিভ্রান্তির আরো একটা কারণ ছিল। ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থা খারাপ হতে হতে এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে তাদের প্রতিভার স্ফুরণের কোনো সুযোগ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, নেতাদের কেউ কেউ জমিদার শ্রেণীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে অন্তত এই শ্রেণীটি সামাজিক এবং বৌদ্ধিক উৎকর্ষের মান কিছুটা বজায় রাখতে সমর্থ। এঁদের চোখে, জমিদাররা ছিলেন "সমগ্র জাতির অন্ধকার গহ্বরে বিলীন হয়ে দাসশ্রেণীতে পরিণত হওয়ার" পথে বাধা। নেতাদের একাংশ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তার নেতৃত্ব থাকা আবশ্যক। এবং জমিদাররাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাতে পারে, কেননা, তারাই পল্লী অঞ্চলের স্বাভাবিক নেতা।[২৫] এই প্রসঙ্গে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে লিখিত একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে "অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৮৭১ সালের ২০শে জানুয়ারি যে মন্তব্য করেছিল, তা

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমাদের আলোচ্য সময়কালের প্রায় এক দশক আগে প্রবন্ধটি লেখা হলেও, এটি পুনর্মুদ্রনের যোগ্য, কেননা এই প্রবন্ধে আমরা সে সময়ের বাংলার সম্ভবত ভারতেরও—জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের চিন্তাধারার ভালো পরিচয় পাই। সম্পাদকীয়টির শুরুতেই বলা হয়েছিল—

"এটা সবাই জানেন এবং স্বীকার করেন যে, শ্রেণী হিসাবে তাঁরা (জমিদারেরা) দেশবাসীর বিশেষ প্রিয়পাত্র নন, কেননা তাঁদের অধিকাংশই উদ্যমহীন, অলস, দুর্বল, অজ্ঞ, অত্যাচারী এবং স্বার্থপর। আমরা এটাও জানি যে, প্রতি বছর এরা প্রভূত পরিমাণে অর্থ নানা তুচ্ছ ব্যাপারে এবং নষ্টামিতে ব্যয় করে—যে অর্থ প্রকৃতপক্ষে রায়তদের। এবং কিছু জমিদার সত্যই সর্বস্বান্ত হলে লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রায়-ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। এইসব কারণে আমরা জমিদারের তুলনায় কৃষককে বেশি ভালোবাসি আর সমীহ করি, তবু জমিদারদের সমর্থন করতে আমরা বাধ্য। এটা যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু প্রয়োজন, যন্ত্রণাদায়ক হলেও প্রয়োজন।"

ঐ সম্পাদকীয়তে দু'দিক থেকে, জমিদারদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। প্রথমত, গণ-আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন টাকা, এবং এই টাকা একমাত্র জমিদাররাই যোগাতে পারে, কেননা বণিকরা আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজে জমিদার ছিলনা বলে সেখানকার আন্দোলন এবং কাজকর্ম অর্থের অভাবে ও দাতার অভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প এবং সরকারি চাকরি থেকে উদ্ভূত সব সম্পদই আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, শুধু বাকি ছিল জমি। জমিদারদের অপসারণ করলে, তারা কৃষি সম্পদও লুঠ করবে, এবং পালা-বদলের সুফল কৃষকের ঘরে পৌঁছোবার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যই যদিও জমিদারেরা অসৎ, "কৃষকের পরিশ্রমের ফল ইংরেজের পেটে যাওয়ার চাইতে জমিদারদের ঘরে যাওয়া শ্রেয়।" যুক্তিটিকে আরো স্পষ্ট করে সম্পাদকীয়টি লিখেছিল—

"জমিদারদের বঞ্চিত করে কৃষকের অবস্থা ভালো হবে—এটি সর্বদাই এবং অবশ্যই বাঞ্ছিত, কিন্তু একেবারেই অবাঞ্ছিত জমিদার এবং রায়ত উভয়ের সম্পদে ইংরেজদের সম্পদশালী হওয়া। এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যা থেকে বলা যায় যে, কৃষকদের উপকারের জন্যই সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করতে চান। বরং আশঙ্কার কারণ আছে যে, তার ফলে বর্ধিত রাজস্ব অপচিত হবে, এবং আমাদের উপকারের জন্য ব্যয় না-হয়ে বিলি হবে অন্যের প্রয়োজনে।" সম্পাদকীয়টির শেষে ঘোষণা করা হয়েছিল—"দেশের অর্থ ভাণ্ডারের উপর জনগণের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসুক, তারপর আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই

ব্যবস্থাটার বিরোধিতা করব যেটাকে নিরুপায় হয়েই এখন আমাদের সমর্থন করতে হচ্ছে।"

সে যাই হক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় নেতাদের অনেকেই জমিদারতন্ত্র এবং কৃষক শোষণের প্রসঙ্গটা উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। তবে তার দ্বারা যেন একটি সত্য চাপা না পড়ে। তারা যখন রাজস্বের চিরস্থায়ীকরণের দাবি তুলেছেন, তখন তাঁরা মুখে যা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাই চেয়েছেন—পিছনের দরজা দিয়ে জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি।

টীকা

১। নীট সম্পদ অথবা উৎপাদন বলতে বোঝাতো হ'ত, মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং উৎপাদনের আনুমানিক ব্যয়ের পার্থক্য। এটা শ্রমিকের বেতন এবং গড় মুনাফার হার অনুসারে কৃষিতে লগ্নি করা মূলধনের লভ্যাংশের হিসেব থেকে পাওয়া যেত।

২। রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সাধারণতঃ যে নীতি অবলম্বন করা হত অর্থ সচিব এ কলভিন ১৮৮৪ সালে সেই নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন—"প্রথমত, ভূ-স্বামী অথবা প্রজা জমির যে উন্নয়ন করেছে তার উপর কর নির্ধারিত হবে না। দ্বিতীয়ত, যেখানে আগেই সঠিক পদ্ধতিতে জমির শ্রেণী বিভাজন হয়েছে সেখানে নতুন ক'রে শ্রেণীবিন্যাস অথবা পুর্নমূল্যায়ণ করা হবে না এবং তৃতীয়ত, বর্তমানে দেয় রাজস্বকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এবং দুটি কি তিনটি সুনির্দিষ্ট কারণেই শুধু রাজস্বের পরিমাণে পরিবর্তন আনা যাবে। চাষের প্রসার, সরকারি উন্নয়ন কার্যের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য বৃদ্ধি—এই কয়টির মধ্যেই সরকার সেই কারণগুলিকে সীমিত রাখতে চেয়েছে।" অবশ্য অর্থসচিব এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে নীতিগুলি অনড় নয় এবং এগুলির প্রযোজ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে বিচার করে দেখা হবে। কোনো কোনো লেখকের মতে, রাজস্ব নির্ধারণ হ'ত আরো বেশি পরীক্ষালব্ধ এবং বাস্তব ভিত্তিতে। এই প্রসঙ্গে বি, এই, ব্যাডেন-পাওয়েলঃ "এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব রেভিনিউ এ্যান্ড ইটস এ্যাডমিনিসেট্রন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া" (অক্সফোর্ড, ১৮৯৪) পৃঃ ৪৮ দ্রঃ।

৩। ১৮৫৬-৫৭ এবং ১৯০১-০২-এর মধ্যে ভূমি-রাজস্ব বেড়েছিল শতকরা প্রায় ৫৬.৬ ভাগ। ১৮৮৮-৮৯-এর এবং ১৯০৫-৬ এর আর্থিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

৪। এর বহু আগে, ১৮৭৯ সালেই, রাণাডে দেখিয়েছিলেন যে, সে সময় কৃষিতে যে মূলধনই লগ্নি হ'ত তা মূলত হ'ত ব্যক্তিগত এবং অনুৎপাদক প্রয়োজনে, কাজেই তা আসলে ছিল কুসীদজীবী মূলধন।

৫। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র-এর প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন—তিনি একটি জমির ক্ষেত্রে রাজস্বের সর্বোচ্চ সীমা মোট উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ করার কথা বলেছিলেন, এটাকে ভূমিরাজস্বের সাধারণ মান করতে বলেননি। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের এই প্রশ্ন উঠেছিল, কারণ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিরা কখনো-কখনো নীট উৎপাদনের হিসেব এমনভাবে করত যার ফলে রাজস্বের পরিমাণ মোট উৎপাদনের-এর পঞ্চমাংশের বেশি

এমনকি কখনও কখনও এক-তৃতীয়াংশে গিয়ে দাঁড়াত। দ্রঃ—"খোলা চিঠি", পৃঃ ৩৯, ৪২, ৫৩ ও ৬৫।

৬। অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, বিতর্ক যখন চলছিল তখন উত্তেজনার মুখে রমেশচন্দ্র যা বলেছিলেন—যাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে কার্জন সব সমালোচনাকে ভোঁতা করার চেষ্টা করেছেন—"খোলা চিঠি"-তে রমেশচন্দ্র তা সামাল দেবার চেষ্টা করেছেন।

৭। উদাহরণ—১৮৯৬ সালে "কেশরী" পত্রিকায় "অশিক্ষিত রায়তদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার এবং কীভাবে তারা সে অধিকার অর্জন করতে পারবে তাদের তা শেখানোর "প্রয়োজনীয়তা" তুলে ধরে তিলক ঘোষণা করেন—নেতাদের দায়িত্ব "জনসাধারণকে বোঝানো যে····তাদের ফসল নষ্ট হলে রাজস্ব দিতে হবে না।" "কেশরীর" ঐ সংখ্যাতেই তিনি আরও লিখেছিলেন—"জনসাধারণকে এটা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি লাঠিগুলির সম্মুখীন হয়েও সংগ্রামে স্থির-সংকল্প থাকেন, তাহলে নেতাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা।"

৮। ১৮৮১ সালে চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে "একমাত্র বিকল্প, যার কাছে অন্যান্য সব সংস্কার কর্মসূচী তাৎপর্যহীন" বলে অভিহিত করে রাণাডে লিখেছিলেন, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না-হ'লে অন্য সব কিছু অকার্যকর, এবং "যেহেতু রাজস্ব সহজেই আদায় করা যায় তার জন্য সরকার এ বিষয়ে বিবেক জলাঞ্জলী দিয়ে ভাবছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ রুটি চাইলে প্রচলিত ব্যবস্থার ক্ষতকে ধামাচাপা দিয়ে উপর-উপর সংস্কারধর্মী আইন প্রণয়ন করে অর্থাৎ রুটির বদলে পাথরের নুড়ি উপহার দিলে—তারা খুশি থাকবে।"

৯। মজার ব্যাপার, কংগ্রেস রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর যে দাবি করেছিল তাকে জমিদার-তোষণ নীতি বলে অভিহিত করে, তাব মাত্র তিন পৃষ্ঠা পরেই রিজ্ বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর থেকে আলাদা "প্রতিটি রায়তের সঙ্গে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার" পক্ষে অনেক কথা লিখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি অন্তত এটা জানতেন যে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" কথাটার সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অর্থ সম্ভব।

১০। লোকনাথনের মতে অবশ্য গোখেল কখনই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমর্থনের ইচ্ছে প্রকাশ করেননি।

১১। প্রসঙ্গত, এই ধরণের প্রস্তাব যে-বছর গৃহীত হয়েছিল—অবশ্য মিশ্র এর যে অর্থ করেছেন, সে অর্থে নয়—সেটা ১৮৮৮ সাল নয়, ১৮৮৯ সাল। ১৮৮৮ সালে বিষয়টি কংগ্রেসের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে মতামতের জন্য প্রেরিত হয়েছিল।

১২। অনুরূপভাবে এইচ, এল, সিং লিখেছেনঃ "কংগ্রেসের নীতি ছিল অনেকটা পরিমানেই জমিদার ঘেঁষা। কংগ্রেস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর সম্প্রসার চেয়েছে জমিদার-দের স্বার্থে, রায়তের বা দেশের স্বার্থে নয়।" এর কারণ ব্যাখ্যা করে লর্ড এলগিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন, বাংলার জমিদাররা ছিল ক্ষমতাশালী এবং "ঐ প্রদেশে যারাই বক্তব্য রাখতেন এবং লিখতেন তাদের সঙ্গে এই জমিদারদের ব্যবসায়িক হৃদ্যতা ছিল।" দ্রঃ—"প্রবলেমস এ্যান্ড পলিসিজ অব ব্রিটিশ ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৮৫-১৮৯৮" (বোম্বাই, ১৯৬৩). পৃঃ ২১৭।

১৩। ১৮৮৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবটির উত্থাপক এরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ১৮৯০ সালের অধিবেশনে জানকীনাথ বসুও একইভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, "আমরা সর্বদাই বোম্বাই ও মাদ্রাস প্রদেশে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কথা বলেছি তা কৃষকমালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত।"

১৪। তিলক মন্তব্য করেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার দরকার মত জমিদার কিংবা গ্রামের মালিক কিংবা রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারেন।

১৫। দত্ত "বাংলায় প্রচলিত ব্যবস্থাকে দেশের অন্যত্রও চালু করার" দাবি করেছেন ভেবে সম্ভবত পি, সি, ঘোষ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। দত্ত কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ চাননি। তিনি এমন ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যাতে রাজস্বের পরিমাণ মোট উৎপাদদের এক ষষ্ঠাংশর, যেটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তাঁর বক্তৃতার পুরো বাক্যটিতে এটা স্পষ্ট হবে, "ভারতের অন্যত্র বাংলার নিয়ম চালু করুন—অন্যান্য প্রদেশেও কৃষকের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্বের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা হ'ক একষষ্ঠাংশ, তাহলেই দুর্ভিক্ষের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।"

১৬। দত্ত এলফিনস্টোনের প্রশংসা করেছেন। কারণ, তিনি গ্রামীন সমাজ, গ্রামীন পঞ্চায়েত ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ঘোর সমর্থক।

১৭। ১৮৮০ সালের ১৬ই মে পুণার জনসভায় এই আবেদনের খসড়া গৃহীত হয়েছিল।

১৮। রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টতই ভুল করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রকৃত চাষী এবং জমিদারের মাঝখানে যে প্রচুর সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল, তা তিনি লক্ষ করেননি। জমিদার হয়ত জমি যে প্রজার অধিকারে রয়েছে তার কাছ থেকে কুড়ি শতাংশের বেশি নিত না। কিন্তু আসলে চাষীকে সম্ভবত মোট উৎপাদনের অনেক বেশি অংশ কর দিতে হ'ত। রায়তওয়ারি অঞ্চলে এটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল।

১৯। এই প্রসঙ্গে বাংলার 'রেন্ট বিল' সম্পর্কে আলোচনা দ্রঃ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৭৪ সালে, অল্প বয়সে, রমেশচন্দ্র দত্ত নিজেই ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর নিন্দা করেছিলেন, কারণ এই ব্যবস্থা চাষীকে দরিদ্র করে দিয়ে চাষীর উপর অত্যাচার চালাতে জমিদারকে সাহায্য করেছে।

১৮৮৮ সালে জি, ভি, যোশি বাংলায় রাজস্বের উচ্চহারের নিন্দা করেছিলেন।

২০। এর পেছনের নৈতিক যুক্তিটি দত্ত এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন—"কে এই জমিদার যিনি খাজনা বাড়ানোর জন্য রায়তের উপর জবরদস্তি চালান? সুরম্য অট্টালিকা শোভিত নগরে তিনি তাঁর প্রাসাদে আরামে বাস করেন। আর ওরা? সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত মাঠে কাজ করে এবং তারপর প্রায়শই সূর্যাস্তের পর সারারাত পাহারা দেয়; মে মাসের প্রচণ্ড দাবদাহে, আগস্টের প্রবল বর্ষণে এবং ডিসেম্বরের শীতে কাজ করে; ওরা জমি চাষ করে, বীজ বপন করে, আগাছা তোলে, এবং তারপর ফসল কাটে। ওদেরকেই কিনা লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে—কেননা, ওরা ওদের অক্লান্ত মেহনতের ফসল আরও বেশি বেশি করে জমিদারের গোলায় তুলে দিতে রাজি নয়। রায়তদের উপর এই অত্যাচার করার ক্ষমতা জমিদাররা পেল কোথা থেকে? কর্মহীন অবকাশভোগীর সত্যিই কি নৈতিক অধিকার আছে দরিদ্র ক্লিষ্ট মানুষকে পীড়ন করায়? যে নৈতিক বিধান একে, সমর্থন করে মানতেই হবে তা অদ্ভুত।"

২১। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই এটা প্রচ্ছন্ন ছিল। কখনও-কখনও প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

২২। দত্ত এই কোম্পানির অন্যতম পরিচালক হেনরি সেন্ট জন টাকার-এর লেখা বই থেকে উদ্ধৃত করেছেন—"এটা অনস্বীকার্য এবং গোপন করাও অসম্ভব, যে যাতে সরকার

জোত জমি থেকে খাজনার আকারে যতটা সম্ভব আদায় করে নিতে পারেন তার জন্যই এই (রায়তয়ারি) ব্যবস্থা।”

২৩। যেমন, আর, সি, দত্ত বিভিন্ন প্রদেশের খাজনা আইনকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং প্রজাদের জন্য আরও বেশি নিরাপত্তা দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে, ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে “পায়ওনিয়র” এ লেখা চিঠিপত্র এবং ১৯০০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এ্যান্টনি ম্যাকডোনেলকে লেখা চিঠি দ্রঃ।

২৪। সরকারি বক্তব্য ছিল—জমিদারি ব্যবস্থায় খাজনার লভ্যাংশ যেত পরজীবী শ্রেণীর পকেটে, আর রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় সেটা পেত সরকার। ভারতীয় জাতীয় নেতারা এই বক্তব্য সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

২৫। “ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে”র দ্বিতীয় খণ্ডে দত্ত মন্তব্য করেছেন ঃ গ্রামীণ সমাজ এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার না থাকায় পাঞ্জাবে একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী দেখা গেছে তা হ'ল “ফাটকাবাজ, স্রফ এবং মহাজন—এরা যে কোনো দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিকৃষ্ট।”

১০

কৃষি—২

১. কৃষি এবং ভূ-স্বামী

কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর রাজস্ব সংগ্রাহকের দাবিই একমাত্র দাবি ছিল না। যে সব জায়গায় জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল – যেমন বঙ্গদেশ, বিহার, ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা এবং বোম্বাই ও পাঞ্জাবের ছোট ছোট কিছু অংশ—সেখানে প্রকৃত কৃষক ছিল জমিদারকে খাজনা-প্রদানকারী প্রজা। জমিদার সেই খাজনা থেকেই সরকারকে ভূমি রাজস্ব দিত। এই সব অঞ্চলে জমিদার এবং প্রকৃত কৃষকের মাঝখানে খাজনাগ্রহণকারী এবং খাজনা-প্রদানকারী মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি রায়তওয়ারি অঞ্চলেও কৃষক-মালিকানার প্রথা ভাঙনের মুখে পড়ে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। কৃষক মালিকেরা ক্রমাগত তাদের জমি হারাচ্ছিল। এবং সেই জমি চলে যাচ্ছিল মহাজন, বেনিয়া প্রভৃতি পেশাধারী শ্রেণীর ও বড় বড় ভূস্বামীর হাতে। অবধারিতভাবে এরা সবাই ছিল, অনুপস্থিত ভূস্বামী। পূর্বেন মালিকরা হয়ে পড়ছিল এদের প্রজা। তাদের চড়া হারে খাজনা দিতে হত। এই ক্রমবর্ধমান খাজনা এবং উচ্ছেদের ঘটনা পল্লী অঞ্চলে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছিল। ফলে, ভূস্বামী-প্রজার সম্পর্ক দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, সরকার গুরুভার খাজনার ফলে বিধ্বস্ত কৃষকদের দুর্ভোগ কিছুটা কমাবার কথা চিন্তা করতে এবং সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি প্রজাস্বত্ব ও খাজনা বিষয়ক আইন পাস করতে বাধ্য হয়। কিন্তু, লক্ষ্যণীয় যে, রায়তওয়ারি অঞ্চলের পত্তনিদারদের সমস্যা এইসব আইনে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হল, এই ব্যাপারে জাতীয় নেতৃত্বের কোনো স্পষ্ট নীতি ছিল না। এমনকি তাঁরা সমস্যাটির প্রতি উপযুক্ত মনোযোগও দেননি। প্রজা-ভূস্বামী সম্বন্ধকে তাঁরা একটা মুখ্য অর্থনৈতিক সমস্যা বলে মনে করেননি এবং রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সমস্যাকে কখনই তুলে ধরেননি। আমাদের আলোচ্য সময়কালের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এ-বিষয়ে বলতে গেলে কোনো বক্তব্যই ছিল না। এই একটি ঘটনা থেকে জাতীয় নেতৃত্ব কৃষক সমস্যাকে কতখানি অবহেলা করতেন তা অনুমান করা যায়।[১]

কিন্তু জীবনীশক্তিতে ভরপুর যে নেতৃত্ব দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল তার পক্ষে এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা বেশিদিন সম্ভব হয়নি। দুটো স্তরে সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা হল- সাধারণ স্তরে এবং বিশেষভাবে। প্রথম স্তরে, তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে মন্তব্যাদির মাধ্যমে সাধারণ প্রতিকারের কথা বলতেন। এতে প্রায়ই অস্পষ্টভাবে রায়তদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ পেত। দ্বিতীয় স্তরে, তাঁরা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব এবং খাজনা সংক্রান্ত আইনের সমালোচনা করেন। এই স্তরে তাঁদের এক একটা সমস্যার আলাদা আলাদা, সুস্পষ্ট সমাধানের কথা বলতে হয়েছে। এবং তার ফলে হয় ভূস্বামীদের নয় প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করতে হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি কখনো-কখনো মানবিকতায় প্রণোদিত হয়ে জমিদারি অঞ্চলের প্রজাদের প্রতি সাধারণভাবে অনুকম্পা দেখাত এবং জমিদারের অত্যাচার, চড়া খাজনা কিংবা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। কখনো সখনো এই প্রতিবাদের ভাষা হ'ত খুবই কড়া। যেমন, ১৮৮২ সালের ৯ই ডিসেম্বর "দি বেঙ্গলী" বড় বড় জমিদারদের অত্যাচারের সমালোচনা করে লিখেছিল — "স্বৈরাচার সর্বদাই ঘৃণ্য—তা সে স্বৈরাচারী সাদা অথবা কালো যে চামড়ার হক, এবং এ দেশেই জন্মাক বা সুদূর পশ্চিম থেকেই আসুক।" ১৮৮২ সালের ২৪শে জুলাই, 'সোম প্রকাশ" রাজস্বসংগ্রহ নীতির নিন্দা করে লিখেছিলঃ "দশ হাজার মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন সম্পদ ফুর্তিতে ভোগ করে মাত্র একটি মানুষ।" এবং তারপরই প্রশ্ন করেছিল—"কোন যুক্তিতে একজনের পরিশ্রমের ফল অন্য একজন ভোগ করবে?" পত্রিকাটির মতে, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামীরা যত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কৃষকেরা তত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।" ১৮৮৪ সালের ১৪ই জুন 'বঙ্গবাসী" গ্রাম্য জমিদারকে বঙ্গদেশের সব চাইতে বড় শত্রু বলে বর্ণনা করেছিল, কেননা "কোনো আইন কানুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না।" এবং ১৮৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর পত্রিকাটি বঙ্গনিবাসী জমিদার এবং তাদের গোমস্তা ও কর্মচারী রায়তদের উপর যে অমানুষিক, অবর্ণনীয় অত্যাচার করত তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। এই প্রসঙ্গে, শিক্ষিত লোকেদের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করে কাগজটি লিখেছিলঃ

"এইটুকুমাত্র কর্তৃত্বের বলে বলীয়ান হয়েই যদি আমাদের এই দেশবাসীরা (জমিদার এবং তাঁদের লোকেরা) এমন নারকীয় অত্যাচার চালায়, তাহলে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বিদেশী জেলা শাসকের সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদের ঝড় তুলি কোন্ যুক্তিতে? ইংরেজদের

অত্যাচারকে আমরা যদি স্ফুলিঙ্গ আখ্যা দিই, রাজা-রাজড়া জমিদারদের অত্যাচার তাহলে দাবানল !"

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যায় উত্তর ভারতের প্রমুখ ব্যঙ্গ-সাপ্তাহিক, "আউধ পাঞ্চ"-এর সম্পাদক ছিলেন উত্তর ভারতের কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুসলিম সমর্থক সাজ্জাদ হুসেন। ঐ সাপ্তাহিকে ১৮৯৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছিল দু'জন খালি-পা অর্ধ-নগ্ন চাষী তাঁদের ভূস্বামীকে পাল্কিতে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, স্থূল ঐ জমিদারের অঙ্গে মণিমুক্তাখচিত গহনা আর স্টার অব ইণ্ডিয়ার চিহ্ন। কার্টুনের শিরোনাম- 'দুর্ভিক্ষের কারণ'। একজন চাষী অন্য চাষীকে বলছে, "ভাইরে, লোকটার ভারে আমাদের তো মারা পড়ার জোগাড়। ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেব ?"

মালাবারে, কে পি করুণাকর মেনন, সম্পাদিত 'কেরালা পত্রিকা' ১৮৯৬ সালের ২১শে মার্চ লিখেছিল, ঘন ঘন মোপলা বিদ্রোহের কারণ ভূস্বামীদের অসহনীয় অত্যাচার থেকে উদ্ভূত দারিদ্র। এই অত্যাচারের হাত থেকে কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মানুষেরই রেহাই নেই। ১৮৯৬ সালের ৪ঠা জুলাই কাগজটি সরকারকে সাবধান করে দিয়ে লেখে, মালিকদের অত্যাচার যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে যে শুধু মোপলা বিদ্রোহই থামানো যাবে না তাই নয়, নায়ারদের বিদ্রোহও শুরু হবে।

কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও জমিদারি প্রথার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। যেমন, ১৮৭০-এর দশকের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে জমিদারি ব্যবস্থাকে প্রচণ্ড আক্রমন করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তরুণ রমেশচন্দ্র দত্ত, মারহাট্টা পত্রিকায় ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। অন্য বহু জাতীয়তাবাদী নেতা এবং "ভারত-সভা" "বেঙ্গল বেণ্ট বিল" নিয়ে বিতর্কের সময় রায়তদের পক্ষ নিয়েছিলেন। আরো পরে, পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁর দুখানি গ্রন্থে—১৮৯৫ সালে প্রকাশিত "দি পভার্টি প্রবলেমস্ ইন ইণ্ডিয়া" এবং ১৯০১ সালে প্রকাশিত "দি কজেজ অব ইণ্ডিয়ান ফেমিনস"-এ—জমিদারি প্রথা এবং জমিদারদের অত্যাচারকেই জনগণের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করেছিলেন। জি. ভি. যোশিও ১৮৯০ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ "দি ইকনমিক সিচুয়েসন ইন ইণ্ডিয়া"তে জমিদারি এবং রায়তওয়ারি উভয় ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দেখান, সারা দেশে জমি পত্তনি ক্রমাগত বাড়ার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী ও পত্তনিদারের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবং একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে অ-কৃষি জাতীয় শিল্পের ক্রমাবলুপ্তির ফলে জমির জন্য প্রতিযোগিতা ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছিল এবং সেই সুযোগে জমির খাজনাও সার্বাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই চড়া খাজনা এবং ভূমিস্বত্বে নিরাপত্তার অভাব জমির

উন্নতির জন্য প্রকৃত কৃষকের সমস্ত উদ্যোগ নষ্ট করেছে। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল—

"কৃষকের অবস্থা এখন এমন যে সে যতই উদ্যম দেখাক অথবা সুবিবেচনার পরিচয় দিক তাতে তার কিছুমাত্র লাভ হবে না। অন্যদিকে, বেপরোয়া হলে তাতে তার কিছু হারাবার নেই, কেননা, তার প্রত্যাশা করার কিছু নেই। সব কিছু ছাপিয়ে একমাত্র চিন্তা যেন মাত্র কয়েকটি বিঘা জমির অধিকারও হারাতে না হয়, সেজন্য যে কোনো খাজনাতেই রাজি হতে হবে, না হলে অনশন। নিজের স্বার্থেও 'এর চাইতে বেশি উদ্যমহীনতা' কল্পনা করা যায় না।"

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত "নোটস্ অন এগ্রিকালচার ইন বম্বে" নামে একটি প্রবন্ধে যোশি বিশদভাবে দেখান, কীভাবে একদিকে জমি পত্তন দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে কৃষকদের আকণ্ঠ ঋণে ডুবে থাকার ফলে' জমিদারি ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে এবং পত্তনিদারের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সখেদে উল্লেখ করেন যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রজাস্বত্বের অধিকার কিংবা প্রজাস্বত্ব আইন বলে কিছু নেই, যার ফলে সেখানে "জমির উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ নেই, এবং অধস্তন প্রজারা চড়া খাজনা বা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে অপারগ।"

নেতাদের অনেকেই প্রজাদের রক্ষাকল্পে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা সুপারিশ করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল অন্যায় খাজনা বৃদ্ধি, চড়া হারে খাজনা আদায়, উচ্ছেদ এবং প্রজার স্বত্বলোপের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার দাবি এবং জমির অধিকার ও অন্যান্য অধিকারকে সম্প্রসারিত ও দৃঢ় করার দাবি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিন প্রধান জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ—বিচারপতি রানাডে, জি ভি যোশি এবং রমেশচন্দ্র দত্ত—সরকার যে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং প্রজার অধিকারকে আরো সুরক্ষিত করার জন্য প্রবল দাবি রাখেন। জি. ভি. যোশি বোম্বাইয়ের রায়তওয়ারি অঞ্চলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত উপ-প্রজাদের রক্ষার জন্যও আইনগত ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

তবে, আমাদের আলোচ্য সময়কালে জমিদারি প্রথা বিলোপের জন্য খুব বেশি দাবি উত্থিত হয়নি। সাধারণভাবে তার কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে এ দাবিও জানানো হয়েছিল। ১৮৮১ সালের ২রা অক্টোবর "ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর" সব জমিদারি কিনে নিয়ে রায়তদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্ত করতে সরকারকে অনুরোধ জানায়। ১৮৮২ সালের ২৪শে জুলাই সোমপ্রকাশ অনুরোধ করে রাশিয়ান সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিশ

বছরের লাভের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়ে জমিদারদের বিদায় করতে। কাগজটি প্রস্তাব করে যে, এর জন্য যে খরচ হবে তা সরকার এবং রায়ত উভয়ে সমান ভাবে বহন করবে। তবে, কখনো কখনো ভারতীয় নেতারা এই দাবি মূলতুবি রেখেছেন। এবং জমিদারি ব্যবস্থা রদ করা যাবে না, এটা ধরে নিয়ে জমিদার এবং রায়তের মধ্যে সরাসরি বন্দোবস্ত দাবি করেছেন।'

১৮৮০ সালের ১২ই জুনের 'বেঙ্গলী' বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করেছিল। "বেঙ্গলী" লেখে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের পিছিয়ে পড়ার কারণ, কেননা, এতে নিশ্চিত লাভের আশ্বাস থাকায় জমিদারেরা শিল্পক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ না ক'রে সেই অর্থ জমিদারিতে খাটানো শ্রেয় মনে করেছেন। এর ঠিক দু বছর বাদে ১৮৮২-র ২৮শে জানুয়ারি, বেঙ্গলী একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে আবার লিখেছিল শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে বোম্বাই এবং বাংলার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা।

নেতারা জমিদার অথবা অন্যান্য ভূস্বামীর হয়ে রায়তদের বিরুদ্ধে বলেছেন এ রকম উদাহরণ তুলনায় খুবই কম। ১৮৮৭ সালের ১৯শে মার্চ 'বাংলার বঙ্গবাসী' পত্রিকা রায়তদের সম্পর্কে আগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দাবি জানিয়েছিল, সরকার যেন পূর্ববঙ্গের কৃষক সংগঠনগুলি ভেঙে দেবার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেয়, এবং কৃষকদের যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয় ন্যায্য খাজনা তাদের দিতেই হবে। ১৮৯৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকাও লিখেছিল, "দুর্ভিক্ষ, কৃষক-বিদ্রোহ এবং অন্যান্য বিপদের হাত থেকে" সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় "জমিদারদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা সুরক্ষিত করা, সেগুলির ধ্বংস সাধন নয়।" এর এক বছর বাদে ১৯০০ সালের, ১২ই জানুয়ারি "পত্রিকা" অনুরোধ জানায় সরকার হয় জমিদারদের প্রতি তাঁদের কঠোর মনোভাব ত্যাগ করুন অথবা রায়তদের কাছ থেকে জমিদাররা যাতে খাজনা আদায় করতে পারে তার সুযোগ ক'রে দিন। দেশের অন্য প্রান্তে, 'কেশরী' ১৮৮১র ১৮ই অক্টোবর, অভিযোগ করেছিল যে বোম্বাইয়ের সাতারায় ও অপর কয়েকটি জেলায় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারিরা "রায়তদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইনামদারদের উপযুক্ত সাহায্য করছেন না।" "মারহাট্টা"ও ১৮৯০-এর ২৭শে জুলাই জমিদার ও ভূস্বামীরা বহুক্ষেত্রে যে দুর্দশায় কাটাচ্ছিল সেজন্য খেদ প্রকাশ করে ক্রমাগত তাদের অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার জন্য সরকারের নিন্দা করেছিল। কাগজটি ভূস্বামীদের "অন্য কোনো কারণে না হলেও অন্তত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে" ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের ভূস্বামীদের। পত্রিকাটির পরামর্শ ছিল, তাঁরা যেন একটা সংগঠন তৈরি করে। ১৯০০ সালের ৯ই ডিসেম্বর, কাগজটি কর আদায়ে

ইনামদারদের সাহায্য করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শ্রেণী হিসাবে ভূস্বামীরা ভালভাবে বেঁচে থাকুন এবং তাঁদের অধিকার অব্যাহত থাকুক, এই সদিচ্ছার মূলে অনেকটাই ছিল এই বিশ্বাস যে অধঃপতিত ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র স্বাভাবিক নেতা ছিলেন এই ভূস্বামীরাই।

আগেই দেখানো হয়েছে, ভূস্বামী প্রজা সম্পর্কের বিষয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা খুবই সামান্য মন্তব্য করেছেন। কৃষি-বিষয়ক এই দিকটির প্রতি তাদের অনাগ্রহই ছিল এর কারণ। এই অনাগ্রহ কৃষকপক্ষ অথবা মালিকপক্ষ অবলম্বন করার জন্য হয়নি। ১৮৮০-১৯০৫ সালের মধ্যে সরকার যে সব প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করেছিল সেগুলি সম্পর্কে নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেও, এর সমর্থন পাওয়া যায়। একমাত্র ১৮৮৫ সালের বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন ছাড়া অন্য কোনো প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে নেতারা বিশেষ আগ্রহ তো দূরের কথা এমন কি ন্যূনতম ঔৎসুক্যও দেখাননি।

২. বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তদের জমিদারের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। এর ফলে বাঙালি রায়তদের যে দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হতে সরকারের ষাট বছরের বেশি লেগেছে। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনেই প্রথম ১২ বছর ধরে চাষ করছে এমন জমির ক্ষেত্রে রায়তকে স্বত্বের অধিকার দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থাও হয় যে, সুনির্দিষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত খাজনা বাড়ানো যাবে না। কিন্তু এই আইন এবং ১৮৬৯ সালের সংশোধনীর পরও জমিদার ও প্রজার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাদ মিটল না। রায়তেরা যাতে জমির অধিকার না পায় এবং যাতে ইচ্ছামত খাজনা বাড়ানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভূস্বামীরা আগের মতোই উচ্ছেদ, ঘন ঘন বদলি, বলপ্রয়োগ, লাঞ্ছনা, অবৈধভাবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, জোর ক'রে টাকা আদায় ইত্যাদি চালিয়ে যেতে লাগলেন। একই সঙ্গে তারা এ অভিযোগও করতে লাগলেন যে, ১৮৫৯ এবং ১৮৬৯ সালের খাজনা আইনের ফলে তাদের পক্ষে খাজনা আদায় দুরূহ হয়ে উঠেছে এবং ন্যায্য কারণেও খাজনা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ১৮৭২-৭৬ সালে বাংলায় বেশ বড় রকমের জমিদার-বিরোধী দাঙ্গা দেখা দেয়। অবস্থা যে কোনো মুহূর্তে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বিহারে রায়তদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ, জমিদারদের সঙ্গে রায়তের সম্পর্কও ছিল একই রকম তিক্ততাপূর্ণ। ১৮৭৬ সালের পর থেকে বাংলা সরকার এবং ভারত সরকার চেষ্টা শুরু করে পতনোন্মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর অবয়বটা আইন পাস করে টিকিয়ে

রাখতে এবং এই প্রেসিডেন্সিকে সম্ভাব্য কৃষিবিপ্লবের হাত থেকে বাঁচাতে। কারণ, তা নাহলে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষে গুরুতর রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। জমিদার ও রায়তের মধ্যে একটা সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল একমাত্র সমাধান, কিন্তু কীভাবে সেটা কার্যে রূপায়িত করা যাবে, সে বিষয়ে সরকারি আমলাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, এবং ফলত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা চলছিল। এই ব্যাপারে যে কোনো প্রচেষ্টারই প্রাথমিক লক্ষ্য হতে পারত স্থায়ী কৃষকদের ভূমি-স্বত্বের সম্প্রসারণ, অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করা, এবং জমিতে স্থায়ীভাবে বাস করুক বা না-করুক সমস্ত রায়তের জমিতে অধিকার চিরস্থায়ী করতে না-পারলেও অন্তত সুরক্ষিত করা।

জমিদার এবং অধস্তন ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য খাজনা আদায়ের পর্যাপ্ত সুযোগ দান; তাঁদের ন্যায়সঙ্গত খাজনা ও উৎপন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির একটা ন্যায্য অংশ পাওয়ার আশ্বাস দান; এবং কৃষি-সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের যাতে দ্রুত সঙ্গতভাবে নিষ্পত্তি করা যায় সেজন্যে বিধি নিয়ম প্রণয়ন করা। কিন্তু দেখা গেল যে এমন একটি প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন—যেটি উপরের সব কটি সংস্কার রূপায়িত করে প্রজাদের খুশি করবে অথচ জমিদারদেরও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে না—শুধু দুরূহই নয়, রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।

১৮৯৭ সালে "দি রেন্ট ল কমিসন" বাংলার এই সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেছিল। ১৮৮০ সালে কমিসন তাদের রিপোর্ট এবং একটি খসড়া বিলের প্রস্তাব পেশ করে। সেটি নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে প্রচুর আলোচনা হয়। এর পরের বছর ভারত সরকারের কাছে একটি খসড়া বিল প্রেরিত হয়। বিলটি "রেন্ট ল কমিসনের" প্রস্তাবিত বিলের আদলে তৈরি হলেও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে পার্থক্য ছিল। এই ব্যাপারে মনস্থির করতে এবং ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভারত সরকার প্রায় দু'বছর কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ সালে "ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে" একটি স্বতন্ত্র সরকারি বিল পেশ করা হল। ১৮৮৩ সালের এই বিলে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল—(১) যে সব রায়ত একই গ্রামে বা জমিদারিতে ১২ বছর ধরে কোনো জমি ভোগ করছেন তাদের সেই জমিতে দখলি-স্বত্ব প্রদান করা হবে, এমন কি ঐ বারো বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময় তারা ভিন্ন জমি চাষ করলেও। জমির উপর রায়তের দখলের অধিকার অপ্রমাণিত করার দায়িত্ব হবে জমিদারের। (২) এই দখলি-স্বত্ব হবে বংশানুক্রমিক এবং জমিদারের অগ্র-ক্রয়াধিকার সাপেক্ষে হস্তান্তরযোগ্য; দখলি স্বত্বাধিকারী রায়ত প্রয়োজনে অবাধে জমি পত্তনি দিতে পারবে। (৩) খাজনা সম্বন্ধে বলা হল, দখলি স্বত্বাধিকারী রায়ত যে খাজনা দেবে তা কোনো সময়েই মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের বেশি হবে না, কোনো ক্ষেত্রেই একবারে খাজনার পরিমাণ দ্বিগুণ-

করা যাবে না, অন্তত দশ বছরের ব্যবধানে ছাড়া খাজনা বাড়ানো যাবে না, এবং দখলি-স্বত্ব নেই এমন রায়তের ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ মোট উৎপাদনের ৩/১৬ ভাগের বেশি হবে না। (৪) কোনো দখলি-স্বত্বহীন রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৫) জমিদারদের প্রধান অভিযোগ মেটাবার জন্য খাজনা সম্পর্কে মামলার ব্যাপারে সরল ও সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা হবে: শুধু তাই নয়; আদালতের মাধ্যমে শস্য ক্রোক ও বিক্রির ব্যবস্থা হবে।

প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা ঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য দেওয়ানি আদালত এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেওয়া হল।

জমিদারেরা ১৮৮৩ সালের এই প্রজাস্বত্ব বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে সরকার কিছু অদল-বদল করে জমিদারদের শান্ত করার জন্য একটা সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটিতে জমিদার পক্ষের দু'জন প্রধান মুখপাত্র ছিলেন—কৃষ্ণদাস পাল (যাঁর মৃত্যুর পর প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মনোনীত হন) এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। কমিটি রায়তদের অনুকূলে যে সব ব্যবস্থার কথা ছিল সেগুলিকে বাতিল করে বিলটিকে নির্বীজ করে দিল। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে সংশোধিত আকারে আইন পাস হল। এই প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তের দখলি-স্বত্বের সুযোগকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৩-র বিলে যেখানে একই জমিদারির অন্তর্গত জমি বারো বছর ভোগ করলেই দখলি-স্বত্বের কথা বলা ছিল, সেখানে ঠিক হল, শুধু একটি গ্রামেই জমি ভোগ করলে এই স্বত্ব জন্মাবে। প্রস্তাবিত অবাধ হস্তান্তরের সুযোগ বাতিল হল। তাছাড়া, ১৮৮৩ সালের বিলে দখলি স্বত্বাধিকারী এবং অধিকারী নয় এমন সব রায়তের ক্ষেত্রেই খাজনাবৃদ্ধির যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তাও বাতিল হল। দখলি স্বত্ব নেই এমন রায়তকে উচ্ছেদ করতে হলে যে ক্ষতিপূরণ দেবার কথা হয়েছিল তাও আর থাকল না। অর্থাৎ ১৮৮৩-র বিলে রায়তদের স্বার্থানুকূলে যে চারটি বিধান ছিল তার মধ্যে তিনটি পুরোপুরি বাতিল হল এবং দখলি-স্বত্ব সংক্রান্ত ধারাটিকে অনেকটা তরল করে ফেলা হল। বিপরীত দিকে, এই সংশোধনের ফলে দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়তের খাজনা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছিল। আদালতের বাইরে চুক্তির ফলে সেখানে টাকায় ছ আনা বাড়ানো যেত সেখানে এই বৃদ্ধির হার টাকায় এক আনা ধার্য হল। কিন্তু ১৮৮৫ সালের এই প্রজাস্বত্ব আইন ভূমির দখলি-স্বত্বাধিকারী রায়তের অধীন প্রজার সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়নি। আইনের সমর্থকরা দাবি করলেন, এই আইনে জমিদারদের বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, 'কিন্তু রায়তের মর্যাদা, তার অধিকৃত জমির ভোগ দখল ক্ষমতা, জবরদস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, এ-সব কিছুই আইনটির চূড়ান্ত রূপে অনেক বেশি পরিমাণে সুরক্ষিত হয়েছে।'"

তাদের মতে, "আইনের সাফল্যের সব চাইতে বড় প্রমাণ ছিল এটাই যে "সমস্ত শ্রেণীর মানুষই ভালো মনে আইনের মূল বক্তব্য মেনে নিয়েছেন।"

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮৮৩ সালে একটি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন: "সব সময়েই এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে যে জমিদাররা প্রস্তাবিত আইনের সব সুযোগ ভোগ করলেও রায়তদের যে সব সুবিধে দেওয়া হয় তা বাতিল হয়ে যায়।" অনেকেরই মতে, তাঁর এই আশঙ্কা যে ধ্রুব সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই জমিদারেরা সেই প্রজাস্বত্ব আইনের প্রবল বিরোধিতা করেছেন যাতে রায়তের দখলি-স্বত্ব সম্প্রসারণও সেই অধিকারকে হস্তান্তরযোগ্য করে তোলার কথা বলা হয়েছে এবং জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি ও প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা খর্ব করতে চাওয়া হয়েছে। তাদের যুক্তি ছিল: এ ধরণের যে কোনো আইন তাদের মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বহুকালের কায়েমি অধিকারের অবসান ঘটাবে, এবং এই আইন ১৭৯৩ সালের চুক্তি বিরোধী। শুধু তাই নয়, সরকার যে ধরণের আইনের কথা ভেবেছেন তাতে রায়তরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কেননা এর ফলে মামলা-মোকদ্দমা বাড়বে আর জমিতে উপ-প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে, ভারত-সভা, বাংলার তরুণ জাতীয়তাবাদীদের উদীয়মান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের একটা বড় অংশ রায়তদের 'অনুকূলে' মত প্রকাশ করেছিল। তাঁরা জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার সমর্থন করেন এবং রায়তের স্বার্থে এ-রকম হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এঁরা ১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে আনা বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব বিলের খসড়ার প্রতি সাধারণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন যদিও তাঁদের অনেকেরই মনে হয়েছে, এই সব বিলে রায়তের স্বার্থে এমন কিছু করা হয়নি। তাছাড়া, এঁরা জমিদারদের বিক্ষোভের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এই তরুণতর এবং প্রাগ্রসর অংশ সরকারি আইন প্রণয়নের প্রতি সমর্থন জানিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেননি, তাদের অনেকেই প্রবল উৎসাহ সহকারে রায়তদের পক্ষ নিয়ে প্রচারে নেমেছিলেন এবং বাংলার শিক্ষিত মানুষ রাজনৈতিক সমিতি-গুলি এবং নেতাদেরকে মূক কৃষককুলের হয়ে ভাষা জোগাবার জন্য এবং জমিদারদের বিক্ষোভের মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেমন, ১৮৮০ সালে ১৮ই ডিসেম্বর বেঙ্গলি লিখেছিল:

> "আমাদের এমন সব সংগঠন আছে যারা এই দেশের মূক কৃষকদের হয়ে তাদের কথা বলতে চায়। আমরা জানি না যে, যে সুযোগ বর্তমানে এসেছে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তার চাইতে বেশি কর্তব্যপরায়ণতা এবং দেশাত্মবোধ প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা। সত্যি সত্যি এইটাই এমন সময় যখন এই সব সংগঠনকে অবশ্যই তাদের কার্যকারিতার এবং

অস্তিত্বেরও প্রমাণ দিতে হবে।…বাংলার মূঢ় কৃষককুল এবং দেশের এবং দেশের কোটি কোটি অজ্ঞ জনসাধারণ তাঁদের চারপাশে যা ঘটছে তার খবর রাখেন না।…এঁদের যাঁরা শুভার্থী তাঁদেরই এখন এই সব মুখে ভাষা জোগাতে হবে। তাদের হয়ে বলতে হবে, এবং তাঁদের হয়ে কাজ করতে হবে। অলংকার সমৃদ্ধ বড় বড় কথার যুগ আর নেই। যাঁরা একনিষ্ঠ প্রকৃতির, রায়তদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল, এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করতে ব্যগ্র, তাঁরা এখন জেলায় জেলায় ঘুরে জনসভা আহ্বান করুন এবং রায়তদের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করুন। যিনি এইভাবে দীন কৃষকের দীন কুটিরে গিয়ে তার সেবা করবেন তিনি সত্যি-সত্যিই বৃহত্তর অর্থে দেশের সেবা করবেন।"

১৮৮০ সালের ৩রা জানুয়ারি "বেঙ্গলি" রায়তদের মুখপাত্র বলে দাবি করেছিল। ভারত-সভাও রায়তদের দাবি দাওয়া এবং অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করার "পবিত্র কর্তব্যে" এগিয়ে এসেছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিরাও রায়তদের সংগঠিত করে তাদের নিজেদের দাবি দাওয়ার আন্দোলনে সমবেত করবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সভার প্রতিনিধিরা এবং রায়তদের অন্যান্য সমর্থকেরা বাংলার পল্লী অঞ্চলে গিয়ে ১৮৮০, ১৮৮১ এবং ১৮৮৫ সালে অসংখ্য কৃষক সমাবেশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করে। কোনো কোনো সমাবেশে ১০ থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত রায়ত অংশ নিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন বাগ্মীরা ভাষণ দিতেন। বহু জায়গায় খাজনাদাতাদের ইউনিয়ন এবং রায়তদের ইউনিয়নও সংগঠিত হয়েছিল। ভারতসভা চেষ্টা করেছিল এই সব ইউনিয়নকে নিজের শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করতে এবং সভার রাজনৈতিক কার্যকলাপ পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে।

১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল দেশের অন্যান্য অংশেরও বহু প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতার সমর্থন পেয়েছিল। "মারহাট্টা" পত্রিকায় ১৮৮৩ সালে বালগঙ্গাধর তিলক অথবা জি. জি আগরকরের লেখা যে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো সম্ভব যে সে সময় ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের সর্বস্তরে কৃষি-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মৌলিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮৮৩র ১৪ই অক্টোবর, এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বিলটিকে "গভীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং আলোকপ্রাপ্ত মানবপ্রেম থেকে উদ্ভূত এক বিরাট পদক্ষেপ" বলে প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, "জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সমবন্টন-সুদূর ভবিষ্যতে-

হলেও বিকাশশীল দুনিয়া একদিন যা আয়ত্তে আনবে—এটি তার সামান্য সূত্রপাত মাত্র।" সরকারকে তার সঠিক পদক্ষেপে অবিচল থাকতে পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকীয়টি বলে : "স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল অবশ্যই একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে, কিন্তু যাঁরা তাদের ক্ষমতা, বিত্ত ও প্রতিপত্তি খোয়াবার মুখে তাঁদের ভীতি-প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করা কোনো দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের পক্ষে উচিত নয়"। সম্পাদকীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জমিদারেরা যদি "সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই তাঁদের মালিকানার অধিকার ভোগ করে আসেন" তাহলেও "সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সে অধিকার পরিমার্জিত করতে হবে"। সরকার জমিদারদের কায়েমি অধিকার ততদিনই রক্ষা করে যেতে বাধ্য যতদিন সেটা সমাজের সাধারণ মঙ্গল-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—"কিন্তু সামাজিক মঙ্গল বিপন্ন হলে সেই পবিত্র কর্তব্যে পরিবর্তন অবধারিত…সময় ও পরিস্থিতি অনুকূল হলেই সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেটা কেউ পছন্দ করুক আর নাই করুক।" ১৮৮৩ সালের ২১শে অক্টোবর "মারহাট্টা" জমিদারদের আপত্তি নিয়ে আলোচনা করে। জমিদারদের বক্তব্য ছিল প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণয়ন করার সময় তখনো আসেনি। এই বক্তব্যের জবাবে মারহাট্টা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, "যাদের হারানোর সম্ভাবনা তারা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না যে এবার তাদের কিছু কিছু ছাড়তে হবে।" সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষকদের দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেন—

> "সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে, দাসত্ব করবে, আর অন্যরা সমস্ত রকম কায়িক শ্রম থেকে বিরত থেকে শুধু আরাম করবে —আদিতে এ ব্যবস্থার মূলে যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা রাজকার্যে দক্ষতা প্রদর্শন ইত্যাদি যে কারণই থাকুক না কেন, এটা এখন স্পষ্ট যে বর্তমান সভ্যতার গতি-প্রকৃতি এবং ক্রমবর্ধমান সাম্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই অসম এবং অন্যায় সম্পর্ক আর বেশিদিন চলবে না। আজ হ'ক কাল হ'ক, পুনর্বিন্যাসের দিন একদিন না একদিন আসবেই, এবং কোনোরকম অনুযোগ অভিযোগ ছাড়াই আমাদের তা মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

লেখক ঘোষণা করলেন যদি ব্যাপারটা তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়া হত তাহলে তিনি এমন কড়া ব্যবস্থা নিতেন যার ফলে জমিদারেরা তাদের রায়তদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হতেন। ১৮৮৩ সালে ১৮ই নভেম্বর, "মারহাট্টা" নৈতিক প্রশ্ন তুলে জানিয়েছিল যে, বিল নিয়ে বিতর্কের মূলে রয়েছে যে প্রশ্ন, তা হ'ল, "অলস, ব্যভিচারী যে ক্ষুদ্র শ্রেণী অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করে আর দুহাতে ওড়ায়, অন্যরা না খেতে পেয়ে মরল কি ঠাণ্ডায় মারা গেল, তা নিয়ে যাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, আমরা কি তাদেরই চাই?"

১৮৮৪-এর ৬ই জানুয়ারী, কাগজটি জমিদারদের এই বলে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যে, যদিও তাদের "বিত্ত, এবং তারই ফলে প্রভাব", রয়েছে, আর রায়তেরা "দরিদ্র, দুর্বল মূক", তথাপি চিরদিন রায়তেরা এ রকম থাকবে না। জমিদারেরা যদি সময় থাকতে তাদের দাবি মেনে না নেয় তাহলে "পতন যখন হবে তখন সেটা হবে ভয়ানক, এবং সমগ্র জমিদার শ্রেণীকে ধ্বংস করে দেবে।" একই রকম জমিদার-বিরোধী এবং প্রজা-পক্ষীয় মনোভাব প্রকাশ করেছিল ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর ১৮৮৩ সালের ২৫শে মার্চ এবং "নেটিভ ওপিনিয়ন" ১৮৮৩ সালের ২৫শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল। এছাড়া বাইরের আরো কয়েকটি কাগজও বিলের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিচারপতি রাণাডে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ণের বিরোধিতা করলেও (যার কারণ আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি), রায়তদের সাহায্যার্থে প্রতিষেধমূলক আইনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং ১৭৯৩ সালের রেগুলেসন সত্ত্বেও সরকারের যে এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার আছে তা সমর্থন করেছিলেন। এটাও উল্লেখ্য যে, সরকারি আমলা হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তও প্রজাস্বত্ব অধিকার সম্প্রসারণের ব্যাপারে আশলি ইডেনের প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু বঙ্গদেশ এবং বিহারের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একাংশ জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করে। এরা ১৮৮১ এবং ১৮৮৩ সালের প্রজাস্বত্ব বিলেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতা কখনো-কখনো প্রকাশ্যেই করা হয়েছে। "অমৃত বাজার পত্রিকা" এবং তার বাংলা প্রতিরূপ "আনন্দবাজার পত্রিকা" সাধারণভাবেই প্রজাস্বত্ব আইনের বিরোধিতা করেছিল, তবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কখনো কখনো তারা পিতৃসুলভ যুক্তি—যা আসলে জমিদারদেরই পক্ষে যেত—দেখিয়ে বলেছে যে, যে কোনো রকম আইনের হস্তক্ষেপই জমিদার এবং রায়তদের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সঙ্গতিপূর্ণ সুসম্পর্ক নষ্ট করবে। যেমন, ১৮৮৫ সালের ৮ই জানুয়ারি অমৃত বাজার পত্রিকা অনেক ইতস্তত করে এবং ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছিল :

> "জমিদার এবং রায়তদের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের নীতি নিম্নরূপ। রায়তদের জমির অধিকার স্পষ্ট ও সন্তোষজনক ভাবে নিরূপিত হ'ক, যাতে অনধিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তার অধিকার সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা প্রয়োজন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যুগসঞ্চিত যে স্নেহ ভালবাসার ও মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান সেটা যেন নির্মমভাবে মুছে ফেলা না হয়। সংক্ষেপে, এমন ব্যবস্থা করা হ'ক, যাতে জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে না পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা হ'ক যে, প্রজারা যেন জমিদারদের বিরুদ্ধে যেতে এবং সামাজিক শোভনতা ভঙ্গ করতে

উৎসাহ না পায়। একশ্রেণীর কর্তব্য যেমন অন্যদের ভালবাসা, অন্যদেরও তেমনি কর্তব্য হবে তাদের সম্মান ক'রে চলা।"[৭]

কখনো কখনো কাগজগুলি এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে, বাংলার জমিদারদের উপর আঘাতের অর্থ দেশের একমাত্র নেতৃস্থানীয় ও সম্পন্ন শ্রেণীর উপর আঘাত হানা। তবে, আসলে, এদের বিরোধিতার মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করেছে, তা' হ'ল, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় "জমিদার এবং কৃষকের মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের অর্থাৎ মধ্যবর্তী প্রজা বা ভূস্বামীদের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষা" করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষনীয় যে, জমিদাররা যখন এলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ইংরেজদের সর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তখন "অমৃতবাজার পত্রিকা এবং আরো কয়েকটি জমিদার-ঘেঁষা জাতীয় সংবাদপত্র অন্য জমিদার-বিরোধী পত্র পত্রিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ধিক্কার জানায় এবং তাদের এই চেষ্টাকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করে। আসলে প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ব আইনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা এবং নেতাদের সব যুক্তিই নির্ভর করেছে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, অথবা রায়ত, কাকে তাঁরা সমর্থন করেছেন, তার উপর—

জমিদারপক্ষীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রাদি প্রস্তাবের যে সব ধারার বিরোধিতা করেছিল তার মধ্যে ছিল দখলি সত্বের সম্প্রসারণ, ঐ স্বত্বের হস্তান্তর যোগ্যতা, খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিধিনিষেধ, এবং দখলি-স্বত্ব নেই এমন রায়তের উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ। খাজনা নির্দিষ্ট করা হ'লে, তার ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর দাবিও করা হয়েছিল।

কয়েকটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সচেতনভাবেই তালুকদার জোতদার ইত্যাদির মত মধ্যস্বত্বভোগীর স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, অমৃতবাজার পত্রিকা খোলাখুলিভাবেই মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের স্বীকৃতিদান এবং তাদের অধিকার সম্প্রসারিত করার কথা বলেছিল। পত্রিকায় ভাষায়, এরাই ছিলেন "বঙ্গীয় সমাজের অস্থিমজ্জা"। আনন্দবাজার লিখেছিল, সরকার রায়তদের যেসব অধিকার দেবার প্রস্তাব করেছিলেন সেগুলি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দিলে আরো ভালো হতো, কারণ জমিদার ও রায়ত উভয়ের মধ্যেই যে দোষত্রুটি দেখা যায় এরা তার থেকে মুক্ত, মানুষ হিসাবেও জমিদারদের থেকে ভালো, এবং রায়তদের তুলনায় অনেক বেশি ও প্রত্যক্ষভাবে জমির যত্ন নেবেন। এরা সাধারণ রায়তের চাইতে বেশি সঙ্গতি-সম্পন্ন এবং শিক্ষিতও, এবং সেই কারণেই জমির যত্ন নিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে বেশি পারদর্শী। শুধু-তাই নয়, এই মধ্যস্বত্ব ভোগীরা জমিদারের অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে, আবার এদের দ্বারা রায়তের উপর অত্যাচারের ভয়ও ছিল না, কেননা এরা রায়তের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখে, পাইক পেয়াদা, নায়েব, দেওয়ান

ইত্যাদির মাধ্যমে নয়। এই কারণেই আনন্দবাজার ১৮৮৩ সালের প্রজাস্বত্ব বিল মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ-বিরোধী, এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে বিলটির বিরোধিতা করে। আনন্দবাজারের আর একটি যুক্তি ছিল এই যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা ছিল বঙ্গদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী, কেননা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই—ছাত্র। আইনজীবি, করণিক, ডাক বা পুলিশ বিভাগের কর্মীরা—এই শ্রেণী থেকেই আসত। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ছিল এই শ্রেণী। ১৮৮৩ সালে ১৭ই মার্চ, বেঙ্গলিও "দেশীয় সমাজের মেরুদণ্ড"-স্বরূপ এই শ্রেণীটিকে শক্তিশালী করার পক্ষে বলেছিল, যদিও কাগজটির মতে প্রজাস্বত্ব বিলে সেটা হয়েছে। একইভাবে "বঙ্গবাসী" "নব বিভাকর" "ভারত মিহির" এবং "সাধারণী"ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার সম্প্রসারণের পক্ষে মত দিয়েছিল।

যে নেতারা রায়তের পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁরা প্রজাস্বত্ব বিলের যে সব ধারায় রায়তের অধিকার সম্প্রসারণ করতে চাওয়া হয়েছিল সেগুলিকে সমর্থন করেছেন। এবং সেইসব অধিকারকে আরো দৃঢ় করার আবেদন জানিয়েছেন; যে সব ধারা রায়তের স্বার্থ-বিরোধী মনে হয়েছে, সেগুলির সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, যেসব ধারা রায়তের দখলি-স্বত্বকে ব্যাপক ও স্থায়ী ভিত্তি দিতে চেয়েছিল, তাঁরা সেগুলি সমর্থন করেছিলেন এবং আরো বেশি অধিকার দাবি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দখলি-সত্বকে জন্মগত এবং হস্তান্তর-যোগ্য করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৯] তৃতীয়ত, তাঁরা জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর প্রস্তাবিত বাধানিষেধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের অনেকেরই মনে হয়েছে এই বাধানিষেধ যথেষ্ট ছিল না এবং খাজনা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমাও বড় বেশি উচুতে বাধা হয়েছিল। কেউ-কেউ দাবি করেছিলেন, জমির উন্নতিসাধনে যেখানে জমিদারের কোনো অবদান নেই, সেখানে এই বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া অনুচিত। কেউ-কেউ আবার এমন দাবিও করেছেন যে, জমিদার এবং রায়তের মধ্যে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক।[১০] চতুর্থত, স্বত্বহীন রায়তকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের সমর্থন ছিল। নেতাদের কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে খাজনা ও খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে স্বত্বভোগী ও স্বত্বহীন রায়তের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা চলবে না। পঞ্চমত, তাঁরা বুঝেছিলেন জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা আদায়ে সুবিধা ক'রে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হলেও তাদের ফসল বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা চলতে দেওয়া যায় না, কেননা সেটা অত্যাচার চালানোর একটা জবরদস্ত হাতিয়ার হবে।

জাতীয় নেতৃত্বের এই অংশ ১৮৮৩ সালের প্রজাস্বত্ত বিলের বিশেষ একটি দিক সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক।

তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, জমির উপ-মালিকানার প্রসার রোধ অথবা স্বত্বভোগী রায়তের উপ-প্রজাদের রক্ষার ব্যাপারে বিলে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পল্লী বাংলায় ঘটনাপ্রবাহ পরবর্তীকালে যেদিকে মোড় নিয়েছিল,[১১] তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমালোচনার একটা অতিরিক্ত ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, এবং সেজন্য আমরা নিচে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

এই নেতারা দেখিয়েছিলেন যে, আসল কৃষকের সুরক্ষার উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ১৮৮৩ সালের বিলের বিভিন্ন ধারা—যেমন ভূমিস্বত্ব অধিকারের সম্প্রসারণ, এই অধিকারকে হস্তান্তর-যোগ্য করা, জমি লিজ দেওয়া এবং সেই সঙ্গে 'রায়ত' শব্দটির অ-যথার্থ সংজ্ঞানির্দেশ, ইত্যাদির ফলে মধ্যবর্তী শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে, এবং চরিত্রগতভাবে মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা জমিদারদের তুলনায় বেশি অত্যাচারী এবং চড়া-খাজনা আদায়কারী হওয়ায়, প্রকৃত কৃষকের বিশালতম অংশ প্রকৃতপক্ষে অধিকার-বিহীন এবং আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম অধস্তন রায়ত হয়েই থাকবেন। এই কারণে তাঁরা দাবি করে, এই নতুন শ্রেণীর বিকাশ রোধ করতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কীভাবে সেটা করা সম্ভব? এই প্রসঙ্গে লক্ষনীয় যে, জমিদারেরা ভূমিস্বত্ব হস্তান্তর ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে এর ফলে জমি মহাজন-মধ্যশ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা এখানে যে নেতৃগোষ্ঠীর কথা বলছি তারা এর বিরোধিতা করেছিলেন, জমিদারদের দৃষ্টিকোন থেকে নয়, রায়তদের দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁরা জমিদারদের যুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ভূমিস্বত্ব হস্তান্তর সমর্থন করে এই কারণে যে, এর দ্বারা রায়তেরা উপকৃত হবে। একই সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর বিকাশে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে এবং উপ-প্রজা সৃষ্টিতে উৎসাহ না-দেবার জন্য তাঁরা অন্যান্য কয়েকটি বিধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যা ছিল একাধারে রায়তদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপক, জমিদার-বিরোধী, মধ্যশ্রেণী-বিরোধী এবং মহাজন-বিরোধী। যে প্রতিবিধানটি তাঁদের সব চাইতে বেশি মনঃপুত ছিল তা হ'ল: প্রকৃত চাষীর ভূমিস্বত্ব থাকা উচিত, এবং ঐ অধিকার প্রকৃত কৃষককে দিতে হবে, নিছক কৃষক নামধারীকে নয়। যখনই এই স্বত্বের অধিকারী তাঁর জমির পুরোটা বা তার অংশ বিশেষ অন্য কাউকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তনি দেবেন, তাকে সেই অংশের স্বত্ব খোয়াতে হবে, এবং পত্তনিদার সেই অধিকার পাবেন।[১২] ১৮৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর "সঞ্জীবনী" এবং ১২ নভেম্বর "নববিভাকর" আইন করে পত্তনি-প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিল। শেষোক্ত কাগজ প্রকৃত রায়তের সংজ্ঞা-নির্ণয় করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিল: "এই নিয়ম কি আরো ভাল না যে যাঁরা নিজের হাতে জমি চাষ করবেন না নিজেদের লোক দিয়েও করাবেন না, অথবা চাষের লাভ বা ক্ষতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবেন না, তাঁদের রায়ত ব'লেই ধরা হবে না,

এবং সেই কারণে তাঁরা ভূমিস্বত্বের অধিকারী হবেন না ?” জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেবার আধুনিক মতের সূচনা করে বেঙ্গলি ১৮৮৩ সালের ১৩ই মার্চ সুপারিশ করেছিল, “একজন রায়ত নিজের সামর্থ অনুযায়ী যতখানি জমি সুষ্ঠুভাবে এবং নিয়মিতভাবে চাষ করতে পারবে তার চাইতে বেশি জমি তার অধিকারে রাখতে দেওয়া উচিত নয়।” সবশেষে কোনো কোনো সংবাদপত্র এ-প্রস্তাবও করেছিল যে, ভূমির অধিকারী রায়ত এবং তাঁর অধস্তন রায়তের জমির খাজনার মধ্যে তফাৎ এত কম রাখা হ'ক যাতে অধিকারী রায়তের কাছে তার জমি লিজ দেওয়া লাভজনক ব'লে বিবেচিত না হয়।

১৮৮৩ সালের প্রজাস্বত্ব বিলের তিনটি প্রধান নীতি - ভূমিস্বত্বের নিশ্চয়তা, ন্যায্য খাজনা এবং অবাধ বিক্রয়ের অধিকার—১৮৮৪ সালের সিলেক্ট কমিটি এবং ভারত সরকার দ্বারা দারুণভাবে সংকুচিত হ'লে রায়তপক্ষীয় জাতীয় নেতারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এবং জমিদারদের স্বার্থে বিলে সংশোধন করার অভিযোগ এনেছিলেন। বিশেষ ক'রে ভূমিস্বত্ব লাভের অধিকার, সেই অধিকার অনুসারে হস্তান্তরের ক্ষমতার তরলীকরণ, খাজনাবৃদ্ধির উপর সীমা আরোপ, এবং উচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরনদানের প্রস্তাব বাতিল করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকে এমনকি সংশোধিত বিলের আলোচনারও বিরোধিতা করলেন। এবং এই যুক্তিতে বিল স্থগিত রাখার দাবি জানালেন যে, রায়তদের দিক থেকে বিলটি শুধু অসন্তোষজনকই নয়, তাঁদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারকও। শেষ দিকে অবশ্য রায়ত-পক্ষীয় নেতারা এই ভেবে বিলের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন যে একেবারে কিছু না পাওয়ার চাইতে কিছু পাওয়া ভাল। তাছাড়া, তাঁদের অনেকেই ১৮৮৫ সালের ৫ই জুলাই-এর সাধারণীর ভাষায়, উপলব্ধি করেছিলেন যে, “যদিও প্রজাস্বত্ব আইন সন্তোষজনক নয়, তবু এর অন্তর্নিহিত নীতিটি রায়তদের পক্ষে অনুকূল এবং এর উপর ভিত্তি ক'রে ভবিষ্যতে নূতন নূতন অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করা যাবে।” কিন্তু, এটা লক্ষণীয় —এবং সম্ভবতঃ বিস্ময়করও—যে, ১৮৮৫ সাল থেকে পরবর্তী বিশ বৎসরে, আমাদের বর্তমান আলোচনার সময়কালের মধ্যে, বঙ্গদেশে সে রকম কোনো আন্দোলনই গড়ে ওঠেনি। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসাও ঠিক হবে যে ভারত সরকার যদি বঙ্গদেশ এবং বিহারের জমিদারদের কাছে ১৮৮৫ সালে হার মেনে থাকেন, তাহলে সেটা করেছেন জমিদারদের চাপের ফলে, উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে নয়। বঙ্গদেশের উদীয়মান জাতীয় নেতৃত্বের প্রধান অংশের বিরোধিতার প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এটা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে, নেতাদের একাংশ সরকারি আমলাদের তুলনায় একদিক থেকে অনেক বেশি প্রাগ্রসর এবং দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। যে সময় আমলাদের অনেকেই

জমি পত্তনিকে (যাদের অন্য কোনোভাবে কাজে লাগানো যাবে না) গ্রামাঞ্চলের, পক্ষে কবচ-কুণ্ডল ব'লে ভাবতে চেয়েছেন, অথবা খুব বেশি হলে অনিবার্য অভিশাপ ব'লে ধরে নিয়েছেন, এই নেতারা তখন পত্তনি রোধের জন্য এবং অধস্তন রায়তদের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন।

৩. অন্যান্য প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮০-১৯০৫

১৮৮১ সালের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ খাজনা আইন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের মতামত অপ্রাপ্য। এক অজ্ঞাত লেখকের একটি প্রবন্ধে ১৮৮৩ সালের মধ্যপ্রদেশ প্রজাস্বত্ব বিলের, তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১-এর এপ্রিলে পুনা সার্বজনিক সভার মুখপত্রে। বিলের যেসব ধারায় মালগুজারদের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর সীমা আরোপ করতে চাওয়া হয়েছিল, লেখক সেগুলি সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েছিলেন—আরো বেশি ক'রে এই কারণে যে, সরকার তার নিজের রাজস্বের চাহিদার বেলায় এ-রকম কোনো সীমা নির্দিষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। তাছাড়া, যেসব ধারায় মালগুজারদের পাওনা খাজনার বদলে ফসল আটক এবং প্রজাদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা বন্ধ করতে চাওয়া হয়েছিল, লেখক সেসবেরও বিরোধিতা করেছিলেন। অনধিকারী প্রজার দ্বারা জমির উন্নতি-সাধনের পর তাঁকে উচ্ছেদ করা হলে ক্ষতিপূরণ দেবার এবং স্বত্বাধিকারের সম্প্রসারণের যে ধারা ছিল, লেখক তারও বিরোধিতা করে। নীতিগতভাবে লেখকের বক্তব্য ছিল যে, ভূস্বামী এবং প্রজার সম্পর্ক "বাইরের লোকের দ্বারা" নিয়ন্ত্রিত হওয়া অনুচিত, এবং সেটিকে অবশ্যই "ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার উপর ছেড়ে দিতে হবে।" "ন্যায় সুধা" ও জমিদারদের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রদেশ প্রজাস্বত্ব বিলের সমালোচনা করেছিল। অন্যদিকে, 'বেঙ্গলি' বিলের প্রতি সমর্থন জানায়। তবে "বেঙ্গলি" একথাও বলে যে, এতে প্রজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করা হয়নি। পরবর্তীকালে সরকার যখন ১৮৮৩ সালের মধ্যপ্রদেশ প্রজাস্বত্ব আইনকে, আর একটু প্রজাপন্থী ক'রে তোলার জন্য সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন, মারহাট্টা তখন ১৮৮৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর—সরকারের বিরুদ্ধে ভূ-স্বামীদের অধিকারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনেছিল।

জাতীয় নেতৃত্ব ১৮৮৬ সালের অযোধ্যা খাজনা আইন এবং পঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কেও কোনো মন্তব্য করেননি।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করার জন্যে ১৮৯৭ সালে যে বিল পেশ করা হয়েছিল, এবং যেটা ১৮৯৮ সালে পাস হয়েছিল, সে বিষয়ে বঙ্গদেশে অতি সামান্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'ঢাকা প্রকাশ' এবং 'বঙ্গবাসী' জমিদারপন্থী মনোভাব অবলম্বন করেছিল, আর বেঙ্গলি এবং হিতবাদী প্রজাদের পক্ষে। বঙ্গীয় আইন পরিষদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলের সেই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেছিলেন যেগুলি তাঁদের মতে প্রজাদের স্বার্থের পরিপন্থী। উক্ত দুই নেতা এবং এন. এন. সেন প্রজাদের অধিকারকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য বিলটি সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলেন।

১৮৮৪ সালের ১৬ই এপ্রিল হিন্দু এবং ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি "স্বদেশ-মিত্রন" মাদ্রাজের জমিদারি অঞ্চলের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৮০-র দশকে সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলে অভিমত ব্যক্ত করে। হিন্দু ১৮৯৮ সালের ২৭, ২৮ এবং ৩০শে মে ও ২৩শে জুন মাদ্রাজ প্রজাস্বত্ব বিলের (১৮৯৮ সালের) প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। যদিও হিন্দুর মতে, প্রজাদের রক্ষার্থে বিলে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দু চেয়েছিল, "চিরদিনের মতন রায়তকে ভূমিস্বত্ব দেওয়া হ'ক, কেননা জমিদারেরা নয়, তারাই জমির আসল মালিক" কিন্তু মাদ্রাজ বিধান পরিষদে জাতীয়তাবাদী সদস্যদের মনোভাব ছিল এ-ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত।

মালাবারের জেন্‌মি অর্থাৎ ভূস্বামীরা ব্যাপকভাবে প্রজাদের উচ্ছেদ করত। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য ১৮৯৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি "মালাবার প্রজা উন্নতি ও ক্ষতিপূরণ বিল" নামে একটি আইনের প্রস্তাব আনা হয়। মালাবারের সর্বপ্রধান জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র "কেরালা পত্রিকা" অন্য দুইটি কাগজ "কেরালা সঞ্চারী" এবং "কেরালা চন্দ্রিকার" সঙ্গে একযোগে বিলের প্রতি সক্রিয় সমথন জানিয়েছিল। "কেরালা পত্রিকা" অনেক বছর ধরেই এই বিষয়ে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এবং মালাবারের প্রজাদের কোনো-না কোনরকম দখলি স্বত্ব দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল। এই পত্রিকার মতে, ভূস্বামীদের অত্যাচারের ফলে উদ্ভূত দারিদ্র্যই ছিল পৌনঃপুনিক মোপলা বিদ্রোহের কারণ। কিন্তু "হিন্দু" এবং "মনোরমা" এবং মাদ্রাজ বিধান পরিষদের সদস্য সি. বিজয় রাঘবাচারীয়ার, জি বেঙ্করামন এবং পি. রত্নসভাপতি পিল্লে প্রমুখ বিলের বিরোধিতা করেন। বিজয় রাঘবচারীয়ার আপত্তির অন্যতম কারণ ছিল, এই আইনের প্রস্তাবে শুধু মালাবারের "কর্ণোমদার" প্রজাদের স্বার্থ দেখা হয়েছিল, অথচ এরা আসলে গ্রাম্য মহাজন, এবং এদের কোনো সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, এই প্রস্তাবে প্রকৃত চাষী-প্রজাদের কোনোমতেই রক্ষা করার কথা বলা হয়নি। এবং সেজন্য মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা এবং নাম্বুদির "জেন্‌মি" ভূস্বামীরাই শুধু "প্রস্তাবটিকে" সমর্থন করেছে।

১৮৯৯ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজস্ব আইন সংশোধনের যে চেষ্টা হয়েছিল ভূস্বামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিরোধিতা করেছিল "তোহফা-ই-হিন্দ", "নগিম-ই-আগ্রা", "অনিস্‌-ই-হিন্দ" এবং "প্রয়াগ সমাচার"। অন্যদিকে

রায়তের স্বার্থে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায় "আউধ পাঞ্চ"। "হিন্দুস্তানি সমাচার" মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। কিছুটা ভূ-স্বামীদের পক্ষে গেলেও। ১৯০১ সালে উত্থাপিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিলের প্রতি "ইণ্ডিয়ান ডেইলি মেল" পত্রিকা, ২৫শে অক্টোবরের সংখ্যায়, পূর্ণ সমর্থন জানায়। কিন্তু, লক্ষণীয় হ'ল, ঐ প্রদেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা মোটের উপর জমিদার-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন। প্রথমে তাঁরা বিলটিকে সংশোধন করে জমিদারদের বহু দাবি পূরণের জন্য চাপ দিতে থাকেন, এবং সরকার তা ভালোভাবে করতে ব্যর্থ হওয়ায়, শেষে আইনটির সমালোচনা করেন

১৮৯৮ এবং ১৯০৪ সালের মধ্যে বোম্বাই সরকার রত্নগিরি জেলার খোস্ত-এবং তাদের রায়তদের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের বিষয়ে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেছিল। এর ফলে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাতে বোম্বাইয়ের জাতীয় নেতৃত্ব প্রধানত "খোস্ত"দের পক্ষ অবলম্বন করে।

৩ কৃষক ও মহাজন

গ্রামীণ ভারতের দুঃখ-দুর্দশার তৃতীয় কারণ ছিল, সাহুকার অর্থাৎ মহাজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঋণগ্রস্ততা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটাই ছিল পল্লী অঞ্চলের অন্যতম প্রধান দুরূহ সমস্যা। গ্রামের মহাজন অত্যধিক চড়া হারে সুদ আদায় করত। চাষীর উপার্জনের একটা বড় অংশই সুদ মেটাতে চলে যেত। এবং প্রায়শই চাষী ঋণ পরিশোধ করতে না-পারার ফলে প্রচুর পরিমাণে জমি অ-কৃষিজীবী মহাজনদের অধিকারে চ'লে যেত। এই প্রক্রিয়ায় চাষী ক্রমশ পূর্বতন রায়ত মালিকের ঠিকা প্রজায় পরিণত হচ্ছিল। যে-কারণে কৃষি এবং কৃষক উভয়েরই অবনতি ঘটতে থাকে।

গ্রামাঞ্চলের এই ঋণগ্রস্ততা সম্বন্ধে ভারতীয় জাতীয় নেতারা যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, সেটি কিছু পরিমানে জটিল, বহুমুখী, সংকীর্ণ স্বার্থদ্যোতক, এবং কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর। ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসকেরা কৃষকের এই ঋণগ্রস্ততাকেই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ বলে অভিহিত করতেন এবং তার জন্য দায়ী করতেন। মহাজনকে এবং তার অত্যধিক চড়া হারের সুদকে। কিন্তু, ভারতীয় নেতারা মনে করতেন, মহাজন ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্য ও ঋণের গৌণ কারণ, মূল কারণ নয়। তাঁরা এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে, মহাজনকে এর জন্য দায়ী করা হলে ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের আসল কারন থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আসল প্রশ্নটা হওয়া উচিত 'কেন কৃষক সুদখোর মহাজনের কাছে যায়?' কেননা, আর যাই হ'ক, "টাকা ধার নেওয়াতে আনন্দ অথবা লাভ কোনোটাই নেই।"

জাতীয় নেতাদের মতে, পল্লী অঞ্চলে ঋণগ্রস্ততা ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছিল

তার অন্যতম প্রধান কারণ, কৃষকের দারিদ্র্য। কৃষক তার জমি থেকে উপযুক্ত জীবিকা অর্জন করতে পারত না, যার ফলে নিজের এবং পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য অত্যধিক চড়া সুদে ধার করতে বাধ্য হ'ত। বিশেষ ক'রে টানাটানির সময়ে। প্রায়শই তাকে একদিকে অনাহার, অন্যদিকে মহাজন, এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হ'ত। তাঁদের মতে পল্লী ঋণগ্রস্ততার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অনমনীয়তা ও কঠোরতা এবং অত্যন্ত উচ্চহারে রাজস্বের দাবি। কেননা, কৃষককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার করতে হ'ত সরকারের পাওনা মেটাবার জন্য। ১৮৮৪ সালের ১২ই জুন "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখেছিল : "কিন্তু মহাজন বা রক্ত চোষা 'সাহুকার' তো সরকারের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থারই সৃষ্টি। সরকার চাপ দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে অত্যধিক হারে কর আদায় করে, এমনকি দৈব দুর্বিপাকেও সামান্য ছাড় দেয় না, যার ফলে মহাজনের সৃষ্টি।" কিছু নেতা গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার জন্যে জটিল আইন ব্যবস্থাকেও দায়ী করেছেন। কেননা, এই আইন ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মহাজনকেই সাহায্য করেছে, এবং অপরের জমি দখল করে নিতে উৎসাহ জুগিয়েছে, আর তারই ফলে, সুদখোরি কারবারের কুফল আরও তীব্র হয়েছে। সরকারের বক্তব্য ছিল—কৃষক অযথা ঋণ করে বিবাহ, শ্রাদ্ধকৃত্য কিংবা সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য, অর্থাৎ কৃষকের ঋণগ্রস্ততার কারণ তার বেহিসাবি স্বভাব। অধিকাংশ নেতাই প্রবলভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার কারণ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের বিশ্লেষণের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, এটি ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতিরই পরিনাম, এবং মহাজন ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতিরই একটি উপাঙ্গ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। যেমন, ১৯০১ সালের ২রা জানুয়ারি "অমৃতবাজার পত্রিকা" জোর দিয়েই বলেছিল, মহাজনেরা "অন্তত মাড়োয়ারি ভাবিষৎ-সন্ধানীরা এদেশের ব্রিটিশ শাসনের ফল।" ১৯০২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি "কেশরী" লিখেছিল—

"ব্রিটিশ শাসনকালে নিঃসন্দেহে মহাজনের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে ; কিন্তু তার কারণ, ব্রিটিশ শাসন সমস্ত দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছে। একদিকে স্বদেশী শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, অন্যদিকে বছরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ইংল্যাণ্ডে চালান ক'রে দেওয়া হচ্ছে, এই অবস্থায় এটা কি কোনো বিস্ময়কর ঘটনা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে মাত্র একটাই পথ খোলা থাকছে, তাহ'ল, একে অপরকে খেয়ে পেট ভরানো ? ব্রিটিশ রাজত্বকালে শুধু এই বিপ্লবটিই ঘটেনি, সরকার আইন ক'রে একে পাকা ক'রে দিয়েছে।"

ভারতীয় নেতারা কৃষকের দারিদ্রের জন্য মহাজনকে ও ঋণগ্রস্ততাকে দায়ী করার ব্যাপারে সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে একমত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ জাতীয় নেতা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই তেজারতি কারবারের প্রসারের ফলে উদ্ভূত

কুফলগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং অত্যধিক চড়া হারে সুদ আদায় ও বেআইনীভাবে কৃষককে শোষণ করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত বিভিন্ন উপায়ের নিন্দা করেছিলেন। চড়া সুদের ঋণকে তাঁরা কৃষকের দারিদ্র্যের গৌন কিন্তু একটি প্রধাণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলে। এবং সুদখোর মহাজনকে 'রক্ত চোষা' বলে অভিহিত করে এদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পাঞ্জাবের লালা মুরলীধর মহাজনদের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন :

"মহাজন হচ্ছে মানুষ ও পশুর এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। যাঁরা দেহান্তর-প্রাপ্তি ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এদের থাবা সিংহের, মস্তিষ্ক শৃগালের, এবং হৃদয় ছাগলের।... ঘৃণিত জোঁকের মতন শুধু টাকা আদায় করে ; গরিব চাষীদের রক্ত চুষে খায়।"

চাষের জমি যে ক্রমাগত অকৃষিজীবী অথবা চাষের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব শ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছিল, সেটা অনেক নেতা লক্ষ করেন, এবং তার বিরোধিতাও করেন।

একই সঙ্গে আবার অনেক নেতাই এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থায় ঋণ সংগ্রহের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না-থাকায় মহাজন গ্রামাঞ্চলের একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাচ্ছিল। কেননা, মহাজনকে বাদ দিয়ে কৃষকের পক্ষে চাষের কাজকর্ম চালানো বা চট্‌ করে খাজনার টাকা জোগাড় এবং আর্থিক টানাটানির সময় সংসার চালানো ছিল অসম্ভব। সুতরাং তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, মহাজনকে দমন করার প্রয়োজন নেই, তাকে সংশোধন এবং নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নিঃসন্দেহে সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের যুক্তির মধ্যে সারবত্তা ছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু নেতা এ নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যেই মহাজনদের হয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন।[১৩]

কৃষক-মহাজন সম্পর্কিত সমস্যায় ভারতের জাতীয় নেতাদের মনোভাব কী ছিল তা সম্ভবত আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে মহাজনের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতি সংকটপন্ন হয়ে পড়েছিল, সে-বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করলে।

৫. দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী ত্রাণ আইন, ১৮৭৯

১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী ত্রাণ আইন পাস করে সরকার প্রথম মহাজনদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারের লক্ষ্য ছিল, বোম্বাই এর দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজীবীদের যে অসন্তোষের ফলে ১৮৭৫ সালে

গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়েছিল, তা দূর করা। এই আইনে মহাজনদের চড়া সুদ আদায় এবং প্রতারণামূলক কাজকর্ম খর্ব করার, আইন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের ঋণের বোঝা কমানোর চেষ্টা হয়েছিল। প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্যের মাত্র চারটি জেলাকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। আইনের বলে আদালতের ক্ষমতা চুক্তিপত্রে যা লিখিত থাকত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, প্রয়োজনে আদালত ঋণের ইতিহাস এবং দোষ-গুণ অনুসন্ধান করে এবং সুদের হার অন্যায্য হলে তা বাতিল করে দিয়ে, যুক্তিযুক্তভাবে হিসাব ক'রে উচিত প্রাপ্য স্থির করার ক্ষমতা পেল। সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে না-থাকলে অধমর্ণের জমি বিক্রি এই আইন রদ করে দিয়েছিল। এমনকি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জমি পুনরুদ্ধার করে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থাও আইনে ছিল। তাছাড়া, আইনে গ্রামের জন্যে রেজিস্ট্রেশন নিয়োগের বিধান ছিল, যার কাছে সমস্ত ঋণ চুক্তি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই বিধানও ছিল যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরখাস্ত ক'রে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারবে। ঋণ পরিশোধ করতে না-পারার জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রদ করা হয়েছিল এবং ঋণ সালিশ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে আইনটি সংশোধিত হয়। এই সংশোধনীতে অধমর্ণকে বন্ধকি জমির দায়মোচন না করেই হিসাব নিকাশের জন্য মামলা দায়ের করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

বিচারপতি রানাডে, পুনা সার্বজনিক সভা এবং বোম্বাইয়ের কিছু সংবাদপত্র এই আইনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৮১ সালে রানাডে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য এইভাবে উপস্থিত করেন: "আইনটি এই কারণেই সমর্থনযোগ্য যে সাধারণত আইনে ধরে নেওয়া হয় যে দেউলিয়া বা অশিক্ষিত রায়ত আর সঞ্চয়ী বুদ্ধিমান সাহুকার সুযোগ-সুবিধা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সমগোত্রীয়, অথচ বাস্তবে তা কখনোই নয়; এই সমতার ধারণার সবটাই অবাস্তব আইনের গল্প-কথামাত্র, যার ফলে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। এখন উপযুক্ত সময় এই ভুল সংশোধন করে আমাদের দুর্বলতর পক্ষকে রক্ষা করার পুরনো রক্ষণশীল দেশীয় প্রথায় ফিরে যেতে হবে।"

১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে "জার্নাল অব দ্য পুনা সার্বজনিক সভা"তে প্রকাশিত "দি ডেকান এগ্রিকালচারিস্টস্ বিল" নামে একটি লেখায় রানাডে বিলের প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের অধিকাংশ সংবাদপত্রই আইনটিকে অনুমোদন করে নি। এই যুক্তিতে যে, এটি একটি দায়সারা গোছের আইন, এবং এর দ্বারা কৃষককে রক্ষা করা সম্ভব হবে না; কেননা, এতে একটি গৌণ সমস্যা মহাজনের কথাই শুধু আছে, আসল যে সমস্যা সেই অনমনীয় কঠোর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন বিধান নেই।

ফলে কার্যত এই আইন কৃষকের ঋণ পাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে। অথচ তার দায়দায়িত্ব পুরোটাই থেকে যাবে, এবং সেজন্য সে চরম বিপদের সম্মুখীন হবে। সম্ভবত এইসব সমালোচকদের যুক্তির পিছনে সেই মনোভাবটাই কাজ করেছিল যেটা ১৮৮৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মারহাট্টা খোলাখুলিভাবে বলে ফেলে এটা আসলে "ব্যাধির মূল কারণ গোপন করার একটা প্রচেষ্টা ...এর দ্বারা সরকার তার নিজের দায়িত্ব সাহুকারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান।"

রানাডে অবশ্য আইনটিকে অকুণ্ঠ সমর্থন করলেও একথা বলেছিলেন যে, এই আইনের দ্বারা তখনই কৃষক উপকৃত হবে যখন "এর সঙ্গে থাকবে উদার একটি ভূমি রাজস্ব নীতি, এবং সেটাই আইনের সাফল্যের একমাত্র শর্ত।" আর তা যদি না থাকে তাহলে "শুধু এই আইনের দ্বারাই কোনো প্রকৃত, প্রত্যক্ষ অথবা স্থায়ী উপকার সাধিত হবে না, বরং বর্তমান অবস্থায় আরো অবনতি ঘটে যেতে পারে"[৯], কেননা মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব দিতে কৃষককে কোনো জায়গা থেকে টাকার জোগাড় করতেই হবে।

ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ এই আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে এমন কথাও বলেছিলেন যে, এই আইন মহাজনের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এবং তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।[১৪]

৬. জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ

১৮৭৯ সালের পর গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার ক্রমবর্ধমান কুফল রুখতে সরকার কোনো বড় ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশেষে, যেভাবে দ্রুত হারে জমি অ-কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির হাতে চলে যাচ্ছিল তা দেখে শঙ্কিত হয়ে, শতাব্দীর শেষ দিকে, কর্তৃপক্ষ কঠোরতর ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। অনেক বছর ধরেই এ-বিষয়ে সরকারি মহলের চিন্তা-ভাবনা ধীরে ধীরে এই মতবাদের চতুর্দিকে দানা বেঁধে উঠছিল যে, কৃষিজীবীদের জমি ব্যাপক অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর হাতে চলে যাবার মুখ্য কারণের মধ্যে একটি সরকারি রাজস্বের অত্যধিক শিথিলতা। কেননা, সরকারের ঘরে যেটুকু রাজস্ব আসে তা প্রকৃত অর্থকরী খাজনার একটা অংশ মাত্র, বাকিটা ভূস্বামীর হাতে বিরাট অনুপার্জিত উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে থেকে যায়। যার জন্য একগাদা পরগাছা মধ্যস্বত্ব ভোগীর জন্ম হয়েছে। তার উপরে আবার ব্রিটিশ প্রশাসন ভূম্যধিকারীদের জমি হস্তান্তরের অবাধ ক্ষমতা দিয়েছিল। এছাড়াও ছিল ভারতীয় কৃষকের বেহিসাবি খরচ করার প্রবণতা; যেহেতু রায়ত জমি হস্তান্তর করতে পারে, কাজেই কোনো চিন্তা না ক'রেই সে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ করে বসে। এর থেকেই সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে জমির খাজনা যত বেশি হবে রায়তের পক্ষে সেটা তত বেশি মঙ্গলদায়ক। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু

ইংরেজ প্রশাসক অ-কৃষিজীবী ভূ-স্বামীপ্রথা অলাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে হয়ত ভূমি ভূমিরাজস্ব বাড়াবার প্রস্তাবই দিয়ে বসত, যদি না তারা উপলব্ধি করত যে এ রকম প্রস্তাব কার্যকর করা রাজনৈতিক ভাবে অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের মতে, অন্য একমাত্র যে পথ খোলা ছিল তা হ'ল বেহিসাবি অদূরদর্শী কৃষকের হাত থেকে জমি হস্তান্তর করার "প্রাণঘাতী আশীর্বাদ" ফিরিয়ে নেওয়া। কেননা এইভাবেই তার ঋণ করার ক্ষমতা সংকুচিত করে তাকে অত্যধিক ঋণ করার প্রলোভন থেকে মুক্ত করা সম্ভব হতে পারত।

এই নতুন নীতি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পেল ১৯০০ সালের পঞ্জাবের ভূম্যধিকার হস্তান্তর আইনে। এই আইনের ফলে নির্দিষ্ট কয়েকটি কৃষিজীবী শ্রেণী ছাড়া এবং একজন ডেপুটি কমিসনারের অনুমোদন ছাড়া বংশানুক্রমিক কৃষকের পক্ষে পাকাপাকিভাবে জমি হস্তান্তরিত করা অসম্ভব হল। তবে, অকৃষিজীবীদের জন্য বিশ বছরের সর্বোচ্চ মেয়াদে বিশেষ কয়েক ধরণের অস্থায়ী হস্তান্তর অনুমোদিত হয়েছিল। এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় জমি বিশ বছর বাদে দায়মুক্ত অবস্থায় হস্তান্তরকারীর কাছে ফিরে আসত। এ ছাড়া ডিক্রি অথবা আদেশ জারি করতে গিয়ে কোনো কৃষি জমির বিক্রয় আইনে নিষিদ্ধ করা হ'ল। এটা স্পষ্ট যে, আইনটা তৈরি হয়েছিল যতটা কৃষি ঋণের তৎকালীন বোঝা লাঘব অথবা তার ভবিষ্যৎ প্রসার রোধের উদ্দেশ্যে, তার চাইতে বেশি পঞ্জাবের কৃষকদের জমি বাইরের মহাজনদের—কবলে চ'লে যাওয়া বন্ধ করার জন্য, কেননা তাতে সম্ভবত একটা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিপদ ছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন কৃষিজীবীশ্রেণীর কাছে অবাধে জমি বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জমির হস্তান্তর সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল মাত্র, পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়নি। অবশ্য এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে কৃষকের মহাজনের কাছে দৌড়বার প্রবণতা এবং সামর্থ্য এই আইনের ফলে পরোক্ষভাবে খর্ব হবে।

এ-বিষয়ে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বোম্বাইতে, ১৯০১ সালের ভূমি রাজস্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে। খাজনা দিতে না পারার ফলে যে সব পতিত জমি এবং ক্ষেত সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই আইনের বলে সরকার সেই জমি এক নূতন নিয়মে বিলি করতে পারল। কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য এই সব জমি বিলি ব্যবস্থা হ'ত। আইনটা বাধ্যতামূলক ছিল না, তাছাড়া ক্ষমতাপ্রদানকারী ছিল মাত্র। তবে এই হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল শুধু বাজেয়াপ্ত করা জমির ক্ষেত্রেই। কাজেই পঞ্জাব আইনটির তুলনায় এর প্রয়োগ ক্ষেত্র ছিল সীমিত। অন্য দিকে, দুটি বিষয়ে আইনটি পাঞ্জাব আইনের তুলনায় কঠোর ছিল। প্রথমত, এই আইনের দ্বারা

জমির হস্তান্তর শুধু সীমাবদ্ধই করা হয়নি, সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই আইন সরকারকে বাজেয়াপ্ত জমি স্বল্পকালের জন্য লীজ দেবার ক্ষমতা দিয়েছিল।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে জমি হস্তান্তরের অধিকার সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য থেকে পল্লী ঋণ-গ্রস্ততার কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে ইংরেজ আমলা এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল তা খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই মতপার্থক্যের জন্য শুরু থেকেই সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, জমির হস্তান্তর বন্ধ করার প্রস্তাবের ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের বিরোধিতা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

পঞ্জাবের বাইরে পঞ্জাব ভূমি স্বত্ব হস্তান্তর বিলটি হয় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল নয়তো অসমর্থিত থেকেছে।[১৬] পঞ্জাবে বিলটি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিল।[১৭] অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই উভয় সংকটে পড়েছিলেন। যেমন, পঞ্জাবের প্রধান উর্দু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'অখবার-ই-আম' প্রথম দিকে দ্বিধান্বিত ছিল; পরে বিলের সমর্থক এবং বিরোধী উভয় পক্ষের জন্যই কাগজের দরজা খুলে দিয়েছিল। এবং প্রায় এক বছর নিরপেক্ষ থেকে অবশেষে ১৯০০ সালের ৭ই অগাস্ট এবং ২৭শে অক্টোবর কাগজটি বিলের বিরুদ্ধে লেখে। কিন্তু আবার দু সপ্তাহ বাদেই, ১৯০০ সালের ১০ই নভেম্বর, একেবারে উল্টো কথা বলে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই ভবিষ্যদ্বাণী করে যে আইনটি কার্যকর প্রমাণিত হবে, সুতরাং এর বিরুদ্ধে সমস্ত আপত্তিই অসঙ্গত।[১৮] তবে পঞ্জাবে কিংবা পঞ্জাবের বাইরে কোথাওই পঞ্জাব হস্তান্তর আইনের বিরোধিতা বিশেষ জোরদার হয়নি, কিংবা উত্তেজনাপূর্ণ অথবা দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি।

বোম্বাই ভূমি-রাজস্ব সংশোধনী বিল কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। প্রেসিডেন্সির সর্বত্র প্রতিবাদ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েসন, পুনা সার্বজনিক সভা ও দাক্ষিণাত্য সভা বিলের প্রতিবাদ করে আবেদনপত্র পাঠায়। প্রধান জাতীয়তা-বাদী সংবাদপত্রগুলি বিলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং নেতারাও প্রবল আক্রমণ চালাতে থাকেন। বোম্বাই আইন পরিষদের কয়েকজন ভারতীয় সদস্য—পি এম মেটা, জি কে. গোখলে, জি. কে. পারেখ, বালচন্দ্র কৃষ্ণ এবং ডি এ খারে—বিলটি তাড়াহুড়ো করে পাস করার চেষ্টার বিরুদ্ধে এক নজিরবিহীন প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। ভারতীয় আইন সভার ইতিহাসে সম্ভবত এটিই প্রথম 'ওয়াক-আউটের' ঘটনা।

হস্তান্তর নিবিদ্ধকরণ আইনের বিরুদ্ধে নেতাদের বক্তব্যের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, মহাজনদের শোষণের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার মহৎ

উদ্দেশ্য নিয়ে আইনটি রচিত হলেও, বাস্তবে এই আইনের ফলে কৃষক সামান্যই লাভবান হবে, বরং তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রথমত জমি হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে কৃষকের ঋণ নেবার ক্ষমতা যদি একেবারে নিঃশেষ হয়ে নাও যায় অনেক কমে যাবে। এবং যেহেতু চাষের কাজ, সরকারের পাওনা মেটানো এবং অনটনের সময় সংসার চালাবার জন্যে ঋণ প্রয়োজন হবেই, এই ব্যবস্থার ফলে হয় কৃষক ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হবে অথবা তাকে অনেক বেশি সুদে ঋণ নিতে হবে। নেতাদের বক্তব্য ছিল, এই বিধিনিষেধের ফলে জমির দামও অনিবার্যভাবে কমে যাবে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থা কৃষকের মালিকি অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল হওয়ায় কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হবে।

প্রধানত বোম্বাই ভূমি রাজস্ব বিলের সমালোচনায় এই বক্তব্য সোচ্চারে উপস্থিত করা হয়েছিল। ঐ বিলে সরকারের হাতে বাজেয়াপ্ত হওয়া জমি ইচ্ছামতন শর্তে এবং সময়ের জন্য পুনরায় বিলি করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতে তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু রায়তের জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই নয়, তার স্থায়ী স্বত্ব অথবা চিরস্থায়ী ও উত্তরাধিকার সূত্র প্রাপ্ত অধিকারও কেড়ে নেওয়া। এটা ছিল আসলে গোপনে রাষ্ট্রীয় জমিদারি প্রথা প্রবর্তন ও জমি জাতীয়করণ করার প্রচেষ্টা। নেতাদের কেউ কেউ এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, এই সব "বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থাদির" প্রকৃত পরিণতি হবে যা চাওয়া হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। কেননা, নিজের জমির উপর পূর্ণ মালিকানার অধিকার রক্ষা করতে এবং বাজেয়াপ্ত হবার হাত থেকে জমি বাঁচাতে রায়ত আরো বেশি পরিমাণে মহাজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, এবং মহাজনও জমি যাতে বাজেয়াপ্ত না হয় তার জন্য সুদ বাকি পড়ার অজুহাতে বন্ধক বাতিল করে জমির দখল নিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কিছু নেতা একটা অদক্ষ নিঃশেষিত কৃষক গোষ্ঠীকে এইভাবে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার সমালোচনাও করেছিলেন। তাঁদের অভিমত, এই ছিল যে, এর ফলে কৃষিতে অবধারিতভাবে নিশ্চলাবস্থা দেখা দেবে; পক্ষান্তরে জমির অবাধ হস্তান্তরের সুযোগ থাকলে আরো দক্ষ, আরো সমর্থ কৃষক এবং পুঁজিপতিদের কাছে জমি চলে যাবে, তাতে জমিতে পুঁজির নিয়োগ বাড়বে, এবং কৃষি প্রযুক্তি ও উৎপাদন উভয়েরই উন্নতি হবে। এই মতের প্রধান প্রবক্তা বিচারপতি রাণাডে যেভাবে স্বত্ব হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন সে-সম্পর্কে আমরা পরে আলাদা আলোচনা করব।

লক্ষণীয় যে, জমি হস্তান্তরের বিরোধিতা করার সময় মহাজনদের ক্ষতি হবার আশঙ্কাকে যুক্তি হিসাবে ভারতীয় নেতারা প্রায় উপস্থিতই করেননি।[১৯] বরং তাঁরা এটা দেখাতে ব্যগ্র ছিলেন যে মহাজনদের জন্য তাঁদের কোনো দরদ নেই। যেমন, ফিরোজশাহ. মেটা এবং জি. কে গোখলে উভয়েই প্রবলভাবে

অস্বীকার করেন যে মহাজনদের স্বার্থ চিন্তাই তাঁদের বোম্বাই ভূমি রাজস্ব সংশোধন বিলের বিরোধিতা করার প্রেরণা যুগিয়েছে।[২০]

আসলে নেতারা বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখেছিলেন বিষয়টিকে। জমির হস্তান্তরকে সীমাবদ্ধ করার অর্থ হল গ্রামীন ঋণ গ্রস্ততার সমস্যার মূল কারণকে এড়িয়ে গিয়ে অন্যত্র আক্রমণ করা। সমস্যাটির মূল কারণ সম্পর্কে মারাত্মক ভুল উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনাটি তৈরি হয়েছিল। একথা ঠিক যে, জমি হস্তান্তর করার সুযোগ থাকলে রায়ত তার জমি বন্ধক রেখে ধার নিতে পারেন। কিন্তু ঋণগ্রস্ততার আসল কারণ এটা নয়। সেজন্য, তাঁরা জোর দিয়েছেন জমির ব্যাপক হস্তান্তরের কুফল রোধ করতে রায়তের ঋণ করার কারণগুলি দূর করার উপর, ঋণ করার ক্ষমতার উপর নয়। ঐ সমস্যার কোনো সমাধান না করে হস্তান্তর বন্ধ করার অর্থ, "রোগের আসল কারণের চিকিৎসা না করে শুধু লক্ষণগুলি চাপা দেওয়া।"

এই প্রসঙ্গে নেতারা বারবার ভারতীয় কৃষক চারিত্রিকভাবেই বেহিসাবি এবং চিরদিনই সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ ঋণ করে যাবে—এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া, জমি থেকে সরকারের চাহিদা সামান্য হওয়ায় অনুপার্জিত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার ফলে মহাজনেরা পরোক্ষভাবে জমির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করছে—।[২১] এই অভিমতকেও উপহাসে ভূষিত করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, সরকার ডুবন্ত ব্যক্তির মতন যে, কোনো খড়কুটো আকড়ে ধরতে রাজি অথচ ঋণগ্রস্ততার আসল কারণ যে উচ্চ ভূমিরাজস্ব তা দূর করতে ইচ্ছুক নন, কেননা তাহলে সরকারের নিজের অর্থভাণ্ডারে টান পড়বে। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ডন' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত "দি ইকনমিক সিচুয়েসন ইন ইণ্ডিয়া" নামে একটি প্রবন্ধে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখেছিলেন। ইংরেজ শাসনে জমির স্বত্ব হস্তান্তরকরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখালেন যে এদেশে "কঠোর রাজস্বনীতি চালু করার পর রায়তকে বিক্রির অথবা বন্ধকির দ্বারা জমি হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করে একটা অনুপূরক ব্যবস্থা সরকারের নিতে হয়েছিল, কেননা তা নাহলে ভূমিরাজস্ব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। সমাজ সংহতি যাতে বিপন্ন না হয় তার জন্য হস্তান্তর ক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন জমির হস্তান্তর যে রাজস্ব ব্যবস্থার ফল তার বেশ ভালরকম সংস্কারসাধন, এমনকি এই ব্যবস্থার অবসানও।[২২]

সবচেয়ে বড় কথা নেতারা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে হস্তান্তর রোধ করার জন্য যে পন্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তার প্রকৃত কার্যকারিতা আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এসব ব্যবস্থা পল্লী ঋণগ্রস্ততাকে বাইরে থেকে শুধু স্পর্শ করতে পারবে, আর তার ফলে বড়জোর রোগ লক্ষণের উপশমে কিছুটা সাহায্য করবে, কিন্তু আসল সমস্যা যেমন ছিল তেমনিই থেকে যাবে।[২৩]

৭ বিকল্প সমাধান

পল্লী অঞ্চলের ঋণগ্রস্ততা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের মূল বক্তব্য এটাই ছিল যে মহাজন-বিরোধী ব্যবস্থাদির উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন রায়ত যে-সব কারণে সুদখোর লোভী মহাজনের খপ্পরে গিয়ে পড়তে বাধ্য হয় সেগুলি দূর করার উপর সেজন্য এমন ব্যবস্থার দরকার যাতে মহাজনের পরিবর্তে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লীঋণের সুযোগ পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর মারাঠা সংক্ষেপে এই প্রস্তাব উপস্থিত করে লিখেছিল :

"যতদিন অভাবের ফলে টাকা ধার করার তাগিদ থেকে যাবে ততদিন কৃষক ও মহাজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সব ভূমি হস্তান্তর আইনের মহৎ উদ্দেশ্য বানচাল করার পথ বের করে নেবে।... এ ব্যাপারে সরকারের অবশ্যই কিছু করা উচিত। সরকার হয় রাজস্বের বোঝা হাল্কা করুন এবং তদ্দারা অন্তত কিছু পরিমাণ ঋণগ্রস্ততার কারণ দূর করুন, নয়তো সরকার স্বয়ং মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, এবং কৃষকদের প্রকৃত অভাব মিটিয়ে হৃদয়হীন ও অসৎ মহাজনদের কবল থেকে তাঁদের বাঁচান।'

বোম্বাই ভূমি-রাজস্ব সংশোধনী বিলের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে জি-কে গোখলে সরকারের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন : গ্রামে একটা ক্ষুদ্র অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখানকার রায়তেরা মহাজনদের কাছ থেকে যে ঋণ করেছে সরকার সেগুলি অধিগ্রহণ করুন, এবং কৃষকদের অর্থের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কৃষি ব্যাংক চালু করুন এবং তারপর ঘোষণা করুন যে তাদের জমি হস্তান্তরযোগ্য নয়। তিনি দাবি করেন—"যে ভাবে সমস্যাটার মোকাবিলা করা উচিত, একমাত্র এইভাবেই সেটা সম্ভব', এবং এইরকম একটি সরকারি নীতির প্রতি বহু দেশবাসীই সমর্থন জানাবেন।" আসল সমস্যা হল, বর্তমান ঋণের বোঝা যতক্ষণ না লাঘব করা যাচ্ছে এবং রায়তের ঋণের প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনোভাবেই সাহায্য করা যাবে না : "নিছক আইন ব্যবস্থার এদিক ওদিক করে কৃষিজীবীর অবস্থার উন্নতি বিধান করা যাবে না।" সংক্ষেপে বললে, উপশম মূলক ব্যবস্থাদির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকা চাই আরো বেশি মৌলিক এবং চিরস্থায়ী প্রতিবিধান, তবেই রোগ নির্মূল করা সম্ভব।

"শ্রম ও শিল্প এবং উদ্বৃত্ত পুঁজির জন্য নূতন নূতন সুযোগের ব্যবস্থা করে" পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য-মোচন এবং ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ কমিয়ে[২৪] রায়তদের সাহায্যের জন্য সুপারিশ ছাড়াও নেতারা রায়তদের জন্য সহজ ও সুলভ ঋণের ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, মহাজনের লোভ থেকে কৃষককে বাঁচানো প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অল্প

সুদে প্রয়োজনীয় ঋণের সুবন্দোবস্ত। ঋণের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে মহাজনের কাজ বন্ধ করে দিলে, বাস্তবে রায়তকে মহাজনের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়াই হবে; আগের তুলনায় অনেক খারাপ শর্তে। সেজন্যই তাঁরা আমাদের আলোচ্য সময়কালের পুরো সময়টাতেই সারা দেশে কৃষি ব্যাংক স্থাপনের জন্য আন্দোলন করেছেন। এবং কৃষি ব্যাংক এবং ঋণ সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যখন ১৯০৩-০৪ সালে সমবায় ঋণ সমিতি বিল-রচনা করেন তাঁরা ঐ বিলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের একটা উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছেড়ে না দিয়ে সরকারের নিজেরই কৃষি ব্যাংক স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। বিচারপতি রাণাডে, জি ভি. যোশী, জি. কে. গোখলে প্রমুখ জোর দিয়ে বলেছেন, প্রথমে দেনার দায়ে ডুবে থাকা কৃষকদের আগের ঋণ মিটিয়ে দিয়ে তাদের দেনার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে; অন্যথায় তারা কৃষি ব্যাংকের সহায়তায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।

৮. পুঁজিবাদী কৃষি

কৃষককে মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকার এবং জাতীয় নেতারা সাধারণভাবে যে সব প্রতিকার সুপারিশ করেছিলেন তার দ্বারা শুধুমাত্র তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই কৃষকের অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন সম্ভব ছিল। কিন্তু বিচারপতি রানাডে প্রুশিয়া, রাসিয়া এবং ফ্রান্সের ভূমি ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে ভারতের ভূমিনীতি ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব করেন। তিনি কৃষকের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং এ-ব্যাপারে বিবিধ সরকারি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছিলেন। তাছাড়া রায়তকে রাষ্ট্র, জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেও নানা প্রস্তাব রেখেছেন। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও গৃহীত ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি একমত ছিলেন না। তাঁর মতে, সরকারি ব্যবস্থায় কৃষিজীবী শ্রেণী গুলির বন্ধন-শৃঙ্খল ছেঁড়া যায়নি কিংবা তাদের উপর আরোপিত বাধা নিষেধ দূর করা যায়নি, যেটা প্রুশিয়ান আইন ব্যবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সম্ভব হয়েছিল। রাণাডে দেখিয়েছিলেন যে, ভারতীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে ভূস্বামী ও রায়ত উভয়েই পুরোন কৃষি সম্পর্কের ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যাবেন। এই ধরণের আইনের ফলে শুধু বিভিন্ন 'স্বার্থ ও অধিকারের' জটিলতা বৃদ্ধি পাবে, ভূস্বামীদের 'খাজনা ও পেনসনভোগী' শ্রেণীতে নামিয়ে আনা হবে, আর রায়তকে শেখানো হবে—"আরো বেশি করে মুখ্য ভূস্বামীরূপী সরকারের উপর নির্ভর করতে; কেননা নিজের দায়িত্ব উপলব্ধির জন্য যে প্রশিক্ষণের

প্রয়োজন তা তার নেই।" এ সবের একটাই অর্থ, যেখানে আসল প্রয়োজন একটা জরুরি ও মৌলিক সংস্কার সাধন সেখানে "একটা শ্রেণীর অনুমিত স্বার্থের খাতিরে প্রচলিত অধিকারগুলিতেই একটু জোড়া তালি দেওয়া হবে।"[২৪] আর এই জোড়াতালির ফলে "জমির স্বত্ব ও অধিকার আগের মতই কলহ পরায়ণ অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত থেকে যাবে, প্রকৃত উন্নয়নের কিছুই হবে না।" অনুরূপভাবে মহাজনের গ্রাস থেকে রায়তকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জমি অ-হস্তান্তর-যোগ্য করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে রাণাডে বলেন—"জমির সমস্ত রকম হস্তান্তর, ইচ্ছায় হক বা অনিচ্ছায়, বলপূর্বক নিষিদ্ধ করণের দ্বারা কোনো প্রতিকারই হবে না—এর ফলে, দারিদ্র্য যেমন ছিল সেই ভাবেই থেকে যাবে, বরং অসহয়তা আরো বাড়বে।"

রানাডে চেয়েছিলেন প্রচলিত কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তে এমন এক কৃষি-সম্পর্ক যার ভিত্তি হবে "ব্যক্তিগত স্বাধীন সম্পত্তি।"[২৫] সরকারের করুণার উপর নির্ভরশীল রায়তের পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন এমন রায়ত যে স্বাধীন, ও সমস্ত দিক থেকে দায়মুক্ত, যার সম্পত্তি থাকবে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধিকারে, এবং তার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ম্যাজিকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জমিতে প্রাণপণ খাটবে। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র চাষীদের নিয়ে গড়ে-ওঠা কৃষি কখনই স্থিতিশীল বা প্রগতিশীল হতে পারে না; এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে বা জনসেবামূলক উদ্যোগ, গ্রহণ করতে কিংবা আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারবে না। তিনি লিখেছিলেন "জমি যাঁরা চাষ করেন তাঁদেরকে জমির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা জাতীয় ক্ষতি, কিন্তু দেশ জুড়ে শুধু একটা মুমূর্ষু কৃষকশ্রেণী থাকবে এটাও কম ক্ষতিকারক নয়।" রানাডে যে বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তা হল কৃষির সঠিক এবং সুষম বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি পুঁজিপতি কৃষক শ্রেণীর, যাঁরা জমিদারদের মতন হবেন না, ব্রিটিশ ধাঁচের ভূস্বামীদের মতন অথবা জার্মান জাংকারদের মতন জমির মালিক হবেন। অনেক আগে, ১৮৭৯ সালে, তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, একবার যদি জমিকে কৃত্রিম বাধানিষেধ থেকে মুক্ত করা যায় তাহলে "দূরদর্শী এবং মিতব্যয়ী শ্রেণীগুলি জমির মালিকানা লাভ করবে এবং সারা দেশে এমন এক শ্রেণীর ভূস্বামীর সৃষ্টি হবে যাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ ও সরকার নির্মিত জনসেবামূলক উদ্যোগগুলিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারবে।"[২৭] এর কিছুকাল পরেই তিনি নিম্নোধৃত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যটি করে:

"ভারতের মতন সব প্রাচীন এবং পিছিয়ে-পড়া দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সব সময়ই সব শক্তির উৎসকে কব্জা করে রেখেছে। সামাজিক এবং

ধর্মীয় ব্যাপারে তারা সবার আগে থাকে। তাদের আছে বুদ্ধি, বিত্ত, মিতব্যয়ী দক্ষতা, জ্ঞান এবং একত্র হবার ক্ষমতা। জনসাধারণের অধিকাংশই নিরক্ষর, অদূরদর্শী, অজ্ঞ, অসংগঠিত, বেহিসাবি এবং সামর্থহীন। কোনো রাজনৈতিক কৌশলই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য আনতে সক্ষম হবে না। যেখানে রয়েছে বিত্ত এবং বুদ্ধি ক্ষমতার পাল্লা সেদিকেই ঝুঁকবে। একটা হতদরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে জমির অধিকারে বসিয়ে রাখা এবং পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বাভাবিক মিলনের পথে বাধা সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন আলোচনা প্রসঙ্গে রানাডে খাস জমি, অর্থাৎ জমিদারের ব্যক্তিগত অধিকারের জমির আয়তন হ্রাস এবং রায়তের অধীন জমির সীমা বাড়াবার জন্য বিলের সমালোচনা করেছিলেন। এই বিলের ধারাগুলির সঙ্গে প্রুশিয়ার ভূমি আইনের বৈপরীত্য তুলে ধরে শেষোক্ত আইনে পুরনো সামন্ত ভূস্বামীদের তালুকের একাংশ নিজেদের নিঃশর্ত ও দায়মুক্ত অধিকারে রেখে বড় আকারের পুঁজিবাদী চাষে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি ঐ আইনের প্রশংসা করেন। তিনি জমি হস্তান্তর অধিকারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করার বিরোধিতা করেছিলেন প্রধানত এই আশঙ্কা থেকে যে এইসব বিধিনিষেধ "দেশের ভূমিজ পুঁজি কেন্দ্রীভূত হবার অনিবার্য প্রবণতায় বিঘ্ন ঘটাবে।"[২৮]

এই কারণেই রাণাডে ভারতের ভবিষ্যৎ কৃষি-ব্যবস্থাকে পাশাপাশি বাস করা দুটো মূলত কৃষি শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। একদিকে থাকবেন বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র চাষী যাঁরা রাষ্ট্র কিংবা ভূস্বামীর উপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত হবে এবং স্বল্প রাজস্ব ও কৃষি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুলভ ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থার ফলে আশ্বস্ত হবে। অন্য দিকে থাকবে, পুঁজিপতি কৃষিজীবী ও ভূস্বামীদের বিরাট একটি শ্রেণী যারা প্রজাস্বত্ব ইত্যাদির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না, নিজেদের জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করবে, পুঁজির বিনিয়োগে সক্ষম হবে, এবং কৃষিকাজে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারবে। রানাডে যে সরকারের রাজস্বনীতির সমালোচনা করেছিলেন তার একটা বড় কারণ ছিল তাঁর এই বিশ্বাস যে এই নীতির ফলে বৃহদায়তন কৃষির বিকাশ ব্যাহত হবে। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রুশিয়ার ক্ষেত্রে ভূস্বামী এবং কৃষক উভয় শ্রেণীর ভূ-সম্পদের অবাধ অধিকার লাভের মধ্য দিয়ে যে ভূমি-মালিকানা প্রথার উদ্ভব হয়েছিল রানাডে সেটা অনুসরণ করার প্রস্তাব করেন। তিনি দেখান যে ১৮৬০ সালে প্রুশিয়ায় কৃষি-যোগ্য ভূমির ১৫ শতাংশ ছিল রাষ্ট্র অথবা চার্চের অধিকারে এবং ৪৪ শতাংশ বৃহৎ তালুকের মালিকদের, ৩৫ শতাংশ কৃষক-মালিকদের ও ৫ শতাংশ ক্ষুদ্র মালিকদের অধিকারে। এরপর 'ধনী ভূস্বামী এবং দরিদ্র স্বাধীন

মানুষের' মধ্যে জমি সমান ভাবে বণ্টন করা হয়েছে এবং সামন্ত ভূমিদাসরা স্বাধীন মালিকে রূপান্তরিত হয়েছে, অন্যদিকে সামন্ত প্রভুরাও হয়েছে নিজেদের সম্পত্তির দায়মুক্ত অধিকারী। এই ঘটনার সপ্রশংস উল্লেখ করে রানাডে প্রুশিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলেন এবং উপসংহারে মন্তব্য করেন—

"যেমন প্রয়োজন ক্ষমতা ও সম্পত্তির মেরুদণ্ডস্বরূপ স্বাধীন ও গর্বোন্নত এক কৃষক শ্রেণী, তেমনি প্রয়োজন সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতা। একদিকে বৃহদায়তন ও অন্যদিকে ক্ষুদ্র কৃষি এবং উপরের দিকে হাজার দশেক বড়ভূম্যাধিকারী, আর নীচে বিশাল কৃষক সম্প্রদায়—দেশের শক্তি ও প্রগতির জন্য পল্লী সমাজে এই রকমই একটি মিশ্র ব্যবস্থা প্রয়োজন।"

কী ক'রে পুঁজিপতি কৃষিজীবী এবং ভূস্বামী সৃষ্টি করা যায়, রানাডে তাও পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কিছু মিতব্যয়ী স্বাধীন কৃষক ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে। তিনি এটাও আশা করেছিলেন যে বিত্তবান শ্রেণীর বহু মানুষ জমির দিকে আকৃষ্ট হবে এবং 'উদাসীন' অলস কৃষকদের জমি কিনে নিয়ে পুঁজিপতি ভূস্বামীর দায়িত্ব পালন করবে। স্পষ্টতই এটা ভেবেছিলেন রায়তওয়ারি অঞ্চলের জন্য। বঙ্গদেশের জমিদারি ব্যবস্থার জন্য রাণাডের পরামর্শ ছিল প্রুশিয়ান ভূমি-সংস্কারের অনুকরণ। তিনি বলেন, জমিদারি অঞ্চলের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন "সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুতর বিপর্যয় না ঘটিয়ে এবং বিপ্লব অথবা রক্তক্ষয়ী শ্রেণী সংঘাতের দুর্ভোগ ছাড়াই" আমূল ভূমি সংস্কার। রানাডে যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলের বিরোধিতা করেছিলেন তার অন্যতম কারণ, এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে "এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাবে।" তাছাড়া, তিনি এক-তরফাভাবে জমিদারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরোধী ছিলেন।[৩০] বঙ্গীয় বিলটি, তাঁর মতে, এটাই করতে চেয়েছিল। এই সব অধিকারের যে কোনো একটি বিলোপ করতে হলে সেজন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত—এটাই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি চেয়েছিলেন জমিদার এবং কৃষক উভয়কেই স্বাধীন ভূস্বামীর স্তরে উন্নীত করে উভয়ের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করতে। যে কারণে তিনি প্রস্তাব করেন যে, জমির সম্পূর্ণ মালিকানা কৃষকদের উপর অর্পিত হক, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের কাছে লিজ দেওয়া জমির একটি অংশের ক্ষেত্রেই এর ক্রয় মূল্য হিসাবে কৃষকেরা তাঁদের বাকি জমির স্বত্বাধিকার জমিদারদের অনুকূলে সমর্পণ করবে। এইভাবে লিজ দেওয়া জমির একটা অংশের পূর্ণ মালিকানা কৃষক পাবে, আর অন্য অংশের উপর পূর্ণ অধিকার থাকবে ভূ-স্বামীর। এর পরেও যদি জমিদারের কিছু পাওনা বাকি থাকে তাহলে কয়েক বছর ধরে খাজনার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে

দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ সংক্ষেপে, তাঁর প্রস্তাব ছিল, জমিদারি বিলুপ্তির জন্য জমিদারদের ক্ষতিপূরণ ও তৎসহ লিজ দেওয়া জমির একাংশে তাঁদের নিজস্ব আবাদে চালিয়ে যেতে দিতে হবে। তার ফলে খাজনা-আদায়কারী অনুপস্থিত জমিদারেরা উদ্যমী পুঁজিপতি কৃষক বা ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হবে। পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন বঙ্গদেশে অধিকৃত জমির ২/৩ ভাগ এবং অনধিকৃত জমির ১/২ ভাগ নিঃশর্ত স্বত্বসহ কৃষকদের হাতে অর্পণ করা হক, এবং অধিকৃত জমির ১/৩ ভাগ ও অনধিকৃত জমির ১/২ ভাগ জমিদারদের খাস জমিতে পরিণত করা হক। যেহেতু এই বিভাজনের ফলে জমিদারের ক্ষতি আংশিকভাবে পূরণ হবে মাত্র সেজন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন বাকি ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য কৃষকেরা তিরিশ অথবা চল্লিশ বছর ধরে তাঁদের কমিয়ে দেওয়া জমির উপর আগের হারে খাজনা দিয়ে যাবেন—"যাতে ক্রয়মূল্যের বাকি টাকাটা সুদসহ শোধ করা যায়।" সরকার টাকাটা—রানাডের হিসাব মতন প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা—কৃষকদের আগাম দিয়ে ভূস্বামীদের স্বত্ব ক্রয় করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। রানাডে ভেবেছিলেন এইভাবেই 'কায়েমি স্বার্থের কোনো মারাত্মক ক্ষতি না ঘটিয়েই এক কি দুই পুরুষের মধ্যে বঙ্গদেশের রায়তদের মুক্তি অর্জন' সম্ভব। লক্ষ্যণীয় যে এই স্বাধীন প্রজা এবং পুঁজিপতি ভূস্বামী সৃষ্টির পুরো পরিকল্পনাটাই ছিল জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। রাণাডের এই সংস্কার প্রস্তাবের লক্ষ্য যতটা স্বাধীন কৃষক শ্রেণী গঠন ছিল তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে ছিল খাজনা-গ্রহণকারী জমিদারদের পুঁজিপতি ভূস্বামীতে রূপান্তর করা। তিনি চেয়েছিলেন, জমিতে স্বাধীন সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি করতে হবে জমি ভূস্বামীদের হাতে তুলে দিয়ে, কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে নয়। কিন্তু রানাডের এই ভূমি-সংস্কারের পরিকল্পনা এতটাই রায়ত-স্বার্থ বিরোধী ছিল যে এটা কল্পনাই করা যায় না যে তারা জমির স্বাধীন মালিকানার খেতাব অর্জন করার জন্যে তাঁদের প্রজা-পরিচয়—সুরক্ষিত বা অরক্ষিত যাইহোক—ত্যাগ করতে রাজি হ'ত।

কিছু সংখ্যক নেতা পুঁজি এবং শ্রম উভয়কে একত্র করে কৃষির উন্নতির দাবি জানাবার সময় রানাডের ভারতীয় কৃষির এই প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা-পূর্ণ পরিকল্পনার প্রতি অস্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় কেউই সুনির্দিষ্ট এবং বিশদভাবে সমর্থন জানাননি। সমর্থনের একটা নজির পাওয়া যায় ১৮৯০ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে। দেওরাও বিনায়ক তাঁর ভাষণে প্রস্তাব করেছিলেন, জমি তাদের হাতেই থাকা উচিত যাদের জমির উন্নতিসাধন করার ক্ষমতা আছে, "নুন আনতে যে সব চাষীদের পান্তা ফুরোয় তাদের হাতে নয়।" তিনি দাবি করেন, "ছোট পুঁজিপতিদের, অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের একটা শ্রেণী সৃষ্টির"

স্বারাই' কৃষি-সম্পদের সার্বোত্তম বিকাশ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন, 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুঁজিবাদী কৃষির স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন, এই যুক্তিতে যে, তার ফলে বেকারত্ব বাড়বে এবং কৃষকদের আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।

৯. কৃষি ও শিল্প

কিছু নেতা কৃষির বিকাশ এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়টিকে ভারতীয় অর্থনীতির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছিলেন। এইসব নেতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কৃষির প্রগতি এবং দ্রুত শিল্পবিকাশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। এঁদের মতে, সারা দেশের গ্রামীণ হয়ে ওঠার প্রবণতাকে রোধ করে যদি সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে চালিত করা না যায় তাহলে যতই 'জোড়াতালি' দিয়ে কৃষিসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হক না কেন, তাতে কোন লাভ হবে না।

এই মতের একজন প্রবক্তা ছিলেন রানাডে। ১৮৮১ সালেই তিনি দেখিয়েছিলেন যে যেহেতু ভারতীয় কৃষির ব্যাধি "নিহিত রয়েছে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে", "নিছক রোগলক্ষণের উপশমের স্বারা অথবা বহির্ঙ্গের শুশ্রূষার স্বরা কিছুই করা যাবে না।' অন্য সব কিছুর আগে যা প্রয়োজনীয় তা হল, কৃষির উপর সরকারি দাবি হ্রাস এবং 'শ্রম, শিল্প ও উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের জন্য নূতন নূতন রাস্তা খুলে দিয়ে জমির উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমানো"।[৩১] পরে, ১৮৯২ সালে "ভারতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি" বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময় রাণাডে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, একটা দেশকে যদি চিরদিনের জন্য কৃষিনির্ভর হয়ে থাকতে হয় তাহলে তার কপালে শুধু দারিদ্র্যই জুটবে তাই নয়, সেই দেশ ক্রমাগতঃ দরিদ্রতর হবে কেননা কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকর হয় এবং ভারতের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা আরও বেশি কারণ এখানে "অনিশ্চিত বারিপাতের প্রতিবন্ধকত রয়েছে।"

মারহাট্টা পত্রিকার ১৮৮১-৮৪ সালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে কৃষি ও শিল্পবিকাশের পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কটিকে বারম্বার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ১৮৮১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাগজটি লিখেছিল।—

"কৃষিশ্রমের বাজারে কৃষিশ্রমিকের আধিক্য রয়েছে, এবং বাড়তি শ্রমের জোগানকে অন্যত্র নিয়োগ করা না গেলে কৃষিজীবীদের দুর্দশামোচনের জন্যে যে পন্থাই অবলম্বন করা হক না কেন তা চিরস্থায়ী ফলপ্রসূ হবে না। যুগপৎ কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি একান্ত প্রয়োজন।"

একইভাবে ১৮৮২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি লিখেছিল—"বিভিন্ন ধরনের শিল্প গঠন ছাড়া নিছক আইন প্রণয়ন, ব্যাঙ্ক স্থাপন, এমনকি ভূমিস্বত্বের

চিরস্থায়ী-করণের দ্বারা কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নতি করা যাবে না, কেননা কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়।" ১৮৮৪ সালের ২৫শে মে নেটিভ ওপিনিয়নও একই বক্তব্য উপস্থিত করেছিল।

১৮৯৫ সালে পি সি রায় রাণাডের মত অনুমোদন করে বলেন যে "কৃষকদের নিয়ে গঠিত জাতি কারিগর এবং উৎপাদকদের জাতির তুলনায় সর্বদাই অনেক হীন হয়ে থাকতে বাধ্য। সেজন্য, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হল, ভারতের মুমূর্ষু শিল্পসমূহকে পুণরুজ্জীবিত করা, এবং পশ্চিমী আদর্শে আধুনিক শিল্প প্রবর্তন করা, যাতে "কৃষিকে অপ্রয়োজনীয় শ্রম থেকে মুক্ত করা যায়।"

জি ভি যোশি কৃষির উপর অতিরিক্ত জন সংখ্যার চাপের জন্য দায়ী করেছিলেন জমির জন্যে অস্বাস্থ্যকর এবং অত্যধিক প্রতিযোগিতাকে। এর ফলে, নিদারুণ খাজনা বৃদ্ধি হয়, জমি খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে যায়, এবং রায়ত জমির উন্নতিসাধনে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও কৃষির উপর অতিরিক্ত জন সংখ্যার চাপের ফলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অলস থাকতে বাধ্য হয়, অথবা অন্যভাবে বললে, 'অর্থনৈতিক শক্তির বিপুল ক্ষয় হয়।' তাঁর হিসাব অনুযায়ী গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিরই উপযুক্ত কাজ ছিল না। সেজন্য তিনি অ-কৃষিমূলক শিল্পাদির বিকাশ সুপারিশ করেছিলেন, যাতে কৃষি থেকে "উদ্বৃত্ত শ্রমকে অপসারিত করা যায়।" তাঁর অভিমত ছিল, "শ্রমের জন্য এই রকম নতুন নতুন পথ খুলে দিয়ে রায়তকে যত বেশি অস্বাস্থ্যকর, অস্বাভাবিক চাপের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে তার কাজের পরিবেশ তত অনুকূল হয়ে উঠবে, এবং সাফল্যের সম্ভাবনাও উজ্জ্বলতর হবে" যোশি একটি বিষয়ের উপরই জোর দিয়েছিলেন তা হল, যতদিন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকবে ততদিন "আমাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।" ১৯০১ সালের ১৮ই জুন এবং ১৯০২ সালের ১১ই নভেম্বর তিলক সম্পাদিত কেশরী এই উভয় বক্তব্যকেই সমর্থন করেছিল।

জি সুব্রহ্মণ্য আইয়ারও ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সাম ইকনমিক এ্যাস্পেক্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এই বক্তব্যকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করেছিলেন। রাশিয়ার অর্থমন্ত্রী এম. ডি বিটু-এর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত একটা দেশ নিছক কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে থাকবে ততদিন সে দেশের পক্ষে "মাঝে মাঝেই দুর্ভিক্ষ এবং স্বাভাবিক দুর্দশার" হাত থেকে পরিত্রাণ অসম্ভব। তাঁর মতে, ভারতের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ছিল রাশিয়ার তুলনায় আরো সঙ্গিন, এ কেননা দেশের জনসমষ্টির আট-দশমাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং অবশিষ্টাংশ ছিল প্রধানত "কুলীগিরি অথবা তুচ্ছ অনুৎপাদক পেশায়" নিযুক্ত। তিনি লিখেছিলেন,—"ভারতের অর্থনৈতিক

বাবস্থার এই গুরুতর ত্রুটির প্রতিকার না করা পর্যন্ত কি কৃষক কি অন্যান্য সম্প্রদায় সবার কাছেই রামরাজ্য দূর-অস্ত থেকে যাবে এবং দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্য মোচন সম্ভব হবে না।" দেশ জুড়ে শিল্পায়নই হল 'ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র শর্ত'।"

টীকা

১। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল এবং তাও পঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর ১৮৯৯ সালে বিলের উপর একটা প্রস্তাবের আকারে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কংগ্রেস এ দাবিও উত্থাপন করে যে ভূস্বামীরা ব্যক্তিগতভাবে "খাজনা গ্রহীতা যেখানে সেখানে অন্যায় খাজনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হক" (প্রস্তাব—1৮—৮)। প্রসঙ্গত, জমিদারি ব্যবস্থার ব্যাপারে কংগ্রেসের নীরবতার সঙ্গে এ ও হিউমের বক্তব্যের বৈশাদৃশ্য তুলনীয়। হিউম তাঁর 'হিন্টস্ অন এগ্রিকালচারাল রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া' (কলকাতা, ১৮৭৯, পৃঃ ৩) পুস্তিকায় "চরম জমিদারতন্ত্র", ও "খাজনার অধিকারী ও 'অপ্রয়োজনীয় মধ্যস্বত্বভোগী" ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করা দরকার, যে, প্রজাদের স্থায়ী স্বত্বের 'দাবি' প্রথম ১৮১১ সালে উত্থাপন করেন রাজা রামমোহন রায়।

৩। এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য খুব একটা পাওয়া যায় না। তার একটি কারণ, বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের ব্যর্থতা। তবে, এটিই একমাত্র কারণ নয়। আমি নিজে যেসব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র এবং বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের রচনা ও বক্তৃতার মূল লিপি দেখেছি সেগুলির সব কটিতেই এই বিষয়ে আগ্রহের অভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া এটা অনুমান করাও সম্ভবত অসঙ্গত হবে না যে তাঁদের মন্তব্য যদি জোরদার ও ব্যাপক হ'ত তাহলে অন্তত বহু ক্ষেত্রেই দেশীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের পক্ষে সেগুলিকে সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ত না।

৪। ১৮৮১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় পত্রিকাটি লিখেছিল—"দেশ বলতে কাদের বোঝায়? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশণের কয়েকশ সদস্যকে? নাকি, মফস্বলের সামান্য কয়েক হাজার জমিদারকে? অথবা, কলকাতার দু এক লক্ষ মানুষকে?…দেশকে পাওয়া যাবে জীর্ণ কুটিরে…বাংলার মূক কৃষক সমাজই প্রকৃত পক্ষে দেশ।"

৫। ১৮৮১ সালের ২৫শে আগস্ট "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে" উদ্ধৃত ভারত-সভার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন। ১৮৮১ সালের ২৭শে জুন রায়তদের প্রতিনিধি হিসেবে সভা বাংলা সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ১৮৮৩ সালের ২৯শে অক্টোবর আর একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছিল।

৬। ১৮৮৫ সালে রায়ত সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—"বর্তমানে সভা গ্রাম স্তরে সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। কেননা, আমাদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াকে বাস্তব ক্ষমতার ভিত্তিতে শক্তিশালী হতে হলে তা ব্যাপক জনসাধারণের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। প্রায়শই আমাদের সমালোচনা করে বলা হয় আমাদের রাজনৈতিক

তৎপরতা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত বাবুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সমালোচনার সম্মুখীন যাতে আর না হতে হয় তার জন্য সভা বদ্ধপরিকর।"

৭। এটা উল্লেখ করা দরকার যে, ১৮৮৩ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রস্তাবের যে সমালোচনা রাণাডে করেছিলেন তার অন্যতম কারণ এটিও। তিনি আশংকা করেছিলেন এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মাত্রাতিরিক্ত হবে এবং সেজন্য "শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত" দেখা দেবে।

৮। ১৮৮১ সালের ৩রা মার্চের সংখ্যায় 'পত্রিকা' দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিল, গ্রাম বাংলার মধ্যস্বত্বভোগীরা আসলে 'বাবু' সম্প্রদায়ভুক্ত—এঁরা পরীক্ষা পাস করেছেন এবং "লিখতে, পড়তে ও চেঁচাতে" পারেন।

৯। ১৮৮৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি "দ্য বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" ১৮৮৪ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়ায় জমিদারদের যে অগ্রক্রয়াধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল তার বিরোধিতা করে।

১০। ভারত-সভা দাবি করেছিল যে একবার খাজনা বাড়ালে তা অন্তত ৩০ বছরের জন্য অপরিবর্তিত থাকবে বলে ঘোষণা করতে হবে (১৮৮১ সালের ২৭শে জুনের স্মারকলিপি)। ১৮৮৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা" এবং ২৭শে জুন "সময়" পত্রিকায় দাবি করা হয় যে সরকার যেন সরাসরি রায়তদের সঙ্গে চুক্তি করে খাজনার হার নির্দিষ্ট করে দেয়। কেননা তার ফলে রায়তরা অনুভব করতে পারবে তারাই জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী এবং জমিদার খাজনা আদায়কারী 'মাত্র'।

১১। অশোক মিত্র (সম্পাদিত) ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে (ভল্যু VI পার্ট—1A) মন্তব্য করা হয়েছে: "যদিও এইসব আইনের (১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন) ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, যথেষ্ট খাজনা বৃদ্ধি ও উচ্ছেদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা, বাস্তবে তার ফল হয়েছে জমিদার নয় কৃষকের স্বার্থহানি ঘটিয়ে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও জোতদারদের স্বার্থ-রক্ষা। লাভবান হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সেইসব ধনী কৃষক যারা জমিদারদের ভগ্ন দশার ফলে উদ্ভূত হয়ে ব্যাপকভাবে ও ক্রমাগত ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিকদের নিষ্পেষণ করে নিজেদের স্বার্থের বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। বর্তমান শতাব্দিতে এবং বিগত শতাব্দিতেও এই শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখা সরকারের কাছে ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল।"

১২। ১৮৮৪ সালের ৩রা নভেম্বর "সময়" প্রস্তাব করে যে, আইন করে প্রকৃত চাষী নয় এমন কাউকে দখলি স্বত্ব প্রদান বন্ধ করে দিতে হবে।

১৩। প্রবন্ধটি লেখকের নাম ছাড়া প্রকাশিত হয়। তবে, মানকর-এর অভিমতানুসারে এটি রাণাডের লেখা। লেখাটির মধ্যেই এমন প্রমান আছে যাতে মনে হয় মানকরের এই বক্তব্যই ঠিক।

১৪। পরবর্তীকালেও বসু ভারতীয় আইনটি সম্পর্কে একই সংশয় প্রকাশ করেছেন। এঁরা দেখিয়েছেন যে, মহাজন ও ঋণ-গ্রহিতার যোগসাজশে আইনটি কার্যত বাতিল হয়ে গিয়েছিল, এবং বস্তুত বহু ক্ষেত্রেই জমি এই আইনের বলেই মহাজনদের কুক্ষিগত হয়েছে। এই কারণেই এঁরা আরও উদার ভূমিরাজস্ব নীতি গ্রহণের জন্য এবং কৃষকদের ঋণ গ্রহণের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন।

১৫। ১৮৯৯ সালের ৭ই ও ৮ই অক্টোবর যথাক্রমে "হিন্দু" ও "মাহরাট্টা" পত্রিকায় প্রস্তাবটিকে সরাসরি পরিত্যাজ্য না-বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল যে এতে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা কার্যত অসার।

১৬। কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঞ্জাবের দুজন অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা মুরলিধর ও কানহাইয়া লাল প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।

১৭। একইভাবে ১৯০০ সালের ২২শে আগস্ট "ভিক্টোরিয়া পেপার" আগের অবস্থান থেকে সরে এসে সংশোধিত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছিল।

১৮। অন্য দিকে গোখেল অভিযোগ করেন যে বোম্বাই-এর ব্যবস্থায় যাদের লক্ষ্য বলা হয়েছে তারা কোনো মতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

১৯। উদাহরণস্বরূপ, ফিরোজশাহ মেটা এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেন—"ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ সরকারি যেসব কার্যকলাপ তা যদি অসহানুভূতিশীল নাও হয়, এবং ভারতীয়দের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অনুৎসুক যদি নাও হয়ও তা অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং পুরোপুরি অপরিচিত ও বিদেশীদের" কার্যকলাপ। তিনি দাবি করেন—"আমি এবং আমার স্বদেশীয় সহকর্মীরাই শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং স্বজ্ঞার সাহায্যে প্রাথমিকভাবে রায়তদের অনুভূতি ও চিন্তা, তাদের সংস্কার, ভাবনা-চিন্তার ধরণ, জীবনযাত্রাপদ্ধতি, আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি ইংরেজ প্রসাশকরা নয় কেবল আমরাই কৃষির সংগে যুক্ত জনসাধারণের প্রকৃত মতামত তুলে ধরতে পারি।" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ৬৭০)।

২০। যেমন, জি. এস. আয়ার মন্তব্য করেছিলেনঃ "রাজস্বের হার যদি এতই কম যে তার ফলে গ্রামে বিপুল ঋণের বোঝা দেখা দিয়েছে, তাহলে সরকার ইচ্ছে করলেই একটা নির্দেশ জারি করে এমনভাবে খাজনা বাড়িয়ে দিতে পারেন যাতে জমির আয়ে জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং সরকারও তখন কৃষি-ঋণের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। কী দরকার সরকারের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার—লর্ড কার্জন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—যে ভবিষ্যতে এ-ব্যাপারে নরম ব্যবস্থা নেওয়া হবে?" রমেশচন্দ্র দত্তও সরকারকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে, সরকার বাস্তবে "প্রাচীনকালের জমিদারদের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করছেন যার মূলকথাঃ কৃষকদের আরও শোষণ করা হক যাতে বেচারারা খারাপ পথে না যেতে পারে" (বক্তৃতাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪ ৯৫)।

২১। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেনঃ "যদি দেখা যায় কিংবা ধরে নেওয়া হয় যে কৃষকেরা জমি হস্তান্তরের অধিকার না দেওয়া সত্ত্বেও সরকারের রাজস্বের দাবি মেটাতে পারছে এবং তাদের অজ্ঞানতা, সঞ্চয়ের অক্ষমতা বা অন্য কারণে হস্তান্তরের অধিকারের অপব্যবহারের সম্ভাবনা, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নেয়। এমন কি আশাব্যঞ্জকও হতে পারে।"

২২। বোম্বাই-এর ভূমি রাজস্ব আইনের প্রস্তাবের উপর বক্তৃতায় জি. কে. গোখেল এই সমালোচনা করেন। গোখেল বলেন যে, "যদি সত্যিই এই আইনের প্রস্তাব যারা মহাজনদের অধীনস্থ ভূমিদাস তাদের ভার লাঘব করতে সহায়ক হয়, তাহলে অবশ্যই মেনে নেব এর বিরুদ্ধে যে সমালোচনাই করা হ'ক না কেন, প্রস্তাবটির পক্ষেও বলার আছে", কিন্তু তাঁর দৃঢ় অভিমত—"এই আইনের ফলে সে রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।" (বক্তৃতাবলী, পৃঃ ১০২)।

২৩। তুলনীয়—মুর ম্যাকেঞ্জির মন্তব্য: "খাজনা মওকুফ করার কোনো ব্যবস্থাই ঋণ গ্রহণ বন্ধ করতে অথবা ঋণাংস্থার উন্নতিসাধন করতে পারবে না। খাজনা নেওয়া বন্ধ করে দিলেও তা হবে না।"

২৪। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে বাঙলাদেশে প্রচলিত ব্যবস্থার কুফল দূর করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাণাডে পুরোপুরি একমত ছিলেন।

২৫। বঙ্গদেশের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—"রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ফলশ্রুতি ভূমিস্বত্বের

সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা। এই ত্রুটি দূর করার মত সব আইনের প্রবণতাই হবে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব জোত, খামার অথবা জেরায়েত সৃষ্টি। কেননা জমিকে মালিকের পুরোপুরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি করা হলে ক্ষতি কিছু নেই অথচ সবদিক থেকেই লাভবান হওয়া যায়।"

২৬। তাঁর মতে, "জমি সম্পর্কে কোনো আগ্রহই না থাকায়, মহাজনেরা কখনই জমিদারের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারবে না বা তারা জমিদারের মত ক্ষমতার অধিকারী হবে না এবং জমিদারের কাজ করতে পারবে না। জমিদারশ্রেণীর অনুপস্থিতি ঘটলে সব দিক থেকেই প্রগতি বিঘ্নিত হবে।" (কৃষি-সমস্যা ও তার সমাধান", পৃঃ ১৭)।

২৭। রাণাডে লিখেছিলেন: "দেশ এখন আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে আরও স্থিতিশীল বাণিজ্যিক ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে।...এই অবস্থায় কোনো অর্থনৈতিক আইন যদি স্রোতের বিরুদ্ধে যায় বা স্রোতকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করে তাহলে তা সফল হতে পারে না। সব দেশেই সম্পত্তি—জমি বা অন্যবিধ যাই হোক—অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে দাঁড়াতে অসমর্থ ব্যক্তির হাত থেকে অবশ্যই বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সঞ্চয়ী ব্যক্তির হাতে চলে যেতে বাধ্য। এটাই ঐশ্বরিক বিধান। ...সরকার বড়জোর অনিবার্য এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পরিবর্তনকে সহনীয় করে তুলতে পারেন, যাতে আশু কষ্ট লাঘব করা যায়।" প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, সার্বোক মহাজনেরা যে তাদের সুদের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যই জমি দখল করত এবং কৃষির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা নেওয়ার কোনো আগ্রহই যে তাদের ছিল না। রাণাডে সে-বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন।

২৮। রাণাডে কখনই বঙ্গদেশের জমিদারকুলকে তাঁর প্রস্তাবিত কৃষিব্যবস্থায় পুঁজিপতি মালিক বলে ধরে নেওয়ার মত ভুল করেননি, যেটা পরবর্তীকালের বহু ভারতীয় লেখক প্রায়শই করেছেন। বরং রাণাডে এই অভিমত পোষণ করতেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দির বঙ্গদেশের অবস্থা ছিল মূলত ঐ শতাব্দির প্রথমার্ধে প্রুশিয়ার অবস্থার অনুরূপ। ঐ সময়কার প্রুশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে এদের (বঙ্গদেশের জমিদার শ্রেণীর) ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।" এই কারণেই রাণাডে প্রুশিয়ার কৃষি সমস্যা ভালোভাবে অনুধাবন করার উপর জোর দিয়েছিলেন।

২৯। তিনি অভিযোগ করেন, "আইনটিতে বর্তমানে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে এক শ্রেণীর সুবিধের জন্য অন্য আর একটি শ্রেণীর স্বার্থ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে, যা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যতান্ত্রিক নীতির দ্বারাই সমর্থনযোগ্য।"

৩০। তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গেই রাণাডে এই সমীকরণের বিপরীত দিকটিকেও ধরতে পেরেছিলেন: "অবশ্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কৃষিকর্মে এই অনুপ্রেরণার সুফল অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে পৌঁছোবে এবং সবদিক থেকেই দেশীয় সম্পদের এমন বিকাশ ঘটবে, যা এখন ভাবাই যায় না।"

১১

রাষ্ট্রীয় আর্থিক নীতি—১

আমাদের আলোচ্য সময়ে শিল্প ও শুল্ক নীতির পরেই জাতীয় নেতাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিল সরকারের আর্থিক নীতি। ঐ সময়ে সরকার অনুসৃত আর্থিক নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—এশিয়ায় ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার ফলে রুশ কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশংকার জন্য সামরিক ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি; সোনার হিসেবে রুপোর দামের অবনমন; রেলপথের দ্রুত বিস্তৃতির জন্য ব্যয়; এবং এ-সবের ফলশ্রুতিতে, ক্রমাগত ব্যয়ভার বৃদ্ধির জন্য, করবৃদ্ধি। যদিও এর মধ্যে কয়েক বছর ভারতীয় আর্থিক বিষয়ক কমিটির সদস্যরা বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখাতে পেরেছিলেন, আসলে সামগ্রিক সময়টা ছিল আর্থিক ভারসাম্যহীনতা ও অস্বস্তির সময়। ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য করের বোঝা বাড়াতে হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা হয়নি। মজার ব্যাপার অর্থ-বিষয়ক সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্ভাগ্যের কথা বলে বিলাপ করলেও, ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞরা যখনই এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মতামতে সাধারণভাবে একটি নিশ্চিন্ত মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৩ সালে জেনারেল চেসনি 'ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা" নামে একটি বই লেখেন, তাতে তিনি "ভারতের আর্থিক অবস্থায় অসামান্য স্থিতি" লক্ষ্য করে হর্ষ প্রকাশ করেছিলেন। জেমস ওয়েস্ট-ল্যাণ্ড ১৮৭৮ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ভারতের অর্থনীতি পর্যালোচনা করে ১৮৯৮-৯৯ সালের অর্থবিষয়ক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিলেন: "আমি বিগত কুড়ি বছরের যেসব তথ্য উপস্থিত করেছি তা একমাত্র যুক্তরাজ্য ছাড়া বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় ভালো অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে।" একইভাবে, ১৯০১ সালে স্বরাষ্ট্রসচিব জর্জ হ্যামিলটন "ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।"[১]

অন্যদিকে, জাতীয় নেতৃত্বের অভিমত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে অমৃত বাজার পত্রিকা ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাকে 'আগাপাশ-তলা অসুস্থ' বলে বর্ণনা করে। জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৯৪ সালের অধিবেশনে ডি. ই. ওয়াচা মন্তব্য করেন যে, "আমাদের সব অভিযোগের মূলে" আছে মন্দ অর্থনীতি এবং "ব্রিটেন যদি ভারতকে হারাতে বাধ্য হয় তাহলে তা হবে এই দুঃবিসহ আর্থিক অবস্থার জন্য"। "যে কোনো দেশের জনসাধারণের অবস্থা

বোঝা যায় আর্থিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে”—জন ব্রাইট-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন যে এই নিরিখে ভারতের অবস্থা “সত্যিই শোচনীয়” কেননা ভারতের অর্থনীতি “ক্রমাগত ঘাটতি ও ঋণের বোঝায় নিমজ্জিত”।[২] পরের বছর, ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত “দ্য প্রেজেন্ট ফিনানসিয়াল পোজিশন” নামে প্রবন্ধে জি. ভি. যোশি “ভারতের আর্থিক অবস্থা অর্থনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতার নিদর্শন”, সরকারি এই বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করে দেখান যে ভারতবর্ষ “তীব্রতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি।” তাঁর মতে, অবস্থা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে কোনো একজন প্রশাসকের কার্যকলাপ বা ভুল ত্রুটির এর জন্য দায়ী ছিল না—“গোটা দেশের আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থাই ছিল এই সংকটের কারণ।”[৩] একইভাবে, জি. কে গোখেলও ১৯০২ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বাজেটের উপর তার প্রথম বক্তৃতায় ১৮৮৫-৬ সাল থেকে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে অভিযোগ করেছিলেন যে, ঐ বছর থেকে “আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে এটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এ-দেশের রাজস্বকে দেশের স্বার্থে ব্যবহারের থেকে অন্য কোনো স্বার্থে ব্যবহারের প্রয়োজন প্রাধান্য পেয়েছে।”

ভারতের অর্থনীতির পরিচালনা ব্যবস্থার এই সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় নেতারা সরকারের রাজস্বনীতিকে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ এবং বিকল্প নীতির প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তাঁরা যেগুলিকে জনসাধারণের উপর নতুন করের বোঝা চাপানোর অথবা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্যের কিংবা কল্যাণমুখী নয় এমন ব্যয়ের দৃষ্টান্ত অথবা ভারত ও ব্রিটেনের আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যায় সিদ্ধান্তের উদাহরণ বলে মনে করেছেন, সেগুলিকে বিশেষ করে বিচার বিশ্লেষণ করে নিন্দা করেছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছেন। এর প্রতিটি উদাহরণ থেকে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

১. করব্যবস্থা

সরকারি হিসেবমত দেখা যায় ১৮৮০ সালে ভারতে মোট কর আদায় হত ৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, ১৮৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবং ১৯০৪ সালে ১৭২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।[৪] কিন্তু এই পরিসংখ্যান ছিল কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। তার কারণ, এর মধ্যে অন্যান্য রাজস্বের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় রেল পরিবহন ব্যবস্থার ও সেচ ব্যবস্থার মোট আয় এবং অন্যান্য রেল ব্যবস্থার নীট আয়ও ধরা হয়েছিল। তাছাড়া হিসেবের এককের

পরিবর্তন করার ফলে অন্য আরো কিছু কারণে এক বছরের সঙ্গে অন্য বছরের আয়ের তুলনা অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

রাজস্বের বোঝা জনসাধারণের উপর কতটা পড়েছে তা নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় নেতাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত দেখা গিয়েছিল। বেশির ভাগ ব্রিটিশ লেখক ও পদস্থ কর্মচারি সরকারের মোট রাজস্ব ও করের পরিমানকে এক করে দেখার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে আপত্তি জানিয়েছেন। এঁদের অনেকে ভূমি রাজস্বকে কর না বলে রাষ্ট্রীয় খাজনা হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছেন। একইভাবে, আফিম করকে তাঁরা জনসাধারণের উপর ধার্য কর বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, ভারতীয় লেখকরা সরকারের আয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ উৎসকেই কর বলে অভিহিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দাদাভাই নৌরজি দেশের মোট আয়কে অর্থাৎ "সরকারি প্রশাসন, পরিচালনা, সরকারি ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি খাতে" সংগৃহীত সব অর্থকেও কর আখ্যা দিয়েছিলেন।[৫] বর্তমানে কর-এর যে সংজ্ঞার্থ করা হয় তাতে ভারতীয় নেতাদের বক্তব্যকেই অপেক্ষাকৃত সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ব্রিটিশ প্রশাসকেরা সবাই ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে দাবি করেন যে ভারতে করের বোঝা ছিল নিতান্তই কম, এবং সম্ভবত ভারতবর্ষই ছিল বিশ্বের সেই দেশ যেখানে করের বোঝা সবচেয়ে কম। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, অর্থ কমিটির সদস্য জন স্ট্র্যাচি ১৮৯৪ সালে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—"ভারতবর্ষের মত এমন আর একটি দেশ নেই যেখানে সভ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে অথচ করের পরিমাণ এত কম।" এ-বিষয়ে কার্জন-ও কম সুনিশ্চিত ছিলেন না। ভারতের জনসাধারণ করের বোঝায় পিষ্ট হচ্ছে গোখেলের এই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে ১৯০২ সালে তিনি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেন—"মাননীয় সদস্য যদি ইউরোপের কোনো দেশে বসবাস করতে যান, তাহলে আমার বিশ্বাস তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসবেন এবং তখন এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্যরকম মতামত দেবেন।"

অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ব্রিটেনের, তুলনায় ভারতে মাথাপিছু করভারের আপতন যে কম সেটা ব্রিটিশ প্রশাসকরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে, তদানীন্তন অর্থসংক্রান্ত সদস্য জেমস উইলসন ব্রিটেন ও ভারতের মাথাপিছু করের বোঝার তুলনা করে দেখিয়েছিলেন, ব্রিটেনে মাথাপিছু কর যখন ২ পা ৩ শিলিং ভারতে তখন করের পরিমাণ ছিল ৫ শিলিং। এর এগারো বছর পরে ভাইসরয় লর্ড মেয়ো ভারতে করের পরিমানের স্বল্পতা প্রমানের জন্য দেখান যে এদেশে মাথাপিছু কর ছিল ১ শিঃ ১০ পে।[৬] এই সংখ্যাটা তিনি পেয়েছিলেন সরকারের মোট রাজস্ব আয় থেকে ভূমি রাজস্ব, আফিং কর, নজরানা, এবং অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে। একইভাবে হিসেব

করে ভারতসচিব হেনরি ফাউলার ১৮৯৪ সালে ঘোষণা করেন—"ভারতে মাথাপিছু কর-এর পরিমাণ ২ শি ৬ পে. যা যুক্তরাজ্যের মাথাপিছু করের ১/২০ অংশ এবং আয়ার্ল্যান্ডের মাথা পিছু করের ১/১৩ অংশ।"[৭]

লক্ষণীয় যে, ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০৪ সালে যে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছিল—তাঁদের মতে, নতুন কর প্রবর্তন না-করেই—ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মচারিরা তাকে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির সূচক বলে উপস্থিত করেছিলেন। যেমন, জেনারেল চেসনি দাবি করেন ঃ "বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি এটাই সূচীত করে যে বছরের পর বছর সীমিত পরিমাণে হলেও দেশের বৈষয়িক অবস্থার ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে উন্নতি ঘটেছে"। ১৯০৩ সালে কার্জন রীতিমত গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করেন—"আমরা নিয়মিত রাজস্ব-বৃদ্ধি, বিপুল ও ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত এবং অন্যান্য নিদর্শন দেখিয়েছি যেগুলি বৈষয়িক সমৃদ্ধির দ্যোতক।" কিছু ব্রিটিশ কর্মচারি এমনকি এ দাবিও করেন যে ১৮৬০ সালের পর থেকে করের বোঝা প্রকৃতপক্ষে কমে গিয়েছিল।

ভারতীয় নেতারা কিন্তু সরকারের এইসব দাবিকে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছিলেন।[৮] তাঁরা বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে ভারতে করের বোঝা ছিল বিপুল ও অসহনীয়, সাধারণ মানুষের ও দেশের সম্পদের ক্ষমতার বাইরে, এবং তা সর্বোচ্চ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল। করভারের নিষ্পেশন সম্পর্কে এই বক্তব্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের একটি নিয়মিত অভিযোগের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বহু ভারতীয় নেতা এ-বিষয়ে কঠোর ভাষায় তিক্ত ও ক্রুদ্ধ মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন।

বহু আগে—১৮৩৮ সালে—ইয়ং বেঙ্গল-এর সদস্যরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে "দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিপুল করের বোঝা" সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। এরপর ১৮৭১ সালে বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন কমনস সভার কাছে একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে অভিযোগ করে যে, "অতিরিক্ত করের বোঝা বহু বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের দুর্দশার হেতু।" ১৮৭৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন ঃ "কেউ যদি এক ঝলক দেখে তাহলেও তাঁর কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে এদেশে করের বোঝা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এবং এর উপর নতুন কোনো কর আরোপ করা হলেই সেটা হবে প্রাণঘাতী।" একইভাবে রানাডে-ও ১৮৮০ সালে মন্তব্য করেন—"করের পরিমাণ যদি আর বাড়ানো হয় তবে তাকে অবশ্যই রাজনৈতিক পাগলামো বলে গণ্য করতে হবে।" ১৮৮৫ সালের ২৭শে আগস্ট অমৃত বাজার পত্রিকা লেখে—"একটা সীমার পরে যে কর বাড়ানো সম্ভব নয়" এবং "ভারতে করের পরিমান ইতিমধ্যেই সেই সীমায় পৌঁছে গেছে তা বহু তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায়।" পত্রিকাটি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে মন্তব্য করে—"চিন্তাভাবনা-শূন্য শাসকরা ঐ সীমা অতিক্রম

করে কর চাপালে তার পরিণতি হবে বিদ্রোহ ; আর যদি এমন হয় যে জনসাধারণ এত দুর্বল যে তাদের বিদ্রোহ করার ক্ষমতা নেই, তাহলে প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করে ; তার ক্রোধের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। পরপর দুর্ভিক্ষের ঘটনা দেখলে বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে সেই সীমা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করা হয়েছে।"

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই করের ব্যাপারটি তীব্র আক্রমণের বিষয় হয়েছিল। দাদাভাই নৌরোজি শাসকদের অভিযুক্ত করে বলেছিলেন, তারা "কমলালেবু নিংড়ে রস বের করার মত ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমানে কর নিংড়ে নিচ্ছে, এবং তার ফলে দুর্দশা ও দুঃখকষ্ট চাপিয়ে দিচ্ছে।" এছাড়াও, ১৮৮৮ সালের ৩১ শে জানুয়ারি তিলকের কেশরী পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—"ভারতে কোনো দ্রব্যই করের আওতার বাইরে নেই ; এমনকি গাছের পাতার উপরও কর চাপানো হয়েছে।" বিদ্রূপ করে কেশরী লিখেছিল—"অবশ্য এখনও কিছু কিছু জিনিস আছে যার উপর কর চাপানো যেতে পারে এবং তাহলেই ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হবে—এর মধ্যে একটি ভারতের মানুষের গায়ের চামড়া, আরেকটি তার বায়ুমণ্ডল।"[৯] ১৮৮৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি "সত্যমিত্র" সাবধান করে লিখেছিল, সরকারের "এটা মনে রাখা উচিত যে এমনকি শান্ত-শিষ্ট গরুও রেগে গেলে হাতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে অথবা সব দুধ দেওয়ার পর গোয়ালা আরও দুধ দুইতে চাইলে তাকে লাথি কষিয়ে দিতে পারে" প্রায় বিদ্রোহাত্মক ভঙ্গিতে পত্রিকাটি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিল—"ঝাঁসির রাণী, নিজাম উল-মুলক, চিমনাদি আপ্পা, বাজিরাও, তাঁতিয়া টোপি এবং অন্যান্য বীরেরা ইতিহাসের বিষয় হলেও আজও বিশ্বের মানুষের সামনে তাদের তরবারি উদ্ভাসিত হয়ে আছে এবং আমাদের বীরত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।"[১০] ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস সভাপতি আর, এম, সয়ানিও একইরকম নিশ্চিত ছিলেন যে "নতুন করের বোঝা বহন করার ক্ষমতা এদেশের আর নেই।"[১১] পরের বছরগুলিতেও অন্য বহু জাতীয়তাবাদী নেতা একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় নেতাদের অভিযোগ ছিল, ভারতে করের পরিমাণ যে শুধু বেশিই তাই নয়, তা নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৯৬ সালে জি. ভি যোশি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, রেলপথের আয় ও অন্যান্য বাণিজ্যিক উৎস থেকে আয় বাদ দিয়েও যে রাজস্বের পরিমান তা ১৮৮৩-৪ থেকে ১৮৯৫-৬ সালের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভারতে রাজস্বের বোঝা যে খুবই বেশি এটা প্রমাণ করতে ভারতীয় নেতারা সরকারি প্রতিপক্ষীয়দের মতই পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে তাঁদের পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্ন। এটা তাঁরা অস্বীকার করেননি যে মাথা-পিছু করের পরিমাণ ছিল খুবই কম। কিন্তু তাঁদের যুক্তি ছিল এই

যে, তার থেকে চাপের পরিমাণ অনুমান করা অসম্ভব, কেননা চাপ কতটা তা বোঝা যায় আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে করকে দেখালে। মাথাপিছু কর কতটা, তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, মাথাপিছু আয়ের কতটা অংশ কর হিসেবে দিতে হয়, সেটাই আসল কথা। ভারতে মোট রাজস্বের পরিমান কম ছিল ঠিক কিন্তু তার থেকেও কম ছিল জাতীয় আয়ের পরিমাণ। এবং এইভাবে দেখলে বোঝা যাবে রাজস্বের বোঝা কতটা বেশি এবং তা বাস্তবিক ভাবে কতটা পীড়াদায়ক। এই যুক্তি প্রথম উপস্থিত করেন দাদাভাই নৌরজি ১৮৭১ সালে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ক সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতিতে। এইভাবে হিসেব কষে দাদাভাই দেখিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ডে যেখানে করের প্রকৃত বোঝা ছিল শতকরা ৮ ভাগ ভারতে সেখানে এই বোঝার পরিমান ছিল শতকরা ১৬ ভাগ। দাদাভাই ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা পরবর্তীকালে বার বার এই হিসেব উপস্থিত করেছেন। তবে করের বোঝার শতকরা পরিমাণ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল।

কিছু ভারতীয় নেতা আবার এই অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন যে, রাজস্ব ও আয়ের অনুপাত থেকে প্রকৃত বোঝা কতটা তা বোঝা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে, জনসাধারণের কর দেওয়ার সামগ্রিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এটি বিচার্য। একই নির্দিষ্ট হারে কর যদি একজন দরিদ্র ও একজন ধনী উভয়ের কাছ থেকেই নেওয়া হয়, তাহলে দরিদ্র ব্যক্তিটির জীবনযাত্রার মান-এর উপর ঐ করের বোঝার প্রতিক্রিয়া হবে অনেক বেশি। দাদাভাই নৌরোজির লেখাতে এই যুক্তি সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। এবং এই যুক্তির সাহায্যেই তিনি মাথাপিছু কর কম, অথচ করের চাপে জনসাধারণ পিষ্ট হচ্ছে, জাতীয়তাবাদীদের এই আপাত স্ববিরোধী বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ১৮৭১ সালে ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত প্রতিবেদনে নৌরোজি এটিকে বিশদ করে বলেন—

"উপরন্তু, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি হাতির কাছে যেখানে এক টন ওজনও কোনো বোঝাই নয়, সেখানে মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজন একটি শিশুকে পিষ্ট করে ফেলতে পারে। · বোঝা বহন করার ক্ষমতা বা অন্যভাবে বললে বোঝা কতটা হলে একজন পিষ্ট হবে, তা করের পরিমাণের শতকরা হিসেব থেকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এর জন্য দেখতে হবে স্বাচ্ছল্য কতটা বা কর দেওয়ার ক্ষমতা বা আয় কতটা। বিস্তর সম্পদ থাকলে আপনি সহজেই একটা বড় অংশ কর হিসেবে দিয়ে দিতে পারেন; এমনকি সাধারণ স্বচ্ছল অবস্থাতেও একই পরিমাণে বা সামান্য কিছুটা কম হারে কর দিতে ততটা কষ্ট হয় না, কিন্তু অস্বাচ্ছল্য যদি থাকে তাহলে ঐ করই অসহনীয় হয়ে ওঠে।"

"ভারতে দারিদ্র্য" বিষয়ে তাঁর লেখায় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন বক্তৃতায় নৌরোজি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এরপরে ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষনে আর, এম, সয়ানি দাদাভাই-এর এই বক্তব্যকেই খুব স্পষ্ট করে উপস্থিত করেন।

ভারতের অবস্থাকে এই দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে দাদাভাই ঘোষণা করেন যে ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতে করের চাপ দ্বিগুণ এবং শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি কষ্টকর, কেননা এটা আদায় হ'য় "দরিদ্রদের মধ্য থেকে।"[১২] একইভাবে, সয়ানিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "ভারতের ক্ষেত্রে আয় ও করের শতকরা ১৬$\frac{১}{২}$ ভাগের অনুপাত ইংলণ্ডের আনুপাতিক হারের তুলনায় মাত্র আড়াই গুণ হলেও, ভারতে করের প্রকৃত বোঝা অনেক বেশি এবং এই আনুপাতিক হার থেকে যতটা বোঝা যায় ভারতের অবস্থা তার থেকেও খারাপ।" কে, টি, তেলাঙগ, মদন মোহন মালব্য, জি, কে গোখেল, আর, সি, দত্ত এবং অন্য বহু নেতাও একইভাবে এদেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে করের সম্পর্কটিকে তুলে ধরেছিলেন। জাতীয় আয় না বাড়লে করের পরিমাণ বাড়ানো যায় না, এই স্বীকৃত নীতিটিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে জি, ভি, যোশি ১৮৯৬ সালে লিখেছিলেন, ভারতবর্ষে করের হার বাড়ানো হচ্ছিল, অথচ জাতীয় আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত কমছিল। দাদাভাই নৌরোজি ও মদন মোহন মালব্য কিছুটা অন্য ভাষায় একই নীতির উল্লেখ করে বারবার বলেছেন, ভারতীয়রা আরও বেশি হারে কর সানন্দে দিতে রাজি যদি তার আগে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় নেতারা ইংরেজদের লেখা প্রামান্য গ্রন্থ থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন যে, প্রয়োজন হলে নতুন কর আরোপের মতন আর কোনও ক্ষেত্র ভারত সরকারের সামনে অবশিষ্ট ছিল না, এবং একমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনা ছাড়া কর আদায়ের কোনো সুযোগ ছিল না।

পরে বাজেটে যখন উদ্বৃত্ত প্রকাশ পেলো তখন জাতীয় নেতারা বললেন যে এই উদ্বৃত্ত প্রমাণ করে যে "সঠিক, প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন করের পরিবর্তে জনসাধারণের কাছ থেকে বেশি কর অন্যায়ভাবে নেওয়া হচ্ছে।" গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এই পৌনঃপুনিক উদ্বৃত্তের বিশ্লেষণ করেন এবং এটাকেই ১৯০২ সালে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রবিন্দু করে তিনি সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে আক্রমন চালান। তিনি ঘোষণা করেন যে "দেশের সরকারি অর্থনীতির সাথে জনসাধারণের অবস্থার যে কোনো যোগসূত্র নেই সেটাই অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে এবং স্পষ্ট করে এই উদ্বৃত্ত নামক ব্যাপারটা থেকে বোঝা যায়"। এটা স্পষ্ট যে "জনসাধারণের উপরে সরকারি করের

বোঝা অন্যায়ভাবে অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা" এবং "এর থেকেই এই দুর্দশাগ্রস্থ দেশের উপচে পড়া সরকারি কোষের রহস্যটি বোঝা যায়।"

করের বোঝা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি কয়েকজন জাতীয় অর্থনীতিবিদ বিবেচনা করে দেখেছিলেন। ১৮৮০ সালের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের অর্থনীতি বিভাগ করের ব্যাপারে সমীক্ষা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল—করের ভারের সবচেয়ে বড় অংশ বহন করতে হত প্রধানত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে।[১৩] জাতীয় অর্থনীতিবিদরা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে কর ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। অন্যান্য শ্রেণীকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র চাষীদের থেকে বেশি কর আদায় করার জন্য দাদাভাই নৌরজি সেই ১৮৭১ সালেই সরকারের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন এবং ব্যংগ করে সরকারের কাছে জানতে চান "বড়লোকদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তাঁরা আন্দোলন করে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেন সরকারের কানে, কিন্তু গরীব শ্রমিক এবং কৃষক তা পারেন না—এই জন্যই কি সরকার এটা করছেন? জি ভি. যোশিও ১৮৮৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর "বার্মা ঘাটতি এবং লবন শুল্ক বৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধে প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। গরীব লোকের উপর ট্যাক্স বসানো এবং "বড়লোক জমিদারদের এবং তার ধনী বন্ধু চা বাগিচার মালিকদের" করের আওতায় না আনার জন্য যোশি অর্থনৈতিক সদস্যের নিন্দা করেন। অসম করব্যবস্থায় খেদ প্রকাশ করে তিনি বলেন "ব্রিটিশ প্রশাসন, ব্রিটিশ বিচার ব্যাবস্থা ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থার ফলে সব থেকে বেশি যারা উপকৃত হচ্ছেন সেই স্বল্পসংখ্যক বড়লোক সব থেকে কম কর দিচ্ছেন এবং সব থেকে যাঁরা কম উপকৃত হচ্ছেন সেই লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষকে দিতে হচ্ছে অনেক বেশি।" তিনি আরও বলেন, করের বোঝার এই অসমতা শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিলো না এটা "শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর" মানুষ এবং গ্রামীন জনতার মধ্যেও বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। ভবিষ্যতের জন্য তিনি পরামর্শ দেন যে সরকারের প্রথম কর্তব্য হলো কর বণ্টনের এই অসাম্য দূর করা। এর আগে ১৮৮৬ সালে তিনি কয়েকটি কর নীতির কথা বলেছিলেন—

"অর্থনীতির সব আলোচনাতেই আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রককে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা এই নয় যে জনসাধারণের উপরে করের সামগ্রিক বোঝা কতটা পড়ল। সেটি রাজনীতির ব্যাপার। আসলে মূল বিচার্য হ'ল এই বোঝা সমান ভাবে বণ্টিত হয়েছে কিনা · এবং করের বোঝা সব শ্রেণীর উপরে তাদের কর দেওয়ার ক্ষমতানুযায়ী, ন্যায়সংগত এবং সমান অনুপাতে পড়েছে কিনা।"

জি সুব্রাহ্মনিয়াম আয়ার পরিচালিত এবং সম্পাদিত "স্বদেশমিত্রণ" পত্রিকা

১৮৮৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী লবণ কর না বাড়িয়ে তার বদলে আয়কর বৃদ্ধির সুপারিশ করে এবং যোশির উপরিউক্ত মতের প্রতিধ্বনি করে বলে—

"সব দেশেই এটা মনে করা হয় যে গরীব মানুষের পরিবর্তে ধনীদের উপরই কর বেশি বেশি করে চাপানো দরকার, কেননা কেবলমাত্র তারাই পুলিশ, কোর্ট কাছারী, রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু যদি কোনো দেশের সরকার উচ্চবর্গের সরকার হয় তাহলে কি তারা বোকার মতো নিজেদের উপরই বোঝা বাড়াবে?"

১৮৮৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, "স্বদেশ মিত্রণ" এই তত্ত্বটি উপস্থিত করেছিল—"সেই সরকারকেই ভালো বলা যায় যে সরকার গরীব মানুষকে কষ্ট থেকে রেহাই দেয় এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর কর বসিয়ে অর্থ আদায় করে"। একইরকমভাবে ১৮৮৮ সালের ১৮ই মার্চ পুনা সার্বজনীন সভার উদ্যোগে লবণ শুল্ক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পুনার অধিবাসীদের দ্বারা রচিত স্মারকপত্রে অভিযোগ করা হয়েছিল যে গরীবদের উপরে করের চাপ প্রচণ্ড, তুলনায় ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা "করছাড় ও কর মকুবের সুযোগ পাচ্ছে।"[১৪] পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় করের বোঝার বৈষম্যের একই রকম তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, এটা হলো একটি "বৃহত্তর নালী ঘা।" লবণ কর, আয়কর এবং ভূমি রাজস্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, "আর্থিক বিশৃংখলার সব দায় শেষ পর্যন্ত গরীব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।"[১৫] এমনকি গোখেলও পরবর্তীকালে, তাঁর ১৯০৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় এই মত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোনো কর ছাড়ের প্রস্তাব থেকে থাকে তা যেন দরিদ্র শ্রেণীর সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়, কেননা "তারা ক্ষমতার তুলনায় বেশি টাকা সরকারি কোষে জমা দেয়।"

উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনের ভারতবর্ষের একজন নেতৃস্থানীয় শিল্পপতি জে, এন, টাটাও এই বিপ্লবী ধাঁচের বক্তব্যে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে লন্ডন দৈনিক ক্রনিকলে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন—

"আমি সব সময় এই ধারণা পোষণ করতাম যে ভারতবর্ষের সব করই গরীব মানুষদের উপরে একটা নিদারুণ বোঝা, তুলনায় ধনী লোকেদের উপর করের পরিমাণ হাল্কা। যাদের জীবন এবং সম্পত্তির জন্য সরকারের কাছ থেকে সব থেকে বেশী নিরাপত্তার প্রয়োজন তারা কিন্তু সরকারকে দেয় সব থেকে কম, অপর দিকে যাদের কিছুই হারাবার ভয় নেই—এমন কি সরকার বদল হলেও—তাদেরকেই ক্ষুধার অন্ন পর্যন্ত সরকারের দাবি মেটাতে দিতে হচ্ছে।"

এই চিন্তাধারা সব জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই বিশদ সমর্থন পেয়েছিলো। লবণ কর এবং আয় কর সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে আলোচনার সময় এটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে। লক্ষণীয় যে, বেশিরভাগ

নেতার দৃষ্টিভংগী ছিলো যে যদি কর বসাতেই হয় তবে বড়লোকদের উপরেই তা বসাতে হবে, গরীবের উপরে নয়।

২. করের ক্ষত

ভারতীয়রা দাবি করতেন, এই অতিরিক্ত করের বোঝাই ভারতবর্ষের দারিদ্রের এবং পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষের প্রধান এবং আশু কারণ। এই সমালোচনার সুরটি দাদাভাই নওরোজি বেঁধে দিয়েছিলেন। "১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে কিছু বক্তব্যের স্মরনিকায়" তিনি বলেন, "লক্ষ লক্ষ নরনারী যে অনাহার এবং মৃত্যুর মুখে পড়ছে তার জন্য এই অতিরিক্ত করের বোঝাই দায়ী।" পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অগণিত লেখক ও সাংবাদিক বছরের পর বছর এই মতের পুনরাবৃত্তি করেছেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এইমত ব্যক্ত করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে সাম্প্রতিক কালের দুর্ভিক্ষের কারণ "জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র", এই দারিদ্রের অন্যতম কারণ, "অতিরিক্ত করনির্ধারণ ও করভার।"[১৬]

লক্ষণীয় যে, এই সমালোচনা ছাড়াও কয়েকজন ভারতীয় নেতা, যাঁদের মধ্যে জি. ভি যোশি অগ্রগণ্য, ভারতীয় শিল্প ও শিল্পোদ্যোগের দৃষ্টিকোন থেকেও করের বোঝার অনুপুঙ্খ সমালোচনা করেছিলেন। এঁরা ঘোষণা করেন যে এই কর-ভারের ফলেই পুঁজি তৈরি হচ্ছিল না, এবং তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব না হলেও, অন্তত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

১৮৮৮ সালে জি ভি যোশিই প্রথম দেখান যে সরকারি করের বোঝা মজুরি তহবিল গঠন এবং মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। ১৮৯০ সালে "ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে যোশি মন্তব্য করেন যে, দুর্দশাক্লিষ্ট ভারতের "শিল্প শ্রমিকদের" সামনে একটি প্রধান সমস্যা "মূলধনের অপ্রতুলতা", আর এই মূলধনের অপ্রতুলতার অনেক কারণের মধ্যে একটি হলো "আমাদের মোট আয়ের থেকে সামান্য যেটুকু সঞ্চয় হয় তার পরিমান আরও কমে যায় অতিরিক্ত কর-ভারের ফলে।" তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে নীট জাতীয় সঞ্চয় (মোট উৎপাদন থেকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় খরচ-খরচা বাদ দিয়ে) বছরে ৯০ কোটি টাকা, সরকার কর বাবদ এই ৯০ কোটি থেকে বছরে ৫০ কোটি টাকা নিয়ে নেয়। এইভাবে জাতীয় বাৎসরিক সঞ্চয়ের অর্ধেকেরও বেশি সরকারি কোষাগারে চলে যায়, এবং এই টাকাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয় অনুৎপাদনশীল খাতে—"আমাদের শিল্পের উন্নতিতে" এর থেকে বড়ো বাধা আর কিছু হতে পারে না।" গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের ১৯০২ সালের প্রথম বাজেট বক্তৃতায় এই একই মতের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ্যই হওয়া উচিত, "কর

ভার যতটা সম্ভব কমানো যাতে জাতীয় শিল্পের উৎসমুখকে অবাধ এবং অপ্রতিহত বিচরণের সুযোগ দেওয়া যায়।"

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নেতাদের অনেকেই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর-ভার লঘু করার দাবিকে একটা তাত্ত্বিক নীতি হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। ১৮৭১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর অমৃত বাজার পত্রিকায় সরলভাবে এই নীতি প্রকাশিত হয়েছিল—

"যেহেতু ভারতের জনসাধারণ কর নিজেরা ধার্য করতে পারে না এবং যেহেতু সাম্রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেজন্য তাদের দাবি কর বাড়ানো নয়, কর কমানো। আমাদের বিনীত মত হল, যে দেশের মানুষের নিজেদের আইনসভা নেই, তাদের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা হল করভার কমানোর জন্য সতত দৃঢ়ভাবে দাবি জানানো।"

১৮৮৬ সালে জি. ভি যোশি খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, ভারতে "ব্রিটিশ শাসনের বিশেষ পরিস্থিতিতে" দেশের আর্থিক এবং নৈতিক অগ্রগতির জন্য অবশ্যই জনসাধারণের উপর বোঝাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা করা" আবশ্যক। ১৮৯৮ সালের পর ভারতীয় বাজেটে নিয়মিত "উদ্বৃত্ত" দেখা গেলে, বেশির ভাগ ভারতীয় নেতাই কর মকুবের দাবি তোলেন। ১৯০২ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে দেশের সাধারণ করদাতা যখন "ক্ষুধার্ত প্রজা" তখন "শাসকের সব থেকে বড়ো দায়ীত্ব হলো" কর মকুব করা। ১৯০৫-১৯০৬ সালের বাজেটের উপর বক্তৃতায় কর লঘু করার দাবিকে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল অত্যন্ত সরলভাবে উত্থাপন করেছিলেন এইভাবে—

"পৃথিবীর সব দেশেই আর্থিকক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত নীতি হলো জনতার উপর অর্থনৈতিক চাপ যতদূর সম্ভব কমানো। ইউরোপীয় দেশগুলিতে যদি তাই হয়, তাহলে তা আরও বেশি প্রয়োজন ভারতের ক্ষেত্রে—কেননা, এখানে কর আদায় হয় গরীব এবং অসহায় মানুষের কাছ থেকে, করের বেশির ভাগটাই দেয় ভেঙ্গে-পড়া নিঃস্ব কৃষক, এবং এখানকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারি ব্যয়ের চরিত্রই হল, বেশির ভাগ ব্যয় হয় অনুৎপাদনশীল খাতে, অথবা দেশের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে প্রায় সংস্রব নেই এমন উদ্দেশ্যে।"

৩. ভারতীয়দের বিশেষ মনোভাবের কারণ

দেশ যে অতিরিক্ত করভারে জর্জরিত—এই ধারণা ক্রমাগত জনপ্রিয়তা অর্জন করবার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত, সি. এন. ভকিলের মতে, ১৮৭১—১৯০১ সালের মধ্যে ভারতে করের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ থেকে ৯ ভাগ।[১১] দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত করের বোঝা বা উঁচু হারে কর অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে তুলনায় অনেক

বেশি দুর্দশা সৃষ্টি করে, কারণ, তার ফলে এই সব দেশে "গরীব কৃষক, কারিগর এবং এককথায় সব নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে জোর করে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়"। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে এটাই দেখা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, ভারতে করের যে উঁচুহার দেখা যেত তার পিছনে কোনো দেশপ্রেম বা সামাজিক চেতনার সমর্থন ছিল না। বরং ভারতীয় নেতারা মনে করতেন যেটা পরে আলোচনা করা হবে যে ভারত সরকারের বৈদেশিক চরিত্রের জন্য নিতান্ত জরুরী স্থানীয় প্রশাসনের খরচা বাদ দিয়ে, প্রাপ্য সব উদ্বৃত্ত সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যয় করা হবে। চতুর্থত, সরকার যে পদ্ধতিতে ভূমির উপর বা লবণের উপর কর বসিয়ে এবং মদের উপর উৎপাদন শুল্ক বসিয়ে রাজস্ব তুলতেন তাতে ভারতীয় নেতাদের আপত্তি ছিলো। সবশেষে, তাঁরা করের উঁচু হারের সঙ্গে প্রাপ্য অর্থ ব্যবহারের পদ্ধতির সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভারত সরকার, পুরোপুরি রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কিত লেসে ফেররএর তত্ত্বের সীমিত চৌহদ্দির মধ্যেই কাজ করেছেন, এবং বড়ো রকমের উন্নয়ন মূলক কোনো কাজ হাতে নেননি।

৪ রাজস্বের উৎস

ভারত সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎসগুলি সম্পর্কে ভারতের জাতীয় নেতাদের মনোভাব কেমন ছিলো, এখন আমরা সেটা দেখব। সেই সময় রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল—ভূমি রাজস্ব, বিক্রয়কর, আফিম শুল্ক ও উৎপাদনশুল্ক, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক এবং আয়কর।[১৮] ভারতীয় নেতারা তখনকার ভূমি রাজস্বের উঁচু হার এবং তা আরও বাড়াবার যে কোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট আমদানি শুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়াবার স্বপক্ষে বলেছেন। এ সম্পর্কে আগেই বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে আয়কর লবণকর, আফিম শুল্ক এবং উৎপাদন শুল্ক সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

৫. আয়কর

আমাদের আলোচ্য সময়ের শুরুতে, ১৮৮০ সালে, ভারতে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে লাইসেন্স কর নামে আয় কর আদায় করা হত। ১৮৬০ সালে এটা শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথম আর্থিক সদস্য জেমস উইলসন, বাণিজ্য. কৃষি, অন্যান্য বৃত্তি এবং সরকারি অথবা বেসরকারি চাকুরি থেকে উদ্ভূত আয় বাৎসরিক দুশ টাকার বেশি হলে তার উপর কর বসান। কিন্তু বারবার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন করার পর অবশেষে ১৮৬৫ সালে এই কর তুলে দেওয়া হয় এই বলে যে তার ফলে দেশে বিরাট "সঞ্চিত তহবিল থাকবে", এর পর ব্যক্তিগত আয়ের উপরে

কর বহুবার বসানো হয়েছে, তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আবারও বসানো হয়েছে। নিয়মিত দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য ১৮৭৮ সালে সরকার একটি স্থায়ী দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল তৈরির সিদ্ধান্ত নেন—অংশত জমির রাজস্ব ও খাজনার উপর অতিরিক্ত কর (সেসা) বসিয়ে অংশত বণিকশ্রেণী এবং কারিগরদের উপর বৃত্তি অনুমতি কর বসিয়ে। এর জন্য কোনো কেন্দ্রীয় আইন পাশ করা হলো না। ঠিক হলো, প্রাদেশিক সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। তথাকথিত অনুমতি কর ছিল প্রকৃতপক্ষে "একরকমের সীমাবদ্ধ আয়কর যা আয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত জনসাধারণের উপর ধার্য্য করা হয়েছিলো।" কৃষি, বৃত্তি, বেতন এবং নিরাপদ লগ্নির থেকে আয় ছিলো এই করের আওতার বাইরে। এই করের পরিধি এবং চরিত্র ছিলো বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, অযোধ্যায় এবং মাদ্রাজে করযোগ্য সর্বনিম্ন আয় ছিলো ২০০ টাকা; বাংলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে এটা ছিলো ১০০ টাকা। আয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে করভার ছিল বিভিন্ন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই এই করের পরিমাণ করদাতার বার্ষিক মুনাফার শতকরা ২ ভাগ অথবা ৫০০ টাকার বেশি হত না। ১৮৭৯-৮০ সালে সরকার এই করের আওতায় বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি ও বেতনভোগী জনসাধারণকে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ১৮৮০ সালে ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়। এই সময় মোট ২,২৮,৪৪৭ করদাতা ৫ লাখ টাকার উপরে কর দিতেন।

শুরু থেকেই ভারতীয় নেতারা সাধারণভাবে অনুমতি করের বিরুদ্ধতা করে আসছিলেন, এবং পরবর্তীকালে এই করের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য দাবি করতে থাকেন। এটা মনে রাখতে হবে যে, অনুমতি করের মূলনীতিকে তাঁরা আক্রমন করেননি, যে পদ্ধতিতে কর বসানো হয়েছিলো সেই পদ্ধতিটাকে তাঁরা অসম এবং অসংগত বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান সমালোচনাই ছিল "এই কর অত্যন্ত কম আয়ের উপরেও ধার্য হয়েছিল এবং তাতে বহু গরীব মানুষও এই করের আওতায় এসে পড়েছিল · এঁদের কেউ কেউ এমনকি এ অভিযোগও করেছেন যে, এই করের বোঝা গরীবের উপর বেশি পড়েছিল, এবং বড়লোকরা অপেক্ষাকৃত রেহাই পেয়েছে। যেমন ১৮৭৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি "ইন্দু প্রকাশ" এই করের ন্যায্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করে-ছিল, এই কর ধনী প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিদের এবং বড় কারবারীও ব্যবসাদারদের যাদের অধিকাংশই ইউরোপীয় ছিল, পকেটকে হাল্কাভাবে ছুঁয়ে মূল বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছে ছোট ছোট কারবারী ও কারিগরদের উপরে, যারা প্রধানত ভারতীয়। ১৮৮১ সালের ২৩শে অক্টোবরের "ইন্ডিয়ান স্পেক্টেটর" এই করকে একটি "বর্ণ সংকর দানব" নামে অভিহিত করে বলে যে, এই দানব আধা ভীতু এবং আধা দাম্ভিক, ভালো সরকারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া ধনী

মানুষদের এড়িয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রক্ত শোষণ করে। জাতীয় সংবাদপত্রগুলি দেখিয়েছিল যে করের পরিমাণ নির্ধারণকারী ক্ষুদে কর্মচারিদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য এই করের ফলে গরীবেরা আরও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে কিছু ভারতীয় সংবাদ পত্র কর রেহাইয়ের সীমা বাড়ানোর দাবি তুলেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৮০ সালের ১৭ই জানুয়ারী "বেঙ্গলি" পত্রিকা করের উর্ধতন সীমারেখা বেঁধে দেবার প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিল এই বলে যে, এতে "সেই সমস্ত লাখপতি বণিকদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যাদের এই সুবিধার কোনো প্রয়োজন নেই" এবং এরা সবাই ইউরোপীয়। উল্লেখ্য যে,ভারতীয় সংবাদপত্র গুলো এই ক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র মানুষের তীব্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল। এই মনোভাব অন্য ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কলকাতায় এই করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জলওয়ালা (ভিস্তি) ফেরীওয়ালা এবং গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করেছিল। ১৮৮৭ সালে সুরাটে অত্যুচ্চ হারে কর ধার্যের প্রতিবাদে গুরুতর রকমের দাঙ্গাও বেঁধে ছিল।

জাতীয়তাবাদীরা অন্য যে কারণে এই অনুমতি করের সমালোচনা করেন তা হলো উচ্চ আয়ের ইউরোপীয় এবং ভারতীয় কর্মচারিদের এবং বিভিন্ন পেশাদারী মানুষকে অসংগতভাবে এই করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে তাঁরা সমস্ত পেশাদারী এবং উচ্চ আয়বিশিষ্ট মানুষকে এই করের আওতায় আনার জন্য দাবি জানান। পুনা সার্বজনিক সভার উদ্যোগে ১৮৮০ সালের ১৬ই মে পুনার অধিবাসীদের এক সভায় একটি আবেদন পত্র তৈরি করা হয়। এতে অনুমতি করের বিরুদ্ধে জাতীয় নেতাদের সমালোচনার একটা সুষ্ঠু সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। এই আবেদনপত্রে যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয় যে "এই কর একদিকে দরিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের উপর তাদের সামর্থ্যের তুলনায় বেশি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে অতিরিক্ত করের বোঝা বইতে সক্ষম এমন অত্যুচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন ধনী গোষ্ঠীকে করের আওতায় না এনে, রাষ্ট্রিক অর্থনীতির সব মূল নীতিকে ভংগ করেছে।"

এই প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, তখনকার দিনের দুটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় পত্রিকা "অমৃতবাজার" এবং "হিন্দু" কিন্তু প্রকাশ্যভাবে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত করের নীতিকে সমর্থন করেছিল এবং "অনুমতি কর" বিলোপের প্রশ্নে আপত্তি জানিয়ে এই করকে আয়করে পরিবর্ত্তিত করার জন্য সুপারিশ করেছিল।

১৮৮২ সালে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক তুলে দেওয়ার পর ভারত সরকার মুদ্রা বিনিময়েরহার কমে যাওয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ভারের চাপে আয় বাড়ানোর নতুন পথ খুঁজতে শুরু করে। স্বভাবতঃই সরকারের দৃষ্টি পড়ে

অনুমতি করের উপর, যে কর তখন সামান্য পঞ্চাশ লক্ষের মত টাকা যোগাত। ১৮৭৬ সালে সরকার আয়কর প্রবর্তন করে। দরিদ্র মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা বাস্তবিকপক্ষে "অনুমতি করেরই পরিবর্ধন, পরিযোজন ও সমীকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়"। এই নতুন করের আওতায় বৃত্তিভোগী এবং বেতনভোগীদেরও আনা হয়। বার্ষিক ২০০০ টাকার নীচের আয়ের উপর টাকায় ২ পাই এবং এর থেকে বেশি আয়ের উপর টাকায় ৫ পাই হিসাবে কর ধার্য হয়। ৫০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের ছাড় ছিল। সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ৬০০০, টাকা আয় পর্যন্ত ছাড় ছিলো। অন্যান্য কতকগুলো আয় যেমন চা বাগিচা সমেত জমি থেকে লব্ধ আয়, ইংলণ্ডে প্রাপ্ত বেতন, অবসরকালীন বেতন, ছুটীর সময় কাজ করবার জন্য আয়, ইংলণ্ডে রেজেষ্ট্রিকৃত জাহাজ কোম্পানীর লাভ, নিশ্চিন্তীকৃত জমার উপর ইংল্যাণ্ডে দেয় সুদ এবং গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত সুদের পরিমাণ পর্যন্ত রেলের লাভকে করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এই কর আদায়ের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সালে ৩,৫১,০০০ হাজার লোক এই কর দেন এবং তাতে প্রায় ১·৩৭ কোটী টাকা আদায় হয়। এই আয়ের প্রায় ৩০ শতাংশ আসে বেতন এবং অবসরকালীন বেতন থেকে। ১৯০২-০৩ সালে করদাতাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫,৩১,০০০ হাজারে এবং আদায়ীকৃত করের অংক বেড়ে হয় প্রায় ২·১ কোটী টাকা।

আয় করের প্রশ্নে মতামতের ক্ষেত্রে নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই মতদ্বৈধতা আরও স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। বস্তুতপক্ষে কিছু ভারতীয় নেতা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত মতও পোষণ করেছেন।

১৮৮০ সালে, আয়ের উপরে কর বসানোর প্রস্তাব এবং ১৮৮৬ সালে এই কর প্রকৃতই বসানোর বিরুদ্ধে জাতীয় পত্র-পত্রিকা এবং নেতারা ব্যাপকভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই বিরোধিতা করের প্রকৃতি নিয়ে ততোটা ছিল না। জাতীয় নেতারা যে কোনো অতিরিক্ত কর বসাবার সব প্রস্তাবেরই বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন নতুন করের প্রয়োজন কখনই প্রমাণিত হয়নি। সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিশ্বাস ছিল এর মূলে। আয়করের ব্যাপারে "ভারতীয় সংবাদপত্রের অবস্থান" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, "ভয়েস অফ্ ইণ্ডিয়া" অন্তত এভাবেই এই বিরোধিতার অর্থ করেছেন।

এছাড়া অবশ্য অন্য কারণও ছিল। ১৮৮২ সালের আগে বহু জাতীয়তাবাদী নেতারই আশংকা ছিল আয়কর আরোপের উদ্দেশ্য আসলে বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখানো, পরে এটাকে আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার

করা হবে। এবং ১৮৮২ সালে আমদানি শুল্ক যখন সত্যি-সত্যিই তুলে নেওয়া হল তখন জাতীয় নেতারা আয়করের বিরোধিতা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে "আয় বাড়ানোর অনেক বেশি ভালো উপায় আমদানি শুল্কের পুনঃপ্রবর্তন"।

কয়েকজন ভারতীয় নেতা এ সন্দেহও প্রকাশ করেছিলেন যে, আয়কর থেকে প্রাপ্য আয় সরকার ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করবে। স্বভাবতই জাতীয়বাদীদের কাছে এই সম্ভাবনা বিরক্তি ও বিদ্বেষের কারণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আয়কর বিরোধীদের বেশ একটা বড় অংশ কিন্তু আয়করের ব্যাপারে একটি বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তা হল, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এবং বেতনভোগী শ্রেণীগুলিকে এই করের আওতায় আনা।

আয়করের এই বিরোধিতার প্রসঙ্গে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছু আয়কর-বিরোধী নেতা ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মত দেশে প্রত্যক্ষ কর আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়। আবার কেউ কেউ আয়কর আরোপের পরিবর্তে লবণ কর বৃদ্ধি করতে ও বিস্তৃত করতেও চেয়েছিলেন। এইসব নেতার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এঁদের আয়কর বিরোধিতার আসল কারণ ছিল সংকীর্ণ শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ, জনসাধারণের কল্যাণের বোধ তাঁদের প্রণোদিত করেনি। ভি.এন.মণ্ডলিক ১৮৮৬ সালে আয়কর আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতায় প্রকাশ্য সভায় অকপটে এটা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "অনুমতি করের পরিবর্তে আয়করের আওতায় উচ্চ শ্রেণীগুলিকে আনার ফলে আইনটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

তবে আয়করের বিরোধিতার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটি আয়কর সম্পর্কে গবেষণায় সব ভারতীয় ঐতিহাসিকই কম-বেশি উপেক্ষা করেছেন, তা হল, জাতীয়তাবাদী মতামতের শক্তিশালী মুখপত্রগুলির অধিকাংশই আয়কর আদায়ের বিরোধিতা করেনি ; বরং এই কর আরোপের আগে, কর আরোপের সময়, কিংবা পরে প্রায় সক্রিয় ও জোরালো ভাবেই এই করকে সমর্থন করেছিল। যেমন, অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৭০ সাল থেকেই আয়করের পক্ষে বলে এসেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য এই সমর্থন ছিল কিছুটা অনিচ্ছুক এবং উৎসাহহীন। তাছাড়া ১৮৮০ সালে জন স্ট্র্যাচি বেতনভোগী ও পেশাজীবীদের আয়ের ক্ষেত্রে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্রের জন্য কর আরোপ করতে চাইলে বহু জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাই তা সমর্থন করেছিল। ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের বিরোধিতার জন্য স্ট্র্যাচির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হলে অমৃতবাজার পত্রিকা তীব্র বিদ্রূপ করে। ১৮৮০ সালের ৫ই মার্চ স্ট্র্যাচির প্রস্তাবের ভারতীয় সমালোচকদের তিরস্কার করে অমৃতবাজার মন্তব্য করেছিল—

"বেতন ও পেশাগত আয়ের উপর করের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার পর এখন সবচেয়ে হাঁদা লোকটিও বুঝতে পারবে যে করের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করার যে

ঘোষণা স্যার জন স্ট্র্যাচি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কতটা নিবুদ্ধিতার কাজ হয়েছিল। সব সমাজেই গাধা থাকে, তা নাহলে ধোপার বোঝা কে বইবে? তবে গাধাদের রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব অথবা গণমাধ্যমের সম্পাদনার কাজে নয় ধোপার বোঝা বহনের কাজেই নিযুক্ত থাকা উচিত।"

১৮৮০ সালের পরেও হিন্দু, ইন্দুপ্রকাশ বা ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের মত প্রধান বেশ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অনুমতি করের (লাইসেন্স ট্যাক্স) পরিবর্তে আয়কর আদায়ের জন্য সুপারিশ করেছিল। ১৮৮৫ সালের অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে "সরকারি ও বেসরকারি কর্মে নিরত সমাজের অন্যান্য শ্রেণী যাদের করের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে তাদেরকেও অনুমতি করের আওতায় আনার" কথা বলা হয়।[১৯] শেষে, ১৮৮৬ সালে, যখন আয়কর প্রবর্তিত হয় তখন অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু মারহাট্টা এবং অন্যান্য বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র তাকে স্বাগত জানিয়েছিল।[২০]

১৮৮৬ সালের পরে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আয়কর আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে এই কারণে যে এটা স্পষ্ট হয়েছিল আয়কর পরিত্যক্ত হলে অন্যবিধ কর আরোপিত হবে। গোড়ার দিকে কিছু ভারতীয় নেতা আয়করের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তার মূলে ছিল শুধু আয়কর নয় নতুন যে কোনো করেরই বিরোধিতা করার প্রণোদনা। যখন এটা বোঝা গেল যে নতুন কর বসানো হবেই, তখন জাতীয়তাবাদী নেতাদের সবাই আয়কর প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিরোধিতা করলেন। অন্য যে-কোনো করের থেকে আয়করকেই তাঁরা বেশি সমর্থনযোগ্য মনে করেছিলেন। এটা বেশ নাটকীয় ভাবেই স্পষ্ট হয় ১৮৮৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে। ভি. আর. চক্রবর্তী আয়েঙ্গার নামে একজন প্রতিনিধি ৬ নং প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী পেশ করে আয়কর তুলে দেওয়ার দাবি জানান। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা "না, না, এই সংশোধনী তুলে নিন", "আমরা কর দেওয়ার দায় থেকে মুক্ত হতে চাই না", "আমরা এই সংশোধনী চাই না", "বসে পড়ুন", "আপনি চুপ করুন" ইত্যাদি বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং আয়েঙ্গার তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নিতে বাধ্য হন। পরের বছরই, ১৮৮৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে, মদনমোহন মালব্য ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস ধনী ব্যক্তি বা যারা কর দিতে সমর্থ তাদের উপর আয়কর আরোপ সমর্থন করে এবং করটিকে কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে। এরপর ১৯০২ সালে সি. ওয়াই. চিন্তামণি ১৩ নং প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই আয়কর প্রত্যাহারের দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। ঐ বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও ঐ দাবির প্রতি অসমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের মধ্যে

দাদাভাই নৌরজি ১৮৮৯ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে এস. এম. মঙ্গলাচারিকে লেখা একটি চিঠিতে আয়করের বিরোধিতা করে লবণ করকে সমর্থন করে ভোট দেওয়ার জন্য ভাইসরয়-এর কৌন্সিলের ভারতীয় সদস্যদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত-ও তাঁর "ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে ১৮৬০ সালে প্রবর্তিত আয়করকে "যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত" বলে বর্ণনা করেন।[21] এবং ১৮৮৮ সালে জি. ভি. যোশি লবণ কর বৃদ্ধির পরিবর্তে আয়কর বৃদ্ধির পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। ১৮৯৪ সালে ভারতসভাও একই দাবি জানায়।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথম থেকেই আয়করের সমর্থনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৯৩ সালের ১৮ই এপ্রিল পত্রিকাটি এই করের আয়তন বৃদ্ধি (বা করের সম্প্রসারণ) দাবি করে। এর আগেই ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর "দ্য হিন্দু" এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, "ভারতে করের স্থায়ী উৎসগুলির মধ্যে আয়করকে সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করা উচিত।" ১৮৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর "সুধারক"ও স্পষ্টই জানিয়েছিল, "আয়কর প্রত্যাহার করার জন্য দাবি করলে তা হবে চরম স্বার্থপরতার নিদর্শন। ১৮৯৪ সালের ১০ই মার্চ "সঞ্জিবনী" আয়করের হার বৃদ্ধি সুপারিশ করে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, প্রচলিত হারে ধনী ব্যক্তিরা বাস্তবিক পক্ষে রেহাই পাচ্ছিল। ১৯০২ সালের ৪ঠা নভেম্বর "বেঙ্গলি" পত্রিকাও আয়কর প্রত্যাহারের বিরোধিতা করেছিল। „মারহাট্টা„ ১৯০৪ সালের ২৯শে মে বাজেট উদ্বৃত্ত হলেও আয়কর বহাল রাখা উচিত বলে মন্তব্য করে। পত্রিকাটি সুপারিশ করেছিল, আয়কর থেকে প্রাপ্য অর্থ শিক্ষা বিশেষ করে শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক। একইভাবে অন্য বহু ভারতীয় সংবাদপত্রও এই সময় বছরের পর বছর আয়কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই করের আপতন যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য সুপারিশ করে। বিশেষ করে ১৮৮৮ সালে লবণ কর বৃদ্ধি করা হলে বিপুল সংখ্যায় ভারতীয় সংবাদপত্র লবণ কর বৃদ্ধির পরিবর্তে আয়কর বৃদ্ধির দাবি জানায়।

১৮৮৬ সালের পরে অধিকাংশ ভারতীয়ের মতামত যখন আয়করের সমর্থনে প্রকাশিত হচ্ছিল সে সময় মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্র এবং অল্প কিছু নেতা আয়কর তুলে নেওয়ার দাবি জানান। যতদূর জানা গেছে, বাংলা প্রদেশ থেকে প্রকাশিত "সোমপ্রকাশ" (১৮৯০ সালের ১০ই নভেম্বর), "সহচর" (১৮৯১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি) এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা থেকে প্রকাশিত "ভারত জীবন" (১৮৯০ সালের ১৭ই নভেম্বর) শুধু এই দাবি জানিয়েছিল। এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুধু দ্বারভাঙ্গার মহারাজা জি. আর. চিৎনবিশ এবং আশুতোষ মুখার্জি আয়করের বিরোধিতা করেন, তবে এঁরা কেউই প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না।

তবে, প্রথম থেকেই কিছু ভারতীয় নেতা আয়কর নির্ধারণের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন, জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের করের আওতার বাইরে রাখার জন্য। ১৮৮০ সালের ১৭ই জানুয়ারি "বেঙ্গলি" প্রথম এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জমিদাররা পথকর এবং পূর্তকর দেয় বলে তাদের আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া যুক্তিযুক্ত—পত্রিকাটি এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল। "বেঙ্গলি" যে যুক্তি উপস্থিত করেছিল, তা হল, ঐ সব কর বাস্তবে রায়তরা দিয়ে থাকে। কাজেই জমিদারদের আয়করে ছাড় দেওয়া অযৌক্তিক। (১৮৮৫ সালের আয়কর আইনে জমিদারদের করের আওতার বাইরে রাখা হলে একইরকমভাবে সমালোচনায় মুখর হয়েছিল 'হিন্দু' ১৮৮৫ সালের ৭, ৯ এবং ১২ জানুয়ারি) "ইন্ডিয়ান নেশন" (১৮৮৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি এবং "গুজরাত মিত্র" (১৮৮৬ সালের ১০ই জানুয়ারি) সম্পাদকীয় স্তম্ভে। ১৮৮৮ সালে জি. ভি. যোশি আয়করকে সম্প্রসারিত করে জমিদার, তালুকদার ও বাগিচা মালিকদের এই করের আওতায় আনার সপক্ষে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থিত করেন। ১৮৯০ সালের ৯ই জানুয়ারি 'হিন্দু' পত্রিকা এবং ১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি "কাইজার-ই-হিন্দ"-ও অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করেছিল।

কয়েকজন ভারতীয় নেতা ভারতে আয়করের হার যে একেবারেই প্রগতিশীল ছিল না সে-সম্পর্কেও মন্তব্য করেছিলেন। 'হিন্দু' পত্রিকা ২০০০ টাকার বেশি সব আয়ের উপর "একই হারে কর" ধার্য করার বিরোধিতা করে লিখেছিল—"ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপের নীতি অন্যান্য যে কোনো দেশের মত ভারতেও সমান গ্রহণ যোগ্য।" পত্রিকাটির মতে, যারা উচ্চহারে বেতন পেতেন তাদের ক্ষেত্রে করের পরিমাণ আয়ের শতকরা ২½ ভাগ ছিল খুবই কম। ১৮৯৪ সালের ৮ই মার্চ ভারতসভা "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর চাপানোর পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর আরোপ করার এবং যাঁদের বেতন বেশি তাদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে কর আদায়" করার জন্য সুপারিশ করেছিল। অন্য বহু ভারতীয় নেতাও একইভাবে আয়করের ক্রমবর্ধমান হার দাবি করেন।

কী কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিপুল অংশ আয়কর সমর্থন করেছিলেন অথবা অন্তত পক্ষে বেতনভোগী ও পেশাজীবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে আয়করের সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে আলোচনা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হ'ল এই যে, প্রধান করগুলির মধ্যে আয়করই একমাত্র কর যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রশাসক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি, পেশাজীবী অথবা ব্যবসায়ী প্রভৃতি সব ইউরোপীয়দেরই এদেশের শাসনভার পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা এই কারণটিই স্পষ্ট

করে লিখেছিল এইভাবে—"আয়কর ১০০ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে ১০০ জনেরই পকেট স্পর্শ করে, অন্যদিকে ভারতীয়দের মধ্যে এই করের বোঝা পড়ে প্রতি একহাজারে একজনের উপর।" কোনো কোনো ভারতীয় সংবাদপত্র এমনকি একথাও জোর দিয়ে বলেছিল যে, আয়করের বিরোধিতা করার অর্থ ইউরোপীয়দের সুবিধে ক'রে দেওয়া। জাতীয়তাবাদীরা আয়কর সমর্থন করেছিলেন দ্বিতীয় যে কারণে, সেটি সামাজিক ন্যায়বোধ ও করের ব্যাপারে সমতার নীতির ধারণা থেকে উদ্ভূত। এই চরম গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। যেমন, ১৮৮০ সালের ১৭ই জানুয়ারি "বেঙ্গলি" লিখেছিল—"যদি সরকার ব্যয় সঙ্কোচের পরিবর্তে নতুন কর আরোপ করাই সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে দেখতে হবে যাতে এইসব নতুন প্রত্যক্ষ করের ভার দরিদ্রের উপর না-পড়ে যারা করের ভার বহন করতে সমর্থ তাদের উপর পড়ে—সেটাই হবে অনেক ভালো ব্যবস্থা।"[২২] ১৮৮০ সালের ৫ই মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা বিষয়টিকে আরো জোরালোভাবে উপস্থিত করে: "প্রত্যক্ষ কর ভারতের পক্ষে অনুপযোগী কি উপযোগী, প্রকৃত বিচার্য বিষয় সেটা নয়। মূল প্রশ্ন হল—আমাদের সমাজের ধনী ব্যক্তিরা করের বোঝার ন্যায়সঙ্গত অংশ বহন করবে কি করবে না। যদি তাদের বাধ্য করতে হয় তাহলে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই"। পরের বছর অমৃতবাজার পত্রিকা আয়করের সমর্থনে লিখেছিল। আয়করের ফলে হয়রানি এবং অসুবিধে যা হয় তাতে আয়করের যে সুবিধে তা কার্যত নাকচ হয়ে যায়—এই বক্তব্যের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করে ১৮৮৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর "পত্রিকা" লিখেছিল—"প্রথম কথা হল, দেশের ২ লক্ষ ধনী ব্যক্তির সামান্য কী অসুবিধে হল, তা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে? লবণ কর, জমির খাজনা বা আইন আদালতে ব্যবহৃত দলিল দস্তাবেজের উপর ফি বাবদ যে দু কোটি মানুষকে কর দিতে হয় আয়কর নিয়ে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নিশ্চয়ই নেই।" ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর "হিন্দু"-ও মন্তব্য করে—"ধনী ব্যক্তিদের উপর কর চাপালে দরিদ্র মানুষের তাতে আপত্তি জানানোর কোনো কারণ নেই, তাদের অভিযোগ লবণ কর, আবগারি শুল্ক এবং স্ট্যাম্প ডিউটির বিরুদ্ধে"। জি. ভি. যোশি ১৮৮৮ সালে এই অভিমতকেই আরও জোরালো ভাষায় ও সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮৬ সালের আয়কর প্রবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ১৮৮৬ সালের আয়কর আইনে "উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের" উপর আরোপিত করের বোঝা "কোনো অর্থেই বা পরিমাণের দিক থেকে সন্তোষজনক কিংবা যথেষ্ট নয়—অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীগুলির উপর যে বোঝা চাপানো হয়েছে, তার তুল্য নয়। বরং এটা স্পষ্ট যে এই নতুন কর·· সরকারি কর ব্যবস্থার ন্যায়সঙ্গত পুনর্বিন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাস্তব

ঘটনা হল, "এমনকি ১৮৮৬ সালে এই নতুন কর আরোপের পরও উচ্চ শ্রেণীগুলি অনেক কম দিচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে তাদের যা দেয় তার থেকে বেশি দিতে হচ্ছে।"

আয়করের সমর্থকরা যে এই করের সবকিছুকেই সমর্থন করেছিলেন তা নয়. নীতিগতভাবে আয়কর সমর্থন করলেও যেভাবে এই কর আদায় করা হচ্ছিল তার সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, এমনকিএর যে সব সমালোচকরা বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত আয়কর আরোপকে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের মতেও ১৮৮৬ সালে আয়কর যেভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে কর রেহাই-এর পরিমাণ ছিল খুবই কম এবং সেটাই এই করের সবচেয়ে খারাপ দিক। ঐ কর ছাড়ের সীমাকে ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এঁরা অন্তত ১০০০ টাকা করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ ভাবে এঁদের যুক্তি ছিল এই যে কর ছাড়ের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে স্বল্প-বেতনভুক সরকারি কর্মচারি, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার কারিগর প্রভৃতি যাদের আয় খুব কম তাদের উপর অযথা চাপ পড়ছিল। এদের যা আয় তার থেকে কর দেওয়ার মতন উদ্বৃত্ত খুব কমই থাকত, বিশেষ করে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা থাকার ফলে। তাছাড়া কর আদায়ের ব্যবস্থাও ছিল অসন্তোষজনক। যার জন্য, এই সামান্য আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অকারণ হেনস্থা হতে হত। কর আদায়ের জন্য নিয়োজিত খুদে অফিসারদের দৌরাত্ম্য বা জুলুমবাজিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা এদের ছিল না।

আয়কর আদায় শুরু হওয়ার আগে থেকেই কিছু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ছাড়ের পরিমান বাড়ানোর কথা বলেছিল। আয়কর যাতে পীড়নমূলক না হয়, তার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ১৮৮৫ সালে যখন সব বেতনভোগী ও বৃত্তিভোগী শ্রেণীকে "অনুমতি করের" (License tax) আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করে, তখন জাতীয় কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল, "সব শ্রেণীর ক্ষেত্রেই কর ছাড়েব উর্ধ্ব সীমা যথেষ্ট উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়।" ১৮৮৬ সালে আয়কর প্রবর্তনের সময়ও বহু ভারতীয় নেতা ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য চাপ দেন। পরের বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে ছাড়ের পরিমাণ ১০০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মদন মোহন মালব্যর ভাষায় এই প্রস্তাব ছিল "সম্মানীয় দরিদ্র মানুষের প্রস্তাব"। পরবর্তীকালে প্রতি বছরই কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলিও বছরের পর বছর এই দাবিতে সোচ্চার ছিল। ভারতীয় নেতারাও কংগ্রেসের অধিবেশনে, আইন সভায় বক্তৃতায় ও লেখালিখিতে প্রশ্নটি বারবার উত্থাপন করেন।

আয়করের ব্যবস্থার এই দিকটির জাতীয়তাবাদী সমালোচনা যে যুক্তিপূর্ণ

ও ন্যায়সঙ্গত ছিল কালক্রমে কর্তৃপক্ষও তা পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। যার ফলে, ১৯০৩ সালে সরকার কর ছাড়ের পরিমাণ বাড়িয়ে বছরে ১০০০ টাকা করে,[২৩] যাদের 'আয় ১০০০ টাকার বেশি তারাই শুধু আয়করের আওতায় আসে। জাতীয় নেতৃত্ব সোৎসাহে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল। এরপর আয়কর প্রসঙ্গে আর কোনো সুবিধে বা ছাড় কদাচিৎ দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় কখনই দাবি করা হয়নি।

৫. জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নিহিতার্থ

আয়কর সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই ক্ষেত্রে তাঁদের বেশির ভাগই সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থের ঊর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। এঁদের প্রায় সবাই নিজেরা ছিলেন আইনজীবী অথবা সাংবাদিক। উপরন্তু বেতনভোগী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সংযোগ ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এঁদের একটা বড় অংশ আয়কর সমর্থন করেছেন, এমনকি আয়করের প্রবর্তন সুপারিশ করেছেন। যেসব নেতারা সাধারণভাবে আয়করের বিরোধী ছিলেন তাঁদেরও গরিষ্ঠ অংশ পেশাজীবী ও বেতনভোগীদের আয়ের উপর এই কর আরোপ সমর্থন করেছেন, এবং শুধু তাই নয়, তা করার জন্য রীতিমত দাবি জানিয়েছেন। "শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিকে কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষ করের আওতায় আনা যে উচিত, সে-সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য ছিল। এবং সেজন্যই আয়কর প্রবর্তিত হওয়ার পরবর্তী বছরগুলিতে এই কর তুলে নেওয়ার দাবি একজনও জাতীয়তাবাদী নেতার কণ্ঠে শোনা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে এটা ভালোভাবেই উল্লেখ করা দরকার যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রায় সবাই এবং অমৃতবাজার, হিন্দু, মহারাষ্ট্র, বেঙ্গলি, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, ইন্দুপ্রকাশ, ইন্ডিয়ান স্পেকটেটার্স, স্বদেশমিত্রম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সব জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও মালিকেরা কোনো উপায়ে অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর অথবা এমনকি পরোক্ষ কর দেওয়ার হাত থেকে বাঁচলেও আয়কর দিতে অবশ্যই বাধ্য হতেন। তথাপি তাঁরা স্বেচ্ছায় এই কর দিতে এবং তার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতেও পিছপা হননি। এই কারণে যে, ভারত সরকারের বিদেশী কর্মচারিরাও যাতে অনুরূপ কর দিতে বাধ্য হন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই মনোভাব ছিল ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের এবং বিদেশী শাসকদের প্রতি প্রতিকূল মানসিকতার পরিচায়ক অন্যদিকে, তাঁদের এই মনোভাব প্রমাণ করেছে যে তাঁরা দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে জাতীয় নেতৃত্ব শুধু একটি অংশের মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্যই

সুপারিশ করেছেন। তাঁরা হলেন, সেইসব মানুষ যাদের আয় ছিল ১০০০ টাকারও কম—যেমন, ছোট দোকানদার কিংবা স্বল্প চেতন ভোগী সরকারী কর্মচারি। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা দরকার যে, আয়কর ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ভারতীয় নেতৃত্ব যে দাবি জানিয়েছিলেন তা শুধু সামাজিক ন্যায়নীতি বা সমদর্শিতার জন্যই যথার্থ ছিল তাই নয়, ছোট ছোট দোকানদার বা অল্প মাইনের সরকারি কর্মচারিদের জাতীয় আন্দোলনে আকৃষ্ট করার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেও তা সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত ছিল। এটাও দেখা গেছে যে, বহু ভারতীয় নেতা আয়করের ছাড়ের পরিমাণ বাড়ানোর থেকেও লবণ কর এবং ভূমি রাজস্ব কমানোর বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তবিকভাবে কিছু কিছু ভারতীয় নেতা খুবই সচেতনভাবে এবং স্পষ্ট করে কর ছাড়ের যে কোনো প্রস্তাবের ব্যাপারে উপরি-উক্ত ধরনের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় নেতৃত্ব আয়করের ব্যাপারে কখনই যান্ত্রিকভাবে বড় ব্যবসায়ী বা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হননি। যদিও আয়কর তুলে দেওয়ার জন্য নিরন্তর আবেদন নিবেদন করেছেন ও দাবি জানিয়ে গেছেন।

৬. লবণ কর

১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লবণের উপর কর ছিল সরকারের আয়ের সর্ব-প্রধান উৎস। এক একটি প্রদেশে একেক ভাবে এই কর আদায় করা হত। যেমন, বোম্বাইতে পণ্যদ্রব্যের উপর আরোপিত শুল্ক হিসেবে এই কর তোলা হত, বাংলাপ্রদেশে এটি ছিল প্রধানত আমদানি করা লবণের উপর ধার্য আমদানি শুল্ক; অন্যদিকে মাদ্রাজে, উত্তর ভারতে এবং পাঞ্জাবে সরকার একচেটিয়াভাবে যে লবণ উৎপাদন করত তার দামে এই কর ধরে দেওয়া হত।

১৮৭৮-৭৯ সালেও লবণ করের হার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ছিল। ঐ বছর কুখ্যাত আভ্যন্তর বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রদ হলে এই করের হারে কিছুটা সমতা আসে। লবণ থেকে আদায়ীকৃত শুল্কের হার সমান করার জন্য এই সময়ে করের হার কমিয়ে উত্তর ভারতে মন প্রতি ৩ টাকার জায়গায় ২ টাকা ৮ আনা, বাংলা প্রদেশে ৩ টাকা ৪ আনার জায়গায় ২ টাকা ১৪ আনা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে শুল্কের হার ১ টাকা ১৩ আনা থেকে বাড়িয়ে ২ টাকা ৮ আনা করা হয়। সরকারের পক্ষে এটা লাভজনকই হয়েছিল। কেননা লবণ করের থেকে মোট আয়ের পরিমাণ ১৮৭৫-৭৭ সালের তুলনায় ১৮৭৯-৮১ সালে ১০ লক্ষ পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল। তবে জন-সাধারণকে সম্ভবত এতটা বাড়তি বোঝার চাপ অনুভব করতে হয়নি। কারণ

ঐ সময়েই পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে লবণের বাজার দর কিছুটা পরিমাণে নেমে গিয়েছিল।

১৮৫৮ সালের আগেই বিশিষ্ট ভারতীয়দের দ্বারা লবণ কর সমালোচিত হয়েছিল। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় নেতারা সাধারণভাবে লবণ করের পরিমাণ কমানোর জন্য, এমনকি এই কর তুলে দেওয়ার জন্য, দাবি জানিয়েছেন। ১৮৫৯ সালে লবণ করের হারে সমতা বিধানের প্রক্রিয়া শুরু হলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এই করের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ প্রদেশে লবণ কর ও তার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল সবচেয়ে সোচ্চার। দাদাভাই নৌরজির সমালোচনা উদাহরণ : তিনি এই করকে ব্রিটিশ শাসকদের সুনামের উপর একটি "কলঙ্কচিহ্ন" বলে অভিহিত করেছিলেন।

এখানেই আমাদের আর একটি ঘটনা লক্ষ করতে হবে। সংখ্যায় অল্প হলেও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটি অংশ কিন্তু লবণ কর সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এঁরা ছিলেন প্রধানত বাংলা প্রদেশের। কারণ, এই প্রদেশে লবণ করের হারে যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা ছিল নিম্নমুখী। তাছাড়া, এখানকার জমিদারেরা সর্বদাই রায়তদের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখিয়ে এসেছেন। এই প্রদেশে প্রথম দিকে লবণ করের সমর্থকদের দুজন প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র ও কৃষ্টদাস পাল। তবে আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, অমৃতবাজার পত্রিকাকেও দেখা গেছে পথ-কর ধরনের অন্যান্য করের পরিবর্তে লবণ কর বৃদ্ধির পক্ষে ওকালতি করতে। এই অপ্রত্যাশিত অবস্থান গ্রহণের সমর্থনে পত্রিকাটি যে যুক্তি দেখিয়েছিল তা হল এই যে, বাংলায় লবণ আসত লিভারপুল ও চেশায়ার থেকে। কাজেই এই প্রদেশে করটি ছিল মুখ্যত আমদানি শুল্ক এবং সেজন্য এই কর বৃদ্ধি করলে বর্ধিত করের বোঝা বহন করতে হত বিদেশীদের।

১৮৮২ সালে সরকার লবণ করের পরিমাণ কমিয়ে বর্মা ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত সিন্ধুনদের দুধারের জেলাগুলি ছাড়া সর্বত্র মন প্রতি ২ টাকা করে দেয়। এ ব্যাপারে জাতীবাদীদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র প্রকৃতির। মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই-এর বেশ কয়েকটি কাগজ এবং বাংলার কিছু কাগজ সরকারি এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় এবং করের পরিমাণ আরও কমানোর জন্য, এমনকি করটি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়। অন্যদিকে, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি কাগজ এই অভিমত প্রকাশ করে যে এই পদক্ষেপের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ সাধারণ মানুষের কাছে লবণ কর কখনই অসহনীয় মনে হয়নি, এবং সেজন্য লবণ কর কমানোর পরিবর্তে যারা অনুমতি কর দেয় তাদের বোঝা কিছুটা হ্রাস করলে ভালো হত।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে বহু জাতীয়তাবাদী নেতাই লবণ করের

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। যেমন, জি. ভি. যোশি। লবণ করের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া যায়। যোশি ঐ সময়েই তাঁর প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর কাগজে "সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের উপায় ও পদ্ধতি" নামে লেখায় তিনি লবণ কর এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও শ্রমের উপর এই করের প্রভাব সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন। এবং যোশি লবণ করের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।" "কোনো কোনো মহলে" এই করকে আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে দেখার মানসিকতার নিন্দা করে যোশি লবণ করকে "এদেশের কর ব্যবস্থার স্থায়ী অঙ্গ হিসেবে রেখে দেওয়ার" ব্যাপারে আপত্তি জানান।

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই এস. এ. স্বামীনাথ আয়ার এবং ভি. এস. পান্তুলু লবণ কর বৃদ্ধির যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে কংগ্রেস ও জনসাধারণকে এই ধরনের ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেন। ঐ সময়েই কিছু নেতৃস্থানীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রও লবণ করের হার কমানোর অথবা করটি তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। বিপরীতদিকে, অন্য বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ১৮৮৬ সালে আয়কর প্রবর্তন না করে লবণ কর বাড়ানোর জন্যও সুপারিশ করেছিল।

১৮৮৮ নাগাদ বার্মার উত্তরাঞ্চল আক্রমণ ও বিজয়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং টাকার বিনিময় মূল্য ক্রমাগত হ্রাসের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থায় সংকট দেখা দিয়েছিল এবং সেজন্য নতুন কর আরোপ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এরই পরিণতিস্বরূপ, তদানীন্তন অর্থবিষয়ক সদস্য জেমস ওয়েস্টল্যান্ড একটি সরকারি নির্দেশনামা জারি করে ১৮৮৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি লবণ কর মনপ্রতি ২ টাকার জায়গায় ২ টাকা ৮ আনা করলেন। এই কর থেকে সরকারের মোট আয় বেড়ে দাঁড়াল ১৮৮৮ সালের ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার জায়গায় ১৯০২ সালে ৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকায়।

লবণ কর বৃদ্ধি ভারত জুড়ে অসন্তোষ, ক্রোধ ও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। মাহরাট্টা, হিন্দু, বেঙ্গলি এবং এমনকি অমৃতবাজার পত্রিকা সহ বহু অগ্রগণ্য জাতীয়তাবাদী কাগজ তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় এই করবৃদ্ধির নিন্দা করে। কোনো কোনো কাগজ যে ভাষায় এই নিন্দা করে তা রাজ-বৈরিতার সামিল। যেমন, কেশরী পত্রিকা। বালগঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত এই কাগজ ১৮৮৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি লিখল—

"ভারতবাসীর মতন এত দুরবস্থ আর কোনো জাতি নয়। কোথাও কোনো অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলে তাকে ভারতে পাঠিয়ে দিলেই হবে।··· লবণ কর

সম্পর্কে সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশ এইভাবে ভাবতে প্রণোদিত করছে। · এই ধরনের একটি অমানবিক পদক্ষেপ তার পক্ষেই নেওয়া সম্ভব যে ভারতবর্ষের মানুষের নিরতিশয় দুরবস্থা সম্পর্কে নিরুদ্বেগ।··· এখন সেই সময় যখন তরবারির দ্বারা বিজিত দেশকে তরবারির সাহায্যেই ধরে রাখতে হবে, এই মতাবলম্বীরা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হচ্ছেন। · বিড়াল এমনি নীরিহ প্রাণী, কিন্তু খুব বেশি চাপ দিলে তারও প্রাণভয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, এবং তখন তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও সেরকম আকস্মিক সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে যখন স্মরণ করতে হচ্ছে যে সামান্য একটু করের বোঝা কমালে স্থায়ী অধিকার হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় ইংরেজরা শঙ্কিত।”

১৮৮৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি “বোধ সুধাকর” এ-ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে লিখেছিল—“সাম্প্রতিক এই করবৃদ্ধি গজালের সরু মুখের মত। এমনিই মারাত্মক ক্ষততে ভারত ক্লিষ্ট তার উপরে এই গজালের আঘাত এদেশের জনসাধারণের শান্তি ও স্বস্তির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে”[২৯] ১৮৮৮ সালের ৮ই মার্চের “মহারাষ্ট্র মিত্র” অন্য আরও বিষয়ের সঙ্গে লবণ কর বৃদ্ধির ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে একজন হিন্দুর সঙ্গে জনৈক ইংরেজ-এর একটি কাল্পনিক কথোপকথন ছেপেছিল। হিন্দু ভদ্রলোকটি লর্ড ডাফরিনকে কশাই আখ্যা দেওয়ায় ইংরেজ ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলে হিন্দু ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে বলে: “লবণ কর বৃদ্ধির ঘটনা কি জীবনীশক্তি শুষে নেওয়ার মত নয়” ঠিক একইভাবে বাংলার “প্রজাবন্ধু” ১৮৮৮-র ২৭শে জানুয়ারি লেখে—“মহামান্য লর্ড ডাফরিণের ভারতে পদার্পণের মুহূর্তটি অভিশপ্ত হয়ে আছে।”

লবণ কর বৃদ্ধি ১৮৮৮ সালে জি ডি যোশিকে আর একবার সরকারের লবণ কর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করেছিল।[৩০] শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ঐ বছরই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে লবণ কর বৃদ্ধির ব্যাপারে তাদের “প্রতিবাদ নথিভুক্ত” করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কংগ্রেস তার নিজের স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। কেননা, স্ট্যান্ডিং কমিটি আগেই এই ধরনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল এই যুক্তি দেখিয়ে যে করটি বাড়ানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটি বাতিল করার দাবি “নিরর্থক”। এবং সেজন্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন রত্নগিরি জেলার দুজন সাধারণ প্রতিনিধি প্রস্তাবটি উত্থাপন ও সমর্থন করেন তখন উচ্চ নেতৃত্বের কেউই মুখ খোলেন নি।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মতামত যাতে এক সুরে বাঁধা না-হয় অনেকটা যেন তার জন্যেই সরকারি পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েও গুটিকয় কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। তবে লক্ষণীয় যে. অমৃতবাজার পত্রিকা বা ট্রিবিউন-এর মত যেসব

সংবাদপত্র আগে এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করত তাদের বেশির ভাগই এই সময় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের মূল ধারাটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে এবং তাদের নাম সরকারের সমর্থকদের তালিকাতে নেই।

লবণ করের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ বেশ কিছুকাল অব্যাহত ছিল। এবং পরবর্তীকালেও জাতীয় নেতৃত্ব বারবারই এই কর কমানোর দাবি জানিয়ে এসেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও এ-বিষয়ে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং বছরের পর বছর অবিলম্বে লবণ কর কমানোর দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বহু নেতাই এই দাবিতে সামিল হয়েছেন। জি. ভি যোশির রাজনৈতিক শিষ্য জি কে. গোখেল এটিকে একটি নিত্য বিতর্কের বিষয় করে তুলেছিলেন। আইন সভায় এবং বাইরের রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বত্র তিনি গুরুর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একইভাবে, বেশির ভাগ জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাও বছরের পর বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৮৮৯ সালের ২১শে জুলাই মাহরাট্টায় প্রকাশিত একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্পাদকের কাছে এই চিঠিটি লিখেছিলেন আর. ডি. রাসডেন নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। চিঠিটিতে একজন ব্যক্তির মতামত প্রকাশিত হলেও এটির প্রকাশের ব্যাপারে অবশ্যই সম্পাদক তিলকের অনুমোদন ছিল, এবং সেজন্য তিনি প্রায় জেলে যেতে বসেছিলেন। এই চিঠিতে ভারতীয় নেতাদের শস্য-আইন বিরোধী আন্দোলনের অনুরূপ আন্দোলন করার পরামর্শ দিয়ে রাসডেন ভারতীয়দের আহ্বান করেছিলেন সরকারকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিতে যে "যাকে দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু বলা হয় তার একটা বড় অংশ আসলে লবণ করের ফলে হত্যার ঘটনা; পুরো ব্যাপারটাই ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কেলেঙ্কারির ঘটনা, এবং আমাদের অবশ্যই করটি তুলে দেওয়ার দাবি জানাতে হবে; এবং এটাও জানিয়ে দিতে হবে যে, যদি তোমরা এই কর আদায় বন্ধ না কর তাহলে আমরা বাধ্য হব এমন উত্তপ্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যে তোমরা চাও আর না চাও লবণ কর আদায় বন্ধ করতে হবে।" উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত লবণ সত্যাগ্রহের ৪০ বছর আগেই রাসডেন এই চিঠিতে একই পদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীতা জানিয়ে লিখেছিলেন—"যাতে এই কর না দিতে হয় তার জন্য জনসাধারণকে নিজেদের লবণ প্রস্তুত করার পরামর্শ ভারতীয় নেতাদের দিতে হবে…এবং প্রয়োজনে সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য তহবিল তৈরি করে তাদের এ-বিষয়ে উৎসাহিত করা যাবে।"

পরবর্তীকালে, নতুন শতাব্দীর শুরুতে, যখন বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখা গেল তখন অধিকাংশ ভারতীয় নেতাই লবণ কর কমানোর জন্য উদ্বৃত্তকে কাজে লাগানোর দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন।[৩১] সুতাকল মালিকদের একটি

সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে ডি ই. ভাচা এমনকি একথাও বলেন যে সুতিবস্ত্রের উপর একসাইজ শুল্ক তুলে নেবার আগেই লবণ করের পরিমাণ কমানো দরকার।

অবশেষে, ১৯০৩ সালে সরকার লবণের মন-প্রতি আট আনা করে কর কমানোর কথা ঘোষণা করে। প্রত্যাশিত ভাবেই ভারতীয় নেতৃত্ব এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই করের পরিমাণ আরও কমানোর জন্যও দাবি জানানো হয়। পরের মাস ও বছরগুলিতে দাবিটি পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। ১৯০৫ সালে যখন সরকার আর একবার মন-প্রতি আট আনা কর কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখন ভারতীয়রা আর একবার সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে করের পরিমাণ আরও কমানোর জন্য দাবি জানায়।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ যখন লবণ করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন কিন্তু সংখ্যাল্প একটি অংশ অমৃত বাজার পত্রিকার নেতৃত্বে লবণ করের পরিবর্তে আয় কর ও অন্যান্য কর ছাড়ের বিষয়টিকে তুলে ধরে। এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৮৮ সালে অল্প কিছুদিন অমৃতবাজার লবণ করের ক্ষেত্রে আগের সমর্থন প্রত্যাহার করে এই কর বাড়ানোর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ১৮৮৮ সালের পর পত্রিকাটি তার পুরনো অবস্থানেই ফিরে গিয়েছিল।

৭. জাতীয়তাবাদীদের লবণ কর বিরোধিতার কারণ

লবণ করের বিরোধিতায় জাতীয় নেতৃত্ব কী ধরণের অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছিল? তাদের প্রথম আপত্তির কারণ ছিল তাত্ত্বিক। তাঁরা ঘোষণা করেন যে, আর্থিক ব্যবস্থার সুপরিচালনা ও ভালো করনীতির একটি প্রাথমিক শর্ত হল, লবণের মত একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসানো উচিত নয়, এবং কর বসালেও তার পরিমাণ অবশ্যই এতটা হওয়া বাঞ্ছিত নয়।[৩৫] এরপরই তাঁরা সরকারের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। সরকারের বক্তব্য ছিল যে লবণ কর থেকে আয় প্রভূত হলেও যেহেতু এই কর ধার্য হয় বিশাল সংখ্যক মানুষের উপর সেজন্য এর বোঝা সাধারণ মানুষের উপর ততটা পড়ে না। নেতাদের প্রধান যুক্তি হল, এই করের বোঝা কতটা পড়ছে তা আলাদা করে দেখলে বোঝা যায় না, সেটা দেখতে হবে জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে। জনসাধারণের আয়ের স্বল্পতার কথা মনে রাখলে দেখা যাবে যে এমনকি মাথাপিছু কয়েক আনা করের বোঝাও অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই যুক্তিটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে জি. ভি. যোশি মন্তব্য করেছিলেন যে, লবণ কর এতটা খারাপ বলে মনে হত না যদি দেখা যেত যে "দরিদ্র শ্রেণীগুলির অবস্থার সুনিশ্চিতভাবে ক্রমোন্নতি ঘটছে এবং তার ফলে তাদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ব্যয় করার মত

আয়ের উদ্বৃত্ত আরও বেশি পরিমাণে থাকছে। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ কংগ্রেসে লবণ কর সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার উত্থাপক এন ভি. বারভে এই যুক্তির সমর্থনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে, "এরকম লক্ষ-লক্ষ মানুষ আছে যাদের কাছে বাড়তি আট আনা দেওয়ার অর্থ তার জন্য বছরে আটদিন অনাহার ; লবণ কর বাড়ানোর আগেও কখনই এই মানুষেরা চব্বিশ ঘণ্টায় একবারের বেশি খেতে পেতেন না"[৩৩]

জাতীয়তাবাদীদের কেউ কেউ তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে লবণ করের বোঝার গাণিতিক হিসেব উপস্থিত করেছিলেন। যেমন, ১৮৯১ সালে প্রিংগল কেনেডি হিসেব করে দেখান যে, ৫ জনের একটি পরিবারের মাসিক আয় ৫ টাকা হলে লবণ করের বোঝার পরিমাণ হয় টাকা প্রতি ৬ পয়সা করে, যেখানে নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর আয়করের বোঝা টাকা প্রতি মাত্র ৪ পয়সা। ঐ বছরেই ডি ই ভাচা একইভাবে হিসেব করে দেখান যে মাথা-পিছু আয় এমনকি ২ পাউণ্ড বলে ধরলেও লবণ করের পরিমাণ দাঁড়ায় মাথা-পিছু আয়ের শতকরা ১·১ ভাগ।

তবে লবণ করের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগের প্রধানতম কারণ ছিল এই যে, এই কর "অন্যায় এবং দুষ্টচক্রের মত", কেননা, এই করের বোঝা দেশের 'দরিদ্রতম' মানুষের কাছে 'নিষ্ঠুর', অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায় তাদের যা আয় তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি কোনো রকমে সম্ভব হয়—বহু ক্ষেত্রে তাও হয় না—কাজেই কোনো ধরণের কর দেওয়াই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।[৩৪] জাতীয় কংগ্রেস বারবার লবণ কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এই যুক্তিই দেখিয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য কিছু নেতা এই করের আর্থিক অন্যায্যতা এবং অ-প্রগতিশীল প্রকৃতির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৮৭১-সালেই দাদাভাই নৌরজি যে লবণ করের সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন তার মূল কারণ ঐ করের প্রকৃতি। "স্টেটমেন্ট টু দ্য সিলেক্ট কমিটি অন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিন্যান্স"-এ তিনি দেখান যে দরিদ্র মানুষের উপর এই করের বোঝা যেভাবে পড়ে "অন্যান্য শ্রেণীর উপর সেভাবে পড়ে না." এবং ফলে "তারা সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয় না।" "একজন কুলি, শ্রমিক বা কৃষকের আয় বছরে মাত্র ২০ শিলিং এবং লবণ কর বাবদ তাকে দিতে হয় তার আয়ের শতকরা চারভাগ"। নৌরজির প্রধান বক্তব্য বিষয় ছিল, "একজন দরিদ্র মানুষের কাছে তার ২০ শিলিং আয়ের শতকরা ৪ ভাগের মূল্য ধনী শ্রেণীর ব্যক্তির আয়ের শতকরা ১০ অথবা ২০ ভাগের থেকেও বেশি।" একইভাবে পুনার সর্বজনিক সভার মুখপত্রে ১৮৮০ সালে প্রকাশিত "দ্য ফিন্যান্সেস ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডার লর্ড লিটন'' নামে প্রবন্ধে জনৈক অনামা লেখক মন্তব্য করেছিলেন : "এই কর অভিজাত, ধনী ও দরিদ্রের উপর আনুপাতিক হারে প্রায় সমানভাবে পড়ে, প্রধানত, এবং সেজন্যই এই করের

হার এত কম হওয়া উচিত যাতে দরিদ্র জনসাধারণ কর-ভারে পীড়িত না হয়।" অন্যান্য নেতারাও একই রকম মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তবে জি. ভি. যোশিই ১৮৮৬ সালে এই বক্তব্যকে সবচেয়ে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেন। তিনি লিখেছিলেন—"সমান পরিমাণে কর প্রদানের যে সাম্য তা আসলে মিথ্যা সাম্য, প্রকৃত সাম্য নয়, কারণ এই সাম্যের দ্বারা 'সমান কষ্ট স্বীকারের' সাম্য বোঝায় না।" এর দু বছর পর, ১৮৮৮ সালে, যোশি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, লবণ করের পরিমাণ বৃদ্ধি "সরকারি কর বন্টনের ক্ষেত্রে" ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে "বৈষম্য বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করে।"

লবণ ব্যবহারের পরিমাণের উপর লবণ করের প্রতিক্রিয়াকে ভারতীয় নেতারা আর একটি মানদণ্ড হিসেবে দেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, অতীতে ভারতে ব্রিটিশ শাসকরাও লবণ কর সংক্রান্ত তাদের নীতিকে একই মানদণ্ডে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। এমনকি ১৮৮৮ সালে এই করের পরিমাণ বাড়ানোর সময় জেমস্ ওয়েস্টল্যাণ্ডও এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে "২ টাকা ৮ আনা হারে এই করের বোঝায় প্রতিক্রিয়া এতটা হবে না যাতে বর্তমানে লবণের ব্যবহার যে হারে বাড়ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে।" ভারতীয় নেতারা কিন্তু সহমত পোষণ করেননি। তাঁরা এ-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় ছিলেন যে যে উচ্চহারে এই কর আদায় করা হচ্ছিল, বিশেষ করে ১৮৮৮ সালে যেভাবে এই করের হার বাড়ানো হয়েছিল, তার প্রভাবে বাস্তবিকভাবে লবণের ব্যবহার কমে গিয়েছে এবং চাহিদা সীমিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা ভয়ানক দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়েছে। কেননা, লবণ এমন একটি পণ্য যা মানুষের বেঁচে থাকা ও সুস্থতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।[৩৫]

এই প্রসঙ্গে জি. ভি. যোশি জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই উপস্থিত করেছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন এক্ষেত্রেও যোশি মূলত তথ্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি আগের ১৯ বছরের অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃতভাবে পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এই করের হারে পরিবর্তনের প্রভাবে "লবণের ব্যবহারে অনিবার্য পরিবর্তন দেখা গেছে; শুল্ক কমলে লবণের ব্যবহার বেড়েছে এবং শুল্ক বাড়লে লবণের ব্যবহার কমেছে" শুধু তাই নয়, যোশি দেখিয়েছিলেন যে, "শুধু দরিদ্রতম মানুষেরাই বাধ্য হয়েছে দাম বাড়লে লবণের ব্যবহার কমিয়ে দিতে।" ধনী বা প্রায় ধনী মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে কখনই লবণের ব্যবহার সীমিত করতে হয়নি, কিন্তু জনসাধারণের দরিদ্রতম অংশের উপর "লবণ শুল্কের হারে সামান্যতম পরিবর্তনের প্রভাবও ভালোভাবেই পড়েছে।" অর্থাৎ লবণের ব্যবহার যে কমেছে তা সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়নি, প্রায় পুরোটাই বহন করতে হয়েছে দরিদ্র মানুষকে। ১৮৯৬ সালে "লবণ শুল্ক

সংক্রান্ত প্রশ্ন" নামে প্রবন্ধে যোশি পুনরায় এই যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। এই লেখায় ১৮৮৮ সালের পরের অভিজ্ঞতার আলোচনা করে যোশি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, যে বিষাদময় ভবিষ্যতের কথা একদা বলা হয়েছিল তা বেশি রকম ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের সাহায্যে তিনি দেখান, লবণ ব্যবহারের পরিমাণে বৃদ্ধির হার ১৮৮৮ সালের আগে যা ছিল ঐ বছরের পরে আর তা থাকেনি। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭-র মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে শতকরা ৩'৮ ভাগ, আর ১৮৮৭-৮৮ থেকে ১৮৯৪-৯৫ সালের মধ্যে এই হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ০.১২ ভাগে। আরও খারাপ ঘটনা হ'ল, লবণের ব্যবহার "ঐ সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি পায়নি।" যোশি হিসেব করে দেখালেন যে, ভারতে মাথা-পিছু লবণের ব্যবহার ১৮৮০-৮১ সালে ছিল ৮'৮ পাঃ ১৮৮৬-৮৭ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ১০'৩ পাঃ, কিন্তু ১৮৯৪-৯৫ সালে আবার তা কমে গিয়ে হয়েছে ৯'৫ পাঃ। তাঁর হিসেবমত ১৮৯৪-৯৫ সালে দরিদ্র ৮ কোটি মানুষ বাধ্য হয়েছে "আট বছর আগে একেকজন যে পরিমাণ লবণ ব্যবহার করত তার থেকে মাথা-পিছু দুই থেকে তিন পাঃ কম ব্যবহার করতে।" এর থেকে যোশি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোন তা তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছে। তিনি লিখেছেন—

"যে রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য ক্ষুধার্ত মানুষকে রক্তক্ষরণ করতে হয়, যত প্রয়োজনই থাক না কেন, তার নিন্দা করতে হবে। কোনো আর্থিক নিয়ম বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির কোনো নীতিই কখনই রাজস্বের ছুরির এই ধরনের নির্দয় ব্যবহার সমর্থন করতে পারে না। এবং কোনো প্রয়োজনই, তা যতই অপরিহার্য হোক, এবং কোনো আর্থিক জরুরি অবস্থা, যতই গুরুতর হোক, তার দ্বারা দরিদ্র মানুষের কষ্টের প্রতি এই ধরণের ঔদাসিন্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।"

এর পরই হতাশা ও ক্রোধ থেকে যোশি চূড়ান্ত মূল্যায়ণ করেছেন—"আমাদের আর্থিক প্রশাসকেরা সাধারণ মানুষের এই দুরবস্থার কথা কিছুই জানেন না এবং নিদারুণ দারিদ্রের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতিই নেই।"

১৮৮৮ সালের পর লবণ কর বিরোধী আন্দোলনে আর একজন নেতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি জি. কে গোখেল। সব কটি মূল বিষয়েই তিনি যোশির যুক্তি এবং তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসরণ করেছেন অথবা তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মূল অবদান, তিনি যোশির বক্তব্যকে জনসমক্ষে প্রচার করেছেন।

লবণ করের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের আর একটি বক্তব্য ছিল এই যে, এই করের জন্য জমি এবং গবাদি পশু লবণের মত একটি অতি প্রয়োজনীয় পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এবং তার ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ

হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জি. ভি. যোশি এবং জি. কে. গোখেল লবণ-করের বিরুদ্ধে অন্য আর একটি যুক্তিও উপস্থিত করেছিলেন, তা হল ঃ লবণ কর যেহেতু একটি শিল্পের—লবণ শিল্পের—উপর চাপানো কর এবং যেহেতু এই করের ফলে ঐ শিল্পে একচেটিয়া ব্যবস্থা দেখা দিয়েছে, সেজন্য লবণ কর ভারতের "অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি অপরিহার্য ও আবশ্যিক ক্ষেত্রে" ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। যোশি ও গোখেল অভিযোগ করেন যে, লবণ করের প্রবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনা—যেমন, লবণের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রদেশে লবণের উপর ধার্য করের সমতাবিধান, এবং করের অতি উচ্চহার—দেশের বিশাল অংশে, বিশেষ করে বাংলা প্রদেশে আঞ্চলিক শিল্পকে সংকুচিত ও ধ্বংস করে দিতে এবং দেশীয় উৎপাদকদের এই শিল্পক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত করতে সহায়ক হয়েছে। যোশি এমনকি এই অভিযোগও করেছিলেন যে, বাংলায় এই শিল্পটির "সামগ্রিক অবনতি ঘটিয়ে বস্তুত রাজস্ব ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পটিকে বিদেশীদের হাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, বোম্বাইতেও এই মারাত্মক "বাংলায় প্রযুক্ত নীতি" অনুসরণ করা হচ্ছিল "যদিও প্রচ্ছন্নভাবে, মধ্যবর্তী একচেটিয়া স্তর ছাড়াই।"

৮. করের বিকল্প উৎস

বহু ভারতীয় নেতা মনে মনে বা অন্যভাবে এটা স্বীকার করেছেন যে, বাজেটের ঘাটতি সরকারকে লবণের উপর উচ্চহারে কর চাপাতে বাধ্য করেছে, কোনো না কোনো উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করতেই হবে। সেজন্য তাঁরা বাড়তি আয়ের জন্য লবণ করের থেকে কম ক্ষতিকর বিকল্প অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। প্রথম যে বিকল্পটি তাঁরা সুপারিশ করেছিলেন তা হ'ল, আমদানি শুল্ক পুনরারোপ। আর একটি বিকল্পের কথা এঁদের অনেকে বলেছেন—সেটি, আয় করের। হার বৃদ্ধি এবং এতাবৎকাল আয়কর দিতে হত না এমন সব শ্রেণীকে আয়করের আওতায় আনা। সামান্য কয়েকজন এমনকি ধনী ব্যক্তিদের উপর এবং তারা যেসব জিনিস ব্যবহার করে সেগুলির উপর সাধারণভাবে কর বসানোর কথা বলেন, যদিও এই কর কী ধরনের হতে পারে তা স্পষ্ট করে বলেন নি। কেউ কেউ এরকমও ভেবেছেন যে, ১৮৮৮ সালে লবণ করের পরিমাণ বাড়ানোর আগে সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর রাস্তাগুলি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল। যেমন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই সে-সময় এই অভিমত প্রকাশ করে যে, ইউরোপীয় সরকারি কর্মচারিদের বেতন এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে বাজেটের ঘাটতি অনেক ভালোভাবে মেটানো সম্ভব ছিল।

যোশি এবং গোখেল লবণ করের প্রকৃতির মধ্যেই ভবিষ্যতে এই কর থেকে আয় বাড়ানোর যে সম্ভাবনা নিহিত ছিল, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সম্ভাবনার ভিত্তি হল একটি সুপ্রসিদ্ধ করনীতি। এই নীতি অনুসারে লবণ করের মত একটি কর খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে যদি করের হার খুব কম হয় এবং পণ্যটি অধিক ব্যবহারের সুযোগ থাকে। ১৮৯৬ সালে জি. ভি যোশি হিসেব করে দেখান যে, ১৮৮৮ সালের আগে লবণের ব্যবহার যে হারে বেড়েছে ১৮৮৮ র পরেও যদি সেই হারে বাড়ত তাহলে ১৮৯৫-৯৬ সালে মোট ব্যবহৃত লবণের পরিমাণ দাঁড়াত ১ কোটি মন এবং পুরনো হারে মন-প্রতি ২ টাকা করে কর আদায় করলেও সরকারের আয় বাড়ত মোট ২ কোটি টাকা। লবণের উপর কর বাড়িয়ে ও তার ফলস্বরূপ লবণের ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে সরকার প্রায় ঐ পরিমাণ অর্থই বাড়তি পেয়েছেন। ১৯০২ সালে গোখেল তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উপরি-উক্ত করনীতিটির প্রয়োগ সুপারিশ করেছিলেন। পরের বছর বাজেট বক্তৃতায় তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে বলেন: "আর্থিক দিক থেকেও এ-বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে যুক্তি-সম্মত ও ভালো নীতি হবে শুল্কের পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়ে পণ্যটির ব্যবহার বাড়ানো এবং বর্ধিত ব্যবহারের ফলে আয় বাড়ানো।"

ভারতীয় নেতারা যেসব বিকল্প প্রস্তাব রেখেছিলেন তার কোনোটিই সরকার গ্রহণ করতে রাজি না-হওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এঁদের অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন এবং ব্রিটিশ শিল্পপতি, সরকারি কর্মচারি ধনী ও প্রভাবশালী ভারতীয়দের চাপে নতি-স্বীকার করে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ আনেন। এঁদের অভিযোগ ছিল, সরকার পক্ষান্তরে "অসহায়" ও "মূক" লক্ষ লক্ষ মানুষকে হেনস্থা করেছেন এবং তাদের উপর বোঝা চাপিয়েছেন। যেমন ১৮৮৮ সালে ২৪শে জানুয়ারি 'কেশরী' পত্রিকা এই মর্মে সরকারকে অভিযুক্ত করে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছিল—

"মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আমদানি করা সুতী-বস্ত্রের উপর আমদানি কর আরোপ করত তাহলে সেটা ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্প-পতিদের কাছে আতঙ্কের কারণ হত। ··পার্লামেন্টে নির্বাচনের সময় যারা প্রভূত সাহায্য করে, দয়ালু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করা কি সম্ভব? যদি আয়করের হার বাড়ানো হয় তাহলে বাড়তি বোঝা পড়বে মূলত ইউরোপীয় কর্মচারি ও ব্যবসায়ীদের উপর। ইতিমধ্যে মুদ্রার বিনিময় হার অনেক বেড়ে যাওয়ায় ওদের পক্ষে এটা হবে সর্বনাশা এবং ওরা তখন বিদ্রোহ করবে।··· লর্ড ডাফরিনের মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এভাবে বিরোধিতা সৃষ্টি করে নিজের সুনামকে কলঙ্কিত করা কি সম্ভব? সংক্ষেপে, লর্ড ডাফরিণ সম্ভাব্য বিকল্প দুটি বাতিল করে দিয়ে এবং লবণ কর বাড়ানোর

পন্থা গ্রহণ করে সুবিবেচকের কাজই করেছেন, কারণ তিনি জানেন ভারতের নিরস্ত্র ও রাজভক্ত জনসাধারণ যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে সরকারের কোনো দাবিতেই 'না' করবে না। যেহেতু সরকার বাহাদুর অনুগ্রহ করে তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের শারিরীক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই।"

১৮৮৮ সালের ২২শে জানুয়ারি ইন্ডিয়ান স্পেক্টেটরও একইভাবে লিখেছিল—

"অথবা ওরা (সরকার) সম্ভবত জনমতের ভয়ে ভীত। কেননা, এটা নিশ্চিত যে ধনীদের উপর করের বোঝা বাড়ালে সরকারকে '২৫ কোটি লোকের প্রতিনিধিদের' হাতে লাঞ্ছিত হতে হত; অন্যদিকে লবণের উপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে কিন্তু এই বিশ-বাইশ কোটি মানুষের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। সরকারের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে যাই বলা হক না কেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারত সরকার নীতি নির্মাণে বিচক্ষণ।"

১৮৮৮ সালে মাহরাট্টা, (২২শে জানুয়ারি) 'হিন্দু' (২৫শে জানুয়ারি) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (২৬শে জানুয়ারি) বেঙ্গলি (২৮শে জানুয়ারি) এবং সঞ্জীবনী (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) একই সুরে মন্তব্য করেছিল। এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে জি. ভি. যোশিও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১৮৮৮ সালের ১৮ই মার্চ মাহারাট্টা এমনকি এই অভিমতও প্রকাশ করে যে লবণ করের ব্যাপারে আসলে যে প্রশ্নটি জড়িত তা হ'ল, ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্য নাকি ভারতবর্ষ অপরের স্বার্থ সাধনের জন্য?

৯. রাজনৈতিক শিক্ষা

বহু জাতীয়তাবাদী সমালোচক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের দুই ভারতীয় সদস্য প্যারীমোহন মুখার্জী এবং দিনশ মেটার ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন। এঁরা দুজনেই ১৮৮৮ সালে লবণ কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৩৬] বহুকাল ধরেই জাতীয়তাবাদীদের একটি বক্তব্যই ছিল এই যে তদানীন্তন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ভারতীয়দের মতামতের প্রতিনিধিত্ব অথবা এদেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করত না এবং ঐ কাউন্সিলের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না; সেজন্য কাউন্সিলের সংস্কার সাধন করে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিদের কাউন্সিলের সদস্য করতে হবে।[৩৭] দুই ভারতীয় প্রতিনিধির ভূমিকাকে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন। এটা খুব জোরালোভাবে উপস্থিত করেন জি ভি. যোশি। লবণ করের বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিতর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—এই ঘটনা "লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পক্ষে কলঙ্কজনক··আরও বেশি কলঙ্কজনক দেশীয় সদস্যদের পক্ষে··এবং, সর্বোপরি, সবচেয়ে বেশি কলঙ্কজনক ব্যবস্থাটির পক্ষে।"

একইভাবে মদনমোহন মালব্যও ১৯০০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে মন্তব্য করেছিলেন—"জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের প্রতি নির্দয়ভাবে সহানুভূতিহীন সদস্য থাকার চাইতে কাউন্সিলে বেসরকারি সদস্য একেবারে না থাকাও ভালো।" প্যারিমোহন মুখার্জি এবং দীনেশ মেটাকে "প্রভূত পরিমাণে ব্যক্তিগত আয় সম্পন্ন, বিশাল বেতনভোগী সম্মানীয় ভদ্রলোক" বলে বর্ণনা করে মালব্য এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন: "যদি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনে জনসাধারণের কোনো ভূমিকা থাকত, তাহলে কি এই ধরনের সব সদস্য নিযুক্ত হতে পারত?" অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা "না, কখনই না" বলে চিৎকার করে উঠলে মালব্য জানতে চাইলেন: "যদিও ভুলক্রমে একবার তারা নির্বাচিত হত, পরের নির্বাচনে কি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হত না?"

১০. সিদ্ধান্ত

লবণ কর সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করা হল তার থেকে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় নেতৃত্ব ঐ কর হ্রাসের অথবা করটি তুলে দেওয়ার দাবিকে জাতীয় স্তরে নিয়ে এসেছিলেন এবং এটি জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বস্তুত এই দাবিকে কাজে লাগানো হয়েছিল তদানীন্তন আর্থিক নীতির সমালোচনা করার ও তার মূলে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া, এই ঘটনায় অন্তত জাতীয়তাবাদী নেতারা এ-দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থকে যথাযথভাবে ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বিকাশমান জাতীয় আন্দোলনে দরিদ্র মানুষকে সাথে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের উপলব্ধি স্পষ্ট ছিল।

১৮৯০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে লবণ কর কমানোর দাবিতে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতায় প্রিঙ্গল কেনেডি প্রতিনিধিদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন—

"বন্ধু প্রতিনিধিবৃন্দ, যারা আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, আপনাদের সবকিছুই নিজেদের স্বার্থে, আপনারা এই আন্দোলন করছেন ইউরোপীয় সাদা চামড়ার ব্রাহ্মণদের জায়গায় কালো চামড়ার ব্রাহ্মণদের ক্ষমতায় বসানোর জন্য, তাদের অভিযোগ যে মিথ্যা তা দেখিয়ে দিন এই ঘোষণার দ্বারা: 'যদি এই বোঝা কমানোর অন্য কোনো রাস্তা না থাকে, তাহলে আমাদের উপর কর চাপান, ধনীদের উপর কর চাপান, কিন্তু দরিদ্র মানুষকে রেহাই দিন।"

১৮৯২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি জি. এস. খাপার্দেও

লবণ কর সম্পর্কে আনীত প্রস্তাবকে প্রায় একইভাবে "কংগ্রেসের কাছে দরিদ্র মানুষের প্রার্থনা" বলে অভিহিত করেছিলেন।

এক্ষেত্রে অন্তত ভারতীয় নেতারা দেশের ধনীদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা যে করেন নি তা বোঝা যায়। তা না হ'লে তাঁরা ধনীদের মুখপাত্রদের মতন লবণ কর ও তা বৃদ্ধি সমর্থন করতেন, এই বিশ্বাস থেকে যে এই করের ফলে ধনীরা আয়করের মতন অন্য করের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন।[৩৮] সামসাময়িক জমিদারদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের ও সরকারি কর্মচারি নয় এমন ইংরেজদের মুখপাত্ররা যেভাবে ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থে প্রকাশ্যে লবণ করের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের মতামতের পার্থক্য লক্ষ করলে এই সত্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। ১৮৮২ সালেই ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতার ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র দুর্গাচরণ লাহা লবণ কর কমানোর প্রস্তাবকে "অসমর্থনযোগ্য" বলে বর্ণনা করে মূলত "আবেগাত্মক যুক্তি" প্রদর্শন করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল, "এদেশের বাস্তব অবস্থায়" প্রত্যক্ষ কর অনুপযোগী, কাজেই সরকার বরং এইসব কর তুলে দিলে ভালো করত। কাউন্সিলে বাংলার জমিদারদের প্রতিনিধি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লাহার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। একইভাবে ১৮৮৮ সালে লবণ কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জমিদারদের আর একজন প্রতিনিধি প্যারীমোহন মুখার্জির পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র দীনেশ মেটা ও ভারতে ব্রিটিশ কর্মচারি ও ব্যবসায়ীদের অন্য প্রতিনিধিরাও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালের বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-এর কমিটির প্রতিবেদনে লবণ কর বৃদ্ধিকে সমর্থন করে বলা হয়েছিল যে, "আয়করের বর্তমান হারকে দ্বিগুণ করে দিলে সেটা যত আপত্তিকর হত লবণ কর তার থেকে অনেক কম আপত্তিকর।" ১৮৮৯ সালে চেম্বার-এর সম্পাদক এবং সভাপতি লবণ কর কমানোর দাবির যে বিরোধিতা করেছিলেন, তা কম জোরের সঙ্গে নয়।

১১. আবগারি শুল্ক

আর একটি পরোক্ষ কর সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল। সেটি, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের উপর চাপানো অন্তঃ-শুল্ক এবং মাদকদ্রব্য, আফিম, ভাং ইত্যাদির ব্যবসার অনুমতির জন্য প্রদেয় ফি। এই উৎস থেকে মোট আয়ের পরিমাণ ১৮৬০-৬১ সালের ১.১৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৮৮০-০১ সালে ৩.১৯ কোটি এবং ১৯০২-৩৩ সালে ৬.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আবগারি শুল্ক থেকে এই মোট আয়ের প্রধান অংশটাই এসেছে এদেশে প্রস্তুত মদ ও দিশী মদের ব্যাবসা থেকে। এখানে শুধু ঐ অংশটি সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

দিশী মদ থেকে আবগারি শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রকম ছিল। যেসব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা মোটামুটি দুধরণের – (১) ভাটিখানায় প্রস্তুত এবং বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো প্রতি গ্যালন মদের উপর কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আরোপের পদ্ধতি ; এবং (২) উৎপন্ন মদের উপর পরিমাণ অনুযায়ী কর আরোপ না করে নীলামে স্থিরিকৃত মোট মূল্যের উপর এককালীন কর আরোপের পদ্ধতি। এর মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা মদ্যপানের ব্যাপারে সরকারি বাধা থাকত অনেক কম।[৩৯] ১৮৯০-এর দশকে সরকারের ঘোষিত নীতিই ছিল মদ্যপান যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করেই সর্বোচ্চ পরিমাণ শুল্ক আদায়। এটা করা হত শুল্কের হার বাড়িয়ে। মদের ব্যবহার যাতে ন্যূনতম হয় তার জন্য মদের দোকানের সংখ্যা সীমিত রাখা হত। এর সঙ্গে বেআইনী মদ চোলাই নিষিদ্ধ ছিল। অন্তত ১৮৯০ সালের পরে, ভাটিখানা থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে শুল্ক আদায়ের প্রথম পদ্ধতিটিকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে ধীরে ধীরে তুলে দেওয়াই সরকারের স্থির সিদ্ধান্ত এবং প্রচারিত কর্মসূচী ছিল।

মদ্যপান ও তার উপর কর আরোপের ব্যাপারটিকে ভারতীয় নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। প্রায় সব নেতাই ছিলেন মদ্যপান বিরোধী এবং দেশজুড়ে মদ্যপানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ার বিরোধী। মদ্যপানকে এরা মারাত্মক ক্ষতিকর অভ্যাস—"একটি ভয়ঙ্কর শাস্তি"—বলে মনে করতেন। কারণ, মদ্যপান একটি বদভ্যাস যা নৈতিক রক্তকে কলুষিত করে, অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্রের কারণ হয়, এবং দেহকে দুর্বল করে দেয়। কিছু নেতা এমন কি এও মনে করতেন যে, মদ্যপানের পরিমাণ বাড়লে তা পরোক্ষে শ্রমের দক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে শিল্পের প্রসারকে ব্যাহত করে।

মদ্যপানের বিরোধিতা করতে গিয়ে আর একবার ভারতীয় নেতৃত্ব "আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে" বেছে নিয়েছিলেন সরকারকে। সরকার ও তার আবগারি শুল্ক সংক্রান্ত নীতিকে পানাভ্যাসের বিস্তৃতির জন্য সম্পূর্ণত দায়ী করে তাঁরা আবগারি শুল্কের আয়কে সর্বাধিক করার তাগিদে সচেতনভাবে অথবা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াই মদ্যপানকে উৎসাহিত করার জন্য কিংবা অন্তত তা সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করতে না পারার জন্য সরকারের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন।[৪০] সরকারের এই আবগারি নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা সবচেয়ে বেশি তীব্র ও আপোষহীন হতে দেখা গেছে ১৮৮০-র দশকে বাংলা প্রদেশে। কেননা এই প্রদেশে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আবগারি শুল্ক আদায় করা হত, এবং তার ফলে মদের দাম তুলনায় কম ছিল।

ভারতীয় নেতারা অভিযোগ করেছেন, সরকার প্রকাশ্যে মদ্যপানকে নিরুৎ-

সাহিত করা নীতি হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাস্তবে সরকারী নীতির প্রতিক্রিয়া ছিল বিপরীত।[৪১] এর কারণ, প্রশাসনের প্রবণতাই ছিল যেসব সরকারি কর্মচারির এলাকায় আবগারি শুল্ক থেকে আয় বেড়েছে তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করা ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা আর যেসব কর্মচারি তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের নিন্দা করা, কর্মচারিদের আবগারি আয় বাড়ানোর জন্য এই ধরনের উৎসাহদানের অর্থ যদি মদ্যপান বাড়ানো হয় তাহলেও। এই প্রসঙ্গে অবশ্য এটা বলা দরকার যে, সরকারের মুখপাত্ররা এই অভিযোগ খণ্ডনে কম পিছ-পা ছিল না। তারা জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে যে আবগারি শুল্ক থেকে যে আয় বেড়েছে তা মূলত এই শুল্কের উচ্চহার এবং কঠোরতর আবগারি নিয়ন্ত্রণের জন্য।[৪২] তবে মজার কথা হল, মদ্যপান যে বেড়েছিল তা সরকারি কর্মচারিরা পরোক্ষে স্বীকার করেছিলেন, অন্য প্রসঙ্গে। কিন্তু ঐ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে তা মানুষের স্বাচ্ছল্য বাড়ার লক্ষণ। জাতীয়তাবাদীরা সমগ্র বিষয়টিকে যেভাবে দেখেছিলেন তার সঙ্গে সংগতি রেখেই সরকারি মুখপাত্রদের বক্তব্যকে খারিজ করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে, মদ্যপানে আসক্তি পানাসক্ত ও তার পরিবারের দারিদ্র, দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

জাতীয় নেতারা এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে এই ব্যাধি দূর করা অনেক সময়সাপেক্ষ এবং একমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই মাদকাশক্তির বিস্তারকে এখনই রোধ করা সম্ভব।[৪৩] সেজন্য তাঁরা মদ্যপানের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেননি। তাঁরা তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন সরকারকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করে কিংবা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে যাতে সরকার তার আয়ের চিন্তা থেকে জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং মদ্যপানকে নিরুৎসাহ করার জন্য সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করে। তাঁরা যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন তার প্রায় সবগুলিরই লক্ষ্য ছিল মদকে মহার্ঘ করা অথবা ভাটিখানা ও মদের দোকানের সংখ্যা কমিয়ে এমন ব্যবস্থা করা যাতে মদ সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। তাঁদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল, সেটি হল "স্থানীয়ভাবে পছন্দ-অপছন্দ জানা।" তাঁরা দাবি করলেন যে কোথাও নতুন মদের দোকান বা ভাটিখানা খুলতে হলে সেই অঞ্চলের জনমতকে হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা পৌরসভার মত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার মাধ্যমে জানতে হবে এবং তাকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে হবে। আর একটি জনপ্রিয় প্রস্তাব ছিল আবগারি শুল্ক আরোপের দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বাতিল করার দাবি, যদিও এটা মূলত বাংলা প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৯ এবং ১৮৯০ সালে বাংলা প্রদেশের

বৃহত্তর অংশে এই পদ্ধতিতে আবগারি শুল্ক নির্ধারন বন্ধ করা হলে জাতীয় কংগ্রেস পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। এছাড়াও, জাতীয়তাবাদীরা মদের উপর আমদানি ও আবগারি শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিছু নেতা মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার এবং "খুচরো মদ বিক্রির দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে…কড়াকড়ি" করার প্রস্তাবও করেছিলেন।[৪৪] কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হল, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হিসেবে মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের দাবি কখনই খুব একটা আমল পায়নি। সম্ভবত তাঁরা এটা সম্ভবপর নয় বলেই ভেবেছেন।[৪৫]

উপরের এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মদের উপর আবগারি শুল্কের ব্যাপারে জাতীয় নেতৃত্বের মানসিকতা ছিল বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যের দিক থেকে পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী। মদের উপর আবগারি শুল্ক সরকারের আয়ের একটি ভালো উৎস ছিল। তাছাড়া এই শুল্ক শুধু তাদেরই দিতে হত যারা মদ্য পান করত। এবং এই শুল্ক থেকে আয়ের জন্য সাধারণের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর প্রয়োজন হয়নি। তাসত্ত্বেও, নেতারা এই শুল্কের ব্যাপারকে দেখেছেন সার্বিক মঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্তত তাঁরা যেভাবে বুঝেছেন, এবং তার জন্য এর নিন্দা করতে দ্বিধা করেননি।

জাতীয়তাবাদী নীতির এই বৈশিষ্ট্যকে অন্য আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যায়। একদিকে, যদি জাতীয়তাবাদীদের দাবি মত মদকে মহার্ঘ করা হত, তাহলে নেতাদের মধ্যে যাঁরা মদ্যপান করতেন তাঁরা স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদীরা মদের জোগান কমিয়ে দেওয়ার যে দাবি করেছেন তা করা হলে আবগারি শুল্ক আদায় কমে যেত এবং সেটা মদ্যপান করে না এমন করদাতাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যেত। স্পষ্টতই আর্থিক ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের পরার্থপরতার এটি আর একটি উদাহরণ।

এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, মদ্যপান বিরোধী প্রচার পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে ভূমিকা নিয়েছে সেভাবে এটিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা তখনও দেখা না গেলেও, মদ্যপানের বিরোধিতা যে জনসাধারণকে রাজনৈতিক কাজকর্মে সুশিক্ষিত করে তুলতে সহায়ক হতে পারে, নেতৃত্বের সর্বস্তরে এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯০৫ সালের ১৭ই এপ্রিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টেম্পারেন্স এ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় দাদাভাই নৌরজি মন্তব্য করেছিলেন—

"সমগ্র ভারতে সঙ্ঘের ৩০০ শাখা আছে; তার অর্থ—উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব শ্রেণীর, মতের এবং সব মর্যাদার লোকেরা একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হওয়ার ও পরস্পরের সঙ্গে ভাই-এর মত একসাথে কাজ করার

অতীব প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করছে।…এই সঙ্ঘ যে শুধু ভারতবর্ষে মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে কাজ করছিল তাই নয়, সমান গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ভালো কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিল। সেটি, জনসাধারণকে চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে উন্নত করার এবং ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, যা ভবিষ্যতে তাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে।"[৪৬]

দ্বিতীয়ত, মদ্যপানের অভ্যাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদেশী সরকারকে দায়ী করার প্রবণতাটি জাতীয়তাবাদীদের আবগারি শুল্ক সংক্রান্ত নীতিকে জাতীয়তাবাদী চরিত্র দিয়েছিল।

১২. আফিম শুল্ক

ভারত সরকারের আয়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল আফিম। বাজেটের আয় খাতে এটি ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় এবং ১৮৮৪ সালের পর তৃতীয় স্থান নিয়েছে। তবে এই খাতে আয়ের পরিমাণে এক বছর থেকে অন্য বছরে বিপুল পার্থক্য দেখা যেত, যেটি ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় কিছুটা অস্থায়ীত্বের কারণ হয়েছিল। যেমন, ১৮৮০-৮১ সালে আফিম থেকে নীট আয়ের পরিমাণ ছিল ৮'৪৫ কোটি টাকা, ১৮৯০-৯১ সালে ৫'৭০ কোটি টাকা, ১৯০০-০১ সালে ৪'৯৭ কোটি টাকা, কিন্তু এর মধ্যে ১৮৯৭-৯৮ সালে এটা নেমে দাঁড়িয়েছিল ২'৭০ কোটি টাকা। আফিমের থেকে আয় আসত বাংলার সরকারের অধীনে বিহারও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এবং অযোধ্যায় একধরনের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থায় উৎপন্ন বাংলার আফিম রপ্তানি করে এবং বোম্বাই-এ মালয়ের আফিমের উপর উচ্চহারে রপ্তানি কর ধার্য করে। রপ্তানি করা আফিম বেশির ভাগটাই যেত চীনে। বাংলার আফিমের একটা অংশ আবগারি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে ভারতেই বিক্রি হত, এবং এর থেকে যে আয় হত তাকে আবগারি আয় বলে ধরা হত। আফিম থেকে আবগারি শুল্ক বাবদ প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ ১৮৭০-৭১ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯০০-০১ সালে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল।

গোটা উনবিংশ শতাব্দি জুড়ে চীনের সঙ্গে আফিমের ব্যবসা ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও জনমতের দ্বারা নৈতিক ও মানবিক কারণে সমালোচিত হয়েছে। ১৮৮৮ সালে "সোসাইটি ফর দ্য সাপ্রেশন অব দ্য ওপিয়াম ট্রেড" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ব্রিটেনে আফিম ব্যবসা এবং সরকারি "পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যবসার সম্প্রসারণের" বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার ফলেই ১৮৯১ সালের ১০ই এপ্রিল কমনস সভায় ভারতে আফিম শুল্কের ব্যবস্থাকে অনৈতিক ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারত সরকারকে "আফিম চাষের জন্য অনুমতি প্রদান বন্ধ করতে এবং একমাত্র ওষুধের প্রয়োজনে ছাড়া

আফিম বিক্রি নিষিদ্ধ করতে" বলা হয়েছিল। এরপর ১৮৯৩ সালে সমগ্র বিষয়টিকে খতিয়ে দেখতে একটি রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এই কমিশন প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তন না-করার পরামর্শ দেয়।[৪৭] এই কয় বছর ধরেই ভারত সরকার আফিমের ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপ বা এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি জানিয়ে আসছিল। সরকারের প্রধান যুক্তি ছিল, এই ধরনের পদক্ষেপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে অনুচিত হবে।

আফিমের ব্যবসা ও তার থেকে রাজস্ব আয়ের বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের মনোভাব ছিল খতিয়ে দেখার মত। পরিস্থিতিটা ছিল এমন যে তাদের একদিকে জাতীয় স্বার্থ (যেটা অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে) এবং অন্যদিকে, মানবিকতা ও লোকহিতৈষিণা (যে যুক্তিতে তাঁরা সাধারণত ব্রিটেনের জনসাধারণ ও সরকারের কাছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধার জন্য আবেদন-নিবেদন করতেন) মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে হয়েছে।

আফিম থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে। অধিকাংশ ভারতীয় নেতার অভিমতই ছিল সরকারি বক্তব্যের বিপরীত এবং এ-বিষয়ে ইংরেজ সমালোচকদের বক্তব্যের কাছাকাছি। কেননা, তাঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, আফিমের ব্যবসা ও তার থেকে রাজস্ব আদায় একেবারেই অনৈতিক এবং খুবই নিন্দার্হ। ১৮৭০ সালেই কেশব চন্দ্র সেন "যে নীতিবিগর্হিত আফিমের ব্যবসা হাজার হাজার দরিদ্র চৈনিকের মৃত্যু ঘটিয়েছে" তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এরপর ১৮৮০ সালে দাদাভাই নৌরজি ক্রোধের সঙ্গে ঘোষণা করেন—"এই আফিমের ব্যবসা ইংল্যান্ডের মাথায় পাপের বোঝা, এবং ভারতবর্ষ বাহন হিসেবে অংশ নেওয়ায় এটা ভারতের পক্ষে অভিশাপ।"[৪৮] প্রায় একই সুরে ১৮৮১ সালের ৭ই আগস্ট "মাহরাট্টা" প্রতিবাদ করে লিখেছিল, "৪০ কোটি মানুষকে বিষ দিয়ে হত্যা করার জন্য" অভিশাপ কুড়োতে ভারতবাসীকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আফিম থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সরকারি বক্তব্য দাদাভাই নৌরজি ও রমেশচন্দ্র দত্ত মানেননি। সরকার দাবি করত যে আফিমের উপর আরোপিত শুল্ক ভারতবর্ষের মানুষকে দিতে হয়নি, এই শুল্কের বোঝা বহন করেছে চীনদেশের আফিম-সেবনকারীরা। কিন্তু নৌরজি এবং দত্ত দেখালেন যে আফিম শুল্ক ছিল আসলে ভারতীয়দের উপর চাপানো প্রচ্ছন্ন কর। যদি আফিমের ব্যবসায় রাষ্ট্রের একচেটিয়া না থাকত তাহলেই শুধু প্রাপ্ত রাজস্ব —যা আসলে সরকারের মুনাফা—ভারতীয়দের হাতে জমা হতে পারত।

অবশ্য আফিমের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রশ্নের মূল বিষয়ে, অর্থাৎ আফিমের

ব্যবসা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে, ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। নেতাদের একটা বড় অংশ যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টিকে দেখেছিলেন তা প্রায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ। অন্যদিকে আবার বেশ কিছু নেতা মানবিক কারণেই এই ব্যবসা তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। প্রথমোক্তরা নিছক আবেগের বশে আফিমের ব্যবসাকে তুলে দেওয়ার দাবিকে সমর্থন করেননি। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল, আফিম থেকে আয় ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এটা বন্ধ হয়ে গেলে সরকার বাধ্য হবে নতুন নতুন কর বসাতে। এবং এজন্যই তাঁরা ইংলন্ডে আফিম-বিরোধী যে আন্দোলন চলছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে ১৮৮০ সালের ৯ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল তার উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকাটি লিখেছিল— "আয়ের এই ধরণের উৎসকে বর্জন করলে, তার ফলে আয় ও ব্যায়ের মধ্যে যে ব্যবধান হবে তা পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যে জর্জর জনসাধারণের কাছ থেকে ধ্বংসাত্মক কর আদায় করা হবে, যেটা নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে তাতে চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ।"[৫০] শুধু অমৃতবাজারই নয়, সংগ্রামী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নীতিবাগিশ কাগজ "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন"-ও ১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই আফিম থেকে লভ্য করের ব্যাপারে অতিরিক্ত ন্যায়নিষ্ঠ মনোভাব গ্রহণ করলে যে আর্থিক সংকট দেখা দেবে, সে-বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিল।[৫১] এমনকি, ভারতে সামাজিক সংস্কার সাধনের ব্যাপারে জোরালো ও অবিচলিত মুখপত্র "ইন্ডিয়ান স্পেকেটটরও" ১৮৮২ সালের ১২ই মার্চ ইংল্যান্ডে আফিম করের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন তাঁদের "সদুদ্দেশ্যপূর্ণ কিন্তু অত্যন্ত গোঁড়া এবং মূর্খ একটি শক্তিশালী শ্রেণী" আখ্যায় ভূষিত করেছিল।[৫২] আর একটি সংস্কারবাদী সংবাদপত্র 'হিন্দু' ১৮৯৩ সালের ৩রা জুলাই ঘোষণা করেছিল যে, ঐ কাগজ আফিম কর রদ করাকে সমর্থন করবে যদি ব্রিটিশ করদাতারা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে এর ফলে ভারত সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা তারা পূরণ করতে রাজি আছে।[৫৩]

বহু ভারতীয় নেতা আফিম ব্যবসার বিরোধী ইংরেজদের আন্দোলনকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে জনদরদী সাজার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে তা ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করেছিলেন। এঁদের বক্তব্য ছিল, ব্রিটেনের মানুষ যদি চীনের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সত্যি সত্যিই এতই উদ্‌গ্রীব হন তাহলে তাঁরা আফিম কর বন্ধ হয়ে গেলে ভারত সরকারের যে লোকসান হবে তা পূরণ করার জন্য নিজেদের সরকারকে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন না কেন। মজার ব্যাপার হল, ব্রিটেনের আফিম বিরোধী আন্দোলনের জন্য যাঁদের সততা সম্পর্কে এই ধরণের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এবং যাঁদের গোঁড়া, মূর্খ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছিল এঁদের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য ডবলিউ, এস, কেইন ও স্যামুয়েল স্মিথ-

এর মত ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁরা ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রবল সমর্থক বলে পরিচিত।

ভারতীয় নেতৃত্বের এই গোষ্ঠী তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে এবং আফিমের ব্যবসা তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য যুক্তি দিয়েছিলেন। যেমন, একটি যুক্তি ছিল এই যে, চীনকে আফিম সেবনের দুষ্ট অভ্যাস থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা শুরু করার আগে ইংল্যান্ড এবং ভারতের সমাজ সংস্কারক ও কর্তাব্যক্তিদের উচিত হবে এই দেশে মদ্যপানকে নিন্দা করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া, কেননা মদ্যপান আফিম সেবনের থেকে কম ক্ষতিকর নয়। দ্বিতীয়ত, নেতাদের কেউ কেউ এটাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ থেকে আফিম রপ্তানি বন্ধ করে কোনো লাভ হবে না, কারণ পারস্য, তুরস্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র সাগ্রহে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য এগিয়ে আসবে অথবা চীনের জনসাধারণ নিজেরাই আফিমের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হবে। এবং তার ফলে লোকহিতের লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে যাবে, মাঝখান থেকে ভারতবর্ষের মানুষ আয়ের একটি উৎস থেকে বঞ্চিত হবে। লক্ষ করার বিষয় হল, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি কিন্তু কখনই এই যুক্তি উপস্থিত করেনি যে আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ হলে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং তারা বিপরীত কথাই বলেছিল। যেমন, আফিমের ব্যবসার বিরোধী কাগজ "সঞ্জীবনী" ১৮৯৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করে লিখেছিল, তারা আফিমের ব্যবসাকে সমর্থন করে কারণ এই ব্যবসা থেকে তারা বিপুল পরিমাণে মুনাফা করতে পেরেছে। আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্যে ব্যবসার স্বার্থে কথা না বলে সরকারের আয়ের যুক্তির উপর এই গুরুত্ব আরোপ থেকে এটাই বোঝা যায় যে জাতীয় নেতৃত্বের এই গোষ্ঠীর আফিম সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আফিম ব্যবসায়ী-দের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি।

ভারতীয় নেতৃত্বের অন্য একটি গোষ্ঠী যাঁরা মানবিকতার কারণে আফিম উৎপাদন বন্ধ ও আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁরা এই ব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে যে আয়ের ঘাটতির সম্ভাবনা তা ব্যয় সংকোচ করে পূরণের প্রস্তাব করেছিলেন। এ-বিষয়ে অবশ্য মারহাট্টা, হিন্দু, সোম প্রকাশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মত বহু কাগজের বক্তব্যে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সুর লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ সময়ে যিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলেই তা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৮০ সালের ২০শে জুলাই আনন্দ-বাজার পত্রিকাই সবচেয়ে জোরালোভাবে এবং অকাট্য যুক্তি দিয়ে আফিম-ব্যবসার বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে তুলে ধরেছিল। পত্রিকাটি লিখেছিল—

"যেহেতু চীন তার চাহিদা মেটানোর জন্য, অন্য জায়গা থেকে আফিম আমদানি করবেই, অতএব ভারতবর্ষ থেকে ঐ দ্রব্যটির রপ্তানি করলে তার ফলে বিশেষ কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, শাসকেরা এই যে যুক্তি দিচ্ছেন তা কোন নীতিশাস্ত্র-সম্মত? একই যুক্তিতে একজন ডাকাত তার দুষ্কর্মের সমর্থনে বলতে পারে যে সে প্রয়োজনের জন্য দুষ্কর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, একজন খুনী বলতে পারে যে তার হাতে না মরলেও একদিন তো তাকে মরতেই হত। ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করলে তো সরকারের ব্যয় অর্ধেক কমিয়ে আনতে পারে। তার ফলে সহজেই আফিমের অসম ব্যবসাটি বন্ধ দেওয়া যায়।"

দাদাভাই নৌরজি আগাগোড়া আফিমের ব্যবসার বিরোধীতা করেছেন, যদিও তিনি জানতেন যে অন্যান্য নেতাদের বেশির ভাগই এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে এক-মত নন।[৫৪] সে সময়ে ইংলন্ডে আফিম নিয়ে বিতর্ক চলছিল। নৌরজি চেষ্টা করেছেন এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য প্রচার করতে। যে লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেছেন তার জন্য যে কোনো সুযোগকে তিনি যে কাজে লাগাতে পারতেন, এর দ্বারা তা আর একবার প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালে নৌরজি দেখান যে, আফিমের ব্যবসার ফলে ভারত কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি। এই ব্যবসা থেকে যে মুনাফা এসেছে তা আসলে এদেশ থেকে সম্পদ ইংলন্ডে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, আর ভারতের ভাগ্যে জুটেছে শুধুই "চীনে ঘোড়দৌড়ের অভিশাপ।" নৌরজির মতে, ভারতবর্ষের অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে সংকট এবং দেউলিয়া অবস্থা চলছিল আফিমের ব্যাবসা থেকে লব্ধ আয় তা গোপন করে রেখেছে। এই "অভিশপ্ত" ব্যাবসাটি না থাকলে ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হত এবং তার ফলে "ভারতের দুর্দশা অনেক আগেই প্রকট হয়ে পড়ত", এবং তার থেকে মুক্তির পথও পাওয়া যেত। কাজেই, আফিমের ব্যাবসা কেবলমাত্র "ভারতের যন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ীই করেছে।"

১৮৮৬ সালে লন্ডনে আহূত "সোসাইটি ফর দ্য সাপ্রেশন অব ওপিয়াম ট্রেড"-এর সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় দাদাভাই নৌরজি তাঁর উপরি-উক্ত বক্তব্যের প্রায় প্রতিটি শব্দের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আফিমের সমস্যাকে ভারতবর্ষের মূল সমস্যার—অর্থাৎ, দারিদ্রের সমস্যার—সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যদি ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব উৎপন্ন সম্পদ দেশে রাখার এবং স্বাধীনভাবে বৈষয়িক উন্নতি ঘটানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে এই দেশেই এত বিপুল পরিমাণে আয় সৃষ্টি সম্ভব যাতে সরকার সহজেই "আফিমের ব্যাবসা থেকে শুল্ক আদায়ের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আফিম শুল্কের ব্যাপারে জাতীয় নেতাদের মনোভাব

গঠনের মূলে দুটি প্রবণতা—এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী প্রবণতা—কাজ করেছিল। এর একটি মানব-হিতৈষিণা, অপরটি জাতীয় স্বার্থের বোধ। কিছু নেতা এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, এবং যখন এর থেকে একটিকে বেছে নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন, তখন প্রথমটিকেই গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে এম. জি. রাণাডে, বি. জি. তিলক, এস. এন. ব্যানার্জি কিংবা মতিলাল ও শিশিরকুমার ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের মত অনেকেই তাঁদের নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন নতুন কর আরোপের আশংকা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চিন্তাকে।

এর সঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি রপ্তানি শুল্ক রদ করার জন্য যে আন্দোলন চলছিল এবং ভারতীয় নেতৃত্ব যেভাবে তীব্রতা ও তিক্ততার সঙ্গে এবং ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন আফিম শুল্ক রদ করার দাবিতে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধীতা সে-ধরণের ছিল না, যদিও এই শুল্ক রদ হলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল তুলনায় অনেক বেশি।[৫৫] সম্ভবত একটি কারণের দ্বারা এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। সেটা এই যে, আফিম শুল্ক থেকে প্রাপ্ত আয় বন্ধ হয়ে গেলে যে ক্ষতি হত তা শুধু আর্থিক ক্ষতি, এর ফলে শিল্পের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু সুতীবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক রদ হলে ক্ষতি হত আর্থিক এবং একই সঙ্গে শিল্পেরও। স্পষ্টতই ভারতীয় নেতারা এটাই ভেবেছিলেন যে, আর্থিক ক্ষতি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রশান্তচিত্তে না-হলেও অন্তত নীতিগত অবস্থানের প্রতি অবিচল থাকার সন্তুষ্টি সহ, তা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু শিল্পের ক্ষতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রবলভাবে সংগ্রাম করা প্রয়োজন, কেননাএর সঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত।

টীকা

১। ১৮৯৯ সালে কার্জন একইভাবে ঘোষণা করে বলেছিলেন, যে, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বাজেটে ৪½ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত "শুধুমাত্র অবস্থা ফিরিয়ে আনার অসামান্য ক্ষমতারই পরিচায়ক নয়, সুপ্ত আছে যে বিস্ময়কর শক্তির ভান্ডার" তারও সূচক।

২। জন ব্রাইট-এর লেখা এক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে ১৮৯৫ সালে পি. সি. রায় বলেছিলেন, ব্রাইট যে মানদন্ডের কথা বলেছেন সেই মানদন্ড অনুসারে "ভারতে ইংলন্ডে শাসন স্ব-অভিযুক্ত, স্ব-নিন্দিত এবং নিজেই নিজের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হবে।"

৩। যেহেতু ভারতে কর থেকে লব্ধ আয়ের দ্বারাই ব্যয় নির্বাহ হয়েছে, সেজন্য ভারতের আর্থিক অবস্থাকে সুস্বাস্থ্য-সম্পন্ন বলা যায়—যোশি এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ নাকচ

করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, আয়-ব্যয়ের এই ভারসাম্য আর্থিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়, এই দেশের সরকার যে স্বৈরতান্ত্রিক প্রকৃতির, তার প্রমাণ। এর থেকে বোঝা যায় —"প্রশাসনের দয়ামায়াহীন বলপ্রয়োগের ক্ষমতা...দায়দায়িত্বহীন এবং স্বৈরাচারী সরকারি দপ্তরের অপরিণামদর্শী নীতি সুযোগ করে দিয়েছে সাম্রাজ্যের ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে, তার ভিত্তিতে সরকারি করের পরিমাণ নির্ণয়ের যার সঙ্গে জনসাধারণের কর দেওয়ার ক্ষমতার কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই।"

৪। সরকারের নীট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৮৮১-৮২ সালে ৪৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯০৪-৫ সালে ৬৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

৫। নৌরজি আরও বলেন—"আপনি এই অর্থের পরিমাণকে কর থেকে প্রাপ্ত আয়, রেভিনিউ বা অন্য যে কোনো নাম দিতে পারেন এবং সরকারও যে কোনো রূপে বা উপায়ে এটা সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু এটা আসলে সরকারের প্রয়োজনে দেশের আয় থেকে সংগৃহীত অর্থ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই অর্থ ভূমি রাজস্ব বা আফিম শুল্কে বা অন্য যে নামেই সংগৃহীত হ'ক-না-কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, আসল সত্যটা এই যে টাকাটা এসেছে এই দেশের মোট আয় থেকে। সরকার তার প্রয়োজন মেটাতে দেশের সৃষ্ট আয় থেকে এই যে বিপুল পরিমাণে টাকা নিয়ে নিচ্ছে, তা না নিলে এই টাকা থাকত জনসাধারণের হাতে।" অল্প কিছুদিন বাদেই তিনি আরও জোর দিয়ে একই কথা বলেছিলেন—"এই অংশকে রেভিনিউ, কর, খাজনা, সেবাকার্যের মূল্য আশির্বাদ, অভিশাপ অথবা ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডারের 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত যত শব্দ আছে তার যে-কোনোটি দিয়ে অভিহিত করতে পারেন, আসল ঘটনা হ'ল—সরকারের প্রয়োজন মেটাতে দেশটিকে তার আয়ের একটি অংশ দিয়ে দিতে হবে।...এর ছিটে ফোঁটাও আকাশ থেকে পড়েনি অথবা সরকারের কোনো ইন্দ্রজাল ক্ষমতার ফলে উৎপন্ন হয়নি।"

৬। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন ভারতে করের বোঝার পরিমাণ হিসেব করে দেখিয়েছিল মাথা-পিছু ৪ শিলিং।

৭। অর্থ সংক্রান্ত সদস্য এডোয়ার্ড ল-র মতে, ১৯০৪ সালে করের বোঝা ছিল মাথা-পিছু মাত্র ১·৪২ টাকা।

৮। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"এমনকি রোমান্সের ক্ষেত্রেও এর থেকে বেশি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আলো ফেলা হয় তখন মোহ অতি দ্রুত কেটে যায়।"

৯। ১৮৭৯ সালের ১লা জানুয়ারি "হিন্দি প্রদীপ" একই সুরে মন্তব্য করেছিল—"আমাদের সরকারের আশির্বাদপুষ্ট পা-এর নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা হল, যেখানেই এই পা পড়ে সেখানকার মাটি এবং সবচেয়ে গুরুত্বহীন জিনিষও রেভিনিউ সংগ্রহের মূল্যবান উৎস হয়ে ওঠে।"

১০। ১৮৮৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কাগজটি পরিহাস করে সরকারকে ঘাটতি মেটানোর জন্য জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিল সরকার প্রয়োজনে আলো-হাওয়া, মেলা-পার্বন, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং বেশ্যাদের দেহ-ব্যবসায়ের উপরও কর আরোপ করতে পারেন।

১১। এর দু বছর পরে সয়ান সতর্ক করে দিয়েছিলেন—"বর্তমান করের পরিমাণ বাড়ানো অথবা নতুন কর চাপানো রাজনৈতিক বিপদের কারণ হবে, কেননা ভারতের জনসাধারণের এর থেকে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই।"

১২। নৌরোজি ভারতে ব্যয়-সংক্রান্ত ওয়েলবি কমিশনের কাছে বলেছিলেন যে, ভারতীয় কৃষকদের উপর করের বোঝা অত্যাচারের সামিল এবং, "এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তা নিদারুণ হয়ে উঠছে।"

১৩। ১৮৮০ সালের ফিন্যান্স কমিশনের হিসেব মত মাথাপিছু করের বোঝা বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এইরকম ছিল—ভূস্বামী শ্রেণী ২৭৩ পাঃ, কৃষিশ্রমিক '০৮৫ পাঃ। ব্যবসায়ী ও কর্মচারি, '১৬৪ পাঃ এবং কারিগর ও হস্ত শিল্পী '১ পাঃ। এই হিসেব করতে গিয়ে কমিশনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভূমিরাজস্বকে মোট করের পরিমাণের মধ্যে ধরতে হয়েছিল।

১৪। একইভাবে ১৮৮৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী "সঞ্জীবনী" এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—"এদেশের ধনীরা যথেষ্ট পরিমাণে কর তো দেয়ই না এমনকি গরিব মানুষেরা যা দেয় তাও দেয় না।"

১৫। পরবর্তীকালে, ১৯০১ সালে, তিনি গরিবের উপর করের বোঝা কমানোর কথা বলেছিলেন। এমনকি তার জন্য প্রয়োজন হলে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে করের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

১৬। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে প্রায় একই ভাষায় অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৭। এই হিসেব অবশ্য আনুমানিক হবে, আমার ধারণা বর্তমান প্রয়োজনের দিক থেকে এটা ঠিকই ছিল। তাছাড়া আমাদের হাতে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের সাক্ষ্যও আছে। তাঁরা সবাই বলেছেন ভারতের আর অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

১৮। ১৮৮০ সালে ভূমিরাজস্ব থেকে আদায় হত ২১.১ কোটি লবণের উপর কর থেকে ৭.১ কোটি, আফিম শুল্ক থেকে ১০.৪ কোটি, একসাইজ শুল্ক থেকে ৩.১ কোটি, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক থেকে ২.৫ কোটি এবং আয়কর থেকে .৫ কোটি টাকা। ১৯০৪ সালে এইসব উৎস থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮.৩ কোটি, ৭.৯ কোটি, ৯.০ কোটি, ৭.৯ কোটি, ৬.৪ কোটি এবং ১.৮ কোটি টাকা।

১৯। পরের বছর যখন সরকার আয়কর পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন গভর্নর জেনারেল ভারতের জনসাধারণের অগ্রবর্তী অংশের সমর্থনের প্রমাণ স্বরূপ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটির উল্লেখ করেন।

২০। এইসব সংবাদপত্রের মধ্যে বেশ কয়েকটি আগে, এমনকি মাত্র কয়েকদিন আগেও, আয়করের বিরোধিতা করেছিল। এই তালিকায় বাংলা প্রদেশ থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের বিপুল সংখ্যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কী করে ১৮৮৬ সালের বাংলায় প্রদেশের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্র সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে একমাত্র আনন্দবাজার ছাড়া আর কোন দেশীয় সংবাদপত্র আয় করতে সমর্থন করেনি।

২১। "যে সব কর দেশের আয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে" তিনি সেগুলি তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে যে তালিকাটি পেশ করেছিলেন তার মধ্যে ভূমি কর, ভূমি করের উপর সেস, লবণ শুল্ক, এবং সুতীবস্ত্রের উপর এক্সাইজ শুল্ক ছিল, কিন্তু আয়করের উল্লেখ ছিল না। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২২। প্রত্যক্ষ কর ভারতে উপযোগী নয়। এই তত্ত্বটির বিরোধিতা করে 'বেঙ্গলি' লিখেছিল—"আমরা কখনই সব ধরনের প্রত্যক্ষ করের পরিমাণই কমিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানানো থেকে বিরত হয় না এবং সব প্রত্যক্ষ করই তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ

ও করব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা মনে রাখা আমাদের কর্তব্য হবে যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক এবং সবচেয়ে বৈষম্য মূলক প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে সেগুলিই যা আমাদের দিতে হয় না, কিন্তু যেগুলি লক্ষ লক্ষ প্রকৃত কৃষকের—রক্ত শুষে নেয়।"

২৩। এই ছাড়ের কথা ঘোষণা করে আর্থ-বিষয়ক সদস্য স্যার এডোয়ার্ড ল মন্তব্য করেন: "আয়কর ছাড়ের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এক হাজার টাকার কম আয়ের ক্ষেত্রে এই কর দেন প্রধানত ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেরানীরা এবং অবসরকালীন ভাতা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা এই করের পরিমাণ কম হলেও একে গুরুতর বোঝা বলে মনে করেন।......তাছাড়া আমাদের এই আশাঙ্কাও অমূলক নয় যে নিম্ন আয়বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে এই বোঝা আরও বেশি হয় যাঁরা করের পরিমাণ নির্ধারণ কবেন তাঁদের কর নির্ধারণের পদ্ধতির ফলে; সম্ভবত এঁরা কখনও কখনও অযৌক্তিকভাবে উচ্চ হারে কর ধার্য করে থাকে না।"

২৪। ১৯০২ সালের ২০শে অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক-সম্পাদক জাতীয়তাবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। তাঁকে নিজেকে বিপুল পরিমাণে আয়কর দিতে হলেও তিনি যে আয়কর সমর্থন করেছিলেন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২৫। অর্থ সচিব এ. কলভিন ১৮৮৬ সালে উচ্চশ্রেণীগুলির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, এঁরা করের বোঝার "ছিটেফোঁটাও নিজেরা বহন করার" পরিবর্তে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান এবং এঁরা—বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা—"সরকারকে সাহায্য করতে সবচেয়ে কম সাহায্য করেন যদিও সরকারের জন্য এঁদের সমৃদ্ধি।" এই ভৎর্সনা যাঁদের সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় নেতা তাঁদের মধ্যে ছিলেন না।

কলভিন "আমাদের বন্ধুসাংবাদিকদের" সম্পর্কেও ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন: প্রথমত, প্রভূত পরিমাণে আয় কারসত্ত্বেও কর না দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত, "মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীগুলিকে জনসাধারণের দায়ের বোঝার অংশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য" আয়কর তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় হওয়ার প্রতিশ্রুতির জন্য। কিন্তু আমরা এটা দেখিয়েছি যে ভারতীয় সাংবাদিক ও নেতারা এ-ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতে পিছপা হননি। বস্তুত সরকারই দু-বছর বাদে এ-বিষয় এগিয়ে যেতে আর রাজি ছিল না এবং তার জন্য ভারতীয় নেতৃত্বকে সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে হয়েছে, সেটা আমরা পরে লবণ কর সম্পর্কে আলোচনার সময় দেখতে পাব।

২৬। উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৮৯ সালের ৮ই এপ্রিল 'হিন্দু' দেখিয়েছিল যে এমনকি একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির যার আয় ৫০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে, তারও একজন দরিদ্র ব্যক্তি যাকে লবণ কর দিতে হচ্ছিল তার থেকে কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। এবং সেজন্য 'হিন্দু' দাবি করেছিল, কর ছাড়ের প্রশ্ন উঠলে ঐ দুজনের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিটিরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

২৭। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি দুর্গাচরণ লাহা এবং বাংলার জমিদারদের প্রতিনিধি যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর লবণ কর কমানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন; এবং লবণ কর কমানোর পরিবর্তে লাইসেন্স রদ করার জন্য সুপারিশ করেন। ১৮৮৯ সালে লবণ কর কমানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দুর্গাচরণ লাহা আয়কর তুলে দেবার প্রস্তাবও করেছিলেন এই যুক্তিতে যে তার

ফলে "বোঝা বেশ কিছুটা লাঘব হবে এবং জনসাধারণও সেটা সাদরে গ্রহণ করবে।" ১৮৯০ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স আয়কর তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়ে সরকারের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেছিল।

২৮। বাংলায় ও আসামে লবণ প্রায় পুরোটাই আসত ইংলন্ড ও ইউরোপ থেকে। এর প্রধান কারণ; স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন লবণ এবং আমদানিকৃত লবণের উপর শুল্ক একই হারে হওয়ার পর 'জাহাজের খোল ভর্তি করে' আসা বিদেশী লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় লবণ এঁটে উঠতে পারত না।

২৯। ১৮৮৮ সালের ৩০ শে জুন অপেক্ষাকৃত নরম সুরের "ইন্দু প্রকাশ—"ও একই ভাবে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিল—"এটা বলা হয়ে থাকে যে লর্ড ডালহৌসি যেভাবে তাঁর পররাজ্য গ্রাস নীতির দ্বারা লর্ড ক্যানিং-এর উপর বিদ্রোহের মোকাবিলা করার দায়ভার চাপিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড ডাফরিনও সম্ভবত সাধারণ মানুষের উপর কর চাপিয়ে তাঁর উত্তরসুরীদের জন্য একই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাবেন।"

৩০। অন্যায় সরকারি নীতির জন্য বিরক্ত হয়ে তিনি ঘোষণা করেন—'ভাইসরয় ও স্বরাষ্ট্র সচিবেরা আসবেন এবং যাবেন. এবং তাঁদের স্বল্পস্থায়ী খ্যাতির বুদবুদও বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু এদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে তা হবে না। প্রকৃতিগতভাবেই এরা মূক কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপর যে অন্যায় এবং বঞ্চনা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সেটাকে তারা মেনে নেবে না।"

৩১। ১৯০২ সালে কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঘোষণা করে-ছিলেন—"যদি কর মকুব করতে হয় তাহলে কোন কর অগ্রাধিকার পাবে সেটা গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন। এবং এটা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে লবণের উপর শুল্ককেই প্রথম মকুব করার কথা ভাবতে হবে।"

৩২। ১৮৯০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে বর্ণাঢ্য ভাষায় এই আপত্তি জানিয়ে পাঞ্জাবের লালা মুরলীধর লবণ করকে 'ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উপর কর, এবং জীবনের উপর কর' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৩৩। ১৮৯০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে মোহিনী মোহন চ্যাটার্জি একই যুক্তির অবতারণা করে বলেছিলেন—"যখন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, বিলাস ব্যাসনে লালিত ভদ্রলোকেরা বলেন ওহো দরিদ্র মানুষেরা এটা অনুভব করতে পারবে না," তখন সেই নৈরাশ্যবাচক উক্তির মধ্যে এমন কিছু থাকে যা এতটাই হতোদ্যমকর, এতটাই হতাশাব্যঞ্জক এবং এতটাই বিতৃষ্ণ কর যে কোনো বিশেষণের দ্বারাই ঐ নীচ ও স্বার্থপর মানসিকতার সঠিক প্রকৃতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।"

৩৪। ১৮৯০ সালে লবন কর বৃদ্ধিজনিত সাধারণ মানুষের দুর্দশার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে জি. কে গোখেল ঘোষণা করেন যে "যারা সর্বদাই দুর্ভিক্ষের শিকার" সেইসব দরিদ্রতম মানুষ এর ফলে "গুরুতর এবং ভয়ানক দারিদ্র, দুঃখ কষ্ট এবং হীনাবস্থায়" পতিত হয়েছে। অবশ্য জি. ডি. যোশি এর আগেই তাঁর বিস্তৃত আলোচনা সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলিতে এই বক্তব্যই প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থিত করেছিলেন।

৩৫। এই বিষয়ে জনসাধারণের ক্ষোভ কতটা তীব্র ছিল তা বোঝানোর জন্য কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—যেমন, (১৮৯০ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে পি. কেনেডি বিলাপকরে বলেছিলেন: "ভারতের মত এই মহান দেশে আজ লক্ষ লক্ষ স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা রয়েছে সস্তা লবণের অভাবে যাদের আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে। "১৮৯৫ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে এ. ডি. উপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করে

বলেছিলেন "আমরা কি এমন ভয়ানক অপরাধ করেছি যার জন্য সবাইকে বছরের পর বছর লবণ ছাড়া চলবার মতন অসহ্য শাস্তি পেতে হবে?" বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ১৮৮৮ সালের ৩১শে জানুয়ারির সংখ্যায় লিখেছিল, যে অর্থমন্ত্রী "মহামান্য সরকার বাহাদুর অথবা অন্য কারও পরামর্শে লবণের জোগান কমিয়ে দেওয়ার নীতিবিগর্হিত হলেও সুবিধেজনক যে পরিকল্পনাটি করেছেন তাতে এক ঢিলে দুটি পাখি মারা যাচ্ছে—কর আদায় হচ্ছে আবার যেসব সাধারণ মানুষ হৈ চৈ শুরু করেছিল তাদেরকেও দুর্বল করে দেওয়া যাচ্ছে।"

৩৬। ১৮৯৭ সালের ২৮শে মে ঘটনাটি স্মরণ করে 'জামি-উল-উলম', নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় ক্রোধ প্রকাশ করেছিল: "লবণ করের ব্যাপারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকার বাহাদুরের থেকে ভারতীয় সুযোগসন্ধানীরা অনেক বেশি দায়ী। মাতৃদুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এরা শঠতার শিক্ষাও পেয়েছে। এরা দেশদ্রোহী। বাংলা মুলুকে একজন রাজা আছেন যিনি বেশ জোরের সঙ্গে লবণ করকে সমর্থন করেছিলেন। এইসব লোকে মানব জাতির কলঙ্ক, যে দেশে জন্মেছেন সে দেশেরও কলঙ্ক, এদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা উচিত। এই ধরনের ভন্ডরা বেঁচে থাকলে কোনো দেশই উন্নতি করতে পারে না।"

৩৭। বোম্বাই-এর দেশীয় কাগজগুলি সম্পর্কে সংবাদ দাতা একটি সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে ঐ সপ্তাহে "রাস্তা গোফতর" অন্য বহু কাগজ "আর একবার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের গঠনের ত্রুটি নিয়ে অভিযোগ করেছে এবং কাউন্সিলকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

৩৮। "ইন্ডিয়া" (১৯০৩) নামে বই-এর ১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় জন স্ট্র্যাচি লিখেছেন: যাদের উপর এই কর আরোপ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই সম্ভবত এই করের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত নয়। অসংখ্য সাধারণ মানুষ যখন নির্লিপ্ত ও নীরব রয়েছে তখন সংখ্যালঘু কিছু ধনী ব্যক্তি, যারাই শুধু তাদের কণ্ঠস্বরকে শ্রুতিগোচর করতে সমর্থ, সোচ্চারে এমন সব ব্যবস্থার কথা বলছেন, যাতে তাদের নিজেদের কোনো দায় বহন করতে হবে না।" সমগ্র বিষয়টির মূল্যায়ণ স্ট্র্যাচি যেভাবে করেছিলেন তা ঠিকই ছিল, শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর যারা নিজেদের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর করাতে সমর্থ ছিল সেই উদীয়মান জাতীয় নেতৃত্বও লবণ করের বিরোধিতা করেছিলেন, বরং আরও জোরের সঙ্গেই- যার দ্বারা তাঁরা স্পষ্টতই মূক জনসাধারণের স্বার্থকেই ভাষায় দিয়েছিলেন।

৩৯। "এটা সহজেই বোঝা যায় যে, চোলাই-এর ব্যবস্থার সবচেয়ে বিপদের দিক হ'ল, এর ফলে মদের দাম অনেকটা কমে যাবে। একচেটিয়ার লক্ষ্য, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বেশি দামে কম পরিমাণ বিক্রি করার থেকে কম দামে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে পারলে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করা যায়।"

৪০। জাতীয়তাবাদীরা যে ভাবে তীব্রতার সঙ্গে এই অনুভূতিকে ধরে রেখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছেন তা ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে লালা মুরলীধরের বক্তৃতায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায়—"প্রাচ্য প্রতীচ্যকে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিক্ষিত করেছিল, তার বিনিময়ে প্রতীচ্য আমাদের মুক্তি সাধনের পরিবর্তে মদ্যপানের নরকে নিমজ্জিত করেছে।......আমাদের মুসলমান শাসকেরাও মদের ব্যবসাকে ঘৃণা করতেন এবং অভিশপ্ত বলে মনে করিতেন। আর আমাদের খ্রীস্ট-ধর্মীয় শাসকেরা মদ্যপানকে ভালো বেসেছেন, উদ্দীপিত করছেন, সমর্থন করছেন এবং এর থেকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড

মুনাফা করছেন।……যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং ভবিষ্যৎ মুক্তির কথা বলেন তাঁরাও কীভাবে ঈশ্বর যাদের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন সেই সব মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় ক্রুরতার সঙ্গে এবং নিপুনভাবে সব ধরনের পাপ ও দুর্দশায় নিমজ্জিত করতে পারেন?"

৪১। পি মেহেতা ১৮৯৮ সালে মন্তব্য করেছিলেন, শুল্ক দপ্তর সম্ভবত সেই যাজকের আদর্শ অনুসরণ করছে, যিনি বলেছিলেন যে যদিও তিনি অপরকে ভালো নীতি শিক্ষা দিতে বাধ্য কিন্তু নিজে কোনোমতেই সেগুলি পালন করতে বাধ্য নন।
[বক্তৃতামালা পৃঃ ৫৬৪]

৪২। ১৯০৩ সালে জন স্ট্র্যাচি প্রত্যয়সহকারে ঘোষণা করেন, 'সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ১৮৮০ সাল থেকে প্রায় সর্বত্রই মদের দোকানের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে মদ্যপানও হ্রাস পেয়েছে।

৪৩। ১৯০৪ সালে জি কে গোখেল বলেন "শিক্ষা একটি কার্যকরী প্রতিবিধান, কিন্তু এর প্রয়োগ মন্থর হতে বাধ্য। আমি মনে করি স্থানীয় ইচ্ছাকে কার্যকর করতে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে।"

৪৪। এই প্রসঙ্গে গোখেল সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে "মদ্যসংগ্রহের সুযোগ যদি কমানো না যায় তাহলে মদের মত জিনিষের দাম বাড়ানোর অর্থ দরিদ্র মদ্য পায়ীটির পকেট থেকে আরও বেশী টাকা বের করে নেওয়া।" তিনি একথাও বলেছিলেন যে যদি মানুষ বর্তমান আলোচনা, যে সময় সম্পর্কে তার মধ্যেই নেশাসক্ত হয় তাহলে মদের দাম বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই।

৪৫। জাতীয় কংগ্রেস আমেরিকার প্রধান মদ্য আইনের মত আইন পাস করার জন্য সরকারেক অনুরোধ করে। ১৯০১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এই দাবী খুবই হাল্কাভাবে উত্থাপন করেছিল। স্থানীয় মতামত এবং মদের উপর বাড়তি কর প্রসঙ্গে, কিন্তু তারপর জাতীয় কংগ্রেস একই ভাবে চলতে লাগল।

৪৬। ১৮৯১ সালের সমগ্র অনুপস্থিতদের ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব উদ্বোধন করতে গিয়ে দাদাভাই মন্তব্য করেছিলেন এ সম্পর্কে আরেকটি সম্ভাবনার বৈশিষ্ট হল যে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ একসঙ্গে মিশতে সমর্থ হয়েছিল। মহান প্রশ্ন সম্পর্কে এবং সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছিল এবং যা সমস্ত সম্প্রদায়কে একইভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৪৭। ভারতের দেশীয় ইশতেহারে। ১৯০৮ পৃঃ ২৪৫-এ মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকারক ফল সম্পর্কে কমিশন মত দিয়েছিল যে ভারতবর্ষে আফিমের মাঝারি ব্যবহারকে ইংলণ্ডের মাঝারি মদ ব্যবহারের মত করেই ভাবতে হবে। আফিম ক্ষতিকর নয়। অথবা এমনকি উপকারী" এসবই নির্ভর করে এর ধরন বা কিভাবে তা ব্যবহৃত হয় তার উপরে।

৪৮। দাদাভাই-এর আফিমের প্রতি নৈতিক বিরোধিতা এতই গভীর ছিল যে যখন তিনি ১৮৫৫ সালে একটি সওদাগরি অফিসের কাজে যোগ দেন তিনি শর্ত দেন যে তিনি আফিম সংক্রান্ত কোন কিছু করবেন না এবং পরবর্তী সময়ে দেখা গেল আফিম ও মদ ব্যবসা থেকে লভ্যাংশের কোন অংশ নিতে তিনি সম্মত হননি। (নওরোজি বক্তৃতামালা পৃঃ—১৯২ এবং মাসানি ঐ সম্পর্কিত পৃঃ—৭৪)

৪৯। চীনের সঙ্গে আফিম ব্যবসার হ্রাস প্রকৃতপক্ষেই ভারতীয় রাজস্বে একটা বড় ফাঁক সৃষ্টি করবে কিন্তু এই ফাঁক মিতব্যয়ীতা বা অন্যান্য দপ্তরে খরচ কমিয়ে ভরাট

করা ভাল। কেননা ৪০ লক্ষ মানুষের বিষের অভিশাপ বহন করার কোন মানে হয় না। এর কিছু পরে ১৮৮২ সালের ১২ই মার্চ মাহবাট্টা পত্রিকা মন্তব্য করে যে কোন ভারতীয়ই তার অর্থ এমন একটি নৈতিক ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে দেখতে চাইবেনা যেমন ; আফিম ব্যবসার অবলুপ্তি। ঠিক এইভাবে ১৮৯৩ সালের ২৬ আগষ্ট সংখ্যার সঞ্জীবনী পত্রিকা বলল 'অসত পাপপূর্ণ পথে টাকা ক'রে কোন সরকারই উন্নতি করতে পারেনা। সমস্ত পাপীকেই ন্যায়ের ভগবান শাস্তি দেন। তাই সরকারকে এই অসত ব্যবসা ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয়। (আর এন.পি. বাংলা ১৮৯৩, ২ সেপ্টেঃ) এই সঙ্গে সোমপ্রকাশ জুলাই ১৯ (আর. এন পি বম্বে ১৮৮০) ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর ৭ আগষ্ট (আর এন. পি বম্বে ১৩ আগষ্ট ১৮৮১) হিন্দু ৫ ডিসেম্বর ১৮৮৪ এবং ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ নওরোজি (লাভাটি পৃঃ ২১৫, বক্তৃতামালা পৃ: ১৯৬এর মাসানী পৃঃ ৩৫৯, ৩৬২ উদ্ধৃত হিন্দুস্তানী ১৫ এপ্রিল (আর. এন. পি. এন. ২১ এপ্রিল ১৮৯১) ইণ্ডিয়ান মিরর ১৫ এপ্রিল এবং এ্যাডভোকেট ১৭ এপ্রিল (আই এস. ভি. ও. আই) মে, ৩ ১৮৯১) আফিম বিরোধী সংযুক্ত গোষ্ঠী আন্দোলন (পি. এস. এস. খণ্ড ১৪ সংখ্যা ২, অক্টোবর ১৮৯১ পৃঃ ৬, ১৬, বৃত্তান্ত পত্রিকা, এপ্রিল ১৬. আর. এন পি. এম. ৩০ এপ্রিল।) বাবর-ই হিন্দ ১৬ এবং ২০ এপ্রিল (আর. এন. পি. পি ২৫। ১৮৯১) সাম্য, ২৪ এপ্রিল (ঐ ২মে, ১৮৯১)।

১২

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি—২

ব্যয়

করের আপতন এবং করের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতির পর্যালোচনা করা ছাড়াও কীভাবে কর বসানো হচ্ছে নেতারা সেটাও ভাল ভাবে খতিয়ে দেখেছিলেন। কেননা তাঁদের কাছে করধার্যের উদ্দেশ্য এবং করের বিলিব্যবস্থার গুরুত্বটা মোট আদায়কৃত অর্থের গুরুত্বের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না। কর থেকে পাওয়া যে রাজস্ব করদাতাদের উপকারের জন্য ব্যয় করা হয় আর সেজন্য পরোক্ষভাবে জনগণের কাছেই ফিরে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয় তার সঙ্গে যে রাজস্ব অনুৎপাদক প্রয়োজনে ব্যয়িত অথবা নষ্ট করা রাজস্বের যে বিরাট পার্থক্য আছে তা তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই মাপকাঠির সাহায্যে নেতারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ভারত সরকারের ব্যয়নীতি সন্তোষজনক তো নয়ই বরং জনস্বার্থের পরিপন্থী। প্রথমতঃ ভারতীয় রাজস্বের একটা বিরাট অংশ এ দেশে ব্যয় করার বদলে বাইরে ব্যয়িত হচ্ছিল। অর্থাৎ বাইরে 'পাচার' হয়ে যাচ্ছিল, তাঁরা এটাকেই আপত্তিকর মনে করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে একটা স্বাধীন দেশের যেমন. ব্রিটেনের তফাৎ প্রচুর। যদিও সেখানে গুরুভার কর বসানো হয়ে থাকতে পারে। 'সম্পদ পাচার' সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে, আপাতত শুধু এইটুকু যে সরকারি রাজস্বের মোট পরিমাণ কত তার থেকে বাস্তবে তা কি ভাবে খরচ হচ্ছে সেটাকেই তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। যেমন ১৮৮০ সালে দাদাভাই নৌরোজি লিখেছিলেন, 'বর্তমানে মূল বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা নয় যে কী করে ষাট কোটি পাউন্ড অথবা যদি প্রয়োজনে একশ কোটি পাউন্ড সংগ্রহ করা যায়, মূল প্রশ্ন হল জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।" ১৮৮৭-র সেপ্টেম্বরে লিখিত একটি চিঠিতে একথাই তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'করের বোঝা ভারতের দুঃখের কারণ নয়। আকবরের সমকালীন ভূমিরাজস্বও যদি এখন ধার্য করা হয় তাতেও অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না। মূল সমস্যা হল রাজস্বের একটা অংশ দেশের বাইরে

পাচার হয়ে যাচ্ছে।" ১৯০০ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি অমৃতবাজার পত্রিকারও বক্তব্য ছিল অনুরূপ।

"যদি কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দেশেই খরচ করা হয় তাহলে ভারতবাসীর উপর চাপানো করের পরিমাণ গুরুভার হলেও তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি তাদের বাধ্য করা হয় এ দেশে উৎপন্ন ২৫ কোটি টাকার পণ্য প্রতি বছর ইংলন্ডে পাঠাতে, যার পরিবর্তে তারা কিছু পাচ্ছে না তাহলে করের বোঝা কম হলেও তারা ফতুর হয়ে যাবেই।

দ্বিতীয়তঃ জাতীয়তাবাদী নেতারা এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে সরকার বেহিসাবী খরচ করছিল এবং এ দেশের অর্থনীতি, দেশবাসীর অবস্থা বা প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে সরকারের ব্যয়ের প্রকৃতি ও বণ্টন ছিল পুরোপুরি সম্পর্কশূন্য এবং সামঞ্জস্যহীন, তাঁদের বিশ্বাসমত যেটা আরো ভালভাবে এবং লাভজনক উপায়ে সম্পন্ন করা যেত। এই উপলব্ধির ইঙ্গিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের যে সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে নিহিত থাকলেও, কখনো কখনো বিশেষত অর্থনীতিবিদদের লেখায় তা স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের ভিত্তি হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮২ সালের ৩০শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে কোনো সমীক্ষায় প্রকৃত যে প্রশ্নটি করতে হবে তা হল—এই দেশে সংগৃহীত অর্থের কতটা এই দেশেই খরচ করা হচ্ছে এবং কতটা নিছক নষ্ট করা হচ্ছে? অমৃতবাজারের মতে, এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান যাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করা হচ্ছে তাদের উপকারেই তা ব্যয় করা ভারতে ব্রিটিশরাজ চালু রাখার ব্যয় ভারতীয়দেরই বহন করতে হবে এটা মেনে নিয়েও কাজটি চেশায়ার, ম্যানচেস্টার, লন্ডন, সিভিল সার্ভিস, মিলিটারি সার্ভিস, কর্মপ্রার্থী এবং ধান্দাবাজ এদের সবার জন্য অথবা পররাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের অভিযানে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে" এই অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এইভাবে সারা দেশ জুড়ে 'রাস্তাঘাট, সেতু, ডিস্পেনসারি, স্কুল, থানা' প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও ফিরোজশা মেটা ১৮৮৩ সালে আরো মৌলিক প্রশ্নাবলী উত্থাপন করেছিলেন, যেতা হল এই সব উন্নয়ন কার্যে ব্যয় প্রয়োজনাতিরিক্ত অথবা অপচয়মূলক হয়েছিল কিনা এই ব্যয় আরো ভালোভাবে অর্থাৎ লাভজনক উপায়ে করা সম্ভব ছিল কিনা এবং প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানা থাকলে ভুলগুলিকে এড়ানো যেত কিনা। বালগঙ্গাধর তিলকও ১৮৯৫ সালে বোম্বাই আইনসভায় তাঁর প্রথম বাজেট ভাষণে বাজেটের মূল্যায়নের যে নিরিখের কথা বলেন তাতে "আগের ২৫ বছরের মধ্যে কতখানি রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার কতটা অংশ দেশের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে ব্যয় হয়েছে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।" ১৮৯৬

সালে জি. ভি যোশি তাঁর 'দি প্রেজেন্ট ফিনান্সিয়াল পজিশন' নামক প্রবন্ধে পরিসংখ্যানের সাহায্যে ১৮৮৩-৮৪ থেকে ভারতের রাজস্ব ব্যয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে "এই বিপুল অতিরিক্ত ব্যয় যদি সঠিক ভাবে ও ন্যায্য প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে করা হত যেমন অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও বিকাশের উদ্দেশ্যে তাহলে তা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সুখ ও শান্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠতে পারত।" ১৮৯৬ সালের ২১ শে মার্চ ওয়েলবি কমিশনের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে দাদাভাই নৌরজিও অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করে সুস্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছিলেন।

তবে জি. কে. গোখলেই প্রথম এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটিকে সুস্পষ্ট ও তাত্ত্বিক আকার দিয়েছিলেন। ওয়েলবি কমিশনের সামনে প্রতিবেদনে এবং তাঁর বিখ্যাত বাজেটে ভাষণগুলিতে সর্বত্রই ভারতীয় অর্থনীতির সমীক্ষা করতে গিয়ে তিনি এটিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনে সওয়াল করার সময় গোখেল স্বীকার করেন যে, 'জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখাবেন এমনিতে ব্যয়ভারের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বেশি কিছু অভিযোগ করা যায় না।" কিন্তু তারপরেই তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল নীতির উল্লেখ করে বলেন, "এ বিষয়ে সবটাই নির্ভর করে যে কারণে ব্যয়ভার বৃদ্ধি তার প্রকৃতি এবং সরকারি অর্থের এবম্বিধ বিনিয়োগের ফলাফলের উপর।" প্রায় সব ইউরোপীয় দেশেই বিগত কয়েক দশক সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সত্য মেনে নিয়েও তাঁর বক্তব্য ছিল ভারতের ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ সব দেশের ব্যয়বৃদ্ধির 'বিরাট মৌলিক তফাৎ' রয়েছে। ব্যয়বৃদ্ধি ঐসব দেশের মানুষকে আরো শক্তি, আরো সুরক্ষা, আরো আলো এবং আরো সমৃদ্ধি দিয়েছে। অন্যদিকে, "স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিপূর্ণ সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশী শাসনের অন্তর্নিহিত কুপ্রভাবের চাপের ফলে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার ক্রমশই আমাদের পরিসম্পদকে নিঃশেষিত করে তুলছে। আমাদের জাগতিক প্রগতি বিলম্বিত করেছে, আমাদের জাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বলতর করে তুলেছে এবং আমাদের মাথার উপর অনির্নীত এবং অনিয়ত আর্থিক দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছে।" তাঁর মতে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের সরকারি ব্যয়ের মধ্যে আর একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। তা হল এই যে, অন্যান্য দেশে খরচ করা হয় একমাত্র করদাতাদের প্রয়োজনে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে অন্য নানাবিধ প্রয়োজন প্রায়ই সমান গুরুত্বলাভ করে থাকে। এমনকি কখনো বা সেগুলিকে ভারতবাসীর প্রয়োজনের থেকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।" যেমন, ভারতীয় রাজস্বকে "ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে সমস্ত রকম নিয়মিত ব্যয় মেটাতে হয়।" "প্রাচ্যে ব্রিটিশ শাসনের সম্প্রসারণের স্বার্থ দেখতে হয়" এবং ইউরোপীয় মিলিটারি তথা সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজন মেটাতে হয়। এছাড়াও, "ব্রিটিশ

বাণিজ্যের এবং ব্রিটিশের বণিক সম্প্রদায় ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ প্রায়শই ভারতীয় করদাতাদের স্বার্থের উপরে স্থান পায়।"

নেতারা করের বিষয়ের সংগে সমান্তরালভাবে সরকারি ব্যয়ের এবং দেশবাসীর দারিদ্র্য করদানের সীমিত ক্ষমতাকে রেখে এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন। এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভারতের মতন একটা দরিদ্র দেশের সামর্থ্য ও সম্পদের তুলনায় এদেশের সরকারের ব্যয় অত্যন্ত বেশি। এই কারণেই ১৮৮৯ সালে মদনমোহন মালব্য ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি শুধু "অযৌক্তিকই নয়, অপরাধও নয়" সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধিতে এমনিতে যে আপত্তি করার কিছু নেই, তা তিনি স্বীকার করেছেন। এবং তাঁর মতে, সেটা স্বাগত যদি অবশ্য "তার ফলে দেশের মানুষের সম্পদ বাড়ে এবং অবস্থা সমৃদ্ধতর হয়।" যেমনটি হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু "ভারতের দুর্ভাগ্য একদিকে সরকারি ব্যয় বেড়ে চলেছে অন্যদিকে দেশের মানুষের অবস্থা দিনে দিনে আরো খারাপ হচ্ছে।"

এই যুক্তিধারা অনুসরণ করেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪ সালে দাবি করেছিল অর্থব্যয় সংক্রান্ত কোনো সমীক্ষাই ফলপ্রসূ হবে না যদি না সেই সঙ্গে "ভারতবাসীর বর্তমানে যে আর্থিক বোঝা বহন করতে হয় তা সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে কিনা" সে সম্বন্ধে সমীক্ষা করা হয় না। ফিরোজশা মেটাও ১৮৯৫-৯৬ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রদত্ত ভাষণে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি বিশদভাবে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি দেখান যে ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার অর্থ আপেক্ষিক, কেননা, 'কোনো একটি বিশেষ কারণে খরচের প্রয়োজন যত বড়ই হক না কেন, সে প্রয়োজন অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে খরচ করার উপায় এবং সামর্থ্যের দ্বারা।' করের বোঝা যে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র রায়ত বেচারাকেই বহন করতে হয়, সেটা দেখিয়ে তিনি দাবি করলেন যে, "যদি রাজস্ব সংগ্রহের এই একটিমাত্র পথই থাকে, তাহলে যে ব্যয় নির্বাহের জন্যে তা সংগ্রহ করা হচ্ছে—তাত্ত্বিক দিক থেকে যতই যুক্তিপূর্ণ অথবা অবিসংবাদিত হোক না কেন—দেশের সামর্থ্যও সাধ্যের অতিরিক্ত।

ভারতীয় নেতৃত্বের দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে, বিগত বছরগুলিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়ে ছিল অসমঞ্জসভাবে যা অতীব ক্ষতিকর এমন কি ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। সেজন্য নেতারা ব্যাপকভাবে ব্যয়সংকোচ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করেন ভারতের আর্থিক এবং অর্থনীতির সমস্যা সমাধানে ব্যায়সংকোচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সর্বপ্রথম অধিবেশনেই সামরিক খাতে প্রস্তাবিত বর্ধিত ব্যয় অন্যান্য সরকারি খ্যাতে খরচ কমিয়ে মেটানোর কথা বলেছিল। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সমস্যার সমাধান হিসাবে অন্যান্য খ্যাতে খরচ কমানোর বিষয়টিকে পুনরায় তোলা

হয় ১৮৯১ সালে কংগ্রেস ঘোষণা করে ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল সামরিক এবং অসামরিক প্রশাসনের জন্য অত্যধিক ব্যয় এবং এর অন্যতম প্রতিকারই হল সরকারের এই ব্যয় কমানো। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্গে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ এবং ব্যয় সংকোচের সম্পর্ক তুলে ধরে এরপর ১৮৯২, ১৮৯৬, ১৮৯৭, ১৮৯৯, ১৯০১, এবং ১৯০৪ সালে কংগ্রেস ব্যয় সঙ্কোচের দাবি জানিয়েছে। ১৮৯৪, ১৮৯৫ এবং ১৮৯৭ সালেও কংগ্রেস তার 'দৃঢ় প্রত্যয়' ব্যক্ত করেন যে এ দেশের বিড়ম্বিত আর্থিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ সরকারের ব্যয় কমানো। ব্যয় সঙ্কোচের পক্ষে একই রকম জোরালো যুক্তি উপস্থিত করছিল অন্যান্য কিছু সংস্থাও। যেমন—১৮৮৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন, পুনার সার্বজনিক সভা, বোম্বাই-এর প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের মাদ্রাজ মহাজন সভায়। শেষোক্ত সভাটি ১৮৮৬ সালে এই মর্মে একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেছিল। ১৮৮৬-৮৭ সালে প্রকাশিত জি. ভি. যোশীর "এ নোট অন রিট্রেঞ্চমেন্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে, জি. কে গোখলে এবং ডি ই. ওয়াচার প্রদত্ত ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে এবং ১৮৯৮ সালে রমেশচন্দ্র দত্তর লেখায় একই বক্তব্য পুনরুচ্চারিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিস্ময়কর মনে হলেও ব্যয় সঙ্কোচের বিষয়টিকে দাদাভাই নৌরজি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। সম্ভবত এর একটি কারণ ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রশ্নে তিনি একমাত্র সম্পদ উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলেই ভারতবর্ষ যে কোনো রকম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মোকাবিলা করতে পারবে। তাই তিনি বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধ করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, খরচ কমাবার উপর নয়। এমন কি তিনি যে ব্যাপক হারে ইউরোপীয় ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগের সমালোচনা করেছেন তাও মূলত সম্পদ পাচার কমানোর জন্য, প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করার জন্য ততটা নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ঘোর সমালোচক এবং ব্যয় সঙ্কোচের প্রবক্তা এইসব জাতীয় নেতারা শুধু বিরোধিতাই করেন নি কীভাবে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছে তাঁরা সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন এবং কীভাবে ব্যয় সীমিত রাখা যায় তার সুস্পষ্ট উপায়ের কথাও বলেছিলেন। একটি বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন তা হল যে সব কারণে সরকারি ব্যয় বেড়েছে তার কোনোটিই অপরিহার্য নয়, এবং সেজন্য ব্যয় বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান সম্ভব।[১]

সরকারের ব্যয়ের ব্যাপারে নেতাদের মনোভাবের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। তাঁরা ব্যয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনায় তেমন উৎসাহ দেখান নি। প্রধান নীতির ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল নীতিগুলিকেই তাঁরা বিচার করে

দেখেছেন। এই কারণেই ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল যে এক্সপেণ্ডিচার কমিশনের অনুসন্ধান নিরর্থক হবে যদি না "ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে সেগুলিকেও খতিয়ে দেখা হয়।" একই কথা দাদাভাই নৌরজিও ওয়েল্‌বি কমিশনকে বলেছিলেন। তিনি জানান যে, বিভাগীয় খরচপত্রের বিবরণ খুঁটিয়ে দেখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ নেই, কারণ সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত রীতিনীতিকে স্বাভাবিক না হলে এ ধরনের সমীক্ষায় অসুখের লক্ষণগুলিকে কিছুটা প্রকাশিত করার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনো লাভ হবে না। যেটা প্রয়োজন তা হল, ব্যয় সংক্রান্ত সামগ্রিক নীতির একটা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা। নৌরজি এটাও বুঝেছিলেন যে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য বেসরকারি ব্যক্তিদের পক্ষে খরচের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা অথবা প্রকৃত ব্যয়ের হিসেব বোঝা সম্ভব নয়। বস্তুত এঁদের পক্ষে জানাই সম্ভব নয়, বিশদ বিবরণের জন্যে কী ধরনের প্রশ্ন করা দরকার, ফলে তারা শুধু ব্যয় নীতির সাদামাঠা রূপরেখাটুকুরই সমালোচনা করতে সক্ষম।

২. সামরিক ব্যয়

১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে বাজেটে সর্বাধিক ব্যয় ধার্য হয়েছিল সামরিক খাতে। ১৮৮১-৮২ সালে সামরিক খাতে নীট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭.৮৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের ৪১.৯ শতাংশ। ১৮৮৫ থেকে প্রধানত বর্মা যুদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রুশ আক্রমণের আশংকা মাঝে মাঝেই সামরিক বাহিনীর উন্নতি সাধন ও আধুনিকীকরণ এবং ইংল্যাণ্ডের পাওনা মেটাতে গিয়ে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আলোচ্য সময়কালে সামরিক ব্যয় যে কি ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল তা অনুমান করা যায় এই হিসাব থেকে যে ১৮৮৬-৮৭ সালে এজন্য ব্যয় হয়েছিল ১৯.৭১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৪২.৪ শতাংশ। ১৮৯১-৯২ সালে ২২.৫৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ৪৫.৪ শতাংশ ১৯০১-০২ সালে ২৩.৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ৪৫.২ শতাংশ এবং ১৯০৪-০৫ সালে ৩০.২২ কোটি টাকা যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৫১.৯ শতাংশ। এ ছাড়াও সমুদ্রে টহলদারির জন্য ভারতকে রাজকীয় নৌবাহিনীকে ভরতুকি দিতে হত, যা ১৮৬৯ সালের ৭০ হাজার পাউণ্ড থেকে বেড়ে ১৯০০ সালে ১ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। একই সঙ্গে ভারতকে স্থানীয় রাজকীয় বাণিজ্য বহরের খরচও মেটাতে হত। এ সবের উপরেও ভারতকে যুদ্ধ, বিশেষ অভিযান এবং বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খাতে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হ'ত। ১৮৭৬-৭৭ থেকে ১৯০২-০৩ সালের মধ্যে এইসব সামরিক খাতে খরচ হয়েছিল ২২.২ কোটি টাকা এবং বিশেষ প্রতিরক্ষা খাতে ৪.৫ কোটি টাকা।

এজন্যাই নেতারা সামরিক ব্যয় বিষয়টাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন

এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বস্তুত আমাদের আলোচ্য সময়কালের আগাগোড়াই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল সামরিক ব্যয়। যদিও সামরিক ব্যয় পুরো ব্যাপারটাই, যেমন, ব্যয়ের পরিমাণ. উদ্দেশ্য এবং কীভাবে এই খরচ হচ্ছে সবটাই নেতারা সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁদের মূল আলোচ্য ছিল প্রধানত আর্থিক দিকটি। সামরিক সংগঠনের সমস্যাবলী কিংবা দক্ষতা ও নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে তাঁরা মোটের উপর উপেক্ষা করেছেন, এর সঙ্গে আর্থিক প্রশ্ন জড়িত না থাকলে। সামরিক বাহিনীকে ভারতীয়করণের আকাঙ্খা থেকেই এই প্রবণতার একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়. নেতাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল যে, বিপুল ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ই ভারতের আর্থ ব্যবস্থার অস্থিরতা এবং উচ্চ করহারের কারণ এবং যতদিন এই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় উর্ধগতি হতে থাকবে অথবা এই রকম উচ্চসীমায় বিরাজ করবে ততদিন পর্যন্ত এ দেশের আর্থিক ব্যবস্থার কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। একেবারে প্রথম অধিবেশন থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছে। ১৮৮৯ সালের অধিবেশনে সামরিক খাতে ব্যয় লাগাতার বাড়িয়ে যাবার পরিবর্তে এই ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এরপরে ১৮৯১ সালের অধিবেশনে কংগ্রেস দাবি করে যে দেশের চরম দারিদ্র্যের জন্য দায়ী সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য মাত্রাধিক্য ব্যয়, বিশেষ করে সামরিক বিভাগের অত্যাধিক ব্যয়।" পরবর্তী বৎসরগুলিতে কংগ্রেস বারবার সামরিক খাতে ব্যয় আর না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে আনার জন্য দাবি জানায়। অন্যান্য জাতীয়বাদী সংস্থাও মাঝে মাঝে এ নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছে। ১৮৮৫ সালে কলকাতার দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, দি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন, পুনার সার্বজানিক সভা, মাদ্রাজের মহাজন সভা, করাচির সিন্ধু সভা এবং সুরাটের প্রজাহিতবর্ধক সভা যুগ্মভাবে 'ইণ্ডিয়াজ অ্যাপীল টু ইংলিশ ইলেকটস" নামে একগুচ্ছ প্রচারপত্র ছাপিয়ে ইংল্যাণ্ডে বিতরণ করে। এর ৯ নম্বর সংখ্যাটির শিরোনাম ছিল ঃ৯% গ্রোথ অব ইণ্ডিয়ান মিলিটারি এক্সপেণ্ডিচার ইন ২০ ইয়ারস। এই প্রচারপত্রে দাবি করা হয় যে ১৮৫৭ সালে ভারতে সামরিক ব্যয় ছিল ১১,৪৬৩,০০০ পাউণ্ড এবং ১৮৮৪তে যেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬.৯৭৫.৫৫০ পাউণ্ডে যা অনায়াসে ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ডে নামিয়ে আনা যেতে পারত।[২]

বিশিষ্ট নেতাদের অনেকেই সামরিক ব্যয়ভার নিয়ে বিশদ এবং তিক্ত আলোচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ডি. ই. ভাচাই ছিলেন নিঃসন্দেহে প্রধানতম। এই একটি বিষয়ের উপর তাঁর সব রচনা ও বক্তৃতা যদি

একত্রিত করা যায় তাহলে ছোটোখাট একখণ্ড বই হয়ে যাবে। অনেক আগেই, জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৫ সালের অধিবেশনে, সর্বপ্রথম ভাষণ দেবার সময় তিনি ১৮৭১ থেকে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির পর্যালোচনা করে এর "মারাত্মক গুরুভারের" নিন্দা করেছিলেন। ১৮৯১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি পুনর্বার বিষয়টার দীর্ঘ সমীক্ষা চালিয়ে পর্যালোচনা করে ভাচা বলেন 'সামরিক ব্যয়ের এই আসঙ্কাজনক বৃদ্ধির সমস্যার মতন পীড়াদায়ক আর কোনো সমস্যা নয়।" কেননা, এই সমস্যা "দেশের প্রাণশক্তিকে একেবারে কুরে কুরে খাচ্ছে।" পরবর্তী বহু বছর ধরে বার বার তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জি. ভি. যোশি ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তার 'এ নোট অন রিট্রেঞ্চমেন্ট' এবং 'দি নেটিভ ইন্ডিয়ান আর্মি" নামে দুটি প্রবন্ধে এ-দেশের অর্থনীতির উপর ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ে বিপর্যয় কর প্রভাব নিয়ে প্রথম সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরে, ১৮৯৬ সালে লেখা 'দি প্রেজেন্ট ফিনান্সিয়াল পজিসন' নামে প্রবন্ধে তিনি বিশদ পরিসংখ্যানের সাহায্যে তিনি আর একবার অভিযোগ তুলে ধরেন। অন্য আর একজন নেতা যিনি সারা জীবন ধ'রে "মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন," তিনি হলেন জি. কে. গোখলে। এছাড়া অন্যান্য বহু জাতীয়তাবাদী নেতাও একই রকম তীব্রতার সঙ্গে সামরিক ব্যয় ভারের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন এবং বক্তৃতাও করেছেন।[৩] এদিকে জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিও সামরিক ব্যয়ভার কমাবার জন্য একনাগাড়ে শোরগোল তুলেছিল।

সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে নেতাদের সমালোচনার ভিত্তিটা শুধু অঙ্কের পরিমাণটাই ছিল না, সীমিত ক্ষমতার সঙ্গে ভারতীয় সম্পদের অভাবের বিচারে সে ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতাও আর একটা কারণ ছিল। তাঁরা এই স্বীকার্যটির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন যে একটা দেশের প্রতিরক্ষা এবং সামরিক প্রয়োজনটাই সে দেশের সামরিক খাতে খরচের অঙ্ক নিরূপণের একমাত্র নির্ণায়ক হতে পারে না ; সে খরচের ভার দেশবাসী কতটা সহ্য করতে পারে সে বিষয়টিকেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং তাঁরা বলতে লাগলেন যে সামরিকখাতে দেশ যতখানি খরচ করে চলেছে ততটা সহ্য করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।" তাদের আরো যুক্তি ছিল যে উন্নত অনেক বেশি ধনী এবং জঙ্গী মনোভাবাপন্ন অধিকাংশ দেশের তুলনায় ব্রিটেন এবং জারতন্ত্রী রাশিয়াসহ ভারতের মতন একটা দরিদ্র দেশ যে তার বার্ষিক আয়ের অনেক বেশি অংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করে থাকে, সামরিক ব্যয়ের প্রতি তীব্রতর ভর্ৎসনা এটা ছাড়া আর কি হতে পারে! আর একটা উদাহরণ সহযোগে তাঁরা দেখালেন যে সামরিক খরচ মেটাতে ভারতের নীট ভূমিরাজস্বের সবটাই যে লেগে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আর একটা প্রমাণ যে সামরিক বাহিনীতে এত মহার্ঘ্য সমরযন্ত্রের খরচ বহন করা ভারতের সামর্থ্যের বাইরে। কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে ডি. ই.

ওয়াচা আর্তনাদ করলেন, মিলিটারি ট্যাক্স-রাক্ষসকে পদকে তারকায় ভূষিত করার উদ্দেশ্যে রায়তের রক্তমোক্ষম ঘটানো হচ্ছে।'

নেতাদের মতে সামরিক ব্যয় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহির্ভূত হবার প্রত্যক্ষ এবং সম্ভবতঃ নিকৃষ্টতম পরিণতি এটাই যে সামরিক বাহিনীর জন্যে অত্যধিক খরচ করার ফলে সরকার জাতি গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভাগগুলিকে উপবাসী রেখে দিচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীক বিকাশ ও মঙ্গলসাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। কথাটা প্রায়ই খুব জোর দিয়ে বলা হত। ডি. ই. ওয়াচা ১৮৯১-তে বড় অভিলাষ সহকারে খেদোক্তি করলেন, 'আহা পাঁচ বছরে খরচ হয়ে যাওয়া ৫৪ কোটি টাকার এই অ-সাধারণ, সুবিপুল খরচের হাত থেকে যদি ভারতকে রেহাই দেওয়া যেত তাহলে আজ দেশটা কতই না ঐশ্বর্যশালী, কতই না প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারত।' দশ বছর বাদে তিনি দাবি করলেন, 'সামরিক ব্যয়ভারই হচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সমস্তরকম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। একই সুরে টিলক সম্পাদিত 'কেশরী' ১৫ এপ্রিল, ১৯০২ সংখ্যায় লিখল, 'ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক খরচই অভ্যন্তরীণ জনহিতকর প্রশাসনের প্রতি সরকারের অবহেলার প্রকৃত কারণ।' জি. কে. গোখলে ১৯০৩ সালে সখেদে বললেন যে সরকার ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে দেশবাসীর কাছে ১২০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর আদায় করেছিলেন, যার মধ্য থেকে প্রায় ৮০ কোটি টাকা সামরিক বাহিনী 'আত্মসাৎ করে ফেলেছিল।' অথচ 'এই বিপুল অঙ্ক থেকে দেশের শিক্ষা খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তা ছিল এক কোটি টাকারও কম।' তাই তিনি বললেন আমাদের দেশের রাজস্ব যদি এইভাবে ক্রমবর্ধমান হারে সামরিক প্রয়োজনের জন্য নিয়ে যাওয়া হতে থাকে তাহলে জনগণের জাগতিক শ্রীবৃদ্ধি তথা নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য সরকারের দিক থেকে কোনো বড় মাপের স্থায়ী এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হয়ে উঠবে না।[৪]

৩. বিপুল সামরিক ব্যয়রাশি ও তার প্রতিকার

নেতারা বুঝতে পারছিলেন যে সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে ধিক্কার দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সরকারি আমলারা স্বীকার করতেন যে খরচটা বেশি কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্তি দেখাতেন এটা তো অপরিহার্য। আর ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতেও এই ব্যয় হ্রাসযোগ্য নয়। যেমন, ১৮৯৪-৯৫ সালের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর বিতর্ককালে সামরিক ব্যয়ের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে জেনারেল ব্র্যাকেনবেরি বলেছিলেন ঃ

> অনেক নিন্দা, অনেক কুৎসা, অনেক বিবৃতি, অনেক দাবি আমার চোখে পড়েছে। সামরিক ব্যয় কমানোর জন্য ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে

> জানানো অনেক আবেদনও আমি দেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি যুক্তিও আমার চোখে পড়েনি। কোনো ব্যক্তির দাবিতেই আমি এমন যুক্তি দেখিনি যেখানে বলা হয়েছে যে এদেশের সামরিক ব্যয়ভার যুক্তিপূর্ণভাবে কমিয়ে আনা যায়।

লর্ড কার্জন, যাঁর ভাইসরয় সময়কালে সামরিক খরচ ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল, ১৯০১ সালে ঘোষণা করলেন :

> সামরিকখাতে খরচের পুরোটাই অপব্যয় এবং টাকাটা নানা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা উচিত এই যুক্তিতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত নই। সরকারের সমস্ত উপার্জন আমি স্বচ্ছন্দে শেষোক্ত প্রয়োজনে খরচ করতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বীকার করি সে সাহস আমার নেই। ভারতবর্ষের নিরাপত্তার কারণে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন। এবং ভারতবর্ষ যে নিরাপদে রয়েছে এ কথা বলা যায় না।

অগত্যা যে সব কারণে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটছে সেগুলি খতিয়ে দেখবার এবং প্রতিবাদী প্রতিবিধানের সুপারিশ জানাবার কথা ভাবতে নেতারা বাধ্য হলেন। কিন্তু জিনিসটা হাতে নিয়ে তাঁরা নীতি সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলি পরীক্ষাতেই আটকে রইলেন, বাস্তব পরামর্শ দিতে অথবা প্রশাসনিক খুঁটিনাটি বিষয়ে মত প্রকাশ করতে প্রায়শঃই ব্যর্থ হলেন, যদিও সরকারের দিক থেকে সেগুলি বাঞ্ছনীয় ছিল। নেতাদের এই সীমাবদ্ধতার কারণটা ডি. ই ওয়াচা ১৮৯৫ সালে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে সামরিক ব্যয়ের সমালোচকদের কর্তৃপক্ষ গঠনমূলক প্রস্তাব দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন : 'যেন সব কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য তাঁদের হাতে রয়েছে যার সাহায্যে তাঁরা গঠনমূলক পরামর্শ পেশ করতে পারেন।' তিনি জানিয়ে দিলেন, 'বর্তমান অবস্থায়, যেখানে আমাদের কোনো রকম মাল-মশলা দিয়েই সাহায্য করা হচ্ছে না, সেখানে আদৌ কোনো তথাকথিত "গঠনমূলক" প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কেবলমাত্র "ধ্বংসাত্মক" সমালোচনা করতে পারি, এবং সেজন্য আমাদের দোষ দেওয়া চলবে না। শেষোক্ত কাজটা ভারতের নেতারা বেশ ভালোভাবে, আটঘাট বেঁধে এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। বলতে গেলে যে দুটো একটা 'নিশ্চিত' প্রতিকারের কথা তাঁরা বলেছিলেন সেগুলি কি প্রকৃতি এবং কি কাজে উভয় দিক থেকেই ছিল ধ্বংসাত্মক।

আলোচ্য সময়কালে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির একটা বড় কারণ ছিল ভারত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং কয়েকটা বড় ধরনের অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৮৭৬-৭৭ থেকে ১৯০২-০৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই সব খাতে শুধু বিশেষ বিশেষ খরচগুলির অংশটাই দাঁড়িয়েছিল প্রায়

২২ কোটি টাকায়। এইসব যুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটাকে নেতারা ধিক্কার দিয়েছিলেন প্রধানতঃ আর্থিক কারণে, তবে তার সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা তো আসলে ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধীয় ছিল না। ছিল ইংরেজদের আঞ্চলিক তথা বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্প্রসারণ। তাই নেতারা এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রায় সবগুলিকেই অবাঞ্ছনীয় এবং ইংরেজদের লিপ্সার ফলপ্রসূত বলে ঘোষণা করলেন। এইসব যুদ্ধের ও অন্যান্য অভিযানের খরচ যে রকম অন্যায়ভাবে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হত নেতারা তারও সমালোচনা করতেন। দেখা যেত যে, অভিযান থেকে যে লাভ হ'ত সেটা ভোগ করত ইংল্যান্ড আর খরচটা চাপিয়ে দেওয়া হ'ত ভারতের ঘাড়ে। সুতরাং নেতাদের দাবি অবশ্যম্ভাবী ছিল খরচের সবটাই ইংল্যান্ডকে বহন করতে হবে। যে সব যুদ্ধবিগ্রহ ও অভিযান নিয়ে নেতারা সব চাইতে বেশি সমালোচনা করেছিলেন এবং নিন্দায় মুখরিত ছিলেন সেগুলি হ'ল ১৮৭৮-৮০ সালের আফগান যুদ্ধ, ১৮৮২-র ঈজিপ্ট অভিযান, ১৮৮৪-৮৫-র সুদান অভিযান ১৮৮৫-৮৬-র বর্মা সংযোজন, ১৮৮৮ সালের সিকিম অভিযান, ১৮৯৫-এর চিত্রথ অভিযান, ১৮৯৬-এর ঈজিপ্ট অভিযান এবং ১৯০৩-০৪-এর তিব্বত অভিযান।[৫]

নেতাদের মতানুযায়ী উচ্চ সামরিক ব্যয়ের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সশস্ত্র বাহিনীর অনাবশ্যক রকম বিশাল আয়তন। রাশিয়ান আশঙ্কার মোকাবিলা করার সময় ১৮৮৫-৮৭ সালে সেনাবাহিনীতে আরও ১০,৬০০ ব্রিটিশ এবং ২০,০০০ ভারতীয় সেনা নিয়োগ করা হয়েছিল যার ফলে মোট সেনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২,২৬,৭০০ জন। এটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় অন্ততপক্ষে মাত্রাতিরিক্ত সুতরাং জাতীয় তহবিলের বিপুল অপচয়, এই যুক্তিতে জাতীয়তাবাদীরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানালেন। সেনা-বাহিনীর আয়তন যে ভারতের ন্যায় সঙ্গত প্রয়োজনের অনেক বাইরে চলে গিয়েছে, অতএব যথাশীঘ্র সম্ভব বাহিনীর আয়তন হ্রাস করা প্রয়োজন এই দাবিতে নেতৃবৃন্দ বহু বছর ধরে অটল রয়েছিলেন। তারপর যখন ১৮৯৬ সালে সুদানে, ১৮৯৯-১৯০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ১৯০০-০১ সালে চীনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্যদের বড় বড় দল পাঠানো হ'ল নেতারা এই বলে সরব হলেন যে কই এত এত সেনা দেশের বাইরে পাঠাবার পরেও তো দেশের ভিতরের বা বাইরের নিরাপত্তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর আয়তন নির্বিঘ্নে কমিয়ে ফেলা যায়। সেনাবাহিনীর আয়তন যে প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বিশ্বাসের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে নেতারা আরও বললেন যে সামরিক বাহিনীর আয়তন তথা দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য সময়ান্তরে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলি স্থির

করার পিছনে কিন্তু জাতীয় সুরক্ষার চিন্তা থাকে না, থাকে অন্য কিছু। এই বিবেচনাগুলি অনিবার্যভাবেই সাধারণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা এবং বিশেষভাবে 'প্রাচ্যে ব্রিটিশ শক্তির সার্বভৌমত্ব' বজায় রাখতে পর্যবসিত হয়। মতবাদটা খুবই নির্দিষ্ট ও জোরালোভাবে কংগ্রেসের ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালের অধিবেশনে তুলে ধরা হয়েছিল। ওয়েলবি কমিশনে প্রেরিত তাঁর অন্যতম পত্রে দাদাভাই নৌরজি ১৮৯৬ সালে অভিমতটা নিজের স্বভাবসিদ্ধ শাণিত বিদ্রূপ সহকারে প্রকাশ করেছিলেন:

> পুরো ইউরোপীয় বাহিনীটাই (ভারতীয় বাহিনীর অংশটা) আসলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর ভারতকে যে কোনো মূল্যে ব্যবহার করা হয় ইংরেজের অর্থ পরমার্থ শৌর্য বীর্য বৃদ্ধিকল্পে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আদর্শ ট্রেনিং-ক্ষেত্র হিসাবে। ভারতকে ব্যবহার করা হয় ইংরেজ সৈন্যদের যথেচ্ছ মৃগয়ার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ইউরোপে নিজের প্রতিষ্ঠা সুরক্ষিত রাখার উপযুক্ত জায়গা হিসাবে। আর ভারতবাসীকে করে রাখা হয় ক্রীতদাস: যাঁদের পবিত্র অধিকার থাকবে শেষ কানাকড়িটি পর্যন্ত দিয়ে সব কিছুর খরচ মিটিয়ে দেবার যদিও সে ব্যাপারে একটি কথাও তারা উচ্চারণ করতে পারবেন না!

অনুরূপভাবে গোখলেও দাবি করেছিলেন ব্রিটিশের নীতি হচ্ছে ভারতের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে 'এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য দখলের জন্য ইউরোপীয় শক্তি সমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া।' আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি একই সুরে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন।

জাতীয় নেতৃত্বের দাবি ছিল ভারতের সশস্ত্র বাহিনী তথা ভারতীয় রাজস্বকে ভারতের প্রাকৃতিক সীমানার বহির্ভূত কোনো প্রয়োজনে অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সেবায় নিয়োজিত করা চলবে না। সে যাইহোক ভারতীয় বাহিনীর যে অংশটা সাম্রাজ্যের স্বার্থে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং যেটাকে ভালভাবে বলা উচিত ভারতে রাখা ব্রিটেনের রিজার্ভ বাহিনী, সেটার যাবতীয় খরচ তথা সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী নিয়োগের জন্য যা খরচ হবে সেগুলি ব্রিটিশ সরকারকে মিটিয়ে দিতে হবে বলে নেতারা দাবি করলেন। এবং ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন জানাল দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত এক সৈন্য দলের ব্যয়ভারের কিছু অংশ ভারতের রাজস্ব থেকে মিটিয়ে দেবার প্রস্তাব রয়েছে নেতারা তাঁদের সুপারিশ করা নীতি ভাঙ্গা হচ্ছে বলে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি বজায় রাখার ব্যয় ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার এই অপচেষ্টাকে তাঁরা সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় রাজস্ব ব্যবহারের আর একটা উদাহরণ বলে অভিহিত করলেন। নেতাদের এই ধরনের অভিমত প্রায়ই

খুব তীক্ষ্ম এবং তিক্ত ভাষায় প্রকাশ পেত। দি অ্যাডভোকেট ২৩ জুলাই, ১৯০৩ সংখ্যায় লিখল, 'ভারতের বক্ষঃস্থল থেকে আরও একটা বড় ফালি কেটে নেবার জন্য মিঃ ব্রডরিক তাঁর ছুরি শানিয়েছেন।' দি ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফর্মার ১৯ জুলাই, ১৯০৩ সংখ্যায় 'ভারতকে লুণ্ঠন করার এই অভিসন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকাকে আহ্বান জানাল তারা যেন 'বাইবেলের দশবিধ অনুশাসনের অনুকরণে অতিসহজ ভাষায় এই জঘন্য প্রস্তাবের নিন্দা করেন।' এবং দাদাভাই নৌরজি কোনো রকম রাখ-ঢাক না রেখে প্লেটোর মতন নিরাসক্ত ভাবে লণ্ডনের এক জনসভায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলেন, 'এমন কি কারণ ছিল। এমন কি অবস্থায় পড়া গিয়েছিল যার ফলে নৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং দেশের শাসকেরা এই রকম একটা হীন এবং ঘৃণ্য প্রস্তাব পেশ করতে পারলেন?

যদিও নেতারা সামরিক খরচের নীতি সংক্রান্ত প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখতেন তাঁদের কেউ কেউ সামরিক প্রশাসনের কয়েকটি দিক তাঁদের সমালোচনা এবং সুপারিশের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯০-এর দশকে সীমান্ত নীতির প্রশ্নে সামরিক ব্যয় বাড়তে শুরু করার আগেই এটা হয়েছিল।

এই রকম সমালোচনার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোগ অধিকাংশ নেতার মন্তব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকত এবং মাত্র কয়েকজন স্পষ্টভাবে বলতেন তা হ'ল এই যে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বেশি এবং তার দক্ষতাও কম।

নেতাদের অনেকে নানা তথ্যাদি উদ্ধৃত ক'রে বলতে চাইতেন ভারতের সেনার মাথাপিছু খরচ পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি এমন কি সুদক্ষতম ইউরোপীয় সমরশক্তি জার্মানির তুলনাতেও। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের চাইতেও খরচটা বেশি। তাঁদের মতে সামরিক বাহিনীর এত বেশি খরচের নানা কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁরা বলতেন ১৮৫৯ এর অ্যামালগ্যামেসন স্কীম শর্ট সার্ভিস সিস্টেম, চাকরিতে নিয়োগ তথা ট্রেনিং ইংল্যাণ্ডে করার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সৈন্যদের ইংল্যাণ্ড আর ভারতের মধ্যে যাতায়াত, কার্যকর নয় এমন সব চাকরির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের পেনসনের ব্যয়ভার এই সব কারণে আর্থিক বোঝাটা অযথাই, অন্যায্যভাবে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই সব ব্যাপারগুলি হয় রদ করতে হবে নয় সংশোধন করতে হবে।[৩] ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিসনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় জি. কে. গোখলে সেনাবাহিনীর অফিসারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। 'যে অত্যাশ্চর্য পদোন্নত ও পেনসন' প্রথার ফলে যে কোন অফিসার একজন কর্নেলের প্রাপ্য পাবেন বলে নিশ্চিত থাকতে পারেন, 'যদি তিনি বেঁচে থাকেন আর কোনো মতে ৩৮টা বছর চাকরিতে টিকে থাকতে পারেন' এবং যার ফলে বাহিনীর উচ্চতর

শ্রেণীগুলি এমন সব অফিসার ভরে গিয়েছে যাঁদের কোনো কাজই নেই' গোখলে সেই প্রথার প্রবল ধিক্কার দিলেন। তারপর তিনি বক্রোক্তি করলেন, সেনাবাহিনীর প্রমোসন প্রথা 'নিয়ন্ত্রিত হয় বাহিনীর প্রয়োজনের নিরিখে নয়, অফিসারদের স্বার্থে'। যেন অফিসারদের জন্যেই সেনাবাহিনী বাহিনীর জন্য অফিসারেরা নন।' তাঁর মতে কি চাকরির সময় কি রিটায়ার করার পরে অফিসারদের অনেক বেশি দেওয়া হয়।

নেতাদের একাংশের বিশ্বাস ছিল ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের বেতন তথা পরিপোষণ বাবদ খরচটাও মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ের বেশি। ১৫ আগস্ট ১৮৮০ সংখ্যার স্পেক্টেটর দেখাল যে ভারতে অবস্থিত একজন ব্রিটিশ সৈন্যের খরচ ইউরোপের একজন সৈন্যের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি এবং মন্তব্য করলেন সুতরাং কিছু কাটছাঁট করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের সৈন্যরা আরামে গড়াগড়ি যান এটা আমরা অবশ্যই চাইব না।···আমরা একথা বলছি না যে বীর ব্রিটিশ সৈনিকেরা ছেঁড়া পোষাক পরুন অথবা আধপেটা খেয়ে থাকুন। কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ তাঁদের ভুরিভোজনে রাখা হয়েছে। হয়ত পোষাক-আশাকেও বাবুগিরি করানো হচ্ছে।·· আমাদের বিশ্বাস, দেশীয় সেনাদের জন্য বরাদ্দ সামান্য খাদ্য সরবরাহের তুলনায় ব্রিটিশ সেনাদের নিশ্চিত ভাবে বিলাস বহুল ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কর হয়।

১৯০২ সালে ইংল্যান্ডে সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির পর ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদেরও বেতন বাড়ানো হলে জাতীয় কংগ্রেস তথা নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে 'প্রবল প্রতিবাদ' জানালেন।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে নেতাদের কেউ কেউ ভারতীয় সেনার স্বল্প বেতন বাড়াবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং যখন ভারত সরকার ১৮৯৫ সালে একজন জওয়ানের বেতন মাসিক ৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ টাকা করে দিলেন বহু নেতা সেই 'সুসংবাদে' আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

কিছু ভারতীয় নেতার আর একটা সুপারিশ ছিল যে ব্যয় সংকোচের জন্য প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সির জন্য আলাদা আলাদা কম্যান্ড রাখার প্রথা রদ করা হোক। তাঁদের যুক্তি ছিল কেন্দ্রীয় উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে এবং আয়তনে এমনিতেই হ্রাস পাবার ফলে এই সব আলাদা আলাদা প্রশাসন সামরিক দিক থেকে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে 'বস্তু বিনা ছায়ায়' পর্যবসিত হয়েছে। এখন এগুলির একমাত্র প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়েছে বিনা কাজের বড় বড় সামরিক অফিসারদের মাসোহারা জোগানো। লর্ড কিচেনার ১৯০৪ সালে সশস্ত্র বাহিনীর যে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের প্রস্তাব পেস করেছিলেন নেতারা তারও বিরোধিতা করলেন। এর পেছনে যুক্তি ছিল যে এর ফলে খরচ আরও বেড়ে যাবে এবং জানিয়ে দিলেন যে ভারতের অর্থ ভাণ্ডারের উপর এই বোঝা চাপানো চলবে না।

তবে নেতারা যে সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচের ব্যাপারে কতখানি আন্তরিক·

ছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় কিচেনার কার্জন মতদ্বৈধের মধ্য দিয়ে। বিরোধটা —যা নিয়ে কার্জন তাঁর ভাইসরয় পদটি পর্যন্ত খোয়াতে রাজি ছিলেন—জানাজানি হয়ে যায় ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ, যে সময়টায় বিশ্ববিদ্যালয় আইন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণ এবং বঙ্গভঙ্গের কারণে জাতীয়তা বাদীরা ভীষণভাবে কার্জন-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। যে মানুষটার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচণ্ড রকম বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন তাঁর প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁরা যদি কিচেনারকে সমর্থন করতেন তাহলে সেটা নেহাতই মানবিক ব্যাপার হ'ত। কিন্তু তাঁদের কার্জন-বিরোধিতা তো ব্যক্তিগত কারণে ছিল না। ছিল জাতীয়তাবাদী কারণে। সুতরাং তারা অবধারিত ভাবে কিচেনার এবং ভারত সচিবের বিরুদ্ধে কার্জনকে সমর্থন করলেন, যদিও সে সমর্থন ছিল পরোক্ষ এবং প্রায়শঃই প্রায় অনুচ্চারিত। তাঁদের ভয় ছিল প্রধান সেনাধ্যক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সামরিক ব্যয়ভার স্ফীত হতে থাকবে।

কিছু নেতার মতানুসারে উচ্চ সামরিক ব্যয়ভারের আর একটা কারণ ছিল ভারতের সেনাবাহিনীতে ব্যয়বহুল ব্রিটিশ সৈন্যের বেশি পরিমাণে অবস্থিতি। এই কারণে তথা আরো অনেক কারণে নেতারা সেনাবাহিনীর ভারতীয় করণের দাবি তুলে ছিলেন। অল্প কয়েকজন অবশ্য স্বীকার করতেন যে বিদেশী সরকারের পক্ষে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্রিটিশ সৈন্য রাখা প্রয়োজন বটে তবে তাঁরা বলতেন সংখ্যাটা অত বেশি হবার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া অনেকেই বলতেন যে যেহেতু ভারতে বিদেশী শাসন কায়েম রাখবার প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে সেটার সম্পূর্ণ খরচ ব্রিটিশ তহবিল থেকে মেটানো উচিত। অন্ততঃপক্ষে ভারতের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। সেনা-অফিসার হবার সুযোগ থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রাখার জন্যে তাঁরা সমালোচনায় মুখর ছিলেন। তাঁরা বলতেন ব্যাপারটা অন্যান্য কারণের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়েও আপত্তিকর। কেননা ব্রিটিশ অফিসারেরা ভারতীয় অফিসারদের তুলনায় অনেক বেশি মহার্ঘ্য! তাই তাঁরা দাবি তুললেন উচ্চতর সামরিক সেবার দরজা ভারতীয়দের জন্যে খুলে দিতে হবে। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাদের দাবির পিছনে আর্থিক যুক্তিটা সম্ভবতঃ অন্যান্য গৌণ করণের অন্তর্গত ছিল।

জি. ভি. যোশী এবং জি. কে গোখলে সেনাবাহিনীকে একেবারে চিরস্থায়ী বাহিনী করে রাখার ব্যাপারটারও সমালোচনা করতেন। দেশে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক জাতীয় স্থানিক সৈনিক এবং রিজার্ভ সৈন্য রাখার প্রথা না থাকার ফলে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে সদাসর্বদা একেবারে যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে থাকতে হবে। তাঁরা বললেন এ ব্যবস্থার নানা দোষের মধ্যে রয়েছে এর দ্বারা দেশকে বীর্যহীন করে রাখা হয়, জাতীয় রাজস্বেরও প্রচুর ক্ষতিসাধন হয় আর 'করদাতা

তার করের উচিত বিনিময়মূল্য পান না।' তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিলেন জরুরি অবস্থার সময় কত সৈন্য সংগ্রহ করা যায় তারই উপর নির্ভর করে একটা দেশের শক্তি। যেখানে অন্যান্য দেশ অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের শান্তির সময়কালীন সংখ্যায় বহুগুণ সৈন্য জোগাড় করতে সক্ষম ভারতীয় সেনাবাহিনী এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যও জোগাড় করতে অসমর্থ—যদি না অঙ্কের নিয়মে খরচটা বহুগুণ বাড়ানো যায়। এরই ফলে ভারতীয় প্রথাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অপটু এবং ধ্বংসাত্মক পর্যায়ের ব্যয় বহুল! এটা না হয়ে যদি রিজার্ভ সৈন্য রাখার নিয়ম থাকত তার দ্বারা সরকারের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা কমানো সম্ভব হত এবং তাতে সরকারি অর্থ ভাণ্ডারের উপর চাপও কমত আবার একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পেত।"[৭]

এই ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের আর একটা প্রস্তাব ছিল স্বেচ্ছাসৈনিক ব্যবস্থার প্রবর্তনা! ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব পেশ করেছিল ১৮৮৬ সালে এবং তারপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই দাবিটা ঝালিয়ে যেত! যদিও দাবির পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতার বৃদ্ধি কিন্তু প্রস্তাবের বক্তারা প্রায়ই আর্থিক লাভের দিকটাই বেশি বড় করে দেখাতেন।

অন্য সব কারণের তুলনায় বিভিন্ন সীমান্ত অভিযান। এবং সেগুলির প্রস্তুতির জন্যেই বিশাল সৈন্যবাহিনী পুষতে হচ্ছে আর তার যাবতীয় খরচের বোঝা বইতে হচ্ছে—এই ছিল নেতাদের অভিমত। আর যেহেতু এই সব অভিযানের পিছনে ছিল সরকারের সীমানা সংক্রান্ত নীতি দেশের নেতারা বহু ভাবে সেই নীতির নিন্দা করতেন এবং সেটা বাতিল করার দাবি জানাতেন। আরও বলতেন যে অতি তৎপর সীমান্ত নীতি যদি বিসর্জন না দেওয়াই যায় ইংল্যান্ডের উচিত পুরো খরচটা অন্ততঃ পক্ষে খরচের বড় অংশটা বহন করা। কেননা ইংরেজের স্বার্থ তথা সাম্রাজ্য ঘটিত প্রয়োজনেই এই সীমান্তা নীতি পরিচালিত হচ্ছে এবং এসব ব্যাপার থেকে ইংল্যান্ডই সব চাইতে বেশি লাভবান হচ্ছে।

এ পর্যন্ত আমরা দেখে নিয়েছি কিভাবে জাতীয়তাবাদী নেতারা নানা দাবিদাওয়া পেশ করেছেন। যেমন, বিদেশের মাটিতে যুদ্ধের পুরো অন্ততঃপক্ষে আংশিক খরচ ব্রিটেনকে বহন করতে হবে; ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে অংশটা এবং সামরিক খাতের খরচের যে অংশটা ভারতের প্রয়োজন বহির্ভূত কারণে অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে লাগানো হয় সে সবের এবং সীমান্ত যুদ্ধ তথা আগ্রাসন নীতিঘটিত যাবতীয় খরচের ব্যয় ভারও অনুরূপভাবে মেটাতে হবে। সে যুগের মুখ্যতম নেতাদের কেউ কেউ আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবি করলেন যে ভারতের সাধারণ প্রতিরক্ষা খরচের কিছু অংশও ব্রিটেনের বহন করা উচিত। ভারতবর্ষের প্রশাসনজনিত সামগ্রিক ব্যয় যে ব্রিটেনের বহন করা উচিত এই দাবি জানাবার সময়ও উপরের দাবিটা জানানো হ'ত।

এই 'বিচিত্র' দাবির যৌক্তিকতাটা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। ভারতের ব্রিটিশ রাজত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জাতীয় নেতৃত্বের কি ধারণা ছিল তা এটা থেকে বুঝতে পারা যায়। সংক্ষেপে, নেতারা বলতেন শুধু ভারত নয় ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও ইংরেজরা সমান উৎসুক কেননা ভারতকে নিজের শাসনাধীন রেখে তারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করছেন। কথাগুলি প্রায়ই খুব খোলাখুলিভাবে এবং জোরালো ভাবে বলা হত। কংগ্রেসের ১৮৯৩ সালের অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজি বললেন:

> গ্রেট ব্রিটেনের মতন মহৎ এবং ঐশ্বর্যশালী একটা দেশ। যার সৌভাগ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে তার পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ জাতির মতন একটা মহান জাতি—তারা যে তাদের সব কিছু মহত্ব, গৌরব এবং বৈভব অর্জনের পুরো খরচটা—একেবারে শেষ পয়সাটি পর্যন্ত কেবলমাত্র হতভাগ্য ভারতবাসীদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে এটা কি ঠিক: এবং ন্যায়সঙ্গত? তবে কি গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পর্কটা পারস্পরিক সহযোগিতার নয়, ম্যাকলে ভর্ৎসনা সহকারে যা বলেছিলেন, শুধু প্রভু আর দাসের সম্পর্ক?

আজীবন এই দাবির স্বপক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর ভারতে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক সর্বাগ্রগণ্য এই বর্ষীয়ান নেতা স্পষ্ট তিক্ততাসহকারে লিখলেন, 'ভারতের মাটিতে ইউরোপীয় সামরিক ব্যয়রাশির একটাই উদ্দেশ্য, রাশিয়ার আক্রমণের হাত থেকে ব্রিটিশের শক্তি তথা সম্মান এবং ভারতের কাছ থেকে বার্ষিক চল্লিশ পঞ্চাশ মিলিয়ন টাকা আদায় অক্ষুণ্ণ রাখা।' পি. সি. রায় ১৮৯৫ সালে আরো কড়া ভাষায় লিখলেন, 'ঈশ্বর না করুন ভারত যদি সত্য সত্যই রাশিয়ার অধীনে চলে যায় তাহলে একমাত্র ভারতেরই ক্ষতি হবে কি? ইংল্যান্ডও কি তার শক্তির বৃহত্তম উৎস এবং সব চাইতে মূল্যবান বাজারটি হারাবে না?' সেই সঙ্গে তিনি লর্ড র‍্যানডোল্ফ চার্চিলের উক্তিটি উদ্ধৃত করলেন 'ভারতবর্ষকে বাদ দিলে ইংল্যান্ড আর জাতি হিসাবে পরিগণিত হবে না।"[৮] চরমপন্থী মারাঠী সংবাদপত্র পুনার অধ্যাপক এস. এম. পরঞ্জপাই সম্পাদিত 'কাল' ২৮ আগস্ট ১৯০৩ সংখ্যায় প্রায় রাজদ্রোহের কাছাকাছি গিয়ে লিখল যে রাশিয়া যদি আসে ভারতের কিছু হারাবার নেই। কাগজের মতে,

> ভারতের রায়ত আগের মতই তাঁর জমি চাষ করতে থাকবেন কেননা সেটা তো এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া যাবে না। আর তাঁর বর্তমান অবস্থা এতই শোচনীয় যে রাশিয়ানদের আগমণের ফলে তা আর বেশি নিচে নামতে পারবে না! রাশিয়ার আক্রমণ ভীতি ঠেকাবার দায়িত্বটা তাই

প্রধানতঃ আমাদের শাসকবর্গের উপর কেননা এতে আসল ক্ষতিটা তাঁদেরই, তাঁরাই ভারত হারাবেন।

ভারতে বিশালসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থিতি উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে ভারতীয়দের প্রমোশন না দেওয়া, রিজার্ভ সৈন্যদলের ব্যবস্থার অভাবে স্থায়ী সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরতা এই সব ব্যাপারের সমালোচনা করতে করতে আরো বেশি অনুভূতি সম্পন্ন নেতারা উপলব্ধি করলেন যে এই সব ব্যবস্থাদি এবং জনসাধারণকে যে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে এগুলির কোনোটাই ভুল করে করা হয়নি। এসবের গভীরে রয়েছে ভীতি এবং ভারতীয়দের প্রতি অবিশ্বাস। মার্চ ২৯,১৮৯১ সংখ্যার মরাঠা তো বলেই ফেলল যে দেশের সামরিক ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার একমাত্র কারণ হ'ল ব্রিটিশ শাসকেরা ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে এবং তাঁদের অবিশ্বাস বাড়ছে! ফলে জনসাধারণের উপর জোর করে একটা শান্তি চাপিয়ে দেওয়া এবং দেশের চারধারে একটা নিরপেক্ষ বলয় সৃষ্টি করার কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। পি. সি. রায় ১৮৯৫ সালে লিখলেন যে ভারতীয় বাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যার এত বেশি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হ'ল 'ভারতকে নিছক পেশী শক্তির সাহায্যে দাবিয়ে রাখা।' তিনি আরো লিখলেন, 'এই অবিশ্বাসের ফলেই আমাদের শাসকেরা দেশটাকে শুধু যে লৌহ মুষ্টিতে শাসন করতে চান তাই নয়। তাঁরা সদাসর্বদা সামরিক প্রস্তুতিতে থাকতে চান যার ফলে চরমতম জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করা যায়।' অমৃতবাজার পত্রিকাও সেপ্টেম্বর ৬,১৮৯৪ সংখ্যায় একই মতামত প্রকাশ করে লিখল যে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির মূলে রয়েছে 'জনসাধারণের প্রতি শাসকদের অবিশ্বাস।' অনেক আগে ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ তারিখে পত্রিকা লিখেছিল যে মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার মতিগতি সম্বন্ধে ব্রিটেনের নীতি বুঝতে গেলে এই অবিশ্বাসের কথাটা মনে রাখতে হবে। পত্রিকার ভাষায় ইংরেজরা রাসিয়ানদের ভয় পান না কিন্তু তাদের ভয় হচ্ছে রাসিয়া যদি কাছাকাছি এসে পড়ে তাহলে ভারতের মানুষ তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন।

এই কারণেই ইংরেজরা চান রাসিয়ানরা ভারতের সীমান্ত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকুন। ১৮৯৭ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের ভাষণ দেবার সময় সি. শঙ্করণ নায়ার এবং ১৯০৩ সালে বাজেটে ভাষণ দেবার সময় জি. কে. গোখলে উভয়েই একই ধরণের কথা বলেছিলেন, যদিও তাঁদের স্বাভাবিক পরিচিত নরম সুরে। কিন্তু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এবং শাণিত অভিমতটি প্রকাশ করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি ওয়েলবি কমিসনে, প্রশ্নবানে জর্জরিত হবার সময়ে। সেখানে তিনি আগাগোড়া এই দাবিতে অনড় ছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রতি দু'জন ভারতীয় সৈন্যপিছু একজন করে ব্রিটিশ সৈন্য রাখার পিছনে ছিল এই আশঙ্কা যে সৈন্যদের বিশ্বাস নেই। এটাই দেশের

লোকের ধারণা।' নৌরজিকে বিপদে ফেলার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সৈন্যদের বিশ্বাস নেই ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস নেই।' পরবর্তি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি পুনরায় সে প্রসঙ্গে ফিরে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন 'যদি আপনারা মনে করেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য এখানে রাখা প্রয়োজন তাহলে কারণ এটাই দাঁড়ায় যে আপনাদের ভয় যে ভারতীয় সৈন্যরা ঠিকমতন চলবে না।'

এই অবিশ্বাস তথা বিপুল সামরিক ব্যয়ের বিকল্প হিসাবে এই নেতারা প্রস্তাব দিলেন দেশের মানুষদের সুখী এবং সচ্ছল করে তুলে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করে দেশের প্রতিরক্ষা জাতীয় স্তরে উন্নীত করা হ'ক। অনুরূপভাবে তাঁদের অনেকেই বললেন যে অতি তৎপর সীমান্ত নীতির বিপুল ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার চাইতে জনসাধারণের ভালবাসা ও অনুগত্য অর্জন করার নীতি অনেক অনেক শ্রেয়। কেননা আসল সীমান্তটা বিজ্ঞানসম্মত সীমান্তটা লুকিয়ে রয়েছে অনুগত দেশবাসীর হৃদয়ে আর বাহিরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় সুরক্ষা হচ্ছে অন্তরের সংস্কারের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া যাতে মানুষকে সুখী করা যায়।

৪. অসামরিক ব্যয়

সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে নেতারা যতটা সমালোচনা মুখর ছিলেন অসামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ততটা ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের অনেকেই অসামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু সে প্রতিবাদে ঝাঁঝ এবং উৎসাহ প্রায়ই চোখে পড়ত না। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল প্রশাসন বড়ই ব্যয় বহুল বিশেষত ভারতের মতন একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে। কথাটা ১৮৯৭ সালে ডি. ই. ওয়াচা খুব সুন্দর ক'রে সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'ভারতের মতন একটা দরিদ্র এশিয় দেশে পাশ্চাত্য ধরনের শাসনপ্রণালী চাপিয়ে দেওয়াটা আর্থনীতিক রাজনৈতিক দক্ষতার ঠিক বিপরীত বিষয়।

নেতাদের অভিমত ছিল প্রশাসনিক উচ্চ ব্যয়ভারের মূল কারণ হ'ল প্রশাসন-পিরামিডের শীর্ষভাগের অত্যুচ্চ বেতনক্রম। বলতে গেলে অসামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র অভিযোগ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই নেতাদের অসামরিক ব্যয় সঙ্কোচ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই এই ব্যাপারটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

অসামরিক ব্যয়ে কাট-ছাঁট করার জন্য নেতারা প্রায়ই যেটা সুপারিশ করতেন তা হ'ল সমস্ত উচ্চ পদের ভারতীয়করণ অসামরিক, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসা ডাক ও তার পুলিস জনসেবা, শুল্ক বিভাগ, এবং বিশেষ ক'রে বিখ্যাত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস যেটা কার্য'ত ব্রিটিশ নাগরিকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং

যার সঙ্গে অবশ্যই চমৎকার বেতন, পেনসন এবং নানাবিধ ভাতা যুক্ত ছিল। তবে বিষয়টা আমাদের এই আলোচনার পক্ষে অনেক বড় এবং আমাদের বিবেচনারও বাইরে। তাছাড়া ১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ সময়কালের ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ সংক্রান্ত যে সব রচনা বিদ্যমান তাতে এই অন্যতম জাতীয়তাবাদী দাবিটা নিয়ে বেশ আলোচনা করা হয়েছে হয়ত একটু বেশি পরিমাণেই, যদিও খুব সঠিকভাবে নয়। সে যাই হ'ক, যেহেতু বিষয়টা উনিশ শতকের শেষপাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল-স্বীকৃত তথা সমর্থিত হাতিয়ার ছিল, বিষয়টা সংক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচিত হচ্ছে। এই সব জাতীয় সেবায় ভারতীয়করণের জন্য নেতারা আরো অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ ছাড়াও কয়েকটা পরোক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলতেন। এগুলির মধ্যে আই সি. এস ও অন্যান্য কৃত্যকের জন্য যুগপৎ ভারত এবং ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বয়সের সময়সীমা বাড়ানো।

জাতীয় নেতৃত্ব বহুবিধ যুক্তিতে বিবিধ সরকারি কৃত্যকের ভারতীয়করণের দাবি তুলেছিলো এ গুলি হল সামাজিক তথা নৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উপযোগিতা, অধিকার তথা ন্যায় বিচার, ১৮৫৮ সালের 'প্রতিশ্রুতি' পালন, প্রশাসনিক দক্ষতা, এবং প্রশাসনিক মিতব্যয়িতার প্রয়োজনে।[৯] আমাদের আলোচনার বিষয় কেবলমাত্র সেই আর্থিক যুক্তিসমূহ যেগুলির উপর সাধারণতঃ বেশি আস্থা স্থাপন করা হ'ত এবং এ যাবৎ আমরা যতটা ভেবে এসেছি আসলে তার চাইতে অনেক ঘন ঘন তুলে ধরা হত। তাছাড়া প্রশাসনে ইউরোপীয় প্রাধান্যের যে সমালোচনা তাঁরা করতেন সেটা ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। ইউরোপীয় প্রাধান্যের সমালোচনা করা হ'ত দুটো কারণে। একদিকে ছিল দেশের সম্পদ পাচার, কেননা ইউরোপীয় কর্মচারীদের বেতন এবং পেনসনের একটা বড় অংশ বাইরে রপ্তানি হয়ে যেত, যার ফলে দেশ দরিদ্রতর হয়ে পড়ত। অন্যদিকে ছিল ইউরোপীয়দের উচ্চ বেতন হার যার ফলে সরকারের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিত। বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে আমাদের আর একবার বিষয়টার দুটো দিক আলাদা ক'রে নিতে হবে। আপাততঃ আমরা শুধু খরচের দিকটাই বিবেচনা করব এবং সম্পদ পাচারের ব্যাপারটা পরবর্তী অধ্যায়ে বিবেচনার জন্য রেখে দেব। এখানে এটাও ব'লে নেওয়া যায় এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক 'শ্রমবিভাগের ধারনা নেতাদের মনে এসে গিয়েছিল বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কংগ্রেস তার দাবির সমর্থনে প্রধানতঃ ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক উপযোগ, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ১৮৫৮ সালের প্রতিশ্রুতির আবেদন জানাত। দাদাভাই নৌরজি, ওয়াচা, দত্ত এবং আরো কয়েকজন সম্পদ পাচারের উপর জোর দিতেন: অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু, মারাঠা, এবং কেশরী সংবাদপত্র;

জি. ভি. যোশী এবং অন্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক প্রশাসনে মিতব্যয়িতার উপর বেশি গুরুত্ব অর্পণ করতেন। তবে এই তিন গোষ্ঠী নিজেদের যুক্তিতে অবিচল ছিলেন না, প্রায়ই তারা তিন ধরনের যুক্তিই দেখাতেন।

নেতাদের অর্থনৈতিক যুক্তিগুলির মূলসুরকে শেষ পর্যন্ত নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপিত করা যায়। ইউরোপীয় ব্যক্তিদের উচ্চহারে বেতন দিতে হয়, হয়ত না দিয়ে উপায়ও নেই। সুতরাং উচ্চতর পদগুলিতে ইউরোপীয়দের এই প্রাধান্যই ভারতীয় প্রশাসনের এত মহার্ঘ্য হবার অন্যতম প্রধান কারণ। এর বিপরীত দিকে যেহেতু ভারতীয়দের সম্ভবতঃ আরো কম বেতনে নিয়োগ করা যায় বেশি বেতনের ইউরোপীয় পদগুলিতে ভারতীয়দের বসিয়ে দেওয়া গেলে প্রশাসনিক ব্যয়ভার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে ফেলা যাবে।" এই ধরনের মিতব্যয়িতার কথা বলার সময় কখনো বা নৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি একেবারেই বাদ দেওয়া হত। অমৃতবাজার পত্রিকা, ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়—শিশিরকুমার ও মোতিলাল দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সময় যার অন্যতম অনন্যসাধারণ গুণ ছিল স্পষ্ট ভাষণ, ১৮ নভেম্বর, ১৮৮৬ সংখ্যায় বলেই ফেলল:

> সমস্ত রকম ভাল মাইনের কাজ থেকে দেশীয় লোকেদের নির্বাসিত করে রাখার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে 'অনৈতিকতার' অভিযোগ আনা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর মতই ব্যাপার হবে। দেশের মানুষদের সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রেখে, তাঁদের সঙ্গে পরাধীন জাতির মতন ব্যবহার করার 'মারাত্মক রাজনৈতিক ভুলের' কথা বলার ফলও তাই হবে। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয় না করে আমাদের একমাত্র কর্তব্য মিতব্যয়িতার প্রশ্নে অটল থাকা।

[জোর সংযোজিত]

নেতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অর্থনীতিবিদ তাঁরা সমস্যাটার একটা পরিসংখ্যক বিশ্লেষণও করতে চাইলেন। ১৭মে ১৮৯২ তারিখের এক পার্লামেন্টীয় রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁরা হিসাব করে দেখলেন যে বার্ষিক টা ১,০০০ অথবা তার বেশি বেতনভোগী অথবা পেনসনভোগী ইউরোপীয় কর্মচারীরা প্রতি বৎসর ১৪½ কোটি টাকা বেতন এবং পেনসন খাতে তুলে নিচ্ছেন। অঙ্কটা ছিল মোটামুটিভাবে ভারত সরকারের বার্ষিক আয়ের শতকরা প্রায় তিরিশ ভাগ।

সরকারি সেবা ভারতীয় করণের পক্ষে এই ধরনের আর্থিক যুক্তির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল আর একটা বিশ্বাস যে কখনই একজন ভারতীয় একজন ইউরোপীয়র জায়গায় নিযুক্ত হবেন তিনি কম বেতন পাবেন। বস্তুত পক্ষে এই প্রাকপ্রমাণটিই ছিল জাতীয়তাবাদীদের সমীকায় ভিত্তিমূল। কিন্তু

বিস্ময়ের কথা ভারতীয় করণের দাবিটা অতি ঘন ঘন পেশ করা হলেও এই বিশেষ কথাটা ক্বচিৎ কখনো বলা হ'ত অথবা খোলাখুলিভাবে আলোচিত হত। বরং কিছু নেতা জাতিগত বৈষম্যকে ভিত্তি হিসাবে ধরার বদলে জাতিগত সাম্য বজায় রাখার খাতিরে এবং চাকরির পদ ও দায়িত্ব অনুযায়ী বেতন ও শর্তাদি নির্ধারিত হবার ঔচিত্যের যুক্তিতে সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় কর্মচারী-দের জন্য ইউরোপীয়দের সমহারে বেতন, ছুটি ও পেনসনের ব্যবস্থা করে তাঁদের মর্যাদা অক্ষুন্ন বারবার দাবি জানতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসের ভারতীয় কর্মীদের জন্য ইউরোপীয়দের সমহারে বেতনের দাবি করেছিল এবং একটা নূতন বর্ণভেদ প্রথা চালু করে 'ভারতীয় সিভিলিয়ানদের উপর একটা নিকৃষ্টতার ছাপ বসিয়ে দেবার অপচেষ্টার' নিন্দা করেছিল। অনুরূপভাবে ১০ জানুয়ারী ১৮৮০ সংখ্যায় বেঙ্গলী লিটনের স্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে লিখল :

> নেটিভ সিভিলিয়ান এক অদ্ভূত প্রাণী। না আছে তাঁর মান, না আছে মর্যাদা, না আছে ভবিষ্যৎ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক যে জিনিসগুলি ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের বেলায় চাকরির প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। বেতন, পেনসন, মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তাঁর ইউরোপীয় সহযোগীর তুলনায় সম্পূর্ণ অন্য অবস্থানে রয়েছেন।···কিন্তু এটা এমনই একটা পদ যে যার মধ্যে সামান্যতম আত্মমর্যাদার বোধ এবং স্বাধীন মনোবৃত্তি বিরাজ করছে তিনি কখনই এ পদের জন্য লালায়িত হবেন না অথবা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে সে পদ গ্রহণও করবেন না!

ভি. এন মণ্ডলিক, ফিরোজ শাহ মেটা এবং বি. জি. টিলক ১৮৮৬ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নের জবাবে 'সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতি চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। আরো পরে, ১৮৯৮ সালের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এ এম বসু এবং জি. কে. গোখলে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে কোন ধরণের বেতন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এর বিপরীত দিকে অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু স্বদেশ মিত্র, কেশরী এবং আরো অনেকে স্পষ্টভাবে এবং প্রবলভাবে ভারতীয়দের জন্য কম বেতনের দাবি জানাল। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই ধরণের একটা শর্তের অভাবে মিতব্যয়িতার খাতিরে প্রশাসনে ভারতীয়করণের দাবিটা মাঠে মারা যাবে প্রসঙ্গতঃ এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা যে মনোভাব অবলম্বন করেছিল এবং যেটা কাগজের নভেম্বর ও ডিসেম্বর ১৮৮৬ মাসে ধারাবাহিক এক সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল তা পত্রিকার নিজের ভাষায় কিছুদূর অনুধাবন করা যেতে

পারে। ভারতে গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের নিয়মিত বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ বেতন দেবার যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে সম্মত হবার জন্য দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে পত্রিকা ১৮ নভেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় লিখল :

'সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয়দের সমান বেতনের জন্যে পীড়াপীড়ি করি তাহলে এব্যাপারে সরকারের প্রধান অজুহাতটাকেই আমরা হাত ছাড়া হয়ে যেতে দেব। ··· প্রশ্নটা অধিকার এবং অধিকারের অভাবের মধ্যে নয়; পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে। ৯ এবং ১৬ তারিখে পুনরায় একই যুক্তি দেখিয়ে পত্রিকা আরো বলল যে ভারতীয়রা যে কম টাকাতে ভাল কাজ করছেন এই ব্যাপারটারই সমস্ত সিভিল সার্ভিস কর্মীদের বেতন নামিয়ে আনার স্বপক্ষে সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা উচিত। আর কম বেতনের ভারতীয় অফিসাররা আত্মসম্মান তথা জনগণের শ্রদ্ধা হারাবেন এই আপত্তি প্রসঙ্গে পত্রিকার মন্তব্য শুধু অভিনবই ছিল না তা থেকে খুব ভাল বুঝতে পারা যায় উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পাদককে কতখানি প্রভাবিত করেছিল :

> এটা মনে রাখা উচিত যে রাজকর্মচারীদের প্রতি এই শ্রদ্ধার ব্যাপারটা বিদেশী শাসকেরা আমাদের দেশে চালু করেছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজকর্মচারীদের এত বেশি শ্রদ্ধা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই ভারতে যেমনটি হয়ে থাকে। এখানে সরকার তার কর্মচারীদের সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখার জন্য যা যা করার সব কিছু করেছে।···যে সরকার স্বৈরতন্ত্রী সে চাইবেই তার কর্মচারীরা জনগণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হ'ক··· সরকারের নীতিই হচ্ছে দেশবাসীর আত্মসম্মান তথা চারিত্রিক স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে কর্মচারীদের উচ্চে তুলে ধরা।···কর্মচারীদের জন্যে শ্রদ্ধা অর্জনের ব্যবস্থার কথা বলা সম্পূর্ণ দেশপ্রেম বিরোধী। আমাদের সমস্ত প্রয়াসের লক্ষ্য হওয়া উচিত রাজকর্মচারীদের নিচে নামিয়ে আনা এবং জনসাধারণকে একটু উপরে তোলা।

অনুরূপভাবে হিন্দু পত্রিকার ১৮৮৬ ১৫ই জুলাই সংখ্যা এই আশা ব্যক্ত করল যে একজন ভাড়া-করা বিদেশী যা দাবি করবেন একজন শিক্ষিত ভারতীয় তার তুলনায় কম টাকায় তাঁর স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর সেবা করতে রাজি হবেন।' বিদেশীদের সমহারে বেতন দাবি করায় 'আত্মঘাতী' নীতি থেকে বিরত থাকার জন্যে কাগজটি ভারতীয়দের উপদেশ দিল। পুনরায় ২৫ মে ১৮৮৭ সংখ্যায় হিন্দু লিখল 'ইংরেজদের ক্ষেত্রে যে বেতন অত্যধিক বলে ভারতীয়রা নিন্দাবাদ করেন সেই একই বেতন নিজেদের জন্য দাবি করা অবাস্তব এবং

দেশপ্রেম বিরোধী। অনুরূপভাবে, ১৮৮৬ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা বলেছিলেন যে ভারতীয় কর্মচারীদের ইউরোপীয়দের তুলনায় কম বেতন গ্রহণ করা উচিত[১০] অথবা এমন একটা মিশ্র প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছিল ১০০০ টাকা মাসিক বেতন পর্যন্ত বেতনাদিতে সমান হার থাকবে এবং এর উর্ধে ভারতীয়রা কম পাবেন। ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় ১৮৯৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই অভিমত প্রকাশ করলেন যদিও কিছুটা ঘুরিয়ে। সম্ভবতঃ কিছু সহযোগী নেতার বিরূপ সমালোচনা তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন যে 'কোনো পদে কোনো দেশীয় ব্যক্তি যোগ্য বিবেচিত হলে তাঁকে সেই পদে নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করতে হবে' তবে সেই সঙ্গে সুপারিশ করলেন যে সরকারি খরচে বেশ কিছু সাশ্রয় করা যাবে 'যদি বেতনটা সেই প্রয়োজনীয় যোগ্যতার স্থানীয় বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থির করা হয়।' দাদাভাই নৌরোজিও ওয়েলবি কমিশনের সাক্ষে বললেন, 'ভারত শাসিত হবে দেশীয় শ্রমের দ্বারা দেশীয় পারিশ্রমিকের হারে এবং দাবি করলেন যে 'সমান কর্মদক্ষতা সত্ত্বেও এই বেতনহারে সরকারের নিজস্ব বেতনহারের তুলনায় অন্ততঃপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অর্থ বাঁচানো হবে।'

বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় করণের দাবি ছাড়া প্রশাসনের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার মতন আর কোনো সুস্পষ্ট সুপারিশ নেতাদের বিশেষ ছিল না; অসামরিক খরচ ছাঁটাই করার অস্পষ্ট এবং অবিশেষ দাবি জানিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হতেন। যে সব কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় সংকোচের কথা তাঁরা বলতেন—তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮৮০-র দশকে তার কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ :

"নেতাদের মতানুসারে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে আনলে অসামরিক ব্যয়ে বেশ ভাল রকম ব্যয়সংক্ষেপ করা যায়। তাঁরা বলেছিলেন যে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসের কর্মীরা যাঁদের অধিকাংশই ইউরোপীয় এবং কিছু উচ্চ পদাধিকারী রাজপুরুষেরা যেমন গভর্নর-জেনারেল, গভর্নরগণ, সরকারের সচিবগণ, কমিশনারেরা অত্যধিক বেশি বেতন, পেনসন এবং ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ করেন। সেসব প্রাপ্তি কমিয়ে দিলে সরকারি কোষাগারের প্রভূত উপকার হবে এবং প্রাপকদেরও প্রকৃত কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা অতীতে এইসব রাজপুরুষদের যে ধরণের ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ, প্রায় নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হত এবং যে জন্য উচ্চবেতনের একটা যৌক্তিকতাও ছিল, ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি তথা ভারতের জীবনধারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় সে অবস্থারও অনেক উন্নতি ঘটেছে।"

তাঁরা আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে বহু উচ্চতর প্রশাসনিক পদ যেমন

রেভিনিউ বোর্ড. রেভিনিউ বোর্ডের কমিশনার এবং মধ্যম পর্যায়ের অবেক্ষণ মূলক কিছু কিছু পদ নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা শুধুমাত্র মোটা মাইনের সাম্মানিক নিয়োগ ; সুতরাং এগুলি রদ করতে হবে। অনেকের আরো দাবি ছিল ইংল্যান্ডে অবস্থিত ভারত মন্ত্রনাসভা বাতিল করতে হবে. অন্যতম এই কারণে যে সে সভার মহার্ঘতার সঙ্গে কোনো প্রকার উপযোগিতা যুক্ত নেই।

একই সঙ্গে কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা নিম্নশ্রেণীর অল্প বেতনের পদগুলি রহিত করে অথবা সেই সব পদের বেতন কমিয়ে দিয়ে ব্যয়ে সাশ্রয় ঘটাবার সরকারি প্রবণতারও প্রতিবাদ করতেন।[১১] এদের অনেকেই একধাপ এগিয়ে গিয়ে এবং কখনো বা একই সঙ্গে উচ্চ বেতনহার কমাবার দাবি জানাবার সময়ই অত্যন্ত কম বেতনের অধস্তন প্রশাসনিক এবং পুলিশ কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের উপর চাপ দিতেন। যেমন ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাবিনিময় জনিত ক্ষতি ভাতার সমালোচনা করার সময় করনিক এবং পিয়নদের বেতনবৃদ্ধির আবেদন জানালেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'নিচু তলার সরকারি কর্মচারী বেচারাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায় ; বেঁচে থাকার জন্য তারা এমনভাবে চলতে বাধ্য হন যা বিচার করে দেখলে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এ ছাড়া তাঁদের উপায় নেই, তাঁদের বেতনক্রম স্থির করা হয়েছিল বহু পূর্বে।'

আর একটা ব্যয়সঙ্কোচের দাবি জাতীয়তাবাদী মহলে খুব জনপ্রিয়তালাভ করেছিল যদিও টাকা আনা পয়সার হিসাবে সাশ্রয়টা খুব একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের হত না। গরমের সময়, সাধারণতঃ এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারীদের সবাই মিলে পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যাওয়ার যে বার্ষিক প্রথা ছিল, নেতাদের দাবি ছিল সেটা বন্ধ করতে হবে। এবং সত্য সত্যই নেতারা দু' দুবার এ নিয়ে ছোট খাট আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন। প্রথমবার ১৮৮৬-৮৭ নাগাদ যখন ভারত সরকার কর্তৃক অর্থ কমিটি নিয়োগের পর ব্যয়সঙ্কোচের ব্যাপারটা ভারতীয় রাজনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৮৯৭ সালে যখন সারা দেশ একটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পড়েছিল। বহুবিধ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণে। এই বার্ষিক পর্বতাভিযানের বিরুদ্ধে নেতারা প্রতিবাদ তুলেছিলেন। তবে এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থ-সংক্রান্ত এই আপত্তিটা যে পাহাড়ে সাংবৎসরিক বিলাসভ্রমণের জন্য এই বিপুল অথচ একেবারে বাজে খরচের ভার বহন করা ভারতের মতন গরিব দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অভিমতটা সময় সময় বেশ জোরালোভাবে বলা হ'ত। একটা উদাহরণ বিহার হেরাল্ড ২০ জুলাই ১৮৮৬ তারিখে মন্তব্য করল "পাহাড়ে তো বাবুরা দারুন ফুর্তিতে রয়েছেন আর সেই ফুর্তির কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জোগান

দেবার জন্য হতভাগ্য করদাতার বুক থেকে রক্তমোক্ষম ঘটানো হচ্ছে।' কয়েকজন নেতা সমগ্র ব্যবস্থাপনার যুক্তিহীনতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ব্রিটিশ কর্মচারীদের এত উচ্চহারে বেতন দেবার কারণ হিসাবে প্রথমেই ধরে নেওয়া হত যে তাঁদের সমতলভূমির গরমের মধ্যে কাজ করতে হবে। তার পরেও আবার তাঁদের গরমে পাহাড়ে যাবার জন্য এত খরচ করতে হবে কেন!

ব্যয়সঙ্কোচের অন্যান্য যে সব ব্যবস্থার কথা নেতারা বলতেন তার মধ্যে ছিল; ক) সরকারি ঋণের উপর সুদের ব্যয় কমানো। সমস্ত সরকারি ঋণ যদি ব্রিটিশ সরকারের গ্যারাণ্টির আওতায় আনা যায় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে; কেন না টাকার বাজারে ভারত সরকারের তুলনায় ব্রিটিশ সরকারের দাম অনেক ভাল। (২) জনকার্য বিভাগের 'অপব্যয়মূলক' কাজকর্ম দেখেশুনে ছাঁটাই করা।

নেতাদের মতে ব্যয়সঙ্কোচের অন্যতম গুরুত্বপূর্ব উপায় ছিল রেলনির্মাণের গতি হ্রাস করা। জাতীয়তাবাদী আর্থিকনীতির এই অংশটি আগেই এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

৫. ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে ব্যয়-অংশীকরণ

ভারতের আর্থিক কষ্ট লাঘবের জন্য নেতাদের আর একটা সুপারিশ ছিল যে ব্রিটেন তার ভারত সাম্রাজ্য প্রতিপোষণ খরচ খাতে নিজে কিছু দিয়ে আর্থিক প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার করুক। দেশের বাইরে সম্পদ চালান কমাবার একটা উপায় হিসাবেও এই ব্যবস্থাটার সুপারিশ করা হয়েছিল। দাদাভাই নৌরজি বিশেষ করে শেষোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে এই পন্থা গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতেন।[১২] শেষ পর্যন্ত (ব্রিটিশ) পার্লামেন্টের একজন সংসদ হিসাবে তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মে, ১৮৯৫ সালে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হল যার কাজ ছিল, 'ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ভারত এই উভয় সরকারের স্বার্থই যে সব বিষয়ে জড়িত রয়েছে সেগুলির ব্যয়ভার উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টন করা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো।' এর পূর্বে ডিসেম্বর ১৮৯৪ তে জাতীয় কংগ্রেস একই অনুসন্ধানের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল।

ভারতীয়রা ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে আরো সামত্তাপূর্ণ ব্যয়-বণ্টনের দাবি জানিয়েছিলেন দুটো কারণকে ভিত্তি করে। প্রথম যুক্তিটা ছিল সীমিত পরিসরের 'ব্রিটিশের জরুরি প্রয়োজনের যূপকাঠে ভারতকে বলি দেওয়া হয়েছে।' এই কারণেই ভারতের উপর অত্যন্ত অন্যায় ও অনুচিতভাবে এমন সব খরচ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ন্যায় বিচারের খাতিরে যেগুলি সম্পূর্ণ অন্ততঃ আংশিকভাবে

ব্রিটিশ সরকারের বহন করা উচিত কেননা মূলতঃ ব্রিটিশ স্বার্থেই খরচগুলি করা হয়ে থাকে। এই ধরণের খরচের মধ্যে রয়েছে যে সব যুদ্ধবিগ্রহে ভারত অংশ নিয়েছে কি দেশের ভিতরে কি বাইরে সে সবের খরচ; ভারতীয় সেনা বাহিনীর আংশিক খরচ, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের খরচ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও নৌ-ঘাঁটি এবং বিবিধ খরচ যথা ১৮৯৫ সালের আফগানিস্থানের প্রিন্স নসরুল্লার লণ্ডন ভ্রমণ, রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের খরচ এবং ১৯০২ সালের পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভাইসরয়ের সফর। দ্বিতীয় অভিযোগটার পরিসর ছিল ব্যাপকতর এবং গুরুভার। ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব অর্জন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ প্রশাসনিক পরিচালনার ফলে ব্রিটিশ শিল্প বাণিজ্য তথা পুঁজি প্রভূতভাবে উপকৃত হয়েছে এবং বহুসংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিক কাজ পেয়েছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের উচিত এই সার্বভৌমত্বের মূল্য প্রদান করতে রাজি হওয়া এবং ভারত সরকারের সাধারণ স্বাভাবিক প্রশাসনিক খরচের একটা অংশ বহন করা।

সামরিক খরচের আংশিক ব্যয়ভার বহন করার দাবি ছাড়াও কিছু নেতা দুটো স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন প্রথমতঃ ভারতের সমস্ত রকম সেবার ইউরোপীয় অংশটার ব্যয়ভারের কিছুটা এমনকি সবটা ব্রিটেনের বহন করা উচিত কেননা ভারত সরকার স্পষ্টতঃই এই সব সেবা নিয়োজিত করেছেন এই দেশে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়ত, ভারত সরকারের 'দেশের খরচ' অথবা ইংল্যাণ্ডে সেই বিষয়ে করা খরচের একটা ন্যায্য অংশ ব্রিটেনের বহন করা উচিত।

কিছু নেতা এটাও ভাবতেন যে ব্রিটেন যদি ভারতের খরচের কিছু অংশ বহন করে তাহলে তার একটা পরোক্ষ লাভ হবে এই যে ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট তথা জনসাধারণের ভারতের আর্থিক ব্যাপারে আরো গভীর এবং আরো সমালোচনামূলক আগ্রহ জন্মাবে। কেননা টাকাটা যে তখন তাঁদের নিজেদের পকেট থেকেই দিতে হবে।

ওয়েলবি কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করল ১৯০০ সালে। দেখা গেল ব্রিটেন এবং ভারতের মধ্যে যে আর্থ সম্পর্ক রয়েছে তাতে কমিসন মোটামুটি সন্তুষ্ট। কমিশন তাই ভারতের তহবিলকে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ রাজকোষ থেকে সামান্য কিছু দেবার সুপারিশ জানাল। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে আরও ছিলেন দাদাভাই নৌরজি উইলিয়ম ওয়েডরবার্ণ এবং ডবলু এস কেইন। এই তিনজন কমিশনের অধিকাংশের সঙ্গে একমত হলেন না এবং আলাদাভাবে একটি সংখ্যাল্প রিপোর্ট পেশ করলেন যাতে মোটামুটিভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস ওয়েলবি কমিশন

কর্তৃক প্রতিশ্রুত ব্রিটিশ সাহায্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করল কিন্তু বহুনেতা কমিশনের রায়ের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন। তাঁদের মতে প্রস্তাবিত সাহায্যটা ছিল অতি তুচ্ছ পর্যায়ের এবং ভারতের প্রাপ্য সুবিচারের অতি সামান্য অংশ মাত্র। তাঁরা সংখ্যাল্প রিপোর্টের প্রতি উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানালেন।

৬. কল্যাণমূলক ব্যয়

যদিও নেতারা সরকারি খরচে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য একটানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন নীতিগতভাবে তাঁরা সব রকম ব্যয়বৃদ্ধিরই বিরোধী ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁদের আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনোভাবেই শুধুমাত্র নিম্নতম কর ও নিম্নতম ব্যয়ের নীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। অবশ্যই তাঁর সামরিক অসামরিক এবং রেলখাতে ব্যয় কমাবার দাবিতে আন্দোলন করতেন তাঁদের মতে এই তিনটিই ছিল অপ্রয়োজনীয় অপচয়ী এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের রাজপথ। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রের বিকাশমূলক এবং কল্যাণমূলক কাজকর্মকে স্বাগত জানাতেন এমন কি সেই সব খাতে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করতেন এবং চাপও দিতেন। সেই সব কাজের মধ্যে ছিল প্রাথমিক উচ্চ তথা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, কৃষিব্যাঙ্ক পৌর অনাময় ব্যবস্থা তথা জনস্বাস্থ্য বিশ্বাস ভাজন এবং দক্ষ পুলিশি ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের সুবন্দোবস্ত এইসব প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ। বস্তুত পক্ষে কি কি বিষয়ে নেতারা ব্যয়সংক্ষেপ চাইতেন সেটা দেখার পর কি কি বিষয়ে নেতারা ব্যয়সংক্ষেপ চাইতেন না সেটা পরীক্ষা করে দেখা আমাদের পক্ষে ভালই হবে এবং তাতে অনেক কিছু জানাও যাবে। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঠিক পদ্ধতি তথা ক্ষেত্র কি হওয়া উচিত সে সমস্যার উপর নেতাদের কতখানি দখল ছিল সে বিষয়ে বেশ ভাল একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যয় উপযোগ করার সম্ভাবনা তথা ঔচিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নেতারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাঁদের অভিমত ছিল জনসাধারণের প্রত্যক্ষ উপকারের জন্য অথবা তাঁদের নৈতিক এবং পার্থিব উন্নতি সাধনের জন্য ভারত সরকার যে টাকাটা খরচ করেন—পুলিশ এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় থেকে যেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন—তা আসলে ভীষণ রকম কম। সুতরাং তাঁরা দাবি করতেন সরকারের উচিত ঐ সব খাতে আরো ব্যয় করা এবং ছাঁটাইয়ের খাঁড়া যখন অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে তখন সেটা পড়বে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপর নয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপর। এই কারণেই তৎকালীন অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬-৮৭ সালে একসারি ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব রাখার সময় জি. ভি. যোশী সাবধান করে দিলেন যে 'অত্যাবশ্যকীয় এবং অতীব বাঞ্ছনীয়'

ব্যয়গুলির কাটছাঁট করা চলবে না কেননা তাতে শেষ পর্যন্ত প্রগতির পথ স্তব্ধ অথবা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।' তারপর তিনি এই নির্ণয়কটি রাখলেন যে যে-কোনো ব্যাপারেই হক না কেন ব্যয় সাশ্রয়ের সুফলটা চিরস্থায়ী এবং উপযোগী ক'রে তুলতে হলে সাশ্রয়টাকে অবশ্যই প্রগতি তথা দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। পরে, ১৮৮৮ সালে, ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ তথা লেখকরা 'প্রকৃত উপযোগী এবং অত্যাবশ্যকীয়' খাতে খরচ কমাতে চান এই অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তিনি তাঁদের পক্ষ সমর্থন করলেন এবং দাবি করলেন যে এর বিপরীতে তাঁরা প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে আরো বেশি ব্যয়ের পক্ষপাতী। তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'জাতীয় মতবাদের প্রবক্তারা' এতকাল ধরে যেটা দাবি করে আসছেন তা হ'ল, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার দ্বারা যে খরচগুলি অপচয়ী, অপ্রয়োজনীয় এবং অভিসন্ধিমূলক বলে বিবেচিত হবে সেগুলি সরকারকে বন্ধ করতে হবে। অপচয়ী, যেমন প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ; অপ্রয়োজনীয়, যেমন পাহাড়ে গিয়ে থাকা, যে সব জায়গায় কম খরচে সমান দক্ষতা সম্পন্ন, এমন কি আরো বেশি দক্ষতা সম্পন্ন দেশীয় লোকেদের দিয়ে কাজ চালানো যায় সেখানে অনেক বেশি খরচের ইউরোপীয় মাধ্যমের দ্বারা কাজটা করানো, এবং সামরিক তথা 'দেশের খরচ' খাতে অনাবশ্যক ব্যয়বৃদ্ধি : অভিসন্ধিমূলক যথা 'সীমান্তের বৈজ্ঞানিক সংস্কার-সাধন,' এবং অন্যের এলাকায় সামরিক বিলাসচর্চার ব্যয়…

ফিরোজশা মেটা ১৮৯৫ সালে রাজকীয় বিচার সভায় বাজেট ভাষণ প্রসঙ্গে অভিযোগ করলেন যে সামরিক তথা প্রশাসনিক উচ্চ ব্যয়ভারের সর্বপ্রধান কুফল হ'ল এই সব খরচের পর সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন শিক্ষা এবং পুলিশি সংস্কার খাতে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বি. জি. টিলক ১৮৯৫ সালের বোম্বাই বাজেটের উপর তাঁর সর্বপ্রথম ভাষণে ধিক্কার সহকারে বললেন যে ১৮৭০ সাল থেকে বোম্বাই সরকার ৫½ কোটি টাকা অঙ্কের অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করেছে কিন্তু তার থেকে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা প্রদেশের বাস্তব উন্নতির জন্য ব্যয় করেছে। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে এই অতিরিক্ত রাজস্বটা বিবিধ প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যয় করা হয়েছে। তাঁর মতে দেশের আসল প্রয়োজন ছিল জাতি-গঠন সম্পর্কিত কর্মোদ্যোগ যেমন শিক্ষা—শিল্পগত, প্রযুক্তিগত অথবা মানবিক—গ্রামীণ অনাময়, রাস্তাঘাট, খাল ইত্যাদির জন্য অধিকতর ব্যয়। ১৮৯৬ সালের বাজেটে বক্তৃতার সময় তিনি নানাভাবে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে 'সরকারি এবং বেসরকারি দৃষ্টি ভঙ্গির মধ্যে প্রধান পার্থক্যটা হচ্ছে ব্যয়ের প্রণালী সংক্রান্ত। অনুরূপভাবে ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দেবার সময় ডি. ই. ওয়াচা স্পষ্ট সুপারিশ করলেন, 'অসামরিক ব্যয় যদি উৎপাদনমূলক হয় তবে সেটা সর্বাংশে

বাঞ্ছনীয়।' তারপর তিনি উৎপাদনমূলক ব্যয়ের বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেন সে ব্যয়ের ফলে 'করদাতাও তাঁর ন্যায্য পাওনা ফিরে পাবেন নানা ব্যবস্থাদির মাধ্যমে জনগণের জন্য শিক্ষা, সুবিচার সুনিশ্চিত করার আরো উপযুক্ত ব্যবস্থা পাশ্চাত্য গ্রাম এবং নগরে আরো বেশি অনাময় ব্যবস্থা, এবং জন-উপযোগী অন্যান্য সমস্ত রকম কর্মোদ্যোগ, যার দ্বারা প্রদেশের পরিসম্পদের তথা জনসাধারণের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ঘটানো যায়।'

জাতীয় কংগ্রেস বহু বছর ধরে সাধারণ এবং প্রযুক্তিশিক্ষা, সুবিচারের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য আরো বেশি বাজেটীয় উপযোজনের দাবি করে আসছিল। ১৮৯৭ সালে কংগ্রেস তার দাবি আরো সর্বজনীনভাবে সূত্রবদ্ধ করে অনুরোধ জানাল: 'সামরিক তথা অন্যান্য অনুৎপাদক ব্যয় সংক্ষেপ করতে হবে; জনগণের মঙ্গল তথা উন্নতির জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করতে হবে।'[১৩] সবশেষে আমরা জি কে গোখলের অভিমতের উল্লেখ করতে পারি। তিনি তাঁর ১৯০৪ সালের বাজেট ভাষণে সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদির প্রতি সমর্থন জানিয়েও বললেন এইসব কাজে, যেমন অধিকতর সেচ ব্যবস্থা উন্নততর পুলিশি সেবা- বিদেশে শিল্পগত শিক্ষা লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তির প্রবর্তনা, পুসাতে কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় ঋণ সমিতির গঠনে উৎসাহদান, এবং এই ধরণের অন্যান্য কাজে জাতীয় তহবিলের একটা বিরাট অংশ বেরিয়ে যাবে। অবশ্য তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে এই বৃদ্ধির জন্য 'কেউ দুঃখিত হবেন না। বরং দেশের সর্বত্র সকলেই এ জন্য অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করবেন।'

এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার দুটি নির্দিষ্ট বৎসরে কয়েকটি জনকল্যাণ খাতে কি রকম অর্থ ব্যয় করেছিল সেটা দেখা যেতে পারে:

	কোটি টাকা	কোটি টাকা
	১৮৮৫	১৮৯৮
শিক্ষা	১'০৪	১'১৭
বিজ্ঞান	০'৪০	[illegible]৪৫
চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য	০'৬৯	১'৫৩
আইন ও বিচার	২'৭৭	৩'৪৩
সেচ	০ ৭৯ (—)	০'২০ (নীট রাজস্ব)
পুলিশ	২'৫০	৩'৮০

অন্য সব কল্যাণ কর্মের তুলনায় নেতারা শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় চাইতেন। এটা সবারই জানা ছিল যে নেতারা বিশ্বাস করতেন যে জাতীয়

পুনর্জাগরণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল আধুনিক শিক্ষা—বিশ্বাসটা বহু বছর ধরে সরকারি মুখপাত্রদের দ্বারা লালিত ও প্রোৎসাহিত হয়েছিল। এই জন্যই সর্বাগ্রে নেতারা শিক্ষাখাতে, বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষাখাতে ব্যয় হ্রাসের সমস্ত প্রকার চেষ্টার বিরোধিতা করতেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ফিরোজশা মেটা যিনি ছিলেন উচ্চতর শিক্ষার যে কোনো রকম ব্যয় সংকোচ অথবা সীমিত করণের ঘোরতম সমালোচক, তিনি ভারতে উচ্চশিক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টির বাসনাকে নব্য শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতি শাসকশ্রেণীর একাংশের ঈর্ষাপ্রসূত বলে অভিহিত করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন 'প্রজাদের প্রভুদের সমস্তরে উন্নীত' করার কথা বলা ভাল। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে। প্রজাটি যখন একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ে আর ব্যাপারটা যখন একেবারে অসহ্য ঠেকে তখন অদম্য বাসনা জাগে 'একটা লাথি বসিয়ে দেবার।' তাছাড়া অনেক বছর ধরে প্রায় ক্রমান্বয়ে নেতারা শিক্ষাখাতে বড় ধরণের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য চাপ দিয়ে চলেছিলেন। বলা যেতে পারে প্রায় ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতার মতন ১৮৮৮ থেকে কংগ্রেস প্রতি বৎসর দাবিটা উত্থাপন করে যেত। কংগ্রেসের ১৮৯৩ সালের লাহোর অধিবেশনে সরকারি স্কুল ও কলেজে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ফি কমাবার এবং মকুব করার আবেদনও রাখা হল। একইভাবে ১৮৯৫ সালে কংগ্রেস সরকার পরিচালিত অথবা আংশিকভাবে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করল। ১৯০৪ সালে কংগ্রেস এই মৌলিক দাবি রাখল যে 'সরকার অবৈতনিক তথা বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তুতি শুরু করুক।' অন্য অনেক জাতীয় নেতাও শিক্ষায় ব্যয়বৃদ্ধির ধ্বনি তুলেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা অন্যান্য দেশের শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তুলনায় এ দেশের শিক্ষাখাতে সরকারি অনুদানের তুচ্ছতার তুলনা করেছিলেন এবং ভারতের সামরিক ব্যয়ের সঙ্গেও যে ব্যয়ের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছিলেন।

শিক্ষা বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে — অথবা জনগণের জন্যে শিক্ষাকে যিনি আজীবন ব্রত হিসাবে দেখে গিয়েছেন সেই জি. কে গোখলের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ব্রতটা গোখলে জনজীবনে দীক্ষার একেবারে ঊষাকালেই গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৯১ অধিবেশনে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের স্বল্পতার বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি দেখালেন যে যেখানে ইউরোপের সব চাইতে অনগ্রসর দেশে জাতীয় রাজস্বের ৬'৫ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় সেখানে ভারতের খরচ মাত্র এক শতাংশ। এটাও আবার কুড়ি বছর আগে দেশে শিক্ষাখাতে যা খরচ হত—১'৪ শতাংশ তার তুলনায় কম। ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় শিক্ষায় এত কম খরচের ব্যাপারটাকে তিনি 'ভারতীয় রাজস্বের ব্যয়পদ্ধতির

অন্যতম গভীর কলঙ্ক বলে অভিহিত করলেন। আরো বললেন, যে-সরকারের কাছে রাজ্যশাসন একটা 'পবিত্র কর্তব্য' বলে পরিগণিত হয় তার এই অবহেলার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রেট ব্রিটেনের শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের বৈশাদৃশ্য তুলনা করে তিনি মন্তব্য করলেন যে 'নিজের সন্তান এবং বিমাতার সন্তানের মধ্যে তফাৎটা অতি স্পষ্ট।' তিনি বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগের চূড়ান্ত অভাবের জন্যে সরকারের ভর্ৎসনা করলেন। বোম্বাই আইনসভার ১৯০১ সালের বাজেট ভাষণ প্রসঙ্গে অভিমতটা তিনি পুনরায় ব্যক্ত করলেন।[১৪] রাজকীয় আইনসভায় তাঁর বিখ্যাত বার্ষিক বাজেট বক্তৃতাবলীতেও তিনি শিক্ষার প্রসার, এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রবলভাবে দাবি জানিয়ে যেতেন। ১৯০৩ সালে সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি একটি ২৫ বৎসরের পরিকল্পনার দাবি জানাবার সময় বললেন যে সর্বাপেক্ষা জরুরি প্রয়োজনটা হ'ল 'সর্বাগ্রে জনগণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন।' শিক্ষাপ্রসারে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহের ফলে তিনি এমনকি তাঁর নিজের এবং অন্যান্য নেতাদের বিশ্বাসের বিরোধিতা করে প্রশাসনের আরো বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে গেলেন এবং দাবি জানালেন যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রাদেশিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি রদ করে সেটা কেন্দ্রীয় বিষয়ের অন্তর্গত করতে হবে যাতে 'সর্বোচ্চ সরকার সামরিক সেবা এবং রেল সম্প্রসারণের উপর যতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, দেশের জনসাধারণের জন্যও ততখানি মনোযোগ দিতে পারবেন।' সত্যকথা বলতে কি শিক্ষার প্রতি গোখেলের অনুরাগ এত গভীর ছিল যে জাতীয় নেতৃত্বের ছুতমার্গ থেকে তিনি দ্বিতীয় বার সরে এসে প্রস্তাব রাখলেন আরো বেশি পারিশ্রমিক দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজদের এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক হিসাবে আনাবার চেষ্টা করা হ'ক। শিক্ষাপ্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে এর পর থেকে যখনই কোনো খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে সেটা শিক্ষা তথা শিল্পের প্রসারের খাতে অনুমোদন করে দিতে হবে।

এখানে এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে আন্তরিকতার দিক দিয়ে দেশের নেতারা সরকারের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন বটে কিন্তু সরকার যখন প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারকে উচ্চতর মানবিক শিক্ষায় অবহেলার একটা অজুহাত হিসাবে দেখাতে চাইতেন নেতারা আপত্তি তুলতেন। তাঁরা বলতেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, তথা অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য শেষোক্ত শিক্ষাটাও সমান প্রয়োজনীয় এবং এই উচ্চতর মানবিক শিক্ষার অভাবে অন্য দুটি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোনো উন্নতি সম্ভব নয়।

শিক্ষা ছাড়াও যে সব খাতে নেতারা অধিকতর সরকারি ব্যয় চাইতেন সেগুলি

হ'ল দেশব্যাপি শিল্পায়ন, সেচ, কৃষির বিকাশ, গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা দূরীকরণে কৃষিব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ও বিকাশ, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা, নির্বাহব্যবস্থাকে বিচারব্যবস্থার কাজকর্ম থেকে পৃথকীকরণের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার এবং পুলিশি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।[১৫]

কর্তৃপক্ষ প্রায়ই নেতাদের পরস্পরবিরোধী দাবি পেশ করার জন্য তিরস্কার করতেন। তাঁরা নাকি একই নিঃশ্বাসে খরচ তথা ট্যাক্স কমাতে বলেন আবার তাঁদের পেয়ারের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য খরচ বাড়াতেও বলেন। একটা উদাহরণ ১৮৯৪ সালে অর্থসচিব জেমস্ ওয়েস্টল্যান্ড নিদারুণ ব্যঙ্গোক্তি করলেন 'রাজনীতিতে আগ্রহী কিছু ভারতীয় নেতা বড়দিনের ছুটিতে লাহোরে জড়ো হয়েছেন (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস), উদ্দেশ্য কি করে ভারত শাসন করতে হয় তা আমাদের শেখানো।' তারপর নেতাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের বিষ ঢেলে দিয়ে বললেন, যে তাঁদের সম্মিলিত প্রজ্ঞার অবদান স্বরূপ তাঁরা প্রস্তাব রাখছেন যে একই সঙ্গে ঢালাও হারে করভার কমাতে হবে আবার ভীষণভাবে খরচ বাড়াতেও হবে।

জাতীয়তাবাদীদের জবাবটা ছিল নিপাট ভালোমানুষি : হ্যাঁ, একই সঙ্গে করভার কমানো যায় এবং উন্নয়ন কার্যের ব্যয় বাড়ানো যায় যদি এই অতিস্ফীত সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যয় সংক্ষেপ করা যায়। ওয়েস্টল্যাণ্ডের ভর্ৎসনার জবাব দিতে গিয়ে ফিরোজ শা মেটা একই রকম শ্লেষ সহকারে বললেন যে যদিও 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তাকের সভাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের তুলনা হয় না, তবু তাঁদের সুপারিশ একেবারে বিচার বিবেচনাহীন নয়।' তিনি পরিষ্কার বললেন 'যে এটা বুঝতে পারা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয় যে ঠিক ঠিক খাতে ব্যয় সংক্ষেপ করলে রাজস্বও কমানো যায় আবার অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়ও বাড়ানো যায়।' তারপর তিনি কর আদায় এবং ব্যয় সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদীদের সার্বিক অবস্থান নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করলেন :

> যদি সামরিক খরচ কমিয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত স্তরে নামিয়ে আনা যায়, যদি সদা-তৎপর সীমান্ত নীতিকে এমন একটা স্থিতি দেওয়া যায় যে যাতে অবিরত মোটা টাকা খরচ করে অভিযান পাঠাবার দরকার থাকবে না, যদি সামরিক বাহিনীর 'দেশের খরচের' লম্বা চওড়া ফর্দটার বহর সংক্ষেপ করা যায়, যদি বেতন ও পেনসনের গুরুভার বোঝা লঘু করা যায় তাহলে এটা আশা করা খুব অবাস্তব হবে না যে এরপর বিচারব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা যাবে। পুলিশ ব্যবস্থাকে জোরদার করা যাবে, আরো উন্নত শিক্ষাপ্রণালী গড়ে তোলা যাবে, সারা দেশকে প্রয়োজনীয় জনউদ্যোগ তথা রেলপথ দ্বারা ছেয়ে দেওয়া যাবে, আরো

বড় মাপের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হাতে নেওয়া যাবে, ডাক ও তারের মাশুল কমানো যাবে, এবং তার পরেও স্বল্প ব্যয়ের মানুষদের ভার লাঘব করা যাবে, কৃষকদের দম ফেলার ফুরসৎ দেওয়া যাবে, এবং লবণ কর কমানো যাবে।

এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এ. এম. বসু ১৮৯৮ সালে এবং জি. কে. গোখলে ১৯০২ এবং ১৯০৫ সালে। তাছাড়া এই ধরনের বক্তব্যের পিছনে জাতীয়তাবাদীদের এই যুক্তিটা ছিল যে ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ই অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পথে প্রধান বাধা।

কয়েকজন নেতা আর একটু অগ্রসর হয়ে এমনও বললেন যে প্রচলিত করভারও সহনীয় হয়ে উঠবে যদি আদায়কৃত অর্থটা আগের তুলনায় বেশি করে অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রয়োজনে লাগানো যায়।[১৭] অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জি. ভি. যোশী কথা দিলেন যে তিনি আরো বেশি কর বসানোয় রাজি যদি টাকাটা বিশেষভাবে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই তিনি ১৮৮৫ সালে দেশবাসীকে নূতন কর আরোপন হাসি মুখে মেনে নিতে বলেছিলেন যদি সেই করের উদ্দেশ্য হয় ভারতের শিল্পোদ্যমের সহায়তা করা। এইভাবেই ১৮৯৩ সালে তিনি কৃষিবিদ্যার প্রসার কল্পে ব্যাপক কর্মসূচী শুরু করার আহ্বান জানালেন, সেজন্য যদি বিশেষ কর বসাতেও হয় তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ওয়েলবি কমিশনের কাছে অনেকটা এই ধরনের সুপারিশ করে জি কে গোখলে বলেছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে উপকর ধার্য করার ক্ষমতা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির থাকা উচিত। জি সুব্রহ্মণ্য আইয়ারও কমিশনকে বলেছিলেন যে শিক্ষার জন্য তিনি করবৃদ্ধির পক্ষে প্রচারে নামতেও প্রস্তুত।

৮. সরকারি অর্থের উপর লোকায়ত্ত নিয়ন্ত্রণ।

এটা অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য ছিল যে ভারত সরকারের আর্থিক নীতির সমীক্ষা করতে গিয়ে নেতারা জাতীয় তহবিলের উপর লোকায়ত্ত নিয়ন্ত্রণের দাবির কথা ভাববেন। ভারতের রাজস্ব যদি নিপীড়নমূলক এবং ব্যয় অত্যন্ত বেহিসাবি হয় স্পষ্টতই তার বিবিধ কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে অর্থনিয়ন্ত্রণের সাংবিধানিক ব্যবস্থা তার উপযুক্ত দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৯২ সালের পূর্বে ভারতের রাজকীয় আইনসভা বলতে গেলে বাজেট নিয়ে কিছুই করার ছিল না। ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আইনের সভায় বাজেটের ব্যাখ্যা করতে হত এবং সভ্যরা সে বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু বাজেটের উপর কোনো প্রস্তাব পেশ করার অথবা এনিয়ে ভোটাভুটি

করার কোন ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ভারতের অর্থভান্ডার নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল ব্রিটিশ সংসদের হাতে এবং ভারত সরকার সপারিষদ ভারত সচিবের মধ্যস্থতার দ্বারা সংসদের প্রতি দায়বন্ধ ছিলেন।

এইসব কারণে নেতারা দাবি করলেন আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটাই আসলে সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। সরকারের নির্বাহী প্রশাসনের ইচ্ছামতন খরচ করার এবং ট্যাক্স বসাবার প্রবণতা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সে ব্যবস্থা অসমর্থ। বেহিসাবি খরচেপনা, টাকা নষ্ট করা, অনুচিত খাতে অর্থবরাদ্দ ঘুরিয়ে দেওয়া, অর্থের অপব্যয় করা এবং গুরুভার ট্যাক্স বসানো এই সবের হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতেও সে ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় জি. কে. গোখলে দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় অর্থভান্ডারের ব্যবস্থাপনায় প্রায়ই নানা বিষয় যেমন ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব, এশিয়ায় ব্রিটিশ সম্প্রসারণ, ব্রিটিশ সামরিক তথা অসামরিক সেবা, এবং ব্রিটিশ বাণিজ্য ও পুঁজির স্বার্থ ভারতীয় স্বার্থের উপর স্থান পায়। তিনি আরো বলেছিলেন ঃ

> দেশের করদাতার স্বার্থ যে এত ঘনঘন এইসব বিবিধ স্বার্থের নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে দেশের তহবিল যাতে ন্যায্য এবং সাশ্রয়জনকভাবে ব্যয় হয় সেজন্যে সাংবিধানিক শাসনযন্ত্রে উপযুক্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখা উচিত। কিন্তু আমি এটাও জানি আমাদের জন্য রক্ষা কবচের কথা বলা অলীক স্বপ্ন মাত্র।

নেতাদের অভিযোগ ছিল সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় করদাতার স্বার্থ রক্ষার সর্বোচ্চ অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও পার্লামেন্ট সঠিক উপায়ে অথবা আন্তরিকতা সহকারে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। অধিবেশনের একেবারে শেষদিকে সারি সারি খালি বেঞ্চের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাজেট পেশ করা হয়, আর বিশেষ কিছু আলোচনা অথবা পরীক্ষা ছাড়াই জনা কয়েক শ্রান্ত ক্লান্ত সাংসদ দ্বারা সেটা পাস হয়ে যায়। তাছাড়া সে দেশের পার্টি-প্রথা এমনই যে ভারত সচিবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বদাই নিশ্চিত। নেতাদের আরো অভিযোগ ছিল ভারতের অভ্যন্তরেও আর্থিক পরীক্ষা নিরীক্ষা তথা সামঞ্জস্য বিধানের কোন উপযুক্ত পদ্ধতি নেই বরং যে রীতি বর্তমান তার মধ্যেই একটা বেহিসাবিপনা নিহিত রয়েছে। অর্থদপ্তর বাদ দিলে ভারত সরকারের পুরোটাই বলতে গেলে নানা খরচ দপ্তরে ভর্তি। একটা রাজকীয় আইনসভা অবশ্য আছে কিন্তু অর্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সে সভার কিছু করণীয় নেই। সভ্যরা কেবলমাত্র বক্তৃতা করতে পারেন, তারা কোনোভাবেই সরকারের নিন্দা করতে পারেন না অথবা তাঁদের অননুমোদনের দ্বারা সরকারকে এতটুকু

প্রভাবিত করতে পারেন না। ফলে বাজেট বিতর্ক হয়ে পড়ে প্রাণহীণ এবং খুব বেশি হলে কেতাবি চর্চা।[১৭]

জাতীয় নেতৃত্বের অভিমত ছিল আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এই অসন্তোষজনক অবস্থার পিছনে রয়েছে নিয়ন্ত্রণযন্ত্রে লোকায়ত ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। তাই ১৮৯১ সালে জাতীয় কংগ্রেস দাবি রাখল যে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের নানাবিধ কারণের মধ্যে রয়েছে 'নিজের দেশের প্রশাসনে এবং আর্থ বিষয়ক সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণযন্ত্রে উপযুক্ত অংশগ্রহণ থেকে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখা।' অনুরূপভাবে ডি. ই. ওয়াচা ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেবার সময় বললেন যে ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্য 'দেশের কর আরোপণ এবং অর্থ বণ্টনের উপর তাঁদের কোনো হাত নেই,' অন্যথায় তাঁরা দেখিয়ে দিতেন 'কি করে ন্যূনতম কর ধার্য ক'রে ব্যয়ে সর্বাধিক সাশ্রয় তথা দক্ষতা আনা যায়।' রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ইন দি ভিক্টোরিয়ান এজ' নামক গ্রন্থে জাতীয় রাজস্ব তথা ওয়েলবি কমিশনের কার্যাবলীর দীর্ঘ সমীক্ষা অন্তে অভিযোগ করলেন, 'ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় এই লোকায়ত প্রতিনিধিত্বের অভাবে সরকারের সব কিছু ব্যাপারই ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি তথা ব্যয়বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিচ্ছে এবং এমন সব প্রয়োজনে ভারতের রাজস্ব খরচ হতে দিচ্ছে যার সবটাই ভারতীয় নয়।

সুতরাং দেখা গেল রোগ নির্ণয়ের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল প্রতিবিধানের ব্যবস্থা; আর ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত নিয়ন্ত্রণযন্ত্র উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন ছিল সংসদের শিথিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করে তোলা। এই ব্যাপারে ভারতীয়দের সর্বপ্রধান দাবি ছিল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্য প্রতি বছর হাউস অব কমন্স-এ একটি ক'রে সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হ'ক। আর একটা প্রস্তাব ছিল ১৮৫৮ সালের আগে যেমন হ'ত, কিছুকাল পর পর ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সংসদীয় অনুসন্ধান চালানো হ'ক এসব ছাড়াও জি কে. গোখলে ১৮৯৭ সালে প্রস্তাব রাখলেন, ভারতীয় জনমত জানাবার জন্য প্রদেশগুলি থেকে সংসদে সরাসরি প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ক। এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের আর একটা প্রস্তাব ছিল, রাজকীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য ভারতীয়দের ভারত সচিবের মন্ত্রণা সভায় প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হ'ক।

অবশ্য এইসব ব্যবস্থাই আসলে ছিল বহিরঙ্গের চিকিৎসা। ভারতের অর্থ রোগের উপশমের জন্য নেতারা এবার এর চাইতে অনেক বেশি গুরুতর দাবিটা নিয়ে পড়লেন: জাতীয় তহবিলকে ভারতীয়দের লোকায়ত নিয়ন্ত্রণের আওতায়

আনতে হবে কেননা একমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই আর্থিক স্থিতিশীলতা আনা যাবে এবং জনসাধারণের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং ব্যয় করা যাবে। দাবিটা যখন সবিশেষ ভাবে জানানো হ'ত তখন তাতে বেশ একটা মৌলিকতার ছাপ পড়ত। যেমন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময় দাদাভাই নৌরজি ঘোষণা করলেন, 'জনপ্রতিনিধিত্ব এবং করারোপন দুটোই একসঙ্গে চলবে। আমাদের প্রথম সংস্কার কার্যটি হবে নিজেদের উপর কর বসাবার অধিকার অর্জন করা।'[১৮] একইভাবে অমৃত-বাজার পত্রিকা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় বলিষ্ঠ দাবি রাখল, 'মুক্তিকার সন্তানদের অধিকার দিতে হবে নিজেদের আইন নিজেদের তৈরি করার, নিজেদের কর নিজেদের ধার্য করার এবং নিজেদের অর্থ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার।' তারপর পত্রিকা স্পষ্টোক্তি করল, 'এই হল ভারতের জন্য এক ধরণের স্বায়ত্ত শাসন এবং একমাত্র এর দ্বারাই ভারতকে চিরতরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা যাবে।' স্বায়ত্তশাসনের অনুরূপ দাবি জুলাই ১৯০২ সংখ্যার 'হিন্দুস্থান রিভিউ অ্যাণ্ড কায়স্থ সমাচার' পত্রে আরো বেশি আত্মপ্রত্যয় সহকারে ঘোষিত হ'ল। অন্যান্য বহু নেতাও ভারতীয়দের নিজেদের টাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবিটা নানা মাত্রায় প্রবলতা সহকারে জানান দিয়েছিলেন।

তবে অধিকাংশ নেতার দৃষ্টিভঙ্গি আরো বেশি গঠনমূলক ছিল, তাদের দেওয়া জাতীয় তহবিলের ক্রমবর্ধমান লোকায়ত নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবগুলি বেশ বাস্তব বোধযুক্ত হ'ত। সেসব প্রস্তাবে তাঁরা 'জনপ্রতিনিধিত্ব ছাড়া খাজনা নয়' এই নিয়মের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতেন না বরং অনেক কিছু ছেড়ে দিতে রাজি থাকতেন।[১৯] মূলতঃ তাঁরা চাইতেন যে রাজকীয় এবং প্রাদেশিক আইন-সভাগুলি এমনভাবে পুনর্গঠিত হ'ক যাতে সভাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ভারতীয় লোকায়ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগও বাড়ে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আইনসভাগুলির সংস্কারের দাবি অসংখ্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে করা হ'ত। আমরা এখানে শুধু আর্থিক কারণে যে সব দাবি করা হত সেগুলিরই আলোচনা করব।

১৮৯২ সালের পূর্বে আইনসভার দ্বারা জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণের দাবি জানানো হ'ত যেন ভয়ে ভয়ে, অস্পষ্ট ভাষায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের দাবি ছিল সব বাজেটই পুনর্গঠিত এবং আরো বেশি জনপ্রতি-নিধিত্ব মূলক আইনসভাগুলিতে 'পাঠাতে' হবে। পরের বৎসর কংগ্রেস আইন-সভাগুলির সংস্কারের জন্য বিশদ পরিকল্পনা রচনা করে দাবি জানাল যে বাজেটসহ অন্যান্য সমস্ত আর্থিক বিষয় আইনসভাগুলির কাছে 'পেশ করতে হবে এবং সেখানেই এ সবের বিচার-বিবেচনা হবে।' দাবিটা ১৮৮৭, ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সালে পুনরায় রাখা হ'ল। মনে রাখা প্রয়োজন যে 'পাঠানো',

'পেশ করা', 'বিচার-বিবেচনা করা' শব্দগুলি ছিল নেহাতই অস্বচ্ছ এবং বেশ কিছু অর্থবহ হলেও তখন পর্যন্ত অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে এগুলির দ্বারা লোকায়ত নিয়ন্ত্রণের কথা বোঝানো হ'ত না। অন্য নেতারা যাঁরা অর্থ বিষয়ক কারণে আইন সভার সংস্কারের কথা বলতেন তাঁরাও আর্থিক বিষয়ের উপর আইনসভাগুলির কি ধরণের এবং কতখানি নিয়ন্ত্রণ থাকবে সে বিষয়ে সাধারণত সমান অস্বচ্ছ এবং কুণ্ঠিত থেকে যেতেন।[২০]

জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য স্পষ্টতর রূপ পেতে শুরু করল ১৮৯২ সালের পর থেকে যখন আরো বেশি সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব এবং আংশিক নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থার দ্বারা রাজকীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি পুনর্গঠিত করা হ'ল। নেতারা এবার বে-সরকারি সদস্যদের সভায় প্রস্তাব উত্থাপনের এবং অর্থ সংক্রান্ত প্রশ্নে সভার ভোট চাইবার অধিকারের জন্য চাপ দিতে শুরু করলেন।[২১] এরই পাশাপাশি, এই রকম একটা মোটামুটি বিপ্লবাত্মক দাবি জানাবার পর, অনেক নেতাই আবার ভাবলেন আসলে তাঁরা সরকারের কর্তৃত্ব চাইছেন এই ধারণাটার নিরসন করা প্রয়োজন। তাঁরা মনে করিয়ে দিতেন যে পুনর্গঠিত আইনসভা গুলিতে সরকার পক্ষের সুস্পষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে যাবেই, আর অধিকাংশ নেতা চাইতেনও না যে অবস্থাটা বিপরীত হয়ে যাক। সুতরাং কোনো প্রশ্নেই সরকারের বিরুদ্ধে ভোটের সম্মুখীন হবার ভয় থাকবে না। এ ছাড়াও ভারত তথা ইংল্যান্ডের নির্বাহিক অধিকারীর হাতে আইন সভাগুলির যে-কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রাখার নীতিও তাঁরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন। বিস্ময়ের কথা জি কে. গোখলে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে ওয়েলবি কমিশনের কাছে এ কথা মেনে নিয়েছিলেন যে নীতি সংক্রান্ত বড় বড় প্রশ্নগুলির 'আলোচনা এবং নিষ্পত্তি হতে পারে কেবলমাত্র ইংল্যান্ডে।' এবং এইভাবেই নেতারা তাঁদের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ দাবিটা জ'লো ক'রে ফেললেন, সেটাকে স্পষ্টই নিছক একটু চাপ দেবার কৌশলে নামিয়ে আনলেন। কেননা তাঁরা বোঝাতেন, তাঁরা যে সংস্কারের কথা বলছেন তার প্রধান সুফলটা হবে সম্পূর্ণভাবে নৈতিক, রাজনৈতিক নয়। সেই সংস্কারের ফলে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ নির্বাহক ধ্বংস হয়ে যাবে না অথবা দুর্বলও হয়ে পড়বে না; এর ফলে যখনই আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের অধিকাংশ সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেবেন ব্রিটিশ জনসাধারণ তথা সরকার প্রকৃত ভারতীয় জনমত সম্বন্ধে অবহিত হবেন। নিজেদেরই প্রস্তাবিত আইনসভা কর্তৃক জাতীয় কোষাগার নিয়ন্ত্রণের দাবির পূর্ণ সংশ্লেষ থেকে এইভাবে নেতাদের সরে আসার একটা কারণ হয়ত হতে পারে সন্দেহাতীত প্রশ্নাবলী নিশ্চিত তিক্ত বটিকাটির উপর শর্করাপ্রসাধন লেপন। কিন্তু আরো সম্ভবপর কারণটা হয়ত তাঁদের ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হবার বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।

টীকা

১। উদাহরণ স্বরূপ জি. ভি. যোশির বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৮৬-৮৭ সালে তিনি দেখিয়েছিলেন যে সরকারের বর্তমান ব্যয় বাহুল্যের প্রধান কারণগুলি হয় নীতি ও কর্মসূচীর ভুলের মত কারণ যা নিবারণ করা যায় অথবা তত্ত্বাবধানের সমস্যার মত কারণ, যার ফলে ব্যয়ের কার্যকরতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল লক্ষ্য করার মত। সরকারি বক্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়। যেমন—জনস্ট্র্যাচি মন্তব্য করেছিলেন ঃ "দায়িত্ব জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা যে অতি সহজেই ব্যাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার প্রচেষ্টাকে আক্রমণ করতে পারেন সেটা ঠিক, কিন্তু আমি নির্দিধায় চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে প্রশাসনের বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কে যাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি আমাদের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার (সিভিল সার্ভিস) একটি অংশকেও দেখাতে পারবেন না। যেখানে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রকৃত প্রয়োজন যে তার থেকে কম নয় বরং বেশি তা প্রমাণ করার মত অসংখ্য তথ্য দেওয়া যাবে না। "ই বেয়ারিং ১৮৮৩-৮৪ সালের অর্থনৈতিক বিবৃতিতে (ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট-এ) লিখেছিলেন যে, যুদ্ধ সমেত যেসব ঘটনা ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপদ স্বরূপ তার সবগুলির পিছনেই এমন সব কারণ আছে যেগুলিকে ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে খুব কমই পারে কিংবা একদমই পারে না।" একইভাবে ১৮৯৪ সালে এলগিন ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত সরকারের আর্থিক অসুবিধেগুলি এমন সব কারণ থেকে উদ্ভূত যা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।"

২। জানুয়ারী ২৬, ১৮৮৬ বর্ধিত সামরিক ব্যয়সম্পর্কিত রাষ্ট্র-সচিবকে পাঠানো বম্বে প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন-এর স্মারক সনদও দ্রষ্টব্য। বম্বে প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট, ১৮৮৫ ৮৬, পৃঃ ২০৯-১৬, ৩০ সেপ্টেঃ ১৮৮৬ সালের পুনা সার্বজনিক সভার প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

৩। ১৮৯৮ সালে নম্র স্বভাবের আর এম. সয়ানি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য আসন থেকে ঘোষণা করেছিলেন—'বাস্তবিকভাবেই এই অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় এবং অবৈধ সামরিক ব্যয় আমাদের আর্থিক দুরবস্থার সর্বপ্রধান না-হলেও অন্যতম প্রধান কারণ এবং এটি দেশটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" ১৯০০ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত রীতিমত জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ প্রধানত দেশটির উপর তার বহন করার কথা নয় কিংবা সে সামর্থ্য নেই এমন সব যুদ্ধের ব্যয় ভার এবং অস্ত্রসম্ভারের বিপুল ব্যয় চাপিয়ে দেওয়ার ফল।" ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার ১৯০৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলেন যে, "তারা যেন নিছক প্রস্তাব গ্রহণ করেই থেমে থাকা ছেড়ে দেন। "প্রকৃত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হল, প্রচার পত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং প্রতিটি দরজায় গিয়ে করভারের অন্যায্যতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে তাদের ক্রোধ জাগিয়ে তোলা।"

৪। গোখেল বক্তৃতামালা, পৃঃ ৪৩-৪৪। একইভাবে এইচ. সি মিত্র ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে (১৮৯২) দুঃখ প্রকাশ করলেন যে তরবারি কলমকে হত্যা করছে এবং সামরিক বর্বরতা সংস্কৃতি এবং ভদ্রতাকে বিনষ্ট করছে।

৫। বিষয়টার বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট অ্যান্ড ফরেন ওয়ার্স অ্যান্ড এক্সপিডিসন্স' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ১৮৭৮-৯১।

৬। ১৮৫৯ সালের একীকরণ প্রকল্পের সমালোচনার জন্য পুনা সার্বজনিক সভার বক্তব্য 'এ স্টেটমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ান কোশ্চেন' দ্রষ্টব্য।

৭। গোখেল বক্তৃতামালা পৃঃ ৪৬-৪৮ এবং ৯০-৯১, ১৮৩-৮৫। এই সঙ্গে রাজা রামপাল সিং-এর মন্তব্য, আই এন সি. ১৮৮৬, পৃঃ, ৯৩, এ বিষয়টা খুব লক্ষণীয় যে এমন কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও রাজা রামমোহন রায় প্রশাসনিক ব্যয় সংকুলানের একটি উপায় হিসেবে বর্তমান সেনাবাহিনীর বিকল্প সেনাবাহিনী গড়ার স্বপক্ষে জোরালো মত রেখেছিলেন। এই পথে অর্জিত সঞ্চয় তাঁর মতে অন্য যে কোন লাভ থেকে বেশী হবে যা ভূমিরাজস্বর কোনো ব্যবস্থা থেকে অর্জিত হতে পারে।

৮। রায়, পো ভার্টি পৃঃ ২৯৯ একইভাবে ১৮৯৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি প্রশ্ন করেছিলেন ব্রিটিশ কি নিশ্চিত যে বাণিজ্যে নিজস্ব নিয়োগে তার রাজধানী এবং ব্যাপক মানুষের সম্মান হারাবে না লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতিই মূল্যবান দিক থেকে হোম চার্জ বলে তা গড়ে দেয়।

৯। নৈতিক ও সামাজিক লাভের জন্য আমরা দু-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করতে পারি। জি. কে গোখেল বক্তৃতামালা পৃঃ ১৮৮ ভারতীয় জনগণের অধিকার। ১৮৮৬, ২৩ ডিসেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকা জোরের সঙ্গে বলে ভারতীয় জনগণের দাবী সমস্ত ভারতীয় পদ তাদেরই এই বিষয়টি ন্যাষ্য। তাদের অধিকারের পক্ষে যুক্তি হল—পদগুলি ভারতীয় রাজস্বর সাহায্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং ভারতীয় জনগণের এইসব পদের উপর সম্পত্তিসুলভ অধিকার আছে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৯০৪ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সনদ-১ উত্থাপন করার সময় বলেছিলেন মাত্র শতকরা উচ্চপদের ১৪-৭৭ ভাগ আমাদের ভাগ্যে জোটে যদিও দেশটা আমাদের। টাকা আমাদের এবং জনসাধারণের বিরাট অংশও আমাদের। রাজনৈতিকভাবে পরিষেবা চাকুরীর ভারতীয়করণ এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল যে যদি শিক্ষিত জনসাধারণকে ভাল চাকুরি না দেওয়া হয় তাহলে তারা রাজনীতি-গত ভাবে অসন্তুষ্ট হবে।

১০। পাবলিক সারভিস কমিশনের (১৮৮৭) কার্যবিবরণী ; খণ্ড ২ বিভাগ—গ পৃঃ ৪১ খণ্ড ৩, বিভাগ -গ পৃঃ ৭ খণ্ড ৪, বিভাগ—গ পৃঃ ১৪৭ খণ্ড ৫, বিভাগ—খ পৃঃ ২১৪।

১১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করার সময় জে. ইউ. ইয়াগনিক এই বলে সমালোচনা করলেন যে "সাধারণত বিভাগীয় প্রধানদের দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনা যার মাধ্যমে খরচ কমানোর ব্যাপারটা দেখানো হয় তাতে কোনো জায়গায় কেরানী, বা অন্যকোন জায়গায় চাপরাসি বা, জলওয়ালা যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো তৃষ্ণার্তকে জলদান করে যার মাস মাইনে হয়ত ৮ বা ১০ টাকা। বর্তমানে প্রচলিত এই অতিরিক্ত কুণ্ঠা নিশ্চিতভাবেই কোনো রকম সদর্থক সুবিধা সাহায্য গড়ে তুলতে পারবে না।

১২। বিশেষ করে নৌরজী বক্তৃতামালা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৪৯ তিনি ঘৃণার সঙ্গে বললেন যে ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বর্তমান আর্থিক সম্পর্ক কার্যত মালিক ও ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল।

১৩। অনুসিদ্ধান্ত III (ii) একইভাবে ১৯০৩ সালে কংগ্রেস দাবি করল যে করদাতাদের সুবিধার সাহায্যে বাজেট উদ্বৃত্ত না কমানো এবং ব্যয়বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্ররোচনা না ওঠা পর্যন্ত সরকারের উদ্বৃত্ত সেই দিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত যাতে জনসাধারণের উপকার হয় যেমন বিজ্ঞান, কৃষি এবং শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নতি হয় এবং সেই

সঙ্গে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ত্রাণেরও উন্নতি ঘটে। উদ্বৃত্তর বাকী অংশ আঞ্চলিক এবং মিউনিসিপাল পর্ষদের জরুরী জলনিকাশী সংস্কার প্রকল্প এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

১৪। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা এবং বোম্বাই সরকারকে রাজ্যের মোট রাজস্বের বেশ কিছু অংশ নির্দিষ্ট করার সময় গোখেল খুব বিস্তৃতভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধার কথা উল্লেখ করে বললেন: "এর অর্থ হল ব্যাপক মানুষের জন্য উচ্চস্তরের বুদ্ধি, দক্ষ-শ্রমিকের জন্য মানসিকতা এবং ভুল ও সঠিকের পার্থক্য নির্ধারণ করার অধিক ক্ষমতা অর্জন। (বম্বের রাজ্যপালের পর্ষদের কার্যাবলী, ১৯০১)

১৫। গোখেল বক্তৃতামালা পৃঃ ৯১-২ ; ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পুলিশি ব্যবস্থার দক্ষতা এবং সততা উন্নতি বৃদ্ধির পক্ষে পুলিশের অধস্তন কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন।

১৬। বি. জে. তিলক প্রেসিডিংস অফ দি কাউন্সিল অফ দি গভর্ণর অফ বম্বে, ১৮৯৫, খণ্ড XXXIII, পৃঃ ৯১ ; গোখেল বক্তৃতামালা ১৯০৪ পৃঃ ১৬৯ ১৯০৪, ১৯ মে সংখ্যা আয়কর বিলোপের যে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। এবং পরামর্শ দেয় যে এর পরিবর্তে সংগৃহীত অর্থ বিশ্বাসের উপর নেওয়া হবে যা শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হোক।

১৭। ভি. কে. আয়ার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিংশতি সম্মেলনে দাবি করেন যে ১৮৯২ সালে প্রদত্ত পরিষদের সভায় বাজেট পর্যালোচনার সযতা ছিল কার্যত অবাস্তব ও প্রতারণা মাত্র। কেননা সভায় পেসকরা বক্তৃতা সরকারের নীতি ও প্রশাসন সম্বন্ধীয় কোনো প্রতিক্রিয়াই গড়ে তুলতে পারেনি। তিনি আরো মন্তব্য করলেন: "বাজেট আগেই তৈরী করা, সমস্ত বিষয়ই আগে থেকে স্থির করা এবং সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত সদস্যদের মতামত প্রকাশ এবং প্রবন্ধ পাঠ সবকিছুই আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।"

১৮। নৌরজী বক্তৃতামালা পৃঃ ১০৫ নওরোজি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদীয়মান প্রজন্মের, সর্বভারতীয় সমাবেশের মহান ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমান সচেতন ছিলেন এবং তিনি আসন্ন জাতীয়তাবাদী উদ্যোগের দীর্ঘকালীন লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভায় আমি মন্তব্য করতে পারি আমাদের সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত ইচ্ছাকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা। আমরা সেইসব প্রত্যাশা অনতিবিলম্বে পাই বা না পাই আমাদের নেতৃবৃন্দই জানুক আমাদের প্রকৃত আশা কী?

১৯। ১৮৯৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী খোলাখুলি-ভাবে মন্তব্য করেন যেহেতু প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোনো কর নেই। বর্তমান সভা সরকারের এই নীতি কংগ্রেস এই কারণে কংগ্রেস দেশের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেনি। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন যে রাজনীতি হল একটি ব্যবহারিক শিল্প এবং অবাস্তব জগতের নীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

২০। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভাষণ প্রসঙ্গে মদনমোহন মালব্য বলেন "আমরা বলি, আমরা আপনাদের অনুরোধ করি আমাদের বাজেটের ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ দেবার জন্য আমাদের প্রতিনিধিদের বাজেট সম্পর্কে কিছু বলার অবস্থায় নিয়ে যেতে যখন তা পরিষদে উপস্থাপিত হবে।

১৩

সম্পদ-নিষ্কাশন

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতে এ দেশের দারিদ্রের প্রধানতম একটি কারণ সম্পদ-নিষ্কাশন; তাঁদের একটি অংশ মনে করতেন, এটিই ছিল ভারতের সব অর্থনৈতিক দুর্দশার মূলে। এই বই-এ যে সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তখন এদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রধানত নিষ্কাশন তত্ত্ব (drain theory) কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে ভারতের জাতীয় সম্পদের একটি মুখ্য অংশ কিংবা বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হচ্ছিল আর বিনিময়ে ভারতবর্ষে যেসব পণ্য আসছিল তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল, অর্থাৎ ভারতকে বাধ্য করা হচ্ছিল পরোক্ষ-ভাবে বশ্যতা কর দিতে। ধীরে ধীরে কয়েক বছরের মধ্যে নিষ্কাশন-তত্ত্ব এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং এদেশের সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বেশ কয়েকজন ইংরেজ লেখক বা মুখপাত্র এই তত্ত্বটি যে অর্থনৈতিক যুক্তির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ তা প্রমাণ করার প্রায় অসম্ভব প্রচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

নিষ্কাশন তত্ত্বের মূল নির্মাতা বা গুরুসদৃশ ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনব্যাপী তিনি অবিচল দৃঢ়তায় প্রতিনিয়ত এই তত্ত্বটিকে উপস্থিত করেছেন। এর সূক্ষ্ম যুক্তিজাল অল্প কয়েকজনই বুঝেছেন, তবে অনেকেই সাধারণভাবে এটিকে বিশ্বাস করেছেন, এবং প্রচার করেছেন। ১৮৬৭ সালে দাদাভাই যার সূত্রপাত করেছিলেন সেটি শক্তি অর্জন করে চূড়ান্ত প্রবল রূপে জাতীয়তাবাদীদের সার্বিক স্বীকৃতি আদায় করেছিল দাদাভাই-এর "পভার্টি এ্যাণ্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া", ডিগবি-র "প্রসপারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" এবং রমেশ দত্তের দুই খণ্ডে "ইকনমিক হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত হবার পর। এখানে নিষ্কাশন তত্ত্বটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অবশ্য মূলত নির্ভর করব সেই সময় জাতীয় নেতৃত্ব যেভাবে তত্ত্বটি কে গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন তার উপর; এবং সেজন্য দাদাভাই নৌরজীর বক্তৃতা ও লেখাই প্রধানত ব্যবহার করা হবে।

১৮৬৭ সালে ২রা মে লণ্ডনে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে দাদাভাই "ভারতের কাছে ইংল্যাণ্ডের ঋণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তাতেই প্রথম সম্পদ নিষ্কাশনের ধারণাটি উপস্থাপিত হয়েছিল। দাদাভাই দেখালেন যে, 'ভারতবর্ষে যে রাজস্ব আদায় হতো তার প্রায় এক চতুর্থাংশ এদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া হতো, তা ইংল্যাণ্ডের সম্পদ বৃদ্ধি করত। এটা বস্তুত 'ইংরেজদের ভারত শাসনের মূল্য হিসেবে' নিষ্কাশিত হচ্ছিল। পরিণামে ভারতবর্ষ ক্রমাগত দরিদ্র হয়ে যাচ্ছিল। এই বক্তব্যের সমর্থনে দাদাভাই বম্বে থেকে প্রকাশিত দুটি প্রধান সংবাদ পত্র "নেটিভ ওপিনিয়ন" এবং "রাস্ট গোফ্টার" এর থেকে উদীয়মান শিক্ষিত ভারতীয়দের মতামত উদ্ধৃত করেছিলেন।[১] ভারতবর্ষকে এই অর্থ-নৈতিক দারিদ্র থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন : 'ব্রিটেনের মানুষ অন্তত এইটুকু সুনিশ্চিত করতে পারে যাতে ভারত থেকে নিষ্কাশিত সম্পদ ঐ দেশের সম্পদ উন্নয়নের স্বার্থে ব্যয়িত হয়।'[২] ১৮৭০ এবং ১৮৭১ সালে লণ্ডনে "সোসাইটি অফ আর্টস্"-এর সভায় পঠিত "দ্য ওয়াণ্টস এণ্ড মিনস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" এবং "অন দ্য কমার্স অফ্ ইণ্ডিয়া" নামে দুটি প্রবন্ধে দাদাভাই ভারত থেকে 'বৈষয়িক এবং নৈতিক' সম্পদ নিষ্কাশনের বক্তব্যটি আবার তুলে ধরেন। তবে তখন পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধাবলীতে সেই মৌল চিন্তা এবং বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল না যা পরবর্তীকালে নিষ্কাশন-তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় দেখা গেছে। বস্তুত সেই সময় দাদাভাই ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের অর্থনৈতিক পরিণামের সমালোচনা করলেও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক যোগকে মূল্যবান মনে করতেন, সেজন্য মূল্যস্বরূপ ভারতীয় সম্পদের কিছুটা পরিমাণে রপ্তানী যে অনিবার্য তা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "ভারতবর্ষকে যদি ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে পুনর্জীবিত করতে হয় তা হলে তার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।" তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, ইংল্যাণ্ডের কর্তব্য হবে ভারতের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ভারতবর্ষে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, যাতে ক্রমাগত দারিদ্রে নিমজ্জিত না হয়েও ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের ব্যয় ভার বহন করতে সমর্থ হন।

দাদাভাই হিসেব করে বার করেছিলেন যে, ভারত থেকে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড নিষ্কাশিত হচ্ছিল। এই হিসেব দাখিল করে ১৮৭১ সালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "আমি অভিযোগ করছি ; আপনারা ভারতবর্ষে যে কর্তব্য পালন করছেন তার মূল্য অবশ্যই আপনাদের প্রাপ্য, কিন্তু সেটা যাতে আমরা দিতে পারি তার জন্য সাহায্য করুন।" বস্তুত, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, "ইংল্যাণ্ডের কর্তব্য হবে তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে এদেশে এমন সরকার পরিচালনা করা যাতে আমরা দুর্ভিক্ষ কবলিত না হয়ে অথবা না মরে ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত শাসনের মূল্য অথবা প্রয়োজনীয় কর

প্রদানে সমর্থ হতে পারি।' এজন্যে যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন তার উপায় স্বরূপ দাদাভাই ব্যাপকভাবে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৭০ সালে দাদাভাই লিখেছিলেন, "বৈদেশিক শাসনের ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি তা পূরণ সম্ভব ব্যাপকভাবে বিদেশী মূলধন আমদানী করে "এবং এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, "এদেশে প্রভূত পরিমাণে বিদেশী মূলধন এনে যদি তার যোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয়···তা হলেই বর্তমান দূরবস্থা এবং অসন্তোষ অল্প দিনের মধ্যেই দূর হবে।"

১৮৭১ সালে "স্টেটমেন্ট টু দ্য সিলেক্ট কমিটি অন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স"-এ দাদাভাই পুনরায় "বৈদেশিক শাসনের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ফলস্বরূপ" সম্পদ নিষ্কাশনের প্রয়োজন স্বীকার করে ব্রিটিশ শাসকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, এই সম্পদ নিষ্কাশনের অর্থনৈতিক পরিণামের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বার করা, "যাতে বছরের পর বছর যে কোটি কোটি টাকা ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছে তার বোঝাটা কিছুটা হাল্কা হয় এবং যুক্তিসম্মত রপ্তানীর জন্য সম্পদ যোগাতে ভারতবাসী আরও বেশী প্রস্তুত হতে পারে।"

দাদাভাই যখন তাঁর "ভারতের দারিদ্র" গ্রন্থটির প্রথম খসড়া করেন সেই ১৮৭৩ সালের মধ্যে অবশ্য এই সম্পদ নিষ্কাশনের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তা পরিচিত সংগ্রামী রূপে সূত্রায়িত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালের মধ্যেই নিষ্কাশন তত্ত্বটি তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং ঐ বছর "ভারতের দারিদ্র"-এ একটি সংশোধিত খসড়া "ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের" বোম্বাই শাখার একটি সভায় তিনি উপস্থিত করেন। দাদাভাই-এর এই নিষ্কাশন তত্ত্বটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হবে। তার আগে এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে দাদাভাই তাঁর গ্রন্থটির উপসংহারে জোর দিয়ে বলেছেন: "ভারতে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃক এদেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজনে দেশটিকে ক্রীতদাসে পরিণত করার অস্বাভাবিক নীতি সমগ্র শাসন ব্যবস্থাটিকে ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং আত্মহননের ফাঁদে ফেলছে।" তিনি সাবধান করেছিলেন এই বলে যে, "প্রকৃতির নিয়ম নিয়ে খেলা করা যায় না, এই নিয়ম অপরিবর্তনীয় এবং তা লঙ্ঘন করলে দিনের পরে রাত যেমন অনিবার্য সেই রকম অনিবার্যভাবে নিয়তির কবলে পড়তে হয়।"

তখন থেকেই দাদাভাই নিষ্কাশন-তত্ত্বটির প্রচার এবং তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজে প্রায় শব্দার্থেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ঐ সম্পদ নিষ্কাশনকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল কুফলটি বলে ঘোষণা করেছিলেন। অসংখ্য বক্তৃতায়, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্রে, সরকারী কমিশন ও কমিটির সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে—

বস্তুত যোগাযোগের প্রায় সমস্ত মাধ্যমের মারফতে তিনি এই সম্পদ নিষ্কাশনের প্রতি জনসাধারণের এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। ১৮৮০ সালে তিনি লিখেছিলেন "কীভাবে ভারতবর্ষকে এই নিষ্কাশনের রক্তমোচন থেকে মুক্ত করা যায়, সেটি আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। প্রতিকারের প্রতিটি উপায়ের মূল্য নির্ভর করছে তা কতটা কার্যকর তার উপরে··"। আবার ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "সংক্ষেপে বললে ব্যাপারটা এই রকম, বর্তমানে ভারতবর্ষে অর্থব্যয় সংক্রান্ত প্রশাসন যে অন্যায় ও দুর্বপথে পরিচালিত হচ্ছে তাতে ব্রিটিশ শাসনের গুনগান করা স্বপ্ন দেখার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাস্তবে ব্রিটিশ শাসনের ফলে এদেশে রক্ত মোচন হচ্ছে।" এইভাবে তিনি প্রায় ৫০ বছর বার বার একই কথা বলেছেন, কখনও কিছুটা অমার্জিত হলেও সব সময়ই সুবোধ্যভাবে, একটিমাত্র উদ্দেশ্যে তা হল সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কিত ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বছরের পর বছর ক্রমাগত এ বিষয়ে তিনি উত্তেজিত হয়েছেন এবং তাঁর আবেগ তীব্রতর হয়েছে। ব্রিটিশ নীতির বর্ণনা করতে গিয়ে তাই তিনি 'অন্যায়', 'স্বৈরাচারী', 'লুটেরা', 'অস্বাভাবিক, 'ধ্বংসাত্মক' প্রভৃতি নানা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, কারণ, তাঁর মতে, ভারত থেকে এই সম্পদ-নিষ্কাশনের ফলে "ভারতের প্রাণশক্তি" নিষ্কাশিত হচ্ছিল।

দাদাভাই-এর সঙ্গে প্রায় একযোগে অন্য দুজন ভারতীয় নেতাও সম্পদ-নিষ্কাশনের বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন। এদের একজন বিচারপতি রাণাডে। ১৮৭২ সালে পুণেতে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় তিনি ভারত থেকে মূলধন ও সম্পদ নিয়ে যাওয়ার ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, "বাস্তবে ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশী ইংরেজরা কোন না কোনরূপে এদেশ থেকে লুটে নিয়ে যাচ্ছে।" দুই দশক পরে ১৮৯২ সালে "ভারতীয় রাষ্ট্র-অর্থনীতি" সম্পর্কে পথ-প্রবর্তক স্বরূপ একটি বক্তৃতায় তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারক 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত' দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন; তাঁর মতে এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "এদেশ থেকে সম্পদ ও কর্মদক্ষতার নিষ্কাশন যা পরাধীনতার ফল।" অন্য যে ভারতীয় লেখক ১৮৭৩ সালে "প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে" সম্পদ-নিষ্কাশনের মুখব্যাদন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, তিনি ভোলানাথ চন্দ্র। তাঁর মতে, এই অপচয়ের সূচনা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাণিজ্যিক বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় রাজস্বের একটি অংশকে আলাদা করে তুলে রাখার ব্যবস্থা করেছিল" তখন থেকেই। পরে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে: 'সে সময় একটি মাত্র পথেই এ দেশের অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছিল, এখন নির্গমনের পথ সহস্র।'

দাদাভাই নৌরজীর প্রায় একইসঙ্গে আরও দুজন ভারতীয় নেতা এদেশ থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের কুফল সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করেছেন। ১৮৭২ সালে পুনায় 'ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের পরিস্থিতি' বিষয়ে একটি বক্তৃতায় বিচারপতি রাণাডে ভারত থেকে মূলধন ও অন্যান্য সম্পদ-নিষ্কাশনের সমালোচনা করে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কোনো-কোনো রূপে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' কয়েক বছর পরেই, ১৮৯২ সালে, "ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" সম্পর্কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম বক্তৃতায় তিনি এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দুর্বলতার" প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: "ভারতবর্ষের পরাধীনতার ফলস্বরূপ যে সম্পদ ও প্রতিভা এদেশ থেকে নিষ্কাশিত হচ্ছে" তার কুফলও ঐ দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাণাডে ছাড়া আর একজন ভারতীয় লেখকও ১৮৭৩ সালে প্রতি বৎসর বর্তমান হারে সম্পদ-নিষ্কাশনের "মুখব্যাদন" সম্পর্কে বিস্তৃত মন্তব্য করেছিলেন তিনি ভোলানাথ চন্দ্র। চন্দ্রের মতে যখন থেকে "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রাজস্বের একটি অংশ তাঁদের বাণিজ্যিক বিনিয়োগের জন্য আলাদা করে রাখা শুরু করেছিল" তখন থেকেই এই সম্পদ-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। "সে সময় (অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—অনু) ধন-সম্পদ একটিমাত্র পথ দিয়েই নিষ্কাশিত হত। কিন্তু এখন এই নিষ্কাশনের পথের সংখ্যা অগণ্য।"

আরও একজন পরিচিত নেতা যিনি তাঁর নানা লেখা এবং অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে নিষ্কাশন তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন, তিনি হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র কিছুটা দেরীতে এই তত্ত্বটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরকম দেখা যায় সেইভাবে এই তত্ত্বটির প্রচারে অসীম উৎসাহ প্রদর্শন করে এই দেরিতে আকৃষ্ট হওয়ার ঘাটতিপূরণ করেছেন। ইংল্যাণ্ডে 'ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশনের' সম্মেলনে ১৯০১ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে, ভারত থেকে যেভাবে সম্পদ-নিষ্কাশিত হচ্ছে 'তার তুলনীয় উদাহরণ বর্তমান পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না।' রমেশচন্দ্র জোর দিয়ে বললেন যে, 'ইংল্যাণ্ডকে যদি তার উৎপন্ন রাজস্বের অর্ধাংশ প্রতি বছর জার্মানী, ফ্রান্স অথবা রাশিয়ায় একইভাবে পাঠাতে হত, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দিত।' তাঁর "ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস" বই-এ প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারতের নীট রাজস্বের অর্ধেকটাই 'প্রতিবছর এদেশ থেকে নিষ্কাশিত হচ্ছে" এবং তারপর এই বিষয় মন্তব্য করেছিলেন: "সত্যঃ

সত্যই ভারতবর্ষের জলবায়ুর আর্দ্রতা অন্য দেশের জমিতে সিঞ্চিত হয়ে তাকে উর্বর করে তুলছে।" এই বই-এরই শেষ দিকে তিনি এই নিষ্কাশনের অভিশাপের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: "পৃথিবীর সর্বোন্নত দেশ থেকেও যদি এইভাবে অর্থ-নৈতিক নিষ্কাশনের পথে সম্পদ অন্যত্র চলে যেত, তাহলে সেই দেশটিকে ক্রমাগত দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে হত; এর ফলেই ভারতবর্ষ ঘনঘন, ক্রমাগত, ব্যাপকতর এবং উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বা অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে এধরনের নজির আর নেই।" একইভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও তিনি 'পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ' ইংল্যাণ্ড 'দরিদ্রতম দেশ থেকে এইভাবে বাৎসরিক সম্পদ নিষ্কাশনের নীচতা' প্রদর্শনের জন্য ভর্ৎসনা করেছেন। প্রসঙ্গত রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষ থেকে "রক্ত মাংস নিংড়ে নেওয়ার এই প্রক্রিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম প্রক্রিয়া।"

এদেশ থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে প্রচার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে বহু ভারতীয় নেতাই অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে জি. ভি যোশী, পি. সি. রায়, মদনমোহন মালব্য, ডি. ই. ওয়াচা, জি. কে. গোখেল, জি. সুব্রহ্মানিয়ম আয়ার, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল এই নিষ্কাশন তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। ১৮৭০ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে অমৃতবাজার প্রথম ভারতবর্ষের দারিদ্রের অন্যতম কারণ হিসেবে সম্পদ নিষ্কাশনকে দায়ী করেছিল। তারপর থেকে বার বার একই কথা জোর দিয়ে উপস্থিত করে এসেছে। যেমন ১৮৮১ সালের ১৪ই এপ্রিল অমৃতবাজার অভিযোগ করেছিল যে, ভারতবর্ষ এত বহু সংখ্যক শোষকের দ্বারা এত বিভিন্ন রকম উপায়ে শোষিত হচ্ছে যে শোষকরা নিজেরাই পরস্পরকে চেনে না কিংবা পরস্পরের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানে না, এবং জানে না যে তাদের এই অত্যাচারের ফলে অত্যাচারিত দেশটি কীভাবে চূড়ান্ত দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।" ১৮৯৬ সালের ২রা মার্চ এই পত্রিকাতে প্রায় একই কথা আবার লেখা হয়েছিল: "এই অবিরাম সম্পদ-নিষ্কাশনের ফলে ভারতবর্ষ ক্রমাগত দারিদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের ধন-সম্পদ বাড়ছে এই অবস্থার ফলে, ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে দেউলিয়ায় পরিণত হচ্ছে এবং ভারতবর্ষের মানুষ পরিণত হচ্ছে গরু-ভেড়া-ছাগলে।" শুধু অমৃতবাজার পত্রিকাই নয়, ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশই এই সম্পদ-নিষ্কাশনের সমালোচনা করেছে, এবিষয়ে মন্তব্য করেছে এবং নিন্দা করেছে।

বেশ কয়েক বছর ভাবনা চিন্তার—অথবা সম্ভবত দ্বিধাদ্বন্দ্বের—পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৬ সালে কলকাতা অধিবেশনে সরকারীভাবে

নিষ্কাশন তত্ত্বটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ঐ সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে প্রথম বলা হয় 'বছরের পর বছর এদেশ থেকে যে সম্পদ নিষ্কাশিত' হচ্ছে তাই 'ভারতবাসীর অসামান্য দারিদ্র্যের' এবং এদেশে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। পরবর্তীকালে প্রায় প্রতি বছরই কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে এই অভিযোগ বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের শাসনকালের ও ব্রিটিশ শাসনকালের পার্থক্য দেখাতেও ভারতের নেতারা এই সম্পদ-নিষ্কাশনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, স্বৈরাচারী শাসকদের সময়ে এদেশের সম্পদ এভাবে বাইরে চলে যায়নি। একথা ঠিক যে, মুঘল অথবা মারাঠা শাসকেরা বহু লুঠতরাজ করেছে : কিন্তু তারা প্রাপ্ত ধন-সম্পদকে দেশের বাইরে নিয়ে যায় নি, এদেশেই তা ব্যয় করত। এর ফলে ব্যক্তি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত বা নিপীড়িত হত এবং নিজের সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত, কিন্তু সমগ্র দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হত না, কারণ একজনের ক্ষতি অপরের লাভ হিসেবে দেশেই থেকে যেত। ব্রিটিশ শাসকেরা পক্ষান্তরে এদেশ থেকে সম্পদ নিয়ে গিয়ে বিদেশে ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়ত, আগেকার স্বৈরাচারী শাসকদের শাসনকালে করের বোঝা অত্যধিক হলেও তার অর্থনৈতিক ফলাফল ততটা মারাত্মক হয়নি যতটা ইংরেজ আমলে হয়েছে, করের হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়া সত্ত্বেও। কারণ, রাজস্বের অধিকাংশই বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন কি বিদেশী আক্রমণকারী নাদির শাহও এদেশ আক্রমণ করে, লুটতরাজ করে অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল ফলে সেই ধাক্কাও সাময়িক হয়েছিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তা কাটিয়ে ওঠা গেছে। তাছাড়া নাদিরশাহের আক্রমণের মত ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে নি। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বকালে নিষ্কাশন প্রক্রিয়া শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল অবিরামভাবে, বছরে বছরে এই সম্পদ-নিষ্কাশিত হয়েছে। যার ফলে ক্ষতস্থানটি সর্বদাই উন্মুক্ত থেকেছে যা শুকনোর সুযোগ পায় নি।

১. সম্পদ-নিষ্কাশনের হিসাব

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা সম্পদ-নিষ্কাশন বলতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বৈষয়িক প্রতিদান ছাড়াই এদেশের সম্পদ ও পণ্যকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া বুঝেছিলেন। রপ্তানি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল এই সম্পদ-নিষ্কাশনের একটি নির্দিষ্ট রূপ। নেতারা এই উদ্বৃত্তকে সম্পদ-নিষ্কাশনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া এই উদ্বৃত্তের হিসেব থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের প্রকৃত রূপ ও পরিমাণ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায় বলে তারা মনে করেছেন। ফলে তারা সম্পদ-

নিষ্কাশনের পরিমাণ হিসেব করতে সরল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অকাট্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মোট আমদানী ও রপ্তানীর হিসেব থেকে সহজেই নিষ্কাশনের মোট পরিমাণটা হিসেব করে বের করা সম্ভব হয়েছিল।

দাদাভাই আরও নিখুঁত হিসেব পাবার জন্যে আর এক ধাপ এগিয়েছিলেন। শুধু বাণিজ্য উদ্বৃত্তই নয়, তার সঙ্গে বাণিজ্য থেকে লব্ধ মুনাফার অংকটিও তিনি যোগ করেছেন। তাঁর মতে, এইটিই ভারতবর্ষের প্রাপ্য ছিল এবং তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার দুটি যুক্তি ছিল। প্রথমত, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানীর তুলনায় যে উদ্বৃত্ত ঘটছিল মূলধন স্থানান্তর এবং ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া সম্পদ বাদ দিলে তা ছিল মূলত এদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যের জন্যে পাওয়া মুনাফা। যদি এই যুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। দ্বিতীয়ত, তিনি দাবী করেছিলেন যে, ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হিসেব করতে গিয়ে ব্রিটিশ কর্মচারীরা তাদের রপ্তানীর মূল্য হিসেব করতেন। ভারতের বন্দরে তা আমদানী হত সেখানকার মূল্যের হিসেবে। কিন্তু তারা যা আমদানী করত তার মোট মূল্য হিসেব করা হত তাদের বন্দরের প্রচলিত মূল্যের হিসেবে, যার ফলে ব্রিটেন যা আমদানী করত তার হিসেবটা বাড়িয়ে দেখা হত এবং এইভাবে ভারতবর্ষের পণ্য বিক্রি করে ব্রিটেন যে মুনাফা করছিল তা গোপন করা হত। এর অর্থ আমদানী ও রপ্তানীর হিসেব থেকে রপ্তানী উদ্বৃত্তের যে হিসেব পাওয়া যেত আসলে সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল তার থেকে বেশী। দাদাভাই-এর এই হিসেবের মূলে ছিল এই অনুমান যে ভারতবর্ষের বন্দর থেকে রপ্তানী করার সময় পণ্যের যে দাম ধরা হত সেটা বাজারের দাম নয় অর্থাৎ রপ্তানীকরের মুনাফা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এই দর ছিল উৎপাদন ব্যয়ের মোট মূল্য, অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের যে পণ্য আমদানী করা হত তার দর ধরা হত রপ্তানীকারকের মুনাফাসহ। অন্যান্য ভারতীয় নেতারা কিন্তু সম্পদ-নিষ্কাশনের গোপন দিকটি লক্ষ্য করেন নি। তাঁরা মূলত সম্পদ-নিষ্কাশনের মোট হিসেব করেছেন রপ্তানী বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণের ভিত্তিতে। তাছাড়াও, দাদাভাই বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের প্রতি অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে রপ্তানী থেকে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণকে বাদ দিতে গররাজি ছিলেন না।

বহু ভারতীয় নেতা সম্পদ-নিষ্কাশনের মোট পরিমাণকে যথাযথভাবে হিসেব করে বার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেহেতু আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছিল সেজন্য এক এক বছরের এই হিসেব এক এক রকম হয়েছে। শুধু তাই নয় এক একজনের করা হিসেবের পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য ছিল। জাতীয় নেতারা এই হিসেবগুলিকে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন, এর জন্য যে কোনো মাধ্যমকে ব্যবহার করতে তাঁরা পিছপা হন নি।

সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ সম্পর্কে বারবার এইভাবে তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থিত করার ফলে সহজেই তা জনগণের বোধগম্য হয়েছিল এবং তার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিষ্কাশনের তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল। এই হিসেব যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতিবিদ ছিলেন তাঁদের করা হিসেব নিয়ে এখানে আলোচনা সেজন্যই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দাদাভাই যে হিসেব করেছিলেন তা কিছুটা জটিল, কেননা সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে এবং সব আপত্তির জবাব দিতে বার বার তিনি তাঁর মানদণ্ডকে পরিবর্তিত করেছেন। ১৮৬৭ সালে দাদাভাই যে হিসেব করেছিলেন তদনুসারে মোট নিষ্কাশিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৭০ সালে এই পরিমাণটিকে বাড়িয়ে তিনি দেখালেন তখন সম্পদ-নিষ্কাশিত হচ্ছিল মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ছ'বছর পরে ১৮৭৬ সালে তাঁর "ভারতবর্ষের দারিদ্র" নামে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বই-এ তিনি যে হিসেব দিয়েছেন সেই হিসেব অনুসারে রেল ব্যবস্থা প্রদত্ত সুদ বাদ দিয়ে ১৮৩৫ সাল থেকে পরপর বছরগুলিতে সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

বছর	বাৎসরিক গড় (পা)
১৮৩৫—১৮৩৯	৫,৩৪৭ ০০০
১৮৪০—১৮৪৪	৫,৯৩০,০০০
১৮৪৫—১৮৪৯	৭,৭৬০ ০০০
১৮৫০—১৮৫৪	৭,৪৫৮,০০০
১৮৫৫—১৮৫৯	৭,৭৩০,০০০
১৮৬০—১৮৬৪	১৭,০০০,০০০
১৮৬৫—১৮৬৯	২৪,৬০০,০০০
১৮৭০—১৮৭২	২৭,৪০০,০০০

১৮৯৩ সালে দাদাভাই হিসেব করে দেখিয়েছিলেন সে বছর নিষ্কাশিত সম্পদের মোট মূল্য ছিল ২৫ কোটি টাকারও বেশী। এরপর ১৮৯৭ সালে তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে, ১৮৮৩ থেকে ১৮৯২ এই দশ বছরে প্রায় ৩৫৯ কোটি টাকার সম্পদ এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে নিষ্কাশিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো সমালোচক এর থেকে সরকারী ঋণের উপর প্রদত্ত সুদ বাদ দেওয়ার দাবি জানালে তা মেনে নিয়ে দাদাভাই হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, ঐ সুদ বাদ দিয়েও ১৮৮৩ থেকে ১৮৯২ দশ বছরে নিষ্কাশিত সম্পদের মোট পরিমাণ ছিল ২৮৮ কোটি টাকা যার মধ্যে ১১৮ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা। দাদাভাই-এর মতে, ঐ দশ বছরে সম্পদ-নিষ্কাশনের যে পরিমাণ ছিল তা খুব কম করে দেখলেও ২৪১ কোটি টাকার কম নয়—অর্থাৎ প্রতি বছর অন্তত ২৪

কোটি টাকা এদেশ থেকে ঐ দশ বছরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দাদাভাই সবশেষ হিসেবটি করেছিলেন ১৯০৫ সালে। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন তখন প্রতি বছর ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে নিষ্কাশিত হয়ে গিয়েছে। জি. ভি. যোশীর হিসেব মতো ১৮৩৪-১৮৮৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সম্পদ শোষণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রতি বছর এই নিষ্কাশনের পরিমাণ নিয়মিত বেড়েছে এবং ১৮৮৮ সালে তার পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকার মতো। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ডি. ই. ওয়াচা সম্পদ-নিষ্কাশনের পরিমাণ বছরে ৩০—৪০ কোটি টাকার মতো ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরের বছরেই সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে হিসেব উপস্থিত করেছিলেন তদনুসারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বছরে নিষ্কাশিত সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রতি বছর ৩ কোটি পাউণ্ডের মতো। তুলনায় রমেশচন্দ্র দত্তর হিসেব ছিল কিছুটা রক্ষণশীল; তিনি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন বিশ শতকের গোড়ায় প্রতি বছর ২ কোটি পাউণ্ড সম্পদ এ দেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় অঙ্কের হিসেব দিয়েছিলেন পৃথ্বীশ চন্দ্র রায়, তাঁর হিসেব মতো এই হিসেব ছিল বছরে ৬-৭ কোটি পাউণ্ড।

ভারতবর্ষ থেকে কী পরিমাণ সম্পদ-নিষ্কাশিত হচ্ছিল সে সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে স্পষ্ট ধারণা করতে পারে সেজন্য বহু জাতীয় নেতা মোট রাজস্বের পরিমাণের পাশাপাশি সম্পদ-নিষ্কাশনের অঙ্কটাকে রেখে হিসেব করে দেখাতে চেয়েছেন যে, রাজস্বের হিসেবে এই নিষ্কাশনের পরিমাণ কতটা। যেমন রমেশচন্দ্র দত্ত বার বার তুলে ধরেছেন প্রতি বছরই রাজস্বের প্রায় অর্ধেক এদেশ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে গেছে। বস্তুত ভারত সরকারের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সে সময় জাতীয়তাবাদী সমালোচনার একটি প্রধান বক্তব্যই ছিল যে, ভারতবর্ষ থেকে যে কর আদায় হত তার অধিকাংশটাই অন্য দেশে ব্যয় করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২. সম্পদ-নিষ্কাশনের সূচনা

ভারতের জাতীয় নেতাদের মতে, ভারত থেকে সম্পদ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রূপে নিষ্কাশিত হয়েছে। সম্পদ-নিষ্কাশনের সূচনা সম্পর্কে তাঁরা কী ভেবেছিলেন? অর্থাৎ অন্যভাবে বললে এই সম্পদ-নিষ্কাশনেও তাঁদের মূল কারণ কি ছিল? উল্লেখযোগ্য যে সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা ১৮৫৮ সালের পরবর্তীকালে সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কে এই প্রশ্নটি উঠেছিল। ভারতীয় নেতারা কোম্পানীর আমলে, বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে

যে সম্পদ-নিষ্কাশিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন নি, যদিও অনেক সময় তাঁরা কোম্পানীর আমলের নিষ্কাশিত সম্পদের পরিমাণ হিসেব করে বের করেছেন এবং তার নিন্দা করেছেন। এর পিছনে কারণ ছিল মূলত দুটি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে মূলধন বিনিয়োগ করেছে, শেয়ারের মালিকদের ডিভিডেন্ড দিয়েছে, ভারতবর্ষের বাজার সরকারি ঋণ সংগ্রহ করেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিপুল সম্পদ গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। এসবই এদেশ থেকে বশ্যতা কর আদায় করার বা সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ। কিন্তু এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কের সুযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, ঐ সময় সম্পদ যে নিষ্কাশিত হচ্ছিল তা প্রমাণ করবার জন্য ভারতীয় নেতাদের বিস্তৃত অনুসন্ধানের আবশ্যকতা ছিল না, উচ্চ পদস্থ সরকারি এবং বে-সরকারি ইংরেজ কর্মচারীদের লেখা থেকে তাঁরা তা সহজেই প্রমাণ করতে পারতেন। বহু ইংরেজ লেখকই ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এর ক্ষতিকর ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এজন্যই রমেশচন্দ্র দত্ত বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন যে, "এটা দেখে যে-কোনো বিশ্ব নিন্দুক মন্তব্য করতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত সম্পদের পরিমাণ যত বেড়েছে ইংল্যাণ্ড তত সমবেদনা ও দুঃখ প্রকাশের বন্যা বইয়ে দিয়ে সেটা পরিশোধের চেষ্টা করেছে।" সবচেয়ে বড় কথা, ভারতীয় নেতারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় যত আগ্রহী ছিলেন অতীত সম্পর্কে ততটা নয় এবং ভবিষ্যৎকে ঠিকমতো সুরক্ষিত করার জন্য তারা অতীতকে ভুলে যেতেও গররাজী ছিলেন না।

১৮৫৮ সালের পরে অথবা এমনকি ১৮৩৩ সালের পরেও ভারত থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের প্রকৃতি আরও জটিল হয়েছিল। সরাসরি কোনো বশ্যতা কর দিতে হচ্ছিল না বলে কিংবা ভারতবর্ষ থেকে রাজস্বের উদ্বৃত্ত প্রত্যক্ষভাবে ইংল্যাণ্ডের কোষাগারে জমা পড়ছিল না বলে সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ ছিল। সেজন্যই ভারতীয় নেতাদের সম্পদ-নিষ্কাশনের ঘটনাকে প্রমাণ করতে উদ্যোগ নিতে হয়েছে, তাঁদের দেখাতে হয়েছে কীভাবে নানা পদ্ধতিতে পরোক্ষ কায়দায় ব্রিটিশ নাগরিকদের অর্থ দিয়ে ভারতকে এই বশ্যতা কর দিতে হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁদের এটাও দেখাতে হয়েছে যে, সম্পদ-নিস্কশনের এই পরোক্ষ পদ্ধতির ব্যবহার পুরোপুরি ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় নেতাদের মতে, নিষ্কাশিত সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ প্রশাসনিক, সামরিক ও রেল কর্মচারী, আইনজ্ঞ, ডাক্তার প্রভৃতির বেতন, অন্যান্য আয় এবং সঞ্চয় যা তারা ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে

দিত এবং অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের অবসর ভাতা কিংবা দীর্ঘ ছুটিতে থাকা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা যা ভারত সরকার ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিত অর্থাৎ এই সম্পদ-নিষ্কাশন ছিল অংশত ভারতবর্ষের প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে এবং রেলপথে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের ফল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্পদ-নিষ্কাশনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দাদাভাই নৌরজী কখনও কখনও, বিশেষ করে তর্ক বিতর্কের সময় খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টিকে দেখে ভারতের প্রশাসনে 'অতিরিক্ত' সংখ্যায় ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগকে দায়ী করেছেন। তাঁর এই সংকীর্ণ মানসিকতা কখনও কখনও শূন্যগর্ভ উক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের চরম দারিদ্র ও দুর্দশার একমাত্র কারণ এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় অত্যধিক পরিমাণে বিদেশীদের নিয়োগ এবং তার ফলস্বরূপ বৈষয়িক ক্ষতি এবং এদেশ থেকে সম্পদ-নিষ্কাশন।' এর পরই তিনি প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'এটি এ দেশের জীবন মরণ সমস্যা……এই একটি পাপকে দূর করুন তাহলে সবদিক থেকে ভারতবর্ষ উন্নত হয়ে উঠতে পারবে……'। দাদাভাই এর এই সংকীর্ণ মতামতের অনিবার্য ফল হয়েছিল এই যে, সমালোচকেরা তাঁর এই যুক্তির অবাস্তবতাকে তুলে ধরে সহজেই দেখাতে পেরেছিল যে, সম্পদ নিষ্কাশনের তত্ত্বটাই আসলে কতটা অযৌক্তিক। তবে সম্ভবত দাদাভাই-এর এই হাস্যাস্পদ মনোভাবের দুর্ভাগ্যের দিক হল এর ফলে অনেকেই সম্পদ নিষ্কাশন সম্পর্কে তাঁর এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতামতের গভীর ও জটিল দিকটিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কে দাদাভাই-এর যুক্তিতর্কের এই দুর্বল দিকটিকে কিছুটা পরিমাণে নিম্নোক্ত তিনটি কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়—(ক) প্রকৃতিতেই দাদাভাই ছিলেন একজন চরমপন্থী; (খ) ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভারতে বিদেশী সরকারী পুঁজি বিনিয়োগে এবং আরও অনেককাল পর পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ খুব বেশী হয়নি এবং সেজন্য ভারতীয়রা যাকে সম্পদ-নিষ্কাশন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তার একটা বড় অংশই এদেশে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগের ফলেই ঘটেছে ; (গ) ১৮৬০-এর বছরগুলিতে দাদাভাই বিদেশীপুঁজি বিনিয়োগের বিরোধী ছিলেন না এবং তার পরেও বেশ কয়েক বছর তিনি এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতারা যথেষ্ট জোর দিয়ে অথবা সোচ্চারে বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী কালে যখন বিদেশী পুঁজি ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে সম্পদ-নিষ্কাশনের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছিল তখন কিন্তু দাদাভাই তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

ভারতীয় নেতৃত্বের মতে ভারত থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের আর একটি প্রধান কারণ ছিল ভারত সরকারের প্রদেয় 'হোম চার্জেস' অথবা ইংল্যাণ্ডে অধিষ্ঠিত স্বরাষ্ট্র সচিবের ব্যয় নির্বাহ যা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করতে হতো। আভ্যন্তর সরকারি ঋণের উপর প্রদেয় সুদ এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য গ্যারান্টি প্রদত্ত অর্থ, সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার, সরকারের ব্যবহারের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত জিনিসপত্রের দাম, ইংল্যাণ্ডে প্রদেয় সরকারি এবং বেসরকারি নানাধরণের কর, ইণ্ডিয়া অফিসে ভারত সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র সচিবের ব্যয়ভার, অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের অবসরভাতা, ভারত সরকারের ইউরোপীয় কর্মচারীদের প্রদেয় বেতন ও ভাতা এই 'হোম চার্জেস'এর অন্তর্ভুক্ত হত। ভারতীয় নেতারা কখনও কখনও এর এক একটিকে আলাদাভাবে কখনও সবগুলিকে ভারত থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের কারণ বলে অভিহিত করেছেন এবং সম্পদ-নিষ্কাশনের জন্য দায়ী করেছেন।

ভারতীয় নেতাদের মতে, সম্পদ-নিষ্কাশনের তৃতীয় প্রধান উৎস ছিল ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিযুক্ত বিদেশী ব্যক্তিগত মূলধনের মুনাফা।

৩. সম্পদ-নিষ্কাশনের অর্থনৈতিক ফলাফল

আমরা আগেই বলেছি এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সব ছাত্রই জানেন যে ভারতীয় নেতারা এই সম্পদ-নিষ্কাশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুফল হিসেবে ক্রমাগত দারিদ্রকে চিহ্নিত করেছেন। তবে তাঁদের মতে এবিষয়ে কিছু কিছু মতপার্থক্যও ছিল। যেমন, দাদাভাই নৌরজী এদেশের সমস্ত অসুস্থতা, দুর্দশা এবং দারিদ্রের মুখ্য এমনকি একমাত্র কারণ হিসেবে সম্পদ-নিষ্কাশনকে দায়ী করেছেন এবং অন্যান্য সব কারণ দর্শানোকে 'আলোচনা ঘুরিয়ে দেবার অপচেষ্টা' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৮৮০ সালে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন 'ভারত যে দুর্দশা কবলিত এবং ধ্বংসের সম্মুখীন তা নিদারুণ অর্থনৈতিক নিয়মের অভিঘাতে নয় বরং নির্দয়, সমবেদনাহীন ব্রিটিশ নীতির ফলে নির্দয়ভাবে ভারতবর্ষের মজ্জা নিংড়ে নেওয়ার এবং ভারত থেকে সম্পদ-নিষ্কাশনের জন্য অর্থনৈতিক নিয়মের বিকৃতি ঘটিয়ে ভারতকে রক্তক্ষরণে বাধ্য করার জন্য।' অল্প গুটিকয়েক জাতীয় নেতাই দাদাভাই-এর এই মতকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন। যাঁরা দাদাভাই-এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকেরা। এই নেতাদের বেশীরভাগই সম্পদ-নিষ্কাশন যে ভারতের দারিদ্রের মুখ্য এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটা উল্লেখ করেই নিরস্ত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পদ-নিষ্কাশনকে ভারতবর্ষের দারিদ্রের অন্যতম কারণ বলে বর্ণনা করেছে। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

সেটি হল, অনেক নেতাই সম্পদ-নিষ্কাশন ও অন্য কারনের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করেন নি, যখন তাঁরা সম্পদ-নিষ্কাশন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন যেমন সোচ্চারে এই নিষ্কাশনের নিন্দা করেছেন, তেমনি যখন ভারতের দারিদ্রের অন্য কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন একই ভাবে নিন্দাবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

জাতীয় নেতৃত্ব কেন নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছেন যে এদেশের দারিদ্রের মূল কারণ সম্পদ-নিষ্কাশন অথবা কেন তাঁরা সম্পদ-নিষ্কাশনকে ক্ষতিকর এবং সর্বনাশা বলে মনে করেছিলেন, তার পিছনে অর্থনৈতিক যুক্তি কী ছিল, সেটা সম্ভবত ততটা পরিচিত নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন : ভারতীয় নেতারা সম্পদ-নিষ্কাশনকে শুধুমাত্র এদেশের সম্পদের ক্ষয় হিসেবেই দেখেননি, তাঁরা বুঝেছিলেন এর ফলে এ-দেশের মূলধন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছিল। তাঁরা যে সম্পদ-নিষ্কাশনের তত্ত্বটিকে উপস্থিত করেছেন তা শুধু অর্থ অথবা পণ্যাদির রপ্তানীর সঙ্কীর্ণ ধারনাতেই সীমিত ছিল না, তাঁদের এই তত্ত্বের পিছনে আরও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক যুক্তি ও ভাবনা চিন্তা কাজ করেছে। সম্পদ-নিষ্কাশনের ফলে এদেশের সম্পদ হ্রাস অথবা জাতীয় উৎপন্নের একটা অংশ বিদেশে স্থানান্তরিত হওয়া অথবা 'জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার মতো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি' প্রভৃতি ধারণা নিষ্কাশনের সংজ্ঞার্থের মধ্যেই নিহিত আছে। এই অর্থেই সাধারণ মানুষ নিষ্কাশনকে বুঝেছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেক অর্থনীতিবিদ এই ভাবেই নিষ্কাশনের ধারনাটিকে প্রচার করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, সম্পদ-নিষ্কাশনের ফলে যদি অন্য কোনো ক্ষতি দেখা নাও দিত তাহলেও শুধুমাত্র জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাসের জন্যই এই সম্পদ-নিষ্কাশনকে একটি প্রধান ক্ষতিকর ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত করা যেত।

কিছু ভারতীয় নেতা এটাও ধরতে পেরেছিলেন যে, বিদেশে জাতীয় সম্পদ স্থানান্তরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল এদেশের আয় এবং কর্মসংস্থানের উপর। সম্পদ-নিষ্কাশনের ফলে যে শুধু এদেশের জাতীয় একটি অংশ বিদেশে ব্যবহৃত হচ্ছিল তাই নয়, এর ফলে কর্ম সংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষতি হচ্ছিল, কেননা ঐ সম্পদ স্বদেশে ব্যয়িত হলে নতুন আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ হতে পারত। এই কারণেই ১৯০৩ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত নিম্নোধৃত মন্তব্যটি করেছিলেন—

'একটি দেশে আদায় করা কর সেই দেশেই ব্যবহৃত হলে ঐ অর্থ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় যায় ফলে শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি ফলবতী হয়ে উঠতে পারে এবং ব্যয়িত অর্থ কোনো-না কোনো রূপে আয় হিসেবে সাধারণ মানুষের

হাতে পৌঁছয়। কিন্তু যদি একটি দেশের কর রাজস্ব বিদেশে চালান করা হয় তাহলে সেই দেশটি ঐ পরিমাণ অর্থ থেকে চিরকাল বঞ্চিত হয়, তার শিল্প ও বাণিজ্য নতুন উৎসাহ পাওয়ার সুযোগ হারায় অথবা সেই অর্থ কোনভাবেই সেই দেশের জনসাধারণের হাতে পৌঁছয় না।'

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অন্য কিছু ভারতীয় নেতারা জর্জ উইনগেটের নিম্নোক্ত সুপরিচিত উক্তি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে দেশের কর রাজস্ব বিদেশে ব্যয়ের এই অর্থনৈতিক ফলাফলটিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

'একটি দেশের কর রাজস্ব সেই দেশেই ব্যয়িত হওয়া এবং অন্য দেশে ব্যয় করার অর্থনৈতিক ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত অর্থ সেই দেশেরই সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত জনসাধারণের একাংশের হাতে পৌঁছয় এবং তারা সেই অর্থ ব্যয় করার ফলে তা আবার ফিরে আসে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রেণীগুলির হাতে। কিন্তু কোনো কররাজস্ব অন্য দেশে ব্যয়িত হলে ফল হয় বিপরীত। সেক্ষেত্রে বিদেশে ব্যয়িত এই অর্থ পুরোপুরি ক্ষতি কেন না কর রাজস্ব থেকে পাওয়া সম্পদের ঐ অংশটির অবলুপ্তি ঘটে। জাতীয় উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে সে টাকাটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে যা হতো এক্ষেত্রেও তাই হবে।'

ভারতীয় নেতারা পুরনো স্বৈরাচারী শাসকদের সময় এবং ব্রিটিশ শাসনকালে যেভাবে স্পষ্ট পার্থক্য করেছিলেন এই ঘটনা তা সমর্থন করে। যেমন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০২ সালে দেখিয়েছেন যে, 'ইংরেজরা এদেশে আসার আগে যেসব বিদেশী আক্রমণকারী ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করেছিল তারা অল্পদিনের মধ্যেই এদেশটিকে তাদের নিজেদের দেশ করে নিয়েছে এবং ফলে এদেশের মানুষের কাছ থেকে লুণ্ঠিত অর্থ আবার ভারতবাসীর হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এইভাবে এইসব বিদেশী শাসকেরা ভারতবর্ষের শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করেছিল এবং ভারতবাসীর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল।' রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর "অর্থনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় একই কথা আরও প্রাঞ্জল করে উপস্থিত করেছিলেনঃ 'কবির ভাষায় বলা যায় আগেকার রাজারা যে কর আদায় করতেন তা ছিল সূর্য কর্তৃক শুষে রাখা বাষ্পের মতো, যা বৃষ্টিরূপে ফিরে এসে এদেশের মাটিকে উর্বর করে তুলত কিন্তু এখন ভারতবর্ষের মাটি থেকে শোষিত বাষ্প বৃষ্টি হয়ে ভারতবর্ষের মাটিকে উর্বর না করে উর্বর করছে অন্য দেশের মাটিকে।' এই ঘটনার বিরোধিতা ক'রে রমেশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে এমনকি নিকৃষ্ট আফগান অথবা মুঘল সম্রাটদের সময় এরকম হয়নি। বরং 'তারা যেসব বিলাসবহুল প্রাসাদ এবং স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নির্মাণ করেছে সেজন্য এবং আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয়ে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করত বরং তিনি পাল্টা দাবি করেন যে সকল বিশাল বিশাল

রাজপ্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ তারা নির্মাণ করেছিলেন এবং যে বিলাস ব্যসন তারা উপভোগ করতেন তার মাধ্যমে ভারতের শ্রমিক ও কারুশিল্পীরাই পরিপুষ্ট ও অনুপ্রাণিত হত।' তাই তিনি প্রত্যয়ের সাথে বলেন, 'বুদ্ধিমান শাসকের মত, বোকা রাজার রাজত্বেও সংগৃহীত রাজস্ব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়ে তাদের শিল্প ও বাণিজ্যের মঙ্গল সাধন করত।'

জাতীয়তাবাদীদের দাবি ছিল, জনসাধারণের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের অনুমতি দেওয়া হোক এবং এর দ্বারা 'জনগণের মঙ্গল সাধিত হোক', অথবা 'তাদের শিল্প ও বাণিজ্যের মঙ্গল সাধিত হোক।' বিশেষ লক্ষণীয় এই যে রাজস্বকে আভ্যন্তরিণ খাতে ব্যয়ের ফলে পরোক্ষ আয়ের যে সুফল এই দাবির মধ্যেই সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিহিত আছে।

দাদাভাই নৌরজী নিষ্কাশনের সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করেন। বিদেশীরা নিজেদের বেতন ও আয়ের যে-অংশ ভারতবর্ষেই খরচ করেন, তার বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি হল, বিদেশীরা ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে বলেই ভারতীয়দের আংশিক ক্ষতি হয়। কারণ ভারতীয়দের ভোগ্য বস্তুই তারা ভোগ করে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অর্থনীতিবিদরা শংকিত হয়ে পড়েছিলেন এই কারণে যে এই নিষ্কাশনের ফলে সংপদের চেয়ে পুঁজির অপচয় হচ্ছিল অনেক বেশী। তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, এই নিষ্কাশন অত্যন্ত ক্ষতিকর কেননা এর ফলে ভারতের লগ্নীপুঁজি বাইরে চলে যাচ্ছে। নিষ্কাশনের সমালোচনার প্রশ্নে, প্রথম থেকেই দাদাভাই নৌরজী তাঁর বিশ্লেষণে এই দিকটার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নিষ্কাশন-সম্পর্কিত প্রায় সব বিবৃতিতেই তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে পুঁজি নির্গমনের দিকটি তুলে ধরেছিলেন। বস্তুতঃ এটাই তাঁর নিষ্কাশন তত্ত্বের মূল দিক। অবশ্য নিষ্কাশন তত্ত্বের এই দিকটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ফলতঃ দাদাভাইয়ের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর অবদানকে অবজ্ঞা করা হয়। একজন মহান ব্যক্তি হিসেবেই তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁকে এক মহান জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে দেখানো হয় যিনি অর্থনৈতিক বিষয়ে নিছকই অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ এবং নিতান্তই নির্বোধের মত মনে করতেন যে কয়েক হাজার ইংরেজকে টাকা দিলেই বুঝি ভারতবর্ষের মত এত বিশাল একটি দেশের সম্পদ হু হু করে কমে যাবে। নিষ্কাশনের তত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যার প্রশ্নে এই খামতি দেখেই আমি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের, বিশেষতঃ দাদাভাইয়ের নিষ্কাশনের তত্ত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সবচেয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় স্তরের বহু নেতাই সচেতন-ভাবে এই মত পোষণ ও প্রচার করতেন যে নিষ্কাশন দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক

কারণ এর ফলে দেশের সঞ্চিত পুঁজির একটা বিরাট অংশ বিদেশে চলে যায় এবং দেশের পুঁজির সঞ্চয় নিয়ন্ত্রিত ও বাধা প্রাপ্ত হয়।

১৮৯৭ সালেই দাদাভাই তাঁর 'পূর্ব' ভারত অর্থনীতি বিষয়ক সিলেক্ট কমিটিকে প্রদত্ত বিবৃতিতে' অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

> অন্যান্য দেশ যে রাজস্ব আদায় করে, যেমন ইংল্যান্ড করে সাত কোটি পাউন্ড, তার পুরোটাই জনসাধারণের কাছে ফিরে আসে এবং দেশের মধ্যেই থেকে যায়। ফলে যে জাতীয় পুঁজির উপরেই দেশের উৎপাদন নির্ভরশীল তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অপর দিকে যেহেতু ভারতবর্ষ বিদেশ-শাসনাধীন, তার পাঁচ কোটি পাউন্ড বার্ষিক আয়ের ১'২ কোটিরও বেশী পাউন্ড ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে জাতীয় পুঁজি বা পক্ষান্তরে উৎপাদন ক্ষমতা বছরের পর বছর ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

'দি পভার্টি অব ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে দাদাভাই উপরোক্ত ধারণাকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ হল, নিষ্কাশনের ফলে চলতি জাতীয় পুঁজির ওপরেই যে শুধু কোপ পড়ছে তা-ই নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় পুঁজির বর্তমান ভান্ডারও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। উপরোক্ত প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তরে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সার্ভিস ও নিষ্কাশনকে ইওরোপীয় করণের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন এবং তিনি জোরের সাথে বলেছিলেন দেশের পুঁজি বাঁচিয়ে কৃষি ও অন্যান্য শিল্পকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রগতিবজায় রাখতে সমর্থ করার থেকেই ভারতীয়দের বেশী করে উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে, ১৮৮৭ সালে এম ই গ্রান্ট ডাফ-এর প্রত্যুত্তরে দাদাভাই অভিযোগ করেন, 'বর্তমান নীতির বলে দেশের যৎসামান্য আয় থেকে অবিরাম নিষ্কাশন হচ্ছে বলেই ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে নিজের বলতে কোন সঞ্চয় হচ্ছে না।' ১৮৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী হাউস অব কমনস-এ ভাষণ প্রদানকালে তিনি ঘোষণা করেন যে নিষ্কাশনের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ থেকে পুঁজি সরে যাচ্ছে এবং 'ভারতবাসীদের পুঁজি সঞ্চয়ে বাধা দেওয়া হচ্ছে।' বস্তুতপক্ষে, 'ইংল্যান্ডের এই বাধ্যতামূলক সুবিধা প্রাপ্তির ফলেই ব্রিটিশাধীন ভারতবাসীদের সম্পদ শুকিয়ে যাচ্ছে। তারা আর কোন পুঁজি গড়ে তুলতে পারবে না এবং দারিদ্র ক্লিষ্ট জীবন-যাপনে বাধ্য হবে।' ওয়েলবি কমিশনের কাছে সওয়াল জবাব চলার সময়ে দাদাভাই বারবার নিষ্কাশনের জন্য পুঁজি হ্রাসের দিকে কমিশনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সমালোচকদের কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা ক'রে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে যদি 'ভারতবর্ষ'কে পুঁজি সঞ্চয় করার মত কোন অবস্থায় আনা যায়,' তবে ভারতবাসীরা 'যথার্থ' অর্থ" প্রদানে কোনই আপত্তি তুলবেন না।

ওয়েলবি কমিশনের চেয়ারম্যানের সার্থে সুদীর্ঘ বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে দাদাভাই নিষ্কাশনকে পুঁজি গঠন ও আয় বৃদ্ধির সাথে এমন দক্ষতার সাথে যুক্ত করেছিলেন যে প্রত্যেকটি চিত্র পরিষ্কার ও নাটকীয় ভাবে ফুটে উঠেছিল। এখানে দাদাভাই ভারতবর্ষের মত একটি অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের সাথে সাথেও আয় বৃদ্ধির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে অগাধ জ্ঞান এবং অসম্ভব দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই বিতর্ককে আমরা একে একে আলোচনা করব।

সওয়াল জবাবের গোড়ার দিকে দাদাভাই বলেছিলেন ভারতবর্ষের সুদক্ষ ও প্রগতিশীল সরকারের কাছে দেশের ৬৮০ মিলিয়ন টাকার কর-রাজস্ব খুবই অকিঞ্চিৎ। অস্বাভাবিক সরকারী নিয়মকানুনের জন্যই দেশের মানুষ আরও গরীব হচ্ছে এবং সরকারকে অধিক পরিমাণে কর দিতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। এরই ফলস্বরূপ আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ এত কম। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে ভারত যদি 'বিদেশীদের দ্বারা শোষিত না হয়ে নিজের সম্পদ ঘরে রাখতে পারত', তাহলে প্রয়োজনে ২০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত কর দিতে পারত। লর্ড ওয়েলবি এই যুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। তিনি জানতে চান 'শুধু মাত্র একটি স্বাধীন সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে' একটি দরিদ্র দেশ তার মাথাপিছু রাজস্বকে ২ টাকা ১০ আনা থেকে (৩ শিলিং ৮ পেনি থেকে), ১ পাউন্ড ৬ শিলিং ৬ পেনিতে নিয়ে যেতে পারে? দাদাভাই উত্তরে বলেন, 'আজকের দরিদ্র দেশই ধনী হয়ে উঠবে যদি সে তার সম্পদ ধরে রাখতে পারে।' ওয়েলবি এই যুক্তি বোঝেন নি বা বুঝতে চাননি। তিনি প্রশ্ন করেন, যেহেতু দাদাভাই-এর আপত্তি কেবল সেই ২০০ মিলিয়ন টাকার উপরে যা ইওরোপীয় সৈন্য ও আমলাখাতে ব্যয় করা হয়, সেই টাকা যদি ভারতীয়দের ফিরিয়েও দেওয়া যায়, তাহলে কিভাবে মাথা পিছু বাৎসরিক রাজস্ব ২ টাকা থেকে বেড়ে ১ পাউন্ড ৬ শিলিং ৬ পেনিতে বা ৬৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে? এই প্রশ্নের উত্তরে দাদাভাই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে নিষ্কাশণ রোধ বলতে সরাসরি সম্পদ বিনিময়ের ধারণাটা ভুল। তিনি বুঝিয়ে বলেন, 'দেশ থেকে যা নিষ্কাশিত হচ্ছে তা যদি দেশের অভ্যন্তরেই থাকে, তবে সেই সম্পদের বলে দেশ আরও ধনী হয়ে উঠবে।' পক্ষান্তরে দেশের লভ্যাংশ কেবল মাত্র ২০০ মিলিয়ন টাকার মধ্যেই সীমিত থাকবে না। এতেও ওয়েলবি সন্তুষ্ট হন নি বরং তিনি প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু আপনি তো ভারতবর্ষকে ২০০ মিলিয়ন টাকার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারছেন না?' দাদাভাই প্রত্যুত্তরে বলেন, 'দেশের অভ্যন্তরে এই টাকা থাকলে বর্তমানের চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও উন্নত হবে। এর দ্বারা কেবলমাত্র ২০০ মিলিয়ন টাকারই সঞ্চয় হবে না, বরং এর দ্বারা দেশের উৎপাদন ক্ষমতা সঞ্চিত হবে, টাকায় টাকা বাড়বে।' কিন্তু 'টাকায় টাকা বাড়া' বলতে দাদাভাই দিদিমার পয়সা বাড়ার মত যান্ত্রিক অর্থে

বছর বছর চক্রবৃদ্ধিহারে টাকার সুদ (বা লাভ) বাড়ার কথা বোঝান নি। যদিও তাঁর প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্ব ও অংকের হিসাব খুব পরিষ্কার ছিল না, বরং কখনও সখনও সারশূন্য, এখানে তিনি বিনিয়োগ-অর্থনীতির বিকাশ প্রক্রিয়ার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি যে অর্থনৈতিক বিকাশের আধুনিক তত্ত্বগুলোকেই প্রায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা-ই নয়, সম্ভবতঃ তিনি বিনিয়োগ গুণিতকের তাত্ত্বিক দিকেরই প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করছিলেন। তাই যখন ওয়েলবি প্রতিবাদ করে বলেন: 'কিন্তু এই ২০০ মিলিয়ন টাকা দেশে থাকলে শুধু কিঞ্চিৎ সুদেই বাড়বে ' দাদাভাই প্রত্যুত্তরে বলেন; 'সুদই শেষ কথা নয়। এই টাকা দেশের উৎপাদন ক্ষমতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করবে এবং বর্তমানের চেয়ে দেশ অনেক অনেক বেশী সম্পদশালী হয়ে উঠবে। বাস্তবিকপক্ষে, দেশ থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে তা যদি দেশেই সঞ্চিত হয় তবে সেই সম্পদের বলে দেশ ধনী হয়ে উঠবে। এই টাকা হল পুঁজি, দেশের রক্ত।' ওয়েলবি তবুও ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আমি শুনে আনন্দ পাচ্ছি যে ভারতবর্ষ এতই সমৃদ্ধশালী যে সে মাত্র ২০০ মিলিয়ন টাকা মজুত করে বছরে ২০০০ থেকে ৩০০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত উৎপাদন করবে।' দাদাভাই অতি সহজেই সেই মন্তব্য নস্যাৎ করে দেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে তিনি কখনই বলেন নি যে সেই ফল এক বছরেই ফলে যাবে। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে যদি নিষ্কাষণ বন্ধ করে দেওয়া যায়, ভারতবর্ষ 'ঠিক সময়ে' সমস্ত কর মিটিয়ে দিতে পারবে - করের পরিমাণ ২০০০ মিলিয়ন বা ৩০০০ মিলিয়ন টাকা যাই হোক না কেন। এই বাদবিতণ্ডার পরও ওয়েলবি আরও দু-তিন বার দাদাভাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে তিনি যে মনে করছেন সামান্য ২০০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চয় করলেই সেই টাকা এত বিরাট একটা অংকে পরিণত হবে তা অবাস্তব ও আজগুবি। কিন্তু দাদাভাই নিজ বক্তব্যে অটল ছিলেন।

ভি. ভি. যোশীও নিষ্কাশনকে পুঁজির অপচয় বলে মনে করতেন। এবং এই বিষয়েও তিনি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণায় একটি নতুন দিকের সংযোজন ঘটান। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন যে, যদিও বার্ষিক গ্রস জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত যথেষ্ট বেশী, তবুও নিষ্কাশনকে সেই অনুপাত হিসেবে দেখা ঠিক হবে না, বরং একে দেখতে হবে বার্ষিক নীট উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়ের অনুপাত হিসেবে। তাই ১৮৮৪ সালে লিখিত 'মুক্ত বাণিজ্য ও রেলপথ বিস্তার' প্রবন্ধে তিনি হিসাব করে দেখান যে ১৮৮২ সালে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী হয়েছিল ২৩ কোটি টাকা বেশী, ভারতবর্ষের গ্রস বার্ষিক উৎপাদন হয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকার এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক হার ১২ শতাংশ মুনাফা হয়েছিল ৪০ কোটি টাকা। সুতরাং জাতীয় উৎপাদনের নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল 'জাতীয় উৎপাদনের মোট মুনাফার অর্ধেকেরও বেশী'। ছয় বৎসর পরে 'ভারতের

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' প্রবন্ধে জি. ভি. যোশী নিম্নলিখিত ভাষায় এই মূল্যায়ণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন :

> দেশের বার্ষিক গ্রস আয়ের অনুপাতে, যা প্রায় ৬ শতাংশ, নিষ্কাশনের পূর্ণ মূল্যায়ণ করা যায় না। এই মূল্যায়ন করতে হবে দেশীয়কর্মীদের বাৎসরিক ভরণপোষণের প্রয়োজন মিটিয়ে দেবার পর যে নীট আয় হবে তার অনুপাতে। এবং এই অনুপাত হল প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আমাদের নীট জাতীয় আয়ের ঠিক এক তৃতীয়াংশ দেশের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বিদেশী দায় মেটাবার জন্য এবং এর বিনিময়ে আমরা কোন অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছি না। এটা অবশ্যই দেশের একটি বিরাট ক্ষতি এবং এরই ফলে দেশের পুঁজির সঞ্চয় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।'

ডি. ই. ওয়াচা ও জি. এস. আয়ার সহ অন্যান্য অনেক জাতীয় নেতাও এই পর্যাপ্ত পরিমান পুঁজির দেশান্তরিত হওয়ার দরুণ যে নিষ্কাষণ সেই বিষয়ে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, বেশ কিছু ভারতীয় নেতাদের বক্তব্য ছিল, নিষ্কাষণের ফলে দেশের পুঁজি কমে যাচ্ছে এবং ফলতঃ দেশের শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, অথচ এরই উপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের অর্থনীতির স্বাধীনতা। বস্তুতঃ তাঁদের ধারণা, ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অতি ধীর বিকাশের মূল কারণই হল নিষ্কাশন। তাই দাদাভাই নৌরজী তাঁর 'ভারতবর্ষের দারিদ্র' প্রবন্ধে এই বক্তব্য পেশ করেন যে যদিও বৃহদাকারে শিল্পায়নই ভারতবর্ষের সবচেয়ে আশু প্রয়োজন, বাস্তবে মজুত পুঁজির পরিমাণের উপরেই শিল্পায়ন নির্ভরশীল। কারণ, তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের উদ্ধৃতি দেন, 'শ্রম জাত দ্রব্যের প্রতি ক্রেতার চাহিদা নয়, যে-পুঁজির বিনিময়ে উৎপাদিকা শ্রমকে কর্মক্ষম করা যায় সেই পুঁজিই ঐ শ্রমের পালক ও নিয়োগকারী।' আর যেহেতু ভারতবর্ষে পুঁজির ঘাটতি আছে, কারণ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে যে সামান্য উদ্বৃত্ত হয় তা-ও নিষ্কাশিত হয়ে যায়, শিল্পকে এখানে সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগানো যায় নি। ফলে দেশ ক্রমশই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। ১৮৮১ সালে এই মর্মে যুক্তির পুনরুত্থাপন করে তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন, 'একদিকে ইংরেজরা এই পুঁজি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তারা হাত উঁচিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে কেন ভারতবর্ষে শিল্প গড়ে উঠছে না।' অনুরূপভাবে, ওয়েলবি কমিশনের কাছে সওয়াল-জবাবের সময় তিনি আপত্তি তুলে বলেন যে ভারতীয়দের পুঁজি বিনিয়োগের অনীহার জন্যই যে ভারতবর্ষে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না এ কথা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আসল কথা হল ভারতীয়দের মজুত পুঁজি খুবই অপর্যাপ্ত। এই পুঁজির বলে 'ভারতবর্ষ' নিজ সম্পদকে স্বাধীন

ভাবে বিনিয়োগ করে নিজের মঙ্গলার্থে নিজের সম্পদের বিকাশ সাধন করতে পারে না।' যদি ভারতবর্ষ ফি বছর তার পুঁজি থেকে বঞ্চিত না হত, তাহলে সে নিশ্চয়ই তার সম্পদের বিকাশ সাধন করতে পারত। পরবর্তীকালে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটি ভাষণে দাদাভাই ঘোষণা করেন যে ভারতের পুরাতন শিল্পগুলির বিলোপের জন্যও এই নিষ্কাশন আংশিকভাবে দায়ী। 'গ্রেট ব্রিটেন তাদের প্রাণরস শুষে নিচ্ছে এবং তারা আর তাদের শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না কারণ সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন উপায় তাদের কাছে নেই।'

জি. ভি. যোশীও ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অপ্রতুলতার আংশিক কারণ হল বড় পরিমাণ পুঁজির মজুতের অভাব এবং তারও আংশিক কারণ হল ভারতবর্ষ থেকে বিটেনে পুঁজির নিষ্কাশন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'কোন দেশই এই ধরণের নিষ্কাশন সহ্য করে শিল্পক্ষেত্রে নিজের আসন টিকিয়ে রাখতে পারে না।' অনুরূপভাবে, ডি. ই. ওয়াচাও মনে করতেন যে যেহেতু পুঁজি থেকেই পুঁজি বাড়ে এবং শিল্পও পুঁজির উপরেই নির্ভরশীল, যতদিন ভারতবর্ষ থেকে পুঁজি নিষ্কাশিত হয়ে যাবে ততদিন সে কোন নতুন শিল্প-উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না। নিজের বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ তিনি জাপানের উল্লেখযোগ্য শিল্প বিকাশের কথা বলেন, যেখানে 'সম্পদের জাতীয় উদ্বৃত্তের বার্ষিক নিষ্কাশনের সেই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়াটি' অনুপস্থিত। ওয়েলবি কমিশন যখন জি. কে গোখলের সঙ্গে আলোচনায় বসে তখন দাদাভাই ও গোখলের মধ্যেকার প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে নিষ্কাশন ও শিল্পায়নের অভাবের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। গোখলেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন ভারতীয়রা নতুন শিল্প গড়ে তুলছে না :

দাদাভাই : কি কারণে চা বা ঐ ধরনের শিল্প বা প্রতিষ্ঠান সমূহ তারা ধরতে পারল না, অথচ বিদেশীরা এসেই সেসব কব্জা করে নিল; আমাদের দেশ থেকে পুঁজি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেই কি এসব হয়নি ?

গোখলে : হ্যাঁ, ঠিক সেই কারণেই।

দাদাভাই : এটাই কি সব কিছুর মূল নয় ?

গোখলে : হ্যাঁ, এটাই সব কিছুর মূল।

কতিপয় ভারতীয় নেতা আরও উল্লেখ করেন যে, নিষ্কাশনের ফলে ভারত যেমন পুঁজিশূন্য হচ্ছে, অতীতে এটাই ছিল ইংল্যাণ্ডে পুঁজি জমে ওঠার প্রধান কারণ। সেখানে টাকায় টাকা বেড়েছে এবং তা দেশের দ্রুত শিল্পায়নে সাহায্য করেছে।

এই বিষয়ে লক্ষ্যণীয়, দাদাভাই নৌরজী ও পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ মোটামুটিভাবে

যে বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন তা হল, তাঁদের মতে যা নীট জাতীয় উদ্বৃত্ত তা আপনা আপনি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে না এবং তেমনটি ঘটবার আগে দুটি ত্রুটি শোধরাতে হবে। প্রথমতঃ সঞ্চয়ী শ্রেণীর চোখ ধাঁধানো ভোগবিলাস ও পুঁজি মজুত রাখার বা অশৈল্পিক, অনুৎপাদক ক্ষেত্রে লগ্নী করার ঝোঁকের ফলে দেশের অভ্যন্তরে যে নিষ্কাশন হয়েছিল সে বিষয়টিকে তাঁরা অবজ্ঞা করেছিলেন। ওয়েলবি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান কালে দাদাভাই যৎকিঞ্চিৎ হলেও সমস্যাটির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে ভারতের কয়েকটি রাজ্যের শাসকদের নিজ সঞ্চয় মজুত রাখার ঝোঁকের সমালোচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ভারতে জনসাধারণের জন্য ঋণপত্র চালু করার জন্য জি. ভি. যোশী সরকারের সমালোচনা করেছিলেন, কারণ এর ফলে দেশের লগ্নীযোগ্য পুঁজি নিষ্কাশিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ও ১৮৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারীর বেঙ্গলী পত্রিকায় বাংলার জমিদারী প্রথার সমালোচনা করা হয়, কারণ এই প্রথায় বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত পুঁজি জমিতে লগ্নী করা হচ্ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতীয় নেতৃত্বের এই অংশ পুঁজি গড়ে ওঠার সমস্যার এই দিকটিকে অবজ্ঞা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেননি যে আর্থিক উদবৃত্তকে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত করার পূর্বে কারিগরী, পুঁজি সংগঠন, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রশিল্পের দক্ষতা প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ, আমরা পূর্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে ক্ষেত্র বিশেষে অন্য অনেক ভারতীয় নেতৃত্ব এই সমস্যাবলীর দিকে নজর দিয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে এই সব সমস্যাগুলিকে কম মূল্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ দাদাভাই নৌরজী সার্বিক ঘৃণা ভরেই এইগুলিকে অবজ্ঞা করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল, নিষ্কাশন বন্ধ করা এবং ফলতঃ পুঁজি উৎপন্ন হওয়াই হল প্রধান কাজ। এটি সম্পন্ন হলেই অন্যান্য কাজগুলি করা সম্ভব হবে।

নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে দাদাভাইয়ের আর একটি অভিযোগ হল এর ফলে বিদেশী পুঁজির পক্ষে ভারতবর্ষকে ভেতর থেকে শোষণ করা সুগম হচ্ছে। তাঁর মতে দুই ভাবে এই কাজটি করা হচ্ছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পুঁজি সঞ্চয়ে বাধা প্রদান করে এবং আভ্যন্তরীণ পুঁজিকে নিঃস্ব করে দিয়ে নিষ্কাশন বিদেশী পুঁজিপতিদের এদেশে আসার রাস্তা করে দিচ্ছে। আর যেহেতু তারা কোনও দেশীয় প্রতিযোগীর সম্মুখীন হচ্ছে না, তারা হয়ে উঠছে একচেটিয়া এবং তারা ভারতবর্ষে সকল ভোগ্যসম্পদ থেকে ফয়দা কুড়িয়ে নিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, নিষ্কাশনই হ'ল ভারতে বিদেশী লগ্নীপুঁজির মজুতের প্রধান উৎস। কারণ নিষ্কাশনের একটি বিরাট অংশই ভারতে বিদেশী পুঁজি

হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। দাদাভাই ঘোষণা করেন, এক্ষেত্রে ভারতে ইউরোপীয় সার্ভিসগুলো হল দুমুখো শয়তান। একদিকে এগুলো ভারতীয় বেতনভুক শ্রেণীদের হাতে পুঁজি মজুতে বাধা প্রদান করত ও ইওরোপীয় অফিসারদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিদেশী পুঁজির বিকাশে মদত যোগাত, অপরদিকে তারা বৃটিশ পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষা করত।

নিষ্কাশন তত্ত্ব এবং অত্যাধিক ভূমি-রাজস্বের ফলেই দেশের দরিদ্র হয়ে পড়ার তত্ত্ব—আর. সি. দত্ত এই দুই তত্ত্বকেই সোচ্চারে তুলে ধরেছিলেন। তিনি এই দুই তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভূমি-রাজস্ব থেকেই মূলতঃ নিষ্কাশন ঘটছে। তাই নিষ্কাশনের ফলে চাষীরা আরও বেশী বেশী করে গরীব হয়ে পড়ছে। তাই ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেন যে ১৯০০-০১ সালে স্বরাষ্ট্র বেতনই ছিল প্রায় মোট ভূমি-রাজস্বের সমান সমান। সেই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে তিনি এই দুইয়ের মধ্যেকার আরও জটিল অর্থনৈতিক সম্পর্কটি প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, আর্থিকভাবে গণ-রাজস্ব থেকেই প্রত্যক্ষভাবে এই নিষ্কাশন হত আর এই গণ-রাজস্বের মূল অংশই হ'ল ভূমি-রাজস্ব। নিষ্কাশনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ ভূমি-রাজস্ব বা ভাড়া মেটাতে চাষীরা নিজ উৎপন্ন ফসলের বড় অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হত। এই ফসল রপ্তানী করা হ'ত, কারণ দেশের প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত রপ্তানীর দরকার ছিল এবং কঠোর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম থেকে আদায়ীকৃত কৃষি পণ্য বিক্রি করারও প্রয়োজন ছিল। এইভাবে ভূমি-রাজস্বের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষীরা নিষ্কাশনের মূল্য ও কৃষি-পণ্যের বিদেশী রপ্তানীর জোগান দিতে বাধ্য হ'ত। ফলতঃ, একদিকে সে কঠোর ও উচ্চ ভূমি-রাজস্ব মেটাতে গিয়ে গরীব হচ্ছে, অপরদিকে, ভূমি-রাজস্ব ও নিষ্কাশনের যৌথ চাপে পড়ে খাদ্য-শস্য বিক্রি করতে ও দেশের রপ্তানীর জোগান দিতে বাধ্য হ'য়ে না খেতে পেয়ে শুকোতো।

পূর্বে ১৯০১ সালে তিনি দাদাভাই নৌরজীর বন্ধুত্বমূলক সমালোচনার মোকাবিলায় নিষ্কাশন ও ভূমি-রাজস্বের মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ সূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ দাদাভাই নৌরজী সমালোচনা করে বলেন যে, ভারত-বর্ষের দারিদ্রের কারণই হ'ল ভূমি-রাজস্ব, এ কথা জোর দিয়ে বলেই তিনি দেশের জনগণকে দেশের দারিদ্রের জন্য দায়ী নিষ্কাশন নামক মূল কারণ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ১৯০১ সালের ২৪ মে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দের এক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি ভারতে ভূমি-কর হ্রাস করার দাবি জানান। তিনি দাবি করেন যে এই প্রস্তাবটি আসলে পূর্বেকার নিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রস্তাবেরই পরিপূরক। তিনি বলেন যে দাদাভাই যেমন ভারতের

রাজস্বের একটি বিরাট অংশের বার্ষিক নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছেন, তিনি নিজেও দেখাতে চান যে রাজস্বের একটি বিরাট অংশ তোলা হচ্ছে ভারতের কৃষকদের কাছ থেকে যারা 'গরীবের চেয়েও গরীব।' তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি ও দাদাভাই দুটি ভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন না, বরং একই প্রশ্নের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করছেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল, 'আমরা দুটি ভিন্ন সংস্কারের দাবি করছি না। আমরা একটিই সংস্কার দাবি ক'রে ভেতর ও বাইরে থেকে এর প্রয়োজন তুলে ধরছি।' তিনি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেন যে 'ভূমি-করের সংস্কার না করা হলে বার্ষিক অর্থনৈতিক নিষ্কাশন কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না এবং যতক্ষণ না অর্থনৈতিক নিষ্কাশন হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ ভূমি-করেরও সংস্কার হবে না।' অনুরূপভাবে ১৯০০ সালের ১ অক্টোবরের অমৃতবাজার পত্রিকা এই অভিমত ব্যক্ত করে যে একদিকে যেমন জমির বিষয়টা বেশী বড় দেখা খুবই খারাপ, তেমনি জমির বিষয়টিও আসলে নিষ্কাশন-নামক দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণেরই ফল।'

১৮৮৬ সালে ডি. ই. ওয়াচা কৃষির উপরে নিষ্কাশনের অপর একটি প্রভাবের উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে নিষ্কাশনের ফলে কৃষি সকল উৎপাদিকা পুঁজি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি বলিষ্ঠভাবে দেখান যে যতদিন পর্যন্ত 'সমগ্র জনসাধারণের লভ্যাংশ নিষ্কাশিত হবে' ততদিন পর্যন্ত জমির উৎপাদন বাড়বে না। কারণ এই বৃদ্ধি 'তখনই সম্ভব যখন জমির সব ক্ষেত্রে অল্প অল্প করে পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে। এই অল্প অল্প পুঁজি একত্রিত করলেই একটি বিরাট অংকে পরিণত হয়।'

বেশ কিছু ভারতীয় নেতা এমনও ভাবতেন যে সম্পদের একমুখী প্রবাহের ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়াও নিষ্কাশনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা সংগীণ হয়ে পড়ার মত পরোক্ষ ক্ষতিও সাধন করছে। যেহেতু নিষ্কাশনের সাথে রপ্তানী উদ্বৃত্ত জড়িত সেইহেতু তা ভারতবর্ষের রপ্তানীর উপরে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে : হয় ভারত রপ্তানী করবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলতঃ, ভারতকে রপ্তানী মূল্য কম করতে হল, যাতে করে বিদেশীরা ভারতীয় দ্রব্য কেনে। পক্ষান্তরে যে-শর্তে ভারত তার রপ্তানীর সাথে আমদানীর বিনিময় ঘটাত নিষ্কাশনের ফলে তা তারই বিরুদ্ধে চলে গেল।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে নিষ্কাশনের সমালোচনার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেই নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। 'ওয়েলথ অব নেশনস'-এ অ্যাদম স্মিথ ভারতের প্রথম দিকের শাসকবর্গকে 'ভারতের শোষক দস্যু' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে কার্ল মার্ক্স ও দাদাভাই নৌরজীর মত একই ভাষায় নিষ্কাশনের বর্ণনা দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি লেখেন :

'ইংল্যান্ডের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ঋণের ডিভিডেন্ড ও সুদ সহ এই অবসরকালীন ভাতা (ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারীকে দেয়) প্রতি বছর ভারত থেকে প্রায় পনের থেকে কুড়ি মিলিয়ন ডলার তুলে নিয়ে যায়। কার্যত এটাকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার প্রজাবর্গের শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে মনে করা যেতে পারে। বিভিন্ন কর্মস্থল থেকে প্রতি বছর যেসব ব্যক্তি অবসর গ্রহণ করেন, তারা নিজ বেতন থেকে সঞ্চিত বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভারতের বার্ষিক নিষ্কাশনের সাথে এই অর্থের পরিমাণ যুক্ত হয়ে যায়।"

এবং ১৮৮১ সালে তিনি লেখেন ঃ

শুল্ক, হিন্দুদের কাছে অপ্রয়োজনীয় রেলপথের ডিভিডেন্ড, সামরিক ও সিভিল সার্ভিস কর্মীদের পেনসন, আফগানিস্তান ও অন্যত্র যুদ্ধ প্রভৃতি বাবদ ইংরেজরা প্রতি বৎসর তাদের কাছ থেকে যা নেয় ভারতবর্ষে বসবাস করে তারা যা ভোগ করে ও বেহিসাবী কিছু নিয়ে যায় তা বাদ দিয়েও ভারতীয়রা ফি বছর যে পরিমাণ উপঢৌকন পণ্য ইংল্যান্ডে পাঠায়, শুধুমাত্র তার আর্থিক মূল্য হিসেব করলেই দেখা যাবে যে তার পরিমাণ ভারতের ৬০ মিলিয়ন কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের মোট রোজগারের চেয়েও বেশী! এ হল প্রতিহিংসা প্রসূত এক রক্তক্ষরা প্রক্রিয়া!

পরিশেষে আরও দুটি অর্থনৈতিক বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ নিষ্কাশনকে যদি অনাদায়ী সেবাখাতে ব্যয়ের মত সীমিত অর্থে বা সার্বিক রপ্তানী উদ্বৃত্তের মত ব্যাপকতম অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়, এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ খুবই উল্লেখযোগ্য—এই অর্থের পরিমাণ দাদাভাইয়ের হিসেবে, গণঋণের সুদ বাদে, ২৪ কোটি বা মরিসনের রপ্তানী উদ্বৃত্তের পরিমাণ ভিত্তিক হিসেব অনুযায়ী ৩০ কোটি বা অন্য যে পরিমাণই হোক না কেন, ভারতের নিম্ন জাতীয় আয়, অথবা ১৮৮১-২ সালের ৪৬'৮৬ কোটি এবং ১৯০১-২ সালের ৬০'৭৯ কোটি টাকার নীট গণশুল্কের তুলনায় খুবই উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, এটা আজ সর্বজনগ্রাহ্য যে নিজ অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার পূর্বে, অর্থাৎ বিকাশের যাত্রারম্ভে কোন দেশকে অবশ্যই পুঁজি আমদানীকারী হয়ে উঠতে হবে। পক্ষান্তরে সেই দেশের উদ্বৃত্ত আমদানী থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিকাশের পরবর্তী স্তরেই কেবল সেই দেশ উদ্বৃত্ত রপ্তানীর মাধ্যমে তার ঋণ মেটাবার অবস্থায় পৌঁছতে পারে, যদিও স্বল্প সময়ের মধ্যে এমনটি ঘটার সম্ভাবনার হার খুবই কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে একটি অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অনেক দেশ নিজ অর্থনীতির বিকাশ সাধনে উদ্যোগ নিয়েছে সেই সময়েও এমন একটি দেশের উদাহরণ পাওয়া যাবে না যেখানে রপ্তানী উদ্বৃত্তের সাথে সাথে এমনটি ঘটেছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই

এই দেশগুলির বাণিজ্য খতিয়ানে ঋণ থেকে গেছে। যেমনটি ঘটেছে বর্তমান ভারতবর্ষে—এবং এটিও যথার্থই একটি বিশেষ ঘটনা। বিপরীতক্রমে, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েকটি বছরের কথা বাদ দিলে, সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে ভারতবর্ষ পুঁজি রপ্তানী করে গেছে।

৪. নিষ্কাশনের হ্রাস

নিষ্কাশন-তত্ত্বের কিছু প্রবক্তার বিশ্বাস ছিল এই যে, যতদিন নিষ্কাশন হতে থাকবে, ততদিন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে না। অন্যদিকে, যদি ভারতবর্ষ একবার এই "নিষ্কাশনের" গর্ত থেকে উঠে আসতে পারে, বাকি সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটতে থাকবে।' অবশ্য অন্য অনেকে কিছুটা কম ভাবাবেগের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁরা মনে করতেন যে ভারতবর্ষের দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ দূর করার প্রয়োজনীয় শর্তগুলির অন্যতম হল নিষ্কাশনের হ্রাস।

এই বিষয়ে অন্য দুটি দিকের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দাদাভাইও একটি বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে বিদেশী শাসনের একান্ত অঙ্গস্বরূপই কিছুটা নিষ্কাশন থাকবে এবং সেই শাসনের অবসান ব্যতিরেকে এই নিষ্কাশন পুরোপুরি দূর করা যাবে না। স্বভাবতই আমাদের বিচার্য-কালে দাদাভাইয়ের মনে সেই ঘটনার সম্ভাবনার কথা জাগেই নি। দ্বিতীয়তঃ, দাদাভাই ও আর. সি. দত্ত ইংরেজদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে নিষ্কাশন রোধ করা গেলে ভারতে তাদের রপ্তানী বহুগুণ বেড়ে গিয়ে তাদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দাদাভাই বর্তমান বিচার্যকালে ব্রিটিশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান তীব্র রাজনৈতিক মতভেদের সুযোগ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। প্রথমে ১৮৯৩ সালে এবং পরে আবার ১৮৯৬ সালে ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, কেবলমাত্র 'উচ্চ শ্রেণীর কিছু মানুষই বর্তমানে ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত রকম সুযোগ ভোগ করছে।' পক্ষান্তরে, যদি নিষ্কাশন দূর করা যায়, ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার এত ব্যাপক হয়ে উঠবে যে 'ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রকে বহুকালের মধ্যে "বেকার" নামক কোন কিছুর কথা শুনতে হবে না।'

কিভাবে নিষ্কাশন হ্রাস করা যাবে? এই বিষয়ে জাতীয়তাবাদীদের উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত: নিষ্কাশনের কারণসমূহ দূর কর। যেহেতু এই কারণগুলি ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই নিষ্কাশনের দূরীকরণের জাতীয়তাবাদী দাওয়াই-এর বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য বেশী পাতা খরচ করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই আমি কেবল ঐ দাওয়াইগুলোর শুধুমাত্র উল্লেখ করব।

ঐ উপায়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়টি হল অসামরিক ও সামরিক চাকুরীগুলিকে ভারতীয়করণ করা এবং ফলতঃ 'যুক্তিসঙ্গত' মাত্রায় এর মধ্যেকার ইওরোপীয়বাদের হ্রাস ঘটানো। পূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছিল সেই মত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, দাদাভাই নৌরজী প্রায়শই নিষ্কাশন তত্ত্বকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন যে ভারতীয়করণই হল এই অসুখের একমাত্র ওষুধ। তিনি যখন তাঁর তত্ত্বকে আরও সংকীর্ণ করে বললেন যে ভারত ও ইংল্যাণ্ডে একই সাথে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা হওয়া এবং অচুক্তিবদ্ধ ও অধস্তন চাকুরী-পদের জন্য 'যথার্থ' প্রতিযোগিতাই হ'ল ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির যথাযথ শর্ত, তখন তাঁর তত্ত্ব আরও অবাস্তব ও হাস্যকর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নেতারা স্বরাষ্ট্র খাতে ব্যয় (Home charge) রদ করার দাবি জানিয়েছিলেন। কখনও সখনও নিষ্কাশনের সাথে সম্পর্কবিহীন ভাবেই এই পথের সুপারিশ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রখাতে ব্যয়কে বেশ কয়েক উপায়ে কমানো যায়। ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে যে উপায়টি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিল সেটা হল, ব্রিটেন এই বোঝার একটি বড় অংশ বহন করুক। স্বরাষ্ট্র খাতে ব্যয় কমানোর উপায় হিসেবে কতিপয় নেতা নিম্নলিখিত উপায় সুপারিশ করেন : ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারতের গণঋণের সুদের বোঝা কমানো, গণঋণেরই বোঝা কমানো এবং সুনিশ্চিত রাজ আশ্বাস প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই ঋণের উপরে ধার্য সুদ কমানো, ইংল্যাণ্ডে নয় বরং ভারতবর্ষে গণঋণ সংগ্রহ করা রেলপথ নির্মাণের গতি কমিয়ে রেলপথ সংক্রান্ত ঋণের বোঝা কমানো, ভারতবর্ষ থেকেই সরকারী দপ্তরী দ্রব্য ক্রয় করা, ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন করা যাতে করে অপ্রয়োজনীয় আমদানি বন্ধ করা যায়, এবং ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্ক পুঁজি আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা। নিষ্কাশন হ্রাসের উপায় হিসেবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় সুপারিশ করেন, সেটি হল ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে মজুরীর মধ্যে সংগতি সাধন করা।

৫. নিষ্কাশন-তত্ত্বে অবিশ্বাসী কিছু ভারতীয়

এ কথা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি নিষ্কাশন-তত্ত্ব বিরোধী চিন্তাভাবনা বিরাজ করছিল এবং এই চিন্তাভাবনার নেতৃত্বে ছিলেন রাণাডে। তিনি 'ভারতের দারিদ্রের দায়ভার তথাকথিত "নিষ্কাশনের" উপরে আরোপ করেন নি।' রাণাডের রচনার যে অংশ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে, সেটি পাওয়া যাবে ১৮৯০ সালে পুণেতে অনুষ্ঠিত প্রথম শিল্প সম্মেলনে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ থেকে। সেই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন : 'কিছু কিছু লোক মনে করেন যে, যতদিন আমরা

ইংল্যান্ডকে বেশ ভাল পরিমাণ অর্ঘ্য প্রদান করে যাবো এবং যার ফলে আমাদের প্রায় কুড়ি কোটি টাকার উদ্বৃত্ত রপ্তানী চলে যাবে, ততদিন আমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত এবং আমাদের বাঁচার আর কোন উপায় নেই। যাহোক, এই ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ করা আদৌ ভাল বা পুরুষোচিত নয়।' তিনি দেখান যে এই নিষ্কাশনের একটি অংশ হ'ল বিদেশী পুঁজির উপরে ধার্য সুদ যা ভারতে ঋণ বা লগ্নী হিসেবে খাটে, 'সুতরাং নালিশ করা তো দূরের কথা, আমাদের কৃতার্থ হবার যথেষ্ট যুক্তি আছে কারণ আমাদের এমন একজন দাতা আছেন যিনি এত কম সুদে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোটাচ্ছেন।' অপর একটি অংশ হ'ল ভারতে প্রেরিত দপ্তরী-সামগ্রীর মূল্য, 'যা আমরা এখানে তৈরী করতে পারি না।' প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অবসরকালীন ভাতা সংক্রান্ত খরচ নিয়ে হল বাকি অংশ, 'যদিও এসবের যথার্থ যৌক্তিকতা নিয়ে অভিযোগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।' তাই রাণাডে শ্রোতাদের উপদেশ দেন, 'আপনারা অর্ঘ্য নিয়ে অর্থহীন আলোচনা করে নিজেদের শক্তিকে ভিন্নমুখী ও অপচয় করবেন না। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌রাই বরং এই কাজটি করুন।'

আমার মতে, এই অংশটি থেকে সত্যিই প্রমাণিত হয় না যে, ভারতবর্ষ থেকে এই সম্পদের নিষ্কাশন, অথবা এরই ফলস্বরূপ অর্থনীতির ক্ষতিগ্রস্থতার কথা রাণাডে বিশ্বাস করতেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৭২ সালেই রাণাডে ছিলেন ভারতে নিষ্কাশন-তত্ত্বের প্রবক্তাদের অন্যতম। এবং শিল্প সম্মেলনে তাঁর ভাষণের বড় জোর বছর দুই পরেই 'ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি শীর্ষক আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণে তিনি সম্পদ ও প্রতিভার অর্থনৈতিক নিষ্কাশনের' জন্য ভারতে বিদেশী শাসনকে ধিক্কার জানান। উপরন্তু, এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপরোক্ত অংশটিতেও তিনি ভারতীয়দের আধুনিক শিল্প গঠনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আহূত শিল্প সম্মেলনের মত একটি সভায় নিষ্কাশনের প্রশ্নটি উত্থাপন করার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি 'রাজনীতিবিদ্‌দের' এই প্রশ্ন তোলার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। বস্তুতপক্ষে ১৮৮১ সালে, রাণাডে যখন পুণা সার্বজনীক সভার নেপথ্য পরিচালক ছিলেন, সেই সভার উত্থাপিত মূল বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে ভারতীয়রা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। আর সেই বিষয়গুলির অন্যতম ছিল 'আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর আধিক্য হেতু নিষ্কাশনের প্রশ্নটি ; (এবং) এই নিষ্কাশনকে কতখানি ঠেকানো যাবে।' অনুরূপভাবে যার একজন নেপথ্য নেতা ছিলেন রাণাডে এবং যার প্রস্তাবসমূহ গঠন করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও নিষ্কাশনকে ভারতের দারিদ্রের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু এই সব নির্দেশিকার চেয়েও বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দুই

ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ছাত্র জি ভি যোশী ও জি কে গোখলে এই মতবাদ প্রচার করে যেতে লাগলেন যে নিষ্কাশনই শিল্পের বিকাশ রোধ করছে এবং জনগণকে দারিদ্র করে তুলছে। অবশ্য এ কথা বলা ভুল হবে যে যোশী ও গোখলের দৃষ্টিভঙ্গী ও রাণাডের দৃষ্টিভঙ্গী একই ছিল। আবার সাথে সাথে এ কথা বললেও ভুল হবে না যে পূর্বোক্তরা এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন না যা মূলত তাঁদের শিক্ষাগুরুর নীতির বিরোধী।

রাণাডে ও অন্যান্য বহু ভারতীয় নিষ্কাশন-তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন—এই বিবৃতির মধ্যে যেটুকু সত্য তা হল এই যে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে রাণাডে, যোশী, গোখলে এবং সম্ভবতঃ আরও অনেকে ভারতীয় রাজনীতির বা জাতীয়তাবাদী প্রচার ও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে নিষ্কাশনকে গ্রহণ করতে চাননি। উপরন্তু, সম্ভবতঃ তাঁরা চেয়েছিলেন প্রশ্নটা আরও কিছু দিন শিকেয় তোলা থাক। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সম্ভবতঃ জাতীয়তাবাদী নেতাদের বৃহত্তম অংশই বস্তুত দাদাভাই ও অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই নিষ্কাশনকে দেশের দারিদ্রের কারণ সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র অন্যতম একটি কারণ হিসেবেই দেখতেন।

৬. সমালোচনা ও নিষ্কাশন-তত্ত্ব

জাতীয় নেতৃত্বের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা ও এই নীতিগুলির সপক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করা হয়েছে সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করা সম্ভবতঃ এই ধরনের একটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত হবে না। নিষ্কাশনের জাতীয়তাবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে ১৮৮০-১৯০৫ ও তার পরবর্তী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সরকারী ও বেসরকারী মুখপাত্র, উপদেষ্টা এবং রক্ষাকারীরা নিষ্কাশন-তত্ত্বকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। উপরন্তু, পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদ ও লেখকেরা অত্যন্ত দ্রুত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে অর্থনীতিতে অজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব থেকেই নিষ্কাশনতত্ত্বের উপরে জাতীয়তাবাদী আক্রমণ নেমে আসে, অবশ্য যদি পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা ও জাতীয়তাবাদী গোঁড়ামি থেকে এটা উদ্ভূত হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্কাশন-তত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আক্রমণের মূল ও জাতীয়তাবাদীদের পাল্টা জবাবের পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে নিষ্কাশনের জাতীয়তাবাদী সমালোচকেরা অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন না, পরবর্তীকালে তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা উঠেছে তার অনেকটাই তাঁরা

পূর্বেই অনুমান করেছিলেন, তাঁদের সমালোচকরা তাঁদের অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির দৈর্ঘ ও প্রস্থের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার করেন নি, তাঁরা হয়ত তাঁদের নিষ্কাশন তত্ত্বের রূপদানে কিছু ভুল বা ঠিক করে থাকতে পারেন কিন্তু অর্থনীতিতে তাঁরা কোন মতেই নির্বোধ ছিলেন না, এবং বস্তুতঃ, ভারতীয় পরিস্থিতির সুসংবদ্ধ, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সংহত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেরই একটি অংশ ছিল নিষ্কাশনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী।

নিষ্কাশন-তত্ত্ব ঘোষিত হবার প্রায় সাথে সাথেই ব্রিটিশরা এর নিন্দা শুরু করে দেয়। এটি একই সঙ্গে ঘটে যখন ১৯১১ সালে থিওডর মরিশনের 'ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর-এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।' সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর এটিই সবচেয়ে বিস্তৃত ও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পরবর্তীতে আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপরে এল. সি এ নাউল্‌স ও ভেরা এ্যান্‌সটে কর্তৃক প্রকাশিত দুটি ব্রিটিশ পর্যালোচনায় নিষ্কাশন-তত্ত্বের বিরুদ্ধে মরিশনের সমালোচনাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। বেশ মজার ব্যাপার হল এই যে, নিষ্কাশন-তত্ত্বের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে একটি বিষয়ে বেশ ভাল রকম ঐকমত্য আছে। সেটি হল, নিজ রপ্তানীর অংশ বিশেষের জন্য ভারত কোন অর্থনৈতিক প্রতিদান পাচ্ছে না। তাই ১৮৭৮ সালের অর্থকরী বিবৃতিতে জন স্ট্রাচী মন্তব্য করেন, 'ভারতের সাথে ইংল্যাণ্ডের যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের অর্থকরী ফলই বাধ্য করেছে প্রতি বছর ২০ মিলিয়ন স্টার্লিং-এর সমমূল্য পণ্য ইওরোপে পাঠাতে। পরিবর্তে সে কোনও প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সুবিধা পাচ্ছে না। আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর এই আধিক্যকেই অর্থনীতির ভাষায় বলে অর্ঘ্য।' এবং ভারত 'প্রতি বছর সমমূল্যের কোন বস্তুগত প্রতিদান না পেয়েও পণ্য বা অর্থের মাধ্যমে যে রপ্তানী করে' মরিশন তাকেই 'নিষ্কাশন' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং নিষ্কাশন-তত্ত্বের সমালোচক ও প্রবক্তাদের মধ্যে মত পার্থক্যের জায়গাটা হ'ল এই এই প্রতিদানবিহীন রপ্তানী উদ্বৃত্তের সঠিক অর্থনৈতিক মানে, উৎস ও ফলাফল সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ বোধ ও ধারণা। নিষ্কাশন-তত্ত্বের উপরে আক্রমণের মূল বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ বলা হয়েছে, যথাযথ ছাড় গুলোকে হিসেব না করতে পেরে ভারতীয়রা নিষ্কাশনকে বেশী বেশী করে দেখছে। তারা এই ঘটনাগুলো হিসেবের মধ্যে ধরেনি যে উদ্বৃত্ত রপ্তানীর একটি অংশ যায় আমদানী ও রপ্তানীর উপরে বীমা, জাহাজ মাশুল প্রভৃতির মত অদৃশ্য আমদানীতে এবং বিদেশে ভারতীয় ছাত্র ও ভ্রমণকারীদের নিমিত্ত খরচের মধ্যে। লগ্নী খাতে যে লেনদেন হচ্ছে তা-ও আমদানী রপ্তানীর আপেক্ষিক গুরুত্বকে ভুল ভাবে দেখাচ্ছে—লগ্নী পুঁজির আমদানীর ফলে প্রকৃত উদ্বৃত্ত রপ্তানী কমে যাচ্ছে এবং সেই পুঁজি ফেরৎ দেওয়া হলে রপ্তানী বেশী দেখাচ্ছে। সবশেষে, উদ্বৃত্ত রপ্তানীর হিসেব

কষার সময় সোনা ও রূপার ব্যাপক আমদানীকেও হিসেবের মধ্যে রাখা উচিত। মরিশন বাৎসরিক নিষ্কাশনের একটা হিসেব করেছিলেন এবং তার পরিমাণ ছিল একুশ মিলিয়ন স্টার্লিং। সোনা ও রূপার লেনদেন সহ নীট উদ্বৃত্ত রপ্তানী ও ও পুঁজি আমদানীর গড়কেই তিনি হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকরা বলেন যে অতিরিক্ত রপ্তানীর জন্য ভারত যথেষ্ট পরিমান আর্থিক প্রতিদান পেয়ে থাকে। ঋণকৃত পুঁজির সুদ থেকেই নিষ্কাশনের সবচেয়ে বড় অংকটা আসে। আর এই পুঁজির দ্বারা ভারতের অর্থনীতি বিকশিত হয় এবং গরীব হবার পরিবর্তে ভারত বরং সম্পদশালী হয়ে ওঠে। বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় রেলপথ নির্মিত হচ্ছে, সেচ ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করছে এবং কৃষিকার্য ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থা জন্মাচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে। এ সমস্ত কিছুই মুনাফা অর্জন করছে এবং সেই মুনাফার একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল সুদ বাবদ দেশের বাইরে যাচ্ছে। উপরন্তু, মুনাফা অর্জন করা ছাড়াও এই সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় আয় বাড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত লভ্যাংশও যখন দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখনও মজুরী ও মাশুলের অংশ ভারতেই থেকে গেছে। সুতরাং নিজেদের মজুত পুঁজির অভাব পূরণ করে দেওয়ার জন্য ভারতীয়দের উচিত বিদেশী লগ্নীকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। ভারতের মঙ্গল আরও বৃদ্ধি পেল এই কারণে যে ইংল্যাণ্ডের সাথে ভারতের রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকার ফলে ভারত নিজ দেশে বিশ্বের সবচেয়ে সস্তার বাজারটি গড়ে তুলল। ভাবতে যথেষ্ট লগ্নীযোগ্য পুঁজি আছে ধরে নিলেও এখানে ঋণ করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ত। মরিশন ঘোষণা করেন, বাস্তবিকপক্ষে গণঋণের সহজ মূল্যের কারণে ভারতে যে সঞ্চয় হয় তা দিয়েই 'সমগ্র "রাজনৈতিক নিষ্কাশন" নির্মূল করা খুব বেশী দূরঅস্ত হবে না' এবং এই সিদ্ধান্তকে আটকানো যাবে না। যে ভারতের সাথে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ আছে বলেই সে আর্থিক সুবিধা' ভোগ করছে। এই বিষয়ে ভারতের অবস্থার সাথে আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের মত অন্যান্য দেশের অবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইওরোপীয় দেশগুলির সাথে ঋণপাশে আবদ্ধ থাকার দরুণ আমেরিকার বিরাট উদ্ধৃত্ত রপ্তানী ছিল, অথচ সে বিকাশ লাভ করে গেছে। আসলে আমেরিকার বিকাশের মূল কারণই হল এই যে বিদেশী পুঁজি ব্যবহার করে সে নিজের পুঁজির অভাব পূরণ করে নিয়েছে। এবং বিদেশী পুঁজির সাহায্যে নিজের সম্পদ গড়ে তুলছে। উপরন্তু, এই দেশগুলির উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে যে একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থান তার রপ্তানী উদ্‌বৃত্তের উপর নির্ভরশীল নয়। ভারতের অনুৎপাদনশীল ঋণের প্রশ্নে যে বিষয়টি প্রধানতঃ মনে রাখা দরকার তা হল, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে এর পরিমান খুবই ক্ষুদ্র।

তৃতীয়তঃ, গণঋণের সুদ বাদে স্বরাষ্ট্র খাতে খরচ, ভারতে নিযুক্ত ইওরোপীয়দের সঞ্চিত অর্থের পাচার প্রভৃতির প্রশ্নে সমালোচকেরা সহমত প্রকাশ করে বলেন যে ভারতের বিষয়টি অন্যান্য দেশের থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। অবশ্য এ সব খাতে খরচের পরিমাণ খুব বেশী নয়। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারত ঐ সব খাতে ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পরিশ্রমী নিস্বার্থ ও দক্ষ ব্রিটিশ অফিসারদের সেবা পাচ্ছে এবং শৃংখলা ও শান্তি, একটি আধুনিক প্রশাসন, ও বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা স্বরূপ অন-অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক কাজ পাচ্ছে, বা অন্যথায় একটি ভাল সরকার পাচ্ছে। একটি "ভাল সরকারের" রূপে যে প্রতিদান তাকে অর্থনীতির স্বার্থে কাজে লাগানো যায়। কারণ তা ছাড়া ভারতের শিল্প-বিকাশ সম্ভব হত না। আরও স্পষ্ট ভাবে বললে বলতে হয় যে, ভারত এমন একটা প্রশাসন পেয়েছে যার 'সাহায্যে তার অর্থনীতি বিকাশ লাভ করেছে। নিজ প্রচেষ্টায় সেই বিকাশ সাধনের সম্ভাব্য ব্যয়ের চেয়েও এখানে তার ব্যয় হয়েছে অনেক কম।'

নিষ্কাশন তত্ত্বের প্রবক্তারা, যাঁদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজীই ছিলেন প্রধান, সমালোচকদের নিক্ষিপ্ত সবকটি বান পূর্বেই অনুমান করেছিলেন এবং তা খণ্ডন ক'রে যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যুত্তরের পর্যালোচনার প্রাথমিক স্তরেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিষ্কাশনের সংজ্ঞা ও হিসেবের প্রশ্নে তাঁদের যে সব ভুল-ভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তেমন কোন বড় মাপের ভুল করেন নি। এর একটি উদাহরণ হ'ল, আমদানী ও রপ্তানীর ব্যালান্স সীট তৈরী করার সময় তাঁরা সোনা ও রুপার লেনদেনকে হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পুঁজির লেনদেনের ফলে বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থার ভুল চিত্র ফুটে ওঠে। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাথমিক মূল্যায়ণে আপাতদৃষ্টিতে যে অংক ফুটে ওঠে, রপ্তানীর প্রকৃত আধিক্য বস্তুতঃ তার চেয়ে বেশী। কারণ আমদানীর মধ্যে সেইসব পণ্যকেও ধরা হয়েছে যেগুলিকে আমদানীকৃত পুঁজির সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়েছে। সেই পুঁজি ব্যক্তি উদ্যোগে বা সরকারী উদ্যোগে আমদানী করা হতে পারে এবং তা ইংল্যান্ড থেকেই আনা হোক বা ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজ কর্তৃক পুনর্লগ্নীকৃত হোক, অতিরিক্ত রপ্তানীর মাধ্যমে তা অচিরেই শোধ করে দিতে হবে। একথা বলাও ভুল হবে যে ভারতীয় নেতারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানী বা ব্যালান্স অব ট্রেড ও ব্যালান্স অব পেমেন্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে জানতেন না। অদৃশ্য রপ্তানীর মধ্যে প্রাথমিক ভাবে ইংল্যাণ্ড বা ভারতে সংঘটিত পরিষেবা খাতে ব্যয় এবং জাহাজ মাশুল, বীমা ও ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যয়কে ধরা হয়েছে। ভারতীয়রা যে শুধু এই সব পরিষেবাকে ধরেছে তা-ই নয়, মাঝে মাঝেই তাঁরা এগুলিকে তাঁদের ক্ষোভের প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবসা এবং ভারতের

সীমার মধ্যে উপকূলবর্তী জাহাজ চলাচল—এ সবই হ'ল ভারতে বিদেশী ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির অঙ্গ এবং জাতীয়তাবাদী বিচারে এগুলিকে ভারতে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর সুবিধা হিসেবেই দেখা হয়েছে। সমালোচকেরা যখন বলেন যে উদ্বৃত্ত রপ্তানীর অংশবিশেষ আমদানী ও রপ্তানীর নিমিত্ত জাহাজ মাশুল ও বীমার জন্য ব্যয় করা হয়, দাদাভাই নৌরজী বিষয়টি ধরেন। তিনি দেখান যে আমদানী-রপ্তানীর মূল্যমান নির্ণয়ের সরকারী পদ্ধতিটি এমনই যে ঐ সব খাতে খরচাদি বর্তমান উদ্বৃত্ত রপ্তানী মধ্যে সব সময়ই ধরা থাকে। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এমনটি ঘটেঃ ভারতে আমদানীর সরকারী মূল্য নির্ণয়ের সময়ে ভারতীয় বন্দরে সেই আমদানীর মূল্যকেই হিসেবের মধ্যে রাখা হয় এবং সেই কারণেই সেই মূল্যমানে মাশুল ও বীমা খরচ ধরাই থাকে। অপর দিকে, রপ্তানীর মূল্য নির্ণয়ের সময় ভারতীয় বন্দরের মূলকেই ধরা হয়। ফলতঃ মাশুল ও বীমা খরচ বাদ থাকে এবং যে বন্দরে ঐ মাল রপ্তানী করা হবে সেখানেই ঐ বাবদ অর্থ ঐ মূল্যের সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং তাঁর হিসেব মত নিষ্কাশনের অংকে এই ধরণের বিকৃতি ছিল না। সত্যি বলতে কি, তিনি এমনও মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে যদি রপ্তানীর মূল্যমানের সাথে মাশুল ও বীমা খরচ যুক্ত করা হয়, তাহলে নিষ্কাশনের পরিমাণ তাঁর হিসেবের অংকের চেয়ে আরও বেশী হ'ত।

সমালোচকদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, নিষ্কাশন আসলে হল পুঁজি ও কর্মীদের সেবার মূল্য। আর এরই বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী উত্তরের ভিত্তি ছিল প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাবশ্যকতার অতীব বিনম্র, গম্ভীর ও মৌলিক শর্তাবলী। যদি কোন বিশেষ পরিষেবার প্রয়োজন হয় এবং তা কেবল বিদেশে খরচের মাধ্যমেই পাওয়া যায়, তবে তাঁরা সেই খাতে নিষ্কাশন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপরদিকে, যদি সেই পরিষেবা অপ্রয়োজনীয় হয় বা প্রয়োজনীয় হলেও ভারতেই তা পাওয়া যায়, সেই খাতে নিষ্কাশন ছিল আপত্তিকর।

যখন এ কথা জোর দিয়ে বলা হয় যে উৎপাদনমুখী গণঋণের উপর সুদ এবং বিদেশী ব্যক্তি পুঁজি চালিত প্রতিষ্ঠানগুলির লভ্যাংশ নিয়েই গড়ে ওঠে নিষ্কাশনের বৃহত্তম অংশ, এবং বিপরীত ক্রমে এই দুটিই ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির সহায়ক তার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জবাব তখন হয়ে ওঠে বহুমুখী। তাঁরা দেখান যে প্রথমতঃ বিদেশী পুঁজি অত্যাবশ্যকীয় নয়। দেশের শাসকেরা ভারতের পুঁজি নিষ্কাশিত করে নিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে বলেই এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যদি নিষ্কাশন না হত, ভারত নিজেই রেলপথ প্রভৃতির জন্য লগ্নী করত, এবং সাধারণভাবে নিজের পুঁজির প্রয়োজন নিজেই মেটাতো। তাই বস্তুত পক্ষে বিদেশী পুঁজি ভারতের নিজস্ব পুঁজিকে বাড়ায়

নি বরং হটিয়ে দিয়েছে। বিদেশী পুঁজি যদি সত্যিই দেশীয় পুঁজির বৃদ্ধি ঘটাত, তাকে অবশ্যই স্বাগত জানান হত। উপরন্তু, ভারতের যে পুঁজি অতীতে নিষ্কাশিত হয়েছে, সেই পুঁজিই পুনরায় ভারতে আমদানি করা হয়েছে। সুতরাং ভারতে সত্যিকারের কোন বিদেশী পুঁজি লগ্নী করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে সমর্থকেরা যতখানি বড় করে দেখায় বিদেশী পুঁজি ঠিক ততটা মঙ্গলজনক নয়। রেলপথ অবিমিশ্র আশীর্বাদস্বরূপ ছিল না এবং যে গতিতে রেল চালান হ'ত দেশে তার খুব একটা প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং সেই অপ্রয়োজনীয় রেলপথ নির্মাণের জন্য যে গণঋণ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা যেমন ছিল প্রয়োজনহীন তেমনই অনাবশ্যক। ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি যে কেবল সুদই নিয়ে চলে গেছে তা নয়, দেশকে পুঁজি লগ্নীর গৌণ উপকার থেকে বঞ্চিত করে প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত মুনাফাই বিদেশে নিয়ে চলে গেছে। উপরন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি রেল থেকে কোন লাভ হয় নি। অবশ্য বেতন বাবদ দেশ কিছু উপকার লাভ করেছে। কিন্তু বেতনের একটি অংশ গেছে বিদেশীদের পকেটে এবং সেটাও এক ধরণের নিষ্কাশন। উপরন্তু, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিতে জঘন্য কাজের পরিবেশ ও নিম্নহারে বেতনের বিচারে ভারতের উপকার ছিল যৎসামান্য।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আরও বলেছিলেন যে বিদেশী পুঁজি ছিল ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ ঐ পুঁজি দেশীয় পুঁজিকে দমিয়ে রাখত এবং শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করার উদ্দেশ্যে দেশীয় পুঁজির প্রয়োজনীয় লগ্নীকে রোধ করত। সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারতের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য বিদেশী পুঁজি আসে নি। এ পুঁজি এসেছে শোষণ করতে, দেশকে লুণ্ঠণ করে ভিখারী করতে।

সুতরাং এই যে জোর গলায় বলা হচ্ছে যে সস্তা হারে বিদেশী ঋণ পেয়ে ভারত উপকৃত, এর জবাবে ভারতীয়রা বলতেন যে তাঁদের আদৌ ঐ ঋণের প্রয়োজন ছিল না এবং সাধারণভাবে ঐ ঋণের টাকা প্রয়োজন মাফিক খরচও করা হয়নি। আর যেহেতু ঐ ঋণ ভারতের নিষ্কাশিত পুঁজি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়, সস্তা হারের প্রশ্নও তাই অবান্তর। এবং সর্বোপরি, যদি ভারতে সংগৃহীত ঋণের জন্য আরও বেশী হারে সুদ দিতে হলেও অন্ততঃ সেই সুদ দেশেই থাকত ও দেশের মধ্যেই তা ফলপ্রসব করত। অথচ বিদেশী ঋণের উপর ধার্য সুদ কম হলেও তা নিষ্কাশিত হচ্ছিল।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আরও অস্বীকার করেছিলেন যে ভারতের বিষয়টা আমেরিকার সাথে তুলনীয়! যদিও তখন আমেরিকায় উদ্বৃত্ত রপ্তানী ছিল। এ ঘটনা যদি বাদও দেওয়া যায় যে আমেরিকা সংস্থাগুলির মুনাফা দেশের

মধ্যেই রেখে সাধারণতঃ ঋণকৃত পুঁজির উপরেই সুদ দিত, ভারতের ও তার উদ্বৃত্ত রপ্তানীর মধ্যে একটি বিরাট ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। আমেরিকা তখন উদ্বৃত্ত রপ্তানীর মাধ্যমেই বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অতীত ঋণের সুদ গুণছিল। তার অর্থ হল, অতীতে তার উদ্বৃত্ত আমদানী ছিল। পক্ষান্তরে, তার বর্তমান উদ্বৃত্ত রপ্তানী হল বিলম্বিত প্রাপ্তি। কিন্তু ভারতের ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। ভারত অতীতের ঋণ শোধ করছিল না। কারণ যেহেতু অন্যান্য আমদানির সাথে পুঁজি আমদানীকে যুক্ত করেই উদ্বৃত্ত রপ্তানীর হিসাব করা হয়েছে, ঋণ শোধের প্রশ্নে ভারতের উদ্বৃত্ত রপ্তানীর জন্য অতীত ঋণ প্রকৃত রপ্তানীর সময়ে শোধ করে দেওয়া হত। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছরের যৎসামান্য পরিমাণ বাদে অতীতে ভারতের একদিকে যেমন কোন উদ্বৃত্ত আমদানী ছিল না তেমনি অপরদিকে উদ্বৃত্ত রপ্তানীর কারণেও ভারত ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের উপরে কোন দাবি করতে পারে নি। ফলতঃ, পরবর্তী কালে কোন উদ্বৃত্ত আমদানীই এই ক্ষতি পূরণ করতে পারে নি। সুতরাং ভারতের উদ্বৃত্ত রপ্তানীর সেই একই রকম অদ্ভুত অবস্থা—কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ ব্যতিরেকেই পুঁজির লেনদেন; জন্মলগ্নেই এর মৃত্যু। এই সব যুক্তি দেওয়া সত্ত্বেও নিষ্কাশন-তত্ত্বের প্রবক্তরা উৎপাদনশীল গণঋণ বণ্টনের খরচকে নিষ্কাশনের হিসাববহির্ভূত রাখতে রাজী হয়েছিলেন। এবিষয়ে আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপযোগিতার তত্ত্বের সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁরা ঋণকৃত পুঁজির দ্বারা সংঘটিত সেচ সংক্রান্ত নির্মাণকার্যের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। একইভাবে তাদের কেউ কেউ দেশের উৎপাদিকা সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে ঋণ নেবার নীতিকে সমর্থন করেছিলেন।

ভারতীয় নেতারা আরও দেখিয়ে দেন যে ভারতীয় গণঋণের একটি অংশ সার্বিকভাবেই রাজনৈতিক এবং আসলে তা ব্যবহারের অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় ও উৎপাদনক্ষমতা রহিত। এছাড়া এর কোন অর্থনৈতিক প্রতিদানও নেই। ১৮৫৮ সালে যে সাধারণ গণঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৯ মিলিয়ন স্টার্লিং, তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালেই এই অর্থ এসেছিল। এই অর্থের সাহায্যে ব্রিটিশদের ভারত জয়ের যুদ্ধের খরচ মেটানো হয়েছিল এবং ভারত কোম্পানীর ডিভিডেণ্ট মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কোম্পানীর (ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টক) শেয়ারহোল্ডারদেরকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ রূপে ভারতীয় প্রশাসনকে রাজমুকুটের কাছে বদলি করার খরচ এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের খরচ। এইভাবে ১৮৫৮ সালের পরবর্তী বহু কাল ধরে ভারত এক বিদেশী শক্তির দ্বারা পরাজিত হবার মূল্য দিচ্ছে। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে অন্যায্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের

খেসারত হিসেবে যেমন ভারতের কাঁধে চেপে গেল ১৮৭৮ সালের আফগান যুদ্ধ, ঈজিপ্টের যুদ্ধ, বার্মার যুদ্ধ এবং ১৮৯০ দশকের সীমান্ত যুদ্ধের খরচ পাতি, তেমনি রানীর শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকেই সাধারণ গণঋণের বোঝা বাড়তে লাগল। জাতীয়তাবাদীদের মতানুসারে, এইভাবে প্রায় ১০০ মিলিয়ন স্টার্লিং-এর মত একটি বিরাট অংকের ভারতীয় গণঋণ স্পষ্টতই কোন ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ ছিল না। সুতরাং ভারতেরও সেটা মেটাবার কোন নৈতিক দায় ছিল না। আর এই ঋণ চালু করার খরচ স্বাভাবিক কারণেই সম্পদের-নিষ্কাশন ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য দাদাভাইও তাঁদেরই একজন যাঁরা মাঝে মাঝে ঋণের এই অংশটিকেও ছাড় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

দপ্তরী দ্রব্যের প্রশ্নে বলা যায় যে এই সব বস্তু আমদানী তালিকাভূক্ত হয়েই আছে এবং এগুলিও এক ধরনের নিষ্কাশন। এগুলিকে তাঁরা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন না, কারণ অতি সহজেই এসব দেশে উৎপাদন করা যায়। তৎসত্বেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দপ্তরীদ্রব্য খাতে ব্যয় মেনে নিয়েছিলেন।

নিষ্কাশন ওয়ালারা যে জিনিসটা একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি সেটা হ'ল, ভারত সরকারে ইওরোপীয়দের চাকুরিজনিত খরচ। তাদের চাকুরি বাবদ খরচটাই মূলতঃ নিষ্কাশন তত্ত্বের প্রাণকেন্দ্র। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয়রা নিষ্কাশনের এই দিকটা থেকে কোনই অর্থনৈতিক প্রতিদান পায় না। অপর দিকে, ভারতীয় নেতারা এটাও অস্বীকার করেন যে এই খাতে যে নিষ্কাশন হয় তার পরিপূরক হল চাকুরিতে তাদের অনর্থনৈতিক প্রতিদান। ভারতে এইসব চাকুরির কোন প্রয়োজন ছিল না এবং বস্তুত এর কোন দরকারই ছিল না কারণ ভারতীয়রা নিজেরাই একই দক্ষতায় অথচ কম পারিশ্রমিকে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারত। এইসব চাকুরির বেতন দেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক এবং একপ্রকার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর এটাই আসলে এক ধরণের নিষ্কাশন। যথেষ্ট মজার ব্যাপার হল এই যে, ভারতীয় নেতারা কোন দেশীয় কারখানায় বিদেশী কারিগরিবিদ বা কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেন নি। বরং তাঁরা ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষাঅর্জন জোরদার সপক্ষে সোচ্চারে প্রচার চালিয়েছেন। এই সব খাতে নিষ্কাশনকে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় মনে করা হ'ত। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদীরা নির্দিষ্ট করে দেখান যে ভারত সরকারের সামরিক ও অসামরিক পরিষেবার একটি বিরাট অংশ পোষণ করা হয়েছিল সেইসব উদ্দেশ্যে যার দ্বারা ব্রিটেন ও তাঁর নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয় ভারতের মঙ্গলার্থে নয়। সুতরাং এইসব সার্ভিস খাতে যে কোন খরচই পরিষ্কার নিষ্কাশন। উপরন্তু, আইন শৃংখলার অঙ্গনেও দাদাভাই নৌরজী সরকারী পক্ষের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখান

যে ভারতীয়দের সত্যিই কোন নিরাপত্তা নেই, কারণ ব্রিটিশেরা নির্বিচারে আইন শৃংখলার অপব্যবহার করে যাচ্ছে।

কোন কোন ভারতীয় নেতা এমনও মন্তব্য করেন যে ইওরোপীয় সার্ভিসগুলির বেতন সম্বন্ধে যে অন-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন, বিশুদ্ধ অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ওগুলো নিষ্কাশন। এ বিষয়ে ব্রিটিশদের বিদ্রূপ করে দাদাভাই নৌরজী প্রশ্ন করেন যে তারা বিদেশীদের, যেমন ফরাসী যুবকদের, উপযোগিতার অজুহাতে ভালো ভালো পদ ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম সারির আসনগুলো দখল করতে দেবেন কিনা। তিনি আরও দেখান যে ইংরেজরা নিজেরাই ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড থেকে ইতালিতেও পোপ সরকারের কাছে সম্পদ নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত, ব্রিটিশ নাগরিকদের চাকুরিতে নিযুক্ত করে ভারত অবৈষয়িক উপকার লাভ করেছে বলে যে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে তাকে খণ্ডন করার জন্যই যেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কি কি অবৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হয়েছে—যেমন নৈতিক ক্ষতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্ষতি, এবং সমগ্র জনগণের খর্বতা ও পৌরুষহীনতা। ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান কালে জি. কে গোখলে অত্যন্ত বাগ্মীতার সংগে এই বিষয়ে জাতির বক্তব্যকে তুলে ধরেন:

অবশ্য বিদেশী এজেন্টদের প্রশাসনের মহার্ঘই এর একমাত্র খারাপ দিক নয়। এর একটি নৈতিক ক্ষতির দিকও আছে এবং তার ক্ষতির পরিমাণ আরও অধিক। বর্তমান ব্যবস্থায় ভারতীয় জাতিকে ক্ষুদ্র বা খর্ব করা হচ্ছে। একটি হীন পরিবেশের মধ্যে আমরা জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি এবং আমাদের মধ্যে যিনি দীর্ঘকায় তিনিও বর্তমান ব্যবস্থার কর্মধারাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাথা নত করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঊর্ধ্বচাপ বলে কোন শব্দ ব্যবহার করলে বলা যায় যে ইটন বা হ্যারোর প্রতিটি স্কুলের ছাত্রই এক ধরনের ঊর্ধ্বচাপের প্রভাবে নিজেকে কোন একদিন একজন গ্ল্যাডস্টোন, নেলসন বা ওয়েলিংটন করে তোলার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়। আর আমরা সেই ধরণের কোনও চাপ থেকে বঞ্চিত। বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের মনুষ্যত্ব কখনই তার যথাযথ উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না। প্রতিটি আত্মনির্ভরশীল মানুষ যে নৈতিক উচ্চমন্যতা বোধ করেন আমরা তা বোধ করি না। নিছকই অব্যবহারের ফলে আমাদের প্রশাসন ও সামরিক প্রতিভাগুলি ক্রমশই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এইভাবে একদিন আমরা নিজ ভূমেই জঙ্গলের কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালার একঘেঁয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হব।

এই বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় নেতারা অবস্থার বিপাকে সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যখন তাঁরা জাতীয় অবদমনজাত অনর্থনৈতিক

ক্ষত ও আত্মিক অবনমনের কথা বলছেন, তখন তাঁদের শাসকেরা বিদেশী শাসনের অর্থনৈতিক সুফলের ওপরে ভাষণ দিয়ে বেরাচ্ছেন। যখন তাঁরা বস্তুগত উৎকর্ষ মেনে নিয়েও বিদেশী শাসনজাত অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য অভিযোগ তুলছেন, তখন অনর্থনৈতিক ও আত্মিক সুফলের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য বলা হচ্ছে। এই ভাবে অর্থনৈতিক ও অনর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে মিশিয়ে ফেলা এবং যুক্তির চক্রবৎ কূটকাচালির বিরুদ্ধে তাঁরা সঠিকভাবেই আপত্তি তুলতে পারতেন। যাই হোক, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তখনও বিশেষতঃ ১৯০৫ সালের পরে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মিক প্রেরণা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলির যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটানোর কৌশল আয়ত্ব করে উঠতে পারেন নি।

নিষ্কাশন-তত্ত্বের সমালোচকদের শেষ অমোঘ যুক্তি হল এই যে নিষ্কাশনের বিনিময়ে ভারত এমন একটি প্রশাসন পেয়েছে যা তার অর্থনৈতিক বিকাশের সহায়ক। সমগ্র জাতীয় নেতৃত্ব এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান। কারণ জাতীয় নেতৃত্বের অর্থনৈতিক নীতিগুলির সার্বিক বিশ্লেষণই দেখিয়ে দেয় যে একটি প্রশ্নে সমস্ত ভারতীয় নেতা ঐকামত ছিলেন এবং সেটি হল এই যে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি বৈরী ছিল। এমনকি, জাস্টিস রাণাডে ও অন্যান্য আরো যাঁরা নিষ্কাশন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার বিপক্ষে ছিলেন, তাঁরাও এই প্রশ্নে সহমত পোষণ করেছিলেন। বস্তুত, সরকারী নীতিগুলির এই ক্ষতিকর প্রবণতাকে বিপরীতমুখী করাই ছিল তাঁদের সমগ্র অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

নিষ্কাশন-তত্ত্বের উপরোক্ত বিশ্লেষণ এবং এর প্রবক্তাদের সপক্ষের যুক্তি থেকে এটা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে এই তত্ত্বটি তাঁদের কাছে একটি বিচ্ছিন্ন সমালোচনা নয়। বরং এটি শিল্প, রেলপথ, বিদেশ বাণিজ্য, বিদেশী পুঁজি, দেশী ও বিদেশী মুদ্রা, ভূমি রাজস্ব, শ্রম, এবং কর ও ব্যয় সংক্রান্ত সরকারী নীতিসমূহের সমালোচনারই একটি অংশ। ভারতীয় নেতৃত্বের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রতিটি দিকের সংগে এই তত্ত্বের সংযোগ অতি ঘনিষ্ট ও সূক্ষ্ম। সত্যি কথা বলতে কি, দাদাভাই, নৌরজী, আর সি, দত্ত এবং খবরের কাগজের মত জনপ্রিয় মাধ্যমগুলি যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে একত্র করে নিষ্কাশনকে ব্যবহার করেছিলেন যাতে করে তাঁরা সরকারী অর্থনৈতিক নীতি-গুলির সমগ্র বিরুদ্ধ জাতীয় সমালোচনাকে সূচীমুখ করে তুলতে পারেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শোষণের চরিত্রটি প্রকাশ করে দিতে পারেন। জনমানসে অর্থনৈতিক শোষণের রূপটিকে সংঘবদ্ধ ও সুস্পষ্ট করে তুলছে নিষ্কাশন। অন্যথায় এই শোষণের রহস্যের জটিলতা উদ্ঘাটন করার সময় ও সাধ্য ছিল কেবল অর্থনীতিবিদদেরই হাতে। এটাই ছিল সেই নেহাই যার

উপরেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতুড়ি। তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে আঘাত হেনেছিল।

৭. রাজনৈতিক গুরুত্ব

নিষ্কাশন-তত্ত্বের অর্থনৈতিক তাৎপর্য যাই হোক না কেন, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এর প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত আছে রাজনৈতিক তাৎপর্যের উপরেই কারণ এর মাধ্যমেই তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতির প্রধান দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয় এবং ভারতীয়রা সেই দ্বন্দ্বটিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। সেটি হল ভারতীয় জনগণ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। নিষ্কাশন-তত্ত্বের গঠনক্রিয়া ও প্রচারের মধ্য দিয়েই এই তত্ত্বের প্রধান তাত্ত্বিক দাদাভাই নৌরজীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী রূপ পায়। যে পদ্ধতিতে এমনটি ঘটে তার ধারা অনুসরণ করলেই আমরা উপরোক্ত বোধোদয়ের প্রক্রিয়াটিকে সবচেয়ে ভালভাবে জানতে পারব।

প্রথমতঃ, নিষ্কাশনের সংজ্ঞা ও সংঘটনের তত্ত্বই দাদাভাইকে এই যুক্তি অগ্রাহ্য করার দিকে ঠেলে দেয় যে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণেই এই নিষ্কাশন ভারতের সহজাত। পরিবর্তে এই তত্ত্বের বলেই দাদাভাই দৃঢ়তার সাথে বলেন যে রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই বা একটি বিদেশী শক্তির দ্বারা শাসিত হচ্ছে বলেই ভারতে এমটি ঘটছে। 'ভারতের দারিদ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই সত্যের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে 'ভারতে তার রাজনৈতিক ক্ষমতার' বলেই ব্রিটেন মূলত ভারতীয় রপ্তানীর একটি বিরাট অংশ আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে লর্ড ওয়েলবিকে লেখা একটি পত্রে তিনি বারংবার জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে নিষ্কাশন 'আমাদের কাছে কোন মামুলি বাণিজ্যিক বিষয় নয়' বরং এটা হচ্ছে একটি বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক ভারতীয় সম্পদের 'অস্বাভাবিক প্রশাসন ও ব্যয় নির্বাহ কার্যক্রমের' একটি সাধারণ ফলশ্রুতি মাত্র। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের বেতনমূল্য ইত্যাদি 'নিছকই অত্যাচার হিসেবে ভারতের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ভারতের কোনও কথা শোনা হয়নি বা সম্মতি নেওয়া হয়নি।' এই প্রশ্নের সামগ্রিক রাজনৈতিক দিকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন: 'লর্ড ম্যাকওলে যথার্থই বলেছেন: 'বিদেশীর জোয়াল সকল জোয়ালের চেয়ে ভারী।' পরবর্তীকালে ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনের কাছে সওয়াল জবাবের সময় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় নিষ্কাশনের রাজনৈতিক উৎসমূলের উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 'সহজাত ও প্রধান ত্রুটীই' হল 'আর্থিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক নিষ্কাশন, যা একটি সুদূর বিদেশী শাসনের ক্ষেত্রে ঘটতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে গণ কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ভারত অবশ্যই পূর্ণ

অংশীদারত্ব এবং নিজেদের ব্যয় সংক্রান্ত প্রশ্নে নিজ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এই নীতিকে অগ্রাহ্য করেই ঘটবে।

নিষ্কাশন-তত্ত্ব নিয়ে চর্চা চালানো সূত্রে উদ্ভূত সিদ্ধান্তসমূহ ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দাদাভাইয়ের ধারণা ও মনোভাবকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করতে লাগল। একদিকে সাধারণভাবে যেমন তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রায় ঈশ্বরিক চরিত্রকে তুলে ধরছেন অপরদিকে নিষ্কাশন নিয়ে আলোচনার সময় তিনি ভিন্নসুরে কথা বলতে শুরু করে দেন। ধীরে ধীরে এবং একরকম নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেই তিনি বুঝতে পারলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণাও করতে লাগলেন যে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলময়, পরোপকারী ও বিশ্বপ্রেমীক চরিত্রটি আসলে এক অলীক রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অধ্যায়ের প্রথমাংশেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাদাভাইয়ের মতে এদেশে শিল্পোন্নয়নের অভাব ও জনগণের দারিদ্র্যের দায়ভার সম্পূর্ণতই বর্তায় নিষ্কাশন ও শাসককুলের নীতির উপরে আরও ফলশ্রুতি হল এই নিষ্কাশন। আইন ও শৃংখলা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, বিদেশী আগ্রাসণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ন্যায় ব্রিটিশ শাসনের অন্যান্য শুভকার্যগুলি যখন নিষ্কাশনের সাথে যুক্ত হয়, তখন তিনি মানতে পারেন না যে এর দ্বারা ভারতীয় জনগণের কোন উপকার হবে। দুর্ভিক্ষ—প্রতিরোধক ব্যবস্থাদির প্রশ্নে ১৮৮০ সালেই তিনি ব্যক্ত করেন যে ভারতের শাসকেরা এর জন্য সত্যিকারের কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না' কারণ তারাই এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। কেননা, 'তারা ভারতীয় সম্পদের নিষ্কাশন ঘটান বলেই আজ তাদের দোরগোড়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশা অনাহার ও মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে'। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন যে নিরাপত্তা দিচ্ছে তা থেকেও ভারতের কোন লাভ হচ্ছে না, কারণ 'ইংরেজ শাসকেরা ভারতের দোর-গোড়ায় অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তারা ঘোষণা করছে যে সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা ভারতকে রক্ষা করছে ও করতে থাকবে এবং তারা নিজেরাই গোপন পথে তাদের রক্ষিত সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে।' বাস্তবিক পক্ষে, দেশের প্রতিরক্ষা তো দূরের কথা, ব্রিটিশ শাসন আসলে 'একটি চিরস্থায়ী, ক্রমবর্ধমান ও নিত্যবর্ধমান বিদেশী আগ্রাসন' এবং এমন একটি আগ্রাসন 'যা ধীর গতিসম্পন্ন হলেও দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলছে।' বস্তুতঃ 'দেশে যতগুলি বিদেশী লুঠেরার অনুপ্রবেশের দুর্ভাগ্য ঘটেছে তাদের মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে ইংরেজরা।' জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তামূলক উপকারের প্রশ্নে দাদাভাই নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

> 'গল্পকথা হল এই যে ভারতবর্ষে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা আছে ; আর বাস্তব ঘটনা হল এই যে এখানে সেসব কিছুই নেই।

একদিক দিয়ে বা একভাবে এখানে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা আছে, আর তা হল, নিজেদের মধ্যে বা দেশীয় অত্যাচারীর কাছ থেকে হানাহানির প্রশ্নে এখানে জনগণ নিরাপদ। এখনও জীবন ও সম্পদের প্রকৃত নিরাপত্তা আছে, এবং এর জন্য ভারত কখনও তার ঋণ অস্বীকার করে না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নিজের থাবার কাছে সম্পদের আদৌ কোন নিরাপত্তা নেই, ফলতঃ জীবনেরও কোন নিরাপত্তা নেই। ভারতের সম্পদ নিরাপদ নয়। যা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত, তা হ'ল ইংল্যাণ্ড এখানে অতীব নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় সে প্রতি বছর ভারত থেকে ৩ থেকে ৪ কোটি পাউণ্ড অর্থ লুটে নিয়ে যাচ্ছে এবং এখানে ভোগ করছে।···তাই আমি এগিয়ে এসে এই নিবেদন করছি যে ভারতে জীবন ও সম্পদের এবং 'জ্ঞান' বা বুদ্ধির' 'ও কোন নিরাপত্তা নেই। ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জীবন হচ্ছে 'অর্ধাহার' বা অনাহার বা দুর্ভিক্ষ ও রোগভোগের নামান্তর মাত্র।'

আইন ও শৃংখলার প্রশ্নে দাদাভাই ১৮৯৬ সালে লেখেন :

'ভারতে প্রবাদ আছে : "শিকারী পিছনে আঘাত হানে, কিন্তু পেটে আঘাত হানে না।" দেশীয় অত্যাচারীর রাজত্বে জনগণ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য কাছে রেখে ভোগ করতে পারে, যদিও মাঝেসাঝে তাদের ঘাড়ে কিছু আঘাত এসে পড়ে। ইংরেজ ভারতীয় অত্যাচারীর রাজত্বে মানুষ শান্তিতে আছে, কোনও হিংসা নেই; তার সম্পদ শুধু অগোচরে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে নিষ্কাশিত হয়ে যাচ্ছে— আইন ও শৃংখলার মধ্যে সে শান্তিতে উপোসী থাকে এবং শান্তিতেই বিলুপ্ত হয়ে যায়!' এবং তিনি আরও লেখেন, 'আমি জানিনা ইংরেজরা এমন ভাগ্যকে কি ভাবে নেবেন।'

দাদাভাইয়ের মনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিষ্কাশন-তত্ত্বের প্রভাব ছিল গভীর। তাই 'ভারতের দারিদ্র' প্রবন্ধের প্রায় শেষের দিকে তিনি মন্তব্য করেন যে 'সমগ্র দেশ একটি ভ্রান্ত, অস্বাভাবিক ও আত্মঘাতী গাড্ডার দিকে এগোচ্ছে।' ১৮৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারীতে হাউজ অব কমনস-এ তাঁর বিখ্যাত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 'ব্রিটিশ ভারতবর্ষ' আসলে ব্রিটিশদেরই ভারতবর্ষ, ভারতীয়দের ভারতবর্ষ নয়।' তিনি আরও বলেন : 'এক দিক দিয়ে ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির দাসদের চেয়েও জঘন্য জীবন যাপন করে···। প্রভুর জমি ও সম্পদ নিয়ে কাজ করে সেই দাসেরা, আর মুনাফা লোটে প্রভুরা। ভারতীয়রা নিজ ভূমি ও সম্পদ নিয়ে কাজ করেও লভ্যাংশ

তুলে দেয় বিদেশী প্রভুদের হাতে।' অনুরূপভাবে ১৮৯৭ সালের ৩১ জানুয়ারী লর্ড ওয়েলবিকে লেখা একটি পত্রে দাদাভাই যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন : 'ওরা (ব্রিটিশেরা) আমাদের বলেন সহ-নাগরিক এবং নিজেদের কথা বাস্তবে রূপ দেওয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। অথচ বর্তমানে সেই সম্পর্ক মিথ্যা ও ভাবালুতা ছাড়া, নিছকই একজন দাসমালিক ও দাসের মধ্যকার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।' তাই দাদাভাই বিস্মিত হয়ে লেখেন যে 'পরোপকারী মুখটি' আসলে একটা মুখোস। আর এই মুখোসের অন্তরালেই ব্রিটিশেরা এই দেশ শোষণ করে চলেছে. যদিও 'এই শোষণের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তির উপরে এমন কোন প্রকাশ্য বাধ্যবাধকতা বা জুলুম নেই যা দেখে বহির্বিশ্ব আঁতকে উঠবে…।' তিনি আরও দৃঢ়তার সাথে লেখেন যে 'বর্তমান নারকীয়তায় ও ভারতের ব্যয়নির্বাহের এমত অসমতায় ব্রিটিশ শাসনের সদাশয়তা হচ্ছে ভাবালুতা আর বাস্তব হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের "রক্তপাত"।' ১৯০৪ সালের মধ্যেই দাদাভাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শুধুমাত্র কঠোর ও কঠিন ভাষায় বর্ণনা করতে শুরু করলেন। ১৯০৪ সালের অগাস্টে হেগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে ভাষণ প্রদান কালে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা হল :

> 'বর্বরতার অর্থ কি? একটি জংলী একজন দুর্বল মানুষকে মেরে তার সব কিছু কেড়ে নিল, একেই কি বর্বরতা বলে না? দেশের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটছে। ঠিক এই ভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাথে আচরণ করছে। এর পরিসমাপ্তি ঘটাতেই হবে। দানবীয় সাম্রাজ্যবাদই হ'ল বর্বরতা।'

নিষ্কাশন-তত্ত্ব দাদাভাইয়ের রাজনৈতিক বোধকে আরও একভাবে গভীর করে তুলেছিল। সনাতনী জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস ছিল এই যে ভারতে খারাপ যা কিছু ঘটে তা মানেই এখানকার ইংরেজ অফিসারদের দোষ। কারণ তারা স্বার্থান্বেষী ও রাজইচ্ছা বিকৃতকারী। দাদাভাই ক্রমশই এই বিশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেন। ওয়েলবি কমিশনের কাছে সওয়াল-জবাবের সময়ে তিনি অফিসারদের নোংরামির ওপরে জোর না দিয়ে বরং সরকারের প্রশাসন বা ব্যবস্থার সেইসব ত্রুটীর উপরেই জোর দেন যা থেকেই নিষ্কাশনের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি বলেন :

> 'সাধারণভাবে আমি সরকারী অফিসারদের ওপর যত না আক্রমণ করি. তার চেয়ে অনেক বেশী করি সেই ব্যবস্থার ওপরে যার উপরে দাঁড়িয়ে তারা কাজ করছেন। এই ব্যবস্থাটাই জঘন্য। তারা এমন কাজ না করে পারেন না যা তাদেরই মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে…।

তারা যে জঘন্য ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেন, এ হল তারই কুফল। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার যাতে করে তারা নিজেরাও কাজ করে সন্তুষ্ট হন ।'

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে দাদাভাই যেমন তাঁর নিষ্কাশন-তত্ত্ব থেকে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলছেন, তেমনি অন্য কিছু জাতীয়তাবাদী নেতাও এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসনের শোষণের রূপটি প্রকাশ করেন। যেমন, ১৯০০ সালের ৯ জুনের অমৃতবাজার পত্রিকা নিষ্কাশন-তত্ত্বকে এই যুক্তিতে সমর্থন করে যে এর দ্বারা শ্বেতচর্মীদের বোঝা-র তত্ত্বের একটি দৃশ্যমান অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়ঃ

'সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে এটাই ওদের ধারণা যে ইংল্যান্ড কখনই ভারতবর্ষ থেকে রাজকর ছিনিয়ে নেবে না। ইংল্যান্ডবাসীদের বিশ্বাস শ্বেত-চর্মীরাই কালো মানুষদের বোঝা বইছে, কিন্তু তারা কখনই কালো মানুষদেরকে নিজ-বোঝা বইতে দিচ্ছে না। ইংরেজ সরকার কখনই স্বীকার করবে না যে তারা ভারতবর্ষ থেকে একটা কপর্দকও নিচ্ছে। কিন্তু যদি এখন দেখানো যায় যে ইংল্যান্ড যে শুধু রাজকরই নিচ্ছে না, নিচ্ছে আরও বেশী কিছু, তখন ইংরেজরা এই ভেবে খুশী হবেন যে তাদের মুখাপেক্ষী ও অসহায় সন্তানদের দেবার জন্য তো কিছু নিতেই হবে।'

নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে দাদাভাই ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রকৃতি, চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছেন তা তাঁকে রাজনৈতিক জঙ্গীপথে পরিচালিত করতে বাধ্য। এবং তাই যে-ব্যক্তি অত্যন্ত নরমপন্থী রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে, বছরে বছরে, একটু একটু করে তাঁর রাজনীতি ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার প্রশ্নে আরও বেশী বেশী করে উগ্রপন্থী হয়ে উঠতে লাগলেন।

প্রশাসনিক চাকুরির সংকীর্ণ ক্ষেত্রের প্রশ্নে দাদাভাই অভ্যাস বশতঃই ভারত সরকারের ইউরোপীয় কর্মীদের 'জোঁক' বলে উল্লেখ করতেন। এবং ১৮৮৫ সাল নাগাদই তিনি দাবি করেন যে 'নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা টুকুই' কেবল ইংরেজদের হাতে থাকবে এবং অন্যসব চাকুরিতে ভারতীয়দের নিযুক্ত করতে হবে। ১৮৯৭ সালে তিনি আরও সুস্পষ্ট ভাবে এই দাবি রেখে বলেন যে কেবলমাত্র ভাইসরয়, গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট-গভর্নরই হবেন ইংরেজ।

কোনও উচ্চতর রাজনৈতিক স্তরে কোনও মৌলিক দাবিদাওয়া বা স্লোগান তোলার প্রশ্নে দাদাভাই ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং প্রথম দিকে নৈতিমূলক

সাবধানবানী উচ্চারণ করেই তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রিত না হ'লে তার ফল হবে মারাত্মক। ক্রমশ অতি সূক্ষ্মভাবে এই সাবধানবাণীগুলোকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক স্লোগান ও দাবিদাওয়াও রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৮০ সালেই তিনি ব্রিটিশদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে তারা যেন নিজেদেরকে ভারতের অতীত শাসকদের সাথে তুলনা না করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'যদি ইংরেজরা নিজেদের উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার তুলনায় আরও ব্যাপক উন্নত রূপে নিজেদের জাহির করতে না পারেন, যদি তাদের অধীনে ভারত আরও বেশী বেশী উন্নতিও বিকাশ লাভ না করতে পারে, তাহলে ভারতবর্ষে তাদের থাকার কোনও যুক্তি নেই।' উপরন্তু, অতীত নিষ্কাশনকে একটি দুর্ভাগ্য বলে ক্ষমা-ঘেন্না করা যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টি আলোচিত হবার পরেও যদি ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন নিষ্কাশন ঘটে তাহলে, 'সরল ইংরিজীতে বলতে হবে যে, এ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত বিরাট ভুল ও ধ্বংসলীলা।' ১৮৯৬ সালে তিনি বলেন যে যদিও ব্রিটিশ জনগণের সুবিবেচনা বোধের প্রতি এখনও ভারতীয় জনগণের আস্থা অবিচল, 'বর্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকলে ভারতীয়রা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে 'প্রথম সুযোগেই এই ইওরোপীয় শাসকদের উৎখাত করতে না পারলে' তাঁদের কখনই কোন সুযোগ আসবে না। এবং যদি আবার নিষ্কাশন চলতেই থাকে, তবে ইংরেজ শাসনও বিরাজ করবে 'একটি বিদেশী বিধ্বংসী অত্যাচার হিসেবে' যা এই ইওরোপীয় শাসনের উৎখাতের জন্য জনগণের উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি করবে।' ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের এই মহান প্রবক্তা, যিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন : 'আসুন আমরা সবাই মানুষের মত কথা বলি এবং ঘোষণা করে জানাই যে আমরা বসম্বদ,' তাঁর লর্ড ওয়েলবিকে লেখা 'অসন্তোষের কারণ' শীর্ষক পত্রে আরও সমৃদ্ধ ভাষায় বজ্রনিনাদ করেন : 'কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে কি এমনটি ভাবা সম্ভব যে একটি দেশ অপর একটি দেশকে গোলম করে রেখে তার কাছ থেকে পরম আনুগত্য, ভক্তি ও সান্নিধ্য প্রত্যাশা করবে? এটা স্বাভাবিক নয়, মনুষ্য স্বভাবও নয়। এমনটি হয়নি, আর কখন হবেও না।' ১৯০০ সালের মধ্যেই, সম্ভবতঃ অসচেতন ভাবেই দাদাভাইয়ের অনুগত মনে সন্দেহের ভাবনা সুস্পষ্ট ভাবে উঁকি মারতে শুরু করে। সেই বছরেই তিনি শাসকদের আরও একটি সাবধানবানী দিয়ে বলেন যে ভারতবাসীরা বহুদিন ধরে ইংরেজদের শোষণ সহ্য করে এসেছে। আর যদি মনে করা হয় যে তাদের 'আনুগত্যে চির ধরতে পারে না, এবং বর্তমান ধারাতেই সব কিছু চলবে', তাহ'লে সেটা হবে ভুল। ভারতীয় জনগণ 'এখন অবস্থাটা বুঝতে শুরু করেছেন। আর যদি তাদের এই অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু করা না হয়,

তাহলে হয়ত তারা মারের বদলে মারের পন্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হবেন।' এখন কেবল সময় অপেক্ষা কখন দাদাভাই সেই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন : নিষ্কাশন রোধ করতে হলে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেতেই হবে। আর এ হল ৭৯ বছরের পরিণত বয়স্ক মানুষ দাদাভাইয়ের হৃদয় ও মনের সজীবতা, যৌবন ও শক্তির প্রতি পরম শ্রদ্ধার্ঘ। যে-বয়সে মানুষের ধমনী আড়ষ্ঠ হয়ে যায়, সেই বয়সে তিনি ভারতে ব্রিটিশরাজের দীর্ঘায়ুর বিশ্বাস থেকে একটি গুণগত উল্লম্ফণ ঘটিয়ে স্বরাজের দাবি জানালেন। ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে নিষ্কাশনের উপরে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে দাদাভাই নিম্নোক্ত দ্বিধাহীন ভাষায় নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ঘোষণা করেন। জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ মধ্যপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে সেই ভাষণ সাত্যিকারেরই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল :

> 'ভারতবর্ষকে স্ব-শাসন দেওয়াই হচ্ছে সমাধান। অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের মতই একে দেখতে হবে। ভারতীয়রা ইংল্যান্ডের সাথে সম্পর্ক রাখবে, কিন্তু দাসসম আচরণ তারা সহ্য করবে না। তারা নিজেদের শাসন ও পৃথিবীর বুকে অন্যান্য জাতির সাধারণ অগ্রগতির অংশীদার হবার অধিকার দাবি করেছে।'

দাদাভাইয়ের এই ঘোষণা যে সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসের মৌলিক পরিবেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত কোন আকস্মিক বিস্ফোরণ নয় এটা বছর খানেকের মধ্যেই প্রমাণিত হল যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তায় দাদাভাই সুস্পষ্ট ভাষায় জোর দিয়ে বললেন :

> 'স্ব-শাসন ছাড়া ভারতীয়রা কখনই এই নিষ্কাশন ও তারই ফলস্বরূপ এই দারিদ্র, দুর্দশা ও ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না। এ ছাড়া আর কোন কলমেই, প্রশাসন যন্ত্রের আর কোন পরিবর্তন ও শব্দ-ঝংকারেই কোন রকম উপকার হয় না বা হবে না। একটি সরকারই কেবল, জনগণ নিজেরাই কেবল নিষ্কাশন বন্ধ করতে পারে.....। ভারতবর্ষের দুঃখ ও অবিচারের একমাত্র সমাধানই হ'ল স্ব-শাসন বা স্বরাজ।'

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক কলকাতা অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে দাদাভাই-এর জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ লক্ষটির ঘোষণাও মনে রাখা দরকার, তিনি ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র বা উপনিবেশগুলির মতই "স্ব-শাসন" বা "স্বরাজ" জাতীয় একটি মাত্র শব্দেই ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক দাবি-সমূহকে সূত্রবদ্ধ করা যায়।'

দাদাভাইয়ের চরম মতবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য হল এই যে, ভারতবর্ষের দারিদ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণই হল নিষ্কাশন। আধুনিক শিল্পের অভাব, অথবা ভূমি-রাজস্বের আধিক্য, অথবা বাড়তি কর, অথবা রাজনৈতিক অধিকারহীনতার মত যেসকল মতবাদকে এই দারিদ্রের জন্য প্রধানভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে, তার সাথে তুলনা করলেই দাদাভাই-এর ঐ মতবাদ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এই তুলনা করার আগে তুলনা সংক্রান্ত দুটি দিকের প্রতি নজর দেওয়া কারণ সেগুলি অবহেলা করলে আমাদের সঠিক পটভূমিকাটির হারিয়ে যাওয়ার মূল্য দিতে হবে। প্রথমতঃ, শেষ বিচারে দাদাভাইও কিন্তু শিল্পের অভাবকেই ভারতের দারিদ্রের জন্য দায়ী করেছেন—কেবল পার্থক্য হল এই যে নিষ্কাশনকেই তিনি শিল্পের অভাবের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, যদি দারিদ্রের 'শিল্প তত্ত্ব' নামক বস্তুটিকেও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়, তাহলে যে মৌলিক জাতীয়তাবাদী-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তাহল ‐ই যে ব্রিটিশ ভারত সরকার ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শিল্পের স্বার্থেই কাজ করে চলেছে। সুতরাং যতদিন না পর্যন্ত মুখ্যতঃ ভারতীয় শিল্পস্বার্থবাহী একটি রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন ভারতীয় শিল্প পুরোপুরি বিকশিত হবে না। ফলতঃ, বি. জি. তিলক, লাজপত রাই এবং বি সি. পালের মত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বহু জাতীয়তাবাদী মৌলচিন্তাবিদ্ ভারতীয় শিল্পবিকাশের উপর সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য তাঁর প্রচার চালিয়ে যান। অনুরূপভাবে, দারিদ্রের 'ভূমি-রাজস্ব তত্ত্ব' এবং 'কর-তত্ত্ব ও সময় সময় মৌলিক রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার দিকে পরিচালিত করেছে। যাই হোক, বর্তমান পর্যালোচনায় এই সমস্ত কিছু নিয়েই ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতের দারিদ্রের কারণ হিসেবে নিষ্কাশন তত্ত্ব ও অন্যান্য তত্ত্বের রাজনৈতিক কার্যকারণের মূল পার্থক্যের ভিত্তিই হল এই যে একটি বিদেশী শাসন বজায় থাকলেও অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে কিছুটা ও কিছু সময়ের জন্য মানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু নিষ্কাশন তত্ত্বকে কিছুতেই মানিয়ে নেওয়া যায় না।

যেমন, 'শিল্প-তত্ত্বের' কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে শিল্প-স্বার্থের সংঘর্ষজনিত দ্বন্দ্বগুলি নানাভাবে ফুটে ওঠা ও প্রকাশিত হবার সাথে সাথে এর মধ্য দিয়েই আবার এই দ্বন্দ্বগুলির রাজনৈতিক কার্যকারিতা নানান ভাবে প্রশমিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ 'শিল্প-তত্ত্বের' সমর্থকদের বিচারে ব্রিটিশ শাসন ভারতের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কোন দুরপনেয় বাধা ছিল না। বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলেও কিছু কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং, শিল্পের জন্য সংগ্রামকে ও স্বরাজের জন্য সংগ্রামের সাথে সূত্রবদ্ধ করার কোন স্বাভাবিক ও সামগ্রিক বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, সরকারী

সাহায্যের উপরে জোর দিয়েও জাস্টিশ রাণাডে ভারতে শিল্পের বিকাশের জন্য ন্যূনতম যেসব শর্তের উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার যখন শিল্পায়নের কথা বলে এবং সময়ে সময়ে ভারতীয়দের চেয়েও বেশী উদ্দীপনার সাথে তাদের মুখের কথায় এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন পুরো ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, যত নগন্যই হোক, ভারত সরকার শিল্পের বিকাশের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণও করে। ফলতঃ, ১৯০৫ সালে বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর নামে একটি ভিন্ন সরকারী দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেভাবেই হোক, মাশুল, দপ্তরী দ্রব্য, কারিগরী শিক্ষা, সরকারী-অনুদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের চাহিদা অনুসারে সরকারী নীতির পরিবর্তনের সম্ভাবনা বরাবরই ছিল। সীমিত ভাবে হলেও ভারতীয় শিল্প কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯১৮ সালের পরে যেমনটি ঘটে ছিল। সরকারী নীতিতে একবার একটা পরিবর্তন ঘটে গেলে সরকারকে আর সরাসরি শিল্পায়ন-বিরোধী বলা যায় না। শুরু থেকেই শিল্প-তত্ত্বের প্রবক্তাদের যুক্তিগুলি ছিল খুবই জটিল। তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করতেন যে সরকার যা করছে তা যথেষ্ট নয় এবং একটি ভারতীয় সরকার এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু করত। কাজটা খুব সহজ নয় এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েই এই সব কাজ করতে হয়। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে বিতর্কে নামা হয়, জনগণের দরবারে তখন তা মাঠে মারা যায়। ফলতঃ, শিল্পের বিকাশই হচ্ছে ভারতের দারিদ্র দূরীকরণের প্রধান দাওয়াই—একথা জোর দিয়ে বলায় একদিকে যেমন শিক্ষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সাড়া জাগায়, তেমনি অপরদিকে জনগণ ও সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধানকে গভীরতর করার জন্য তা খুব একটা ভাল অস্ত্র হয়ে ওঠে না। বিপরীতে, সরকারী মুখপাত্ররাও সঙ্গত কারণেই এই যুক্তির অবতারণা করতে পারে যে, শিল্পের কারণে সরকার ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি সামান্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়তঃ, 'শিল্প-তত্ত্বের' প্রবক্তরা একথা স্বীকার করেন যে একদিকে যেমন দেশের শিল্পে পশ্চাদপদতার দায়ভার আংশিকভাবে সরকারের উপরে বর্তায়, তেমনি অপরদিকে এর একটি বিরাট দায় বর্তাবে ভারতীয়দের উপরেই। কারণ তাঁরা পুঁজি, শ্রম, উদ্যোগ ও কলাকৌশলের বিদ্যমান রসদসমূহকে সঠিকভাবে যুথবদ্ধ করেননি। সুতরাং সিদ্ধান্ত খুবই স্পষ্ট : অতএব সরকারের সমালোচনা ও নিন্দা ক'রে ভারতীয়দের সমস্ত শক্তি অপচয় করা উচিত নয় : তাঁদের গঠনমূলক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে ; এবং আত্ম-উদ্যমের জন্য নিজশক্তির খানিকটা ব্যয় করতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে

জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপরে আত্ম-উদ্যোম জাতীয় হাল্কা কথাবার্তার প্রভাবকে বহু সরকারী মুখপাত্র পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। তারা এসব কথা কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার দায়ভার নিজেদের কাঁধ থেকে সরিয়ে ভারতীয়দের কাঁধে চাপাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাই দেখা যায়, ১৮৮৮ সালে এ কথা ঘোষণা করার পরে ডাফরিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বকা লাগালেন যে 'বাণিজ্যের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে এবং পথ, রেলপথ ও যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করে আমরা শিল্প ও বাণিজ্য তৎপরতায় উৎসাহ যোগাতে পারি এবং আমরা তা করছিও; কিন্তু শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজটা তো করতে হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই। কিন্তু যেসব ভদ্রমহোদয়ের কথা আমি উল্লেখ করছি তারা নিজেরাই সরকারের এই না-পারা কাজগুলি করতে পারেন।' এ বিষয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের একটি মজার ঘটনার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। ১৯০১ সালে একটি কমিটি তৈরী করে কংগ্রেস সেই কমিটিকে পরবর্তী অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করার যাথার্থের উপরে রিপোর্ট দেবার দায়িত্ব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে 'উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টনের জ্ঞানের অভাব জনিত' কারণে 'দেশের অর্থনৈতিক বন্দাবস্থার' দায়িত্বের প্রধান দায়ভাব নির্ধারণ করা হবে. সেই জ্ঞান অর্জন ও বিস্তার করার জন্য ভারতীয়দের উপরে চাপ দেওয়া হবে, এ কথা স্বীকার করা হবে যে পুঁজি ও ঋণের সংগঠনই হচ্ছে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির অন্যতম যার সমাধান আছে আমাদেরই হাতে' এবং ভারতীয়দের উপরে চাপ দেওয়া হবে যাতে করে তারা 'পুঁজি সংগঠন ক'রে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের পথে অনেকানের বাধার অন্ততঃ একটিকে সরানোর জন্য লাগাতার ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন'। এই প্রস্তাবগুলিতে ১৮৯০ সালে পুনেতে অনুষ্ঠিত প্রথম শিল্প সম্মেলনে প্রদত্ত জাস্টিস রাণাডের বিখ্যাত ভাষণের মর্মবাণী তুলে ধরার কথা ছিল। উদ্যোক্তরা সম্ভবতঃ সেই মানুষটির স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চেয়েছিলেন যিনি বিগত প্রায় তিন দশক ধরে কংগ্রেস ও দেশকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কখনই অনুমোদিত হয়নি। আমরা জানি না কি কারণে ঐ কমিটি বা কংগ্রেস ওগুলোকে বাতিল করেছিল। অবশ্য এমন ভাবা যেতে পারে যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন যদি এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, তাহলে জাতির শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে অব্যাহত ধারায় জাতীয়তাবাদী চাপ সৃষ্টি করার প্রধান কর্তব্য থেকে বিপথগামী হয়ে পড়বে। তাই কংগ্রেস তার নেতিমূলক, অগঠনমূলক, আন্দোলনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে রইল এবং ভারতের দারিদ্রের দায়ভার নীচের কারণগুলোর উপরে চাপিয়ে যেতে লাগল—

যেমন, দেশীয় উৎপাদনের অবনতি, সম্পদের নিষ্কাশন, মাত্রাতিরিক্ত কর-আরোপ ও প্রশাসনের জন্য অত্যধিক ব্যয়ভার এবং জমির উপরে অতিরিক্ত মূল্য আরোপ। এ সবের জন্য কেবলমাত্র সরকারই দায়ী।

এইভাবে, ব্রিটিশ শাসন ও তার কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি মেনে নিয়ে এবং ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান দুর্বলতা। যেমন শিল্পগত পশ্চাদপদতা, হচ্ছে মূলতঃ ভারতের নিজস্ব ভুলেরই ফসল এবং আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা দূর সম্ভব, এই বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে 'শিল্প-তত্ত্ব', 'ভারতীয় অর্থনীতির আশাবাদী চিন্তার' জন্ম দেয় এবং অন্ততঃ শুরুতে ও আগামী কিছু দিনের জন্য মধ্যপন্থী রাজনীতির অর্থনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

অনুরূপভাবে, ভূমি-রাজস্ব হ্রাস ক'রে অথবা তার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি রোধ ক'রে সরকারী ভূমি-রাজস্ব নীতির কট্টর সমালোচককেও সন্তুষ্ট করা যেত অথবা সেই সমালোচকের মতামতের বাড়াবাড়ির অংশটুকু প্রকাশ ক'রে তাঁকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা যেত। ১৯০১ সালে আর সি. দত্তের ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্বের উপরে প্রস্তাব উত্থাপন করে কার্জন ঠিক এমনটিই করেছিল। এদিক ওদিক সীমিত মাত্রায় করের বোঝা কিঞ্চিৎ হ্রাস ক'রে এবং কিছু কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ বা দপ্তরে কিঞ্চিৎ ব্যয় বরাদ্দ ক'রে সরকার রাজস্ব ও ব্যয়ের জাতিয় সমালোচকদের কিছুটা সন্তুষ্ট করতে পারত। অতীতে রেলপথের সমালোচনা যতই অর্থবহ হয়ে থাকুক না কেন, তার ক্রমবর্ধমান উপকারিতা ও মুনাফার দরুণ ক্রমশঃ সেই সমালোচনার ধার কমে আসে। এমনকি কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সযত্নে পরিমিত রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান ও সংস্কার সাধন ক'রে জাতীয় রাজনৈতিক অগ্রগতির দাবিসঞ্জাত উগ্রপন্থাকেও নরম করা যেত। এবং যে ভাবেই হোক না কেন, একদিকে জাতীয়তাবাদী যেমন নিজ—বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে পারতেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতেই এবং সাথে সাথে বিদেশ-বাণিজ্য, মুদ্রা, শ্রম, প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি ছিল স্বার্থসিক্ত ও ভারতীয় জনস্বার্থ বিরোধী, তেমনি সরকারী যুক্তি ও আত্মরক্ষার কৌশলের কুয়াশাজাল ভেদ করার জন্য তাঁর কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল। নেতৃত্ব হয়ত এই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারতেন, কিন্তু জনগণের মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলার কাজ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন, বা আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ।

নিষ্কাশন তত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত তত্ত্বেরই এই ভূমিকা যে রাজনৈতিক সংগ্রামী মেজাজকে ম্রিয়মান করে দিচ্ছে, দাদাভাই নৌরজী ও নিষ্কাশন-তত্ত্বের তাঁর সহ-প্রচারকরাও অমৃতবাজার পত্রিকা এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই ১৯০০ সালে দাদাভাই ভারতের যুব সম্প্রদায়কে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন

যে তারা যেন ভারতের দারিদ্রের কারণ হিসেবে বর্ণিত দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় ও অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্বের মত যুক্তি ও অজুহাতের দ্বারা প্রভাবিত না হন। তিনি সতর্কবাণী দেন, 'আসলে এ সবই হচ্ছে মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।' তিনি বলেন, 'যতদিন রক্তক্ষয় চলবে, ততদিন ভারতের কোন আশা নেই।' দাদাভাইয়ের জীবনীকার আর. পি. মাসানী দেখান যে ১৯৩০ সালেই দাদাভাই আর. সি. দত্তকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি যদি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ত্রুটির উপরে বেশী জোর দেন, তাহলে 'ভারতের দারিদ্রের মূল কারণ, নিষ্কাশন ও তার নিরাময় হিসেবে স্বরাজ থেকে হয়ত মানুষের মন দূরে সরে যাবে।' অনুরূপভাবে, অমৃতবাজার পত্রিকা ১৯০০ সালের ৯ই জুন তারিখের সংস্করণে লেখে যে, যদিও এটা তর্কাতীত যে অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্ব ভারতের দারিদ্রের একটি কারণ, তবুও নিষ্কাশনের ওপরে জোর না দিয়ে এর উপরে বেশী জোর দেওয়া হবে খুবই ভুল কাজ। একটি লাভজনক মীমাংসার প্রশ্ন তুললে হয়ত তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে, কিন্তু এই বার্ষিক নিষ্কাশনের ব্যাপারে কোন বিতর্ক উঠবে না।' ১৯০১ সালের ২৮ মার্চ পত্রিকা এই সন্দেহ প্রকাশ করে যে ভূমি-রাজস্বের উপরে বেশী জোর দিয়েও 'একটি গৌণ বিষয়কে তুলে ধরছেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে তিনি আলোচনার গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যাবেন।' পত্রিকায় এই পরামর্শ দেওয়া হয় যে, এখন দরকার একটি পরিষ্কার বিষয় তুলে ধরা এবং এমন দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা ব্যাপারটা কার্যকরী হয়।'

'শিল্প তত্ত্ব' প্রভৃতির বিপরীতে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ যে অর্থনৈতিক অপশাসনের শিকার হয়েছে, নিষ্কাশন-তত্ত্ব তার উৎস সন্ধান করেছে এবং আপোষহীনভাবে ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিদেশী চরিত্র ও তার শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। সংগা দিয়েই বোঝা যায় যে নিষ্কাশন হচ্ছে ব্রিটেনেরই দোষে, এবং এর ফলে যে দারিদ্রের জন্ম হচ্ছে তার দায়ভার বহন করতে হবে ইংরেজদেরকেই। এই মত অনুসারে, এই অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণ ও তাঁর নেতৃবৃন্দের নিষ্কাশন হ্রাস করবার মত গঠনমূলক কোন করণীয় কাজ খুব একটা কিছু নেই। তাঁদের যা কিছু করণীয় আছে তা হল, ভারতীয়করণ, ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সুষম অর্থনৈতিক বন্টন, স্বরাষ্ট্র খাতে ব্যয় হ্রাস করণের জন্য আন্দোলন করা। উপরন্তু, নিষ্কাশন-তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশেষ ভাবেই মনে করতেন যে যতদিন নিষ্কাশন চলবে ততদিন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যহত হবে এবং তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে ব্রিটেনের দোষেই নিষ্কাশনি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসন ও তার মৌলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহ, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য ব্যবস্থাদির — যেমন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, ইংল্যান্ডে ভারতীয় দপ্তর, ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নী, রেলপথ, বিদেশ বাণিজ্য, সাধারণভাবে ভূমি-রাজস্ব ও কর — সাথে নিষ্কাশনকে সমার্থকরূপে অংগায়িত করে তাঁরা জনসাধারণকে ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের দিকে চালিত করছিলেন যে, যদি ভারতবর্ষকে একটি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও দরিদ্র দেশ বলা যায়, এর মূল কারণই হল 'বিদেশীদের উপস্থিতি ও নীতি' এবং এর

আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্বলতা নয় বরং ব্রিটিশ শাসনই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা। এমনকি সিভিল সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর ইওরোপীয় চরিত্রকে বড় করে তুলে ধরেও অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, কারণ একদিকে তা যেমন জনগনের সামনে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে, তেমনি অপরদিকে তা এমন একটি দাবির দিকে মানুষকে চালিত করে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন থাকুক কিন্তু দেশে যেন ব্রিটিশরা সশরীরে উপস্থিত না থাকে। শাসকরা হয়ত সেই দাবি মেনে নিত না বরং তা শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতাই জাগ্রত করত।

এইভাবে নিষ্কাশন-তত্ত্ব একটি দুরূহ সমস্যা তুলে ধরেছিল। এই তত্ত্বে এমন সব সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম। এই তত্ত্বে এমন একটি দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছিল যার ফলশ্রুতিতে একটি চরম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ না ঘটে পারে না, এবং তা হল সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এক সার্বিক রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং পরিশেষে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার জন্য একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দাবির উত্থাপন। এমনকি রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমেও নিষ্কাশন-তত্ত্বের সমর্থকদের সন্তুষ্ট করা যেত না কারণ এই সংস্কারের মাধ্যমে নিষ্কাশনের হেরফের হত না। সুতরাং রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেও নিষ্কাশন-তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক জঙ্গীবাদকেও হ্রাস করা যেত না। উপরন্তু, নিষ্কাশন-তত্ত্ব ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীন সকল দ্বন্দ্বের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট শয়তানের বিরুদ্ধে তার সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিল। এইভাবে, দাদাভাইয়ের অর্থনৈতিক প্রস্তাবনার নেতিবাচক চরিত্রটি তাঁকে ১৯০৪ সালেই সেই আহ্বানটি তুলে ধরতে সক্ষম করেছিল যা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নিছকই নেতিবাচক ও হতাশ ব্যঞ্জক'। সেটি ছিল স্বরাজের আহ্বান। যে-রাণাডে নিজে ১৮৭২ সালে নিষ্কাশন-তত্ত্বের প্রবর্তক হয়েও তাঁর আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেই তত্ত্বকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরই সাথে তুলনায় দাদাভাই হয়ে উঠেছিলেন একজন ধ্বংসেরই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

নিষ্কাশন-তত্ত্বের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক তাৎপর্য যে শুধু তার প্রবক্তাদেরই চোখেই ধরা পড়েছিল তাই নয়, সমালোচকদের চোখে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেই ১৮৮৬ সালেই ভারতের রাজ্য-সচিব, র‍্যাডল্ফ চার্চিল, দেখিয়েছিলেন যে,

> দেশে বিদেশী শাসন চাপিয়ে দেবার ফলে এবং দেশের বাইরে থেকে চাপানো খরচ মেটাবার জন্য যে নতুন কর আরোপ করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত অস্থিরতার মধ্যে রাজনৈতিক বিপদ সংকেত লুক্কায়িত আছে। আশংকা করা যায় যে, এই বিপদের প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে সে সব মানুষদের কোনই মাথা ব্যথা নেই যারা ভারত সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ বা আদৌ ভাবিত নন। কিন্তু যে সব মানুষ সরকারের দায়িত্বশীল পদে আছেন, তারা বহু পূর্বেই একে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপদ হিসেবে দেখে আসছেন।

অনুরূপভাবে 'দি রিয়েল ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থে জে . ডি রি দাদাভাইকে এই বলে একহাত নিয়েছেন যে তিনি তাঁর হিসেবের মধ্যে এই 'সত্যকে ধরেন নি যে স্বরাষ্ট্রখাতে ব্যয় ব্যতীরেকে ভারতে বৃটিশ শাসন চলতে পারে না।' বহু ভারতবাসীও নিষ্কাশন-তত্ত্বের এত ব্যাপক প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ অচিরেই এই তত্ত্ব মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মত একটি অপরিণত দাবির দিকে চালিত করবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাণাডে নিস্কাশনের উপরে এত জোর দেবার ঝোঁকের বিরোধীতা করেছিলেন।

সংক্ষেপে রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে নিস্কাশন-তত্ত্ব ছিল বৈপ্লবিক; রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটিকে এই তত্ত্ব আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছিল; এই তত্ত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সহজাত দ্বন্দ্বটিই ওপরে উঠে এসেছিল, তাই নয় ভারতবর্ষের উপরে ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রভূত্বও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই তত্ত্ব থেকে এই ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় যে কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সবচেয়ে কট্টর ও একনিষ্ঠ ব্যাক্তিরাও ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সমালোচনা এবং জাতীয় নেতৃত্বের প্রস্তাবিত সমাধানসূত্রগুলোকে গ্রহন করে নিলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ্‌রা পর্যন্ত নিস্কাশনের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারত না।

অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করে নিস্কাশন-তত্ত্ব ভারতের জনজীবনকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতেও সাহায্য করেছিল। কারণ, অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে যদিও বা অর্থনৈতিক সুবিধাদি প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাধান করা যায় এবং সেই কারণেই, কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সেইগুলোকে অর্থনৈতিক আলোচনার চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে রাখা, নিষ্কাশনের জন্য রাজনৈতিক সমাধান ভিন্ন আর কিছুই নেই। এইভাবে, নিষ্কাশন-তত্ত্ব রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল।

নিষ্কাশন-তত্ত্বের মধ্যে এমন একটা রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছিল যে তা সহজেই জনসাধারনের কাছে একটি তালু শব্দে পরিণত হয়ে উঠেছিল। নিষ্কাশনের ধারনাটা ছিল এতই সরল ও সহজ যে একজন চাষীও অনায়াসে ব্যাপারটা বুঝে যেত। নিষ্কাশনের ওপরে আলোচনাকারী একজন জাতীয়তাবাদী বক্তা অতীব অশিক্ষিত শ্রোতাদের মধ্যে অতিদ্রুত সমর্থনের সাড়া জাগাতে পারতেন। অর্থনৈতিক শোষণের তত্ত্বগুলির মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী সহজে বোঝা যেত, সেটা হল একদেশ থেকে অন্য দেশে অর্থের চালান, কারণ এইরূপ ঘটনা তাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। নিষ্কাশনের ওপরে আক্রমণের কথা শুনতে শুনতে একজন কৃষক মনে করতেন যেন তার পকেট থেকেই অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। সুদুর কোন দেশের মানুষকে সুখে রাখার জন্যই যে তাদের উপরে কর চাপানো হচ্ছে, এই ভাবনার চেয়ে বেশী করে আর অন্য কোন তত্ত্বই মানুষ্যকে জাগ্রত করতে পারেনি। ফলতঃ একটি কৃষক-প্রধান জাতির কাছে সোচ্চার দাবী হয়ে ওঠার গুণে সমৃদ্ধ ছিল এই নিষ্কাশন-তত্ত্ব। সকল সফল বিপ্লবেরই এই ধরনের স্লোগানের প্রয়োজন আছে

ও থাকে যে 'নিষ্কাশন বন্ধ কর' — কোন সূক্ষ্ম ও জটিল যুক্তি দিয়ে একে প্রমাণ করার দরকার হয় না বরং পরিবর্তে এর মধ্যে রয়েছে একটি আত্ম-প্রমাণের গুণ। বস্তুতঃ এই স্লোগান নিজেই নিজের প্রমাণ। যে বছরগুলোতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তুঙ্গে ছিল, সেই সময়ে এই বিশ্বাস সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, ভারত হল এমন এক 'সোনে কি চিড়িয়া' (স্বর্ণভূমি) যার সব সম্পদ ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয়ে বর্তমানে এই দারিদ্রক্লিষ্ট ও ভিখারীর দশায় পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে সরকারী এবং বেসরকারী ইংরেজ লেখদের তরফ থেকে নিষ্কাশন-তত্ত্বকে আক্রমণ করা হবে। সেই আক্রমণ এমনই তীব্র ও ধারাবাহিক ছিল যে অন্য আর কোন জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব বা দাবিকে এমনটি সহ্য করতে হয়নি। এবং যাঁর ইংরেজ আনুগত্য ছিল সকলের চেয়ে বেশী এবং ইংরেজদের মহানুভবতার প্রতি যাঁর বিশ্বাস ছিল সকলের চেয়ে গভীর, সেই দাদভাই নৌরজীকেই একজন অবাস্তববাদী, উগ্রপন্থী এবং সম্ভবতঃ এমন একজন ভন্ড বলেও অভিযুক্ত করা হয়েছিলো যিনি নাকি ভেতরে ভেতরে ছিলেন ইংরেজ-বিদ্বেষী। কিন্তু অপর দিকে, গান্ধীবাদী যুগের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ যুব সম্প্রদায় যখন রাণাডে, ফিরোজশাহ মেহেতা এবং গোখলের মত উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল মহান মধ্যপন্থী নেতৃত্বকেই সাময়িকভাবে অবহেলা করতে এবং আবেদন-নিবেদনকারী হিসেবে উপহাস করতে শুরু করেছিল, সেই সময়েও দাদাভাইকে তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসেবে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করত।

টীকা

১। নওরোজি, এসেস্, পৃঃ ২৯-৩১।

২। ঐ, পৃঃ ৩৯; এছাড়াও দ্রষ্টব্য পৃ. ৪০-৪১। ভারতবর্ষের উন্নয়ন সম্পর্কিত এই ধারণা দাদাভাই নওরোজির পরবর্তীকালের উপলব্ধির একেবারে বিপরীত। পরের দিকে তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতে বিদেশী লগ্নীর লক্ষ্য আরোও বেশি মাত্রায় লুণ্ঠন।

১৪

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

আমাদের আলোচ্য সময়সীমা কালে কয়েকজন জাতীয় নেতা ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ধারণা গড়ে তোলেন। ১৮৯২ সালে পুনার ডেকান কলেজে 'ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণে বিচারপতি রানাডে বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবিস্তারে আলোচনা করেন। ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত সাহিত্যে রাণাডের মূল তত্ত্বগুলি এত বেশি সুপরিচিত যে সে বিষয়ে এখানে বিশদভাবে কিছু বলার নেই।[১] যেটা সম্ভবতঃ ভাল ভাবে জানা নেই তা হচ্ছে ব্যাপক হারে জাতীয় নেতৃত্বের সর্বস্তরে তাঁর অভিমত গৃহীত হয়েছিল। রাণাডের মূল বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায় ঃ

ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বের সর্বত্র চূড়ান্তভাবে, স্থান ও কাল নির্বিশেষে এবং অর্থনৈতিকভাবে বিকাশের সমস্ত স্তরে প্রমাণিকভাবে একই প্রকার থাকবে এই দাবি মোটেই সত্য নয়। ধ্রুপদী অর্থনীতি এমন সব অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত যেগুলি বিশ্বব্যাপি প্রযোজ্য নয়; সেগুলির উদ্ভব হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিশেষ অবস্থার মধ্যে এবং প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কোনো সমাজের পক্ষেই যেগুলির আর উপযোগিতা নেই। বিশেষভাবে ভারতের মত একটা পশ্চাদ্‌পর কৃষিপ্রধান দেশে—যেখানে প্রতিযোগীতা নয়, প্রতিষ্ঠা, রীতি এবং প্রথাই হ'ল আসল ব্যাপার সেখানে এসবের কোনো সার্থকতা নেই বললেই হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের অতীত আচরণ এবং অন্যান্য জাতি সমূহের বর্তমান ব্যবহার মোটেই ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের প্রচারিত নীতি অথবা অঙ্গীকার সমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সত্য কথা বলতে গেলে রেল কোম্পানিগুলিকে গ্যারান্টী এবং বাগিচা-শিল্পকে সহায়তা দেবার সময় অথবা ভূমির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার দাবি জানাবার সময় অথবা প্রজাস্বত্ব আইনের সাহায্যে ক্ষুদ্র কৃষি-সংস্কৃতি জীইয়ে রাখার সময় স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার সেই সব নীতি সঠিকভাবে মেনে চলেননি। তৃতীয়তঃ ধ্রুপদী অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক দাবিগুলি সম্বন্ধে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান অর্থনীতিবিদেরা নানা গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন এমনকি কয়েকজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদও তার বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে ধ্রুপদী পন্ডিতদের কেউ কেউ তাঁদের বিজ্ঞানের পরমার্থ তথা সার্বত্রিকতার দাবি এড়িয়ে যেতে বেশ সচেষ্ট। চতুর্থতঃ ধ্রুপদী শাস্ত্র বড় জোর স্থিতিশীল অর্থনীতির লক্ষণ গুলিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল রাখবার ক্ষমতা তার নেই বললেই হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে অর্থনীতির তত্ত্ব অথবা ধর্ম পদার্থবিদ্যা অথবা অঙ্কশাস্ত্রের মতন শুদ্ধ অথবা সার্বত্রিক নয়, বরং আপেক্ষিক এবং ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত এবং এদ্দ্বারা প্রভাবিত; স্থান এবং কাল অনুসারে সেগুলিও

পরিবর্তনসাপেক্ষ। সুতরাং কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিছক অর্থনৈতিক তত্ত্ব নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশেষ স্তরই নির্ণয়ক ভূমিকা হওয়া উচিত।

মনে রাখা প্রয়োজন, রাণাডে অর্থনীতির তত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান হিসাবে অর্থনীতির সার্থকতা অস্বীকার করেননি। বরং যাঁরা অর্থনীতিকে আর্টের পর্যায়ে—নিছক অভিজ্ঞতা নির্ভর হাতুড়ে বিদ্যায় নামিয়ে আনতে চাইতেন, রাণাডে বিশেষ করে তাঁদের যুক্তির বিরোধীতা করতেন। অর্থনীতিকে তিনি কর্মের ভিত্তিতে 'আরো সূক্ষ্ম এবং বৈজ্ঞানিক' রূপ দিতে চাইতেন। তাঁর অভিমত ছিল যেহেতু অর্থনীতি একটি সমাজ-বিজ্ঞান এই বিদ্যার নীতি নির্ণয় করতে হবে অবরোহ পদ্ধতিতে নয়—ইতিহাসের পাতা থেকে, এবং সুনির্দিষ্ট অ র্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুধাবনের দ্বারা, যাতে সেই নীতির সঙ্গে ইতিহাসের শিক্ষা, বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক সত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। অথবা ডি.জি. কার্ভের ভাষায়, 'রাণাডের কাছে অর্থনীতির কেবলমাত্র ব্যাপক, সমাজবিদ্যা বিষয়ক এবং গঠনমূলক রূপটিই গ্রহণীয় ছিল।'[১] 'অবাধ বাণিজ্যের' প্রশ্নটাকে ' কেবলমাত্র আর্থিক দৃষ্টিকোম থেকে' দেখার এবং প্রশ্নটার রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলি উপেক্ষা করার জন্য রাণাডে ১৮৮১ সালে ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন যে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে যদি মাস্টার মশাইদের অধিবিদ্যার চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে টাকা পয়সার হিসাবটাকে অবশ্যই জাতির প্রয়োজন তথা আশা-আকাঙ্খার বৃহত্তর স্বার্থের নিম্নে স্থান দিতে হবে। তিনি বলতেন এই কারণেই 'ফলিত অর্থৎ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' কথাটা ব্যবহৃত হয় 'শুদ্ধ অর্থনীতি' নয়। অন্ততঃ এই দিক দিয়ে রানাডে ধ্রুপদী পন্ডিতদের অনুসৃত পন্থার প্রতি অনুগত থেকেছেন এবং অধিকাংশ সময়ই অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বলে অভিহিত করেছেন।

রাণাডের ধ্রুপদী অর্থনীতির সমালোচনা কালক্রমে জাতীয় অথবা ভাবতীয় অর্থনীতি ধাবার সূত্রপাত করল। আমাদের মতে প্রধানতঃ দুটি কারণে এটা ঘটেছিল। প্রথমটা ছিল রাণাডের সিদ্ধান্ত যে, যেহেতু ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং পবিবেশ ইংল্যান্ডের থেকে ভিন্নতর, ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলীও তাই ভিন্নতর হতে বাধ্য। কেননা রানাডে বিশ্বাস করতেন যে অর্থনীতির তত্ত্বগুলি আপেক্ষিক এবং অনেকটা পরিমাণে সামাজিক বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল এবং প্রকৃত আর্থিক ক্রিয়াকান্ড তাতে প্রতিফলিত হবেই। দ্বিতীয় কারণটা ছিল এই যে রানাডের বহু সহযোগী তাঁর পূর্বানুমান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

কার্যত এই কারণেই আমরা দেখি সুদূর ১৮৭৭ সালে কে. টি. তেলাং ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টি. ই. ক্লিক-লেসলিকে উদ্ধৃত ক'রে বলছেন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির তত্ত্বাবলী সর্বদেশের পক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। তিনি আরো বলেছিলেন বাস্তব প্রশ্নাবলীর মীমাংসার সময় অর্থনীতির কায়দাকানুন বিচার্য নানা বিষয়ের মধ্যে একটা মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণের প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দাদাভাই নৌরজী তাঁর ' দি পভাটি অব

ইন্ডিয়া' গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নিজেদের দ্বারা শাসিত কোনো দেশের পক্ষে সঠিক পদ্ধতি হতে পারে কিন্তু পরাধীন একটা দেশ যাকে বিদেশে নানা খাতে টাকা পাঠাতে হয় তার পক্ষে সে নীতি পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। একটা দেশের সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা ক'রেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির শুদ্ধ তত্ত্বটি যান্ত্রিকভাবে সে দেশের উপর চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে পৃথ্বিশ চন্দ্র রায়ও তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন। তাছাড়া তিনি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের মহাদেশীয় অঞ্চলের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের গোঁড়ামিপ্রসূত আত্মতৃপ্তির প্রমাণ দেখিয়েছিলেন।[৩] জি. ভি. যোশী সরাসরি অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি প্রশ্ন তিনি যেভাবে দেখেছেন তা থেকে রাণাডে তত্ত্বের মৌলিক কাঠামোর প্রতি তাঁর নিকট সাযুজ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। রমেশ চন্দ্র দত্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর মন্তব্য করেননি কিন্তু এটা অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন যে রিকার্ডো, কবডেন, ব্রাইট এবং রবার্ট পীল যখন ইংল্যান্ডে অবাধ বাণিজ্যের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছিলেন ঠিক তখনই সেদেশে প্রবেশকারী ভারতীয় পণ্যের উপর চড়া হারে কর বসানোর ব্যাপারটা তাঁরা উপেক্ষা ক'রে গিয়েছেন। ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদদের এ বিষয়ে আরো বেশি পক্ষপাতহীন মনোভাব গ্রহণ করাব জন্য তাঁদের প্রশংসা করতে তিনি যেমন ভোলেননি তেমনি ইংরেজ রাজনীতিবিদরা যে স্বদেশ এবং ভারতে দু'মুখো নীতি অবলম্বন করে থাকেন সেটাও তিনি নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমস্যাবলী সম্বন্ধে জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁর 'সাম ইকনমিক আস্পেক্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছিলেন এবং তাতে দীর্ঘ এক পরিশিষ্ট যোগ করেছিলেন যার নাম ছিল ' ইংলিশ ইকনমিস্টস্ ইন ইন্ডিয়া।' যদিও তিনি স্পষ্টতঃ রাণাডে প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেছিলেন তবুও বিষয়টা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। অবাধ বাণিজ্য প্রসঙ্গে তিনি জার্মানি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণ নীতির উদাহরণ সহযোগে দেখালেন যে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হয় জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে, অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা নয়। তিনি মন্তব্য করলেন যে ইংল্যান্ডের বিশেষ অবস্থানের কারণে অবাধ বাণিজ্যতত্ত্ব তার পাশে বেশ উপযোগী, পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। তত্ত্বগত সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, ধ্রুপদী অর্থনীতি 'একপেশে এবং অসম্পূর্ণ ' এবং অন্যান্য দেশের প্রতি প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া রাণাডের মতই তিনি বললেন, 'অর্থবিজ্ঞানের ধর্ম জাতিবিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং বিশেষ বিশেষ পরিবেশ তথা অবস্থা নির্বিশেষে সর্বত্র প্রযোজ্য নয়'। তিনি আরো দেখালেন ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি কোনদিনই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি। 'মধ্যযুগীয় কালের অবলুপ্তির পর থেকেই ধারণা তত্ত্ব এবং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।'[৪] অ্যাডাম স্মিথের নিজের অধিষ্ঠানই তো একটা বিশেষ সময়বিন্দুতে। সমাজের মধ্যেই যে অর্থনৈতিক ভাবনার জন্ম এ কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ করে জি.

এস. আইয়ার লিখলেন, 'সমাজের বিশেষ পরিবেশ এবং তার ভবিষ্যৎ তথা বর্তমান প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলি অর্থনৈতিক ভাবনাকে যেভাবে রূপায়িত করেছিল যা চিন্তাবিদদের অনুমোদন এবং রাজনীতিবিদদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।' সুতরাং এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল যে ভারতের ক্ষেত্রে গোঁড়া অর্থনীতির তত্ত্ব পরিমার্জন করা ছাড়া উপায় নেই কেননা 'ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং যে পরিবেশের মধ্যে তা রক্ষা করতে হবে' সবকিছুই ইউরোপ এবং আমেরিকার থেকে অন্য রকম। তিনি আরো বললেন যে, ইংরেজরা ভারতে যে ভাবে চলেন তাতে গোঁড়া অর্থনীতির বহু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছে যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে সেসব ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে শুধুমাত্র উঠতি শ্রেণীটীকে সমর্থন করার জন্য এবং তাঁদের রক্ষা করার জন্য।'

অর্থনৈতিক তত্ত্বের আপেক্ষিকতা এবং তত্ব এবং ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ—এ বিষয়টির গুরুত্ব সংবাদপত্রের জনপ্রিয় স্তরেও আলোচনাও হ'ত। যেমন, অমৃতবাজার পত্রিকা বহু পূর্বে ১ ডিসেম্বর ১৮৭০ সংখ্যায় লিখেছিল, 'বহু ব্যাপারে ভারতের অবস্থা তার নিজস্ব ধরনের। সুতরাং অন্য দেশের জন্য তৈরি নিয়ম-কানুন এদেশে খাটতে নাও পারে।' হিন্দু ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সংখ্যায় লিখল ঃ 'ইউরোপীয় অর্থনীতির নিয়ম কানুন প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রয়োগ করার সময় সে সব দেশের বৈশিষ্টগুলি অবশ্যই বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। আর যাই হ'ক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।' মরাঠা ২ এপ্রিল ১৮৯৯ সংখ্যায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে রসায়ন শাস্ত্রের মতন একটি বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা কারার জন্য অ্যাডাম স্মিম এবং করডেনোর সমালোচনা করল। কাগজের অভিমত ছিল কি ভাবে ইংল্যান্ডের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় সে অন্বেষণে তাঁরা যথাযথ-ভাবেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের হাতে প্রশ্নটার নির্দিষ্ট প্রকরণ ক্রমশঃ লোপ পেতে লাগল আর বিশেষ থেকে অবিশেষ উল্লম্ফনটা হয়ে পড়ল অতি সহজ এবং দ্রুত। কাগজের অভিমত ছিল আর যাই হক না কেন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ইংল্যান্ডের অবস্থার চাইতে ভিন্ন হবার কারণে এখানে প্রযোজ্য নিয়ম কানুনও ভিন্নরূপ হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষকে যে পন্ডিতদের খামখেয়ালির জন্য বিকিয়ে দেওয়া হবে না একথা জানান দেবার পর কাগজটি ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলল সরকার যেন 'বরাবরের মতন ঘোষনা করে দেন যে তাঁরা ইংল্যান্ডের কাছ থেকে অর্থনীতি ধার করতে যাচ্ছেন না।' উপসংহারে কাগজটি 'জাতীয় অর্থনীতি' গঠন করার আবেদন রাখল। বিপিন চন্দ্র পালের নিউ ইন্ডিয়াও এপ্রিল ২১, ১৯০২ সংখ্যায় 'সামাজিক গঠন জলবায়ু তথা ইতিহাসগত পরিবেশের দিক থেকে একটা জাতির সঙ্গে আর একটা জাতির যে বিপুল বৈসাদৃশ্য রয়েছে' তার সঙ্গে অর্থনৈতিক তত্ত্বের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নিয়ে বিশদ আলোচনা করল। তারপর অর্থনৈতিক তত্ত্বের সামাজিক মূলনির্ণয় ক'রে মন্তব্য করল যে অর্থনৈতিক ভাবনাগুলি 'একটা বিশেষ দেশের অথবা একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ শিল্প পরিবেশের ফল। সুতরাং সে ভাবনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেবে।' ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে

আন্দোলন চালাবার সময় অনেক নেতাই অর্থনৈতিক তত্ত্বের আপেক্ষিকতা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

উপরে উল্লিখিত অনেক নেতাই একটা ব্যাপারে রাণাডের অবস্থান থেকে স্পষ্টই কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। এটা তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন যে শুধু ইংল্যান্ড নয় ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত দেশ থেকে ভারতের যে প্রভেদ সেটার স্বরূপ আসলে রাজনৈতিক, কেননা ভারতের অর্থনীতি তথা অর্থ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিদেশি শক্তির দ্বারা।

১. রাষ্ট্রের ভূমিকা

দেশের প্রমুখ জাতীয় অর্থনীতিবিদেরা ধ্রুপদী অর্থনীতির অন্যতম তত্ত্ব রাষ্ট্রের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ মতবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্র শুধু শান্তি এবং শৃঙ্খলারক্ষার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে এই তত্ত্ব তাঁদের কাছে গ্রহণীয় ছিল না। তাঁরা বলতেন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি এমনভাবে প্রসারিত করা উচিত যার ফলে যেসব বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তুলনায় কম কার্যকর হয়ে থাকে সে রকম সমস্ত বিষয় রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই দিক দিয়ে রাষ্ট্র হবে জাতীয় প্রয়োজনে জাতীর ইচ্ছার একীভূত মুখপাত্র। তাঁরা আরো বলতেন ভারতের মতন পশ্চাদপর একটি দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক প্রয়োজনের অভিভাবক হিসাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। কেননা এখানে জনসাধারণ যাতে তাঁদের জন্মগত দুর্বলতা, জাড্য এবং শক্তিমান বিদেশীদের তুলনায় দূর্বল প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেন সেজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।[৫] জি. ভি. যোশী বলতেন যে ভারতে অর্থনীতির নিষ্করুন প্রতিযোগিতা এবং প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করার এবং ন্যূনতম আর্থিক বিঘ্ন ঘটিয়ে হস্তশিল্প থেকে আধুনিক শিল্পে অনিবার্য উত্তরণের পথে সঠিক পথনির্দেশ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র কতদুর হস্তক্ষেপ করতে পারে সে বিষয় বিচারপতি রাণাডে এবং জি. ভি. যোশীর মধ্যে কিছু মত পার্থক্য ছিল। রাণাডে কোনোরকম তত্ত্বগত সীমানা নির্ধারণে বিরোধী ছিলেন এবং বলতেন জাতির প্রয়োজনই হবে একমাত্র নির্ণায়ক। তাঁর উক্তি অনুযায়ী, 'প্রশ্নটা হচ্ছে সময়, উপযুক্ততা এবং সুযোগের; স্বাধীনতা তথা অধিকারের নয়।' অন্যদিকে জি . ভি. যোশী বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একটা অসাধারন ব্যাপার সুতরাং বিধিনিষেধের দ্বারা সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যাতে বেসরকারি উদ্যোগকে সাহায্য করার বদলে তাকে দাবিয়ে রাখা অথবা একেবারে মুছে ফেলা না হয়।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার সমর্থন করার সময় রাণাডে এবং জি. সুব্রহ্মণ্য আইয়ার ব্যক্তির সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বার্থজ্ঞান তত্ত্ব — যার পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক মানব এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির ধারনা — তার উপর তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সম্মিলিত কল্যাণকর্ম — এই নীতি প্রচার করেছিলেন। রাণাডের ভাষায় নীতিটা এই প্রকার ঃ

> আধুনিক চিন্তাধারা ক্রমশই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চলেছে যে এই নীতির আসল কেন্দ্র বিন্দুটা হবে রাষ্ট্র আর ব্যক্তি হবে রাষ্ট্রেরই অঙ্গ। সম্মিলিত সুরক্ষা তথা কল্যাণ ব্যবস্থা। সামাজিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ — নিছক স্বার্থ চিন্তা নয় — সব কিছুকেই এই ব্যবস্থায় আনতে হবে । অন্যথায় নীতিটা অলীক স্বপ্নমাত্র থেকে যাবে।

অনুরূপভাবে জি. এস. আইয়ার এই বলে অ্যাডাম স্মিথের সমালোচনা করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নিজ লাভের জন্য নিরন্তর খেটে চলা একটা স্বার্থময় বস্ত্র হিসাবে দেখেছেন. ব্যক্তিকে যে 'তাঁর প্রতিবেশীর সঙ্গে, তাঁর জন্মভূমির সঙ্গে এবং সবশেষে সারা বিশ্বের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে হয়' সে বিষয়ের উপর তিনি উচিত গুরুত্ব আরোপ করেননি। জার্মান ঐতিহাসিক ধারার অনুসরণে তিনি বললেন ঃ

> ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ আপাত স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়, বরং এতে প্রায়শঃই এর বিপরীতটাই ঘটে থাকে। জাতির ঐক্য রক্ষা ও উন্নতিবিধানের মধ্যেই ব্যক্তির সুরক্ষা। কল্যান এবং সংস্কৃতি নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থকে অন্য সব কিছুর মতন জাতির সংগঠন এবং শক্তি বৃদ্ধির নিম্নে স্থান দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে জি. ভি. যোশীর মন্তব্যটি ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডে 'অবাধ বাণিজ্য নীতি' মতবাদের জন্মের মূলে ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক একশ্রেণীর মানুষকে বঞ্চিত করে অন্য এক শ্রেণীর সাহায্য করার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তিনি মানতেন যে রাষ্ট্র যেখানে 'একটা বিশেষ শ্রেণীকে দাক্ষিণ্য দেখাবে এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের বদলে একটা অংশমাত্রর স্বার্থবৃদ্ধিতে সহায়তা দেবে সেখানে সঙ্গত কারণেই আপত্তি তোলা যেতে পারে।' কিন্তু ভারতের বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা 'এখানে শ্রেণীস্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বিরোধ নেই। শ্রেণীগুলি এখানে অন্যান্য দেশের মতন সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত নয়'। এখানে রাষ্ট্রকে এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে সাহায্য করতে অথবা পুঁজিপতি শ্রেণীকে দাক্ষিণ্য দেখাতে বলা হচ্ছে না; রাষ্ট্রকে শুধু বলা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে অসহায় এই জাতিটাকে সাহায্য করতে। শক্তিশালী বিদেশীদের প্রতিযোগীতার ফলে ভারতের সমস্ত শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকলেই সমান আগ্রহশীল।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার আছে এবং সমষ্টির হিত ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে এই যুগ্ম মতবাদের ভিত্তিতে নেতারা দাবি জানালেন যে দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারকে একটা সুস্পষ্ট সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়মিত নীতি গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের অনেকেই কৃষির জন্য নানা ধরনের সরকারি সহায্যের দাবিও রাখলেন। সরকার সমগ্র সমাজের অভিভাবক এই যুক্তিটা রাণাডে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগালেন। কৃষকদের রক্ষার্থে এবং মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণে আইন ব্যবস্থার প্রতি তিনি সমর্থন জানালেন। জাতীয় সম্পদের আরো সুষম বন্টনের আবেদনও তিনি রাখলেন।[৮] অনুরূপভাবে শ্রম এবং পুঁজির অসম সংগ্রামে সরকারের দুর্বল পক্ষকে রক্ষার

দায়িত্ব রয়েছে এই যুক্তিতে জি. এস. আইয়ারও শ্রমিকদের স্বার্থে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুপারিশ করলেন। অবশ্য এখানে আর একবার ব'লে রাখা উচিত বেশ কিছু নেতা বেসরকারী শিল্পোদ্যগের নিরুপদ্রব কর্মধারায় যে কোনো রকম সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

এই জায়গায় এসে আমাদের একটু সাবধান হতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার আছে এই তত্ত্বের প্রতি জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের সমর্থন এবং তাঁদের শিল্পের সরকারী সাহায্যদানের দাবি— যেটা ক্ষেত্রবিশেষ হয়ত বা প্রত্যক্ষ সরকারি উদ্যোগের রূপও নিতে পারত— এ দুটোর সঙ্গে সমাজতন্ত্র এমনকি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বাসনা যাতে এক ক'রে ফেলা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই অর্থনীতিবিদরা মোটেই সমাজতন্ত্র—এমনকি ধনতন্ত্রেরও — ওকালতি করেননি। তাঁরা শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন যে কৃষি-অর্থনীতি থেকে শিল্প-ধনতন্ত্রে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্র উৎসাহ যোগাক এবং একটু সাহায্য করুক। পশ্চাদ্‌পর একটা দেশের বেসরকারি উদ্যোগের অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারকে অনুপ্রাণিত করা—এইটুকুই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। রাণাডে যে রাষ্ট্রকে এই কর্তব্যটুকুই পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর নিম্নোক্ত কয়েকটি রচনার অনুধাবন থেকে ঃ 'নেদারল্যান্ড্‌স ইন্ডিয়া এ্যান্ড কালচার সিস্টেম্', 'আয়রণ ইন্‌ডাস্ট্রি—পায়োনিয়ার অ্যাটেম্প্‌টস' এবং 'ইনডাস্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্স।' ১৮৮৬ সালে একটা অজানা ঘটনার মধ্য দিয়েও রাণাডের মনোভাব জানা যায়। এমনিতে তাঁর মত ছিল যে সরকারি অফিসগুলিতে যত রকম মালপত্র লাগে এবং যেগুলির উৎপাদনে দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেগুলি সরকারি কারখানায় উৎপাদন করা উচিত। কিন্তু ১৮৮৬ সালের অর্থ কমিটির রিপোর্টের প্রতি বিমত জ্ঞাপন ক'রে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে তিনি জেলের উৎপাদনের উপর কমিটির প্রস্তাবিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এর ফলে জনসাধারণের অর্থের সাহায্যে সমস্ত প্রকার বেসরকারি প্রতিযোগীতা দাবিয়ে রাখার সরকারি প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষভাবে তিনি দেশের টাকায় জেলখানাকে বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি চালানো ছাপাখানার কাজকর্ম করা ত্রিপল, কাগজ, কার্পেট প্রভৃতি বানাবার কাজে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন। অন্য কথায় ভারতীয় বেসরকারী উদ্যোগ যেসব পণ্য উৎপাদন করত জেলাগুলিকে সেগুলির উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র অথবা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের ইঙ্গিত জি. ভি. যোশী আরো প্রবলভাবে এবং স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করতেন। তাই তিনি ১৮৯০ সালে লিখলেন ঃ '১৮৪৮ সালের সাময়িক সরকার স্থাপনের নিদারুণ আত্মঘাতী প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যেমনটি করা হয়েছিল সেই ধরণের রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের ভাবনা অবশ্যই আমাদের পরিকল্পনায় নেই।' প্রথমতঃ তিনি বার বার বলেছেন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সহায়হীন ভারতীয় উদ্যোগী এবং প্রাগ্রসর বিদেশিদের মধ্যে অসম সংগ্রামে একটু সুবিচারের ব্যবস্থা করা যাতে ভারতীয়দের প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ তিনি এই ব্যাপারটার

উপর জোর দিতেন যে শিল্পবিকাশ হচ্ছে মূলতঃ ব্যক্তিগত প্রয়াসের বিশেষ অধিকারের অন্তর্গত এবং সেই প্রয়াসেরই ফল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে সাময়িক এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাকে স্বনির্ভরতার পথে সাহায্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সেই স্বনির্ভরতা অর্জন করা মাত্র রাষ্ট্রীয় সহায়তা অচল হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, সেই অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা অনুচিত হবে। তৃতীয়তঃ সরকারি সাহায্য হয়ত শেষ পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোগকে হঠিয়ে দেবার আগ্রাসী মনোভাবে পরিণত হবে এই আশঙ্কায় তিনি প্রস্তাব দিলেন, ' সেই সহায়তাকে কার্যপরিধি, উদ্দেশ্য এবং সময়কালের সুস্পষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে।' অবশেষে তিনি এই জন্য সরকারের সমালোচনা করলেন যে সেচের কাজ, বনসংরক্ষণ এবং তগাবি ঋণের দেখা শোনার কাজ সরকারের নিজেদের লোকেদের দিয়ে করানো হচ্ছে — যদিও কাজগুলি বেরকারি দেশীয় উদ্যোক্তাদের দ্বারা—প্রয়োজনে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন কি ভরতুকি দিয়েও করানো উচিত।

২. ভূমিরাজস্ব — কর না খাজনা?

সরকারি তত্ত্বের যৌক্তিকতার সঙ্গে নেতাদের মতানৈক্যের আর একটা ক্ষেত্র ছিল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। মতভেদের প্রধান বিষয়গুলি ছিল ভূমিরাজস্বের প্রকৃতি এবং কৃষিজমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে। ভারতীয় প্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমতটা ছিল এই যে স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রই ছিল জমির প্রকৃত মালিক এবং কৃষক বা জমির ধারক মূলতঃ রাষ্ট্রের প্রজা ব'লে গণ্য হয়ে এসেছেন। ফলে জমির ধারকেরা সরকারকে যে রাজস্ব প্রদান ক'রে থাকেন সেটা প্রকৃতিতে ভাড়া, কর নয়।[৭] জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদেরা এবং অন্যানা নেতারা এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁরা বলতেন বিশ্বের অন্যত্র যেমন, ভারতেও ভূমির ধারকেরা তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে তার নিজের জমির মালিক। একথা অস্বীকার করার অর্থই হ'ল অতীতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা এবং বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে পর্যন্ত অস্বীকার করা। সুতরাং তাঁদের দাবি ছিল সরকার ভূমিরাজস্ব হিসাবে যা আদায় করেন আসলে তা হচ্ছে কর এবং অন্যান্য দেশে যেমন হয় সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্যই করটা আদায় করা হয়ে থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সরকারি মুখপাত্রেরা যেখানে বক্তব্য রাখতেন যে ভূমির চূড়ান্ত মালিকানা দাবির মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকেরা দেশের পূর্ববর্তী শাসকদের নীতির অনুসরণ করছেন মাত্র, সেখানে জি. ভি. যোশীর পাল্টা জবাব দিল, ' আসলে পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণাগুলি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে যত্রতত্র ভারতীয় জীবন ধারার প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেই' এই সব কথা বলা হচ্ছে।[৮]

ভারতীয় ভূমি রাজস্ব প্রথার রিকার্ডিয়কে রাণাডে এবং যোশী আঘাত হেনেছিলেন। সরকারের তত্ত্ব তথা কর্মের পিছনে এই অঙ্গীকারটা কাজ করত যে রাষ্ট্রের অথবা ভাবতীয় জমিদারের প্রজা হচ্ছেন আসলে জনৈক পুঁজিবাদী কৃষক যিনি রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক খাজনা প্রদান ক'রে থাকেন। অর্থনৈতিক খাজনা হ'ল ভাল জমিতে উৎপন্ন পণ্য এবং

সবচাইতে নিকৃষ্ট জমিতে উৎপন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রান্তিক চাষের জন্য যে নীট খরচ হয় সেই দুই খরচের তফাৎটা। এই সংজ্ঞা অনুসারে প্রচলিত হারে উৎপাদনকারীর শ্রমের খরচ এবং প্রচলিত মুনাফার হারে পুঁজির খরচও ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে খাজনার এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতের ভূস্বামী হিসাবে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক খাজনার সবটাই ভূমিরাজস্ব হিসাবে নিয়ে নিতে পারে। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই এবং পণ্যমূল্য অথবা পারিশ্রমিক যেগুলি নির্ধারিত হয় প্রান্তিক জমিতে উৎপাদনের খরচের দ্বারা— সেগুলিরও হেরফের হবার কোনো আবশ্যকতা নেই। রাণাডে এবং যোশী এমনিতে রিকার্ডিয় খাজনা তত্ত্বের সমালোচনা করেননি কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন ভারতের পক্ষে সে তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। 'ধ্রুপদী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি অনুযায়ী পুঁজিবাদী কৃষকের অর্থনৈতিক খাজনা নির্ধারিত হয় পুঁজির প্রতিযোগিতা, জনসমষ্টির আয়তন এবং জমির বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা।' রাণাডের যুক্তি ছিল যে যেহেতু রাষ্ট্র এদেশের চূড়ান্ত ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছে কৃষক যে খাজনাটা দিচ্ছেন সেটা প্রতিযোগিতামূলক নয়, একচেটিয়া খাজনা, যেটা সরকার যতখানি ইচ্ছা বাড়িয়ে দিতে পারেন এবং যেটা প্রায়ই কৃষকের লাভ এবং বেতনের মধ্যে প্রবেশ করে। যোশীর আপত্তি ছিল আরো মূলগত। তিনি দেখালেন যে রিকার্ডিয় তত্ত্ব পুঁজিবাদী কৃষকের অস্তিত্ব অনুমান ক'রে নিচ্ছে যদিও ভারতে তাঁর অস্তিত্বই নেই। কি জমিদারি কি রায়তওয়ারি এলাকায় চরিত্রের দিক থেকে ভারতীয় চাষী ক্ষুদ্র প্রজা মাত্র। মোটেই আর্থিক লাভের আশায় অনুপ্রাণিত পুঁজিবাদী কৃষক নন। তাঁর মতে এই অবস্থার জন্য দায়ী দুটো মৌলিক ব্যাপার। প্রথমতঃ সর্বাগ্রে কৃষক চান কোনোমতে বেঁচে থাকা। লগ্নী পুঁজির উপর লাভ নয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, চাষযোগ্য পতিত জমির ক্রমাবলুপ্তি এবং অ-কৃষিমূলক শিল্পের ব্যর্থতার কারণে কৃষকদের মধ্যে জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা। ফলটা এই দাঁড়ায় যে 'অর্থনীতির নির্মম প্রয়োজন' দ্বারা তাড়িত হয়ে এবং একমাত্র সম্বল জমিটুকু খুইয়ে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে সরকার বা ব্যক্তিক ভূস্বামী দ্বারা আরোপিত প্রায় যে কোনো শর্তে কৃষক রাজি হয়ে যান। এমনকি তার দ্বারা যদি ন্যূনতম জীবিকাস্তরের নিচে নেমে যেতেও হয়।

রিকার্ডিয় খাজনাতত্ত্বের এক অনুসিদ্ধান্ত — অনুপার্জিত আয়েরও রাণাডে এবং যোশী সমালোচনা করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো একখণ্ড জমির খাজনা যদি এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে ইতিমধ্যে সেই জমিতে কিছু মূলধন লগ্নী করা হয়ে থাকলে সেই মূলধনের উপর প্রচলিত হারে মুনাফার চাইতেও সেই বৃদ্ধিটা বেশি দাঁড়ায় তাহলে এই দুয়ের মধ্যে তফাৎটা হবে খাজনার অনুপার্জিত আয়। এই অনুপার্জিত আয় আসলে সার্বিক (general) মুনাফাহারের হ্রাস এবং সমাজের (Community) সার্বিক প্রগতির সুফল সুতবাং ন্যায্য কারণেই আয়টা দেশের (Society) অধিকারে যাওয়া উচিত, ভূস্বামীর কবলে নয় কেননা সে আয়টা পরগাছার মতন আত্মসাৎ করার তাঁর একটা ইচ্ছা থেকে যাবে। রাণাডে এবং যোশী এই বলে আপত্তি করলেন যে ভারতীয় রাজস্ব-ব্যবস্থায়

এই তত্ত্বের প্রয়োগ করার সময় ধরে নিতে হবে যে সমাজে, অর্থনীতিতে এবং খাজনায় ঊর্ধ্বগতি চলছে অথচ জমির মালিকানায় স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে, যদিও বাস্তবে এ রকম ধারণা করার কোনো করণ নেই। ইংল্যান্ডে দেখা যায় একই পরিবারের হাতে বংশ পরম্পরায় জমি রায়ে গিয়েছে অথচ ভারতে ঘন ঘন জমির মালিকানা বদল হচ্ছে, যার ফলে প্রত্যেক নুতন মালিককে জমির বর্তমান দামের পুরোটাই শোধ করতে হচ্ছে কি অর্জিত কি অনুপার্জিত— এবং এই প্রক্রিয়ায় অতীতেব অনুপার্জিত আয় সবটাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া যোশীর আরো মন্তব্য ছিল যে অনুপার্জিত আয়ের সন্ধানে ভারতের রাজস্ব কর্তারা প্রায়ই গায়ের জোরে খাঁজনাবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেন এবং সেটা করতে গিয়ে চাষীর রুজিতে হাত দিয়ে ফেলেন।[৯]

৩. অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ

অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীদের প্রথম থেকেই গভীর আগ্রহ ছিল। সেই ১৮৭৭ সালে কে. টি. তেলাং 'অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে'—শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন 'শুধু সামাজিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, শিল্পের দিক থেকেও বিষয়টা আমদের দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে বিজড়িত যে এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের গুরুত্বটা বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়।'

নেতারা এই দাবিতে প্রায় ঐক্যমত হলেন যে দেশের সুস্থ অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সরকারের অবশ্যই উচিত জায়মান শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের দ্বারা সাহায্য করা। জি. সুব্রামণ্য আইয়ার ১৯৩০ সালে লিখলেনঃ

> দেশের সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে অকৃষিমূলক নানাবিধ বৃত্তির সৃষ্টি। ... এটা করা সম্ভব সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে। যতদিন এই অবাধ বাণিজ্য এবং অসম প্রতিযোগীতা চলতে থাকবে ততদিন ভারতের পার্থিব সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের কোনোই আশা নেই। দেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্য এবং কাঁচামাল যাতে দেশেরই প্রয়োজনে অভ্যান্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখা যায় সেজন্য সেগুলির রপ্তানির উপর কর বসানো এবং দেশীয় শিল্প যাতে ঠিকমত বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্যাদির আমদানি বন্ধের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর সংরক্ষণ মূলক শুল্ক বসানো — একমাত্র এই নীতিই ভারতকে রক্ষা করতে সক্ষম।

কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার প্রথম ২০ বৎসরের মধ্যে একেবারের জন্যেও সংরক্ষণের দাবি তোলেনি। এর কারণ কিছুটা হয়ত ছিল ইংল্যান্ডে অবস্থিত তাঁদের ব্যাডিক্যাল বন্ধুদের প্রতি সমীহা, কিছুটা হয়ত তাঁদের অনীহা, কেননা ব্রিটেন এমন কঠোরভাবে অবাধ বাণিজ্যনীতি মেনে চলত যে সে বিষয়ে কোনো দাবিই রাজনৈতিকভাবে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।[১০]

অবাধ বাণিজ্য মতবাদ যে সংরক্ষণের দ্বারা শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অন্যতম প্রধান অন্তরায়

এটা উপলব্ধি ক'রে নেতারা ভারতীয় পরিবেশে সেই মতবাদের অসারত্ব প্রমাণ করতে এবং সংরক্ষণ নীতি যে ক্ষতি করার বদলে ভারতের দীর্ঘকালীন স্বার্থের পক্ষে উপকারক হবে একথা বোঝাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। কে. টি. তেলাং ১৮৭৭ সালে পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরবর্তী অনেক লেখকই তাঁর সেই কাজের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন বলে মনে হয়।

অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নেতাদের প্রধান অভিযোগ ছিল ভারতের মাটিতে এ নীতি উপযুক্ত নয়। এই নীতি হয়ত ইংল্যান্ডের উপকার করেছে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতির একমাত্র অবদান হচ্ছে শিল্পের ধ্বংস সাধন। তাঁদের আরো যুক্তি ছিল অবাধ বাণিজ্য কেবল সমশক্তিধরদের মধ্যেই সম্ভব। ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য যেন 'অনশনে উত্থান শক্তি রহিত একটা মানুষের সঙ্গে অশ্বারূঢ় বলবান কোনো ব্যক্তির দৌড় প্রতিযোগিতা।'

অনেক নেতা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করলেন যে সংরক্ষণ ভোগ্য পণ্যের ক্রেতা এবং উদ্যোক্তা উভয়েরই স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে। তাঁরা বলতেন স্বাধীনতা বলতে সম্ভবতঃ এটাই বোঝায় না যে বিদেশিরা অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতের জায়মান উদ্যোগগুলিকে ধ্বংস করুক। ভারতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বরং সংরক্ষণ এবং 'কৃত্রিম পুষ্টিকরণের' দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতা আনা সম্ভব; অবাধ বাণিজ্য নীতির দ্বারা আসলে অধিকতর শক্তিমান পক্ষ ইংল্যান্ডকেই সংরক্ষণ জোগান হচ্ছে। নেতারা স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে সংরক্ষণের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয়টা হবে দেশ সেটা হাসিমুখে মেনে নেবে কেননা দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যমূল্য হ্রাস, কর্মসংস্থান এবং বেতনবৃদ্ধি এবং সাধারণভাবে জাতীয় আয়ের উন্নতি সবকিছুই সে ক্ষতি ভালভাবে পুষিয়ে দেবে। এটা দেখাতে তেলাং-এর বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি যে সংরক্ষণের ফলে দেশের পুঁজির প্রবাহ স্বাভাবিক খাত ছেড়ে ভিন্নমুখী হয়ে যাবে না বরং পড়ে থাকা অলস অর্থ কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। শ্রম সম্বন্ধে তিনি বললেন যে সংরক্ষণ ও তজ্জনিত শিল্পবিকাশের ফলের সবটাই শ্রমিকদের পক্ষে উপকারক হবে। কেননা শ্রমের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পাবে। তাঁর মতে সংরক্ষণের ফলে দেশের সর্বমোট উৎপাদন যদি হ্রাসও পেয়ে যায় তাহলেও ভারতের মতন দেশের পক্ষে তা বাঞ্ছনীয় কেননা এর দ্বারা জাতীয় আয়ের আরো সুষম বন্টন সম্ভব হবে। তাঁর ভাষায় 'যে দেশের প্রায় সর্বত্রই চরম দরিদ্র আর দুর্দশা সেখানে এক আধজন ধনী ব্যক্তি দিয়ে কি লাভ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলে ধনী ব্যক্তিদের সংখ্যা আরো হ্রাস পেলে ক্ষতি নেই যদি সেই সঙ্গে দেশের জনসাধারন অনাহার আর দারিদ্র্যের হাত থেকে কিছুটা মুক্তি পায়'।

আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়মে কাজ করতে হয় ব'লে অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা বিশ্বব্যাপী সুদক্ষতম শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয় ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের এই প্রধান পূর্বানুমানটির বিষয়ে কয়েকজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে শ্রমবিভাগ প্রায় বিধাতার অমোঘ বিধানের মতই ভারতকে চিরদিনের জন্য শুধু কাঁচামালের উৎপাদক ক'রে রাখতে চায়

সে শ্রমবিভাগ তাঁরা মানতে রাজি ছিলেন না। 'ভারত কেবলি ইংল্যান্ডকে কাঁচামাল রপ্তানি ক'রে যাবে আর তার কাছ থেকে তৈরি মাল আমদানি করবে' এই ধারণাও তাঁরা অগ্রাহ্য করতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে ঐতিহাসিক ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারত এক প্রধান উৎপাদক দেশ হয়ে উঠবার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। সে যাই হ'ক, সাময়িকভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু ক'রে দেখতে হবে কিছু কিছু শিল্পের পক্ষে তাদের অভস্ত নিবাসের তুলনায় নুতন নুতন দেশ আরো উপযোগী হয়ে ওঠে কিনা। তাছাড়া প্রতিটি দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতা জানতে না পারা এবং বিকশিত করতে না পারা পর্যন্ত ন্যায্য এবং পারস্পরিক উপকারী শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়। এই অবস্থায় বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের অর্থ হবে আন্তর্জাতিক স্তরে যে শ্রমবিভাগ প্রচলিত রয়েছে সেটাকেই পুরোপুরি কায়েম রাখা। ফলে যে সব দেশগুলি আগে থেকেই এগিয়ে রয়েছে তারা চিরদিনের জন্যই শিল্পের দিক থেকে এগিয়ে থাকবে আর ভারতের মতন দেশগুলি আরো নিম্নগামী হতে হতে নির্ভেজাল কৃষির স্তরে থেমে থাকবে। এই প্রসঙ্গে কোনো একটা দেশকে একটা মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরতার স্তরে নামিয়ে আনার বিপদ সম্বন্ধে কে. টি. তেলাং সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। সে দেশের পণ্য যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের অভ্যাস, রুচি ও চাহিদায় কোনো পরিবর্তন হলে তার ফল পণ্যের উপরও প্রভাব ফেলবে এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

কয়েকজন নেতা এমন যুক্তিও দেখালেন যে শিশুশিল্পগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা আদৌ অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী নয়। তাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা উদ্ধৃত করে দেখালেন যে ভারতের এখন যে রকম অবস্থা রয়েছে সেই ধরণের অবস্থায় তিনি সংরক্ষণ অনুমোদন করেছেন। এই নেতাদের অনেকে এমন দাবি পর্যন্ত করলেন যে তাঁরা নীতিগতভাবে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক; ভারতের ক্ষেত্রে তাঁরা সংরক্ষণ চাইছেন বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে।

কিছু নেতা ভারতের জন্য সংরক্ষণের দাবির যথার্থ্য এবং ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য অভিনব যুক্তি উপস্থিত করতেন। যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের প্রস্তুত জিনিসের উপর যে চড়া হারে আমদানি শুল্ক বসানো হ'ত সে বিষয়ের উল্লেখ ক'রে কে. টি. তেলাং বললেন যে আমাদের দেশজ শিল্প ধ্বংস করার জন্য যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করা হয়েছিল তা ছিল এই সংরক্ষণ নীতি; আর এখন ভারতীয়রা যা চাইছেন তা আর কিছু নয়, 'যে পন্থাটা আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটাকেই আত্মরক্ষার জন্য বর্ম হিসাবে ব্যবহার করা'। একইভাবে রমেশচন্দ্র দত্ত তিক্ত মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু ভারতের বেলায় প্রথমে সংরক্ষণের সাহায্যে দেশের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস ক'রে ফেলা হ'ল তারপর আবার দেশের উপর অবাধ বাণিজ্যনীতি চাপিয়ে দিয়ে শিল্পের পুনর্জাগরনের পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।'

সংরক্ষণের পক্ষে তাঁদের বক্তব্য আরো জোরদার ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে নেতারা বলতেন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির তত্ত্বাবলী নয়, অন্য জাতিসমূহ এ বিষয়ে বাস্তবে কি করছে

সেটাই বিবেচ্য। তাঁরা দেখালেন ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রায় সব স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের নিজের কলোনি যেমন কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া যখনই দেখেছে তাদের নবজাত শিল্প বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার মুখে তখনই তাঁরা সংরক্ষণের পথ গ্রহণ করেছে। তাঁদের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আরো ধরা পড়ল যে স্বয়ং ব্রিটেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক ধরে এই সংরক্ষণের সাহায্যই তার নবজাত শিশু শিল্পগুলিকে সযত্নে লালন করেছিল এবং যখন তার শিল্পপ্রচেষ্টা বিদেশি প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়ে উঠল শুধু তখনই ব্রিটেন 'সারা বিশ্বকে অবাধ বাণিজ্যের নীতিবাক্য শোনাতে শুরু করল।' রমেশচন্দ্র দত্ত এবং জি সুব্রহ্মণ্য আইয়ারের দৃষ্টিতে এটাও এড়লো না যে যদিও অ্যাডাম স্মিথের মতন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উচ্চকণ্ঠে অবাধ বাণিজ্যের মতবাদ প্রচার ক'রে চলেছিলেন, কিন্তু সে দেশের রাজনীতিবিদেরা অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক হলেন অনেক পরে। যখন ব্যাপারটা ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। নেতাদের অনেকে এমন পর্যন্ত বললেন যে, অবাধ বাণিজ্যনীতিতে ইংরেজদের আন্তরিক আস্থা নেই, তাঁরা এটাকে আড়াল হিসাবে অথবা জি. ভি. যোশী যেমন বলেছিলেন ভারতে তাঁদের পণ্য চালু করার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প গ'ড়ে উঠতে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে একটা দার্শনিক অজুহাত হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন মাত্র।

অবাধ বাণিজ্যের সমালোচনা করা তথা শিল্পের জন্য সুরক্ষাছত্রের দাবি জানানো সত্ত্বেও নেতাদের কেউই সংরক্ষণ নিয়ে মতাদর্শের গোঁড়ামি দেখাননি। এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই সারগ্রাহীমূলক। এটাই ছিল স্বভাবিক কেননা তাঁদের অবাধ বাণিজ্যতত্ত্বের যে বিরোধীতা সেটাও গোঁড়ামি প্রসূত ছিল না। অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ের উপর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বেলায় যেমনটি হয়েছিল তাঁদের শুল্কনীতিও অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম কানুন থেকে উদ্ভুত হয়নি, হয়েছিল বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যাবলী থেকে এবং তাদের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে। নেতাদের এই সারগ্রাহিতা তাঁদের সংরক্ষণের দাবির মধ্যেই নিহিত ছিল এবং কখনো বা স্পষ্টভাবে উচ্চারিতও হ'ত। যেমন, ১৯০১ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত বললেন, 'অবাধ বাণিজ্যে আমার আস্থা নেই। সংরক্ষণেও আমার আস্থা নেই। আমি বলব যে পন্থা ভারতের জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির পক্ষে সর্বপেক্ষা প্রশস্ত হবে সেটাই ভারতের পক্ষে গ্রহনীয়।'[১১] আসলে তাঁরা যা চাইতেন — এবং যেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে কিছু নেতা প্রকাশ্যেও বলতেন, তা হ'ল এই যে তাঁরা যত না সংরক্ষণ চাইতেন তার চেয়ে অনেক বেশি চাইতেন দেশের নিজস্ব শুল্কনীতি রচনার অধিকার। এই সময় থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে শুরু করলেন এবং স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন যে ভুল সংরক্ষণ নীতির ফলে বিদেশি পুঁজির পক্ষে দেশে বিরাটভাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং সংরক্ষণকেই হাতিয়ার ক'রে শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম ক'রে ফেলা সম্ভব। হিন্দুস্থান রিভিউ অ্যান্ড কায়স্থ সমাচারের সম্পাদক নভেম্বর ১৯০৩ সংখ্যায় লিখলেন ঃ

> ইংরেজদের প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করলে তার দ্বারা ইঙ্গ-ভারতীয় উৎপাদকদের স্বার্থসিদ্ধি হবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। ... প্রতিযোগিতাটা তখন দাঁড়াবে ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং বিদেশি পুঁজিপতিদের মধ্যে; একদিকে থাকবেন ভারতীয়রা অন্যদিকে সম্মিলিত বিদেশীরা এমনটা নয়।

অনুরূপভাবে হিন্দু ১৩ অক্টোবর, ১৯০৩ সংখ্যায় লিখল ঃ

> এদেশে অর্থ লগ্নীকারী ইউরোপীয়দের দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থকে দাবিয়ে রাখা হবে এহেন বিপদের সম্ভাবনাও রয়েছে। ভারতের জন্য কাঙ্খিত আশীর্বাদের সুফলটা আসলে হয়ত ভোগ করবে ইউরোপীয় বণিকেরা এবং বাগিচা-মালিকেরা। কয়েক শ্রেণীর মানুষ ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে এমন সব কথা ক্রমশঃই বেশি ক'রে বলার প্রবণতা দেখাচ্ছেন যাতে মনে হচ্ছে ভারতের নয়। ভারতের শোষণকারী স্বল্পসংখ্যক ইউরোপীয়দের স্বার্থের কথাই তাঁরা ভাবছেন।[১২]

৪. আরো কয়েকটি বীক্ষণ

উপসংহারে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সে চিন্তাকে সমাজমুখী করা। আগে কেমন দেখানো হয়েছে তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং পদ্ধতির স্থান হবে গৌণ—সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত লক্ষ্যের নিম্নে। সত্য কথা বলতে কি জাতীয়তাবাদীদের সমগ্র চিন্তাধারাই এই উপলব্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। যে বিদ্যা এখন ভারতীয় অর্থনীতি নামে পরিচিত তার জন্মের মূলে সম্ভবতঃ ছিল অর্থনৈতিক মতবাদ ও পদ্ধতিকে সমাজ সম্বন্ধীয় লক্ষ্যের অধীনে রাখার এই ভাবনা। অর্থনীতির মতবাদ ও পদ্ধতি সম্বন্ধীয় এই ভাবনাই একেবারে প্রথম থেকে ভারতীয় অর্থনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচনা করেছে। এরই ফলে প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্নকে নেতারা দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন এবং একটা বিদেশি শক্তি যে অর্থনৈতিক শোষণের জন্যই ভারতকে শাসন করছে ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার এই পরম সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

তবে এখানে একটা কথা, তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবনা সমকালীন ইংরেজদের তুলনায় প্রাগ্রসর ছিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু অর্থনীতির একই নীয়মকানুন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা যায় না এবং প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়মকানুন আলাদা ক'রে তৈরি করা উচিত এ ব্যাপারটার উপর জোর দেবার সময় নেতাদের ভাবনার মধ্যে তখন পর্যন্ত কোনো নূতন ভারতীয় অর্থনৈতিক ধারণা বা তত্ত্বের উদ্ভব হয়নি।[১৩] তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবনায় 'ভারতীয়', 'জাতীয়' প্রভৃতি বিশেষণগুলির ব্যবহার

করা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদেরা এমন কোনো নূতন অর্থনৈতিক ধর্মের সন্ধান পাননি যার জন্মলাভ হতে পারত ভারতের নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব প্রয়োজনের মধ্যে থেকে এবং প্রয়োগ হতে পারত ঠিক সেইটুকুর মধ্যেই। তাঁরা যা বলতেন তা আসলে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের এবং তাঁদের পরবর্তীকালের সমালোচকদের চিন্তাধারার সংমিশ্রণ। এ কথা বলা খুব ভুল হবে না যে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আসলে ছিল মানসিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী উপলব্ধি করার একটা প্রয়াস এবং অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার একটা ধারা, ঠিক অর্থনৈতিক চিন্তাপদ্ধতি নয়।

এটা হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতি জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের আগ্রহটা ছিল গৌণ্য অথবা সিদ্ধান্তনির্ভর পর্যায়ের। তাঁরা অর্থনীতির তত্ত্ব বিকাশে অথবা সে তত্ত্বের একটি ভারতীয় ভাষ্যের নির্মাণকার্যে নিযুক্ত পেশাদার অর্থনীতি বিশারদ ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা শুদ্ধ তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিলেন না। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য আমাদের আহরণ করতে হয় তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর উপর লিখিত বিশাল রচনাবলী থেকে। তাঁদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জন্মের মূলে ছিল প্রখর বাস্তববোধ যেহেতু ভারতের শাসকেরা ধ্রুপদী অর্থনীতির অনুশাসনকে জাতীয়তাবাদী দাবির বিরোধীতা করার কাজে লাগাচ্ছেন সেহেতু জাতীয়তাবাদীদেরও কর্তব্য হবে ধ্রুপদী অর্থনীতির সার্বত্রিকতার এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তার উপযুক্ততার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো। তাঁদের চিন্তাধারার এই সাদামাটা উৎপত্তিটা কখনো কখনো তাঁরা সজ্ঞানে প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। যেমন তাঁরা বলতেন অবাধ বাণিজ্য নীতি রাষ্ট্রের যে ভূমিকা নির্দেশ ক'রে দিয়েছে সেটা বিধ্বস্ত না ক'রে তাঁদের উপায় ছিল না কেননা এর দ্বারা শিল্পে সরকারি সাহায্যের পথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তাঁদের রিকার্ডিয় খাজনাতত্ত্বের প্রতিবাদ করার কারণ এই তত্ত্বের সাহায্যে উচ্চ ভূমিহারের স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দাবি অগ্রাহ্য করা হচ্ছিল এবং ভারতে ভূমিরাজস্বের হার যে অত্যন্ত চড়া তাঁদের এ অভিযোগও অস্বীকার করা হচ্ছিল। আর অবাধ বাণিজ্য নীতির অপরাধ ছিল তুলা আমদানি শুল্ক রহিত করা তথা তুলার উপর আন্তঃ শুল্ক আরোপ এবং জায়মান শিল্পগুলিকে সংরক্ষণদানে অস্বীকৃতির মূলে এই নীতি অংশতঃ দায়ী ছিল।[১৪]

কিন্তু যদিও জাতীয়তাবাদীদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কিছুই নূতনত্ব ছিল না তাঁরা যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানান দিয়েছেন এবং ইউরোপীয় মতবাদকে ভারতের অবস্থার উপযোগী ক'রে তুলতে চেয়েছেন শুধু এইটুকুর গুরুত্বই অনেক। আর যাই হ'ক, বিবিধ প্রকার তাত্ত্বিক পথের মধ্য থেকে বাছাই করাটাই তো তাত্ত্বিকতার নিদর্শন, এবং তাত্ত্বিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের নেতারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোনো অবস্থাতেই সেই শিক্ষার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকেননি এবং ইংরেজদের সেকেলে ধ্যানধারণাগুলিকেও আঘাত করতে পিছু পা হননি। এ ছাড়াও অর্থবিজ্ঞানের প্রতি একটা ব্যাপক এবং অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কৃতিত্বও তাঁদের রয়েছে। যদিও তাঁরা সুসঙ্গত কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা বিকাশমুখী কোনো

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি গ'ড়ে তুলতে পারেননি, তবুও তাঁরা পরবর্তী সেরা কাজটি ক'রে গিয়েছেন—তাঁরা ভারতীয় অর্থনীতির একটি সুসঙ্গত, অখন্ড এবং আন্তঃ সম্বন্ধিত চিত্র অঙ্কণ ক'রে গিয়েছেন এবং তার ব্যাধি, ব্যাধির সঙ্গে বিদেশি শাসনের সম্পর্ক এবং ব্যাধি দূরীকরণে কি কি করণীয় সবই আলোচনা করেছেন। আমরা এমনকি একথা পর্যন্ত বলতে পারি যে তাঁরা এমন একটা অর্থনীতি গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন যাতে শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্য, আর্থিক নীতি এবং কৃষি অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত থাকবে এবং যার সর্বপ্রথম লক্ষ্য হবে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম দিকের নেতারা যে অর্থনীতির নিয়মকানুনের আপেক্ষিকত্ব এবং ভারতের 'ব্যতিক্রমত্ব' কাজে লাগাতে চাইতেন তার কারণটা এই ছিল না যে তাঁরা 'খাঁটি স্বদেশী' অথবা ভরতীয় অর্থনীতির সেই প্রাক্-আধুনিক ধরণটা সমর্থন করতেন অথবা সেটাকে সযত্নে ধ'রে রাখতে চাইতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় অর্থনীতির আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করা। ধ্রুপদী অর্থনীতি তাঁরা এইজন্য বাতিল করেননি যে এর দ্বারা মান্ধাতার আমলের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছিল, বরং এই জন্য যে অনমনীয় এবং যথেচ্ছভাবে সে নীতি প্রয়োগের ফলে 'অতীতের ভুলভ্রান্তি ও মজ্জাগত ক্লীবতা' এবং 'সামন্ততন্ত্র তথা প্রতিষ্ঠার প্রতি প্রাগৈতিহাসিক আনুগত্য' কায়েম হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এবং এই কারণেই জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনধারার দ্রুত পরিবর্তন সাধন এবং আধুনিকীকরণের তাগিদের উদ্দেশ্যে তাঁরা উপস্থাপিত করেছিলেন এই ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি।

টীকা

১। রানাডের মতের বিস্তৃত পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য জেমস্ কেলক, 'রানাডে অ্যান্ড আফটার', জার্নাল অব ইকনমিক্স্, জানুয়ারি, ১৯৪২ (খন্ড ২২, সংখ্যা ৩); ভবতোষ দত্ত, ' দি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ রানাডে'স ইকনমিক্স্'; ঐ; জে. সি. কয়াজি, 'রানাডে'স ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান ইকনমিস্ট'; ঐ; ডি. জি. কার্ভে, ' দি প্রফেট অব লিবারেটেড ইন্ডিয়া' (পুনা, ১৯৪২), ৪র্থ অধ্যায়; পি. কে. গোপালকৃষ্ণান, ' ডেভেলপমেন্ট অফ ইকনমিক আইডিয়াজ ইন ইন্ডিয়া' (দিল্লি ১৯৫৯), তৃতীয় অধ্যায়।

২। কারভে, লেখায় উদ্ধৃত। এছাড়াও দ্রষ্টব্য রানাডের মন্তব্য—'অ্যাডাম স্মিথ কখনোই অর্থনৈতিক বিষয়কে সমাজিক বিবেচ্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, এজন্য তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটা সুবিধাজনক অবস্থান নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা তার মতবাদকেই চূড়ান্ত মানদন্ড ধরে নেওয়ায় তারা এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলেন' (এসেস, পৃঃ ১৬)।

৩। পৃথ্বিশ চন্দ্র রায় ' দি প্রভার্টি প্রবলেমস ইন ইন্ডিয়া', পৃঃ ৬৬। অবাধ বানিজ্য বনাম সংরক্ষণ—এই বিতর্ককে উল্লেখ করে রায় লিখেছেন, 'অবাধ বানিজ্য ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা আসলে স্থান ও কালের বিশেষ মাত্রা। এটি কোন স্বাভাবিক আইনের বিষয় নয় বরং প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগানোর বিষয়।'

৪। ঐ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪। তিনি বানিজ্যিকতন্ত্রের উত্থান থেকে একেবারে হালের জার্মান ঘরানা পর্যন্ত

ইউরোপের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারণাকে চিহ্নিত করেছেন (ঐ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭-২২)। একদিকে তিনি অর্থনৈতিক মতবাদের আপেক্ষিক সহায়ক তালিকা ও তার ঐতিহাসিক উৎস এবং ব্যক্তির আগুলাভের উপর জাতীয় উন্নয়নকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রশংসা করেছেন। আবার তিনি এও লক্ষ্য করেছেন, এই তালিকা সমসাময়িক সমাজ সংস্কারের উদ্যোগগুলিকে পরিপুষ্ট করার বদলে এক নতুন ধরণের বানিজিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে (ঐ, পরিশিষ্ট ২২-২৩)।

৫। রাণাডে, এসেস, পৃ ৮৬, ৯০-৯২; যোশী, লেখায় উল্লেখিত, পৃঃ ৬৭২-৭৩, ৭৪৭-৪৮, ৭৮৫-৮৬, ৮০৮-০৯, ৮২৬। ১৮৭৭-এ রানাডের আলাদা একটা মত ছিল। দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্টের উপর পুনা সার্বজনিক সভার পক্ষ থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, '' দেশের কাঠামো, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়ী চরিত্রের কোন রকম পরিবর্তন করা সরকারের ক্ষমতা ও কাজের মধে পড়ে না। দেশবাসী কোন বাইরের শক্তির হাতে দেশের চরিত্রের বদল ঘটানো মেনে নেয় না। অন্ততঃ এ ব্যাপারে যত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, তত তাড়াতাড়িতো নয়ই।' জে পি এস এস, জানুয়ারি, ১৮৭০ (খন্ড ১, সংখ্যা ৩), পৃঃ ৩৬। জি. এ. মানকর, 'এ স্কেচ অফ দি লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অফ দি লেট মিঃ জাস্টিস এম. জি. রানাডে' লেখায় উদ্ধৃত, খন্ড ১, পৃঃ ২১৩।

৬। রানাডে লিখেছেন, আধুনিক অগ্রসর তত্ত্ব রাজনৈতিক দলগুলির বৃদ্ধিবৃত্তি ও সম্পদ সংস্থানের ক্ষেত্রে সমানাধিকারের স্বধীনতা স্বীকার করে নেয়। যেখানে এরকম অধিকার থাকেনা, সেখানে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের সব বড় বড় কথা 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র মত শোনায়! এই সমানাধিকারের মনোভাব নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও মুষ্টিমেয় সংখ্যক অর্থবান শ্রেণীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে চরমতার সনাতন ধারণাকে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা আবার নতুন করে ভাবতে হবে' (এসেস, পৃঃ ৩১)।

৭। উদাহরণ হিসেবে দেখুন—'রিপোর্ট অফ দি ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশন, অংশ ২য়, বিভাগ ৭ম, অধ্যায় ২। এছাড়াও দ্রষ্টব্য রিচার্ড স্ট্রাচি ও জন স্ট্রাচি, ' দি ফিনান্সেস অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস অফ ইন্ডিয়া ফ্রম ১৮৬৯ টু ১৮৮১' লেখায় উল্লেখিত অংশ, পৃঃ ১৪-১৫; চেজনি, 'ইন্ডিয়ান পালিটি' লেখায় উল্লেখিত, পৃঃ ৩৩১; কার্জন বক্তৃতামালা ১, পৃঃ ১২৮; রিজলিউশন অফ দি গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ১৬ জানুয়ারি, ১৯০২, অনুচ্ছেদ ৯ ; স্ট্রাচি , ইন্ডিয়া (১৯০৩), পৃ ১২০; ই.ল, এল সি পি, ১৯০৪, খন্ড ৫৩, পৃ. ৫৩৯। উল্লেখ্য, অনেক সরকারি আমলা ও লেখকই সেই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। উদাহরণ, লুই ম্যালেট, লর্ড স্যালিসবেরি এবং এইচ. ই. সুলিভান-এর সাধারণ সভার বিবৃতি। এগুলি দত্তের 'ফ্যামিনস্ ইন ইন্ডিয়া'তে উদ্ধৃত হয়েছে। পরিশিষ্ট এম, এন, ও, কিউ; ভারত সরকারের প্রতিবেদন, ৮ জুন, ১৮৮০, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, কর্মসূচী ৪৫ (ক), জুন, ১৮৮০; বাডেন-পাওয়েল, এ সর্ট অ্যাকাউন্ট অফ দি ল্যান্ড রেভেনিউ অ্যান্ড ইটস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া, উইদ এ স্কেচ অফ দি ল্যান্ড টেনিউয়্যার লেখায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৯।

৮। যোশী, রাইটিং অ্যান্ড স্পিচেস' লেখায় উল্লেখিত, পৃ. ৮৮৬। তিনি বলেছেন, এই সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ইউরোপীয় আর্থনীতিক বিশ্বাসের একটা বাতিল ধারণা মাত্র। বৃটিশ ভারতের বাইরে আমাদের দেশের আদর্শ জমি জাতীয়করণ আন্দোলনেই শুধু এর হাতে কলমে প্রয়োগ দেখা যায়। এক অর্থে যোশীর ধারণা সঠিক। রিকার্ডো, জেমস মিল কেউই সাহস করে বলতে পারেন নি যে, অনুপার্জিত আয়ের তত্ত্বের অনুসরণের তৈরি মৌলিক কর নীতির যে তত্ত্ব ইংরেজদের উপর প্রয়োগ করা উচিত। এরিক স্টোক্স, দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যান্ড ইন্ডিয়া , পৃঃ ৮৯-৯০।

৯। যোশী, লেখায় উদ্ধৃত, পৃ. ৮৯৪-৯০১। তিনি সরকারি আবেদনের প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ' গোটা সমাজের অছি হিসাবে, সমাজের একটা ছোট অংশের সুবিধার জন্য তাদের অনুপার্জিত বাড়তি আয়ের উপর দেয় বাজস্বে ছাড় দেওয়া সরকারের উচিত হবে না। দেশের কৃষকরা কি সমাজের অংশ নয়, তারা কি জনসংখ্যার ক্ষুদ্রতম অংশ?' (ঐ, পৃ. ৯০২)। এটা সত্যিই বিস্ময়ের

এবং স্ব-বিরোধীও বটে যে ইংল্যান্ডের ব্যাপক সাধারণ মানুষকে অল্প কিছু সংখ্যক ভূ-স্বামী- জমিদারের শোষণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রিকার্ডোর উদ্ভাবিত তত্ত্বই ভারতে প্রয়োগ করা হয়েছে, গোষ্ঠী কল্যানের নামে সাধারণ মানুষের উপর বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে।

১০। সংরক্ষণের দাবি মেনে নেওয়ার অসম্ভব্যতা সম্পর্কে বৃটেনের দেওয়া যুক্তি হল, কোন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতাই এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে চায় নি। দ্রষ্টব্য যোশী লেখায় উদ্ধৃত, পৃ. ৮২২; রানাডে, এসেস, পৃঃ ৩৩, ১৮৯, ১৯১; এন. জি. চন্দ্রভারকর, সি.পি. এ, পৃঃ ৫২৬-২৭; এস এন ব্যানার্জী, সি পি এ, পৃ. ৬৯৬; দত্ত, ইংলন্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, পৃ. ১৩৪।

১১। দত্ত, স্পীচেস II পৃঃ ১২৭। একই সময়ে ২২ নভেম্বর, ১৯০৩-এর ' মাহ্‌রাট্টা'য় ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয়, 'ভারত অবাধ বাণিজ্য চায়না, আবার নির্ভেজাল সংরক্ষণও চায় না। ভারতবর্ষ এই দুটি ব্যবস্থাকেই এমন ভাবে পেতে চায় যাতে তার জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।' এছাড়াও দ্রষ্টব্য, রানাডে, ' রিভিউ অফ '' ফ্রি ট্রেড অ্যান্ড ইংলিশ কমার্স '' ', নির্দিষ্ট স্থানে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮২২; রায়, পভার্টি, পৃ. ৬৫।

১২। এছাড়াও দ্রষ্টব্য 'ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স্‌,' ১৬ অক্টোবর, ১৯০৩। এই চিন্তার আরোও কট্টর প্রবক্তা ছিলেন জি. কে. গাখলে। ১৯১১ সালে এর কতৃত্ব ব্যঞ্জক প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর বক্তৃতা মালা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫১৪-১৫।

১৩। কেলক, রানাডে অ্যান্ড আল্টার' যথাস্থানে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫৩; কার্ভে, লেখায় উদ্ধৃত। পৃঃ ৪৫-৪৭।

১৪। তেলাং 'ফ্রি ট্রেড অ্যান্ড প্রটেকসন ফ্রম অ্যান ইন্ডিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ' পৃঃ ১; রানাডে, ''রিভিউ অফ 'ফ্রি ট্রেড অ্যান্ড ইংলিশ কমার্স,' '' নির্দিষ্ট জায়গায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৫১; মাহরাট্টা, ১১ নভেম্বর, ১৯০০; জি. এস. আয়ার, ই এ, পৃঃ ৬ষ্ঠ এবং পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩।

১৫

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ

১. ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

আমাদের আলোচ্য সময়সীমা কালে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছিল এই শাসনের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য তাঁরা যেভাবে বুঝেছিলেন তার উপর। অধিকাংশ নেতার বেলায় এই উপলব্ধিটা কিন্তু আদৌ তত্ত্ববিচার অথবা অনুমানবিদ্যা থেকে উদ্ভূত হয়নি। যে নির্মম পাঠশালার তাঁরা পড়ুয়া ছিলেন তার নাম ছিল অনুশীলন এবং তাঁদের পাঠ্যক্রমের একটা বিষয় ছিল অর্থনৈতিক কর্মসূচী। সমকালীন প্রশাসন এবং রাজনীতিতে যে সব প্রশ্ন দেখা দিত তার প্রায় প্রত্যেকটির উপর একদিকে ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে অন্যদিকে ভারতীয় এবং তাঁদের শাসকদের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা চলত তার একটা প্রভাবও নেতাদের এই মৌল রাজনৈতিক উপলব্ধির উপর পড়ত। অর্থনৈতিক প্রশ্ন বিশেষতঃ ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যে বহুমুখী মতবিরোধের উদ্ভব হয়েছিল তার থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বহু অংশের বিশ্বাস জন্মাল যে মোটের উপর ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক। হয়ত ইচ্ছা করেই এমনটা করে রাখা হয়েছে। তবে কোনো কোনো নেতা যেমন জি কে. গোখলে,জি. ভি. যোশী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি. ই. ওয়াচা এবং রমেশচন্দ্র দত্তর এ বিষয় কিছু দ্বিধা এমনকি বিভ্রান্তিও ছিল যদিও অন্যরা যথা, দাদাভাই নৌরজি, বালগঙ্গাধর তিলক, জি. সুব্রহ্মণ্য আইয়ার এবং অমৃতবাজার পত্রিকা। মারাঠা এবং অন্যান্য অসংখ্য জাতীয়তাবাদী পত্রাদি ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন।

অনেক নেতা, বিশেষ করে পরবর্তীকালে যাঁরা নরমপন্থী ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসন বহুকাল ধরে একটা বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়েছিল। ভারতের উপর তৎকালীন দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ ব্রিটেনের প্রভাব দেখে তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় নৈরাজ্যের পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং আধুনিক, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, আধুনিক শিক্ষার প্রসার এবং পাশ্চত্য গনতান্ত্রিক ভাবধারা ও ঔদার্যের মাধ্যমে বাক্-স্বধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তথা সামাজিক স্বাধীনতার প্রবর্তন এবং সম্ভবতঃ সর্বোপরি ভারতবর্ষের জনসাধারণকে একটা অখন্ড জাতীয়তাবোধের বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া এবং তার ফলস্বরূপ দেশব্যাপী মানুষের মনে এক অখন্ড

সত্তার অন্তর্ভুক্তি হওয়ার অনুভূতির বিকাশ এবং নূতন এক রাজনৈতিক জীবনধারার জন্ম—এর সবকিছুই সেই নেতাদের কাছে মনে হয়েছিল যেন ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনার পর ঘটেছে। সুতরাং সেই সব ব্রিটিশ রাজত্বেরই সুফল এবং ভারতের পক্ষে নবযুগের উষাকালস্বরূপ। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন দ্রুত শিল্পবিকাশের সম্ভাবনার দ্বারা। তাঁদের আশা ছিল পশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং প্রবল ইউরোপীয় উদ্যোগের উদাহরণ, দেশকে তার অর্থনৈতিক পশ্চাদ্গামিতা এবং নিশ্চলতা থেকে উদ্ধার করবে। রেলপথ, রাস্তাঘাট, খাল, উন্নতিশীল বিশ্ববাজারের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রথম যুগের বস্ত্রশিল্প, বিদেশিদের বাণিজ্যিক, শৈল্পিক এবং বাগিচা উদ্যোগ, সবকিছুই তাঁদের কাছে আগামী শিল্পবিপ্লবের অগ্রদুত ব'লে মনে হয়েছিল এবং সে বিপ্লবের প্রাথমিক লক্ষণগুলিও তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন।[১]

প্রথম যুগের নেতারা যে দারিদ্র্যের প্রকোপ তথা অর্থনৈতিক উপসর্গের বিষয় অবহিত ছিলেন না এমন নয়। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শাসনে মন্দর চাইতে ভালোটাই বেশি এবং আশা রাখতেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দোষত্রুটিগুলি ক্রমশঃ দুরীভুত হবে আর গুণগুলি বৃদ্ধি পাবে। অন্য কথায় পার্থিব ব্যাপারে বাস্তবের তুলনায় সম্ভাবনার দ্বারা, প্রত্যাশা পুরণে র তুলনায় প্রত্যাশার দ্বারা তাঁরা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২]

তাঁরা প্রগতির জোয়ারের উর্দ্ধগতির আশায় অপেক্ষা করছিলেন — কেউ ধৈর্য সহকারে অথবা কেউ অধৈর্যভাবে — তা যতই ধীরগতিতে হোক। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ব্রিটিশ রাজ্যের ভাবমূর্তি তাঁদের কাছে ম্লান হতে শুরু করল, যখন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে তাঁদের প্রত্যাশা অদূর ভবিষ্যতে পুরণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁদের কাছে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের প্রগতি যেন মনে হ'ল বাধাগ্রস্ত এবং তার পদক্ষেপ অত্যন্ত মন্থর। কেউ বা এখনও ভাবলেন যে উন্নতি করার বদলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। কালক্রমে ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রকোপ তাঁদের সমগ্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ছায়া ফেলতে শুরু করল। একটা মাত্র আশার আলো ছিল আধুনিক শিল্পবিকাশকে ঘিরে, কিন্তু এবার নেতাদের মনে হল সরকারের আর্থিক নীতিই এ ব্যাপারে সর্বপ্রধান বাধাস্বরূপ।

সুতরাং যেখানে ছিল কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা, সেখানে অন্ততঃ অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে শুরু হল কথায় কথায় দোষ ধরা আর অভিযোগ। নেতারা বলতে লাগলেন দারিদ্র সারা দেশটাকে শেষ ক'রে ফেলল, রাজস্ববিভাগ কৃষকদের গলায় গামছা দিয়ে চড়া কর আদায় করছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস ক'রে ফেলা হচ্ছে এবং আধুনিক শিল্পকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিরুৎসাহিত করে রাখা হয়েছে, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না। অত্যাবশ্যকে খাদ্য সম্ভার বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, মুদ্রা নীতিকে সুকৌশলে ভারতীয় শিল্প ও কৃষির স্বার্থের বিরুদ্ধে লাগানো হচ্ছে, দেশের শ্রমিকদের বিদেশি মালিকানাধীন বাগিচায় ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে, ভারতীয় কোষাগারের ক্ষতি ক'রে এবং কৃষির উন্নতি উপেক্ষা ক'রে রেলপথের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, করের চাপ এখানে প্রচন্ড রকম

বেশি। সরকারি রাজস্ব জাতি গঠন কাজের খাত থেকে সরিয়ে ব্যয় হচ্ছে নানা অ-ভারতীয় প্রয়োজনে এবং অনাবশ্যক বেতন তথা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধবিগ্রহাদিতে, এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ—ভারতের সম্পদ তথা পুঁজি নিষ্কাশিত ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নেতাদের মনে হ'ল এই সব অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে ভারতে ব্রিটিশের অনুসৃত নীতি ঃ 'ভারতের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা যদি বিপর্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য প্রধানতঃ দায়ী হ'ল ব্রিটেন'। এই কারনেই নেতাদের চোখে ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেকার ও বর্তমানের অন্যান্য কিছু সাফল্য অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার তুলনায় তুচ্ছ হয়ে পড়ল।' এবং কালক্রমে এই 'বিশ্বাসের অবক্ষয়ের ফলে শুধু ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল নিয়েই প্রশ্ন শুরু হ'ল না, তার কি ও কেনতে পর্যন্ত টান পড়ল ঃ কেন ভারতের পার্থিব উন্নতি হয়নি, এবং কেন এই ব্যাপারে পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি? এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? ভারতের এই ক্ষতিসাধন কি অনিচ্ছাকৃত না ইচ্ছাকৃত? অন্য কথায়, ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এবং এই প্রশ্নেরই একটি অনুসিদ্ধান্ত, ব্রিটিশ শাসনকে নেতারা যে 'বিধাতার ইচ্ছা'র প্রকাশ বলে ভাবতেন সেই ধারণার সঙ্গে তাঁদের বর্তমানের বিশ্বাসটা দেশের পক্ষে সে শাসন পার্থিব দিক থেকে ক্ষতিকারক খাপ খাওয়ানো যায় কি?

এটা সবারই বেশ ভাল জানা যে বহু বছর ধরে নেতাদের একটা বিশাল অংশের বিশ্বাস ছিল, ভারতের পার্থিব ক্ষতি করার মূলে রয়েছে ব্রিটিশ জনসাধারন, পার্লামেন্ট, এবং সরকারের ভারতের অবস্থা ঠিক মতন উপলব্ধি করতে না পারা — অথবা খুব বেশি হলে ব্রিটেনের পার্টি রাজনীতির কুপ্রভাব, যার ফলটা দাঁড়াত নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল ক'রে ফেলা আর ভারতে আমলাদের এবং ব্রিটেনে পার্টি নেতাদের সঠিক নীতিরও ত্রুটিপূর্ণ রূপ দেওয়া। অর্থাৎ ভারতের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্গামিতার মূলে ছিল শাসকদের অজ্ঞতা অথবা ভুল বোঝাবুঝি, খুব বেশি হলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির দুর্বলতা, ইচ্ছাকৃত কোনো ভ্রান্ত নীতি বা ত্রুটি নয়। সুতরাং এই মতাবলম্বী নেতাদের প্রধান সান্ত্বনার ক্ষেত্র ছিল ব্রিটিশ জনসাধারণের ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচার বুদ্ধি অর্থাৎ 'ইংল্যান্ডের বিবেকের' প্রতি অবিচল আস্থা রাখা। এই নেতারা তাই ভাবতেন যে ভারত তথা ইংল্যান্ডের সরকারদ্বয় এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ তথা পার্লামেন্ট যদি একবার সমস্যার আসল চিত্রটা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। এই কারনেই তাঁরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাবার জন্য সম্ভবপর সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। কিন্তু ব্রিটিশ বিবেক জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিযান, অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনোকিছুই তাঁদের ঈপ্সিত পথে অর্থনৈতিক অভিযোগের কোনো সুরাহা করতে সক্ষম হ'ল না। ধীরে ধীরে তাঁদের বিশ্বাস চুরমার হতে শুরু করল। শাসকদের ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁদের আস্থার ভিত ন'ড়ে গেল আর অবিশ্বাসের বীজটা অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেল।

কালক্রমে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী—বিশেষ ক'রে শুল্কনীতি এবং সম্পদ নিষ্কাশন

তত্ত্ব বিষয়ক সমস্যাদির উপর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভারতের জনসাধারণ এবং নেতৃত্বের সমস্ত স্তরে ব্যাপকতরভাবে এই বিশ্বাস জন্মাল যে ইংরেজ, প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদদের শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজত্বের আর্থিক নীতির জন্ম হয়েছিল সেই রাজত্বেরই আসল চরিত্র ও প্রকৃতির মধ্য থেকে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অর্থনৈতিক পশ্চাদ্গামিতার মূলটা যত না ছিল শাসকদের অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি তার চাইতে সম্ভবত: অনেক বেশি ছিল সেই শাসনের আনুষঙ্গিক ফলশ্রুতি। এবং যেহেতু শাসনের আসল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতকে আর্থিক ভাবে শোষণ করা, সে শাসন ছিল ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্গতিকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে লাগাবার আকাঙ্খার কাছে ব্রিটেনের ন্যায়বিচারের প্রেরণা হার মেনেছে। আমরা আগেই কিছুটা বিশদভাবে দেখিয়েছি কিভাবে নেতারা সরকারের বিশেষ বিশেষ আর্থিক নীতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁদের অনেকেই প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ব্রিটেন ভারত শাসন করছে ভারতের প্রয়োজনে নয়, ব্রিটেনেরই প্রয়োজনে। এখানে শুধু এইটুকুই যোগ করা যেতে পারে যে নেতাদের অনেকে সিদ্ধান্তটাকে একেবারে সাধারণীকরণের স্তরে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে প্রায়ই ভারতকে ইংল্যান্ডের কামধেনুর সঙ্গে তুলনা ক'রে এই সাধারণীকরণ প্রকাশ করা হ'ত।

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ব্রিটিশ রাজত্বের শোষণমূলক চরিত্রের উপলব্ধি এবং পরবর্তীকালে সে উপলব্ধির প্রচার ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোন থেকে বুঝতে গেলে আরো তিনটি বিষয়ের কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ মূলতঃ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র নিয়ে গঠিত ভারতীয় নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনোদিনই শাসকশ্রেণীর পরোপকারী মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস রাখেননি। ১৮৮৮ সালে এ. ও. হিউম এই নেতাদের বর্ণনায় বলেছিলেন, 'শেষ সারির এই অবশিষ্ট মানুষগুলির যাঁরা শাসকশ্রেণীর মধ্যে সেরা এবং সর্বাধিক বন্ধু-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পর্যন্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গলাবাজি ক'রে থাকে, এবং সরকার যাই করুন না কেন, ভালো মন্দ অথবা মাঝারি — সব কিছুতেই আপত্তি জানায় আর ঘেউ ঘেউ করে।' দ্বিতীয়তঃ বহু নেতার লেখা এবং বক্তৃতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কূটাভাস বা আপাত অসঙ্গতি থেকে যেত যাতে একই সঙ্গে ব্রিটিশের সদাশয়তায় আস্থা প্রকাশ করা হ'ত, আবার তাঁদের স্বার্থপরতার কথা বলা হ'ত। কখনো বা তাঁরা একই নিঃশ্বাসে ব্রিটিশ স্বার্থপরতা তুলে ধরতেন আবার ব্রিটিশ জাতির উন্নয়নব্রতর প্রতি আস্থা পুনর্বার ব্যক্ত করতেন। তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে একটা স্ববিরোধ রয়েছে এই নেতারা সেটা অনতিক্রমনীয় ব'লে মনে করতেন না। দাদাভাই নৌরজি যেমন ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করেছিলেন ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে অব্রিটিশীয় আখ্যা দিয়ে। তৃতীয়তঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় সংবাদপত্রগুলি নিঃসন্দেহে সাধারণ স্তরের নেতাদের মনোভাব অনেক সুস্পষ্ট ভাবে এবং সরাসরি প্রকাশ করত এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে জনসাধারণের অনুভূতি জাগ্রত করার এবং গ'ড়ে তোলার তথা রাজনীতির

সঙ্গে সে সব প্রশ্নের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত করার কাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত।

সেসব যাই হ'ক এ কথা বলা যেতে পারে যে জাতীয় নেতৃত্বের সমস্ত অংশ আর্থিক নীতি নিয়ে যে নিরলস আন্দোলন চালিয়েছিলেন তারই ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তথা নেতাদের বিশালাংশের মন থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের ভাবমূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।[৩] বহু ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় নেতা বুঝতে পারলেন ব্রিটিশের ক্ষমতার রহস্যটা শুধু দৈহিক শক্তি নয়, নৈতিক শক্তিও বটে। শক্তির উৎসটা শুধু তরবারি নয়, যার সাহায্যে দেশটাকে জয় করা হয়েছে, দেশবাসীর নিয়ত নীরব আনুগত্য।[৪] কিন্তু নেহাৎ রাজনৈতিক এবং ভাবপ্রবণ আবেদন নিবেদনের দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের নৈতিক ভিতকে নাড়া দেওয়া বোধহয় সম্ভব হয়ে উঠত না; ব্রিটিশ শাসন যে মহৎ উদ্দেশ্যে স্বৈরতন্ত্রী হয়েছে বড় জোর এই ধারণাটার নিন্দা করা যেত। সত্য কথা বলতে কি বহু ব্রিটিশ প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদ তাঁদের শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রটা স্বীকার এবং সমর্থন করতেন। তাঁদের দাবি ছিল প্রশাসনকে মহৎ করার স্বার্থেই এই স্বৈরতন্ত্র — মেকলের 'কঠোর নিরপেক্ষ স্বৈরতন্ত্র' অথবা প্রচলিত ভাষার 'পিতৃতন্ত্র' অত্যাবশ্যক, কেননা এই 'ক্ষমতাটুকু' না থাকলে মহত্ত্বের অস্তিত্বই হয়ত সম্ভব নয়। যাই হ'ক রাজনৈতিক পরাধীনতা তো সবার কাছে স্পষ্ট ছিল কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে ব্যাপারটা কেন অবাঞ্ছনীয় তা অজ্ঞ লোকেদের কাছে দৃষ্টান্তসহকারে বোঝাবার প্রয়োজন ছিল কেননা পরাধীনতা জিনিসটাই যে আদপে খারাপ তা হয়ত তাঁরা বুঝতে পারতেন না। এইখানেই নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেননা এর দ্বারাই ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল তথা সদিচ্ছা সম্বন্ধে অর্থাৎ রাজত্বের সদাশয়তা সম্বন্ধেই চলিত বিশ্বাসে ফাটল ধরতে দেখা গিয়েছিল এবং অবিশ্বাসটা অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক আনুগত্যের ক্ষেত্রেও জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য সাধারণ মানুষদের মনে অন্ততঃপক্ষে সে আনুগত্য আন্দোলনে উচ্চারিত অভিযোগগুলির সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজ করতে পারত না—এ বিষয়ে বিদগ্ধজনের বক্তব্য যাই থাকুক না কেন। এবং এই আন্দোলনে মতাদর্শ নির্বিশেষে সমগ্র নেতৃত্ব নরমপন্থী দাদাভাই নৌরজি, রাণাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত গোখলে এবং যোশী থেকে শুরু ক'রে চরমপন্থী তিলক, শিশিরকুমার ও মোতিলাল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, এবং অসংখ্য জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা সমান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কথাটা মনে রাখলে ন্যায্য ভাবেই বলা যায় যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতারাই দেশের মাটিতে অসন্তোষের বীজ বপন করেছিলেন, রাজদ্রোহের বীজ যদি নাও হয়। তাঁদের মধ্যে এইটুকুই তফাৎ ছিল যে সেখানে কিছু নেতা 'অবাধ্য' হয়েছিলেন সজ্ঞানে, অন্যরা সেখানে তাঁদের আনুগত্য এবং ব্রিটিশ রাজত্ব চিরস্থায়ী দেখার আকাঙ্খা নানাভাবে প্রচার এবং জাহির করতেন। অর্থাৎ যদিও মনের দিক থেকে তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুগত থেকে গিয়েছেন যে-সাম্রাজ্যকে বিধাতার বিধান ব'লে তাঁরা ভাবতেন বাস্তবে তাঁরা নিজেরাই তার মূলে কুঠারঘাত করেছেন; তাঁরাই আসলে ছিলেন 'অবাধ্যতার' উৎসমুখ। ১৮৮০

থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালটা যে বৌদ্ধিক অসন্তোষ অস্থিরতা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের — আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের—বীজ বপন করল ব'লে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে, এটাই তার অন্যতম কারণ।

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সমকালীন অনেক সরকারি আমলা তথা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ বুঝতে পেরেছিলেন যে সে যুগের সর্বাধিক নরমপন্থী নেতারাও আসলে এই ভূমিকাই পালন ক'রে চলেছিলেন। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে নরমপন্থী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পর্যন্ত, যার স্বভাব হ'ল সর্বক্ষণ পৃথিবীর সব কিছু সমালোচনা করা — সেই কংগ্রেস নেতাদের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্ হয়ে ওঠার পরিবর্তে ঘোঁট পাকাবার জায়গায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতসচিব জর্জ হ্যামিলটন ১৮৯৭ সালে এই ব'লে কংগ্রেসের সমালোচনা করেছিলেন যে 'প্রশাসনকে আক্রমণ করার এবং ভারতের জনসাধারণের উপর প্রশাসনের ভাল কাজের প্রভাব খাটো ক'রে দেখাবার সুযোগ' কংগ্রেস কখনোই হাতছাড়া করে না।" আর জেনারেল চেজনি তো কংগ্রেসকে 'পুরোপুরি অবাধ্য' বলেছিলেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ডাফরিন ১৮৮৬ সালে লিখেছিলেন যে 'এই দিক থেকে দেখতে গেলে কোনো সন্দেহই থাকে না যে এসব কাগজ যাঁরা পড়বেন তাঁদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে সাধারণভাবে আমরা সবাই হচ্ছি মানবজাতির এবং বিশেষকরে ভারতের শত্রু।

২. অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা

১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে নেতারা যে সব আর্থিক নীতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন সেগুলির বৈশিষ্ট্যের জন্যই সেই সময়টাকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সময়কালের চরিত্রদান করেছে। নেতাদের বক্তব্য ছিল দেশের জনসাধারণের সম্মুখে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাটা রয়েছে সেটা অর্থনীতি সংক্রান্ত, অর্থাৎ দারিদ্র। তার উপর সমস্যাটা সর্বভারতীয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় সমাজের সমস্ত অংশের স্বার্থই-এর সঙ্গে জড়িত। সর্বোপবি নেতাদের মত ছিল এই দারিদ্রের জন্য প্রকৃতি অথবা দেশবাসী দায়ী নন, দায়ী বিদেশী শাসকেরা। দারিদ্র্যের প্রতিকারকল্পে নেতারা কিছু কিছু ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু সেগুলি মানা হয়নি। সুতরাং বহু নেতার মনেই শাসকদের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল আর তারা ভাবতে লাগলেন দেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে সেজন্য দায়ী 'বিদেশীদের উপস্থিতি এবং তাঁদের নীতি' আর 'সর্বাগ্রে তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ না পাওয়া পর্যন্ত' জাতীয়স্তরে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন হয়ত সম্ভবই হবে না।

নেতাদের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি অথবা আর্থিক নীতিসমূহ মূলতঃ ছিল সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী। তাঁদের দাবি ছিল ভারতের এবং ব্রিটেনের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। এমন কি যখন তাঁরা মাঝারিধরণের দাবি জানাতেন তখনও তাঁদের অর্থনৈতিক দাবিগুলি মূলতঃ জাতীয়তাবাদীই থাকত। নেতাদের অর্থনৈতিক

দাবিগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের জটিল অর্থনৈতিক কলকাঠি অথবা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ক্রমশঃ গভীর অন্তদৃষ্টি অর্জন করেছিলেন এবং বৃটিশ স্বার্থসিদ্ধির ভিত্তিতে রচিত প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধিতা ক'রে চলেছিলেন। এই উপলব্ধির মূলে ছিল তাঁদের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলীর পর্যলোচনা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ও অর্থনৈতিক বিকাশের কাঠামোর মধ্যে সেগুলির সামগ্রিক পরীক্ষা। তৎকালীন আর্থিক শোষণের যে তিনটি রূপ ছিল—বাণিজ্য, শিল্প ও বিত্ত, তা তাঁ রা ধরতে পেরেছিলেন এবং এটাও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সার কথাটি হ'ল ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ অর্থনীতির নীচে দাবিয়ে রাখা। নেতারা ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তোলার অর্থাৎ দেশকে কাঁচামাল সরবরাহকারীতে, ব্রিটেনে তৈরি মালের বাজারে এবং বৈদেশিক পুঁজির লগ্নীক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টারও প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা সরকারের শুল্ক, বাণিজ্য, পরিবহন এবং করনীতির সমালোচনা করতেন এই কারণে যে এই সব নীতি দেশে নূতন নূতন শিল্প স্থাপন এবং পুন: শিল্পায়নে সাহায্য করার পরিবর্তে বাধা দিচ্ছে। অধিকাংশ নেতাই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে রেল, চা-বাগিচা এবং শিল্পে ব্যাপক হারে বিদেশি পুঁজির আমদানির এবং সে সব কাজে সরকার কর্তৃক নানা সুযোগ সুবিধা দানের বিরোধীতা করতেন। সামরিক তথা সিভিল সার্ভিসের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় তো তাঁরা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রধান স্তম্ভগুলির বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফেলেছিলেন। সরকারের ভূমি রাজস্ব এবং করনীতির উপর আঘাত হেনে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক ভিতটাকেই নড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং অর্থভান্ডারকে এশিয়া এবং আফ্রিকায় ব্রিটিশ সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করাকে নেতারা আর এক ধরণের অর্থনৈতিক শোষণ আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বের পুরো প্রশাসনিক ব্যায়টা ভারতীয় কোষাগারের উপর চাপিয়ে দেবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্বে নেতারা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিতটা ধ'রেই নাড়া দিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা জনসাধারণের মনে বিদেশি অর্থনৈতিক শোষণের একটা সরল অথচ প্রবল প্রতীক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন।

তাঁদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার শেষ কথা ছিল তাঁরা চান এমন একটা আর্থিক নীতি যেটা নির্ধারিত হবে ভারতের স্বার্থের প্রয়োজনে, ইংল্যান্ডের প্রয়োজনে নয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা চাইতেন ব্রিটেনের উপর ভারতের অর্থনৈতিক নির্ভরতা আরো হ্রাস পাক। এমনকি পুরোপুরি বন্ধ হ'ক। এমনকি যখন তাঁরা অর্থনৈতিক দাবি পুরণের জন্য ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসন অথবা ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং সংসদের সাহায্যপ্রার্থী হতেন তখনও তাঁদের শেষ লক্ষ্য থাকত একটা স্বধীন অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করা। যদি তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া হ'ত তাহলে কিন্তু ভারতে ব্রিটিশের কায়েমি অর্থনৈতিক স্বার্থে ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে টান পড়ত।

জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক আন্দোলনের আরো দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়। প্রথমতঃ নেতাদের মূল লক্ষ্য ছিল সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ, সমাজের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অংশের আর্থিক উন্নতি নয়। অর্থনৈতিক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাগুলিকে তাঁরা অর্থনৈতিক বিকাশের মূল সমস্যা থেকে আলাদা ক'রে দেখতে রাজি ছিলেন না। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁরা বলতেন পরিবহন, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতির বিচার হবে জাতীয় উন্নয়নে এসবের অবদানের দ্বারা। এমনকি দারিদ্র্যের সমস্যাটাও তাঁদের কাছে প্রধাণতঃ ছিল উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক বিকাশের অভাবজনিত সমস্যা। আর অর্থনৈতিক বিকাশ তাঁদের মতে নির্ভর করছে দেশের দ্রুত এবং সার্বিক শিল্প বিকাশের উপর। অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে শিল্পায়নের মধ্যে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি, অথবা রাজস্ববৃদ্ধিতে বা সুষম বাজেট প্রস্তুতে সরকারের দক্ষতার মধ্যে নয়। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁরা দ্রুত শিল্পায়ণের লক্ষ্যের প্রতি প্রায়-মোহাবিষ্টের মতন একাগ্রচিত্ত হতে পেরেছিলেন। শিল্পবিকাশের ব্যাপারটা তাঁদের কাছে এমন এক পর্যবেক্ষণ-শিখরের সমান ছিল যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রায় সমস্ত সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং বিচার করতেন। তাঁরা চাইতেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য, রেলপথ, শুল্ক, মুদ্রা ও বিনিময়, শ্রম, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, এমন কি কৃষি-বিষয়ক সরকারি আর্থিক নীতি দেশের শিল্প-বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলুক। সম্পদ নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের মূলেও ছিল এই যুক্তি যে এর ফলে পুঁজির সঞ্চয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এখানে আর একবার ব'লে রাখা যাক নেতাদের অনুরাগ ছিল শিল্পের প্রতি, বাণিজ্যের প্রতি নয়। নিজেদের শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহণ, শুল্ক, মুদ্রাবিনিময় এবং আর্থবিষয়ক নীতির মধ্যে নেতারা শিল্পের স্বার্থটাই সবচাইতে বড় করে দেখতেন, বণিজ্যের স্বার্থ নয়। সত্য কথা বলতে কি নেতারা প্রায়ই শিল্পের খাতিরে বাণিজ্যকে উপেক্ষা করতেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমগ্র সমাজের উন্নতি। সুতরাং তাঁরা ভারতবর্ষীয় সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থের কথাই বলতে চাইতেন। তাঁরা এমন এক রাজস্ব ব্যবস্থার কথা বলতেন যাতে সরকারি কোষাগারে এমন ব্যক্তিরাই কর দেবেন যাঁদের তা দেবার সামর্থ্য থাকবে। আর বিশেষ ক'রে তাঁরা ভূমি কর এবং লবণ কর হ্রাসের জন্য নিরন্তর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় আয় যাতে বৃদ্ধি পায় সে উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্রুত শিল্পায়নের জন্য চাপ দিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় রাজস্ব তাঁরা এমন বাবে ব্যয় করতে বলতেন যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যার মানুষের সর্বাধিক উপকার হয়। এ কথা সত্য যে তাঁরা কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীর দাবিগুলি তুলে ধরেননি। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার অথবা কারখানা শ্রমিকদের অরবস্থার উন্নতিসাধন, এর কোনোটার দাবিই তাঁরা জানাননি। ব্যাপারটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে একটা বড় ত্রুটি হয়ে দেখা দিয়েছিল এমনকি পরবর্তী কালেও। তবে তাঁরা জেনেশুনেই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটা গ্রহণ করেছিলেন। তারা জানতেন

যে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সব শ্রেণীর মানুষই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁরা যে আন্দোলন চালাচ্ছেন তার ব্যাপক কর্মসূচীতে তাঁদের সবারই উপকারের সংস্থান রয়েছে।[৭] তাঁরা ভাবতেন যেহেতু তাঁরা সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক ন্যায় এবং সাম্যের জন্য সংগ্রাম ক'রে চলেছেন, সেহেতু তাঁদের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ন্যায় এবং সাম্যের লড়াইতে উৎসাহ দেওয়া ঠিক হবে না। তাঁরা এমন কোনো কাজ করতে রাজি ছিলেন না যার ফলে যুগের দাবি অনুযায়ী জনগণকে একটা অখন্ড জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার বদলে জাতির বিভক্ত হয়ে যাবার পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে। অবস্থানটা মূলতঃ সঠিকই ছিল কিন্তু এরই ফলে তাঁরা সমসাময়িক বাস্তবতার অন্যান্য দিক্‌গুলি উপেক্ষা ক'রে গিয়েছেন। ভারতীয় অর্থনীতির আসল দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁরা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত ভাবনা ও একাগ্রতা ভারতের ঔপনিবেশিক দশার প্রতি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আবার ঠিক এই কারণেই ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা তাঁদের চোখ এড়িয়ে যেতে চাইছিল, অন্ততঃ তাঁদের বৌদ্ধিক অবলোকনের আলোর ঝলকানির প্রভায়। এরই ফলে তাঁরা বুঝতে পারেননি যে জাতীয় কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁরা অবহেলিত, পদদলিত শ্রেণী এবং গোষ্ঠীগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য আরো অনেক কিছু করতে পারতেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এ ব্যাপারে তাঁরা কিছুই করেননি। নিজেদের উপর তাঁরা যে জাতীয়তার সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিলেন তারই ভিতরে তাঁরা কৃষক ও শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। যেমন, বাগিচাশ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য তাঁরা প্রকৃতই রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে শ্রেণী সংঘাতের কোনো প্রশ্ন জড়িত ছিল না কেননা শ্রমিকদের নিয়োগকর্তারা ছিলেন বিদেশি। এটাও লক্ষনীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার মুখেই কিছু কিছু নেতার মধ্যে নূতন, শ্রম-সমর্থক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা দেখা যায়। কৃষকদের ক্ষেত্রে তাঁরা ভূমিরাজস্ব কমাবার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার দাবিতে নিরন্তর আন্দোলন করে গিয়েছিলে এবং শেষ দিকে এ বিষয়ে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। ভূস্বামীদের চড়া কর আদায়ের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও অনেক নেতা আবেদন বিবেদন জানিয়েছিলেন।[৮] তাছাড়া তাঁরা জানতেন তাঁদের আসল বিচার্য বিষয় হচ্ছে কৃষকের দারিদ্র্য, কেননা তাঁদের সব কিছু অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এই কৃষকই 'অদৃশ্য মানুষ' রূপে উপস্থিত রয়েছেন। জাতীয়তাবাদীদের এমন দাবি সম্ভবতঃ খুবই কম ছিল যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কৃষককে সাহায্য করার পরিকল্পনা থাকত না। নেতারা জানতেন যে-কোনো অবস্থাতেই তাঁদের কাঙ্খিত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সব চাইতে উপকৃত হবেন কৃষকই, এখন যেমন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তিনিই সর্বপ্রধান শিকার। সে যাই হ'ক, প্রথমদিকের ভারতীয় নেতাদের কৃষিনীতিই সম্ভবতঃ তাঁদের আর্থিক নীতির সর্বপ্রধান ত্রুটি হয়ে রয়েছে।

একই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে নেতারা যদি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ

নিয়ে লড়াই করতে অস্বীকার করেও থাকেন, তবুও এই বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট পরহিতৈসিতা দেখিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ যে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন—শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সেই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন অনেক প্রস্তাব তাঁরা রেখেছিলেন। অন্য কথায় চাকুরি ক্ষুধায় কাতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা তাঁদরে আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়নি। আমরা তাঁদের আর্থিক নীতির যে পর্যালোচনা করেছি তা থেকেই ব্যাপারটা খুব ভাল ভাবে প্রমাণিত হয়। এবং সেটা আমরা এই ভাবে সংক্ষেপে করতে পারি ঃ তাঁরা তুলা আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দেবার বিরোধিতা করেছিলেন যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল বিদেশি কাপড়ের প্রধান ভোক্তা; তাঁরা শিল্পের সংরক্ষণ চেয়েছিলেন যদিও সংরক্ষণের মূল শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই বহন করতে হত; অনেক নেতাই বীট চিনির উপর আমদানি শুল্ক বসানোর সমর্থন করেছিলেন, যদিও বেশির ভাগ বীট চিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ব্যবহার করত; বিদেশি সামগ্রী সস্তা হওয়া সত্বেও তাঁরা স্বদেশীর পক্ষে প্রচার করেছিলেন; তাঁরা টাকার অবমূল্যায়ণ সমর্থন করেছিলেন যদিও এর অর্থ ছিল বিদেশি পণ্যের ক্রেতা হিসাবে এই শ্রেণীকে আরো বেশি দাম দিতে হ'ত আর নির্দিষ্ট আয়ের উপার্জনকারী হিসাবে শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা টাকার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যেমন লাভবান হতেন তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন সে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে; অধিকাংশ নেতাই আয়করের সমর্থন এবং লবণ করের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা উচ্চ বেতন হার হ্রাসের দাবি করেছিলেন এবং চাপরাশি, কনেস্টবল, সৈনিক এবং কম বেতনের কেরানিদের বেতনবৃদ্ধি চেয়েছিলেন; শিল্প এবং কল্যাণকর্মের স্বার্থে তাঁরা করবৃদ্ধির স্বপক্ষে বলতে রাজি ছিলেন; তাঁরা রেল সম্পসারণের বিরোধিতা করেছিলেন—যদিও তার দ্বারা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বেশি উপকৃত হয়েছিল, এবং পরিবর্তে ' সেচ এবং শিল্পের বিকাশ চেয়েছিলেন; অনেক নেতাই বিদেশী পুঁজির সাহায্যে দেশের উন্নতিকরণের বিরোধী ছিলেন যদিও এর ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্ম সংস্থানের নূতন নূতন পথ খুলে যেত। ব্রিটিশের প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতের জায়গায় মীমাংসামূলক আদালত অথবা প্রচীন পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্তনের জন্য নেতারা কার্যকরভাবে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন কেননা মামলা-মোকদ্দমা ক'রে কৃষকেরা ফতুর হয়ে যেতেন। একথা সত্য যে শহরের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তদের কিছু কিছু দাবিও তাঁরা পেশ করেছিলেন, তবে সেটা জানানো হয়েছিল ভারতবর্ষীয় সমাজের সমস্ত অংশের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে তাঁরা যে সার্বিক আন্দোলন চালাতেন তারই অঙ্গ হিসাবে।

এই বিষয়ে দেশি এবং বিদেশি লেখকেরা প্রায়ই যে ভুলটা ক'রে বসেন তা হ'ল এই যে তাঁরা প্রথম যুগের লেখক, নেতা সাংবাদিক এবং চিন্তাবিদদের একটা শ্রেণী—'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'—হিসাবে দেখেছেন, নতুন ভারতীয় শ্রেণীসমূহ তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৌদ্ধিক মুখপাত্র হিসাবে দেখেননি। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁরা হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা ব'লে থাকতে পারেন এবং বলেছেনও কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী জ্ঞানতঃ তাঁদের চিন্তাধারা পরিচালিত হ'ত চিন্তার দ্বারাই, স্বার্থের দ্বারা নয়। চিন্তাবিদ, বৃহত্তর অর্থে যিনি দার্শনিক অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী, তিনি নিজের সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীকে

ছাপিয়ে উর্দ্ধে উঠতে পারেন এবং প্রায়শঃ উঠেও থাকেন আর তাঁর নিজের নয় এমন কোনো শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর এমনকি একটা জাতিরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। সমাজে যখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যখন পুরাতন সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোগুলি ভাঙতে থাকে এবং নূতন নূতন শ্রেণীর জন্ম হতে থাকে, যখন নূতন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারার উদ্ভব ঘটে তখন কথাটা বিশেষভাবে সত্য হয় দেখা দেয়। সারা বিশ্বের এবং ইতিহাসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এবং অকৃত্রিম বুদ্ধিজীবীদের মতই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীরাও আসলে ছিলেন দার্শনিক, কোনো দল বা শ্রেণী বিশেষের দালাল নন। অবশ্যই তাঁরা শ্রেণী বা গোষ্ঠীর উর্ধে ছিলেন না এবং কার্যতঃ তারা নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা কোনো শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন, তাঁরা সেটা আদর্শবাদের চশমার ভিতর দিয়ে দেখতেন, সরাসরি সেই শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর সভ্য হিসাবে, অথবা বশম্বদ ভৃত্য হিসাবে দেখতেন না। অন্য কথায়, তাঁরা চিন্তা করতেন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, তত্বগত ভাবে, তবে উদ্দেশ্যগত ভাবে এবং নিজেদের সজ্ঞান বিশ্বাসের পরিধির বাইরে সে ভাবনা শুধু জাতীয় স্বার্থের সঙ্গেই নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গেও সঙ্গলাভ ক'রে যেত। আসলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা কি চাইতেন এবং বৌদ্ধিক দিক দিয়ে তাঁরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন তা জানতে হলে তাঁদের চিন্তা ও কর্মের অনুশীলন এবং বিশ্লেষণ করতে হবে নির্দিষ্টভাবে। কোনো দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অথবা চর্চারত বুদ্ধিজীবীদের প্রধাণতঃ শ্রেণীগত অথবা গোষ্ঠীগত উৎপত্তির দিকে নজর রেখে তাঁদের উপর এই শ্রেণীর অথবা ঐ শ্রেণীর সমাজবিদ্যার স্থূল প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম যুগের নেতারা কখনও কোন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, হতেও পারতেন না। অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি তথা অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল আদর্শবাদী ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া; যে শিক্ষিত গোষ্ঠী শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা নিয়ে মগ্ন থাকেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া নয়।

নেতাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলতঃ পুঁজিবাদী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তাঁরা সাধারণভাবে ধণতন্ত্রের এবং বিশেষভাবে শিল্প-পুঁজিপতিদের উন্নতির কথা বলেছেন। যদি কখনো এমন মনে হয় যে তাঁরা শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি বড় বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলেছিলে তাহলে তার কারণটা এই নয় যে নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা তাঁদের দৃষ্টিশক্তি সীমিত হয়ে গিয়েছিল, বরং এটাই যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশের পুনুরুজ্জীবনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ধনতান্ত্রিক পথে শিল্পের বিকাশ। অথবা, অন্য ভাবে দেখতে গেলে শিল্প-পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থ সেই মুহূর্তের প্রধানতম জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে তত্বগতভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পুঁজিপতিদের সমর্থন করতেন এই কারণে যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটির বাসনা তাঁরা ব্যক্ত ক'রে থাকেন, অর্থাৎ দ্রুত শিল্পায়ন, সেটা কার্যে রূপায়িত করতে পারে একমাত্র এই শ্রেণীই। তাঁরা শুধু এই অর্থে শিল্প-

পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে ধনতান্ত্রিক পথে শিল্পায়নের ফলে যে সীমাবদ্ধতার উদ্ভব হয় তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবনা ও কর্মসূচী সেটা অতিক্রম করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতীয় শিল্প এবং বাণিজ্যিক পুঁজিপতিরা মূলতঃ ছিলেন সরকারপক্ষীয় এবং তাঁরা সক্রিয়ভাবে উদীয়মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহায়তা করেননি। কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে আর্থিক টানাটানির জন্য যে দীর্ঘ বিলাপের বিবরনী নথিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তা পাঠ করলেই কথাটার সত্যতা বোঝা যায়। বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রধানতম ব্যক্তিরা প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি কানাকড়িও খরচ করেননি। দাদাভাই নৌরাজি, এ. ও. হিউম এবং উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন তাঁদের ব্যক্তিগত বিশাল সম্পদ ইংল্যান্ডে তাঁদের কাজের খরচ চালাবার জন্য ব্যয় করেছিলেন। সক্রিয় ভারত সমর্থক ইংরেজ প্রচারবিদ উইলিয়ম ডিগবি নিজের খরচ চালাতেন ইংল্যান্ডে কয়েকজন ভারতীয় রাজার ব্যক্তিগত ব্যাপারের দেখা শোনা করে। বিচারপতি রানাডে, এ. এম. বসু, এল. এম. ঘোষ, পি. এম. মেটা, ডি.ই. ওয়াচা, লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য এবং অন্যান্যরা তাঁদের পেশাগত আয়ে জীবিকানির্বাহ করতেন। লোকমান্য তিলক আইনের ছাত্রদের জন্য একটা ব্যক্তিগত টিউটোরিয়াল কলেজ চালিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন। জি. কে. গোখলে ডেকান এজুকেশনাল সোসাইটিতে সামান্য বেতনের কাজ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বেসরকারি কলেজ চালাতেন। জি. সুব্রহ্মণ্য আইয়ার এবং বিপিনচন্দ্র পাল সাংবাদিকের কাজ করতেন, শেষোক্ত জন অতি অল্প বেতনের। সে যুগের প্রতীকী জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক ছিলেন আক্ষরিক অর্থে উৎসর্গপ্রাণ ব্যক্তি যিনি জাতীয় ভাবধারার প্রচার করতেন শীর্ণ তহবিলে এবং প্রায়শঃই শূণ্য উদরে। বড়ধরণের যে চাঁদাটা কংগ্রেস এইসমেয়ে সংগ্রহ করেছিল তা এসেছিল জনাকয়েক জাতীয়ভাবাপন্ন রাজন্যবর্গ এবং বৃহৎ জমিদার যেমন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতিদের কাছ থেকে। বোম্বাই বস্ত্র উৎপাদকদের মুখপাত্ররা ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী উল্লেখযোগ্য ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা নেতাদের সমর্থন এবং আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করে।

সুতরাং আমরা পুনর্বার এই বক্তব্য রাখতে পারি যে প্রথমদিকের জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা—অথবা দার্শনিকেরা—পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের কারণে নয়, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথেই ভারত অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁরা পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচলিত এবং স্বীকৃত অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও অনুশীলনের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতেন বটে কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁরা এমন একটা বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী পথ বেছে নিয়েছিলেন যার একটা স্বাভাবিক অনুষঙ্গ ছিল ভারতের সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর এবং দেশের অর্থনৈতিক নিশ্চলতার অবসান ঘটানো। তাছাড়া তৎকালীন বাস্তবতার চিত্র

ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নেতাদের চিন্তার মধ্য দিয়ে। তাঁদের আর্থিক নীতিও ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের আর্থিক নীতির তুলনায় অনেক ভালভাবে সমাজের সমস্ত স্তরের কথা জানায়। তবে এটাও সত্য যে পুঁজিবাদী শ্রেণীই ভারতের অর্থনৈতিক পরিত্রাতা, তাঁদের এই বিশ্বাসটা ঐতিহাসিকভাবে একটা বিরাট দুর্বলতা বলে প্রমাণিত হয়েছে কেননা প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী নেতারা যে রাজনৈতিক সহায়তার জন্য কয়েকটা বিশেষ উচ্চ ও মধ্য স্তরের জনগোষ্ঠীর উপর ভরসা রেখেছিলেন তার অন্যতম কারণ এটাই। এই সময়কার জাতীয় আন্দোলনের গভীরতাহীন, ব্যাপকতর আবেদনহীন এবং পরিনামে নিষ্ফল হবার অন্যতম কারণও এটা।

কালক্রমে অর্থনৈতিক আন্দোলন চলাকালে নেতারা রাজনৈতিক দাবিও জানাতে শুরু করলেন, কেননা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতার আসন থেকেই অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলিকে সবচাইতে ভালভাবে প্রভাবিত করা যায়। রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী একটা স্বাধীন শিল্প-অর্থনীতির গ'ড়ে ওঠার উপর কি রকম প্রভাব ফেলবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে নেতারা সেগুলির বিচার শুরু করলেন। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণের সম্পর্ক ছাড়াই রাজনৈতিক দাবিগুলি এমনিতেই মাথা চাড়া দিচ্ছিল। সে যাই হক তাঁদের প্রশাসনিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশগ্রহণের দাবি জানাবার একটা প্রধান কারণ ছিল নেতারা চাইতেন যে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে প্রশাসন আরো যোগ্যতর হাতিয়ার হয়ে উঠুক। আমরা আগেই দেখিয়েছি জাতীয় নেতৃত্বের কোনো না কোনো অংশ প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাকে হয় দেশের পরাধীনতা, নয় রাজনৈতিক স্বশাসন অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভারতবাসীর অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করতেন। শেষদিকে অনেক নেতাই উরপলব্ধি করলেন যে, যেহেতু ব্রিটিশের ভারত শাসন আসলে দেশটাকে ' শোষণকরার একটা যন্ত্র মাত্র', অর্থনৈতিক উন্নতি একমাত্র তখনই সম্ভব যখন ষোলো আনা খাঁটি ইংরেজ শাসন এমন একটা রাজনৈতিক শাসনের কাছে নতি স্বীকার করবে যেখানে ভারতীয়রা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

আমাদের আলোচ্য সময়সীমা কালের নেতারা যদি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিকভাবে সামান্যই সুফল অর্জন করে থাকেন তাহলে তার কারণটা সম্ভবতঃ তাঁদের কাজ তথা আন্দোলনের মধ্যে নিহিত ছিল। সেযুগের জাতীয় আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ ছিল—কচিৎ ব্যতিক্রমসহ— তাতে জনগণের বিক্ষোভ এবং আন্দোলন তথা রাজনৈতিক তথা রাজনৈতিক সংগ্রামের অনুপস্থিতি। এবং এর ফলেই সুধুমাত্র প্রস্তাব, স্মারকলিপি, পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ রাজনীতির উপর প্রায় কোনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে নেতাদের গভীর অসাধারণ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি অথবা জাতীয় আন্দোলনে বড় রকম প্রেরণা জোগাতে পারেননি তার কারণ

তাঁদের আর্থিক নীতি ও দাবিদাওয়া ঘিরে কোনো গণআন্দোলন অথবা সংগ্রাম ছিল না। ব্রিটিশ শাসন অপরাজেয় এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই একমাত্র পথ এই যুগ্ম বিশ্বাসের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারাই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ। সামগ্রিক ব্রিটিশ পরাক্রমের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাবার মতন আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে নেতাদের আরো কয়েকটা দশক লেগে গিয়েছিল। ততদিন পর্যন্ত তাঁরা শুধু ব্রিটিশ প্রশাসনের কিছু সংস্কার সাধনের চেষ্টা ক'রে গিয়েছিলেন যাতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশাসন আরো সাহায্য করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের কখনো স্তোক দেবার কখনো তাঁদের উপর চাপসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন মাত্র—অপসারণ নয়। তদুপরি নেতারা নিজেদের এবং জনসাধারণের মধ্যেকার বিশাল দূরত্বের মাঝে সেতুবন্ধন করতে পারেননি অথবা জনগণকে জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ক'রে তুলতে পারেননি। কিন্তু মানুষের মনকে মেঘমুক্ত করার মেধা তাঁদের ছিল। তাঁরা যে সুস্পষ্ট কিছু সফলতা অর্জন করতে পারেননি সেজন দায়ী ছিল রাজনৈতিক সমর্থনের অভাব, সঠিক আর্থিক নীতি তথা কর্মপন্থার উপলব্ধিতে তাঁদের ব্যর্থতা নয়। একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের আলোচ্য সময়সীমাকালের সঙ্গে পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনের যে তফাৎ তার মূলে রয়েছে সেই ব্যাপারটাই, আর্থিকনীতি ও কর্মপন্থার আরো বেশি উপলব্ধি তথা প্রচার নয়। প্রথম দিকের এই সময় কালের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়তাবাদী সমালোচনা পরিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক আকার পায় এবং প রবর্তী জাতীয়তাবাদীরা বহুল পরিমানে সেটার উপর নির্ভর করেন। অবশ্যই তাঁরা 'পুরাতন' অর্থনৈতিক উপলব্ধি তথা যুক্তি ব্যপকতরভাবে প্রচার করেছিলেন। বিরাট রাজনৈতিক শক্তিও তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন; পুরাতন উপলব্ধিগুলিকে তাঁরা জীবন্ত রাজনৈতিক প্রশ্নে দাঁড় করিয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও বলা যায় পূর্বসূরীদের তুলনায় তাঁরা সমান্যই অগ্রসর হয়েছিলেন।

আসল কথাটা হ'ল এই যে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁরা এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন যাতে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল এবং এর দ্বারা তাঁরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে বৈরিতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল, আর রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা স্বাধীনতার লড়াই মোটের উপর অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য তাঁদের দেখাতে হয়েছিল যে ভারতবর্ষের বাস্তবতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারটা হ'ল এই যে একটা বিদেশি শক্তি অর্থনৈতিক শোষণের জন্য ভারতকে শাসন করছে, আর ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে ইংল্যান্ড অথবা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের অর্থনীতির সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথা প্রধান তফাৎ হ'ল ভারতের অর্থনীতি তথা রজকোষ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিদেশি শক্তির দ্বারা। তারপর তাঁরা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে এমন সব প্রস্তাব রেখেছিলেন যেগুলি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব ছিল না এবং তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক দাবিগুলির রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। একবার যখন বিদেশি শাসক আর

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয় ই ভাবে তু যখন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্ববিরোধিতাটা স্পষ্টভা ত পারা গেল, সঠিক রাজনৈতিক কলাকৌশল নিরূপণ শুধু সময়ের অপেক্ষায় র । প্রকৃত রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা সম্ভব ছিল আরো পরে এবং হয়েছিলও ত সংগ্রামের বিবিধ প্রকরণ এবং কলাকৌশলগত ভুলভ্রান্তি তো মূল সমস্যাগুলির প তে যে কোনো সময়ই শোধরানো যেত।

এটাও লক্ষ্যনীয় যে এই সময়কার প্রায় সমস্ত জাতীয় নেতার রাজ কাজকর্মের একটা বিশেষত্ব ছিল যে তাঁরা সজ্ঞানে জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা ত করতে এবং আধুনিক রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং কর্মে দীক্ষিত ক তেন। নেতারা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁদের ক্রিয়াকান্ড হচ্ছে পরবর্তী কা ক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বস্বরূপ। দাদাভাই নৌরজী যেমন জানুয়ারী ১ ৯০৫ তারিখে ডি. ই. ওয়াচাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

> উদীয়মান প্রজন্মের বিচারে শ্লথগতি এবং অপ্রগতিশীল হবার ফলে ক নিজের বিরুদ্ধেই যে অসন্তোষ এবং ধৈর্যহীনতার খোরাক জুগিয়েছে সে কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। এটাই কংগ্রেসের নিজস্ব ধরণের বিকাশ তথ প্রগতি... এর দ্বারাই একদিন আসল বিপ্লবের পথ সুগাম হবে, সেটা শান্তিপূর্ণই হক কি হিংসাত্মক। বিপ্লবের প্রকৃতি নির্ভর করবে ব্রিটিশ সরকারের অথবা অন্যায় বিচারের এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের আচরণের উপর।[১৩]

এই সময়কার নেতাদের কৃতিত্ব বহুমুখী—যদি অবশ্য তাৎক্ষনিক প্রাপ্তির ভিত্তিতে সাফল্যের বিচার করা না হয়। তাঁরা ভারতের জনগণকে একটা অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যসূত্র এবং একটা অভিন্ন শত্রুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছেন এবং সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁদের এক অখন্ড জাতীয়তার বন্ধনে একীভূত হতে সাহায্য করেছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁদের অবস্থা যে কত সঙ্গিন আর হীন পর্যায়ের এবং সে অবস্থার যে উন্নতি বিধান সম্ভব সে বিষয়ে জনগন. ' তাঁরা সচেতন করেছেন। দেশবাসীর অসম্বদ্ধ অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্খার তাঁরা একটা সুস্পষ্ট অবয়ব প্রদান করেছেন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাঁরা জনগনকে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, কি ক'রে সেটা করা যায় দেখাবার জন্য অর্থনৈতিক বিকাশের একটা সুষম পরিকল্পনা পেশ করেছেন এবং অর্থনৈতিক অভীষ্ট অর্জনের জন্য যে যে অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করতে হবে সেগুলিও নির্দেশিত করেছেন। এই দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করার কাজে নরম পন্থী এবং চরমপন্থী —সমস্ত নেতাই সমান অবদান জুগিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে উচ্চ মানের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসা খুব ভুল হবে না যে তাঁদের বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গ'ড়ে ওঠার উপযোগী মজবুত এবং টেকসই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন এবং আধুনিক ভারতবর্ষের রূপকারদের মধ্যে তাঁরা উচ্চ আসনের

অধিকারী। তাঁদেরই এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিজেদের ভূমিকার যে মূল্যায়ন করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার চাইতে বেশি কিছু বলা বোধ হয় সম্ভব নয়ঃ

> আমরা যেন না ভুলি যে আমরা দেশের উন্নতির পথে এমন এক জায়গায় রয়েছি যেখানে আমাদের সফলতা সামান্য হতে বাধ্য এবং আমাদেরও ঘন ঘন গভীর হতাশার কবলে না পড়ে উপায় নেই। বর্তমান সংগ্রামে এই জায়গাটিই বিধাতা আমদের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন এবং এই অবস্থানে যা যা করনীয় তা সম্পাদন করতে পারলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে। সফলতার দ্বারা ভারতবর্ষের সেবা করার সৌভাগ্য নিঃসন্দেহে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলির উপর বর্তাবে; আমাদের এই প্রজন্মের মানুষদের বর্তমানে আমাদের ব্যর্থতার দ্বারাই দেশমাতৃকার সেবা ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদিও আমদের পক্ষে বেদনাদায়ক এই ব্যর্থতাই ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস এবং সেই শক্তির সাহায্যেই একদিন বিরাট বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করা যাবে। (গোখলের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত)।

টীকা

১। ১৯০৪ সালে আর্থবিষয়ক সদস্য এডওয়ার্ড ল সেই সময়ের ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মৃদু ভাষী হিসাবে পরিচিত জি কে গোখলের ক্রমাগত সমালোচনায় বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলেন.'যেদিন থেকে সে এই কাউন্সিল সভায় জায়গা পেয়েছে, সেদিন থেকেই সে অসচেতনভাবে স্বভাব সিদ্ধ বিলাপকারীর ভূমিকা রপ্ত করে ফেলেছে। সরকারের কাজে গাফিলতি নিয়ে তার করুণ বিলাপ ও খেদোক্তি, যা অনেকদিনের চর্চা ও অভ্যাসে আয়ত্ত করা সম্ভব, তা কেবল করুণা পাবারই যোগ্য (এল সি পি, ১৯০৪, খন্ড ৫৩, পৃ: ৫৪)।

২। উদাহরণ, দাদাভাই নওরোজি লিখেছেন, 'বারে বারে এটা আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক ও অনর্থক যে বৃটিশের আইনই এ দেশকে একদিন বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছে এবং সেটাকেই তারা একের পর এক ব্যর্থতা ও দেশের নৈতিক ও বৈষয়িক দরিদ্রায়নের স্থায়ী অজুহাঃ হিসেবে খাড়া করেছে। আজকের দেশবাসীরা এই বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রত্যক্ষ করেনি এমন কি অনুভবও করেনি, তা সত্ত্বেও তারা এটা বুঝতে পারে এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দেশবাসী বর্তমানে যা দেখছে ও অনুভব করছে তা হল, সম্পদ লুণ্ঠন, দারিদ্র - দুর্দশা ও সার্বিক ধ্বংস (পভার্টি, পৃ: ২১৯)। একই কথা লিখেছেন, আর. সি. দত্ত ঃ 'বৃটিশ শাসন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু তার প্রশাসন দেশের সম্পদ সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোনোটাই করেনি, (ই এইচ আই আই , পৃ: ৭)। কেশরী এই পত্রিকার ৩১ মার্চ, ১৯৩১ - এর সংখ্যায় লিখেছেনঃ 'ভারতীয়দের মধ্যে একতা ও সমতা বজায় আছে, কিন্তু এটি সেই ধরনের একতা ও সমতা যেমনটি দেখা যায় একজন মালিক-প্রভুর অসংখ্য চাকরদের মধ্যে অথবা কোনো রাখালের চড়ানো গরুদের মধ্যে। আমাদের শাসকরা আমাদের হাতে কোনো দায়িত্বপূর্ন কাজ ছেড়ে নিতে রাজি নয়। অথবা ব্যবসা ও শিল্পে আমাদের অংশীদার করতেও ইচ্ছুক নয়' (আর এন পি, বোম্বাই, ৪ এপ্রিল. ১৯০৩। এছাড়াও নজির হিসেবে দ্রষ্টব্য দাদাভাই নওরোজি. পভার্টি, পৃ: ২০৯-১২, ২২৪-২৮, ৫৮৯, ৬৫২-

৫৩। এগুলি উদ্ধৃত হয়েছে মাসানির লেখায়, পৃঃ ৪৪৩, ৪৪৭, সি পি এর পৃঃ ২২-এ; বেঙ্গলি ১০ মে, ১৮৮৪ সংখ্যায়; এ এল রায়ের মাহরাট্টায় লেখা প্রবন্ধে ৬ জুন, ১৮৮৬; এল. এম. ঘোষের সি পি এ-র লেখায়, পৃঃ ৭৬২; আর. এন. মুধলকার - এর ইন্ডিয়ান পলিটিক্স্ - এ পৃঃ ৩৭; জি. এস. আইয়ারের ই এ-র লেখায়, পৃঃ ৩৩০।

৩। লালমোহন ঘোষ, কংগ্রেস সভাপতি, ১৯০৩, খুবই আকর্ষনীয়ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন : 'আমরা কেন জানতে চাইবনা যে এই নীতি বহুবছর আগে আমাদের দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছে, এবং সেদিন পর্যন্ত একটি উদারনৈতিক প্রশাসনের অধীনেও নির্দ্বিধায় আমাদের সূতা উৎপাদকদের উপর শুল্ক বসিয়েছে, এই নীতির অধীনেই বছরে প্রায় দু কোটি স্টার্লিং মুল্যের জাতীয় সম্পদ নিজের দেশে পাচার করছে, বদলে আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে দুর্ভিক্ষের প্রবণতাকে আগেকার সময় থেকে আরো ব্যাপক ও গভীর করে তুলেছে। আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে , যে সব প্রশাসনিক আইন এই অমোঘ বিপর্যয়কর পরিনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি একজন প্রকৃত উপকারীর প্রত্যক্ষ মদতে চালু করা হয়েছিল।

৪। বৃটিশ অভিমতের জন্য দ্রষ্টব্য : জর্জ হ্যামিলটনের অভিমত যা উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে; লেখায় উল্লেখিত, পৃঃ ৩০০; কার্জন, স্পিচেস ওয়ান, পৃঃ ৪। ভারতীয় মতের জন্য দ্রষ্টব্যঃ নওরোজি, স্পিচেস, পৃঃ ১২৩, ৩৩২, এসেস, পৃঃ ৩৬, পভার্টি, পৃঃ ২১৬, সিপিএ, পৃঃ ১৮১; আর. বি. ঘোষ. স্পিচেস, পৃঃ ১৫২; এ. এম. বোস, সি পি এ, পৃঃ ৪৩৬ ' দি ব্রোকেন প্লেজ অ্যান্ড ইট্‌স্ কনসেকোয়েন্সেস, জে পি এস. , জুলাই, ১৮৭৯, (খন্ড ২, সংখ্যা ১) পৃঃ ৪৩, ৪৬; মাহরাট্টা, ৬ নভেম্বর, ১৮৮১; দত্ত, ইংলন্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, পৃঃ ১১৮।

৫। হানসার্ড, চতুর্থ সিরিজ, খন্ড ১০৫. ২৬ জুন, ১৮৯৭, সি ৫৩৪। ৬ ডিসেম্বর, ১৯০০-এ দাদাভাই নওরোজিকে লেখা এক চিঠিতে সেক্রেটারি অফ স্টেস জর্জ হ্যামিলটন অভিযোগ করেছেন, 'আপনি নিজেকে বৃটিশ শাসনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক বলে থাকেন। অথচ এই শাসন বজায় রাখার জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ অনিবার্য তার ফলাফলকে আপনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করছেন' (এটি মাসানি উদ্ধৃত করেছেন, লেখায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৬৯)। ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৭-এর টাইমস পত্রিকা একই কথা লিখেছে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি বৃটিশরাজের বিদ্বেষী মনোভাবের সরকারি রূপ জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ এইচ এল সিং, লেখায় উদ্ধৃত, 'অধ্যায় চার; এছাড়াও দ্রষ্টব্যঃ ডব্লু এস সেটন-কার, 'দি নেটিভ প্রেস অফ ইন্ডিয়া', এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ, খন্ড ৭ম, ১৮৮৯, পৃঃ ৬২; রীজ্, লেখায় উদ্ধৃত, অধ্যায় দশ এবং পৃঃ ২৬৮-৮৮।

৬। 'সেক্রেটারি অফ স্টেট-এর প্রতি ডাফরিন ১৭ মে, ১৮৮৬, ডাফরিন পেপারস্। এর কয়েক মাস পরে ৭ আগষ্ট, ১৮৮৬ তে এ.ও. হিউমকে লেখা এক চিঠিতে ডাফরিন ভারতীয় সংসদপত্রের কাজকর্মের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনের কাজের প্রচার ও সমালোচনার জন্য এবং সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রকাশ করার জন্য ভারতীয়দের স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে; তিনি চাইলেন, ' ভারতের সংবাদ মাধ্যম অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিক, এক, যে বিষয়ের নিন্দা ও সমালোচনা করা হবে, যেমন সরকারি কাজকর্ম, বিবৃতি এবং সরকারি মতামত, তা যেন প্রকৃত তথ্যভিত্তিক হয়ে থাকে, এবং উদ্দেশ্যমূলক ও মনোগত হলে চলবে না,' দুই, ' বৃটিশ নীতিকে লক্ষ্য করে যাই সমালোচনা করা হোক না কেন, প্রশাসনকে ভারতে বা বৃটেনে যেখানেই হোক, কখনই কু উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে নিন্দা করা চলবে না, (ডাফরিন পেপারস)।

৭। উদাহরণ হিসেবে ১৮৯৩ সালেই দাদাভাই নওরোজি এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির ভাষণে। 'আমি বিশ্বাস করি এবং এব্যাপারে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, রাজনৈতিক অথবা জাতীয় ক্ষেত্রে যতটুকু সুবিধা আদায় করে নিতে পারব, তা যে ভাবেই হোক, সমস্ত শ্রেণীরই উপকারে আসবে। প্রত্যেকেই নানা উপায়ে এই থেকে উপকৃত হবে। আমাদের

সবার স্বার্থই সমান। আমরা সব একই নৌকার যাত্রী, আমরা এক সঙ্গে ডুবব অথবা ভাসব। যদি দেশ সমৃদ্ধ হয়, তাহলে একজন জীবনের একদিক থেকে এর সুবিধা ভোগ করবে তো অন্যজন আর একদিক থেকে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, যদি কুয়োতে জল থাকে তবে তা বালতি ফেললে উঠে আসবে। আমাদের যদি সমৃদ্ধির কুয়ো থাকে, তাহলে আমরা সবাই যে যার ভাগ পেয়ে যাব। কিন্তু যদি কুয়োই শুকনো হয়ে যায়, তাহলে সবাইকেই শূণ্য হাতে ফিরতে হবে' (সি পি এ, পৃ: ১৮০-৮১; এছাড়াও দ্রষ্টব্য : যোশী, লেখায় উদ্ধৃত, পৃ: ২৪৮-৪৯; আর এম সায়ানি, সি পি এ, পৃ: ৩০৯।

৮। উল্লেখ্য, ১৯২০ এবং ১৯৩০ সালে যখন কংগ্রেসের আন্দোলন তীব্র ও চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল সে সময়ই একমাত্র জমির খাজনা কমানোর দাবিতে কৃষি আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অত্যধিক খাজনার ভাবে পীড়িত রায়তদের রক্ষার প্রশ্নটি কংগ্রেস কর্মীদের ব্যক্তিগত দায় দায়িত্বে ছেড়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। এই সময়েই কংগ্রেস প্রথম "জমির ভোগ বন্দোবস্ত ও রাজস্ব পদ্ধতির আগাগোড়া পরিবর্তন" এবং জমির খজনা ও রাজস্ব বহুল পরিমানে কমিয়ে অবিলম্বে ক্ষুদ্র কৃষককে রেহাই দেওয়ার দাবি তোলে (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কিত প্রস্তাবনা, ১৯২৪-৫৪, নতুন দিল্লি। ১৯৫৪, পৃ: ১২-১৩১); অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার শর্তহিসেবে গান্ধীজি কেবলমাত্র কৃষির উপর যে ১১ দফা দাবি পেশ করেছিলেন তাতে, জমির খাজনা হ্রাস করার দাবিও ছিল (বি পট্টভি সীতারামাইয়া, দি হিস্টরি অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৩৫, মাদ্রাজ, ১৯৩৫, পৃ: ৬১৯)।

৯। লক্ষণীয় যে, যখন আর. সি. দত্ত ভাইস রিগ্যাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে (রাজকীয় কার্যকরী পরিষদে) একজন অন্ততঃ ভারতীয়কে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করেন, তখন একই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন সেই সদস্যকে যেন ভূমি রাজস্ব, শিল্প ও কৃষি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয় (সি পি এ, পৃ: ৪৯৭-৯৮।

১০। মাসনির লেখায় উদ্ধৃত, পৃ: ৪৪১। আবার, ১৮৯১ -এ পুনা সার্বজনিক সভার পক্ষথেকে অতি যত্নে ও আন্তরিকতার সঙ্গে লেখা স্মারক লিপির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের দু'লাইনের দায়সারা উত্তরের প্রতি যখন গোখলে তীব্র অসন্তোষ জানালেন, তখন বিচারপতি রাণাডে প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমাদের দেশের ইতিহাসে আমাদের স্থান কোথায়, তা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই স্মারকলিপিগুলি নামেই সরকারকে করা হয়েছে, বাস্তবে তা দেশের মানুষকেই সম্বোধন করে লেখা, যাতে তারা শিখতে পারে এ বিষয় কি ভাবে ভাবনা চিন্তা করতে হয়। এই ধরণের কাজকর্ম কোন রকম ফলের আশা না করে আরো অনেক বছর ধরেই করতে হবে। কারণ এই ধরণের রাজনীতি সার্বিক অর্থেই এই দেশে নতুন (গোখলের লেখায় উদ্ধৃত, স্পীচেস, পৃ: ৯২৯)।

গ্রন্থপঞ্জী

Note : For the sake of brevity, only the sources cited in the text are being given. Abbreviated titles used in the text are given in brackets at the end of each title.

PRIMARY SOURCES

(A) Books

Abstract of the Proceedings of the Council of the Governor-General of India, assembled for the purpose of making Laws and Regulations (Annual), 1877-1905 (*LCP*).

Banerjea, Surendranath, *Speeches*, Vols. I-V, Calcutta, 1880, 1885, 1890, 1894, 1896 (*Speeches I*, etc.), *Speeches and Writings*, published by G. A. Natesan and Co., Madras, undated (*S and W*).

Bengal National Chamber of Commerce, Reports (Annual), 1887-91, 1894-1905

Bharucha, S. B., *Speeches on Indian Economics*, Bombay, undated.

Bombay Millowners Association, Reports (Annual), 1883, 1884, 1887-1905

Bombay Presidency Association, Reports (Annual), 1885-6, 1886-7.

Chandavarkar, N.G., *Speeches and Writings*, edited by Kaikini, L. V., Bombay, 1911

Curzon, Lord (of Kedelston), *Speeches*, Vols.I, IV, Calcutta, 1900, 1902, 1904, 1906 (*Speeches I*, etc.).

Desai, Ambalal Sakerlal, *Speeches and Writings*, Bombay, 1918.

Despatches from Secretary of State and Despatches to Secretary of State, 1875-1905.

Dufferin, Marquis of, and Ava, *Speeches*, Calcutta, 1889

Dufferin Papers, microfilm copies in the National Archives of India, New Delhi.

Dutt, R. C., *The Peasantry of Bengal, 1874; England and India*, London, 1897; *Sir Philip Francis's Minutes on the Subject of a Permanent Settlement for Bengal, Bihar and Orissa*, with a preface by R. C. Dutt, Calcutta, 1901; *Famines and Land Assessments in India*, London, 1900 (*Famines in India*); *Economic History of India – Early British Rule*, 1956 impression of the edition first published in 1901, London (EHI); *Economic History of India in the Victorian Age*, 6th edition, first published in 1903, London (EHII), *Speeches and Papers on Indian Questions*, 1897-1900, Calcutta, 1904 (*Speeches I*); *Speeches and Papers on Indian Questions, 1901 and 1902. Calcutta, 1904 (Speeches II)*; *Open Letters to Lord Curzon*, Calcutta, 1904 (*open Letters*).

Elgin, Earl of, *Speeches*, Calcutta, 1899.

Eminent Indians on Indian Politics, edited by C. L. Parekh, Bombay, 1892 (*Eminent Indians*).

Finance Committee, Report of, 1886

Financial Statements of the Government of India (Annual), 1877-1905.

Ghose, Lal Mohun, Speeches, 2 parts, Calcutta, 1883, 1884

Ghose, Dr Rash Behari, *Speeches and Writings*, 3rd edition, Madras, undated.

Gokhale, G.K., *Speeches*, published by G. A. Natesan, 2nd edition, Madras, 1916; *Correspondence*, unpublished, the Library of the Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona

Government of India, Acts, 1880-1905.

Hansard (Parliamentary Debates), 1880-1905.

Home (Public) Department of the Government of India, Proceedings, 1880-1905.

Hume, A. O., *A Speech on the Indian National Congress and its Origins, Aims and Objects*, delivered at a public meeting held at Allahabad on 30 April 1888.

Indian Association, Reports (Annual), 1880-1905 (stray Reports only).

Indian Currency Committee, Report, 1893, Calcutta, 1893.

Indian Currency Committee, Minutes of Evidence and Appendices, 1893, C-7060 II

Indian Debates (Hansard's), 3 February 1902

Indian Education Commission, Report, 1883

Indian Famine Commission, Report, 1880, London

Indian Famine Commission, Report, 1898,Calcutta.

Indian Famine Commission, Report, 1901, Calcutta

Indian Leaflets, India's Appeal to the English Electors: Published and Distributed on behalf of the People of India by the British India Association and the Indian Association of Calcutta, the Bombay Presidency Association, the Poona Sarvajanik Sabha, the Mahajan Sabha of Madras, the Sindh Sabha of Kurrachee and the Praja-hita-Vardhak Sabha of Surat,1885.

Indian National Congress Reports (Annual), 1885-1904 (*Rep.INC*).

Indian National Congress, containing full text of all Presidential Addresses, reprint of all the Congress Resolutions, etc., Madras, no date (*CPA*).

Indian National Congress, *Resolutions on Economic Policy and Programme* 1924-54, New Delhi, 1954

Indian Politics, published by G A Natesan, Madras, 1898

Iyer, G. Subramaniya, *Some Economic Aspects of British Rule in india*, Madras, 1903 (*EA*).

Iyer, S Subramaniya, *Speeches and Writings*, Madras, no date.

Joshi, G V., *Writings and Speeches*, Poona, 1912.

Lajpat Rai, *Lala Lajpat Rai: The Man in His Word*, Madras, 1907.

Land Problems in India, papers by R. C. Dutt and others, Madras, 1902.

Land Revenue Policy of the Indian Government, Calcutta, 1902 (including Resolution by the Governor-General of India in Council, No. 1, dated 16th January 1902).

Lansdowne, Marquis of, *Speeches 1888-94*, 2 vols., Calcutta, 1894.

Malabari, Behramji M., *The Indian Problem*, Bombay, 1894.

Malaviya, Madan Mohan, *Speeches, Published by Ganesh and Co* , Madras, no date.

Mandlik, V.N., *Writing and Speeches*, Bombay, 1896.

Mehta, Pherozeshah M., *Speeches and Writings*, edited by C. Y. Chintamani, Allahabad, 1905 (*Speeches*); *Some Unpublished and Later Speeches and Writings*, Bombay, 1918.

Moral and Material Progress Report, the Third Decennial, prepared by J. A. Baines, London, 1894.

Moral and Material Progress Report, the Fourth Decennial, prepared by Francis C. Drake, London, 1903.

Naoroji, Dadabhai, *Essays, Speeches and Writings*, edited by C. L. Parekh, Bombay, 1887 (*Essays*); *Poverty and Un-British Rule in India*, London, 1901 (*Poverty*); *Speeches and Writings*, Published by G. A. Natesan and Co., 2nd edition, Madras, no date (*Speeches*).

Pal, Bipin Chandra, *The New Spirit*, Calcutta, 1907.

Papers Relating to Changes in the Indian Currency System, Simal, 1893.

Parliamentary Papers, 1876-1905 (PP).

Poona Sarvajanik Sabha, *Report from the Sub-Committee of the Poona Sarvajanik Sabha appointed to Collect Information to be laid before the East India Finance Committee on matters relating to India*, Poona, 1873.

Proceedings of the Council of the Governor of Madras, 1898, 1899,1902,1903.

Proceedings of the Council of the Governor of Bombay, 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1905

Proceedings of the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal, 1898.

Proceedings of the Legislative Council for the N. W. P. and Oudh, 1901.

Proceedings of the Public Meeting of the Indian Currency Association, 13 July 1892.

Proceedings of the Public Meeting Held at the Framji Cowasji Institute under the Auspices of the Bombay Presidency Association on Saturday the 15th July 1893.

Proceedings of the 1st North Arcot District Conference held on 21, 22 July 1990 at Chittoor.

Public Service Commission, Proceedings, 1887, 7 Vols., Calcutta.

Ranade, M. G., *Essays on Indian Economics*, Bombay, 1898 (*Essays*); *The Miscellaneous Writings*, published by Ramabai Ranade, Bombay, 1915, *Plea for Protection–Indian Sugar Industry*, three articles contributed in May and June 1899 to the *Times of India*, with an introduction by V G. Kale, Bombay, no date.

Ray, Prithwis Chandra, *The Poverty Problem in Indian*, Calcutta, 1895 *(Poverty)*; *The Indian Sugar Duties*, Calcutta, 1899; *Indian Famines–Their Causes and Remedies*, Calcutta, 1901 (*Famines*).

Resolution of the Government of India, Circular No. 96F/6-59, dated 19 Oct. 1888, Famine Prog. No, 19, Dec. 1888.

Resolution of the Government of India, dated 27 November 1893 *(General)*, File No. 95, Serial No. 7.

Royal Commission on the Administration of the Expenditure of India, Report of, Vols. III and IV, Parliamentary Paper (House of Com-

mons), 1900, Vol. 29, C 130 and C 131 (Welby Commission).
Runchorelal Chotalal, *Letters on the Currency Question*, Ahmedabad, 1895.
Sen, Keshub Chandra, *Life and Works of Brahmananda Keshav*, compiled by Basu, Prem Sundar, Calcutta, 1940.
Source Material for a History of the Freedom Movement in India, Bombay, Vol. I (1957).
Telang, K. T., *Free Trade and Protection from an Indian Point of View*, Bombay, 1877; *Select Writings. and Speeches*, Bombay, 1885.
Vakil, M. H., *The Currency Problem in India and Sir David Burbour, the Anglo-Indian, and the Rupee*, Bombay, 1892.
Wacha, D. E., *Speeches and Writings*, published by G. A. Natesan and Co., 1st edition, Madras, no date (*Speeches*).
Wadia, J. A., *The Artificial Currency and the Commerce of India*, Bombay, 1902.

(B) Newspapers and Journals

Amrita Bazar Patrika, Calcutta, 1870-1905* (*ABP*).
Asiatic Quarterly Review, London, 1886-1905.
Bengal Magazine, Calcutta, 1873-1882.
Bengalee, Calcutta, 1880-1905
Brahmo Public Opinion, Calcutta, 1878-1881
Calcutta Review.
Concord, Calcutta, 1887
Dawn, Calcutta, 1897-1905.
East and West, Bombay, 1901-1905.
Hindu, Madras, 1880-1905
Hindustan Review and Kayastha Samachar (known as *Kayastha Samachar* from 1899-1902), Allahabad, 1899-1905 (*HR*).
India, London, 1890-1905.
Indian People, Allahabad, 1903-1904.
Indian Review, Madras, 1901-1905.
Indian Spectator and Voice of India, Bombay, 1890-1901 (*ISVOI*)
Indu Prakash, Bombay, 1883-1895 (stray copies).
Journal of the East India Association, London, 1867-1895.
Journal of the Poona Sarvajanik Sabha, Quarterly, Poona, 1878-1897 (*JPSS*).
Journal of the Royal Statistical Society, 1902, 1911.
Mahratta, Poona, 1881-1905.
Mookerjee's Magazine, Calcutta, 1872-1876 (*MM*).
Native Opinion, Bombay, 1880-1889 (stray copies).

*Three different editions, city, mofussil, and foreign, of the *Patrika* were used. This would explain the discrepancy in its dates that a careful reader might discover. But no other arrangement was possible since the only full set of the *Patrika* that is available at the *Patrika* office is kept in this manner. All dates, therefore, refer to the set concerned.

New India, Calcutta, 1901-1904 (many issues missing).

Report on the Native Press for Bombay (weekly), 1870-1905 (*RNP Bom.*)

Report on the Native Press for Bengal (weekly), 1875-1905 (*RNP Beng*).

Report on the Native Press for Madras (monthly and later weekly), 1875-1905 (*RNPM*).

Report on the Native Press for Punjab, North-West Provinces and Oudh, etc. (weekly), 1875-1888 (*RNPPN*).

Report on the Native Press for North-West Provinces and Oudh (after 1902-UP) (weekly), 1888-1905 (*RNPN*).

Report on the Native Press for Punjab (weekly), 1888-1905 (*RNPP*).

Statesman, press cuttings in Hemanda Prosad Ghose's Collection.

The Times, London (stray copies).

Times of India, 11 and 18 March 1896.

Voice of India, Bombay, 1883-1889, New Series, 1901-1904 (*VOI*)

SECONDARY SOURCES

Anstey, Vera, *The Economic Development of India*, London, 1949, 3rd edition.

Baden-Powell, B. H., *A Short Account of the Land Revenue and its Administration in British India, with a Sketch of the Land Tenures*, Oxford 1894.

Bagal, J. C., History of the Indian Association, 1876-1951, Calcutta, 1953

Balfour, Lady B., *The History of Lord Lytton's Indian Administration, 1876-80*, London, 1899.

Banerjea, P N., *Fiscal Policy in India*, Calcutta, 1922; *A History of Indian Taxation*, Calcutta, 1930.

Banerjea, S. N., *A Nation in Making*, Calcutta, 1925.

Baran, Paul A., *The Political Economy of Growth*, Indian edition, New Delhi, 1957.

Basu, B. D., *The Ruin of Indian Trade and Industries, 3rd edition*, Calcutta, 1935.

Bell, Horace, *Railway Policy in India*, London, 1894.

Bhatia, B. M., *Famines in India 1860-1945*, Bombay, 1963.

Bombay Factory Labour Commission, Report, 1885, Bombay

Bose, Bipin Krishna, Stray Thoughts on Some Incidents of My Life, Calcutta, 1919.

Buchanan, D. H., *The Development of Capitalistic Enterprise in India*, New York, 1934.

Buckland, C. E., *Bengal Under the Lieutenant-Governors 1854-1898*, 2 Vols., Calcutta, 1901.

Chablani, H. L., *Studies in Indian Currency and Exchange*, Bombay, 1931.

Chaman Lall, D., *Coolie. The Story of Labour and Capital in India*, 2 Vols., Lahore, 1932.

Chandra, Bholonath, *Raja Digambar Mitra*, Vol. I, 2nd edition, 1896, Vol. II, Calcutta, 1906.

Chesney, General, George, *Indian Polity*, 3rd edition, London, 1904.

Chaudhari, R., *The Evolution of Indian Industries*, Calcutta, 1939.

Chintamani, C. Y., *Indian Politics Since the Mutiny*, Allahabad, 1937 reprint of 1947.

Clow, A. G., *Indian Factory Legislation–A Historical Survey*, being Bulletin of Indian Industries and Labour, No. 37, Calcutta, 1926.

Coyajee, J. C., *The Indian Currency System, 1835-1926*, Madras, 1930.

Dacosta, John, *Facts and Fallacies Regarding Irrigation as a Preventive of Famine in India*, London, 1878.

Das, R. K., *Factory Legislation in India, Berlin*, 1923; *The Labour Movement In India*, Berlin, 1923; *Factory Labour in India, Berlin*, 1923; *Plantation Labour in India*, Calcutta, 1931; *History of Indian Labour Legislation*, Calcutta, 1931.

Davies, C Collin. *The Problem of the North-West Frontier, 1890-1908*, Cambridge, 1932.

Digby, William, *'Prosperous' British India*, London, 1901.

Forrest, G. W , *Administration of the Marquis of Lansdowne as Viceroy and Governor-General of India, 1888-1894*, Calcutta, 1894.

Fraser, Lovat, *India Under Curzon and After*, 3rd edition, London, 1912.

Gadgil, D. R., *The Industrial Evolution of India in Recent Times*, 4th edition, Calcutta, 1948

Ghosh, P. C., *The Development of the Indian National Congress 1892-1909*, Calcutta, 1960.

Gopal, S., *The Viceroyalty of Lord Ripon 1880-84*, London, 1953.

Gopalakrishnan, P. K., *Development of Economic Ideas in India, 1880-1950*, New Delhi, 1959.

Gupta, J. N. *Life and Work of Romesh Chunder Dutt*, London, 1911.

Hamilton C. J , *The Trade Relations Between England and India (1600-1896)*, Calcutta, 1919.

Hoyland, John S , *Gopal Krishna Gokhale*, Calcutta, 1933.

Hume, A. O., *Hints on Agricultural Reform in India*, Calcutta, 1879.

Hunter, W. W., *The Marquess of Dalhousie*, Oxford, 1895.

Indian Economic Journal, 1953.

Imperial Gazetteer of India, Vol. III, 1908, Vol. IV, 1909, Oxford.

Indian Factory Labour Commission, Report. 1890.

Indian Industrial Commission, Report, 1918, Calcutta.

Indian Journal of Economics, 1916.

Indian Nation Builders, 3 parts, published by Ganesh & Co., Madras, no date.

Jagtiani H. M , The Role of the State in the Provision of Railways, London, 1924.

Jenks, Leland Hamilton, *The Migration of British Capital to 1875*, New York, 1927.

Kale, V. G., *Gokhale and Economic Reforms* Poona, 1916.

Karandikar, S. L., *Lokamanya Bal Gangadhar Tilak*, Poona, 1957.

Karve, D. G., *Ranade, the Prophet of Liberated India*, Poona, 1942.

Kellock, James, *Mahadev Govind Ranade*, Calcutta, 1926.

Keynes, J. M., *Indian Currency and Finance*, 1924, reprint of the 1913 edition, London.

Knowles, L. C. A., *The Industrial and Commercial Revolutions in Great*

Britain During the Nineteenth Century, London, 1927; *The Economic Development of the British Overseas Empire*, London, 1928.

Kuznets, S., and others, *Economic Growth : Brazil, India, Japan*, *Durham*, N. C., 1955.

Kydd, J. C , *A History of Factory Legislation in India*, Calcutta, 1920.

Lovett, Verney, *A History of the Indian Nationalist Movement*, London, 1920.

Lyall, Alfred, *Life of the Marquis of Dufferin and Ava*, 2 Vols., London, 1905.

Majumdar, B. B., *History of Political Thought from Rammohun to Dayananda (1821-84)*, Vol. I: Bengal, Calcutta, 1934.

Malhotra, D. K., *History and Problems of Indian Currency, 1835-1945*, 3rd edition, Lahore, 1945

Mankar, G. A., *A Sketch of the Life and Works of the Late Mr Justice M. G. Ranade*, 2 Vols , Bombay, 1902.

Masani, R. P., *Dadabhai Naoroji: The Grand Old Man of India*, London, 1939.

Mazumdar, A C , *Indian National Evolution*, Madras, 1915.

Marx, K., and Engels, F., *On Colonialism*, Moscow, no date.

Mehta, S. D., *The Indian Cotton Textile Industry*, Bombay, 1953

Metzler, Lloyd A., 'The Theory of International Trade', *A Survey of Contemporary Economics*, edited by Howard S Ellis, Philadelphia, 1948.

Mill, John Stuart, *Principles of Political Economy*, London, 1920.

Misra, B. B., *The Indian Middle Classes*, London, 1961.

Misra B. R , *Land Revenue Policy in the United Provinces under British Rule* Benares, 1942.

Mitra, A.,*Census of India*, 1951, Vol. VI, West Bengal Sikkim and Chandernagore, Part 1A–Report, Delhi, 1953.

Mody, H. P., *Sir Pherozeshah Mehta, a Political Biography*, 2 Vols., Bombay, 1921.

Morison, Theodore, *The Economic Transition in India*, London, 1916 reprint of 1911 edition.

Mukerji, Radhakamal, *Land Problems of India*, London, 1933

Mukhtar, Ahmed, *Factory Labour in India*, Madras, 1930.

Murdoch, John, *Famine–Facts and Fallacies*, no date.

Niyogi, J. P., *The Evolution of the Indian Income Tax*, London, 1929.

Paisa Fund Silver Jubilee Number, Poona, 1935.

Pal, Bipin Chandra, *Memories of My Life and Time*, 2 Vols., Calcutta, 1932 and 1951.

Palekar, S. A., *Trade of India*, Bombay, 1944.

Parshad, I. Durga, *Some Aspects of Indian Foreign Trade 1757-1893*, London, 1932.

Pillai, P. P., *Economic Conditions in India*, London, 1925.

Pradhan, G. P., and Bhagwat, A. K., *Lokamanya Tilak*, Bombay, 1958.

Punekar, S. D., *Trade Unionism in India*, Bombay, 1948.

Ram Gopal, *Lokamanya Tilak*, Bombay, 1956.

Rao, V. K. R. V., *Taxation of Income in India*, Calcutta, 1931; *An Essay on India's National Income 1925-29*, London, 1939; *The National Income of British India 1931-1932*, London, 1940.

Ray, Parimal, *India's Foreign Trade Since 1870*, London, 1934.

Rees, J. D., *The Real India*, 2nd edition, London, 1908.

Ricardo, David, *The Principles of Political Economy and Taxation*, Every man's Library, London, 1943.

Roll. Eric, *A History of Economic Thought*, revised edition, New York, 1947.

Roy, Parbati Churun, *The Rent Question in Bengal*, Calcutta, 1883.

Sanyal, N., *Development of Indian Railways*, Calcutta, 1930.

Sanyal, Ram Gopal, *A General Biography of Bengal Celebrities*, Calcutta, 1889.

Sastri, Sivanath, *Men I have seen*, Calcutta, 1919.

Sen, Amit, *Notes on the Bengal Renaissance*, 2nd edition, Calcutta, 1957

Shah, K. T., *Sixty Years of Indian Finance*, Bombay, 1921.

Saha, K. T., and Khambata, K. J., *Wealth and Taxable Capacity of India*, Bombay, 1924

Shelvankar, K. S., *The Problem of India*, London, 1940.

Shiras, G. F., *Poverty and Kindred. Economic Problems in India*, 1935, 3rd edition

Singh, Hira Lal, *Problems and Policies of the British in India 1885-1898*, Bombay, 1963.

Sitaramayya, B. Pattabhi, *The History of the Indian National Congress, 1885-1935*, Madras, 1935.

Spear, Percival, *India, A Modern History*, Ann Arbor, 1961

Statistical Abstract for British India from 1891-92 to 1900-01.

Stokes, Eric, *The English Utilitarians and India*, Oxford, 1959

Strachey, John, and Strachey, Richard, *The Finances and Public Works of India from 1869 to 1881*, London, 1882.

Strachey, John, *India*, new edition, 1894, and revised edition, 1903, London

Studies in the Bengal Renaissance, edited by A. Gupta, Calcutta (Jadavpur), 1958.

Tahmankar, D. V., *Lokamanya Tilak*, London. 1956

Thompson, E., and Garratt, G. T., *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, London, 1935.

Thomas, P. J., *Growth of Federal Finance in India*, Madras, 1939.

Thorner, Daniel, *Investment in Empire*, Philadelphia, 1950

Tiwari, R. D., *Railways in Modern India*, Bombay, 1941.

Vakil, C. N., *Financial Developments in Modern India*, Bombay, 1925.

Vakil, C. N., and Muranjan, S. K., *Currency and Prices in India*, Bombay, 1927.

Wadia, P. A., and Merchant, K. T., *Our Economic Problem*, 2nd editon Bombay, 1946.

নির্দেশিকা